বিজ্ঞান ভারতী

বৈজ্ঞানিক শব্দের অভিধান

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ বিশ্বাস
সংকলিত

পরিবেশক
শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
কলিকাতা - ৯

—পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত নব কলেবরে প্রকাশিত—

বিজ্ঞান ভারতী

॥ বৈজ্ঞানিক শব্দের ব্যাখ্যামূলক অভিধান ॥

(জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'রবীন্দ্র পুরস্কার' প্রাপ্ত 'মানব-কল্যাণে রসায়ন', ভারত সরকারের 'বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি' দপ্তরের আনুকূল্যে প্রকাশিত 'কিশোর বিজ্ঞানী' প্রভৃতি বহু বিজ্ঞান-গ্রন্থ প্রণেতা।

পরলোকগত জাতীয় অধ্যাপক বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ভূমিকা সম্বলিত প্রথম সংস্করণ 'বিজ্ঞান ভারতী' দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নরসিংদাস পুরস্কার' প্রাপ্ত
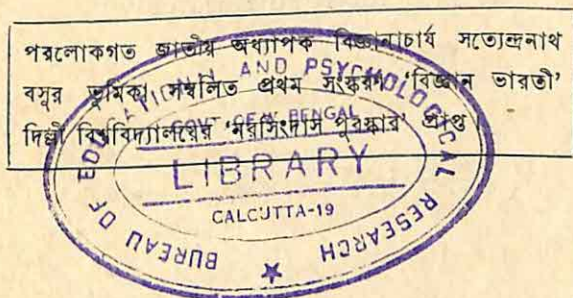
: পরিবেশক :

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী

79, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-9

প্রকাশক-গ্রন্থকার : শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
49/1A, টালিগঞ্জ রোড, কলিকাতা-26

পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত নব কলেবরে প্রকাশিত
তৃতীয় সংস্করণ : এপ্রিল, 1975
দ্বিতীয় সংস্করণ : মার্চ, 1962
প্রথম সংস্করণ : জুলাই, 1954

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে আধুনিক ভারতীয় ভাষা-সমূহের প্রসারকল্পে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আংশিক অর্থানুকুল্যে প্রকাশের দরুণ এবং বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার প্রসার সাধনের উদ্দেশ্যে কালানুযায়ী যথাসম্ভব স্বল্প মূল্য নির্ধারিত।

মূল্য : **ষোল টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র।**
(Price Rs. 16·50 Paisa only)

মুদ্রাকর : দেবেশ দত্ত
অরুণিমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
81, সিমলা স্ট্রীট, কলিকাতা-6

সূচীপত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও পাঠ-সংকেত iv

গ্রন্থকারের নিবেদন v

ভূমিকা :

জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ... vi

পরলোকগত বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু ... viii

গ্রন্থ-পরিচয় : গ্রন্থকারের বক্তব্য ix

অভিধান, মূল অংশ ... ... 1 – 399

পরিশিষ্ট : ... ... 400 – 483

ব্যবহৃত সংক্ষেপ ও তার পরিভাষা ... 400

মৌলিক পদার্থের তালিকা ... 401

রেডিও-অ্যাক্টিভ এলিমেণ্ট ... 404

রেয়ার-আর্‌থ এলিমেণ্ট ... 405

মৌলের ভ্যালেন্সি ও আইসোটোপ ... 405

মৌলিক পদার্থের পর্যায়-সরণী ... 406

বিভিন্ন শক্তি-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ও গতি ... 408

মৌলের গলনাংক, স্ফুটনাংক ও স্পেসিফিক হিট ... 411

বিভিন্ন পদার্থের ডেন্সিটি ... 412

বিভিন্ন ফ্রিজিং মিক্‌শ্চার ... 414

সৌর পরিবার সম্পর্কীয় বিভিন্ন তথ্যাদি ... 415

বায়ুমণ্ডলের উপাদান ও পরিমাণ ... 416

বিভিন্ন ক্ষেত্রের আয়তন ও ধ্রুবক রাশির মান ... 416

বিভিন্ন একক পরিবর্তনের সহজ কৌশল ... 417

বর্গমূল ও ঘনমূল ; রোমান সংখ্যা-লিখন পদ্ধতি ... 419

বিখ্যাত উদ্ভাবন ও উদ্ভাবক ... 420

নোবেল পুরস্কার ও প্রাপকদের তালিকা ... 421

মহাকাশ অভিযান ও চন্দ্রাভিযান ... 431

ব্যবহৃত পরিভাষা (বাংলা-ইংরেজী) ... 445

পারিভাষিক শব্দের তালিকা (ইংরেজী-বাংলা) ... 452-483

ঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, ডক্টর শ্রীশান্তি রঞ্জন পালিত, শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত, শ্রীঅমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর স্বর্যেন্দুবিকাশ কর মহাপাত্র, শ্রীগৌরদাস মুখোপাধ্যায়, শ্রীআশুতোষ গুহ ঠাকুরতা, শ্রীঋষিকেশ রায়, শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য, জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানানুরাগী সুধীবৃন্দের অকৃত্রিম সহযোগিতা ও সাহায্যের ফলে আমার এই 'বিজ্ঞান ভারতী' অভিধানখানা সংকলনের এবং এর এই নবকলেবরে নূতন তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের কার্য সম্ভব হয়েছে। এঁরা নানাভাবে এই গ্রন্থ প্রণয়ন ও নবীকরণের কাজে যেরূপ শ্রম স্বীকার করেছেন, তার জন্যে আমি এঁদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এ ছাড়া পরিচিত-অপরিচিত যে সকল সহৃদয় বন্ধু ও গুণগ্রাহী ব্যক্তি প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে আমাকে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের এই প্রথম প্রকাশিত অভিধানখানা প্রণয়নে সাহায্য ও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন, কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

পাঠ-সংকেত ঃ এই অভিধানে বিভিন্ন শব্দের ব্যাখ্যাদির মধ্যে অন্যত্র দ্রষ্টব্য শব্দের পরে এই ↑ চিহ্ন দেওয়া হয়েছে ; ↑ মানে 'অন্যত্র দেখুন'।

বিজ্ঞান ভারতী

(পরিবর্ধিত নবতম তৃতীয় সংস্করণ)

॥ গ্রন্থকারের নিবেদন ॥

'বিজ্ঞান ভারতী' অভিধানখানা পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত হয়ে নব কলেবরে পুনঃ প্রকাশিত হলো। এই সংস্করণে বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক পারিভাষিক শব্দগুলোর শাব্দিক তাৎপর্য রক্ষার্থে বাংলার সঙ্গে-সঙ্গে ইংরেজী বানানও সন্নিবিষ্ট হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার নূতন সব আবিষ্কার ও তথ্যাদি সম্পর্কিত বহু নূতন-নূতন শব্দের ব্যাখ্যা সংযোজিত করে অভিধানখানা অধিকতর সুসমৃদ্ধ ও তথ্যবহুল করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক শব্দের এরূপ একখানা অভিধানের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার পথ যে যথেষ্ট সুগম করেছে তারই প্রমাণ।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের অভিধান প্রণয়নের প্রচেষ্টায় 'বিজ্ঞান ভারতী' প্রথম আলোক-বর্তিকাস্বরূপ; এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হতেই দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সুধীজনের নিকট অভিধানখানা বিশেষ সমাদর লাভ করেছে। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় এর সংক্ষিপ্ত প্রথম সংস্করণটিকে বাংলা ভাষায় একটি মূল্যবান সংযোজন বলে 'নরসিংদাস পুরস্কার' দানে সমাদৃত করেছে বিগত 1955 সালে। এর বর্তমান সংস্করণটি আরও সুসমৃদ্ধ ও তথ্যবহুল হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিজ্ঞান শিক্ষার সহায়ক তথ্য-পুস্তক হিসেবে অভিধানখানার বর্তমান তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের জন্যেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাদপ্তর আংশিক কিছু অনুদান প্রদান করেছে; আর, তার ফলেই পুস্তকখানার মূল্য বর্তমান মুদ্রণ-সংকটের দিনেও যথাসম্ভব স্বল্প রাখা সম্ভবপর হয়েছে।

'বিজ্ঞান ভারতী' অভিধানের এই নব সংস্করণে বহু নূতন চিত্র, সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক শব্দের ব্যাখ্যা, নতুন-নতুন সব জ্ঞাতব্য তথ্য, বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের সংক্ষিপ্ত জীবনী, মহাকাশ অভিযানের কাহিনী প্রভৃতি বহু বিষয় সংযোজিত হয়েছে এবং গ্রন্থখানার কলেবরও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। বস্তুতঃ অভিধানখানাকে অধিকতর তথ্যপূর্ণ ও আকর্ষণীয় করবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। পুস্তকখানার এই বর্তমান তৃতীয় সংস্করণের বৈশিষ্ট্য ও উপযোগিতা দেশের বিজ্ঞানানুরাগী ও কল্যাণকামী সুধীবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে আমি আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করবো। ইতি—

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
গ্রন্থকার

কলিকাতা, মার্চ, ১৯৭৫

পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত নূতন সংস্করণ

'বিজ্ঞান ভারতী'

মানবিকী বিদ্যায় ভারতের জাতীয় অধ্যাপক

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভূমিকা

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের 'বিজ্ঞান ভারতী,—বৈজ্ঞানিক শব্দের অভিধান' বাঙ্গালা ভাষায় একখানি অতি মূল্যবান সময়োপযোগী পুস্তক হইয়াছে, ইহার তৃতীয় সংস্করণ হইতেই ইহা বুঝা যাইতেছে। এই বই অতি সহজভাবে বিজ্ঞানের নানা তথ্যের অতি সুন্দর সুবোধ্যভাবে ব্যাখ্যা দ্বারা, কেবল ছাত্র-ছাত্রীদের নহে, বয়স্ক শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সর্বশ্রেণীর বঙ্গভাষী মানুষকে বিভিন্ন বিজ্ঞানের সরল, বা জটিল সমস্ত প্রকারের মূল কথাগুলি বুঝিবার পক্ষে অপরিসীম সাহায্য করিয়াছে ও করিবে। অধুনাতন কালে 'বিজ্ঞান', অর্থাৎ ভৌতিকী বিদ্যাময় বিজ্ঞান এবং মানবিকী বিদ্যা-বিষয়ক বিজ্ঞান, এই উভয় শ্রেণীর বিজ্ঞান—ইংরেজীতে যথাক্রমে যাহাদের বলে Physical Sciences ও Human Sciences (অথবা Humanities)—এক অতি বিরাট ব্যাপার, এবং মানুষের মুখ্য আলোচনার যাবতীয় বিষয়বস্তু যে এই দুই প্রকারের বিজ্ঞান, ইহাই এখন সাধারণ্যে স্বীকৃত হইয়া গিয়াছে। প্রাচীনকালে এবং এখনও কোনও-কোন জন-সমাজে এমন বহু আলোচ্য বিদ্যা ছিল (ও এখনও কিছুটা আছে) যেগুলি প্রত্যক্ষ ও প্রমাণিত জ্ঞান ও বিচারের ক্ষেত্রের বাহিরে। এখন সেইরূপ বিদ্যাসমূহকে বিজ্ঞানের পর্যায়ে ধরা হয় না, এবং আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বারা স্বীকৃত আলোচনা-পদ্ধতির সাহায্যে সেগুলির বিচারও বোধ হয় সম্ভবপর নহে। শ্রীযুক্ত বিশ্বাস মহাশয়ের এই অভিধানখানা মুখ্যতঃ ভৌতিকী বিদ্যার এবং অংশতঃ মানবিকী বিদ্যার আলোচনায় ব্যবহৃত আন্তর্জাতিক পারিভাষিক শব্দের ও সংজ্ঞা প্রভৃতির বাংলা ভাষায় ব্যাখ্যামূলক একখানা উৎকৃষ্ট অভিধান।

আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের দেশে ইংরেজী ভাষার দ্বারা বাহিত হইয়া আসিয়াছে, এবং ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার অত্যাবশ্যক Laboratory, বা প্রয়োগশালার প্রায় তাবৎ যন্ত্রপাতি এবং

উপকরণের নাম ইংরেজী ভাষা হইতেই গৃহীত। এই হেতু, এই বিজ্ঞানের সুষ্ঠু ও সার্থক আলোচনা, পূর্ণ আলোচনা করিতে গেলে, ইংরেজী ভাষা বিশেষতঃ ইংরেজী পারিভাষিক নাম প্রভৃতি অপরিহার্য। এই সব নাম, বা সংজ্ঞা, বা পারিভাষিক শব্দের বাঙ্গালা অনুবাদ বহু ক্ষেত্রেই অনাবশ্যক, এবং কার্যতঃ ব্যর্থ শ্রমের পরিচায়ক। বহু অর্থব্যয় ও শ্রম স্বীকার করিয়া যে-সব পারিভাষিক শব্দ বাঙ্গালা, হিন্দী প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় ভাষায় গঠন করা হইয়াছে, সেগুলির কোনও ব্যবহারিক মূল্য, বা সার্থকতা নাই। এইজন্য ইহা এখন স্বীকৃত হইয়াছে যে, আমাদের বিজ্ঞান-চর্চায় উন্নতির জন্য ভারতীয় ভাষা-সমূহে সংস্কৃত, অথবা আধুনিক ভাষার ধাতু ও প্রত্যয়, এবং নবনির্মিত তথা প্রাচীন ও প্রাপ্ত শব্দের সহযোগে নূতন শব্দ না বানাইয়া যতদূর সম্ভব আন্তর্জাতিক ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করাই উচিত হইবে। ইহাতেই আমাদের দেশে আধুনিক বিজ্ঞানের চর্চা এবং বিজ্ঞান প্রচারের কাজ খুব ভাল ভাবেই চলিবে, এবং জাতীয় মর্যাদার কোন হানি হইবে না।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবাবুর সংকলিত এই অভিধানখানি এই পদ্ধতিতেই রচিত হইয়াছে। ইহার এই পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণে বাঙ্গালা অক্ষরে ও সঙ্গে-সঙ্গে বুঝিবার সুবিধার জন্য ইংরেজী অক্ষরে ইংরেজী পারিভাষিক শব্দ, সংজ্ঞা প্রভৃতি দেওয়া হইয়াছে, তাহার পরে সহজ সুপাঠ্য ও সুবোধ্য বাঙ্গালা ভাষায় শব্দীয় ব্যাখ্যা ও অন্য কার্যকর আলোচনা করা হইয়াছে। আমার মনে হয়, এবং আমার মত অনেকে আমার সঙ্গে একমত যে, এই 'বিজ্ঞান ভারতী' অভিধান খানির সাহায্যে আধুনিক বিজ্ঞানের শিক্ষা ও আলোচনার পথ সমগ্র বঙ্গদেশে সুগম ও প্রশস্ত হইবে।

মাতৃভাষার সেবায় এই মূল্যবান পুস্তকখানি অর্পণ করায় আমি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয়কে সাধুবাদ দিতেছি ও অভিনন্দিত করিতেছি। ইতি—

শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়।

২৬শে নভেম্বর, ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দ
'সুধর্মা'
১৬, হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা-২৯

॥ বিজ্ঞান ভারতী ॥

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

(জাতীয় অধ্যাপক বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু)

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের অভিধান এই প্রথম প্রকাশিত হলো। লোক-শিক্ষার প্রয়োজনে এরূপ একখানা পুস্তকের বাস্তবিকই অভাব ছিল ; সে-অভাব পূরণ করবার জন্যে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস 'বিজ্ঞান ভারতী' নামে এই অভিধান রচনা করে প্রাথমিক বিজ্ঞান শিক্ষার পথ যথেষ্ট সহজ ও সুগম করেছেন বলে আমি মনে করি।

পুস্তকখানা কেবল বিজ্ঞানের পারিভাষিক অভিধান নয় ; বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মোটামুটি জ্ঞাতব্য তথ্যেরও সহজ ব্যাখ্যা এতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। কাজেই বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তুগুলোর সঙ্গে মৌলিক পরিচয় লাভের পক্ষে পুস্তকখানার বৈশিষ্ট্য ও উপযোগিতা সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বর্তমান যুগে মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্য ও ভাবধারার সঙ্গে অন্ততঃ সাধারণভাবেও সকলেরই পরিচয় থাকা একান্ত দরকার। এজন্যে আমার বিশ্বাস, দেশের প্রত্যেক জ্ঞানানুরাগী ব্যক্তির নিকট 'বিজ্ঞান ভারতী' সমাদৃত হবে। আমাদের ছাত্রছাত্রীরাও নিজের ভাষায় বিজ্ঞানের মৌলিক তথ্যাদি এই পুস্তক থেকে সহজে আয়ত্ত করতে পারবে। 'বিজ্ঞান ভারতী' বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের অনুশীলন ও আলোচনায় বিশেষ সাহায্য করবে, এবং একখানা প্রয়োজনীয় তথ্যপুস্তক হিসাবে দেশের জনসাধারণের কাছে যথোচিত সমাদর লাভ করবে বলে আশা করি।

দেশের ঘরে-ঘরে এই অভিধানখানা সমাদৃত হোক ; জনে-জনে, বিশেষতঃ আমাদের ছাত্রছাত্রীগণ পুস্তকখানা পড়ে আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করুক, এই আমার কামনা। ইতি—

বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজ,
কলিকাতা-৯। ১০ই জুন, ১৯৫৪

স্বাঃ **সত্যেন্দ্রনাথ বসু**
সভাপতি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ।

গ্রন্থ পরিচয়

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের এরূপ একখানা সহজ ও সুবোধ্য অভিধানের প্রয়োজন বহু দিন থেকেই দেশের বিজ্ঞানানুরাগী মহলে অনুভূত হচ্ছিল, যা থেকে আধুনিক বিজ্ঞানের মূল তথ্যগুলোর সঙ্গে সহজে সকলের পরিচয় ঘটতে পারে। মানবসভ্যতার ইতিহাসে আজ জাতীয় সমৃদ্ধি ও সর্বাঙ্গীন অগ্রগতির মূল সূত্রই হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা; যার সঙ্গে অন্ততঃ সাধারণ পরিচয় লাভ করা দেশের শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেরই একান্ত প্রয়োজন। আমাদের দেশে আধুনিক বিজ্ঞানের সাধনা ক্রমেই প্রসার লাভ করছে, মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার ঘটছে। আবার, আধুনিক বিজ্ঞানের নানা প্রয়োগ ও বিভিন্ন অবদানের মূল তথ্যাদি সম্পর্কে দৈনন্দিন জীবনেও মানুষের ঔৎসুক্য বৃদ্ধি পেয়েছে; সাধারণ আলাপ-আলোচনায়ও তাই আজকাল দেখা যায়, স্বভাবতঃই বিজ্ঞানের নানা কথা উঠে পড়ে। অথচ আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষিত লোকের মধ্যেও অধিকাংশেরই বিজ্ঞানের সাধারণ তথ্যাদি সম্পর্কেও পরিষ্কার কোন ধারণা নেই। শিক্ষাক্ষেত্রের এই দৈন্য দূরীকরণের প্রয়াসে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়ের মৌলিক তথ্যাদি মাতৃভাষায় যথাসম্ভব সহজ, সুবোধ্য ও সংক্ষিপ্ত করে পরিবেশন করাই বিজ্ঞানের এই অভিধানখানা প্রণয়নের একমাত্র উদ্দেশ্য।

শব্দ নির্বাচন: 'বিজ্ঞান ভারতী' কেবল একখানা পারিভাষিক শব্দাভিধান নয়, ইহা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক শব্দের ব্যাখ্যামূলক তথ্যাভিধান। এতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার প্রচলিত ইংরাজী শব্দগুলোর মূল তথ্য ও তাৎপর্য সহজ বাংলায় বিবৃত হয়েছে এবং ইংরেজী শব্দগুলোই বাংলা বানানে বর্ণানুক্রমিকভাবে সজ্জিত হয়েছে। অবশ্য ভাষান্তরের শাব্দিক ত্রুটি ও বিভ্রান্তি দূরীকরণের উদ্দেশ্যে জাতীয় অধ্যাপক আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সাগ্রহ পরামর্শক্রমে অভিধানখানার বর্তমান তৃতীয় সংস্করণে বৈজ্ঞানিক শব্দসমূহের বাংলা বানানের সঙ্গে-সঙ্গে ইংরেজী বানানও দেওয়া হলো। এভাবে বিজ্ঞানের মূল পারিভাষিক শব্দরাজির আন্তর্জাতিক রূপ রক্ষা করা সমীচীন বলে আমরা মনে করি; এর ফলে সর্বসম্মত ও সর্বত্র সর্ব দেশে প্রচলিত বৈজ্ঞানিক শব্দ ও তথ্যের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের স্থায়ী পরিচয় লাভের সুযোগ ঘটবে এবং উচ্চতর বিজ্ঞান-শিক্ষার ভিত্তি সুদৃঢ় হবে। আভিধানিক

ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য বিবৃতির ক্ষেত্রে অবশ্য অধিকাংশ স্থলেই প্রচলিত ও সুবোধ্য বাংলা পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। অভিধানখানার আলোচ্য শব্দ-নির্বাচনে আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মূল তথ্যাদি সম্পর্কিত ও সাধারণ জ্ঞাতব্য, বিশেষতঃ সর্বাধুনিক শব্দসমূহেরই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

বাংলা বানানে ইংরেজী শব্দের সঠিক উচ্চারণ বজায় রাখার যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি ; অবশ্য কোন-কোন ক্ষেত্রে দেশীয় উচ্চারণের সৌকর্যার্থে সামান্য ব্যতিক্রমও করতে হয়েছে। বৈদেশিক শব্দের যথাযথ উচ্চারণ বাংলায় সর্বত্র নিখুঁতভাবে রক্ষা করা দুরূহ, সন্দেহ নেই ; অবশ্য বর্তমান সংস্করণে বাংলার সঙ্গে-সঙ্গে ইংরেজী শব্দও সন্নিবিষ্ট থাকায় কোথাও দ্ব্যর্থতার বিভ্রান্তি ঘটবে না।

পরিভাষা ঃ ইংরেজী, তথা আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক শব্দের বাংলা পরিভাষা প্রণয়নের জন্যে বহুদিন থেকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে অনেকে অনেক চেষ্টাই করেছেন। এর ফলে কিছু-কিছু বৈজ্ঞানিক শব্দের বাংলা পরিভাষা যথেষ্ট প্রচলিত হয়েছে সত্য; কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই বাংলা পরিভাষা সর্বাংশে প্রকৃত অর্থবোধক হয় না, কষ্টকল্পিত ও নিরর্থক হয়ে পড়ে। এজন্যে এরূপ বাংলা পরিভাষা এ পুস্তকে যথাসম্ভব বর্জন করে ইংরেজী শব্দই বিশেষ তাৎপর্য রক্ষা করে বাংলা বানানে ব্যবহৃত হয়েছে। কেবল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যাদির ব্যাখ্যাংশেই নয়, আলোচ্য মূল আভিধানিক শব্দসমূহের ইংরেজী আন্তর্জাতিক রূপই বাংলা বানানে সর্বত্র রক্ষিত হয়েছে। 'বিজ্ঞান ভারতী' অভিধানে আমরা বিশেষ প্রচলিত ও যথাযথ অর্থবোধক বাংলা পারিভাষিক শব্দগুলো মাত্র ব্যবহার করেছি।

বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তুর বাংলা ব্যাখ্যায় ও মূল পারিভাষিক শব্দ নির্বাচনে সর্বত্র ইংরেজী শব্দই স্বকীয় তাৎপর্যসহ ভাবপ্রকাশক ভঙ্গিতে সন্নিবেশিত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—অক্সিজেন, হাইড্রোজেন প্রভৃতির পরিভাষা অম্লজান, উদ্‌জান প্রভৃতি ব্যবহৃত হয় নি ; কারণ, এগুলো থেকে অক্সাইড, পারক্সাইড, হাইড্রক্সাইড প্রভৃতি বিভিন্ন অনুযোজক শব্দ গঠন করা সুষ্ঠুভাবে সম্ভব হয় না। কিন্তু টেম্পারেচার—উষ্ণতা, বা তাপমাত্রা, বয়েলিং পয়েণ্ট—স্ফুটনাংক, ইকোয়েটর—বিষুববৃত্ত, প্রভৃতি পরিভাষা সর্বতোভাবে গৃহীত হয়েছে। কেহ কেহ ইন্‌কুবেটর, রিফ্রিজারেটর প্রভৃতি শব্দের পরিভাষা উষ্ণকক্ষ, হিমকক্ষ প্রভৃতি ব্যবহার করেন, এরূপ না করাই ভাল। ইঞ্জিন, ডায়নামো, কমিউটেটর, কম্পাস, গ্যালভ্যানোমিটার প্রভৃতি যাবতীয় যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ সম্বন্ধীয় শব্দের যথাযথ আন্তর্জাতিক রূপ বজায় রাখাই বিধেয়। আবার অনেকে ক্যালসিয়াম,

প্লাটিনাম প্রভৃতি শব্দকে ক্যালসিয়ম, প্লাটিনম প্রভৃতি লিখে থাকেন ; এরূপ বিকৃতিরও আমরা পক্ষপাতী নই। অক্সি-অ্যাসিডকে অক্সি-অম্ল, অ্যাল্কোহলকে কোহল, ক্যাথোড-রে-টিউবকে ক্যাথোড-রশ্মি-নল লেখাও ভাষান্তরের গুরু-চণ্ডালী দোষে দুষ্ট ও নিরর্থক বলে আমরা মনে করি।

মোট কথা, আমরা এই অভিধানে বৈজ্ঞানিক শব্দের মূল ধ্বনি ও রূপ যথাযথ বজায় রেখে হুবহু বাংলায় গ্রহণ করেছি ; এর ফলে আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক শব্দরাজি ক্রমে বাংলা ভাষার অঙ্গীভূত হলে বাংলায় বিজ্ঞান-সাহিত্য সমৃদ্ধ হবে, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধা দূর করবে। অধিকন্তু এর ফলে বিজ্ঞানশিক্ষার্থী কিশোর-কিশোরীদের ভবিষ্যৎ উচ্চশিক্ষার পথও বহুল পরিমাণে সুগম হবে বলে আমরা মনে করি।

এ ছাড়া, সংখ্যাসূচক প্রতীক চিহ্নগুলোও এই পুস্তকে সর্বত্র 1, 2, 3··· ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে ; যেহেতু, রাসায়নিক সংকেত ও সূত্রাদিতে রোমান হরফ ও সূচক-সংখ্যা ব্যবহার করা অপরিহার্য ; বাংলা ভাষায়, বা হরফে এ-সবের রূপান্তর সম্ভব, বা সমীচীন নয়। রসায়নের সংকেত ও সমীকরণাদিতে, বা গাণিতিক সূত্রে ইংরেজী সূচক-সংখ্যার ব্যবহার অপরিহার্য বলে বৈজ্ঞানিক আলোচনায় সর্বত্র সংখ্যা-লিখনে একই রীতি, অর্থাৎ ইংরেজী সংখ্যার ব্যবহারই সঙ্গত বলে আমরা মনে করি। আবার, এর ফলে উচ্চ-শিক্ষার ক্ষেত্রে ও আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক আলোচনায় সঙ্গতি রক্ষিত হবে।

শব্দার্থ ও ব্যাখ্যা : বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পারিভাষিক শব্দের মূল তথ্য ও তাৎপর্য যথাসম্ভব সহজভাবে বিবৃত করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে বহু জটিল বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তুর সহজ ব্যাখ্যা অল্প কথায় সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করতে হয়েছে ; কারণ, সংক্ষিপ্ত সারমর্ম সংকলনই অভিধানের রীতি,—অভিধানে বিস্তৃত আলোচনা সমীচীন নয়। এজন্যে কোন-কোন স্থলে বিবৃতি অসম্পূর্ণ মনে হতে পারে, তথ্যবিশেষে মতদ্বৈধের অবকাশও অসম্ভব নয়। সহজবোধ্য বাংলায় জটিল বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হয়তো সর্বত্র সর্বাঙ্গসুন্দর হয় নি ; তবে সাধারণ পাঠক ও শিক্ষার্থীর পক্ষে বিজ্ঞানের অনাবশ্যক জটিলতা বর্জন করে প্রধান-প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয় ও মূল তথ্যের প্রাথমিক ধারণা পরিবেশন করতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। মাতৃভাষায় বিজ্ঞান অনুশীলনের ক্ষেত্রে 'বিজ্ঞান ভারতী' অভিধানখানা দেশের সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেই আমরা কৃতার্থ হবো।

বাংলা ভাষায় এরূপ বৈজ্ঞানিক অভিধান প্রণয়নের প্রচেষ্টা এই প্রথম। বিশেষতঃ নানারূপ অসুবিধা ও বিরূপ বাস্তবতার মধ্যে এর সম্পাদনা কার্য সম্পন্ন করতে হয়েছে এবং বর্তমান সংস্করণের প্রকাশনা-কার্যে নানা বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে। কাজেই কোথাও-কোথাও ত্রুটি বিচ্যুতি ও ভুল-ভ্রান্তি হয়তো থেকে যেতে পারে; অতএব, আমরা দেশের সহৃদয় সুধী-সমাজের সহযোগিতাপূর্ণ অভিমত সর্বতোভাবে কামনা করছি। অভিধান-খানার বর্তমান তৃতীয় সংস্করণে আলোচিত তথ্যাদি সম্পর্কে যে-কোনরূপ সংশোধন, বা সংযোজনের প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হবে।

পরিশিষ্ট ঃ অভিধানখানার মূল অভিধানাংশের পরে বিজ্ঞান-বিষয়ক বহু জ্ঞাতব্য তথ্য পরিশিষ্ট হিসেবে প্রদত্ত হয়েছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন আলোচনা ও অনুশীলনের কাজে বিভিন্ন পদার্থের ডেন্সিটি, গলনাংক, স্ফুটনাংক, বিভিন্ন শক্তি-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ও গতি, সৌর পরিবারের বিভিন্ন গ্রহ সম্বন্ধীয় বিবিধ জ্ঞাতব্য তথ্য প্রভৃতি বহু বিষয়ের সঠিক মান বিজ্ঞানশিক্ষার্থী ও বিজ্ঞানানুরাগী পাঠকবর্গের প্রায়শঃই প্রয়োজন হয়ে থাকে। এজন্যে এরূপ বিভিন্ন তাত্ত্বিক মানের তালিকা পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে। তদ্ব্যতীত বর্তমান সংস্করণে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার চরম উৎকর্ষের পরিচায়ক **মহাকাশ অভিযান** সম্পর্কিত বিবিধ জ্ঞাতব্য তথ্যাদি ও বিবরণ পরিশিষ্টে এই প্রথম সংযোজিত হয়েছে। এই অভিধানে যে-সকল প্রাচীন ও বহুল প্রচলিত বাংলা পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলোর একটা বাংলা বর্ণানুক্রমিক তালিকা মূল ইংরেজী শব্দসহ প্রদত্ত হয়েছে। এ থেকে বাংলায় বহুকাল থেকেই সুপরিচিত বৈজ্ঞানিক শব্দসমূহের আধুনিক ইংরেজী প্রতিশব্দ সহজে পাওয়া যাবে।

এ-সব ছাড়া বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়ে বাংলা প্রবন্ধাদি রচনার জন্যে লেখকগণের ও বিজ্ঞানানুরাগী সাধারণ পাঠকবর্গের সুবিধার জন্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সংকলিত বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পরিভাষা অবলম্বনে বিভিন্ন পারিভাষিক শব্দের তালিকা পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে। প্রয়োজন-বোধে উক্ত তালিকার কিছু-কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্জন করা হলেও মূল তালিকার ধারা যথাযথ রক্ষা করা হয়েছে। ইতি—

15, মার্চ, 1975
49/1A, টালিগঞ্জ রোড, কলিকাতা-26

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
সংকলক, 'বিজ্ঞান ভারতী'

বিজ্ঞান ভারতী

বৈজ্ঞানিক শব্দের ব্যাখ্যামূলক অভিধান

অক্টা-,অক্টো- (octa-,octo-)—আট গুণ, অষ্টসংখ্যক; যেমন, অক্টোপাস—অষ্টভুজ সামুদ্রিক জীব; অক্টাহেড্রন—সমান আটতলবিশিষ্ট ঘনায়তনিক আকৃতি।
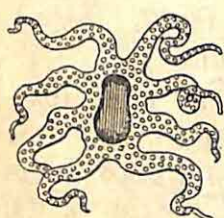
অক্টোপড (octopod)—অষ্টসংখ্যক পদ, বা অঙ্গ-বিশিষ্ট জীব, যেমন—অক্টোপাস।

অক্টোপাস

অক্টাগন (octagon)—অষ্টভুজ জ্যামিতিক ক্ষেত্র; যে সামতলিক ক্ষেত্র আটটি ভুজ, বা বাহু দ্বারা সীমাবদ্ধ।

অক্ট্যাণ্ট (octant)—বৃত্তের অষ্টমাংশ। কোন জ্যামিতিক বৃত্তের দুটি ব্যাসার্ধ 45° কোণে অঙ্কিত হলে তাদের দ্বারা সীমাবদ্ধ বৃত্তাংশ।

অক্টেন (octane)—প্যারাফিন ↑ জাতীয় একটি হাইড্রোকার্বন ↑; তরল পদার্থ, স্ফুটনাংক 126° সেন্টিগ্রেড। আণবিক সূত্র C_8H_{18}; মোটর স্পিরিট, বা পেট্রলের ↑ কার্যকরী শক্তি পরীক্ষা করবার জন্যে ব্যবহৃত হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলে 'অক্টেন-রেটিং'।

অক্টেভ-ল (octave Law)—বিজ্ঞানী নিউল্যাণ্ডস্ মৌলিক পদার্থগুলোর ক্রমপর্যায় সম্বন্ধে যে অসম্পূর্ণ অষ্টোত্তর সূত্র নির্ধারণ করেছিলেন। এর মূল তথ্য অনেকটা মেণ্ডেলিফের 'পিরিয়ডিক্-ল'-এরই ↑ অনুরূপ। কিন্তু বিজ্ঞানী মেণ্ডেলিফ ↑ করেছিলেন বিভিন্ন মৌলিক পদার্থগুলোর একটা সুসম্পূর্ণ পর্যায়ক্রমিক তালিকা, যাকে বলা হয় 'পিরিয়ডিক টেবল' (পরিশিষ্ট ↑); আর এর মূল সূত্রটাকে বলে পিরিয়ডিক্-ল ↑। নিউল্যাণ্ডস্-এর এই 'অক্টেভ-ল' অসম্পূর্ণ হলেও অন্যনিরপেক্ষভাবেই তিনি এটা স্থির করেছিলেন।

অক্ট্যাভো (octavo)—মুদ্রণকার্যে ব্যবহৃত সাংকেতিক শব্দ। এক তা কাগজকে এদিক-ওদিক করে তিন বার ভাজ করলে যে আকার হয় এবং যাতে 16 খানা মুদ্রিত পৃষ্ঠা (এক ফর্মা) পাওয়া যায়।

অক্লুসন (occlusion)—কোন নলপথে বহমান তরল পদার্থের চলাচল অবরুদ্ধ হওয়ার অবস্থা; যেমন—**করোনারি অক্লুসন**, ধমনীর রক্ত কোন স্থানে জমাট বেঁধে হৃৎপিণ্ডে রক্তের চলাচল বন্ধ হওয়া। তরল, বা

কঠিন পদার্থের অভ্যন্তরে কোন গ্যাস আবদ্ধ থাকা ; যেমন — ঢালাই লোহার কোথাও ফেপে বাতাসের বুদ্বুদ্ আবদ্ধ থাকে। এভাবে আবদ্ধ গ্যাসকে (বায়ু) বলে **অক্লুডেড** গ্যাস (occluded gas)।

অকাল্টেশান (occultation) — জ্যোতির্বিজ্ঞানে গগন পর্যবেক্ষণকালে চন্দ্রমণ্ডলের পশ্চাতে কোন গ্রহ-নক্ষত্রের অদৃশ্য হওয়া। দর্শকের দৃষ্টি থেকে কোন গ্রহের দ্বারা তার কোন উপগ্রহ আচ্ছাদিত হয়ে অদৃশ্য থাকার অবস্থা।

অক্সিন্স (ouxins) — উদ্ভিদের পত্র ও মূলের অগ্রভাগে উৎপন্ন যে-সকল জৈব রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে উহাদের অগ্রজ বৃদ্ধি ঘটে। প্রাণীদের মূত্রেও অনুরূপ পদার্থসমূহ পাওয়া যায় ; রসায়নাগারে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করাও সম্ভব হয়েছে।

অক্সানোমিটার (auxanometer)— উদ্ভিদের যে-কোন অংশের দৈর্ঘ্য-বৃদ্ধির হার পরিমাপক যন্ত্র। 'অক্স' (aux)—বৃদ্ধি।

অক্সাইড (oxide) — অক্সিজেনের সংযোগে গঠিত যৌগ ; জারিত পদার্থ। হাইড্রোজেন অক্সাইড (H_2O) হলো জল। অক্সাইডেসন—জারণ, অক্সিজেনের সংযোগ-প্রক্রিয়া (সাধারণ অর্থে)।

অক্সাইম (oxime)—N.OH পরমাণু-জোটের সহযোগে গঠিত রাসায়নিক যৌগ, যা কোন অ্যাল্ডিহাইড ↑ (বা কিটোন ↑) থেকে উৎপাদন করা যায়।

অক্সিজেন (oxygen)—একটি মৌলিক গ্যাস, সাংকেতিক চিহ্ন O ; বর্ণহীন, স্বাদহীন, গন্ধহীন পদার্থ। পারমাণবিক সংখ্যা হলো 8, অন্যান্য গ্যাসের সঙ্গে বায়ুতে মিশে আছে ; আয়তনে বায়ুর প্রায় এক পঞ্চমাংশ। সব রকম দহনকার্য ও জীবের শ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়া এ ছাড়া চলে না। হাইড্রোজেন ↑ গ্যাসের সঙ্গে এর রাসায়নিক মিলনে জলের উৎপত্তি। ধাতব খনিজের সঙ্গে প্রচুর সংযুক্ত রয়েছে। লোহার সঙ্গে এর রাসায়নিক মিলনের ফলে লোহায় মরিচা ধরে, — লোহার অক্সাইড ↑ হয়। তরল বায়ু থেকে আংশিক বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ায় বিশুদ্ধ অক্সিজেন পাওয়া যায়। জলে সামান্য দ্রবণীয়। 1774 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী প্রিষ্টলি ↑ আবিষ্কার করেন।

অক্সি-অ্যাসিটিলিন ফ্লেম (oxy-acetylene flame)—অক্সিজেন ↑ ও অ্যাসিটিলিন ↑ গ্যাস দুটিকে মিশিয়ে একসঙ্গে প্রজ্জ্বলিত করলে যে উচ্চ তাপের (প্রায় 3300 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) তীব্র অগ্নিশিখার সৃষ্টি হয়। বিশেষ যান্ত্রিক ব্যবস্থায় পৃথক নলের মধ্য দিয়ে এসে ওই দুটা গ্যাস এক মুখে
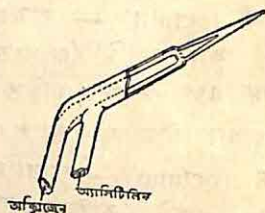
অক্সি-অ্যাসিটিলিন বার্ণার

মিশে বেরোয় ; এই মিশ্রিত গ্যাস জালিয়ে দিলে অত্যুত্তপ্ত অগ্নিশিখার সৃষ্টি করে। এর তাপে কঠিন ধাতব পদার্থ গালিয়ে জোড়া লাগানো হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলে ওয়েল্ডিং ↑ ।

অক্সিপাট (occiput) — মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ।

অক্স্যালিক অ্যাসিড (oxalic acid) — সাদা স্ফটিকাকার বিষাক্ত পদার্থ, জলে দ্রবণীয়। উদ্ভিজ্জ পদার্থ থেকে প্রাপ্ত জৈব রাসায়নিক পদার্থ, $(COOH)_2 \cdot 2H_2O$; নানা রকম রঞ্জক-দ্রব্য, কালি, মেটাল-পলিশ প্রভৃতি প্রস্তুত করতে দরকার হয়। এর জলীয় দ্রব লাগালে কালির দাগ উঠে যায় ; এর সঙ্গে একটু অ্যামোনিয়া ↑ দিয়ে রোদে রাখলে আরও ভাল কাজ হয়ে থাকে। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এথেকে বিভিন্ন **অক্স্যালেট** সল্ট ↑ উৎপন্ন হয়।

অটো- (auto-) — শব্দার্থ হলো স্বয়ংক্রিয়, বা আপনা-থেকে ; যেমন, অটোমেটিক পিস্তল, অটোজাইরো ↑, অটোগেমিক ↑ ইত্যাদি।

অটো-অক্সাইডেশন (auto-oxidation) — বায়ু থেকে কোন পদার্থের স্বভাবতঃই অক্সিজেন গ্যাসের শোষণ, বা জারণ প্রক্রিয়া ; যেমন কোন-কোন রাসায়নিক রঙের (পেইন্ট) ক্ষেত্রে ঘটে ও তার বর্ণ পরিবর্তন হয়।

অটোগেমিক (autogamic) — যে সকল উদ্ভিদ, বা প্রাণী গর্ভকোষ ও পুংকোষের (স্ত্রী-পুরুষের) মিলন ব্যতীত আপনা থেকেই এককভাবে বংশ বৃদ্ধি করে। (অ্যাসেক্সুয়াল ↑)

অটোক্লেভ (autoclave) — বাক্সের মত আধারযুক্ত বিশেষ এক রকম তাপযন্ত্র ; ফুটন্ত জলীয় বাষ্পের সাহায্যে উত্তপ্ত রেখে এই আধারের মধ্যে কোন বস্তু 100° সেন্টিগ্রেডের অধিক তাপে উত্তপ্ত রাখা যায়। ক্ষতচিকিৎসার তুলা, ব্যাণ্ডেজ প্রভৃতি বিভিন্ন জিনিস জীবাণুমুক্ত করবার জন্যে এই ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে ; এই প্রক্রিয়াকে 'স্টেরিলাইজ' ↑ করা বলে।

অটোজাইরো (autogyro)—উপরে ঘূর্ণায়মান পাখাযুক্ত হেলিকপ্টার ↑ শ্রেণীর এক রকম বিশেষ ধরণের ক্ষুদ্র বিমান-পোত। স্বয়ংক্রিয় ভাবে ঘূর্ণায়মান এই পাখার সাহায্যে বাতাস কেটে অটোজাইরো যে-কোন স্থান থেকে সোজা উপরে উঠে যেতে পারে।

অটোজাইরো

অটোলিসিস (autolysis) — প্রাণীর মৃত্যুর পরে জীবকোষের রাসায়নিক উপাদান সমূহের (কোষাভ্যন্তরস্থ এঞ্জাইম ↑ কর্তৃক) স্বতঃবিয়োজন-পদ্ধতি ; জীবিতাবস্থায় এঞ্জাইমসমূহ কোষের মধ্যে সুপ্তাবস্থায় নিয়ন্ত্রিত ও সক্রিয় থাকে।

অটো-সাজেস্‌শান (auto-suggestion)—মনস্তাত্ত্বিক স্ব-কল্পনা ; ব্যাধি বিশেষ ; যাতে কোন রোগের বদ্ধমূল ধারণা জন্মায়,—রোগের কল্পনা করে, আর শেষে প্রকৃতই সেই রোগে আক্রান্ত হয়।

অটো-ভ্যাক্‌সিন (auto-vaccine) — দুষ্ট ক্ষতচিকিৎসায় ক্ষতের রোগ-জীবাণু রোগীর দেহে অনুপ্রবেশ করানোর চিকিৎসা-পদ্ধতি ; শোধিত রোগ-জীবাণুর টিকা।

অডিবিলিটি লিমিট্ (audibility limit) —শ্রুতি-সীমা ; বাতাসে প্রতি সেকেণ্ডে কমপক্ষে 30 থেকে উর্ধে 30,000 বার স্পন্দনের শব্দতরঙ্গ

মানুষের কানে ধরা পড়ে ; এর বেশী, বা কম স্পন্দন-বিশিষ্ট তরঙ্গের শব্দ মানুষের শ্রুতিগোচর হয় না। প্রতি সেকেণ্ডে শব্দ-তরঙ্গের স্পন্দন-সংখ্যার এই সীমাকে বলে অডিবিলিটি-লিমিট্। এর বেশী সংখ্যক স্পন্দনযুক্ত শব্দ-তরঙ্গকে বলে 'আল্ট্রাসোনিক' ↑ ।

অণ্টোজেনি (ontogeny) — কোন প্রাণীবিশেষের জৈববিবর্তন, বা ক্রমবিকাশের বৈজ্ঞানিক ধারাবিবরণী, বা ইতিহাস। জীব-বিজ্ঞানের এই শাখাকে বলা হয় **অণ্টোলজি**। সমষ্টিগতভাবে কোন প্রাণী-গোষ্ঠির (ফাইলাম ↑) জৈব বিবর্তনের ইতিহাসকে বলে **ফাইলোজেনি**।

অপ্‌সোনিন্‌স (opsonins) — জীবের রক্তে যে-সব সূক্ষ্ম জৈব উপাদানের কার্যকারিতায় শ্বেত-কণিকাগুলি কোন বহিরাগত রোগ-জীবাণুকে দ্রুত ধ্বংস করতে সমর্থ হয়। কোন ব্যক্তির রক্তে কোন বিশেষ জীবাণুকে বিপর্যস্ত করবার যতটা শক্তি থাকে তার পরিমাপক তুলনামূলক সাংকেতিক সংখ্যাকে বলে **অপ্‌সোনিক ইণ্ডেক্স** ; বিশেষ টিকার বীজের প্রভাবে রক্তে এই শক্তি, বা 'অপ্‌সোনিক ইণ্ডেক্স' বৃদ্ধি পায়।

অপ্‌থেল্‌মিয়া (ophthalmia) — চোখের রোগ-বিশেষ ; অক্ষিগোলকের প্রদাহ ও স্ফীতাবস্থা। জীবাণুঘটিত সংক্রামক রোগ। রোগী থেকে সুস্থ লোকের চোখে সংক্রামিত হতে পারে ; আবার মাতার কোন গোপন ব্যাধির জীবাণুর প্রভাবে নবজাত-কেরও হতে দেখা যায়।

অপ্‌থ্যাল্‌মোস্কোপ (ophthalmoscope) — চক্ষুপরীক্ষার যন্ত্র, যাতে চোখের দৃষ্টিশক্তির ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়ে। 'অপ্‌থ্যাল্‌মস' মানে চোখ।

অপোজিশন (opposition) — জ্যোতির্বিজ্ঞানে ব্যবহৃত শব্দ ; নিজ নিজ কক্ষ-পথে পরিক্রমাকালে কোন গ্রহ যখন পৃথিবী ও সূর্যের সমসূত্রে আসে এবং পৃথিবী থাকে মাঝে, তখন মহাশূন্যে ঐ গ্রহটি 'অপোজিসন' অবস্থায় আছে বলা হয়।

অপ্টিমাম (optimum) — সর্বোৎকৃষ্ট ; যেমন, 'অপ্টিমাম টেম্পারেচার' হলো কোন জীবের (বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার) পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট, বা সব চেয়ে উপযোগী তাপমাত্রা।

অপ্টিক অ্যাক্সিস (optic axis)— কোন পদার্থের ক্রিষ্ট্যাল ↑, অর্থাৎ স্ফটিকের অভ্যন্তরে যে নির্দিষ্ট দিকে আলোকরশ্মি প্রতিসরিত করলে তা বর্ণালীতে বিশ্লিষ্ট না হয়ে সমবর্ণেই প্রতিসরিত হয়। এক কথায় বলা যায়, আলোকরশ্মির (স্ফটিকাভ্যন্তরস্থ) অক্ষপথ।

অফ্‌সেট প্রিণ্টিং (offset printing) — অমসৃণ কাগজেও রঙিন ছবি ছাপবার এক রকম উন্নত প্রণালী। রাবার, বা তদনুরূপ কোন নরম পদার্থের পাতের উপরে বিশেষ কৌশলে প্রথমে উদ্দিষ্ট ছবির এক-এক বর্ণের উল্টা প্রতিচ্ছবি মুদ্রিত হয় ; পরে যন্ত্রের সাহায্যে তার থেকে কাগজে ধারাবাহিকভাবে তাদের পুনর্মুদ্রিত করা হয়।

অপ্টিক্স্‌ (optics) — আলোকের ধর্ম ও তথ্যাদি সম্পর্কীয় বিজ্ঞান।

অব্জেক্টিভ (objective)—দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ যন্ত্রে যে-সব লেন্স ↑ দৃশ্য বস্তুর অভিমুখে সংলগ্ন থাকে। ওই সব

যন্ত্রের যে-দিকে চোখ লাগানো হয় সেখানকার লেন্সকে বলে 'আই-পিস'।

অব্টিউস অ্যাঙ্গল্ (obtuse angle) — এক সমকোণ, বা 90° ডিগ্রি অপেক্ষা বৃহত্তর, কিন্তু 180° ডিগ্রি অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর জ্যামিতিক কোণ।

অম্ব্রোমিটার (ombrometer) — বৃষ্টিমান যন্ত্র, বা রেইন-গেজ ↑; বৃষ্টি-পাতের পরিমাণ নির্দেশক যন্ত্র। 'অম্ব্রো' মানে রেইন, বা বৃষ্টি।

অর্কিড (orchid) — এক শ্রেণীর মনোরম সপুষ্পক উদ্ভিদ; এদের কতকগুলি আছে পরগাছা শ্রেণীর। এদের ফুল সাধারণতঃ বিভিন্ন বর্ণে বৈচিত্র্যময় সুদৃশ্য হয়ে থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন গ্রীষ্ম-প্রধান অঞ্চলে প্রায় পাঁচ হাজার বিভিন্ন গোত্রের অর্কিড পাওয়া গেছে। ভারতে হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে নানাজাতীয় উৎকৃষ্ট অর্কিড জন্মে।

অর্কিড

অর্গ্যানিক কেমিষ্ট্রি (organic chemistry) — জৈব, বা অঙ্গারক রসায়ন-বিদ্যা; কার্বো-রসায়ন। উদ্ভিদ, বা প্রাণিদেহ থেকে প্রাপ্ত, বা অঙ্গার-ঘটিত পদার্থাদি বিষয়ক রসায়ন শাস্ত্র।

অর্গ্যানোথেরাপি (organotherapy) — চিকিৎসা পদ্ধতি বিশেষ; যাতে কোন রোগ প্রতিকারের উদ্দেশ্যে কোন সুস্থ জীবের বিশেষ গ্ল্যাণ্ড ↑, বা জৈবগ্রন্থি অস্ত্রোপচারের দ্বারা রোগীর দেহে সংযোগ করা হয়; অথবা সেই গ্রন্থির নির্যাস (যেমন থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের ↑) রোগীর দেহে ইন্‌জেক্‌সন করে প্রবিষ্ট করাও হয়ে থাকে।

অর্গ্যাণ্ডি (organdie) — হাল্কা, সূক্ষ্ম, অথচ খড়খড়ে সূতীবস্ত্র বিশেষ; ব্যবহারিক নাম।

অর্গ্যানোসল (organosol)—কোন তরল জৈব রাসায়নিক (অর্গ্যানিক ↑, অর্থাৎ কার্বন-ঘটিত তরল যৌগিক) পদার্থের মাধ্যমে তৈরী কোলয়ড্যাল সল্যুসান (কোলয়েড ↑)।

অর্গ্যানো-মেটালিক কম্পাউণ্ড (organo-metallic compound) — ধাতব পরমাণুর সঙ্গে জৈব রাসায়নিক (অর্গ্যানিক ↑) কোন পরমাণু-গোষ্ঠির রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন যৌগিক পদার্থ, যেমন — লেড-টেট্রাইথাইল।

অর্ডিনেট (ordinate) — সমতলস্থ কোন বিন্দুর অবস্থান-নির্দেশক লম্ব-স্থানাঙ্ক, বা 'y' কোঅর্ডিনেট; বাংলায় বলা হয় বিন্দুর কটিপদ। (অ্যাব্‌সিসা ↑)

অর্থো-অ্যাসিড (ortho-acid) — যে অ্যাসিড ↑ কোন অক্সাইডের ↑ সঙ্গে সর্বাধিক সংখ্যক জলীয় অণুর মিলনে গঠিত হয়েছে বলে মনে করা হয়। রাসায়নিক বিচারে যে-কোন অ্যাসিডকেই মূলতঃ এক, বা একাধিক জলীয় অণুর সংযোগে গঠিত কোন অক্সাইডরূপে কল্পনা করা যায়। এভাবে সর্বনিম্ন সংখ্যক জলীয় অণু থাকলে তাকে মেটা-অ্যাসিড ↑, এবং অধিক সংখ্যক থাকলে অর্থো-অ্যাসিড বলা হয়। যেমন—মেটাসিলিসিক অ্যাসিড (H_2SiO_3)-কে মনে করা যায় SiO_2+H_2O; কিন্তু অর্থো-

সিলিসিক অ্যাসিড (H_4SiO_4)-কে SiO_2+2H_2O; রাসায়নিক বিচারে একে দু'টি জলীয় অণুবিশিষ্ট সিলিকা ↑, বা সিলিকন ↑ ডাইঅক্সাইড রূপে পরিকল্পিত হয়।

অর্থোক্রোমেটিক ফিল্ম (orthochromatic film) — 'অর্থো' মানে সোজাসুজি, অথবা যথাযথ; 'ক্রোমেটিক' মানে বর্ণময়। আলোকচিত্রের যে ফিল্মে ↑ বিভিন্ন বর্ণের ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য সাদা-কালো ছবিতে যথাযথভাবে পরিস্ফুট হয়। আবার বিশেষ রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে এরূপ ফিল্ম বিশেষতঃ সবুজ, নীল ও বেগুনী বর্ণ (আলোক) সুগ্রাহী হয়ে থাকে; যার ফলে ফটোগ্রাফির ↑ আলোছায়ার কৌশলে এতে অধিকতর স্বাভাবিক ছবি ওঠে।

অর্থোক্লেজ (orthoclase) — ফেলস্পার ↑ শ্রেণীর খনিজ প্রস্তর বিশেষ; অ্যালুমিনিয়াম ও পটাসিয়ামের যুগ্ম সিলিকেট ↑। এর বিশেষত্ব হলো আঘাতে এর ক্রিষ্ট্যালগুলি পরস্পরের লম্বভাবে (অর্থোগন্যাল ↑) দু'দিকে ফেটে ভেঙ্গে যায়।

অর্থোগন্যাল (orthogonal) — লম্বভাবে অবস্থিতি; দু'টি সরলরেখা পরস্পরকে সমকোণে ছেদ করলে তাদের বলা হয় পরস্পরের 'অর্থোগন্যাল'।

অর্থোগ্রাফিক প্রোজেকশন (orthographic projection)— গৃহাদির যে নক্সা অঙ্কনে কেবল মাত্র প্রান্তীয় রেখাগুলি মূলবস্তুর অনুরূপ সমান্তরালভাবে হুবহু অঙ্কিত হয়, অর্থাৎ যে নক্সায় দৃষ্টিকোণানুরূপ-ভাবে (পার্সপেক্টিভ ↑) বস্তুর অবস্থান-বৈশিষ্ট্য বুঝাবার জন্যে অসমান্তরাল রেখাবিন্যাসে নক্সা অঙ্কন করা হয় না।
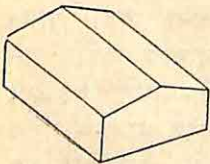
অর্থোগ্রাফিক প্রোজেকসন

অর্থোপিডিক সার্জারি (orthopaedic surgery)— অস্ত্র-চিকিৎসা বিশেষ; যাতে দেহের (বিশেষতঃ শিশুদেহের) কোন ভগ্ন, বা বিকৃতাঙ্গের অস্থি, অথবা অস্থি-সন্ধি অপসারিত করে কৃত্রিমপ্রক্রিয়ায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা হয়।

অর্থোসেণ্টার (orthocentre) — ত্রিভূজের লম্ববিন্দু; কোন জ্যামিতিক ত্রিভূজের কৌণিক বিন্দুত্রয় থেকে বিপরীত বাত্রয়ের উপরে অঙ্কিত প্রলম্ব-রেখা তিনটির ত্রিভূজাভ্যন্তরস্থ ছেদবিন্দু।
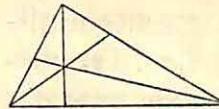
অর্থোসেণ্টার

অর্থোপ্‌টেরা (orthoptera)— আরসোলা জাতীয় যে-সব পতঙ্গের সামনের পক্ষদ্বয় অপেক্ষাকৃত পুরু ও শক্ত থাকে; কিন্তু পেছনের পাখা-জোড়া পাত্‌লাজালি-পর্দায় গঠিত। (চিত্রে এক দিকের পক্ষদ্বয় দেখানো হয়েছে।)
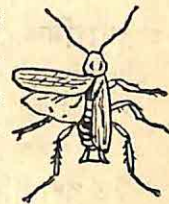
অর্থোপ্‌টেরা

অর্পিমেণ্ট (orpiment) — এক রকম হল্‌দে খনিজ পদার্থ; স্বভাবজাত আর্সেনিক ট্রাইসাল্‌ফাইড (As_2S_3), বিষাক্ত পদার্থ। একে বাংলায় বলে 'হরিতাল'।

অরবিট (orbit) — কক্ষ; নির্দিষ্ট ভ্রমণ-পথ, গ্রহাদি যে-পথে সূর্যকে

প্রদক্ষিণ করে। আবার, পরমাণুর সংগঠক ইলেক্‌ট্রনগুলো ↑ যে-পথে নিউক্লিয়াসের ↑ চারিদিকে ঘোরে।

অরিক্‌ল (auricles) — হৃদ্‌পিণ্ডের অলিন্দ-প্রকোষ্ঠ ; মানুষের হৃদ্‌পিণ্ডের ঊর্ধ্ব-প্রকোষ্ঠ দুইটি,—দক্ষিণ অলিন্দ ও
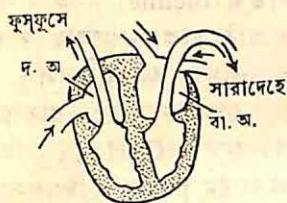
হৃদ্‌পিণ্ডের সাধারণ গঠন

বাম অলিন্দ ; যাদের মধ্যে সরাসরি রক্ত চলাচল করে না। হৃদ্‌পিণ্ডের (হার্ট, heart) ↑ নিম্ন-প্রকোষ্ঠ দুইটিকে বলা হয় ভেন্ট্রিকল্‌স (ventricles) ↑, যারা রক্ত সংবহনে পাম্পের মত কাজ করে।

অরোরা অস্ট্রালিজ (aurora australis) — দক্ষিণ মেরুজ্যোতি ; পৃথিবীর দক্ষিণ মেরুঅঞ্চলের আকাশে যে জ্যোতি-প্রভা দৃষ্ট হয়। উত্তর মেরু অঞ্চলের আকাশে একই নৈসর্গিক কারণে উৎপন্ন অনুরূপ জ্যোতি-প্রভাকে বলা হয় 'অরোরা বোরিয়ালিস' ↑।

অরোরা বোরিয়ালিস (aurora borealis) — উত্তর মেরু-প্রভা ; পৃথিবীর উত্তর মেরু-প্রদেশের আকাশে যে আলোকচ্ছটা পরিদৃষ্ট হয়। এর বর্ণালীতে প্রধানতঃ লাল ও সবুজ বর্ণের আভাই বেশী। সম্ভবতঃ সূর্য থেকে তড়িতাবিষ্ট কণিকা-ধারা বিচ্ছুরণের ফলে এরূপ বর্ণচ্ছটা প্রতিভাত হয়ে থাকে। বায়ু-কণিকা আয়নায়িত ↑ হয়ে তার তড়িৎ-বিচ্ছুরণের ফলেও এরূপ হতে পারে। যখন সৌরকলঙ্কের আধিক্য ঘটে তখনই এই আলোকচ্ছটার ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়।

অরোগ্রাফিক রেইন (orographic rain)—পর্বতগাত্রে বাধাপ্রাপ্ত মেঘের বর্ষণে যে বৃষ্টিপাত হয় (অরো, oro = পার্বত্য)।

অর্মোলু (ormolu)—তামা ও দস্তার (জিঙ্ক ↑) এক প্রকার ধাতু-সংকর বিশেষ ; যা দেখতে অনেকটা যেন সোনার মত বর্ণবিশিষ্ট হয়।

অল্‌ফ্যাক্টরি (olfactory) — গন্ধ, বা ঘ্রাণ সম্বন্ধীয় ; যেমন—'অল্‌ফ্যাক্টরি অর্গ্যান' হলো ঘ্রাণেন্দ্রিয়, বস্তুতঃ নাসিকার অভ্যন্তরস্থ ঝিল্লি।

অলিয়ো-রেজিন (oleo-resin) — যে রেজিনে ↑ উদ্ভিজ্জ উদ্বায়ী তৈলাংশ কতকটা সংমিশ্রিত থেকে যায়। 'অলিয়ো' মানে 'অয়েল', অর্থাৎ তেল-সংযুক্ত।

অলিভাইন (olivine) — লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজ ↑ ধাতুদ্বয়ের সম্মিলিত অর্থো-সিলিকেট [$(MgFe)_2SiO_4$], ব্যবহারিক নাম। এরূপ খনিজ পদার্থ প্রধানতঃ ভূ-স্তরের গভীরে ও সমুদ্রের তলদেশের কঠিন প্রস্তরাভ্যন্তরে পাওয়া যায়। স্ফটিকাকারের বিশুদ্ধ অলিভাইন মূল্যবান সৌখিন ও সুদৃশ্য প্রস্তর হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

অলিয়াম (olium)— ঘনীভূত (কন্‌সেন্ট্রেটেড) গন্ধকাম্ল ; প্রায় নির্জল বিশুদ্ধ সালফিউরিক অ্যাসিড, ↑ H_2SO_4, যাতে জলীয় অংশ প্রায় থাকে না। অনাবৃত রাখলে বায়ুর সংস্পর্শে এ-থেকে সব সময় সালফার-

ট্রাইঅক্সাইডের (SO_3) ধূম নির্গত হতে থাকে; তাই একে **ফিউমিং সালফিউরিক অ্যাসিড**-ও বলে।

অলেইক অ্যাসিড (oleic acid) — একটি তরল অসম্পৃক্ত জৈব (অর্গ্যানিক) অ্যাসিড; বিভিন্ন তৈল ও চর্বি জাতীয় পদার্থে এর বিভিন্ন গ্লিসারাইড ↑ পাওয়া যায়। এর গ্লিসারাইডের ভাগ যত বেশী থাকবে তৈল, বা চর্বি তত নরম, মসৃণ ও তৈলাক্ত হবে।

অল্টার্নেটিং কারেণ্ট (alternating current) — সংক্ষেপে এ. সি. (তড়িৎপ্রবাহ); যে তড়িৎপ্রবাহ পর্যায়ক্রমিকভাবে দ্রুত দিক পরিবর্তন করে। এরূপ প্রবাহে তড়িৎশক্তি প্রথমে একদিকে সর্বোচ্চ চাপ-সীমায় পৌঁছেই সঙ্গে সঙ্গে সে-চাপ মন্দীভূত হয়, এবং বিপরীত দিকে সর্বনিম্ন সীমায় দ্রুত নেমে যায়। প্রবাহপথে তড়িৎশক্তির এরূপ পর্যায়ক্রমিক অতি দ্রুত হ্রাস-বৃদ্ধি চলতে থাকে; —প্রতি সেকেণ্ডে তড়িৎ প্রবাহের এরূপ দিক পরিবর্তনের পৌনঃপৌনিক সংখ্যাকে বলে 'ইলেক্ট্রো ফ্রিকোয়েন্সি' ↑। এ. সি. তড়িৎপ্রবাহে সাধারণতঃ সেকেণ্ডে 50 ফ্রিকোয়েন্সি রাখা হয়, কিন্তু রেডিও ↑, রাডার ↑ প্রভৃতির ক্ষেত্রে তা কয়েক হাজার করাও প্রয়োজন হয়।

অল্টিচিউড (altitude) — সাধারণ অর্থে 'উচ্চতা'; কোন স্থানের অল্টিচিউড বললে সাগরপৃষ্ঠ থেকে সে-স্থানের উচ্চতা বুঝায়। জ্যোতির্বিজ্ঞানে কোন গ্রহ-নক্ষত্রের অল্টিচিউড বলতে ভূ-সমান্তরাল থেকে তার কৌণিক উচ্চতা (অ্যাঙ্গুলার হাইট ↑) বুঝতে হয়।

অল্টিমিটার (altimeter)—কোন স্থানের উচ্চতা নিরূপণ করবার জন্যে ব্যবহৃত যন্ত্র বিশেষ। নানা রকমের আছে (হিপ্‌সোমিটার ↑)।

অলিফাইন (olefine) — ইথিলিন ↑ শ্রেণীর হাইড্রোকার্বনগুলোর সাধারণ নাম; এদের **অলিফিন্‌স**ও বলা হয়। এদের সাধারণ রাসায়নিক ফর্মূলা হলো C_nH_{2n}; বিভিন্ন সংখ্যক কার্বন ↑ ও তার দ্বিগুণ সংখ্যক হাইড্রোজেন অণুর মিলনে এগুলো গঠিত হয়।

অলিফিয়াণ্ট গ্যাস (olefiant gas) —ইথিলিন ↑ নামক গ্যাসীয় হাইড্রোকার্বনটির বিশেষ নাম (C_2H_4)।

অয়েল অব ভিট্রিয়ল (oil of vitriol) — সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিডের ↑ (H_2SO_4) বিশেষ নাম; বাংলায় বলে গন্ধকাম্ল। (ব্লু-ভিট্রিয়ল ↑)

অস্‌মোসিস (osmosis)— সূক্ষ্ম পর্দা-বিশেষের মধ্যে দিয়ে জল, বা অপর কোন দ্রাবক পদার্থের যে-গতি লক্ষিত হয়; অভিস্রাবণ প্রক্রিয়া। এরূপ পর্দার ভিতর দিয়ে দ্রাবক তরল পদার্থটি নিঃসৃত হয়, কিন্তু দ্রাব্য পদার্থ আটকে যায়। অসমান ঘনত্বের দুটি দ্রবের মধ্যে এরূপ পর্দা দিলে অল্প ঘনত্বের দ্রব থেকে দ্রাবকের এই গতির (অস্‌মোসিস) প্রভাবে জল, বা যে-কোন তরল দ্রাবক অধিক ঘনত্বের দ্রবের দিকে প্রবাহিত হয়ে উভয়ের ঘনত্ব সমান করতে চায় (হাইপার টোনিক ↑)।

অস্‌মিয়াম্‌ (osmium) — একটি মৌলিক ধাতু; সাদা, স্ফটিকাকার,

কঠিন পদার্থ। সাংকেতিক চিহ্ন Os; পরমাণবিক ওজন 190·2, পারমাণবিক সংখ্যা 76; সবচেয়ে ভারী ধাতব পদার্থ। প্ল্যাটিনাম ↑ ধাতুর সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় খনিজ আকারে পাওয়া যায়। দুর্লভ মূল্যবান ধাতু।

অস্‌মিরিডিয়াম (osmiridium) — অস্‌মিয়াম, ইরিডিয়াম ↑ ও সামান্য প্ল্যাটিনামের মিশ্রণে উৎপন্ন একটি সংকর-ধাতু (অ্যালয় ↑); অত্যন্ত কঠিন, ক্ষয় হয় না, মরিচা ধরে না, — মূল্যবান ঝর্ণা-কলমের নিবের অগ্রভাগে লাগানো হয়।

অস্টিয়োলজি (osteology) — অস্থি-বিজ্ঞান; শারীরবৃত্তের শাখা বিশেষ, যাহাতে প্রাণিদেহের অস্থিসমূহের সংস্থান ও কার্যকারিতাদি বিষয়ে আলোচিত হয়। **অস্টিওপ্যাথি** (osteopathy)—অস্থি-চিকিৎসা।

অস্ট্রিচ (ostrich)—উটপাখি, পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহদাকার পক্ষী; উচ্চতায় অনেক সময় আট ফুট পর্যন্ত হয়। উড়তে পারে না, দেহের অনুপাতে অতিক্ষুদ্র পক্ষদ্বয়ের সঞ্চালনে এদের দ্রুত ধাবনে সাহায্য হয় মাত্র। স্ত্রী-পক্ষীর পালক ধূসর বর্ণের, পুং-পক্ষীর পালক হয় প্রায়শঃ কৃষ্ণবর্ণ। আরব ও আফ্রিকায় এর আদি আবাস। এদের বংশ ক্রমে লোপ পাচ্ছে। আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে এদের কৃত্রিম পালনভূমি তৈরী করা হয়েছে। এদের পালকের ব্যবসায় লাভজনক; —পাশ্চাত্য রমণীর টুপি সুশোভিত করতে ও সৌখিন ব্যাজন তৈরী করতে এদের পালক উচ্চ মূল্যে প্রচুর বিক্রয় হয়।

অস্ট্রিচ

অসিলেটিং কারেণ্ট (oscillating current) — অল্টার্নেটিং কারেণ্ট ↑, বা এ. সি. তড়িৎ-প্রবাহ; যাতে প্রবাহের গতিপথ সেকেণ্ডে শত, বা সহস্র বার এদিক-ওদিকে অতি দ্রুত পরিবর্তিত হতে পারে।

অসিলোস্কোপ (oscilloscope) — স্পন্দন-নির্দেশক যন্ত্র; যে যন্ত্রের সাহায্যে সব রকম বৈদ্যুতিক স্পন্দন বা কম্পন ধরা পড়ে, এবং সেই কম্পনের গতি-প্রকৃতি নিরূপিত হয়। অনেক যন্ত্রে আবার স্পন্দনের রেখা-চিত্রও অঙ্কিত হয়ে যায়—এই রেখা-চিত্রকে বলে **অসিলোগ্রাফ**। (ভূ-কম্পন নির্দেশক যন্ত্রের নাম সিস্‌মোমিটার ↑)

অ্যা

অ্যাক্‌টিনিয়াম (actinium) — তেজস্ক্রিয় (রেডিও অ্যাক্‌টিভ ↑) মৌলিক পদার্থ বিশেষ; সাংকেতিক চিহ্ন Ac, অ্যাটমিক নাম্বার ↑ 89; এই দুষ্প্রাপ্য পদার্থটি ইউরেনিয়াম ↑ খনিজ থেকে 1899 খৃঃ বিজ্ঞানী ডিবার্নে (Debierne) কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়।

অ্যাক্‌টিনোমিটার (actinometer) —সূর্যালোকের অদৃশ্য রশ্মির তীব্রতা ও তেজঃশক্তি পরিমাপক যন্ত্র বিশেষ।

অ্যাক্‌টিনিক-রে (actinic-ray) — সূর্যালোকের সংগঠক রশ্মিমালার ক্ষুদ্রতম তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের (ওয়েভ-লেংথ ↑) অতি-বেগুনি (অ্যাল্‌ট্রাভায়ো-

লেট ↑) রশ্মি; সূর্যালোকের এই অদৃশ্য অংশই ফটোগ্রাফিক ফিল্মের ↑ উপরে প্রভাব বিস্তার করে এবং তার রাসায়নিক ক্রিয়ায় ফিল্মে ছায়াপাত হয়ে থাকে।

অ্যাক্‌টিভেটেড কার্বন (activated carbon) — বায়ু-শূন্য পাত্রে কাঠ উত্তপ্ত করে (পুড়িয়ে) যে কয়লা, বা চারকোল ↑ তৈরি হয়। এরূপ কাঠ-কয়লার গ্যাস-শোষণের ক্ষমতা সমধিক বলে সাধারণতঃ গ্যাস-মাস্কে ↑ (মুখসে) ব্যবহৃত হয়। আবার, কোন দ্রবণ থেকে তার মধ্যে দ্রবিত জৈব রঞ্জক পদার্থ পরিপোষণের ক্ষমতাও এর যথেষ্ট প্রবল।

অ্যাক্‌টিনোমাইসেস (actinomyces) — কতকটা তারকাকৃতি ছত্রাক (ফাঙ্গাস ↑) জাতীয় সূক্ষ্ম আণু-বীক্ষণিক জীবাণু। সাধারণ ছত্রাকের মত এগুলিরও স্পোরের ↑ সাহায্যে বংশবৃদ্ধি হয়। এই ছত্রাকের জন্যেই আলো-বাতাসহীন আবদ্ধ ঘরে এক রকম সোঁদা গন্ধ পাওয়া যায়। এর আক্রমণে গরু প্রভৃতি জন্তুর জিভ ফুলে শক্ত হয়ে ওঠে,—এ রোগকে বলা হয় **অ্যাক্‌টিনোমাইকোসিস**।

অ্যাক্রাইলিক (acrylic) — রাসায়নিক পদ্ধতিতে সংশ্লেষিত এক প্রকার কৃত্রিম পশমের (উল) ব্যবহারিক নাম। জান্তব পশমের বিকল্প হিসাবে আজকাল বহুল ব্যবহৃত।

অ্যাক্রোমেটিক লেন্স (achromatic lens) — বিভিন্ন প্রতিসরণ-ক্ষমতার কাচের সংযোগে তৈরী বিশেষ এক রকম যুগ্ম লেন্স ↑। সাধারণ একক লেন্সে প্রতিসরিত প্রতিচ্ছবির প্রান্তদেশে বিভিন্ন বর্ণাভা পরিদৃষ্ট হয়; কিন্তু এই লেন্সের প্রতি-সরণে প্রতিসরিত রশ্মিমালায় ঐ-রকম প্রান্তীয় বর্ণাভা থাকে না, হুবহু প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়।

অ্যাক্রোমেটিন (achromatin) — উদ্ভিদ, বা প্রাণীর জীবকোষের (সেল ↑) সংগঠক যে উপাদান কোন রঞ্জক পদার্থেই রঞ্জিত হয় না, সর্বদা নিজস্ব স্বাভাবিক স্বচ্ছ অবস্থায় থেকে যায় (ক্রোমেটিন ↑)।

অ্যাক্রিফ্লেভিন (acriflavine) — আল্‌কাতরা (কোল্‌টার ↑) থেকে নিষ্কাশিত জৈব রাসায়নিক পদার্থের সংশ্লেষণে প্রস্তুত হল্‌দে এক প্রকার জীবাণু-প্রতিষেধক (অ্যান্টিসেপ্টিক ↑) পদার্থ। এর জীবাণু-প্রতিরোধক ক্ষমতা স্বভাবতঃই প্রবল; আবার রক্তের সিরামের ↑ সংস্পর্শে এর শক্তি আরও বৃদ্ধি পায়।

অ্যাক্সিল (axil)—উদ্ভিদদেহের শাখা ও তাহাতে উদ্‌গত পত্রের মধ্যবর্তী উপরের দিকের কোণ।

অ্যাক্সিলা (axilla) — মানবদেহে বাহুসংযোগের নিম্নবর্তী গহ্বর; যাকে বাংলায় বলে 'বগল'।

অ্যাক্সিলারেশন (acceleration)— ত্বরণ; চলমান বস্তুর গতি-বৃদ্ধির হার। গতিবেগের হ্রাসের হারকে বলে রিটার্ডেসন ↑। উপর থেকে ভূ-পৃষ্ঠের দিকে পতনকালে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির (গ্রাভিটেশন ↑) প্রভাবে সকল বস্তুর গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে 32 ফুট করে বৃদ্ধি পেতে থাকে; এই নির্দিষ্ট বৃদ্ধি-হারকে বলা

হয় 'অ্যাক্সিলারেসন ডিউ টু গ্রাভিটেসন', অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণ-জনিত ত্বরণ। স্থিরাবস্থা থেকে বস্তুটি যখন পড়তে থাকে তখন প্রথম সেকেণ্ডের অন্তে তার গতিবেগ হবে প্রতি সেকেণ্ডে 32 ফুট, দ্বিতীয় সেকেণ্ড অন্তে হবে প্রতি সেকেণ্ডে 64 ফুট—এভাবে পতনের গতিবেগ ক্রমাগত বাড়তে থাকে। গতিবেগের এই ত্বরণ, বা অ্যাক্সিলারেশন '32 ফুট প্রতি সেকেণ্ড/সেকেণ্ড' বলে প্রকাশ করা হয়। নিক্ষিপ্ত গোলা-গোলি প্রভৃতি চলমান বস্তুর এরূপ অ্যাক্সিলারেশন, বা রিটার্ডেসন থাকতে পারে; না থাকলে তার গতি হবে স্থির, অর্থাৎ প্রারম্ভিক গতি বরাবর একই থাকবে, সমকালে সমান দূরত্ব অতিক্রম করছে, বুঝতে হবে।

অ্যাক্সিলারেটর (accelerator) — ত্বরক; যার প্রভাবে কোন কিছুর গতি ত্বরান্বিত হয়। যে যন্ত্রাংশের সাহায্যে মোটরগাড়ীর গতিবেগ প্রয়োজন অনুসারে বাড়ানো যায় তাকে বলে 'অ্যাক্সিলারেটর'। অন্যপক্ষে, যে সব পদার্থের প্রভাবে কোন রাসায়নিক ক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়—যেমন, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড (খাদ্য-লবণ) মেশালে সিমেণ্ট↑ জলের রাসায়নিক ক্রিয়ায় অতি দ্রুত জমে যায়; ম্যাগ্নেসিয়াম, অ্যানিলিন↑ প্রভৃতি মেশালে রাবারের ভ্যাল্কানাইজিং↑ প্রক্রিয়া দ্রুততর হয়। রাসায়নিক ক্রিয়ায় এ-সব পদার্থকে সাধারণতঃ বলে ক্যাটালিষ্ট↑; কখন কখন অ্যাক্সিলারেটর-ও বলে।

অ্যাক্সেল (axle) — চাকার অক্ষদণ্ড; কোন চক্রের (যেমন, গাড়ীর দুইটি চাকার) কেন্দ্রে সংবদ্ধ দণ্ড।

অ্যাকাউষ্টিক্স (acoustics) — শব্দ-বিজ্ঞান; শব্দ-তরঙ্গের উৎপত্তি ও গতি-প্রকৃতি বিষয়ক বিজ্ঞান।

অ্যাকোয়া (aqua)—জল; রসায়ন-বিদ্যায় জল, বা অ্যাকোয়া বুঝাতে সংক্ষেপে Aq লেখা হয়।

অ্যাকোয়া ফর্টিস (aqua fortis)—প্রায়-নিরুদক বিশুদ্ধ নাইট্রিক অ্যাসিড, HNO_3, (কন্‌সেণ্ট্রেটেড)।

অ্যাকোয়া রিজিয়া (aqua regia) — এক ভাগ নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3) ও চার ভাগ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের (HCl) সংমিশ্রণ। স্যাক্‌রারা সোনা গলাতে ইহা ব্যবহার করে; সোনা, রূপা প্রভৃতি 'নোবল মেটাল'↑ এতে গলে যায়, যা অপর কোন অ্যাসিড এককভাবে পারে না। এই মিশ্রণ খোলা রাখলে বায়ুর সংস্পর্শে হলদে হয়ে যায়—নাইট্রোসিল ক্লোরাইড জন্মায় ও ক্লোরিন↑ গ্যাস বেরোয়।

অ্যাকোয়েরিয়াম (aquarium) — যে-সব কৃত্রিম জলাধারে জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী সংরক্ষিত করে প্রকৃতি-বিজ্ঞানীরা তাদের জীবনধারা পর্যবেক্ষণ করেন। পরীক্ষাগারে এগুলি হয় কাচের তৈরি। শখ করে অনেকে কাচের ছোট অ্যাকোয়েরিয়ামে রঙিন মাছ ও সুদৃশ্য জলজ উদ্ভিদ পালন করে গৃহ শোভা বৃদ্ধি করেন।

অ্যাকোয়াস (aquous) — জলীয়, জলযুক্ত। কোন দ্রবের দ্রাবক জল হলে তাকে 'অ্যাকোয়াস সল্যুসন'↑ বলে। আবার জলজ উদ্ভিদকে বলে **অ্যাকোয়েটিক প্ল্যাণ্ট।**

অ্যাকোনাইট (aconite) — এক প্রকার উদ্ভিদের বিষাক্ত রস; উদ্ভিদটাও এই নামে পরিচিত। একটি উৎকৃষ্ট ভেষজ পদার্থ, ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাংলায় বলে কাঠবিষ।

অ্যাকু (acu)—সূচ্যাগ্র-বিশিষ্ট, সূচী-ভেদ; যেমন — অ্যাকুলিয়েট (aculeate), সূচের মত কাঁটায় আবৃত; **অ্যাকু-পাংচার** (acupuncture) বিশেষতঃ পায়ের নিম্নগামী স্নায়ুর (সায়েটিক নার্ভ, sciatic nerve ↑) ব্যথা নিরাময়ের জন্য সূচীভেদ প্রক্রিয়া; সায়েটিকা ↑ (sciatica) রোগের বিশেষ চিকিৎসা পদ্ধতি; বিশেষতঃ চীন দেশে বিভিন্ন রোগ নিরাময়ে অনুরূপ পদ্ধতি প্রচলিত।

অ্যাকুমুলেটর (accumulator)—যে যান্ত্রিক ব্যবস্থায় তড়িৎ-শক্তি সঞ্চিত করে রাখা যায়। একে এক রকম সেল ↑ বলা যেতে পারে; যার মধ্যে তড়িৎ-শক্তি সঞ্চিত করে রেখে দরকার মত ব্যবহার করা যায়। এজন্যে একে **স্টোরেজ ব্যাটারি** ↑ বলা হয়। সাধারণ লেড্-অ্যাকুমুলেটরে একটা কাঁচ-পাত্রের মধ্যে দু'খানা সীসার পাত পাশাপাশি সামান্য ব্যবধানে জলমিশ্রিত সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিডের মধ্যে ডুবিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়। ওর একখানা (পজিটিভ) প্লেটের গায়ে লেড-পারক্সাইড (PbO_2) চূর্ণ মাখানো থাকে। ওই সীসক-প্লেট দু'খানার মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহ চালালে ইলেক্ট্রোলিসিস্ ↑ প্রক্রিয়ায় সীসা ও সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিডের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। এর ফলেই তড়িৎশক্তি সঞ্চিত হতে থাকে। এই অ্যাকুমুলেটর থেকে তড়িৎশক্তি ব্যবহারের সময় বিপরীত ধারায় রাসায়নিক ক্রিয়া চলতে থাকে, ফলে সঞ্চিত তড়িৎশক্তি সংযোজক তারের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। সাধারণতঃ এরূপ অ্যাকুমুলেটর মোটর গাড়ীতে তড়িৎস্ফুরণ (স্পার্কিং ↑) ও আলো জ্বালার জন্যে ব্যবহৃত হয়।
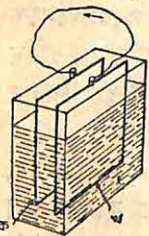
অ্যাকুমুলেটর

অ্যাগেট (agate) — এক রকম প্রস্তর বিশেষ, মূলতঃ সিলিকা (SiO_2)। অত্যন্ত কঠিন বলে ঘর্ষণে তেমন ক্ষয়ে যায় না। সূক্ষ্ম পরিমাপ-যন্ত্রের ফাল্‌ক্রাম ↑ ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়—কঠিন বস্তু পেষণের যোগ্য হামান-দিস্তা অ্যাগেট্ প্রস্তরে তৈরী হয়ে থাকে।

অ্যাগোনিক লাইন (agonic line) — পৃথিবীর যে সকল স্থানে কম্পাসের ↑ কাঁটা চৌম্বক মেরুর (ম্যাগ্নেটিক পোল ↑) দিকে সুনির্দিষ্ট-রূপে প্রসারিত থাকে, অর্থাৎ কোন ডেক্লিনেসন ↑ থাকে না। মানচিত্রে এ-সব স্থানের সংযোজক রেখাকে বলে অ্যা. লাইন.।

অ্যাগার-অ্যাগার (agar-agar) — নানা প্রকার সামুদ্রিক গুল্ম থেকে যে এক রকম আঠালো পদার্থ পাওয়া যায়; এর রাসায়নিক গঠন কার্বোহাইড্রেটের ↑ মত। গরম জলে মিশে যায়, পরে ঠাণ্ডা হলে ক্রমে ঘন জেলির ↑ আকারে থিতিয়ে পড়ে। জীববিদ্যার পরীক্ষাদিতে এই জেলির মাধ্যমে জীবাণুদের বংশ বৃদ্ধি করিয়ে নানা রকম গবেষণা করা হয়।

অ্যাগ্লোমারেট রক (agglomerate rock) — আগ্নেয়গিরির নিকটে, বা

গহ্বর-মুখে প্রাপ্ত বিশেষ গঠনের প্রস্তর, যা অগ্ন্যুৎপাতে উদ্‌গীরিত ভস্মরাশির শিলীভূত স্তরের মধ্যে সংবদ্ধ অবস্থায় বড়-বড় প্রস্তর-খণ্ডের আকারে পাওয়া যায়।

অ্যাজ্‌মা (asthma) — হাঁপানী রোগ,যাতে রোগীর ফুস্‌ফুসের ও শ্বাস-নালীর পর্দার প্রদাহ-জনিত স্ফীতির ফলে তীব্র শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়।

অ্যাজো (azo)—ছুটি নাইট্রোজেন ↑ পরমাণুর পরস্পর যুগ্ম সমাবেশ (N. N) রসায়ন শাস্ত্রে এই নামে পরিচিত; একে দ্বি-নাইট্রোজেন র‍্যাডিক্যাল ↑ বলা যায়। এর প্রভাবে রঞ্জক পদার্থের বর্ণ-স্থায়িত্ব ও ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায় এবং তাকে বলা হয় **অ্যাজো ডাই**।

অ্যাজোট (azote)—নাইট্রোজেন ↑ গ্যাস। শব্দার্থ হলো 'নিষ্ক্রিয়' ; পূর্বে নাইট্রোজেন গ্যাস এই নামে পরিচিত ছিল।

অ্যাজাইড (azide) — হাইড্রো-জোইক (HN_3) অ্যাসিডের ধাতব সল্টের সাধারণ নাম; যেমন— সোডিয়াম অ্যাজাইড, NaN_3। সীসা (লেড্ ↑) প্রভৃতি ভারী ধাতুর অ্যাজাইড সল্ট সাধারণতঃবিস্ফোরক-ধর্মী হয়ে থাকে।

অ্যাজিমাথ (azimuth)— দিগংশ ; ভূ-পৃষ্ঠ থেকে কোন গ্রহ, বা নক্ষত্রের অবস্থান নির্দেশক কৌণিক পরিমাপ (অ্যাঙ্গুলার মেজার ↑)। কোন স্থান থেকে কোন গ্রহ, বা নক্ষত্র গগন-মণ্ডলের কোন্ দিগংশে অবস্থিত তা যে কোণ দ্বারা নির্দিষ্ট হয়।

অ্যাজুরাইট (azurite)—স্বভাবজাত বেসিক কপার কার্বনেট ↑; তামার একটা রাসায়নিক যৌগিক, 2Cu-CO_3, $Cu(OH)_2$; নীলবর্ণের খনিজ পদার্থ। রাসায়নিক উপায়ে এ থেকে তামা নিষ্কাশিত হয়ে থাকে।

অ্যাটম (atom) — পরমাণু; রাসায়নিক মতে মৌলিক পদার্থের অবিভাজ্য ক্ষুদ্রতম অংশ; সম্ভাব্য ক্ষুদ্রতম পদার্থ-কণিকা। (অবশ্য আধুনিক বিজ্ঞানে পরমাণু-বিভাজনও (ফিসন ↑) সম্ভব হয়েছে। ইলেক্ট্রন ↑ প্রোটন ↑, নিউট্রন ↑ প্রভৃতি কণিকায় পরমাণু গঠিত।)

অ্যাটম বম্ (atom bomb) — পারমাণবিক বোমা, যার বিস্ফোরণে মুহূর্ত মধ্যে প্রচণ্ড পারমাণবিক শক্তি বিমুক্ত হয়ে ভয়াবহ ধ্বংসলীলার সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়বিশ্ব যুদ্ধের সময় জার্মান বৈজ্ঞানিক অটোহ্যান প্রথমে ইউ-রেনিয়াম ↑ পরমাণুর ফিসন ↑ ঘটাতে সমর্থ হন। ইহার উপর ভিত্তি করেই পরে আমেরিকায় মিত্রপক্ষীয় বৈজ্ঞানিকদের সমবেত প্রচেষ্টায় কার্যকরীভাবে পারমাণবিক বোমা তৈরী করা সম্ভব হয়। জাপানের হিরোসিমা নগরীতে প্রথম 'অ্যাটম-বম্' বিস্ফোরিত হয়েছিল। ইউরে-নিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে মন্দগতি নিউট্রন ↑ কণিকার সংঘাতে ক্রমাগত ভগ্ন করবার ব্যবস্থা করায় এই প্রচণ্ড শক্তির বিমুক্তি ঘটে। এই বোমা এমন ভাবে তৈরী হয় যাতে কোটি কোটি পরমাণুর নিউক্লিয়াস ↑ ক্রমাগত ভাঙ্গতে থাকে, আর তা থেকে বিমুক্ত শক্তি এক সেকেণ্ডের লক্ষ ভাগেরও কম সময়ে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটায়। এই প্রক্রিয়াকে বলে নিউক্লিয়ার-ফিসন ↑। প্রকৃতপক্ষে এরূপ অ্যাটম বোমার বিস্ফোরণ অসংখ্য ধারাবাহিক

বিস্ফোরণের সমষ্টি ; একে বলে চেইন-রিঅ্যাক্সন ↑। জটিল ব্যবস্থায় ইউরেনিয়াম ↑, বা প্লুটোনিয়াম ↑ ধাতুর বিশেষ বিশেষ আইসোটোপের ↑ ফিসন ঘটানো সম্ভব হয়েছে।

অ্যাটমাইজার (atomizer)—মেঘায়ন যন্ত্র ; যে যন্ত্রের সাহায্যে কোন তরল পদার্থকে বায়ুর চাপে মেঘ, বা কুয়াশার ধুয়ার মত সূক্ষ্ম কণিকায় রূপান্তরিত করা যায়। যান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরু নল-পথে তরল পদার্থের অভ্যন্তরে সবেগে বায়ু প্রবেশ করিয়ে এইরূপ বাষ্পায়ন ঘটানো হয়ে থাকে।

অ্যাটোমাইজার

অ্যাট্‌মোলিসিস (atmolysis)—গ্যাস-পরিস্রুতি ; গ্যাসীয় সংমিশ্রণ থেকে বিভিন্ন গ্যাসের ↑ পৃথকীকরণ, বা পরিস্রাবণের প্রক্রিয়া। বিশেষ এক প্রকার পাত্‌লা জৈব পর্দার (মেম্‌ব্রেন ↑) ভিতর দিয়ে প্রবাহিত করলে বিভিন্ন গ্যাস বিভিন্ন গতিতে ঐ পর্দা ভেদ করে বেরোয় এবং কৌশলে তাদের পৃথক করা যায়। একে অনেকটা তরল পদার্থের 'ফ্রাক্সন্যাল ডিষ্টিলেসন' ↑ প্রক্রিয়ার অনুরূপ মনে করা যায়।

অ্যাটমিক ষ্ট্রাক্‌চার (atomic structure) — পরমাণুর গঠন। পদার্থের প্রত্যেকটি পরমাণুর কেন্দ্রীয় কণাকে বলা হয় **নিউক্লিয়াস** ↑। এই নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঋণ-তড়িৎযুক্ত **ইলেক্‌ট্রন** ↑ কণিকাগুলো বিভিন্ন পথে ঘুরছে। বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুর সংগঠনে এই ইলেক্ট্রন কণিকার সংখ্যা বিভিন্ন। আবার প্রত্যেকটি পরমাণুর নিউক্লিয়াস গঠিত হয়েছে ধন-তড়িতাহিত কয়েকটি **প্রোটন** ↑ ও তড়িৎবিহীন কয়েকটি নিউট্রন ↑ কণার সমবায়ে। প্রোটন ও নিউট্রনের প্রত্যেকটির ভর (মাস্‌ ↑) হাইড্রোজেন-পরমাণুর ভরের প্রায় সমান ; কিন্তু ইলেক্ট্রন কণিকার ভর হাইড্রোজেন-পরমাণুর 1840 ভাগের একভাগ মাত্র, অর্থাৎ ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। পক্ষান্তরে, প্রোটনের তড়িৎশক্তি ইলেক্ট্রনের তড়িৎশক্তির সমান, কিন্তু বিপরীতধর্মী। কোন একটি পরমাণুর গঠনে নিউক্লিয়াসের প্রোটন সংখ্যা তার চারদিকের ইলেক্ট্রন সংখ্যার সমান। পরমাণুর রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য ও বস্তুগত পার্থক্য নির্ভর করে তার ইলেক্ট্রন সংখ্যা ও তাদের গতি-প্রকৃতির উপর। এই ইলেক্ট্রন-সংখ্যাকেই বলা হয় কোন পদার্থের পারমাণবিক সংখ্যা, **অ্যাটমিক নাম্বার** ↑। দুইটি পদার্থের রাসায়নিক মিলন তাদের পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন ইলেক্ট্রন কণিকার আকর্ষণ-বিকর্ষণ ও স্থান বিনিময়ের ফলেই সম্ভব হয়ে থাকে।

অ্যাটমিক পাইল (atomic pile)—যে বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে ইউরেনিয়াম ↑ পরমাণুর নিউক্লিয়াস ভাঙ্গার কাজ চালানো হয়। এই প্রক্রিয়া গ্র্যাফাইট্‌ ↑, বা ভারীজল (হেভি-ওয়াটার ↑) দিয়ে মন্দীভূত করে প্লুটোনিয়াম সৃষ্টি করা হয় ; অথবা, তার তাপ নিয়ন্ত্রণ করে 'রেডিও অ্যাক্‌টিভ' ↑ পদার্থ উৎপন্ন করা হয়ে থাকে।

অ্যাটমিক এনার্জি (atomic energy) — পারমাণবিক শক্তি ;

পরমাণুর নিউক্লিয়াস ভাঙ্গলে যে-শক্তির উদ্ভব হয়। বিশেষ ব্যবস্থায় পদার্থকে এভাবে শক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়েছে। পদার্থ বিজ্ঞানের বিখ্যাত সমীকরণ, $E=mc^2$, এই সত্যই প্রতিপন্ন করছে। এখানে E হলো এনার্জি, বা শক্তি, m বস্তু-ভর এবং c আলোর গতি। আলোর গতি হলো প্রতি সেকেণ্ডে 1,86,026 মাইল। এই হিসেবে পঞ্চাশ টন কয়লা পুড়িয়ে যতটা শক্তি পাওয়া যায়, মাত্র এক গ্র্যাম ↑ পদার্থের (ইউরেনিয়ামের) বিলুপ্তি ঘটিয়ে ততটা প্রচণ্ড শক্তির উদ্ভব হতে পারে। বিজ্ঞানের মতে পদার্থ ও শক্তি মূলতঃ এক। পদার্থের অন্তর্ধানে শক্তির উদ্ভব, এবং শক্তির অন্তর্ধানে পদার্থের উৎপত্তি হয়ে থাকে।

অ্যাটমিক ওয়েট (atomic weight) —পারমাণবিক ওজন; কোন মৌলিক পদার্থের এক-একটি পরমাণুর আনুপাতিক ওজন। অক্সিজেন গ্যাসের পরমাণুর ওজন 16 ধরে নিয়ে বিভিন্ন পদার্থের এই পারমাণবিক ওজন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তুলনামূলকভাবে স্থির করা হয়েছে।

অ্যাটমিক থিওরি (atomic theory) — পারমাণবিক মতবাদ। পদার্থের পারমাণবিক গঠন সম্পর্কে সর্বপ্রথম ডিমোক্রিটাস ↑ সাধারণভাবে যে মতবাদ প্রচার করেছিলেন, উনবিংশশতাব্দীর প্রথমভাগে বিজ্ঞানী ড্যাল্টন ↑ সেই মতবাদকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপন করেন এবং পারমাণবিক গঠনের রাসায়নিক ব্যাখ্যা ও সূত্র প্রবর্তন করেন। ভারতের প্রাচীন আর্যঋষিগণও পদার্থের গঠনে অণু-পরমাণুর অস্তিত্ব সম্পর্কে একটা মতবাদ প্রচার করেছিলেন। যাই হোক, এভাবে মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য কণাকে পরমাণু হিসাবে ধরা হলো। কোন একটি পদার্থের সব পরমাণু সর্বতোভাবে একই রকম হয় (আইসোটোপের ↑ ক্ষেত্রে অবশ্য প্রভেদ দেখা যায়); বিভিন্ন পদার্থের পরমাণু গুণ ও ধর্মে বিভিন্ন হয়ে থাকে। দুইটি পদার্থের বিভিন্ন পরমাণু একে অন্যের সঙ্গে পরস্পর জুড়ে গিয়ে পদার্থ দুইটির রাসায়নিক মিলন ঘটায় এবং যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়। আধুনিক মতবাদ (অ্যাটমিক স্ট্রাক্চার ↑) অবশ্য ড্যাল্টনের উল্লিখিত মতবাদ থেকে অনেকাংশে বিভিন্ন।

অ্যাটমিক নাম্বার (atomic number)— পারমাণবিক সংখ্যা; কোন মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াসের চারদিকে যতগুলো ইলেক্ট্রন ↑ পরিভ্রমণ করে সেই সংখ্যাকে বলে ওই পদার্থের পারমাণবিক সংখ্যা। এই সংখ্যা আবার নিউক্লিয়াসের সংগঠক প্রোটন ↑ সংখ্যারও সমান।

অ্যাটমিক হিট্ (atomic heat) — পারমাণবিক তাপ। কোন মৌলিক পদার্থের বিশেষ তাপের (স্পেসিফিক হিট্ ↑) পরিমাণ ক্যালোরি-প্রকাশক সংখ্যাকে তার পারমাণবিক ওজন (গ্র্যাম ↑) সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায়। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সব কঠিন পদার্থের এই পারমাণবিক তাপ মোটামুটি 6 ক্যালোরি ↑; স্বাভাবিক তাপ হ্রাস পেলে পারমাণবিক তাপও হ্রাস পায়।

অ্যাট্মস্ফিয়ার (atmosphere) —

পৃথিবীর উপরি ভাগের বায়ুমণ্ডল ; নানারকম গ্যাসীয় পদার্থে গঠিত। শুষ্ক ও বিশুদ্ধ অবস্থায় বায়ুতে থাকে 78·08% নাইট্রোজেন, 20·95% অক্সিজেন, ·93% আর্গন ↑ ·03% কার্বন-ডাইঅক্সাইড ; এগুলি ছাড়া নিয়ন, হিলিয়াম, ক্রিপ্‌টন, জেনন্‌ প্রভৃতি **ইনার্ট গ্যাস** ↑ বায়ুতে অতি সামান্য পরিমাণে মিশ্রিত আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন উচ্চতায় বায়ুর এই গ্যাসীয় অনুপাতের সামান্য তারতম্য দেখা যায়। সাধারণতঃ বায়ুতে আবার কিছু জলীয় বাষ্প, হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড ↑, ওজোন ↑, গন্ধকজাত রাসায়নিক পদার্থ, ধূলিকণা প্রভৃতিও সংমিশ্রিত থাকে। ভূ-পৃষ্ঠের সকল পদার্থের উপর বায়ুমণ্ডলের একটা চাপ সব সময়েই পড়ছে—সমতল ভূমিতে এই চাপের পরিমাণ প্রতি বর্গ-ইঞ্চিতে মোটামুটি 14·62 পাউণ্ড ↑। বিভিন্ন উচ্চতায় ও বিভিন্ন সব প্রাকৃতিক কারণে বায়ু-মণ্ডলের এই চাপের কিছু হ্রাসবৃদ্ধি স্বভাবতঃই ঘটে থাকে।

অ্যাট্রপিন (atropin) — বেলেডোনা উদ্ভিদ থেকে নিষ্কাশিত একটি জৈব রাসায়নিক পদার্থ ; বিবিধ রোগে ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। ব্যবহারে হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয় ; হাঁপানি ও শূলবেদনায় ফলপ্রদ। চোখে দিলে চক্ষু-তারকার সম্প্রসারণ ঘটায়,—চক্ষু পরীক্ষায়ই প্রধানতঃ এর জলীয় দ্রবণ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

অ্যাডিটিভ কম্পাউণ্ড (additive compound) — দুটি রাসায়নিক পদার্থের পরস্পর সামগ্রিক মিলনে যে একটি মাত্র যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি হয়, যেমন—ইথিলিন ↑ + ক্লোরিন ↑ = ইথিলিন ডাইক্লোরাইড ; $C_2 H_4 + Cl_2 = C_2 H_4 Cl_2$ (অ্যাডিটিভ কম্পাউণ্ড)।

অ্যাডাম্‌স অ্যাপেল (Adam's apple)—পুরুষের কণ্ঠ-নালীর সম্মুখস্থ সামান্য বহিঃস্ফীত অংশ ; স্বর-নালীর (ল্যারিংস ↑) তরুণাস্থির ঈষৎ স্ফীতির ফলে এর উৎপত্তি হয়।

অ্যাডেনিন (adenine)—মাংসপেশীর অভ্যন্তরস্থ একটা জটিল জৈব রাসায়নিক পদার্থ। পেশীর সংকোচন-কালে পদার্থটার রাসায়নিক গঠন স্বতঃই বদলে গিয়ে বিভিন্ন সহজতর জৈব পদার্থ সাময়িকভাবে উৎপন্ন হয় ; পিউরিন ↑

অ্যাডিনাইটিস (adenitis) — কোন গ্রন্থির (গ্ল্যাণ্ড ↑) প্রদাহ ; যেমন — লিম্প্যাডিনাইটিস (lymphadenitis) গলার শ্লেষ্মা-গ্রন্থির স্ফীতি ও প্রদাহ-জনিত রোগ।

অ্যাড্রিন্যাল গ্ল্যাণ্ডস্‌ (adrenal glands) — দেহাভ্যন্তরস্থ বৃক্কদ্বয়ের (কিড্‌নি ↑) ঊর্ধ্ব-ভাগের নিকটবর্তী ক্ষুদ্র (ছবিতে গ-চিহ্নিত) গ্রন্থিদ্বয়।
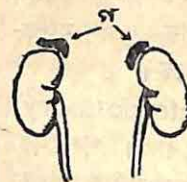
অ্যাড্রিন্যাল গ্ল্যাণ্ডস্‌

এই দু'টি গ্রন্থি, বা গ্ল্যাণ্ডের ↑ মধ্যস্থ মেডুলা ↑ থেকে সময় সময় **অ্যাড্রিনেলিন** নামক এক প্রকার হর্মোন ↑ নির্গত হয়ে রক্তে মিশে যায়। অকস্মাৎ ক্রোধ, ভয় প্রভৃতি উত্তেজনার ফলে এই রস-নিঃসরণ ঘটে।

অ্যাঙ্গিয়ো (angio) — আধার ; খোলা, বা খোসা বিশিষ্ট। রক্তনালী

সম্বন্ধীয়; যেমন — **অ্যাঙ্গিয়োমা** (angioma) — প্রাণিদেহের সূক্ষ্ম রক্ত-নালীগুলি স্থান বিশেষে সংকুচিত ও গুচ্ছিত হয়ে যে স্থানীয় স্ফীতি, বা টিউমার ↑ হয়।

অ্যাঙ্গিয়োস্পার্ম (angiosperm) — গুপ্তবীজী। যে সব উদ্ভিদের বীজ বীজাধারে (শক্ত খোলায়) আবদ্ধ অবস্থায় থাকে; অধিকাংশ সপুষ্পক উদ্ভিদই এই শ্রেণীর। কিন্তু পাইন, ফার প্রভৃতি সরল বর্গীয় উদ্ভিদের বীজাধারথাকেনা,এদের বলে জিম্নো-স্পার্ম ↑ (মুক্তবীজী উদ্ভিদ)।

অ্যাংস্ট্রম (Angstrom) — সুইডেন-বাসী পদার্থবিদ, জন্ম 1814 খৃঃ, মৃত্যু 1876 খৃঃ। তড়িৎচুম্বকীয় বিভিন্ন তরঙ্গের দৈর্ঘ্য পরিমাপের যান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভাবক; নামানুসারে উক্ত পরিমাপের একক হয়েছে অ্যাংস্ট্রম $= 10^{-8}$ সেণ্টিমিটার ↑। **অ্যাংস্ট্রম ইউনিট** (Angstrom unit) পরি-শিষ্টে ↑। সাধারণতঃ আলোক-তরঙ্গের দৈর্ঘ্যই এই এককে প্রকাশিত হয়; অবশ্য রঞ্জন রশ্মি (এক্স-রে, ↑), কস্‌মিক রশ্মি ↑ প্রভৃতির অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যও এতে প্রকাশ করা চলে।

আন্‌থার (anther) — ফুলের যে কোষাধারে রেণু উৎপাদিত হয়। পরাগ-কোষ।

অ্যান্‌থারিডিয়াম (antheridium) — ফার্ন ↑ ও মস্ ↑ জাতীয় নিম্নস্তরের উদ্ভিদের পুং-কোষ সমন্বিত জৈবাঙ্গ।

অ্যান্‌থেল্‌মিন্‌টিক (anthelmintic) — ক্রিমিনাশক ঔষধ; অন্ত্রের বিভিন্ন ক্রিমি যে-সব ঔষধে বিনষ্ট, বা নির্গমিত হয়ে যায়; যেমন — স্যান্টোনিন ↑ প্রভৃতি।

অ্যান্‌থ্রাসিন (anthracene) — আল্‌কাতরা (কোল্ টার ↑) থেকে নিষ্কাশিত এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ, যা থেকে অ্যালিজারিন ↑ শ্রেণীর গাঢ় লাল রঙের রঞ্জক-পদার্থ প্রস্তুত হয়। 'অ্যান্‌থ্রা' মানে কোল, বা খনিজ কাঁচা কয়লা।

অ্যান্‌থোসায়েনিন্‌স (anthocyanins) — যে সব জৈব রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে ফুলের বিভিন্ন বর্ণ বিকশিত হয়। 'অ্যান্‌থো' মানে পুষ্প সম্বন্ধীয়। আবার 'অ্যান্‌থাস' মানে পুষ্পায়িত, যেমন—**নিক্‌ট্যান-থাস** হলো কেবলমাত্র রাত্রিকালে বিকশিত হয় এমন পুষ্পসমন্বিত।

অ্যানথ্রাক্স

অ্যান্‌থ্রাক্স (anthrax) — এক রকম বিশেষ মারাত্মক পশু-রোগের জীবাণু; বিশেষতঃ ভেড়ার চামড়া ও পশম থেকে এই রোগের ব্যাচিলাস ↑ মানুষের দেহে সংক্রামিত হয়ে থাকে। এজন্যে এই রোগটা 'উল-সর্টারস্ ডিজিজ' নামেও পরিচিত। এ-রোগের জীবাণুগুলোকেও 'আন্‌থ্রাক্স' বলে।

অ্যান্‌থ্রোপ (anthrop) — মানুষ, মানুষ সম্বন্ধীয়; **অ্যান্‌থ্রোপয়েড এপ্‌** (anthropoid ape) — অনেকটা মনুষ্য-সদৃশ্য বানর, বন-মানুষ। **অ্যান্‌থ্রোপোমেটি** (anthropometry) — বিজ্ঞানসম্মত ভাবে মানব সম্বন্ধীয় পরিমাপ-বিদ্যা,

অ্যানথ্রোপ

যেমন—বয়স অনুযায়ী উচ্চতা, ওজন, মস্তকের পরিমাপ ইত্যাদি।

অ্যান্‌থ্রোপোলজি (anthropology) — মানবজাতি সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান; বিভিন্ন মনুষ্যগোষ্ঠির উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, সামাজিক উন্নতি, শিক্ষা, সভ্যতা প্রভৃতি সম্বন্ধীয় বিবিধ তথ্য বিষয়ক বিজ্ঞান।

অ্যান্‌হাইড্রাইট (anhydrite)—নির্জল, অর্থাৎ অ্যান্‌হাইড্রাইড ↑ ক্যালসিয়াম সালফেটের ($CaSO_4$) বিশেষ নাম; যার সঙ্গে চিনামাটি ও জল মিশিয়ে 'প্লাস্টার অব প্যারিস' ↑ তৈরী করা হয়ে থাকে। পদার্থটি অ্যামোনিয়াম সল্টের সঙ্গে মিশিয়ে জমির সার হিসাবেও ব্যবহৃত হয়।

অ্যান্‌হাইড্রাইড (anhydride) — নিরুদক পদার্থ; যে সব রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে ওয়াটার-অব-ক্রষ্ট্যালিজেসন ↑ থাকে, উত্তাপ প্রয়োগে তাদের থেকে জল বিমুক্ত করলে সেই সব পদার্থের অ্যান্‌হাইড্রাইড তৈরী হয়; যেমন, নীল স্ফটিকাকার তুঁতে (ব্লু-ভিট্রিয়ল ↑) উত্তপ্ত করলে তার ওয়াটার-অব-ক্রষ্ট্যালিজেসন চলে গিয়ে যে সাদা গুঁড়া পড়ে থাকে তাকে বলে তুঁতের অ্যান্‌হাইড্রাইড। আবার বলা যায়, কোন পদার্থের আন্‌হাইড্রাইড হলো সেই পদার্থ, যা জলের সঙ্গে রাসায়নিক মিলনে উক্ত পদার্থটি উৎপন্ন হয়; যেমন, সাল্‌ফার ট্রাই-অক্সাইড ↑ (SO_3) গ্যাস হলো সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিডের (H_2SO_4) অ্যান্‌হাইড্রাইড়।

অ্যানিলিডা (annelida) — অঙ্গুরীমাল প্রাণীকুল; যাদের দেহ খণ্ডে-খণ্ডে সংযুক্ত হয়ে গঠিত; যেমন, কেঁচো, জোঁক প্রভৃতি। (আর্থ ওয়ার্ম ↑)।

অ্যাণ্টেনা (antenna) — (1), শুঙ্গ, শোঁয়া। কীটপতঙ্গের সূক্ষ্ম অঙ্গবিশেষ; জীব-বিজ্ঞানে ব্যবহৃত শব্দ। (2) রেডিও গ্রাহকযন্ত্রের 'অ্যারিয়াল' বা আকাশ-তার, যার মাধ্যমে বেতার তরঙ্গ এসে যন্ত্রে পৌছায়।

অ্যান্‌থ্রাসাইট (anthracite)—এক শ্রেণীর শক্ত খনিজ কয়লা। এতে কার্বনের ভাগ অনেক বেশী, সামান্য কিছু-কিছু হাইড্রোকার্বন-ও ↑ মিশ্রিত থাকে। সাধারণ কয়লার চেয়ে এর তাপ-শক্তি অনেক বেশী।

অ্যাণ্টিজেন (antigen) — যে-সব জৈব পদার্থ (যেমন, জীবাণুর দেহ-নিঃসৃত জৈব রস) প্রাণীর রক্তে স্বতঃই বিশেষ রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা (অ্যান্টিবডি ↑) বৃদ্ধি করে।

অ্যাণ্টিপাইরেটিক (antipyretic) — অ্যাস্পিরিন ↑ প্রভৃতি যে সব ভেষজ পদার্থ দেহের তাপ কমিয়ে দেয়; এরূপ ঔষধকে **ফেব্রিফিউজ**-ও বলা হয়।

অ্যাণ্টিমনি (antimony) — একটা মৌলিক ধাতব পদার্থ; সাদা, স্ফটিকাকার, ও ভঙ্গুর। এর পারমাণবিক ওজন 121·76; সাংকেতিক চিহ্ন Sb (ষ্টিবিয়াম)। সাধারণতঃ অক্সাইড ও সাল্‌ফাইড অবস্থায় খনিজ আকারে পাওয়া যায়। অ্যান্টিমনি সাল্‌ফাইড যৌগিককে বাংলায় বলে রসাঞ্জন, বা সুর্মা। ছাপার টাইপ তৈরীর কাজে সীসার সঙ্গে কিছু অ্যান্টিমনি মিশ্রিত করা হয় (টাইপ মেটাল ↑)।

অ্যাণ্টিবডি (antibody) — বিভিন্ন প্রকার রোগ প্রতিরোধের স্বাভাবিক উপায়স্বরূপ (ইমিউনিটি ↑) জীবের

রক্তে কোন রোগ-জীবাণু ঢুকলে স্বভাবতঃই যে-সব জৈব রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন হয়। রক্তে প্রবিষ্ট জীবাণুরা এদের প্রভাবে বিনষ্ট হয়, অথবা এদের রাসায়নিক ক্রিয়ায় সেই জীবাণু-নিঃসৃত বিষ-রস নির্বিষ হয়ে পড়ে।

অ্যাণ্টিবায়োটিক (antibiotic) — বিভিন্ন শ্রেণীর আণুবীক্ষণিক ছত্রাক, বা জীবাণুরা যে-সব জৈব রাসায়নিক পদার্থ সৃষ্টি করে; যার প্রয়োগে বিশেষ বিশেষ রোগ-জীবাণু ধ্বংস হয়, বা তাদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়ে থাকে। জীবাণু-ঘটিত বিভিন্ন রোগে এরূপ বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিক পদার্থ কার্যকরী ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পেনিসিলিন ↑, ষ্ট্রে প্টো মাইসিন ↑ প্রভৃতি অনেক রকম অ্যান্টিবায়োটিক (প্রতিষেধক) ঔষধ আবিষ্কৃত ও কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হয়েছে।

অ্যাণ্টিডোট (antidote)—প্রতিবিষ, বা বিষঘ্ন পদার্থ, যাতে কোন বিশেষ বিষ-ক্রিয়া নাশ করে। এ রকম ঔষধ প্রয়োগে বিষের শক্তি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় দ্রুত প্রশমিত হয়ে থাকে; আবার অনেক সময় তাকে অদ্রাব্য করে ফেলে, যাতে সে-বিষ রক্তের সঙ্গে মিশে আর প্রাণহানি ঘটাতে পারে না।

অ্যাণ্টিপোড (antipode) — ভূ-বিপরীত স্থানদ্বয়; ভূ-গো ল কে র বিপরীত দুইদিকে সম-সূত্রে অবস্থিত দুই স্থানকে পরস্পরের অ্যাণ্টিপোড বলে, যেমন — ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়া।

অ্যাণ্টিফেব্রিন (antifebrin) — অ্যাসিটিক অ্যাসিড ও অ্যানিলিনের ↑ সংযোগে প্রস্তুত **অ্যাসিট্যানিলাইড** নামক রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহারিক নাম। পূর্বে জ্বরের ঔষধ হিসাবে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হোত।

অ্যাণ্টিম্যাটার (antimatter) — প্রতিবস্তু, বিপরীতধর্মী বস্তু; পার্থিব পদার্থের প্রতিরূপ গঠনবিশিষ্ট বস্তু-কণা। আমাদের পরিচিত জড় বস্তুর বিপরীতধর্মী নূতন এক প্রকার যে মৌলিক বস্তুকণার অস্তিত্ব ইদানিং তত্ত্বগতভাবে জানা গিয়েছে; কিন্তু এর বাস্তব সন্ধান আজও মেলে নি। এর মূল তত্ত্বটি হলো এই: আমরা জানি, জাগতিক পদার্থ মাত্রই মূলতঃ ধন-তড়িতাহিত প্রোটন ↑ ও ঋণ-তড়িতাহিত ইলেকট্রন ↑ ক ণি কা র সমবায়ে গঠিত অসংখ্য পরমাণুর সমষ্টিমাত্র (অ্যাটমিক ষ্ট্রাক্‌চার ↑)। পদার্থ, তথা তার পরমাণুর এই তড়িৎ-ধনাত্মক প্রোটন ও তড়িৎ-ঋণাত্মক ইলেক্‌ট্রনের প রি ব র্তে ঋণাত্মক প্রোটন ও ধনাত্মক ইলেক্‌ট্রনের সমবায়ে বিপরীতধর্মী এক প্রকার পরমাণুও গঠিত হতে পারে বলে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেছিলেন বর্তমান বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই। গত 1932 খৃষ্টাব্দে ক্যালিফোর্নিয়ার বিজ্ঞানী ডঃ অ্যাণ্ডারসন মহাজাগতিক রশ্মির (কস্‌মিক-রে, cosmic ray ↑) মধ্যে সর্ববিষয়ে ইলেক্‌ট্রনের অনুরূপ, কিন্তু বিপরীত, অর্থাৎ ধন-তড়িতাহিত এক প্রকার নূতন কণিকা আবিষ্কার করেন, যার নাম দেওয়া হয় **পজিট্রন** ↑, অর্থাৎ বিপরীতধর্মী ইলেকট্রন, বা অ্যান্টি-ইলেকট্রন। এই বিস্ময়কর আবিষ্কারের জন্য 1936 খৃঃ ডঃ অ্যাণ্ডারসন নোবেল পুরস্কার ↑ লাভ করেন। অতঃপর 1955 খৃঃ

ক্যালিফোর্নিয়ার ডঃ সেগ্রে ও ডঃ চেম্বারলেন বিভাট্রন ↑ যন্ত্রের সাহায্যে ঋণ-তড়িতাহিত প্রোটন, অর্থাৎ **অ্যান্টিপ্রোটন** কণিকারও সন্ধান পান এবং বহু চেষ্টায় এই বিপরীতধর্মী প্রোটন-কণা পৃথক করতেও সক্ষম হন। এই কৃতিত্বের জন্য উক্ত বিজ্ঞানীদ্বয়ও 1959 খৃঃ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ইদানিং এরূপ বিপরীতধর্মী কণিকার (অ্যান্টিইলেকট্রন ও অ্যান্টি-প্রোটনের) সমবায়ে এক প্রকার বিপরীতধর্মী বস্তু-কণা, বা অ্যান্টি-ম্যাটারের অস্তিত্বের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা আশান্বিত ; কিন্তু জড় পদার্থের এ-হেন প্রতিরূপ আজও আবিষ্কৃত হয়নি। কেহ-কেহ মনে করেন, মহাশূন্যের অপর কোন ছায়াপথের (মিল্‌কি-ওয়ে, milky way ↑) কোন গ্রহে এরূপ বিপরীত-ধর্মী জড় বস্তু (অ্যান্টিম্যাটার) হয়তো আছে।

অ্যান্টিসেপ্টিক (antiseptic) — বীজবারক ; রোগ-জীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধক পদার্থ। যে সব রাসায়-নিক পদার্থ দেহের ক্ষতে, বা কাটা-ছেঁড়ায় লাগালে জীবাণুর আক্রমণ ও কার্যকারিতা প্রতিরুদ্ধ হয়, যেমন — আয়োডিন ↑, কার্বলিক অ্যাসিড ↑, আইডোফর্ম ↑ ইত্যাদি।

অ্যাণ্ড্রোগাইন্‌স (androgynes) —উভয়-লিঙ্গী উদ্ভিদ, যে-সব উদ্ভিদের বীজোৎপাদক পুষ্পে পুং-কেশর ও গর্ভ-কেশর উভয়ই থাকে। (অ্যাণ্ড্রো = পুং-সত্তা, গাইন = স্ত্রী-সত্তা)

অ্যানাটমি (anatomy) — দেহ ব্য ব চ্ছে দ-বি দ্যা ; চিকিৎসা-শাস্ত্রের অঙ্গ বিশেষ। দেহের অস্থি-সংস্থান, অন্ত্র, মাংসপেশী, শিরা-ধমনী প্রভৃতি সম্পর্কিত শারীরবৃত্তীয় বিজ্ঞান।

অ্যানাল্‌জেসিক (analgesic) — ব্যথা-বেদনানাশক ঔষধ। অ্যাস্পি-রিন, অ্যান্টিপাইরিন প্রভৃতি নানা রকম অ্যানাল্‌জেসিক ঔষধ আছে। এ-সব খেলে দেহের আভ্যন্তরীণ সব রকম ব্যথা-বেদনার উপশম হয়। আবার মর্ফিয়া, কোকেন্ ↑ জাতীয় পদার্থ প্রয়োগে স্থানীয়-ভাবেও বেদনা দূর হয়ে থাকে। এইরূপ বিভিন্ন সব ভেষজ পদার্থকেই সাধারণভাবে বলা হয় অ্যানাল্‌জেসিক। **অ্যানাল-জেসিয়া** হলো ব্যথা-বেদনার অনু-ভূতিহীন অসাড় অবস্থা।

অ্যানালিসিস (a n a l y s i s) — বিশ্লেষণ ; রসায়ন-বিদ্যায় যে সব প্রক্রিয়ার সাহায্যে পদার্থের উপাদান-গত গুণ, বা পরিমাণ নিরূপিত হয়। বিশ্লেষণের তৌলিক (গ্র্যাভিমেট্রিক), মাত্রিক (কোয়ান্টিটেটিভ), আঙ্গিক (কোয়ালিটেটিভ) প্রভৃতি নানারকম বিশ্লেষণ-পদ্ধতি আছে।

অ্যানিউরিন (aneurine) — ভিটা-মিন B_1-এর ↑ বিশেষ রাসায়নিক নাম ; যার অভাবে বিশেষতঃ রক্ত-হীনতা ও বেরিবেরি রোগ হয়।

অ্যানায়ন (a n i o n) — ইলেক্‌-ট্রোলিসিস (electrolysis) ↑।

অ্যানিমিয়া (anaemia)—রক্তাল্পতা-রোগ বিশেষ ; যাতে রক্তের লোহিত কণিকা ও হিমোগ্লোবিন ↑ হ্রাস পেয়ে দেহ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে, কঠিন রোগের বিষ-ক্রিয়ায়, বা অত্যধিক রক্ত ক্ষরণে দেহের এরূপ অবস্থা ঘটে থাকে।

অ্যান্যারোবিক (anaerobic)—অবায়ুজীবী ; যে-সব জীবাণু বায়ুহীন পরিবেশেই বেঁচে থাকে, যেমন—অ্যান্যারোবিক ব্যাক্টিরিয়া ↑ হলো সম্ভবতঃ যক্ষ্মা রোগের জীবাণু। (আবার 'অ্যারোবিক' মানে বায়ুজীবী, যেমন টিটেনাস রোগের জীবাণু।)

অ্যানিরয়েড (aneroid)—শব্দার্থ হলো, তরল-পদার্থ বিহীন। বিশেষ এক রকম বায়ু-চাপমান যন্ত্রকে (ব্যারোমিটার ↑) বলে 'অ্যানিরয়েড ব্যারোমিটার'। বায়ুর চাপ মাপবার জন্যে এই যন্ত্রে সাধারণ ব্যারোমিটারের মত পারদ, বা অন্য কোন তরল পদার্থ ব্যবহৃত হয় না। এ যন্ত্রে

অ্যানিরয়েড ব্যারোমিটার

থাকে একটা ধাতু-নির্মিত বায়ুশূন্য চ্যাপ্টা পাত্র,—দু'দিকে ঢেউ-খেলানো পাতলা ধাতব ঢাক্‌না। বায়ুমণ্ডলের চাপ কম-বেশী হলে ওই পাতলা ঢাক্‌নাটা ওঠা-নামা করে। যান্ত্রিক কৌশলে ওই সামান্য ওঠা-নামার হার পরিবর্ধিত করে মাপা হয়,—একটা কাঁটা ঘুরে যায় স্কেলের উপরে। ওই কাঁটা আবার একটা ঘূর্ণায়মান ড্রামের গায়ে রেখাপাত করেও বায়ু-চাপের হ্রাস-বৃদ্ধি নির্দেশ করতে পারে।

অ্যানিলিন (aniline) — অ্যামিনো-বেঞ্জিন নামক এক প্রকার বর্ণহীন তৈলাক্ত পদার্থের ব্যবহারিক নাম। কোল-গ্যাস ↑ উৎপাদনের সময় কয়লা থেকে উপজাত পদার্থ হিসাবে পাওয়া যায় বেঞ্জিন ↑। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বেঞ্জিনকে নাইট্রোবেঞ্জিনে পরিবর্তিত করা হয়, তা থেকে আবার অ্যামিনো-বেঞ্জিন, বা অ্যানিলিন তৈরী হয়ে থাকে। বিশুদ্ধ অবস্থায় বর্ণহীন, কিন্তু বায়ুর সংস্পর্শে এর বর্ণ গাঢ় বাদামী হয়ে যায়। বিষাক্ত পদার্থ। নানা রকম রং, ঔষধ ও প্লাষ্টিক ↑ শিল্পে অ্যানিলিন একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় রাসায়নিক উপাদান।

অ্যানিম্যল-চারকোল (animal-charcoal)—জীব-জন্তুর হাড় বিশেষ প্রক্রিয়ায় পুড়িয়ে যে কয়লা তৈরী হয়। এতে থাকে 10% কার্বন, ও 90% ক্যাল্‌সিয়াম ফস্‌ফেট ↑ প্রভৃতি অজৈব পদার্থ। চিনি, লবণ প্রভৃতি বিভিন্ন পদার্থ বর্ণহীন সাদা ধব্‌ধবে করবার জন্যে এদের জলীয় দ্রবকে এরূপ কয়লার ভিতর দিয়ে চুঁইয়ে ফিল্টার ↑ করে নেওয়া হয়।

অ্যানিমোমিটার (anemometer)—বায়ুপ্রবাহের বেগ, বা শক্তি নির্ধারক যন্ত্র বিশেষ ; একটি ধাতব নলাগ্রে ঘূর্ণায়মান তিনটি নল-সংলগ্ন বাটির মত পাত্র বায়ুপ্রবাহের শক্তিতে চক্রাবর্তনে ঘুরে বিশেষ প্রক্রিয়ায় বায়ুর বেগ নির্দেশ করে।

অ্যানিমোমিটার
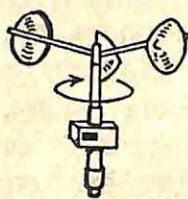
অ্যানিলিং (annealing)—উত্তপ্ত পদার্থ ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা করবার ব্যবস্থা। পুড়িয়ে পিটিয়ে বিভিন্ন ধাতব দ্রব্যাদি তৈরী করবার সময় ধাতুর আণবিক গঠনের বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট হয়ে যায়, কতকটা ভঙ্গুর হয়ে

পড়ে। পদার্থের স্বকীয় গঠন-বৈশিষ্ট্য আবার ফিরিয়ে আনবার জন্যে এই কৌশল অবলম্বন করা হয়ে থাকে। কাঁচও 'অ্যানিল' করা হয়,—উপযুক্ত কৌশলে ধীরে ধীরে ক্রমশঃ ঠাণ্ডা (অ্যানিলিং) করে কাঁচকে টান-শূন্য করে তার সহজ-ভঙ্গুরতা দূর করা হয়ে থাকে।

অ্যানেস্থেটিক্‌স (anaesthetics)—যে সকল ঔষধ প্রয়োগে জীবদেহ অসাড় ও অনুভূতিশূন্য হয়। জীবদেহে এরূপ অ্যানেস্থেসিয়া, বা অসাড়তার অবস্থা স্থান বিশেষে, বা সামগ্রিকভাবে হতে পারে ; যেমন, ক্লোরোফর্ম ↑ প্রয়োগে জীবদেহ সামগ্রিকভাবে অসাড় ও চেতনাশূন্য হয়ে পড়ে ; আবার কোকেন ↑ প্রভৃতি ইন্‌জেক্সন করে দিয়ে দেহের কোন স্থান-বিশেষ অনুভূতিশূন্য করা যায়। এ জাতীয় সব রকম ঔষধকেই অ্যানেস্থেটিক বলা হয়। (অ্যানাল্‌জেসিক ↑)

অ্যানোডাইন (anodyne)—বেদনা-নাশক ঔষধ ; যার প্রয়োগে দেহের তাপ কমে, ব্যথা-বেদনা দূর হয়। অ্যাস্পিরিন, ফেনাসিটিন ↑ প্রভৃতি অ্যানাল্‌জেসিক্ ↑ ঔষধ ; আফিম, মর্ফিয়া, ক্লোরাল প্রভৃতি বিভিন্ন নার্কোটিক ↑, বা ঘুমের ঔষধ এবং বিভিন্ন অ্যানেস্থেটিক ↑ ঔষধ প্রভৃতি সব পদার্থকেই সাধারণভাবে 'অ্যানো-ডাইন' বলা হয়।

অ্যাপার্‌চার (aperture) — ছিদ্র-পথ ; আলোক-বিজ্ঞানের যন্ত্রাদিতে যে ছিদ্রপথে আলোক-রশ্মি যন্ত্রাভ্যন্তরে প্রবেশ করানো হয়।

অ্যাপেণ্ডিক্‌স (appendix —) বৃহদন্ত্রের ডানদিকস্থ ঊর্ধ্বমুখী কোলন ↑ অংশের নিম্নভাগে সংলগ্ন ক্ষুদ্র একটা সরু বদ্ধমুখ নল, কোলনের সঙ্গে এটা যেন একটা বোঁটার মত সংলগ্ন আছে। এর প্রদাহ এবং স্ফীতিজনিত বিশেষ রোগকে বলা হয় **অ্যাপেণ্ডিসাটিস** (appendicitis)। প্রদত্ত চিত্রে প্রদর্শিত 'ক' কোলন, 'প' পাকস্থলী, আর তীর-চিহ্নিত হলো অ্যাপেণ্ডিক্‌স।

অ্যাপেণ্ডিক্‌স

অ্যাপিকাল্‌চার (apiculture) — মধুমক্ষিকা পালন ও সংরক্ষণ বিদ্যা। পুষ্টিকর, সুমিষ্ট ও ভেষজ গুণসম্পন্ন মধু সংগ্রহের জন্যে বিজ্ঞান-সম্মতভাবে মৌমাছি পালন আজকাল একটা লাভজনক ব্যবসায়। **অ্যাপিস্** মানে মৌমাছি।

অ্যাপোথিক্যারিজ ওয়েট (Apothecaries' weight) — ডাক্তারী ঔষধাদির ইংলণ্ডীয় মাপ ; কঠিন পদার্থের সূক্ষ্ম ওজন-পরিমাণ :

1 গ্রেন = ·0648 গ্র্যাম
20 গ্রেন = 1 স্ক্রুপল
24 গ্রেন = 1 পেনিওয়েট
3 স্ক্রুপল = 1 ড্রাম (Drachm)
4 ড্রাম = 1 আউন্স, ট্রয়

অ্যাপোথিক্যারিজ মেসার (Apothecaries' measure) — তরল ঔষধাদির ডাক্তারী ইংলণ্ডীয় আয়তনিক পরিমাপ :

1 মিনিম = ·0591 সি. সি. (1 ফোঁটা)
60 মিনিম = 1 ড্রাম = 3·55 সি. সি.

8 ড্রাম = 1 আউন্স
= 28·41 সি. সি.
20 আউন্স (তরল) = 1 পাইণ্ট
= 568 সি. সি.

অ্যাফোনিয়া (aphonia) — স্বরভঙ্গ রোগ ; স্বর-নালির বিকৃতি, বা অত্যধিক ঠাণ্ডা লেগে গলা বসে যাওয়ার অবস্থা ; রোগ বিশেষ।

অ্যাফিলিয়ন (aphelion) — কোন গ্রহের নির্দিষ্ট উপবৃত্তীয় কক্ষপথের (অরবিট ↑) যে বিন্দু সূর্য থেকে সর্বাধিক দূরবর্তী।

অ্যাব্‌ডোমেন (abdomen) — প্রাণিদেহের ফুসফুসাংশের নিম্নবর্তী অংশ, যেখানে পরিপাক ও প্রজনন যন্ত্রাদি অবস্থিত ; পেট, বা উদর দেশ। কীট-পতঙ্গাদির তৃতীয় দেহাংশ (1) মস্তক, (2) থোরাক্স ↑, (3) অ্যাব্‌ডোমেন।

অ্যাব্রেসিভ (abrasive) — যে সকল সুকঠিন পদার্থের চূর্ণ দিয়ে ঘসে ধাতব বস্তুকে পরিস্কৃত ও মসৃণ করা হয়ে থাকে ; যেমন—এমারি ↑, কার্বোরাণ্ডাম ↑, বালুকা প্রভৃতি।

অ্যাব্‌সিসা (abscissa) — পরস্পর সমকোণে ছেদী দুটি অক্ষরেখা (চিত্রে XX´ এবং YY´) থেকে সমতলস্থ কোন বিন্দুর লম্ব দূরত্ব দিয়ে ঐ বিন্দুর সঠিক অবস্থান প্রকাশ করা হয়। মানচিত্রে অথবা গাণিতিক বর্গলেখ-কাগজে এইরূপ উপায় অবলম্বিত হ'য়ে থাকে। প্রদত্ত চিত্রে P বিন্দুর অবস্থান PN এবং PM, অর্থাৎ OM এবং ON দৈর্ঘ্য দিয়ে নির্দিষ্ট হয়। এই দৈর্ঘ্যের একক অঙ্কদ্বয়কে বলে P বিন্দুর স্থানাঙ্ক (কোঅর্ডিনেটস ↑)। এদের মধ্যে OM দৈর্ঘ্যাঙ্ককে বলা হয় P বিন্দুর **অ্যাব্‌সিসা**, বাংলায় বলে ভূজ ; আর ON দৈর্ঘ্যাঙ্ক হলো P বিন্দুর **অর্ডিনেট** ; যাকে বাংলায় বলা হয় কটি।
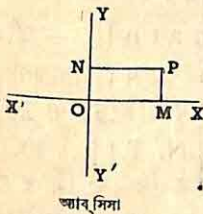
অ্যাব্‌সিসা

অ্যাব্‌সোলিউট অ্যালকোহল (absolute alcohol)—প্রায় নিরুদক কোহল। বিশুদ্ধ ও নির্জল ইথাইল-অ্যাল্‌কোহল ↑, যাতে প্রায় 99% কোহলের ভাগ বর্তমান, জল মোটামুটি 1% মাত্র থাকে।

অ্যাব্‌সোলিউট জিরো (absolute zero) — সম্ভাব্য সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। সেন্টিগ্রেড ↑ তাপমানের হিসেবে এই তাপ হলো −273° ; সেন্টিগ্রেড মাপের মত অ্যাব্‌সোলিউট মাপেও হিমাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্কের ব্যবধানকে 100 ডিগ্রিতে বিভক্ত করা হয় ; কাজেই উষ্ণতার সেন্টিগ্রেড ডিগ্রিকে অ্যাব্‌সোলিউট ডিগ্রিতে (°A বা °K) নিতে হলে তার সঙ্গে 273 যোগ করতে হয়।

অ্যাবারেশন (aberration) — জ্যোতির্বিদ্যায় গগন পর্যবেক্ষণ-কালে বিভিন্ন কারণে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থিতি সম্পর্কে যে দৃষ্টিভ্রম ঘটে। পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলে দর্শকের দৃষ্টিকোণ নিয়ত পরিবর্তিত হয়ে থাকে ; এর ফলে দৃশ্যতঃ গ্রহ-নক্ষত্রের প্রকৃত অবস্থানের ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। গ্রহ-নক্ষত্রের আলোক-রশ্মি বায়ুমণ্ডল ভেদ করে আসার ফলে এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের লেন্সের ↑ মধ্য দিয়ে ওই আলোক-

রশ্মি প্রতিসরণের জন্যেও এরূপ দৃষ্টিভ্রম, বা 'অ্যাবারেসন' ঘটে থাকে।

অ্যাভয়রডুপয়েজ ওয়েট (Avoirdupois weight) — ইংলণ্ডীয় বাজার ওজন পরিমাপ :

$437\frac{1}{2}$ গ্রেন = 1 আউন্স
= 283 গ্রাম ↑
16 আউন্স, বা
7000 গ্রেন = 1 পাউণ্ড
14 পাউণ্ড = 1 ষ্টোন
2 ষ্টোন = 1 কোয়ার্টার
4 কোয়ার্টার = 1 হন্দর
20 হন্দর, বা
2240 পাউণ্ড = 1 টন = 1016 কে.জি.
(প্রায় 27 মণ)

অ্যাভালাঙ্ক (avalanche) — ধ্বস ; পর্বত-গাত্র থেকে বরফ ও তুষার-সহ স্খলিত প্রস্তররাশি (নিম্ন উপত্যকায় পতিত)। এর বিশাল ও প্রবল পতনে অনেক সময় পার্বত্য পথ ও লোক-বসতি বিধ্বস্ত হ'য়ে যায়।

অ্যাভোগেড্রো, কাউণ্ট অ্যামাডিও (Avogadro) — ইটালিবাসী বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী ; জন্ম 1776 খৃঃ, মৃত্যু 1856 খৃঃ। উদ্ভাবিত গ্যাসীয় সূত্র 'অ্যাভোগেড্রোজ-ল' ↑ নব্য রসায়ন-বিজ্ঞানের প্রভূত অগ্রগতি সম্ভব করেছে।

অ্যাভোগেড্রোজ-ল (Avogadro's law) — বিজ্ঞানী অ্যাভোগেড্রোর নির্ধারিত গ্যাস-সূত্র, বা তথ্য। তথ্যটা হলো এই যে, একই তাপ ও চাপে সমান আয়তনের সকল গ্যাসের মধ্যেই সর্বদা সমান সংখ্যক গ্যাসীয় অণু থাকবে।

অ্যাম্পিয়ার (ampere) — তড়িৎ-প্রবাহ পরিমাপের একক ; ফরাসী বৈজ্ঞানিক অ্যাম্পিয়ারের নামানুসারে। এক অ্যাম্পিয়ার তড়িৎ মানে, সিল্ভার-নাইট্রেট দ্রবের মধ্যে যে-টুকু তড়িৎ-প্রবাহের ফলে প্রতি সেকেণ্ডে ·001118 গ্র্যাম সিল্ভার, বা রৌপ্য ইলেক্ট্রোলিসিস্ ↑ প্রক্রিয়ায় বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়।

অ্যাম্পিউল (ampule) — কাচের মুখবদ্ধ ক্ষুদ্র শিশি ; যার মধ্যে

অ্যাম্পিউল

বিভিন্ন ঔষধের দ্রবণ সংরক্ষিত করে রোগ-জীবাণু সংক্রমণের আশঙ্কা দূর করা হয়।

অ্যামর্ফাস (amorphous) — দানাযুক্ত বা স্ফটিকাকার নয় এমন ; যে কঠিন পদার্থের কোন রকম নির্দিষ্ট আকারের দানা, বা স্ফটিক (ক্রিস্ট্যাল ↑) নেই, যেমন কাঁচ, রজন, রাবার ইত্যাদি।

অ্যামাল্গাম (amalgam) — পারদ-সংকর ; মার্কারি ↑ বা পারা সংযুক্ত ধাতু-সংকর (অ্যালয় ↑)। প্রায় সব ধাতুর সঙ্গেই পারদের ধাতু-সংকর গঠিত হয়, কিন্তু লোহার সঙ্গে পারা মেশে না। স্বর্ণরেণু মিশ্রিত পাথর, বা বালি থেকে অ্যামাল্গাম প্রক্রিয়ায় সাধারণতঃ স্বর্ণ পৃথক করা হয়।

অ্যামাটল (amatol) — তীব্র বিস্ফোরক পদার্থ বিশেষ ; সাধারণতঃ 80% অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ও 20% টি. এন. টি (T. N. T.) ↑, অর্থাৎ ট্রাইনাইট্রো-টলুইন-এর সংমিশ্রণে এই বিস্ফোরক পদার্থ প্রস্তুত হয়।

অ্যামাইন (amines) — অ্যামোনিয়া ↑ হলো NH_3 ; এর এক, বা একাধিক H-পরমাণু কোন জৈব রাসায়নিক

মূলক (র‍্যাডিক্যাল ↑) দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে যে-সব যৌগ গঠিত হয়। প্রাইমারি অ্যামাইন ↑।

অ্যামাইড (a m i d e s) — বিভিন্ন অ্যামাইন-ঘটিত রাসায়নিক পদার্থ; অ্যামোনিয়ার ↑ রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন বিভিন্ন যৌগিক। কোন জৈব অ্যাসিড র‍্যাডিক্যাল ↑ দিয়ে অ্যামোনিয়ার (NH_3) এক, বা একাধিক হাইড্রোজেন পরমাণু বিচ্যুত করে যে সব জৈব রাসায়নিক পদার্থ গঠিত হয় তাদের বলে **অ্যামাইড**; যেমন — অ্যাসিট্যামাইড, CH_3CONH_2।

অ্যাম্ফিবিয়া (amphibia) — জীব সৃষ্টির ক্রম-বিকাশের ধারায় মৎস্য ও সরীসৃপের মাঝামাঝি পর্যায়ের প্রাণী, যেমন—ব্যাং, শামুক, কচ্ছপ প্রভৃতি উভচর জীব-শ্রেণী।

অ্যাম্ফিবিয়া

অ্যাম্মিটার (ammeter)—বিদ্যুৎ-প্রবাহ পরিমাপের সূক্ষ্ম যন্ত্র-বিশেষ; যান্ত্রিক কৌশলে এর সাহায্যে অ্যাম্পিয়ার ↑ এককে তড়িৎ-প্রবাহ মাপা সম্ভব হয়।

অ্যামিথিষ্ট (amethyst) — বেগুনী রং-এর এক রকম বালুকা-প্রস্তর, বা কোয়ার্টজ ↑; স্ফটিকাকার, স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল বর্ণের প্রস্তর বিশেষ, রাসায়নিক হিসাবে অবিশুদ্ধ প্রাকৃতিক (SiO_2) সিলিকন-ডাইঅক্সাইড ↑।

অ্যামিবা (amoeba) — এক প্রকার আণুবীক্ষণিক প্রোটোজোয়া ↑ শ্রেণীর জীবাণু। এক-কোষী আদ্য প্রাণী বিশেষ; প্রস্থে এরা এক ইঞ্চির প্রায় এক'শ ভাগের এক ভাগ মাত্র। একটা
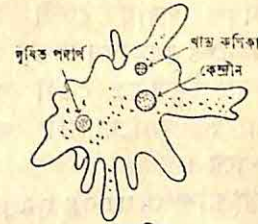
অ্যামিবা

থেকে দু'টা, দু'টা থেকে চারটা, এভাবে নিজ দেহ বিভাজিত করে এরা বংশ বৃদ্ধি করে। এদের দেহ জেলির মত থল্‌থলে পদার্থে (প্রোটোপ্লাজম ↑) গঠিত। দেহের বিভিন্ন অংশ (ক্ষণপদ) বাড়িয়ে-বাড়িয়ে এরা এগিয়ে চলে।

অ্যামিনো অ্যাসিড (amino acid) —যে-সকল জৈব অ্যাসিডে COOH এবং NH_2 মূলক যুক্ত থাকে, যেমন —গ্লাইসিন ($NH_2.CH_2.COOH$)। পরিপাক-ক্রিয়ায় ভুক্ত আমিষ খাদ্যের প্রোটিন ভেঙ্গে বিভিন্ন প্রকার অ্যা. অ্যা. উৎপন্ন হয়, যা অন্ত্রের প্রাচীর-পর্দা ভেদ করে বাহিরে আসে এবং দেহকোষে প্রবিষ্ট হয়ে পুনরায় প্রোটিনে ↑ পরিণত হয়। জীবদেহের গঠনে অত্যাবশ্যকীয় উপাদান।

অ্যামোনিয়া (ammonia) — এক রকম উগ্র গন্ধ-বিশিষ্ট গ্যাস, জলে দ্রবণীয়। হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন গ্যাসের মিলনে উৎপন্ন একটি গ্যাসীয় যৌগিক। আণবিক সূত্র NH_3; এর জলীয় দ্রবে থাকে অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড, NH_4OH; ক্ষারধর্মী পদার্থ। বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় অ্যামোনিয়ায় রূপান্তরিত করা যায়। কয়লা থেকে কোলগ্যাস ↑ তৈরীর সময় উপজাত পদার্থ হিসেবেও প্রচুর অ্যামোনিয়া

পাওয়া যায়। জমির সার ও বিভিন্ন বিস্ফোরক পদার্থ তৈরী করবার কাজে যথেষ্ট দরকার। শীতল কক্ষ, বা রেফ্রিজারেটর ↑ যন্ত্র তৈরী করতেও তরলায়িত অ্যামোনিয়া প্রয়োজন হয়ে থাকে।

অ্যারোগ্রাফ (aurograph)— জিনিসপত্রে রং করবার জন্যে ব্যবহৃত এক রকম যন্ত্র-বিশেষের ব্যবহারিক নাম। এর সাহায্যে বিভিন্ন জিনিসের উপরে সমানভাবে রং-এর পাত্‌লা আস্তরণ দেওয়া যায়। যন্ত্রের সূক্ষ্মাগ্র-মুখে তরল রঞ্জক পদার্থ (পেইণ্ট) বা স্প্রা কারে নির্গত হয়। এর 'ন' নলপথে বাতাস প্রবেশ করানো হয়, তার চাপে 'ব' ছিদ্রপথে রং অতি সূক্ষ্ম কণিকাকারে বেরিয়ে জিনিসের উপরিতলে লাগে।
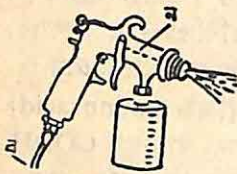
অ্যারোগ্রাফ

অ্যারোনটিক্স (aeronautics)— বেলুন, এরোপ্লেন প্রভৃতির সাহায্যে গগন-পর্যটন সংক্রান্ত বিবিধ তাত্ত্বিক বিজ্ঞান।

অ্যাল্‌কাথিন (alkathene)— পলিথিন ↑ শ্রেণীর প্ল্যাস্টিক ↑ পদার্থের প্রচলিত ব্যবসায়িক নাম; বিভিন্ন কাঠিন্য ও বর্ণের অ্যাল্‌কাথিন প্ল্যাস্টিক উৎপাদিত হয়ে থাকে। একটি পলিমার (polymer) ↑ পদার্থ। রাসায়নিক বিচারে একটি পলিথিন-প্ল্যাস্টিক।

অ্যাল্‌কেমি (alchemy) — প্রাচীন যুগের 'কিমিয়া', বা রসায়নবিদ্যা। সেকালে (পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে) এক শ্রেণীর তথাকথিত বিজ্ঞানী যে-সব কৌশলে প্রধানতঃ নিকৃষ্ট ধাতুকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। এই অ্যাল্‌কেমিষ্টরা রসায়নবিদ্যার সঙ্গে নানা রকম তন্ত্রমন্ত্র, যাদুবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা সব মিশিয়ে এক অপ্রাকৃত উপায়ে 'জীবন-রসায়ন' ও 'পরশপাথর' আবিষ্কারের এক চেষ্টায় নিয়োজিত ছিলেন। প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তু ও ব্যবস্থার বিশেষ যোগাযোগে মানুষের ব্যাধিশূন্য দীর্ঘজীবন লাভ ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করবার উপায় বার করাই ছিল তাঁদের কাম্য। ক্রমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি ঘটতে এঁদের এই উদ্ভট প্রচেষ্টা অবাস্তব প্রতিপন্ন হয় এবং অ্যাল্‌কেমি যুগ শেষ হয়।

অ্যাল্‌কালি (alkali) — ক্ষারধর্মী যৌগ; কতকগুলো ক্ষারক ধাতুর হাইড্রক্সাইড ↑। জলে বিশেষ দ্রবণীয়। অ্যালকালি পদার্থগুলি অ্যাসিডের শক্তি প্রশমিত করে, এবং উভয়ের রাসায়নিক মিলনে যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি হয়। সোডিয়াম, পটাসিয়াম, লিথিয়াম ↑ প্রভৃতি ধাতুকে বলে অ্যালকালি-ধাতু; কারণ, এদের হাইড্রক্সাইড যৌগসমূহ সর্বদা অ্যাল্‌কালি, বা ক্ষারধর্মী হয়।

অ্যাল্‌কালি মেটাল (alkali metal) — পটাসিয়াম, সোডিয়াম, লিথিয়াম, রুবিডিয়াম ও সিজিয়াম ধাতু; এদের অক্সাইড যৌগের জলীয় দ্রবণ ক্ষারধর্মী (অ্যাল্‌কালিন) হয়ে থাকে।

অ্যাল্‌কালয়েড (alkaloid)— বিভিন্ন উদ্ভিদ থেকে যে-সব জৈব রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যায়। নিকোটিন ↑, কুইনিন ↑, কোকেন ↑, মর্ফিন ↑ প্রভৃতি সবই এরূপ উদ্ভিদজাত অ্যাল্‌কালয়েড। এদের

সবগুলিরই অন্যতম একটি উপাদান নাইট্রোজেন, আর এরা সামান্য কিছু অ্যাল্‌কালি, বা ক্ষারধর্মী হয়। এজন্য বাংলায় এদের বলা হয় **উপক্ষার**। জীবদেহের উপর এদের বিশেষ বিশেষ ভেষজ গুণ প্রকাশ পায়।

অ্যাল্‌জি (algae) — অপুষ্পক উদ্ভিদ বিশেষ; শৈবালশ্রেণী। এদের প্রকৃত মূল থাকে না; মূলের মত একটা অংশ এঁটে পাথরের উপরেও জন্মায়। জলজ অ্যাল্‌জিও অনেক আছে। জলজ ও স্থলজ শত শত প্রকারের অ্যাল্‌জি, বা 'শেওলা' দেখা যায়।

অ্যাল্‌জেব্রা (algebra) — বীজগণিত; বিভিন্ন গাণিতিক সমাধানের জন্যে অনির্দিষ্ট সংখ্যার প্রতীক চিহ্নের সাহায্যে সাধারণ সূত্র নির্ণয়ের গণিতশাস্ত্র। মিশরীয়গণ তিন হাজার বছরেরও আগে এই সূত্র-গণিত, বা বীজগণিত উদ্ভাবন করেন বলে কথিত আছে। প্রাচীন ভারতেও এর প্রভূত প্রসার ও উন্নতি ঘটেছিল। একে গণিতের উন্নত স্তর বলা যায়; সংখ্যাগণিতে যার সমাধান দুঃসাধ্য, বীজগণিতের অনির্দিষ্ট প্রতীক-সূত্র প্রয়োগে তা বিশেষ সহজসাধ্য হয়ে থাকে।

অ্যালয় (alloy) — সংকর ধাতু; দুই বা ততোধিক ধাতুর সংমিশ্রণে যে মিশ্র-ধাতু তৈরী হয়। কখন কখন বিভিন্ন ধাতুর যৌগিক মিলন ঘটিয়ে, কখন বা কেবলমাত্র গলিয়ে-মিশিয়ে সংকর-ধাতু সৃষ্টি হয়ে থাকে। ধাতুর কাঠিন্য বা অন্য কোন বৈশিষ্ট্য বৃদ্ধি করে বিশেষ কাজের উপযোগী করবার জন্যে এরূপ বিভিন্ন ধাতু-সংকর তৈরী করা হয়; ব্রাস ↑, ব্রোঞ্জ ↑ ইত্যাদি।

অ্যাল্‌কোহল (alcohol) — জৈব রাসায়নিক তরল পদার্থ; বিভিন্ন হাইড্রোকার্বনের ↑ সঙ্গে অক্সিজেনের (হাইড্রক্সিল ↑ র‍্যাডিক্যাল) মিলনে বিভিন্ন শ্রেণীর অ্যাল্‌কোহল উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ ইথাইল অ্যাল্‌কোহল, $CH_3.CH_2OH$, বুঝায়। শ্বেতসার, শর্করা প্রভৃতি গাঁজিয়ে (ফার্মেণ্টেসান ↑) তৈরী হয়। বর্ণহীন দাহ্য তরল পদার্থ; যাকে বলে সুরাসার, অর্থাৎ 'স্পিরিট অব ওয়াইন' ↑।

অ্যালবুমেন(albumen)—প্রোটিন ↑ জাতীয় পদার্থ, যা ডিমের শ্বেত-অংশে এবং প্রাণী-দেহের বিভিন্ন জৈব বস্তুতে বর্তমান। আবার বিভিন্ন শস্য-বীজেও বিভিন্ন প্রকার অ্যালবুমেন রয়েছে,—গম, রাই, বার্লি প্রভৃতিতে **লুকোসিন** নামে; মটর, সয়াবিন প্রভৃতিতে **লিগোমেলিন** ↑ নামে পরিচিত পৃথক পৃথক শ্রেণীর অ্যালবুমেন আছে। অ্যালবুমেন ঠাণ্ডা জলে দ্রাব্য, উত্তাপে শক্ত ও অদ্রাব্য হয়।

অ্যালবুমিনয়েড (albuminoid) — অ্যাল্‌বুমেনের ↑ প্রায় অনুরূপ জৈব রাসায়নিক পদার্থ, কিন্তু জলে দ্রাব্য নয়। মানুষের চুল ও নখর এই উপাদানে তৈরী।

অ্যাল্‌ডিহাইড (aldehyde) — এক শ্রেণীর জৈব রাসায়নিক যৌগমূলক (···COH), যা অক্সিজেন সংযোগে জারিত হয়ে বিভিন্ন জৈব অ্যাসিড গঠন করে (···COOH)।

অ্যালাম (alum) — ফিট্‌কিরি; পটাসিয়াম সাল্‌ফেট ও অ্যালুমিনিয়াম সাল্‌ফেট মিলে 24-টি জলীয় অণু নিয়ে এর উৎপত্তি হয়ে থাকে; (K_2SO_4-

$Al_2(SO_4)_3 . 24H_2O$) ; একে বলে **পটাস্ অ্যালাম**। স্ফটিকাকার, জলে দ্রবণীয়। এর বিক্রিয়ায় জলের ময়লা থিতিয়ে পড়ে। রঞ্জক পদার্থ, অগ্নিনিরোধক দ্রব্য ও অন্যান্য নানা শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করতে ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ অ্যালাম বলতে পটাসিয়াম-অ্যালুমিনিয়াম সাল্‌ফেট বুঝালেও রাসায়নিক হিসেবে একই গঠনের বিভিন্ন লবণ (সল্ট ↑) মিলিত হয়ে যে স্ফটিকাকার যৌগিক পদার্থ গঠিত হয় তাকেই বলা হয় অ্যালাম ; যেমন, ফেরিক-অ্যালাম, ক্রোম-অ্যালাম ↑ ইত্যাদি।
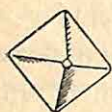
অ্যালাম

অ্যালার্জি (allergy) — বিশেষ বিশেষ প্রোটিন ↑ পদার্থের প্রভাবে দেহের আকস্মিক অসুস্থতা দেখা দেয়, যেমন — কোন কোন লোক ডিমের শ্বেতাংশ সামান্য পরিমাণে খেলেও অসুস্থ হয়ে পড়ে, একেই বলা হয় অ্যালার্জি অবস্থা। কারো দুধ সয় না, কারো মাংস,—অ্যালার্জি দেখা দেয়। কেবল খাদ্যই নয়, কোন বিশেষ বস্তুর সংস্পর্শে, বা ঘ্রাণেও কারো কারো অসুস্থতার নানা উপসর্গ প্রকাশ পায়। মোট কথা, কোন-কোন বস্তু বিশেষের প্রভাবে মনুষ্য-দেহের স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় ভারসাম্য, বা সংবেদনশীলতার বিপর্যয়কেই বলা হয় অ্যালার্জি।

অ্যালিমেণ্টারি ক্যানাল (alimentary canal) — খাদ্যনালি ; ভুক্ত খাদ্যবস্তুর পরিচলন-পথ। মুখগহ্বর থেকে যে দীর্ঘ নলপথ পাকস্থলী ও অন্ত্রাদি (ইণ্টেস্টাইন ↑) সহ মলদ্বার পর্যন্ত প্রসারিত রয়েছে। সাধারণতঃ মানুষের অ্যা. ক্যা. দৈর্ঘ্যে প্রায় 30 ফুট হয়ে থাকে।

অ্যালিকোট পার্ট (aliquot part) — কোন রাশির পূর্ণসংখ্যায় সম্পূর্ণ বিভাজক রাশি। যে সংখ্যা কোন বৃহত্তর সংখ্যার গুণনীয়ক, যেমন— 2 হলো 10-এর একটা অ্যা. পা. ; কিন্তু 3 নয়।

অ্যালিফেটিক কম্পাউণ্ড (aliphatic compound) — যে সব জৈব রাসায়নিক যৌগের আণবিক সংগঠনে কার্বন-পরমাণুর সারিবদ্ধ (চক্রাকার নহে) সংযোগ থাকে, যেমন — ইথেন ↑, CH_3CH_3 ; বুটেন, $CH_3 . CH_2 . CH_2 . CH_3$, ইত্যাদি ; কিন্তু, বেন্‌জিন ↑ C_6H_6, নহে। অ্যাসিটিক ↑ অ্যাসিড, অ্যাসিটোন ↑ প্রভৃতিও এই শ্রেণীর যৌগিক।
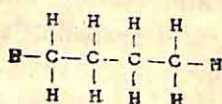
অ্যালিফ্যাটিক কম্পাউণ্ড

অ্যালুভিয়্যাল (alluvial) — নদী-বাহিত ; কর্দম ও মৃত্তিকাদি যে-সব পদার্থ নদীস্রোতে বাহিত হয়ে এসে একস্থানে সঞ্চিত হয় ; যেমন— 'অ্যালুভিয়্যাল ক্লে' হলো নদীবাহিত কর্দম। এ-সব পদার্থকে আবার কখন কখন এক কথায় বলে **অ্যালুভিয়াম**।

অ্যালোট্রপি (allotropy) — বহু-রূপতা ; পৃথক ভৌতধর্ম ও আকার-বিশিষ্ট একই মৌলিক পদার্থের বহুরূপ অবস্থা। দৃশ্যতঃ বাহ্যিক বিভিন্নতা, কিন্তু রাসায়নিক ধর্মে অভিন্ন পদার্থ ; যেমন, সালফার ↑, বা গন্ধকের নানা রকম অ্যা-পি. আছে, যাদের বলে সালফারের **অ্যালোট্রোপ**, বহুরূপ।

অ্যালুমিনিয়াম (alluminium) — মৌলিক ধাতু ; সাদা, হাল্‌কা ও উৎকৃষ্ট তড়িৎ-পরিবাহী ধাতব মৌল। সাংকেতিক চিহ্ন Al ; পারমাণবিক ওজন 26·97, পারমাণবিক সংখ্যা 13 ; প্রধানতঃ বক্সাইট ↑ নামক এক রকম খনিজ থেকে নিষ্কাশিত হয়। বিশেষ হাল্‌কা বলে অ্যালুমিনিয়ামের বিভিন্ন ধাতু-সংকর নানা কাজে, বিশেষতঃ বিমানপোত তৈরী করতে ইদানিং প্রচুর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে গৃহস্থালীর নানা রকম তৈজসপত্র, বৈদ্যুতিক তার ও যন্ত্রাদি তৈরী করা হয়।

অ্যালুমিনা (alumina) — অ্যালুমিনিয়ামের অক্সাইড, Al_2O_3, যৌগ ; বক্সাইট ↑, কোরাণ্ডাম ↑ প্রভৃতি বিভিন্ন খনিজ প্রস্তরে প্রাকৃতিক অবস্থায় থাকে।

অ্যালুমিনিয়াম ব্রাস (aluminium-brass)—পিতল, বা ব্রাস ↑ প্রধানতঃ তামা ও দস্তার মিশ্রণে তৈরী একটি সংকর ধাতু। এর সঙ্গে সামান্য অ্যালুমিনিয়াম মিশিয়ে এই বিশেষ সংকর-ধাতুটা তৈরী হয়।

অ্যালুমিনিয়াম ব্রোঞ্জ (aluminium-bronze) — ব্রোঞ্জ প্রধানতঃ তামা ও টিনের সংকর ধাতু ; এর সঙ্গে সামান্য (4% থেকে 13%) অ্যালুমিনিয়াম মিশিয়ে যে অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা সংকর-ধাতু তৈরী করা হয়।

অ্যাস্‌কর্বিক অ্যাসিড (ascorbic acid) — সাধারণতঃ ভিটামিন-সি নামে পরিচিত একটি খাদ্য-প্রাণ। সাদা ক্ষুদ্র স্ফটিকাকার পদার্থ। বিভিন্ন ফল ও তাজা শাকসব্জিতে পাওয়া যায় (ভিটামিন ↑)।

অ্যাস্পিরিন(aspirin)—অ্যাসিটাইল সেলিসিলিক অ্যাসিড নামক একটি রাসায়নিক যৌগের সাধারণ নাম ; যা মাথা-ধরা ও সাধারণ ব্যথা-বেদনায় ঔষধ হিসাবে বহুল ব্যবহৃত। বিশেষ একটি উদ্ভিদজাত অ্যালকালয়েড (alkaloid) ↑ পদার্থ।

অ্যাস্‌ফ্যাল্ট (asphalt) — আল্‌কাতরার মত কালো আঠালো এক রকম পদার্থ ; এর প্রধান উপাদান হলো বিটুমেন্ ↑। ডিস্টিলেসনের পরে আল্‌কাতরার (কোলটার ↑) সর্বশেষ উপাদান। সাধারণ কথায় একে বলে পিচ্ ; সহরের রাস্তা তৈরীর কাজে ব্যবহৃত। অনেক হ্রদের তলায় ও কোন কোন স্থানের চুনা-পাথর ও বেলে-পাথরের সঙ্গে সংমিশ্রিত অবস্থায় খনিজ রূপেও পদার্থটা প্রচুর পাওয়া যায়।

অ্যাস্‌বেস্টস (asbestos) — এক শ্রেণীর মিশ্র সিলিকেট ↑ পদার্থের বিশেষ নাম। প্রধানতঃ ক্যালসিয়াম-ম্যাগ্নেসিয়াম সিলিকেট ও অন্যান্য ধাতব সিলিকেট, ও বালুকাদির মিলনে উৎপন্ন একটা খনিজ রাসায়নিক পদার্থ। জিনিসটা অদাহ্য বলে অগ্নি-নিরোধক দ্রব্যাদি প্রস্তুত করতে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন আঁসযুক্ত জিনিসের সঙ্গে মাখিয়ে-মিশিয়ে নানা আকারের অদাহ্য 'অ্যাস্‌বেস্টস সিট্' তৈরী হয়ে থাকে।

অ্যাসিটোন (acetone)—তরল জৈব রাসায়নিক পদার্থ, CH_3COCH_3 ; বর্ণহীন, দাহ্য, সুমিষ্ট গন্ধযুক্ত। স্ফুটনাংক 56·5° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। অ্যাসিটোনকে কখন কখন 'ডাই-মিথাইল-কিটোন' ও বলা হয়। উৎকৃষ্ট

দ্রাবক পদার্থ হিসেবে বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় লাগে; বিশেষতঃ সেলুলোজ-অ্যাসিটেট্ রেয়ন ↑, অর্থাৎ কৃত্রিম রেশম তৈরীর জন্যে এর বিশেষ প্রয়োজন। চর্বি ও রজন জাতীয় পদার্থ অ্যাসিটোনে গলে যায়।

অ্যাসিটিক অ্যাসিড (acetic acid) — একটি বর্ণহীন তরল অম্ল-পদার্থ। রাসায়নিক সূত্র CH_3COOH; ভিনিগারের ↑ মধ্যে পাওয়া যায় বলে একে **ভিনিগার অ্যাসিড**-ও বলা হয়। উপযুক্তরূপে ঠাণ্ডা করলে জমে যায়, তখন একে 'গ্ল্যাসিয়াল' অ্যাসিটিক অ্যাসিড বলে। বিবিধ রাসায়নিক শিল্পে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন ধাতব পদার্থের সঙ্গে এর রাসায়নিক মিলনে বিভিন্ন **অ্যাসিটেট সল্ট** তৈরী হয়; যেমন —লেড্ অ্যাসিটেট, যাকে 'সুগার-অব-লেড' ↑ বলে। বয়ন-শিল্পে যথেষ্ট দরকার হয়। কৃত্রিম রেশম (অ্যাসিটেট সিল্ক ↑) শিল্পে অ্যাসিটিক অ্যাসিড একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় উপাদান।

অ্যাসিটিলিন (acetylene)—বর্ণহীন, দাহ্য, বিষাক্ত গ্যাসীয় পদার্থ, C_2H_2; গ্যাসটা জ্বালালে বেশ উজ্জ্বল আলো ছড়ায়। সাধারণ কার্বাইড ↑ গ্যাস-বার্ণারে এই অ্যাসিটিলিন গ্যাসই জ্বালানো হয়। ক্যাল্সিয়াম কার্বাইডে জল দিলে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে গ্যাসটা উৎপন্ন হয়; $CaC_2 + 2H_2O = C_2H_2$ (অ্যাসিটিলিন) + $Ca(OH)_2$ (ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড, অর্থাৎ চূণ)। ওয়েল্ডিং-এর ↑ কাজে ও অক্সি-অ্যাসিটিলিন ফ্লেম ↑ সৃষ্টি করতে এর প্রয়োজন হয়।

অ্যাসিটেট সিল্ক (acetate silk)—কৃত্রিম রেশম; আজকাল ইহা রেয়ন ↑ নামে পরিচিত। তূলা, কাঠের গুঁড়া প্রভৃতি সেলুলোজ জাতীয় পদার্থের উপর অ্যাসিটিক অ্যাসিডের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে এক রকম সাদা নরম পদার্থের সৃষ্টি হয়; এই পদার্থটা হলো সেলুলোজ অ্যাসিটেট ↑ যৌগ। যন্ত্রের সাহায্যে এর থেকে সূক্ষ্ম সূত্র তৈরী হয় এবং সেই সূতায় রেশমের মত নরম ও সুদৃশ্য বস্ত্রাদি বোনা হয়। এই হলো কৃত্রিম রেশম, বা 'আর্টিফিশিয়াল সিল্ক'।

অ্যাসিড (acid) — অম্ল, তেজাব (হিন্দি); কোন ধাতুর সংস্পর্শে যে-পদার্থের হাইড্রোজেন-পরমাণু বিমুক্ত হয়ে যায়, আর ওই ধাতুর পরমাণু তার স্থান অধিকার করে ধাতব যৌগিক পদার্থ (সল্ট ↑) সৃষ্টি করে। সাধারণতঃ অ্যাসিডের স্বাদ অম্ল, তীব্র জারক পদার্থ। এর সংস্পর্শে বিভিন্ন বস্তু পুড়ে ক্ষয়ে যায়। যে-কোন অ্যাসিডের সংস্পর্শে নীল-লিট্মাস (একটি উদ্ভিজ্জ রাসায়নিক পদার্থ) লাল হয়। অ্যাসিড মাত্রেরই হাইড্রোজেন একটি অপরিহার্য মৌল উপাদান। এর জলীয় দ্রবে ওই হাইড্রোজেন আয়নায়িত (আয়ন ↑) হয়ে পড়ে, এবং কোন ধাতব বেসের ↑ সংস্পর্শে সহজেই বিমুক্ত হয়ে যায় এবং ধাতব সল্টের উৎপত্তি ঘটে।

অ্যাসিড-সল্ট (acid salt) — অ্যাসিডের সঙ্গে বিভিন্ন ধাতুর মিলনে বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ (সল্ট ↑) তৈরী হয় এবং হাইড্রোজেন গ্যাস বিমুক্ত হয়ে যায়। যদি অ্যাসিডের সবটা হাইড্রোজেন-পরমাণু বিমুক্ত না হয়ে বিক্রিয়ার অবস্থা বিশেষে তার

কিছুটা ওই সল্টে থেকে যায় তবে তাকে বলা হয় অ্যাসিড-সল্ট, অম্ল-লবণ ; যেমন, $NaHCO_3$ সোডিয়াম বাই-(অ্যাসিড) কার্বনেট।

অ্যাসে (assay)—কোন খনিজ প্রস্তর, বা ধাতু-সংকরে কত শতাংশ ধাতু (বিশেষতঃ স্বর্ণ, বা রৌপ্য) আছে তার বিশ্লেষণ। 'অ্যাসে' বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া দু'রকম—শুষ্ক বিশ্লেষণ ও তরল বিশ্লেষণ। স্বর্ণ, বা রৌপ্যের শুষ্ক বিশ্লেষণে চূর্ণিত খনিজের, বা ধাতুসংকরের সঙ্গে লেড্ অক্সাইড↑ মিশিয়ে উত্তপ্ত করা হয়, সঙ্গে দেওয়া হয় চারকোল↑ও জিঙ্ক ক্লোরাইড↑ জাতীয় একটা 'ফ্লাক্স' (flux)↑। উত্তাপের ফলে গলিত লেড (সিসা) স্বর্ণ, বা রৌপ্যের কণিকা-সহ পাত্রের তলদেশে সঞ্চিত হয়। তরল 'অ্যাসে' বিশ্লেষণে নাইট্রিক প্রভৃতি অ্যাসিডের সাহায্যে খনিজটিকে দ্রবীভূত করা হয়, আর সেই দ্রবণ থেকে ধাতুকে উপযুক্ত রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অধঃক্ষিপ্ত করা হয়।

অ্যাসেক্সুয়াল (asexual)—অযৌন, অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষ ভেদাভেদহীন ; জীবজগতে যে-সব নিম্নস্তরের উদ্ভিদ, বা প্রাণীর প্রজননে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নেই, তাদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত শব্দ ; যেমন—ব্যাক্টেরিয়া↑, অ্যামিবা↑, ইস্ট↑ প্রভৃতির প্রজনন। সাধারণ কোষ-বিভাজন প্রক্রিয়ায় এদের বংশ-বৃদ্ধি ঘটে ; যৌন প্রক্রিয়ায় নহে।

অ্যাস্টার-, অ্যাস্ট্রো (aster-,astro)—নক্ষত্র ; নক্ষত্র সম্বন্ধীয়, বা নক্ষত্রের অনুরূপ ; যেমন, **অ্যাস্টারয়েড্স**—গ্রহ-কণিকাপুঞ্জ। অ্যাস্ট্রোনেভিগেসন—আকাশে নক্ষত্রের অবস্থান দৃষ্টে দিঙনির্ণয় করে জাহাজ অথবা বিমানপোত চালনা।

অ্যাস্ট্রোফিজিক্স (astrophysics)—গ্রহ-নক্ষত্রের গঠন, অবস্থান, উপাদান, ঔজ্জ্বল্য, গতি-প্রকৃতি প্রভৃতি বিষয়ক গবেষণা বিজ্ঞান।

অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট (astronomical unit)— পৃথিবী থেকে সূর্যের গড় দূরত্বকে একক ধরে নিয়ে অনেক সময় জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাধারণ গণনাদি করা হয়। এই একককে বলে অ্যা. ই. ; মোটামুটি 92,900,000 মাইল। মহাশূন্যে বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের দূরত্ব নির্ণয়ে কখন-কখন এই একক ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

অ্যাস্ট্রোলজি (astrology)—জ্যোতিষশাস্ত্র ; ভাগ্যগণনা তত্ত্ব। মানবজীবনের শুভাশুভ বিভিন্ন গ্রহের প্রকোপ ও প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় বলে যে বিশ্বাস গড়ে উঠেছে তৎসম্বন্ধীয় গণনা-শাস্ত্র। জ্যোতিষশাস্ত্রের বিচার-পদ্ধতি প্রত্যক্ষ পরীক্ষাসম্মত ও যুক্তিসহ নয় বলে আধুনিক বিজ্ঞানে অস্বীকৃত।

অ্যাস্ট্রোনমি (astronomy)—জ্যোতির্বিদ্যা; মহাকাশে গ্রহ-নক্ষত্রের গতি-প্রকৃতি, অবস্থান ও অবস্থাদি সম্পর্কীয় যান্ত্রিক পর্যবেক্ষণ-লব্ধ বিবিধ তথ্যাদি আধুনিক বিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচিত হয়।

অ্যাস্টারয়েড্স (asteroids) —গ্রহাণুপুঞ্জ ; মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহ-দ্বয়ের কক্ষপথের মধ্যবর্তী মহাশূন্যে কাছাকাছি বিভিন্ন কক্ষপথে প্রায় আড়াই হাজার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে ; এদের সমবেতভাবে

বলে অ্যাস্টারয়েড্‌স, বা গ্রহাণুপুঞ্জ। এগুলোর মধ্যে প্যালাস, সেরাস প্রভৃতি বৃহত্তরগুলোর ব্যাসও 3500 মাইলের অধিক নয়।

অ্যাস্টিগ্‌মেটিজ্‌ম (astigmatism) — চোখের, অথবা কোন লেন্সের উপরিতলের বক্রতা প্রয়োজনানুরূপ না হওয়ার জন্যে যে দৃষ্টিদোষ ঘটে। এরূপ লেন্সে প্রতিসরিত আলোকরশ্মি বিভিন্ন ফোকাসে↑ সংহত হয়; এ-জন্যে দৃষ্ট বস্তু এবড়ো-খেবড়ো দেখায়। দৃষ্টির এই ত্রুটিকে বলে অ্যাস্টিগ্‌মেটিজ্‌ম। চোখের এরূপ দোষ সিলিণ্ড্রিক্যাল লেন্সের চশমা ব্যবহার করে দূর করা যায়।

অ্যাস্পিরিন (aspirin) — সাদা ও সূক্ষ্ম স্ফটিকাকার একটি উদ্ভিজ্জ অ্যাল্‌কালয়েড↑ পদার্থ; এর রাসায়নিক পরিচয় অ্যাসিটাইল-সেলিসাইলিক অ্যাসিড। প্রায় 133° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় গলে যায়। বেদনা-নাশক ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়; এর অ্যানাল্‌জেসিক↑ এবং অ্যান্টিপাইরেটিক↑ উভয় গুণই বিশেষভাবে বর্তমান। মাথা-ধরা ও ব্যথা-বেদনায় বিশেষ ফলপ্রদ।

অ্যাস্টেটিক কয়েলস (astatic coils)—বৈদ্যুতিক তার-কুণ্ডলীর এক রকম ব্যবস্থা; সূক্ষ্ম তড়িৎ-যন্ত্রাদিতে ব্যবহৃত হয়। এর জন্যে একটা ধাতব তার-কুণ্ডলী এমনভাবে স্থাপিত হয় যাতে ওর মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ চালালে যে চৌম্বক-শক্তি উৎপন্ন হয়, তা আবার নিকটস্থ কোন চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের বিপরীত শক্তির প্রভাবে পরস্পর শক্তিশূন্য হয়ে পড়ে।

আ

…আইট (…ite) — সাল্‌ফিউরাস (H_2SO_3), নাইট্রাস (HNO_2) প্রভৃতি অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় ধাতব '…আইট' সল্ট উৎপন্ন হয়, যেমন— সোডিয়াম সাল্‌ফাইট (Na_2SO_3), পটাসিয়াম নাইট্রাইট (KNO_2) প্রভৃতি। পক্ষান্তরে সাল্‌ফিউরিক (H_2SO_4), নাইট্রিক (HNO_3) প্রভৃতি অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় ধাতব '…**য়েট**' সল্ট; যেমন— সোডিয়াম নাইট্রেট ($NaNO_3$), পটাসিয়াম সাল্‌ফেট (K_2SO_4) ইত্যাদি। এই দুই শ্রেণীর সল্টের প্রভেদ মাত্র তাদের রাসায়নিক গঠনে অক্সিজেন-পরমাণুর সংখ্যায়।

…আইটিস (…itis) — কোন অঙ্গের প্রদাহ বুঝাতে বিশেষ বিশেষ শব্দের পরে এই উপসর্গ যুক্ত হয়; যেমন— **গ্যাস্ট্রাইটিস**↑ মানে পাকস্থলী, বা অন্ত্রের প্রদাহ-জনিত রোগবিশেষ; এ-রকম **ল্যারেঞ্জাইটিস** ল্যারিংস↑ -এর প্রদাহ; **ডার্মাইটিস** গাত্র-চর্মের (ডার্মিস↑) প্রদাহ।

আইয়োডোফর্ম (iodoform) — বীজঘ্ন রাসায়নিক পদার্থ, CHI_3; হলদে, স্ফটিকাকার কঠিন জৈব যৌগ। জলে অদ্রবণীয়, কিন্তু ইথার↑, অ্যালকোহল↑ প্রভৃতিতে গলে যায়। একটা বিশেষ তীব্র গন্ধের জন্য পরিচিত। বীজাণু-প্রতিরোধক হিসেবে ক্ষতস্থানে লাগানো হয়।

আই-পিস (eye-piece)— অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ প্রভৃতি যন্ত্রে দর্শকের চোখের কাছে যে লেন্স↑ সংলগ্ন থাকে। অবজেক্টিভ↑ লেন্সের ভিতর দিয়ে

দৃশ্য বস্তুর প্রতিবিম্ব এই 'আইপিস' লেন্সের মধ্য দিয়ে প্রতিসরিত হয়ে বর্ধিতাকারে দর্শকের চোখে এসে প্রতিফলিত হয়।

আইডিয়াল গ্যাস (ideal gas) — আদর্শ গ্যাস। বায়বীয় পদার্থের আয়তন, চাপ ও তাপের পারস্পিরক সম্বন্ধ বিভিন্ন সূত্রানুযায়ী (চার্লস-ল ও বয়েল্‌স-ল ↑) সাধারণতঃ নির্ধারিত হয়; কিন্তু অতি সতর্ক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, সূত্রগুলি সর্বত্র সম্পূর্ণ খাটে না, বিভিন্ন গ্যাসে কিছু-কিছু ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়ে থাকে। তথাপি নানা রকম রাসায়নিক তথ্য প্রকাশের সুবিধার জন্যে ঐ সব সূত্র নির্ভুল ধরে নিয়ে বিজ্ঞানীগণ শেষে আদর্শ গ্যাসের কল্পনা করেছেন, যাতে ঐসব সূত্র যেন সম্পূর্ণরূপে খাটে। প্রকৃতপক্ষে, এরূপ কোন আদর্শ, বা আইডিয়াল গ্যাস দুর্লভ; হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন গ্যাস কতকটা এর কাছাকাছি। এই কাল্পনিক 'আইডিয়াল গ্যাস'কে কখন কখন **পারফেক্ট গ্যাস**-ও বলা হয়।

আইনস্টাইন, অ্যালবার্ট (Einstein) — ইহুদী বংশীয় বিশ্ববিশ্রুত জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী; জন্ম জার্মানীর উলম সহরে 1879 খৃঃ, মৃত্যু 1955 খৃঃ। বাল্যকাল কাটে মিউনিকে,—শিক্ষা-সমাপ্তি সুইজারল্যাণ্ডের জুরিখে। গণিতে অপূর্ব প্রতিভা; পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণায় আত্মনিয়োগ। গতিবিদ্যা, তাপ-বিজ্ঞান, মহাকর্ষ শক্তি প্রভৃতি বিষয়ে মূল্যবান গবেষণা। 1905 খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানে যুগান্তকারী তথ্য 'আপেক্ষিকতা বাদ' প্রকাশ এবং পদার্থ ও শক্তির অভিন্নতা প্রতিপাদনেই সমধিক প্রসিদ্ধি; সারা পৃথিবীর স্বীকৃতি ও সম্মান। 1921 খৃষ্টাব্দে ফটো-ইলেক্‌ট্রিসিটি ↑ সম্বন্ধীয় গবেষণার জন্য পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ। বার্লিনে কাইজার উইলহেল্‌ম ইনষ্টিটিউটে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ডিরেক্টর। অবশেষে 1933 খৃষ্টাব্দে নাৎসী অত্যাচারে গোপনে জার্মানী ত্যাগ, বিভিন্ন দেশ ঘুরে শেষে আমেরিকার প্রিন্সটনে বসতি স্থাপন এবং তত্রত্য ইনষ্টিটিউটে অধ্যাপনা। প্রিন্সটনের হাসপাতালে 76 বছর বয়সে লোকান্তর।

আয়োডিন (iodine) — গাঢ় ধূসর বর্ণের কঠিন একটি মৌলিক পদার্থ। পারমাণবিক ওজন 126·92, পারমাণবিক সংখ্যা 53; সামান্য উদ্বায়ী পদার্থ, হাওয়ায় উন্মুক্ত রাখলে বেগুনী রংয়ের ধূমে পরিণত হয়ে উবে যায়। জলে প্রায় গলে না; কিন্তু অ্যালকোহলে ↑ সঙ্গে সঙ্গে গলে যায়,—এই দ্রবকে বলে **টিংচার-আয়োডিন,** যা কাঁটা-ছেড়ায় জীবাণু-প্রতিরোধক হিসেবে লাগানো হয়। বিভিন্ন সামুদ্রিক গুল্মে ও চিলি সল্ট-পিটার ↑ নামক একটি খনিজে যৌগিকের আকারে পাওয়া যায়, এবং তা থেকে বিশুদ্ধ আইয়োডিন পৃথক করা হয়। বিভিন্ন পদার্থের সঙ্গে এর রাসায়নিক মিলনে বিভিন্ন **আইয়োডাইড** সল্ট সৃষ্টি হয়। অনেক খাদ্যবস্তুতে সামান্য আইয়োডিন থাকে; খাদ্যে এর ক্রমাগত অভাবে গলগণ্ড রোগ জন্মে। বিভিন্ন আইয়োডাইড সল্ট ঔষধ হিসেবে ও আলোকচিত্র (ফোটোগ্রাফি ↑) শিল্পে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়।

আইস (ice) — বরফ ; জলের কঠিন অবস্থা। তাপ হ্রাস পেয়ে 0° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে ↑ নেমে এলে জল জমে কঠিন বরফে পরিণত হয়। জল জমলে আয়তনে বাড়ে,—কাজেই হাল্কা হয়ে বরফ জলের উপর ভেসে থাকে ; নীচের জলে জলচর জীব স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করে বেঁচে থাকতে পারে। তীব্র শীতপ্রধান অঞ্চলের স্বাভাবিক তাপেই জল জমে বরফ হয়। আবার, রেফ্রিজারেটর ↑ প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে কৃত্রিম উপায়েও বরফ তৈরী করা যেতে পারে।

আইস্‌ল্যাণ্ড স্পার (iceland spar) — এক রকম প্রস্তর বিশেষ ; স্বচ্ছ স্ফটিকাকার ক্যালসিয়াম কার্বনেট ↑। পদার্থটির একটা বিশেষ ধর্ম হলো এই যে, এর ভিতর দিয়ে পরিচালিত করলে আলোক-রশ্মি পোলারাইজ্‌ড ↑ হয়ে যায়, অর্থাৎ আলোকের তরঙ্গ-ধারা সব সামতলিক ও একমুখী হয়ে পড়ে। আলোক তরঙ্গের এইরূপ গতি-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাকে বলা হয় 'পোলারাইজিং এফেক্ট'। আইস্‌ল্যাণ্ড স্পারের মধ্যে আবার আলোক-রশ্মির একাধিক প্রতিসরণও কখন-কখন হয়ে থাকে। এ-সব বৈশিষ্ট্যের জন্যে আলোক-বিজ্ঞানের যন্ত্রাদিতে এর ক্রিষ্টাল ↑ বহুল ব্যবহৃত হয়।

আইস্‌ল্যাণ্ড স্পার

আইস্‌-পয়েণ্ট (ice-point) — বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক চাপে ঠিক যে-তাপমাত্রায় জল জমে বরফ হতে স্বরু করে ; অন্য কথায় বলা যায়, যে তাপমাত্রায় (টেম্পারেচার ↑) বরফ গলতে স্বরু করে, অর্থাৎ বরফের গলনাংক। বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক চাপে (ব্যারোমিটার ↑) এই তাপমাত্রা হলো 0° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ↑।

আইসোগোনিক লাইন (isogonic line) — পৃথিবীর ভৌগোলিক উত্তর ও চুম্বকীয় উত্তরের (ম্যাগ্নেটিক নর্থ ↑) মধ্যবর্তী কৌণিক ব্যবধান (ম্যাগ্নেটিক ডিভিয়েশন ↑) যে সব স্থানে সমান, মানচিত্রে তাদের সংযোজক রেখা। সম-চৌম্বক রেখা।

আইসোটোপ (isotope)— বিশেষ বিশেষ অবস্থায় কোন-কোন মৌলিক পদার্থের কতকগুলো পরমাণুর ওজন বদলে যায়, অথচ পারমাণবিক সংখ্যা সমান থাকে। এরূপ পরমাণুর সমবায়ে গঠিত পদার্থকে ওই মৌলিক পদার্থের আইসোটোপ বলা হয়। আইসোটোপের পারমাণবিক ওজন ব্যতীত আর সব রকম রাসায়নিক ধর্ম সর্বাংশে ওই মৌলিক পদার্থের অনুরূপই থাকে। আবার একই মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন পারমাণবিক ওজনের বিভিন্ন আইসোটোপ হতে পারে। বস্তুতঃ পরমাণুর কেন্দ্রীনস্থ নিউট্রন ↑ সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির ফলেই আইসোটোপের স্বষ্টি হয়। যে-সব পরমাণুর কেন্দ্রীনে সমসংখ্যক নিউট্রন থাকে তারা হয় সমগোত্রী আইসোটোপ। অনেক স্বাভাবিক মৌলিক পদার্থের মধ্যে তার বিভিন্ন আইসোটোপ মিশ্রিত থাকতে পারে ; বিভিন্ন যান্ত্রিক কৌশলে আইসোটোপ তৈরীও করা যায়।

আইসোটোপিক ওয়েট (isotopic weight)—অক্সিজেন গ্যাসের আই-

সোটোপের ওজন 16 ধরে নিয়ে কোন মৌলিক পদার্থের নির্দিষ্ট আইসোটোপের পারমাণবিক ওজন তুলনা করা হয়। কোন আইসোটোপের এই তুলনামূলক পারমাণবিক ওজনকে বলা হয় আইসোটোপিক ওয়েট। এই ওজন প্রায়ই পূর্ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়ে থাকে; একে আইসোটোপের মাস্ ↑ (mass), বা ভর-সংখ্যাও বলা হয়।

আইসোক্রোনাস (isochronous) — সমকালব্যাপী; যেমন, পেণ্ডুলামের ↑ দোলন-কাল। পৃথিবীর আহ্নিক গতির ব্যাপ্তিকালও (সিডিরিয়াল ডে ↑) সর্বদা সমান, অর্থাৎ আইসোক্রোনাস।

আইসোটোনিক (isotonic) — সম অস্‌মস্‌-শক্তি বিশিষ্ট (অস্‌মোসিস ↑); যেমন— 'আইসোটোনিক লিকুইডস' হলো, যে-সব তরলের দ্রবে দ্রাবক ও দ্রাব্যের আণবিক অনুপাত সমান থাকে, অর্থাৎ সমান আণবিক ঘনত্ব-বিশিষ্ট হয়। অধিক ঘনত্ববিশিষ্ট দ্রবে অল্প ঘনত্বের দ্রব থেকে তরল দ্রাবক ধীরে ধীরে অভিস্রাবিত হয়ে গিয়ে ক্রমে উভয়ের ঘনত্বের সাম্যাবস্থা আসে এবং দ্রব দু'টি ধীরে ধীরে 'আইসো টোনিক' হ'য়ে যায়।

আইসোট্রন (isotron)—যে যন্ত্রের সাহায্যে তড়িৎ-চুম্বকীয় বল-ক্ষেত্রের প্রভাবে কোন পদার্থ থেকে তার হাল্‌কা ও ভারী বিভিন্ন প্রকার আইসোটোপ ↑ সব একে-একে পৃথক করা সম্ভব হয়ে থাকে।

আইসোট্রপিক (isotropic) — যে সব পদার্থের শক্তি, বা ধর্ম (যেমন, তাপের তারতম্যে আয়তনের হ্রাস-বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ-পরিবহন ক্ষমতা প্রভৃতি) সর্বত্র সব দিকেই সমান; যেমন— কাঁচকে বলা হয় আইসোট্রপিক পদার্থ; কিন্তু কাঠ আইসোট্রপিক নয়।

আইসোথার্ম (i s o t h e r m) — আবহাওয়া-নির্দেশক মানচিত্রে, অথবা নক্সায় সাধারণ বায়ুমণ্ডলীয় সমান তাপবিশিষ্ট বিভিন্ন স্থান যে সকল রেখা টেনে দেখানো হয়। আঞ্চলিক সম-তাপ রেখা। এদের **আইসোথার্মাল লাইন্‌স**-ও বলে।

আইসোথার্মাল লাইন (isothermal line) — আইসোথার্ম ↑ ।

আইসোথার্মাল চেঞ্জ (isothermal change) — সমতাপাংক পরিবর্তন; যে পরিবর্তনে পদার্থের তাপ, বা উষ্ণতার কোন হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না; যেমন—অতি মন্থর গতিতে কোন গ্যাসের আয়তন সম্প্রসারিত করলে তার উষ্ণতার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় না (যেমন হয় দ্রুত সম্প্রসারণ, বা সংকোচনে)। কোন কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়ও এরূপ আইসোথার্মাল চেঞ্জ, বা সমতাপ-পরিবর্তন অনেক ক্ষেত্রে লক্ষিত হ'য়ে থাকে।

আইসোপোডা (i s o p o d a)— সামুদ্রিক জীবের এক বিশেষ শ্রেণী; ক্ষুদ্র থল্‌থলে দেহ, বাইরে কোন কঠিন খোলা, বা আবরণ এ দে র থাকে না (প্রোটোজোয়া ↑)।

আইসোপ্রিন (isoprene) — জৈব রাসায়নিক পদার্থ, C_5H_8; উদ্ভিজ্জ রাবারের ↑ গুণ ও ধর্ম এই উপাদানের উপরে নির্ভরশীল। আইসোপ্রিনের অণুগুলি পরস্পর শৃঙ্খলিত অবস্থায় সংবদ্ধ হ'য়ে প্রাকৃতিক পলিমারিজেসন ↑ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিজ্জ রাবার উৎপন্ন

হয়। রাসায়নিক উপায়ে আইসো-প্রিনের পলিমারিজেসন ঘটিয়ে কৃত্রিম রাবার তৈরি করাও সম্ভব হয়েছে।

আইসোবার (isobar)—আবহাওয়া নির্দেশক মানচিত্রে যে সকল রেখা টেনে অনুরূপ বায়বীয় (বায়ুমণ্ডলের) চাপবিশিষ্ট স্থানসমূহ প্রদর্শিত হয়। মানচিত্রের আঞ্চলিক সম-চাপরেখা।

আইসোবারস (isobars) — সমান পারমাণবিক ওজনের বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের আইসোটোপ↑; অর্থাৎ বিভিন্ন মৌলের সমগোত্রীয় ও সমান ওজনের আইসোটোপ সমূহ। এদের পারমাণবিক সংখ্যা (অ্যাটমিক নাম্বার↑) বিভিন্ন, কিন্তু আইসো-টোপিক ওয়েট↑ সমান ; যেমন, টিন ধাতুর একটা আইসোটোপ হলো $_{50}Sn^{115}$; আর, ইণ্ডিয়াম↑ধাতুর একটা আইসোটোপ $_{49}In^{115}$; কাজেই এদের বলা হয় আইসোবারস। এখানে 115 হলো পারমাণবিক ওজন, আর 50 ও 49 হলো পার-মাণবিক সংখ্যা।

আইসোমর্ফিজ্ম (isomorphism) — একই রূপ রাসায়নিক গঠন ও একই কেলাসন (দানাবাঁধা) আকারে থাকার ভৌত অবস্থা। আণবিক গঠনে ও ক্রষ্টালিজেসনে↑এই সাম্য-ভাব যে পদার্থের সর্বত্র একই রূপ থাকে তাকে বলে **আইসোমর্ফাস** পদার্থ; যেমন—বিভিন্ন শ্রেণীর ফিট্‌-কারি, অর্থাৎ অ্যালাম↑হলো আই-সোমর্ফাস।

আইসোমার (isomar) — যে সব রাসায়নিক পদার্থের অণুগুলো সমান সংখ্যক ও সমপর্যায়ের বিভিন্ন পরমাণুর সমবায়ে গঠিত হয়েও পরমাণুগুলোর সংস্থান বা, পারস্পরিক সংযোগের বিভিন্নতার জন্যে বিভিন্ন গুণ ও ধর্মবিশিষ্ট হয়, তাদের বলে পরস্পরের আইসোমার। যেমন, অ্যামোনিয়াম সায়েনেটের↑ আণবিক সূত্র হলো NH_4CNO, আবার, ইউরিয়া↑ হলো $CO(NH_2)_2$; এরা একই প্রকার বিভিন্ন মৌলের সমান সংখ্যক পরমাণু সংযোগে গঠিত হয়েও পারমাণবিক সংস্থানের বিভিন্নতার জন্যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন গুণ ও ধর্মবিশিষ্ট পদার্থ হয়েছে। এই দু'টি যৌগ হলো পরস্পর পরস্পরের আইসোমার। যৌগের অণুর গঠনে সংগঠক পরমাণুর এরূপ সংস্থান-বৈচিত্র্যকে বলে **আইসোমেরিজ্ম**।

আইসোসেলিস ট্র্যায়েঙ্গেল (isosceles triangle) — সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ; জ্যামিতিতে যে ত্রিভুজের দু'টি বাহু হয় পরস্পর সমান। চিত্রে ABC সম-দ্বিবাহু ত্রিভুজের AB ও AC বাহুদ্বয় সমান।
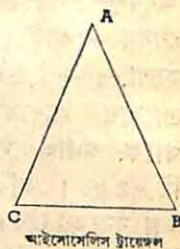
আইসোসেলিস ট্র্যায়েঙ্গল

আইসোহেল (isohel) — পৃথিবীর যে সব স্থানে সম পরিমাণ সূর্যকিরণ (রৌদ্র) পড়ে, অর্থাৎ সমান সৌর তাপ বিকিরিত হয়। 'আইসো' মানে সমান ; 'হেলাস' সূর্যকিরণ।

আইসোহেলাইন (isohaline) — সমুদ্রের যে সকল স্থানের জল সমান লবণাক্ত।

আইসোহেইট (isohyet) — ভূ-পৃষ্ঠের যে সকল স্থানে সমপরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়।

আউন্স (o u n c e) — ওজন ও আয়তন পরিমাপের বৃটিশ একক পরিমাণ। কঠিন বস্তুর ওজন নির্ধারণে অ্যাভয়ড্রুপয়েজ ↑ . আউন্স = 437·5 গ্রেন ↑, বা 28·3 গ্র্যাম ↑ বুঝায় ; ট্রয় আউন্স = 480 গ্রেন, বা 31·1 গ্র্যাম। আবার তরল পদার্থের আয়তন পরিমাপে 'ফ্লুইড আউন্স' = 8 ড্রাক্‌ম = 28·43 সি. সি. ↑।

আফ্‌টার-ড্যাম্প (after-damp)— মিথেন(CH_4)গ্যাসকে বলে **ফায়ার-ড্যাম্প** ↑ ; কয়লার খনিতে আবদ্ধ এই মিথেন গ্যাস সহসা জ্বলে উঠে যে বিস্ফোরণ ঘটায় তাতে কার্বন-মনক্সাইড ও অন্যান্য কোন-কোন দূষিত বিষাক্ত গ্যাসের উদ্ভব হয়। বিস্ফোরণের ফলে খনির গহ্বরে উৎপন্ন এইরূপ সব বিষাক্ত গ্যাসের সংমিশ্রণকে বলে 'আফ্‌টার-ড্যাম্প'।

আম্ব্রা (umbra) — আলোক-রশ্মি কোন অস্বচ্ছ পদার্থে বাধা পেলে ওই বাধার পশ্চাদ্ভাগে একটা গাঢ় অন্ধকার ছায়া পড়ে। এই ছায়ার চারধারে আঁধা অন্ধকার সৃষ্টি হয়ে থাকে। মাঝখানের ঐ
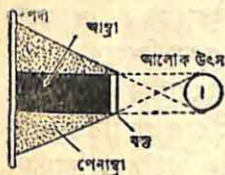
গাঢ় অন্ধকার ছায়াকে বলে আম্ব্রা ; আর চার-ধারের স্বল্প আলোকিত ছায়াকে বলে **পেনাম্ব্রা**।

আয়ন (ion) — তড়িতাবিষ্ট পরমাণু, বা পরমাণু-সমষ্টি। কোন মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াসের চারদিকে যতগুলি ইলেকট্রন ↑ (অ্যাটমিক স্ট্রাক্‌চার ↑) থাকলে তা বৈদ্যুতিক-সমতা লাভ করে তার চেয়ে কম-সংখ্যক ইলেকট্রন থাকলে ওই পরমাণু হয় + ধন-তড়িতাহিত আয়ন (ক্যাটায়ন ↑)। ওই ইলেকট্রন-সংখ্যার আবার আধিক্য ঘটলে সৃষ্টি হয় ঋণ-তড়িতাহিত আয়ন কণিকা (অ্যানায়ন ↑)। বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রন কণিকার সংখ্যার এরূপ হ্রাস বৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন পদার্থের পরমাণু, বা পরমাণু-জোট এরূপ আয়নায়িত হয়ে পড়ে। হাইড্রোজেন ↑ পরমাণুর সংগঠক ইলেকট্রন-কণিকাটি সরিয়ে দিলে তার নিউক্লিয়াসে যে প্রোটন ↑ কণিকাটি থেকে যায় তাই হলো হাই-ড্রোজেন-ক্যাটায়ন। কোন গ্যাসীয় পদার্থের মধ্যে তড়িৎ-স্ফুরণ করলে, অথবা রঞ্জন-রশ্মি ↑, গামা-রশ্মি ↑ প্রভৃতি চালালে তার গ্যাসীয় পরমাণুগুলো ধীরে ধীরে আয়নায়িত (ionised) হয়ে ওঠে।

আয়োনোন (ionone)—বিশেষ এক শ্রেণীর হাইড্রোকার্বন যৌগ ; বিভিন্ন ফল-ফুলের গন্ধযুক্ত বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ-জাত আয়োনোন আছে। কৃত্রিম সুগন্ধের জন্য সাবান প্রভৃতি প্রসাধন-শিল্পে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। আয়রোন ↑ অনুরূপ আর একটি জৈব যৌগিক পদার্থ।

আয়নোস্ফিয়ার (ionosphere)— ভূ-পৃষ্ঠের মোটামুটি 30 থেকে 250 মাইল উচ্চে অবস্থিত আয়নায়িত বায়বীয় স্তর। সূর্যকিরণের তীব্র আলট্রা-ভায়োলেট ↑ রশ্মির প্রভাবে এই স্তরের বায়ু-কণিকাগুলো তড়িতাবিষ্ট (আয়নায়িত) অবস্থায় থাকে। বেতার-তরঙ্গ সোজা মহাশূন্যে চলে না গিয়ে এই স্তরে প্রতিফলিত

হয়ে ক্রমাগত ভূ-পৃষ্ঠের দিকে ফিরে আসে। এর ফলেই পৃথিবীর বহু দূরবর্তী স্থানেও বেতার-তরঙ্গ প্রেরণ করা সম্ভব হয়ে থাকে। পৃথিবীর অ্যাট্‌মস্ফিয়ারের ↑ এই সুগভীর বায়ুস্তরকে আবার **হেভিসাইড লেয়ার** ↑ -ও বলা হয়।

আয়রন (iron) — লৌহ ; কঠিন মৌলিক ধাতব পদার্থ। পারমাণবিক ওজন 55·85, পারমাণবিক সংখ্যা 26। চুম্বকে আকৃষ্ট হয়। বিশুদ্ধ লৌহ অপেক্ষাকৃত নরম ; বিভিন্ন কৌশলে একে সুকঠিন ও কার্যক্ষম করা হয়। কার্বন, বা বিশেষ ধাতব পদার্থ উপযুক্ত পরিমাণে মিশ্রিত করলে লোহার এই বৈশিষ্ট্য জন্মায় (স্টিল ↑)। নরম কাঁচা লোহায় তৈরী জিনিসকে টেম্পার ↑, অর্থাৎ 'পান' দিয়েও তার কাঠিন্য কিছুটা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। পরিমাণ মত কার্বন ↑ মিশিয়ে লোহাকে কঠিন ইস্পাতে পরিণত করা হয়। ম্যাগ্নেটাইট ↑, হেমাটাইট্ ↑, পাইরাইটস্ ↑ প্রভৃতি লৌহ-মিশ্রিত বিভিন্ন খনিজ-প্রস্তর ব্ল্যাষ্ট-ফার্নেসে ↑ গলিয়ে নানা কৌশলে কাঁচা লোহা নিষ্কাশিত হয়। লোহার ল্যাটিন নাম **ফেরাম** ; সাংকেতিক চিহ্ন তাই Fe. বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের জন্যে বিভিন্ন শ্রেণীর লোহা বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে ; যেমন, পিগ্-আয়রন, রট-আয়রন, কাষ্ট-আয়রন ↑ ইত্যাদি।

আয়রন এজ (iron age) — লৌহ যুগ। প্রাগৈতিহাসিক কালকে মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশের তিনটি স্তর, বা যুগ দ্বারা মোটামুটিভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে ; —প্রস্তর-যুগ, তাম্র-যুগ ও লৌহ-যুগ। কিছুটা শিল্প-সমুন্নত যে যুগে মানুষ ক্রমে লৌহের ব্যবহার আয়ত্ব করে। অবশ্য যুগের এই কাল বিভাগ সুনির্দিষ্ট নয় ; কারণ, পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন কালে লোহার ব্যবহার প্রচলিত হয়। ইউরোপে খৃঃ পূর্ব প্রায় 1500 বছর থেকে এই যুগের আরম্ভ বলে ধরা হয়েছে।

আয়রন-লাংস (iron-lungs)—ফুস্‌ফুস্ অকেজো হয়ে মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটলে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে যে-যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। যন্ত্রটা হলো, বাইরের বায়ু-সম্পর্ক-শূন্য একটা সুদৃঢ় বা বাক্সের মত, যার মধ্যে

আয়রণ লাংস
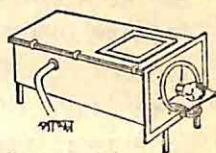
শ্বাস-প্রশ্বাস ঘটিত রোগীকে বিশেষ ব্যবস্থায় শুইয়ে রাখা হয়, মাথাটি অবশ্য বাইরে থাকে। ওই বাক্সের মধ্যস্থ বায়ুর চাপ যান্ত্রিক কৌশলে (পাম্পের সাহায্যে) পর্যায়ক্রমিক ভাবে হ্রাস-বৃদ্ধি করা হয় ; এর ফলে স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়ায় যেমন হয়, তেমনভাবেই রোগীর ফুস্‌ফুস্‌টাও পর্যায়ক্রমে সংকুচিত ও প্রসারিত হতে থাকে, যার ফলে বাইরের বাতাস নাসিকাপথে দেহের মধ্যে প্রবেশ করে ও বেরিয়ে আসে। এই কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় সহজেই রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া চলতে থাকে ও ক্রমে স্বাভাবিক হয়ে আসে। এ-যন্ত্রটাকে আবার আবিষ্কারকের নামানুসারে **'ড্রিঙ্কার অ্যাপারেটাস'**-ও বলা হয়।

আয়রন পাইরাইট (iron pyrite) — একটি লৌহ-আকরিক ; আয়রন

সাল্‌ফাইডের প্রায় বর্গাকার চক্‌চকে স্ফটিকের আকারে পাওয়া যায়।

আয়োরোন (iorone) — সুগন্ধযুক্ত এক প্রকার হাইড্রোকার্বন শ্রেণীর জৈব যৌগিক পদার্থ, সাবান তৈরীতে ব্যবহৃত হয় ; আয়োনোন ↑ জাতীয়।

আর্ক, arc (জ্যামিতিক) — বৃত্তের পরিধির যে-কোন অংশ।

আর্ক, arc (বৈদ্যুতিক) — সামান্য ব্যবধানে রক্ষিত দু'টি তড়িৎ-দ্বারের (ইলেক্ট্রোড ↑) মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহ চালিয়ে যে সুতীব্র বৈদ্যুতিক আলো ও উচ্চ তাপ-শক্তি সৃষ্টি করা যায়। তীব্র আলোর সঙ্গে-সঙ্গে প্রায় 3000° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডেরও বেশী উত্তাপ সৃষ্টি হয়ে থাকে। এর তড়িৎ-দ্বার দুটি সাধারণতঃ হয় গ্যাস-কার্বনের তৈরী। উচ্চশক্তির তড়িৎ-প্রবাহের ফলে বাষ্পীভূত কার্বন-কণিকার ধারা উভয় তড়িৎ-দ্বারের মধ্যস্থ ব্যবধান ঘুচিয়ে দেয়। এই কার্বন-বাষ্পের মাধ্যমে বিদ্যুৎ চলাচল করবার ফলে কার্বনের কণিকাগুলো তড়িতাবিষ্ট হয়ে ওই তীব্র আলোক ও উত্তাপের সৃষ্টি করে। এভাবে কোন-কোন ধাতু নির্মিত তড়িৎ-দ্বারের মধ্যেও বৈদ্যুতিক আর্ক সৃষ্টি করা যেতে পারে।

আর্ক ল্যাম্প (arc lamp) — তীব্র আলোক সৃষ্টির জন্যে বৈদ্যুতিক আর্কের ব্যবহারিক প্রয়োগে যে এক রকম বাতি তৈরী করা হয়। সাধারণতঃ কার্বন আর্কেরই বাতি হয়ে থাকে। বিশেষ যান্ত্রিক ব্যবস্থায় তড়িৎ-প্রবাহ বাড়িয়ে কমিয়ে আলোর তীব্রতারও হ্রাস-বৃদ্ধি করা যেতে পারে। আবার, পারদের সাহায্যেও এক রকম আর্ক-ল্যাম্প তৈরী হয়, এতে পারদই তড়িৎ-দ্বারের কাজ করে।
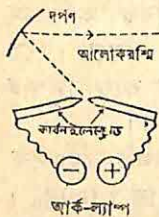
দর্পণ
আলোকরশ্মি
কার্বন ইলেক্ট্রোড
আর্ক-ল্যাম্প

আর্কটিক রিজিয়ন (arctic region) — সুমেরু-অঞ্চল ; পৃথিবীর উত্তর মেরুকে বেষ্টন করে 66½° উত্তর-অক্ষাংশ (ল্যাটিচিউড ↑) পর্যন্ত বিস্তৃত চির তুষারাবৃত ভূ-খণ্ড। গ্রীনল্যাণ্ড, স্পিটস্‌বার্জেন, অ্যালেস্‌মার দ্বীপগুলি এই অঞ্চলের অন্তর্গত আর্কটিক, বা সুমেরু-সাগরে অবস্থিত। দক্ষিণমেরু অঞ্চলকে বলা হয় **অ্যাণ্টার্কটিক রিজিয়ন**, বা 'অ্যাণ্টার্টিকা'।

আর্ক সাইন (arc sine) — ত্রিকোণমিতিতে কোন সমকোণী ত্রিভূজের লম্ব ও অতিভূজের অনুপাতকে বলে ভূমিসংলগ্ন সূক্ষ্ম কোণের **সাইন** ; প্রদত্ত
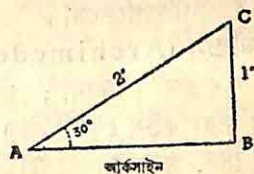
আর্কসাইন

চিত্রে CAB (30° ডিগ্রি) কোণের সাইন = BC : AC, সংক্ষেপে সাইন 30° = ½ ; এই উক্তিকে আবার ঘুরিয়ে বলা যায়, যে-কোণের 'সাইন ½' তার পরিমাণ 30° ডিগ্রি। একে সংক্ষেপে প্রকাশ করা যায় : 30° = আর্ক সাইন ½, অথবা সাইন $^{-1}$ ½ ($\sin^{-1}\frac{1}{2}$); সুতরাং 'আর্ক সাইন A' হলো সেই কোণ যার সাইন হলো A; মোটামুটিভাবে বলা যায়, সাইনের বিপরীত 'আর্ক সাইন', যাকে অন্য কথায় বলে 'সাইন ইন্‌ভার্স'।

আর্কি (archae) — অতি পুরাতন, বহু প্রাচীন ; যেমন — **আর্কিয়ান**

রক হলো লক্ষ লক্ষ বছরের অতি প্রাচীন সুকঠিন প্রস্তর।

আর্কি (arche) — প্রারম্ভ, প্রথম। **আর্কিটাইপ** মানে প্রথম নমুনা, বা মডেল ; যেমন—'আর্কিটাইপ এরোপ্লেন' হলো কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীর মডেলের যে বিমানপোতটি প্রথম তৈরি হয়েছে এবং পরে যার অনুকরণে সেই মডেলের অসংখ্য বিমানপোত তৈরি করা হবে।

আর্কিঅপ্টারিক্স (archaeopteryx) — শিলীভূত জীবাশ্ম (ফোসল ↑) দেখে অতি প্রচীন যুগের যে অধুনালুপ্ত বৃহদাকার পক্ষীর অস্তিত্ব জানা গেছে। পৃথিবীর প্রাচীন পক্ষিকুল।

আর্কিপেলেগো (archipelago) — দ্বীপপুঞ্জ ; বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের কাছাকাছি একত্র সমাবেশ ; যেমন — হাওয়াই আর্কিপেলেগো।

অর্কিমিডিস (Archimedes) — গ্রীক গণিতজ্ঞ বিজ্ঞানী ; জন্মস্থান গ্রীসের সিরাকিউস (সিসিলি)। জন্ম খৃঃ পূঃ 287, মৃত্যু খৃঃ পূঃ 212 অব্দ। জ্যামিতি, যন্ত্র-বিদ্যা, জল-বিজ্ঞান প্রভৃতিতে অসামান্য দান,—সে-যুগের বিস্ময়। তরল পদার্থের প্লবতা (বয়্যান্সি ↑) বিষয়ক 'আর্কিমিডিস প্রিন্সিপল' ↑ নামক তথ্যাবিষ্কারে প্রসিদ্ধি। উচ্চে জলোত্তলনের জন্যে 'আর্কিমিডিস স্ক্রু' নামক যন্ত্র প্রভৃতির উদ্ভাবক।

আর্কিমিডিস প্রিন্সিপ্‌ল (Archimedes' principle)—তরল পদার্থের প্লাবতা সম্পর্কে বিজ্ঞানী আর্কিমিডিসের আবিষ্কৃত তথ্য। তথ্যটি হলো এই যে, কোন তরল পদার্থের মধ্যে আংশিক, বা সম্পূর্ণভাবে কোন বস্তু নিমজ্জিত করলে যতটা তরল পদার্থ স্থানচ্যুত হয়, তার ওজনের সমান ওজন সেই বস্তু দৃশ্যতঃ হারায়, নিমজ্জিত বস্তুটা হাল্‌কা মনে হয়। নিমজ্জিত অবস্থায় বস্তুর সমায়তন তরল পদার্থের ওজন ওই বস্তুর প্রকৃত ওজন থেকে দৃশ্যতঃ কমে যায়। নিমজ্জিত বস্তুর উপরে তরল পদার্থের উর্ধ্বচাপের ফলেই এরূপ ঘটে। একেই বলে তরল পদার্থের প্লাবতা, বা বয়েন্‌সি ↑। কোন বস্তুর আয়তন, ঘনত্ব প্রভৃতি এই তথ্যের সাহায্যে সহজেই নির্ণীত হয়ে থাকে।

আর্কিয়োলজি (archaeology) — প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা বিজ্ঞান। প্রাগৈতিহাসিক মানব-সভ্যতার বিভিন্ন নিদর্শন (প্রাচীন অলঙ্কার, তৈজসপত্র, কারুশিল্প, বাসগৃহ প্রভৃতি) পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করে মানবজাতির ক্রমবিকাশের ধারা ও কাল নিরূপণের বৈজ্ঞানিক গবেষণা-বিদ্যা।

আঙ্গিওলেটা (angioleta) — ক্ষুর-সমন্বিত পদবিশিষ্ট প্রাণিকুল ; যেমন —ঘোড়া, গরু, ছাগল প্রভৃতি।

আর্গ (erg) — বল-বিদ্যায় শক্তি পরিমাপের একক বিশেষ। শক্তি প্রয়োগে জড় পদার্থে যে কর্মক্ষমতা প্রকাশ পায় তার পরিমাপ। 'সি. জি. এস.' মাপে এক ডাইন ↑ শক্তির প্রভাবে এক সেন্টিমিটার ↑ দূরত্ব অতিক্রম করতে (এক গ্র্যাম বস্তুতে) যে পরিমাণ গতীয় শক্তির কাজ নিষ্পন্ন হয় তাই হলো এক আর্গ।

আর্গন (argon) — একটি মৌলিক গ্যাস ; বায়ুমণ্ডলে সামান্য (0·9%) পরিমাণে আছে। গ্যাসটি নিষ্ক্রিয়, অর্থাৎ কোন পদার্থের সঙ্গেই এর

রাসায়নিক মিলন ঘটে না (ইনার্ট গ্যাস ↑)। বিজলী বাতির বাল্‌ব সাধারণতঃ এই গ্যাসে ভর্ত্তি করা হয়। (ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌ব ↑)।

আর্গল (argol) — ঈষৎ লালাভ স্ফটিকাকার কঠিন পদার্থ ; এর প্রধান উপাদান হলো পটাসিয়াম হাইড্রোজেন-টার্টারেট। একে সাধারণতঃ **টার্টার**-ও বলা হয়ে থাকে। ফার্মেন্টেসন ↑ প্রক্রিয়ায় মদ্য প্রস্তুতির সময় মদ্য-ভাণ্ডের তলায় এই পদার্থ আপনা থেকে উৎপন্ন হয়ে সঞ্চিত হয়ে থাকে।

আর্জেণ্টাইট (argentite) — খনিজ সিল্‌ভার-সাল্‌ফাইড, Ag_2S ; রৌপ্য ও গন্ধকের একটি যৌগিক পদার্থ। সাধারণতঃ এই খনিজ থেকেই রৌপ্য নিষ্কাশিত হয়ে থাকে। একে **সিল্‌ভার-গ্ল্যান্স**-ও বলে। কোন ধাতুর সঙ্গে রৌপ্য মিশ্রিত থাকলে তাকে বলে 'আর্জেন্টিফেরাস মেটাল'।

আর্টারি (artery) — ধমনী ; রক্তবহা নালী। হৃৎপিণ্ডের বাম প্রকোষ্ঠ থেকে যে নালীপথে বিশুদ্ধ রক্ত সর্বদেহে সঞ্চালিত হয়। ঐ রক্ত দেহের সর্বত্র জীব-কোষগুলিকে অক্সিজেন ↑ জুগিয়ে সঞ্জীবিত করে এবং তাদের নিঃসৃত দূষিত পদার্থ নিয়ে অবিশুদ্ধ রক্ত শিরা (ভেন ↑) পথে ফুস্‌ফুসের ভিতর দিয়া বিশুদ্ধ হয়ে আবার হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ প্রকোষ্ঠে ফিরে আসে। হৃৎপিণ্ড থেকে রক্তের বহির্গমন-নালী পথ হলো ধমণী, বা 'আর্টারি', আর প্রত্যাগমন-নালী পথকে বলে শিরা, বা 'ভেন' ↑ ।

আর্টিকুলেটেড স্কেলিটন (articulated skeleton) — মৃত দেহের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল অস্থি যথাস্থানে যথাযথভাবে সংলগ্ন করে গঠিত কৃত্রিম নর-কঙ্কাল। শারীরবৃত্ত শিক্ষায় যেরূপ কঙ্কাল শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন হয়।

আর্টিফিসিয়াল সিল্ক (artificial silk) — রেয়ন ↑ , ভিস্কোজ ↑ ।

আর্টিসিয়ান ওয়েল (artesian well) — আর্তেজীয় কূপ ; এক ধরনের কৃত্রিম প্রস্রবণ বিশেষ। ভূ-গর্ভের কোথাও কোথাও দু'টি অপ্রবেশ্য শিলাস্তরের মাঝে একটি প্রবেশ্য শিলাস্তর অর্ধ চন্দ্রাকারে বিন্যস্ত থাকে ; যার প্রান্তদ্বয় ভূ-পৃষ্ঠ পর্যন্ত পৌছালে বৃষ্টির জল ভিতরে প্রবেশ করে ঐ প্রবেশ্য স্তরটি জলে পরিপূক্ত হয়। এরূপ স্থানের ভূ-পৃষ্ঠে প্রবেশ্য স্তর পর্যন্ত কূপ খনন করলে প্রস্রবণের ন্যায় জল সবেগে উঠতে থাকে। এরূপ কূপ প্রথমে ফ্রান্সের আর্তোয়া নামক স্থানে খনিত হয়েছিল বলে একে 'আর্তেজীয় কূপ' বলা হয়। অষ্ট্রেলিয়ায় এরূপ কূপ অনেক খনিত হয়েছে। এর জল ক্রমাগত উঠে অযথা যাতে নষ্ট না হয় যান্ত্রিক ব্যবস্থায় তার উপায় করাও সম্ভব হয়েছে।

আর্টিসান ওয়েল

আর্থ (earth) — পৃথিবী ; সূর্য থেকে দূরত্বের ক্রম অনুসারে সৌর পরিবারের তৃতীয় গ্রহ। মঙ্গল (মারস ↑) ও শুক্র (ভেনাস ↑) গ্রহদ্বয়ের মধ্যবর্তী নির্দিষ্ট উপবৃত্তীয় কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। প্রায় গোলাকার ; নিরক্ষীয় ব্যাস 7,926·7 মাইল, মেরু-প্রসারী ব্যাস 7,900 মাইল ; কাজেই

উত্তর-দক্ষিণে কিছু চাপা। ভূ-পৃষ্ঠের আয়তন মোটামুটি 19,68,00,000 বর্গ মাইল ; নিরক্ষীয় পরিধি 24,902 মাইল ; ওজন প্রায় 6×10^{21} টন।

আর্থ, বা পৃথিবীর গতি দ্বি-বিধ—আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি। উপ-বৃত্তীয় কক্ষপথে ঘণ্টায় 66,000 মাইল বেগে বছরে, অর্থাৎ 365 দিন 6 ঘণ্টা 9 মিনিটে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করছে। সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর এই উপবৃত্তীয় কক্ষ-পথ প্রায় 580 লক্ষ মাইল। পৃথিবী স্বীয় অক্ষের চারদিকে 23 ঘণ্টা 56 মিনিটে (সিডিরিয়্যাল-ডে ↑) পূর্ণ এক পাক ঘোরে, যার ফলে দিন-রাত্রি হয়। সূর্য থেকে দূরত্ব গড়ে 9,25,00,000 মাইল। পৃথিবীর দৈনিক ঘূর্ণনের অক্ষ বার্ষিক গতির কক্ষপথের সঙ্গে নিয়ত 23·5° ডিগ্রি কোণে সর্বদা একই দিকে হেলে থাকে; এর ফলে ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন সময়ে সূর্য থেকে দূরবর্তী ও নিকটবর্তী হয় এবং বছরের বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ঋতু পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে।

আর্থ (earth)—মৃত্তিকা, মাটি। চূর্ণিত প্রস্তর, বালুকা, উদ্ভিজ্জ পদার্থাদির সংমিশ্রণে গঠিত ; যাতে কৃষিকার্য হয়, উদ্ভিদাদি জন্মায়, বিভিন্ন জীবাণু বেঁচে থাকে। ক্রমাগত রোদ ও বৃষ্টিজনিত শিলাক্ষয়ে ও বিভিন্ন জীবাণুর প্রভাবে নানা অজৈব পদার্থের বিবর্তনে মৃত্তিকার উৎপত্তি। নানারকম জৈব ও অজৈব পদার্থও সূক্ষ্ম কণিকায় এর সঙ্গে সংমিশ্রিত রয়েছে।

আর্থ-ওয়ার্ম (e a r t h-worm) — কেঁচো ; সরু, দীর্ঘাকার মৃত্তিকাভোজী অ-মেরুদণ্ডী প্রাণী। দেশে দেশে শ্রেণী ও গোষ্ঠির বিভিন্নতা আছে ; গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে ঊর্ধ্বে 2—3 ফুট এবং শীতপ্রধান দেশে কোথাও কোথাও 10 ফুট দীর্ঘ দেখা যায়। এদের দীর্ঘ দেহ পর-পর সংলগ্ন কতকগুলি নরম আংটির মত দেহ-খণ্ডকে গঠিত। এজন্য এদের 'অঙ্গুরীমাল', বা **অ্যানিলিডা** (annelida) ↑ পর্বের জীব বলা হয়। লম্বা দেহের এক প্রান্তে মুখ ও অপর প্রান্তে এদের পায়ু। মৃত্তিকাভ্যন্তরে থেকে মৃত্তিকাই খায় ; আর তার মধ্যস্থ উদ্ভিজ্জ পদার্থাদি জীর্ণ করে বিশুদ্ধ ও অতিমসৃণ মৃত্তিকা পায়ু-পথে নিঃসরিত করে উপরে তোলে। এভাবে নীচের মাটি উপরে তুলে হিউমাস ↑ গঠনে সাহায্য করে' এরা মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধি করে। হিসাব করে দেখা গেছে, প্রতি একরে ↑ পঞ্চাশ হাজার কেঁচো থাকলে বছরে তারা 10 টন মাটি নিচে থেকে উপরে তুলে আনতে পারে। কৃষিকার্যে পরম হিতকারী।
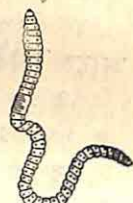
আর্থ ওয়ার্ম

আর্থ-কোয়েক (earth-quake) — ভূমিকম্প। ভূ-গর্ভের উত্তপ্ত ও তরল পদার্থাদির সংকোচন-আলোড়নের ফলে, বা আগ্নেয়োৎপাতের দরুণ ভূ-পৃষ্ঠের কঠিন শিলাস্তরের প্রকম্পন ও আন্দোলন। মৃদু স্থানীয় কম্পন, বা সুদূর-প্রসারী প্রবল ও ধ্বংসকারী প্রকম্পন পৃথিবীর নানা স্থানে ঘটে। ভূ-স্তরের অগভীর দুর্বল অঞ্চল বরাবর আঞ্চলিক ধারায়ই প্রায়শঃ ভূমিকম্প ঘটে থাকে। প্রশান্ত মহাসাগর, দক্ষিণ এশিয়া ও ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চলেই ভূমিকম্পের প্রাবল্য বেশি ;

অর্থাৎ এ-সব অঞ্চল ভূকম্পন-বলয়ের অন্তর্গত। অতি মৃদু ভূ-কম্পনও সিস্‌মোগ্রাফ ↑ (seismograph) যন্ত্রে পরিলক্ষিত হয়। ভূমিকম্পের প্রাকৃতিক কারণ, স্থানীয় অবস্থা ও বিবরণাদি সম্পর্কীয় বিজ্ঞানকে বলা হয় **সিস্‌মোলজি** (seismology)।

আন্‌ডাইন (undine) — তরল ঔষধাদি নির্গমণের বক্র নলমুখ-যুক্ত ছোট শিশি; যা দিয়ে সাধারণতঃ চোখে ফোঁটা কেটে ঔষধ প্রয়োগ করা হয়।

আন্‌ডিন

আর্থ্রাইটিস (arthritis) — দেহের অস্থিসংযোগের স্ফীতি-জনিত যন্ত্রণাদায়ক বাত রোগ বিশেষ। অস্থি-সংযোগে উপাস্থির (কার্টিলেজ ↑) আবরক পর্দায় এক প্রকার জীবাণু সংক্রমণের ফলে এ-রোগের সৃষ্টি হয়। বাংলায় বলে 'গেঁটে বাত'।

আর্থ্রোপোডা (arthropoda) — কঠিন ও পরস্পর সংযুক্ত একাধিক খণ্ড-খোলসে আবৃত-দেহ জীবশ্রেণী; যেমন — কাঁকড়া, বোলতা, চিংড়ি, বিছা প্রভৃতি।

আর্মেচার (armature)— বৈদ্যুতিক মোটর, অথবা ডায়নামো ↑ যন্ত্রে ধাতব, বিশেষতঃ তামার তার-জড়ানো যে যন্ত্রাংশ থাকে। একটা ধাতব দণ্ডের গায়ে বিশেষ ব্যবস্থায় সরু তারের (নির্দিষ্ট কাজের জন্য) নির্দিষ্ট সংখ্যক পাক জড়ানো থাকে। বৈদ্যুতিক পাখা প্রভৃতিতে ওই তারের মধ্য দিয়ে ডি. সি. বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে সাধারণতঃ সমগ্র আর্মেচার-টাই বহিঃস্থ ফিল্ড কয়েলের তড়িৎ-চুম্বকীয় শক্তির প্রভাবে ঘুরতে থাকে।

আর্সেনিক (arsenic) — একটি মৌলিক পদার্থ; পারমাণবিক ওজন 74·91, পারমাণবিক সংখ্যা 33; সাংকেতিক চিহ্ন As; বিষাক্ত পদার্থ, ধূসর বর্ণ, স্ফটিকাকার ও ভঙ্গুর। এক রকম সাদা আর্সেনিকও আছে, যাকে বাংলায় বলে 'সেঁকো'; তীব্রবিষাক্ত। গন্ধকের সংযোগে রিয়েলগার ↑, As_2S_2, অর্পিমেণ্ট ↑, As_2S_3, প্রভৃতি নানা খনিজের আকারে এবং কোথাও-কোথাও বিশুদ্ধ অবস্থায়ও পাওয়া যায়। ঔষধ হিসেবে ও কীট-নাশক পদার্থ তৈরীর কাজে মৌলটি যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন ধাতব পদার্থের সঙ্গে এর রাসায়নিক সংযোগে বিভিন্ন **আর্সেনাইট** সল্ট তৈরী হয়। ধাতুকল্প (মেটালয়েড ↑)।

আল্‌পাকা (alpaca) — দক্ষিণ আমেরিকার এক জাতীয় লোমশ জন্তু বিশেষ; দেখতে অনেকটা ভেড়ার মত; কিন্তু এদের গলা লম্বা, দেহ অতি সুচিক্কণ ঘন পশমে আবৃত থাকে। এদের ওই লোমে তৈরী সূক্ষ্ম সূত্রে বোনা বস্ত্রাদিকেও 'আল্‌পাকা' বলা হয়। এর তৈরী বস্ত্রাদি সুদৃশ্য, মূল্যবান ও বেশ গরম।

আলপাকা

আলট্রা- (ultra-) — পরবর্তী, বা বহির্ভূত অর্থে ব্যবহৃত শব্দ; যেমন, **আলট্রা সর্ট-ওয়েভ** (ultra short wave) — যন্ত্রের মাধ্যমেও শ্রুতি-বহির্ভূত ক্ষুদ্রতম বেতার-তরঙ্গ

(radio waves) ↑, যাদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য 10 মিটারের ↑ কম।

আলট্রাভায়োলেট-রে (ultra violet ray)— অদৃশ্য অতিবেগুনী রশ্মি। সূর্য-রশ্মির বর্ণালিতে দেখা যায় পর-পর সাজানো সাতটা বর্ণরেখা, যার এক প্রান্তে 'ভায়োলেট', বা বেগুনী ও অন্য প্রান্তে লাল। সাদা আলোকের সংগঠক বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের এই সাতটা বর্ণরশ্মির বর্ণালি আমরা দেখতে পাই (স্পেক্ট্রাম ↑)। বেগুনী-রশ্মির পরে যে সূক্ষ্মতর অতিবেগুনী, বা আলট্রাভায়োলেট রশ্মি সৃষ্টি হয় তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এত কম (4×10^{-5} সেন্টিমিটার থেকে 5×10^{-7} সেন্টিমিটার) যে, তা আর মানুষের চোখে ধরা পড়ে না। কিন্তু এই অদৃশ্য রশ্মি ফটোগ্রাফিক প্লেটে ধরা পড়ে (অ্যাক্টিনিক-রে ↑)। সূর্যালোকের এই অদৃশ্য আলট্রাভায়োলেট রশ্মি মানুষের দেহে ভিটামিন-ডি সৃষ্টি করে, নানা রকম চর্মরোগ সারায়। এর আবার বিভিন্ন জীবাণু-নাশক শক্তিও আছে।

আলট্রা-মাইক্রোস্কোপ (ultra-microscope) — এক রকম বিশেষ যান্ত্রিক ব্যবস্থার অণুবীক্ষণ যন্ত্র। এর সাহায্যে সাধারণ মাইক্রোস্কোপ ↑
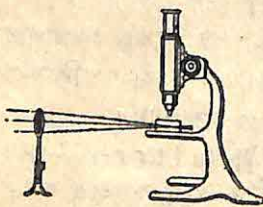
আলট্রা-মাইক্রোস্কোপ

যন্ত্রে অদৃশ্য অতিসূক্ষ্ম পদার্থ-কণিকাও বেশ উজ্জ্বল ও বৃহদাকার দেখায়। এ দিয়ে বিশেষতঃ তরল পদার্থ পরীক্ষা করা হয়। ওই তরল পদার্থের মধ্যে একটা তীব্র আলোক-রশ্মি সংহত করা হয়, যার ফলে তার মধ্যস্থ অতি ক্ষুদ্র অদৃশ্য পদার্থ-কণিকাগুলো বিচ্ছুরিত আলোক-রশ্মির প্রভাবে সাধারণ মাইক্রোস্কোপেই স্পষ্ট দেখা যায়। সাধারণতঃ এরূপ ব্যবস্থার অণুবীক্ষণ যন্ত্রকেই বলা হয় আলট্রা-মাইক্রোস্কোপ। তরল পদার্থের মধ্যে আলোক বিচ্ছুরণের এই ফলাফলকে বলে টিণ্ড্যাল-এফেক্ট ↑।

আলট্রা-ম্যারাইন (ultra-marine) —এক রকম নীল বর্ণের রঞ্জক পদার্থ বিশেষ। চীনামাটি, গন্ধক, সোডিয়াম সাল্ফেট ইত্যাদি মিশিয়ে এ জিনিসটা প্রস্তুত করা হয়। নীল জল-রং হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কাঁচা কাপড়ের হল্দে ছোপ ও চিনির স্বাভাবিক ধূসর বর্ণ দূর করতে এই নীল রঞ্জক পদার্থটা অনেক সময় ব্যবহৃত হয়।

আলট্রাসোনিক ওয়েভ (ultrasonic wave) — যে শব্দ-তরঙ্গের স্পন্দন-সংখ্যা প্রতি সেকেণ্ডে 30,000-এরও বেশী। এরূপ স্পন্দনের শব্দ-তরঙ্গ মানুষের কানে ধরা পড়ে না, অর্থাৎ শ্রুতিগোচর হয় না (অডিবিলিটি লিমিট ↑)। একে **সুপারসোনিক** ↑ ওয়েভ-ও বলে।

আল্না (ulna) — অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থি ; মানুষের হাতের কনুইয়ের পরবর্তী
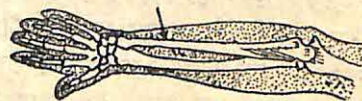
আল্না, বা অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থি

প্রকোষ্ঠাস্থি দুটির পশ্চাদ্বর্তী অপেক্ষা-

কৃত সরু অস্থিখণ্ডটি ; যা ঊর্ধবাহুর প্রগণ্ডাস্থির ('হিউমারাস', humerus ↑) সঙ্গে যুক্ত থাকে। নিম্ন-বাহুর বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থিটি (রেডিয়াস, radius ↑) বৃদ্ধাঙ্গুলীর হাড়ের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে।

ই

ইউক্লিড (Euclid) — গ্রীক গণিতজ্ঞ পণ্ডিত। সুনির্দিষ্ট জন্মকাল অজ্ঞাত, খৃঃ পূর্ব 300 অব্দে আলেকজেন্দ্রিয়ায় অধ্যাপনা করতেন বলে জানা যায়। জ্যামিতি বিদ্যার আবিষ্কারক না হলেও এর প্রভূত উন্নতি সাধন করে সুসংবদ্ধ আকারে 13 খণ্ডে বিভক্ত বিরাট জ্যামিতি গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। এ জন্যে জ্যামিতি, বা রেখা-গণিতের প্রবর্তক বলে আখ্যাত। আলোক-বিজ্ঞানেও প্রভূত দান।

ইউগ্লেনা (euglena) — প্রো টো-জোয়া ↑ শ্রেণীর একটি আণুবীক্ষণিক জীবাণু; এদের সূক্ষ্ম দেহটির গঠন অতীব সরল; দেখতে এরা সবুজ বর্ণের এক টু পত্রাংশের মত, পাত্‌লা এবং চেপ্‌টা। পশ্চাদ্ভাগ লেজের মত নেড়ে-নেড়েই এরা জলে ভেসে বেড়ায়। আবদ্ধ জলে জলজ উদ্ভিদ ও উদ্ভিজ্জ পদার্থাদির সান্নিধ্যে জন্মায়।

ইউগ্লেনা

ইউজেনিক্স (eugenics) — সর্বাংশে উন্নত শ্রেণীর সন্তানোৎপাদন, অর্থাৎ কোন জীবের সুপ্রজনন সম্পর্কীয় তথ্যাদির গবেষণা-বিদ্যা। যোগ্যতা-সম্পন্ন সুনির্বাচিত স্ত্রী-পুরুষের মিলনে প্রজনিত সন্তানই সাধারণতঃ সর্ব গুণান্বিত হয়ে থাকে। পশুপালন ও প্রজননে এরূপ বিচার-বিশ্লেষণের, অর্থাৎ 'ইউজেনিক্স' বিদ্যার ব্যবহার ও প্রয়োগ বিশেষ ফলপ্রদ হয়েছে।

ইউরেটার (ureter) — মূত্র-নালীদ্বয়; দেহাভ্যন্তরে দুই পার্শ্বের দুইটি বৃক্ক (কিড্‌নি ↑) থেকে নিম্নমুখী যে দু'টি নল-পথে অল্প-অল্প করে মূত্র প্রবাহিত হয়ে এসে মূত্র-স্থলীতে সঞ্চিত হয়।
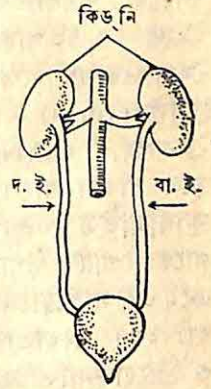
ইউরেটার

ইউটারাস (uterus) — ভ্রূণস্থলী, বা গর্ভাশয় ; প্রসূতির উদরাভ্যন্তরে পাত্‌লা পর্দায় তৈরী যে আধারের মধ্যে সন্তান সৃষ্ট ও বর্ধিত হয়।

ইউফোরিয়া (euphoria) — দেহের প্রকৃত অবস্থাতিরিক্ত শক্তি, স্বাস্থ্য ও উদ্দীপনার কল্পিত অনুভূতি। অনেক সময় মানসিক বিকৃতির ফলে এরূপ অবাস্তব অনুভূতি অনেকের মধ্যে প্রকাশ পেয়ে থাকে। মানসিক রোগ বিশেষ। কোন কোন ঔষধের প্রভাবেও অনেক সময় এরূপ মানসিক রোগ দেখা দেয়।

ইউথ্যানাসিয়া (euthanasia) — যন্ত্রণাহীন আকস্মিক মৃত্যু ; যেমন, কোন কোন কষ্টদায়ক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তির সকলের অজ্ঞাতে অকস্মাৎ হৃৎযন্ত্র বন্ধ হয়ে সকল যন্ত্রণার অবসান হয় ; একেই বলে ইউথ্যানাসিয়া।

ইউরেকা ওয়্যার (eureka wire)— নিকেল ↑ ও তামার এক প্রকার বিশেষ সংকর-ধাতুর (অ্যালয় ↑) সরু তারের ব্যবহারিক নাম। ইহা উৎকৃষ্ট তড়িৎ-পরিবাহী হিসাবে বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদিতে ব্যবহৃত হয়।

ইউরিয়া (urea) — সাদা স্ফটিকাকার জৈব পদার্থ, $CO(NH_2)_2$; জীবজন্তুর মূত্রে পাওয়া যায়। এর অন্য নাম **কার্বামাইড**। প্রাণীর দেহাভ্যন্তরে খাদ্যের প্রোটিন উপাদান বিশ্লিষ্ট হয়ে ক্রমে এই নাইট্রোজেন-বহুল পদার্থের সৃষ্টি হয়। দেহাভ্যন্তরস্থ অনাবশ্যক ও প্রয়োজনাতিরিক্ত নাইট্রোজেন ইউরিয়ার আকারে বেরিয়ে যায়। পদার্থটা জলে দ্রবণীয়। জীবের মূত্রে এই ইউরিয়ার সঙ্গে কিছু **ইউরিক অ্যাসিড**-ও থাকে। এই সাদা প্রায়-অদ্রাব্য স্ফটিকাকার পদার্থটি কিছুক্ষণ রক্ষিত মূত্রের তলায় থিতিয়ে হলদে দেখায়। শারীরিক নানা কারণে এই ইউরিক অ্যাসিডের সোডিয়াম, বা পটাসিয়াম সল্ট উৎপন্ন হয়ে হাত-পায়ের গাঁটে-গাঁটে সঞ্চিত হওয়ার ফলে এক প্রকার বাত রোগ হয়।

ইউরিমিয়া (uraemia)— বৃক্কদ্বয়, বা কিড্‌নির ↑ কার্যকারিতাহ্রাস, বা ব্যাহত হওয়ার ফলে প্রাণিদেহের রক্তে ইউ-রিয়ার উপস্থিতি-জনিত রোগ বিশেষ।

ইউরেথ্রা (u r e t h r a) — প্রস্রাব নির্গমনের নালিপথ; যে নলপথে মূত্রস্থলী থেকে মূত্র নিঃসৃত হয়। পুং-জননেন্দ্রিয়ের নালীপথ।

ইউরেনিয়াম (uranium) — সাদা কঠিন ধাতব পদার্থ। এই মৌলিক পদার্থটি থেকে স্বভাবতঃই তেজঃরশ্মি বিকিরিত হয় বলে একে 'রেডিও-অ্যাক্টিভ ↑ এলিমেণ্ট' বলা হয়। ইউরেনিয়াম-পরমাণুর নিউক্লিয়াস ↑, বা কেন্দ্রীয় বস্তুকণাকে নিউট্রন ↑ কণি-কার সংঘাতে ভেঙে শক্তিতে রূপা-ন্তরিত করা সর্বপ্রথম সম্ভব হয়েছে। এরূপ কেন্দ্রীণ বিভাজন প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'নিউক্লিয়ার ফিসন' ↑।

ইউরেনাস (uranus)—সূর্যের একটি গ্রহ; শনি ও নেপচুন ↑ গ্রহদ্বয়ের মধ্যবর্তী নিজস্ব কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। সূর্য থেকে এর দূরত্ব প্রায় 178 কোটি মাইল; আয়তনে পৃথিবীর প্রায় 14·6 গুণ বড়। সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে এর আমাদের হিসাবে লাগে 84 বছর, অর্থাৎ আমাদের 84 বছরে ইউরেনা-সের হয় এক বছর।

ইক্লিপ্‌স (eclipse) (লুনার) — চন্দ্রগ্রহণ; বিভিন্ন কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবী যখন সূর্য ও চন্দ্রের মাঝখানে একই সরল রেখায় এসে পড়ে, তখন সূর্যের আলোক-ধারা পৃথিবীতে আট্‌কে যায়, কাজেই পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পড়ে চন্দ্রকে আংশিক, বা সম্পূর্ণরূপে ঢেকে ফেলে। পূর্ণিমা রাতেই এরূপ অবস্থা হতে পারে এবং চন্দ্রের উপর পৃথিবীর এইরূপ ছায়া দেখা যায়; একেই বলে চন্দ্রগ্রহণ। ব্যাপারটা নিছক আলো-ছায়ার খেলা মাত্র।

ইক্লিপ্‌স (eclipse) (সোলার)—সূর্য-গ্রহণ; বিভিন্ন কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে চন্দ্র যখন সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে একই সরল রেখায় এসে পড়ে, তখন সূর্য-গ্রহণের সৃষ্টি হয়। চন্দ্রের ছায়ায় পৃথিবীর কোন স্থান থেকে সূর্য আংশিক, বা সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে অদৃশ্য

হয়। চন্দ্র আয়তনে ছোট বলিয়া পৃথিবীর সব জায়গা থেকে সূর্য-গ্রহণ,
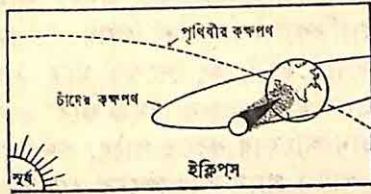
অর্থাৎ আলো-ছায়ার এই অবস্থা একই সময়ে পরিদৃষ্ট হয় না।

ইক্লিপ্টিক (ecliptic) — মহাশূন্যে নক্ষত্রাদির অবস্থানের আপেক্ষিকে সূর্যের যে গতিপথ আপাতদৃষ্টিতে লক্ষিত হয়। সম্বৎসরে 'সেলেশ্চিয়্যাল স্ফিয়ার'-এর ↑ গায়ে সূর্যের যে উপবৃত্তাকার আপেক্ষিক পরিক্রমা-পথ দৃষ্ট হয়। (ইকুইনক্স ↑)।

ইকোলজি (ecology) — পরিবেশ-বিজ্ঞান; জন্মস্থান ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোন প্রাণী, বা উদ্ভিদের সহজাত বৈশিষ্ট্যগুলির বিচার সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। হিমালয়ের সানুদেশে পাইন, ওক প্রভৃতি সরল বর্গীয় বৃক্ষ জন্মে কেন? আফ্রিকার অধিবাসী কৃষ্ণকায়, আর চীনের লোক সাধারণতঃ খর্বকায় হয় কেন? স্থানীয় পরিবেশের বিভিন্নতার প্রভাবে অধিবাসীদের এরূপ সব বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যগত বিভিন্নতা সম্বন্ধীয় তথ্যাদির পরীক্ষা, অনুশীলন ও পর্যালোচনা বিজ্ঞানের এই শাখার অন্তর্গত। **ইকো** মানে গৃহ, বা বাসস্থান।

ইকোয়েটর (equator) (টেরেস্ট্রিয়াল) — ভূ-বিষুবরেখা। ভূ-পৃষ্ঠের কাল্পনিক নিরক্ষ রেখা; পৃথিবীর মেরুদ্বয়ের সমদূরবর্তীভাবে পৃথিবীকে বেষ্টন করে যে বৃত্তরেখার কল্পনা করা হয়েছে। একে বলে 0° অক্ষাংশ (ল্যাটিচিউড ↑) রেখা। ভৌগোলিক আলোচনার সুবিধার জন্যে এই রেখার কল্পনা করা হয়।

বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়ের আলোচনায় বিভিন্ন রকম ইকোয়েটরের কল্পনার সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে।

ইকোয়েটর (equator) (ম্যাগ্নেটিক) — পৃথিবীর প্রায় উত্তর ও দক্ষিণ মেরুপ্রদেশে দুইটি বিপরীতধর্মী চৌম্বক শক্তির অস্তিত্ব বিভিন্ন চৌম্বকীয় পরীক্ষায় লক্ষিত হয়ে থাকে; এদের বলে ভূ-চৌম্বক মেরু। এই দুই চৌম্বক মেরুর সমদূরবর্তী পৃথিবীর নিরক্ষীয় অঞ্চলে ভূ-চৌম্বক শক্তির প্রভাব লক্ষিত হয় না। এই রকম ভৌগোলিক চৌম্বকশক্তিশূন্য সব স্থানের উপর দিয়ে যে বৃত্ত রেখা পৃথিবীকে বেষ্টন করে রয়েছে বলে কল্পনা করা হয়েছে তাকে বলা হয় **ম্যাগ্নেটিক ইকোয়েটর**। এটা ভৌগোলিক নিরক্ষ-বৃত্ত, বা 'টেরেস্ট্রিয়াল' ইকোয়েটরের প্রায় কাছাকাছি; উত্তর-দক্ষিণে কিছু সরে আছে মাত্র।

ইকোয়েটর (equator) (সেলেশ্চিয়াল) — পৃথিবী থেকে আমরা আপাতদৃষ্টিতে গ্রহনক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কগুলোকে আকাশের এক অর্ধ-গোলাকার চাঁদোয়ার গায়ে সংলগ্ন দেখতে পাই, পৃথিবী যেন ওর কেন্দ্রস্থলে রয়েছে। জ্যোতির্বিদ্যায় একে বলে 'সেলেশ্চিয়াল স্ফিয়ার'। পৃথিবীর ভৌগোলিক ইকোয়েটর বা নিরক্ষরেখা যে সমতলে আছে তাকে চারদিকে বাড়িয়ে দিতে পারলে যে কাল্পনিক বৃত্তরেখায় উহা সেলেশ্চিয়াল স্ফিয়ারকে ছেদ করবে বলে মনে করা

যায় তাকে বলা হয় 'সেলেশ্চিয়াল ইকোয়েটর'। (গ্রেট সার্কেল ↑)।

ইকোয়েশন (equation) (ম্যাথ্‌মেটিক্যাল) — গাণিতিক সমীকরণ ; বিভিন্ন রাশি, বা রাশিসমষ্টির সমতা প্রদর্শনের সূত্র। এর মধ্যে নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট মূল্যমানের রাশি থাকবে, যাতে অনির্দিষ্ট রাশির একটি নির্দিষ্ট মূল্যমানে সমীকরণটি সার্থক হবে ; যেমন, $5a = 10$ একটি গণিতিক সমীকরণ ; এর অনির্দিষ্ট রাশি a-এর মূল্য 2 হলেই সমীকরণটি সার্থক হয়।

ইকোয়েশন (equation) (কেমিক্যাল) — রাসায়নিক সমীকরণ ; যে-সব পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটবে এবং তার ফলে যে-সব পদার্থ উৎপন্ন হবে, তাদের সমতা প্রদর্শনের রাসায়নিক বর্ণনামূলক সূত্র। এর মধ্যে উৎপাদক ও উৎপাদিত পদার্থগুলোর মৌলিক উপাদানের সব অণু-পরমাণুর সংখ্যাও নির্দিষ্ট করে দেখানো হয় ; যেমন, $H_2 + Cl_2 = 2HCl$, একটি রাসায়নিক সমীকরণ ; এর থেকে বুঝা যায় : হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের রাসায়নিক মিলনে হাইড্রোজেন-ক্লোরাইড, অর্থাৎ হাইড্রোক্লোরিক ↑ অ্যাসিড উৎপন্ন হয়েছে। একটি হাইড্রোজেন-অণু ও একটি ক্লোরিন-অণু মিলে দু'টি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের অণু সৃষ্টি হয়েছে ; আর, সেই হা ই ড্রো জে ন ↑ ও ক্লোরিনের ↑ প্রত্যেকটির অণুতে দু'টি করে পরমাণু রয়েছে ; এবং তাদের এক-একটি পরমাণু মিলে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের এক-একটি অণু গঠিত হয়েছে। এভাবে উভয় পক্ষে সমীকরণটির সমতা রক্ষিত হলো।

ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট (equivalent weight) — রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কোন মৌলিক পদার্থের, অথবা কোন র‍্যাডিক্যালের ↑ যত গ্রাম কোন অ্যাসিডের (অণু থেকে) মাত্র এক গ্রাম হাইড্রোজেন বিমুক্ত করে' তার স্থান অধিকার করতে পারে, অথবা 8 (আট) গ্রাম অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে, সেই গ্রাম-সংখ্যাকে বলে ঐ মৌলিক পদার্থ, বা র‍্যাডিক্যালের ই. ও.। যেমন — হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সঙ্গে দস্তার (জিঙ্ক ↑) রাসায়নিক মিলনে হা ই ড্রো জে ন গ্যাস বিমুক্ত হয় এবং জিঙ্ক-ক্লোরাইড সল্ট উৎপন্ন হয়ে থাকে। পরীক্ষায় দেখা গেছে, এই বিক্রিয়ায় 35·5 গ্রাম দস্তা (হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের থেকে) মাত্র এক গ্রাম হাইড্রোজেন অপসারিত করে এবং তার স্থান অধিকার করে ক্লোরিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে উৎপন্ন হয় জিঙ্ক-ক্লোরাইড। সুতরাং 35·5 হলো দস্তার ই. ও.। আবার 35·5 গ্রাম দস্তা আট গ্রাম অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জিঙ্ক-অক্সাইড উৎপন্ন হয়ে থাকে। এভাবে হাইড্রোজেন, বা অক্সিজেনের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের 'ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট', বা 'সমভর পরিমাণ' স্থির করা হয়। ভরের এরূপ তুলনা যে-কোন এককে চলতে পারে—গ্রামে হলে তাকে তখন বলে **গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট**।

ইকুইনক্স (equinox) — পৃথিবীর তুলনায় সূর্য এক স্থানে স্থির আছে সত্য ; কিন্তু গ্রহ-নক্ষত্রাদির তুলনায় পৃথিবী থেকে আমরা আপাতদৃষ্টিতে সারা বছরে সূর্যের যে গতিপথ দেখতে

পাই তাকে জ্যোতির্বিদ্যায় বলা হয় ইক্লিপ্টিক ↑। এই ইক্লিপ্টিক, বা সূর্যের এই কক্ষপথ সেলেশ্চিয়াল ইকোয়েটরকে ↑ যেখানে ছেদ করে তাকে বলে ইকুইনক্স। সূর্য যখন ইকুইনক্সে থাকে তখন পৃথিবীর সর্বত্র দিন ও রাত সমান হয়; এ-রকম হয় বছরে দু'দিন, — 21 মার্চ এবং 23 সেপ্টেম্বর। 21 মার্চ সূর্য 'ভারন্যাল ইকুইনক্সে' এবং 23 সেপ্টেম্বর 'অটাম্ন্যাল ইকুইনক্সে' থাকে, বলা হয়।

ইকুইলিব্রিয়াম (equilibrium)— সাম্যাবস্থা; বিপরীত শক্তির প্রভাবে পদার্থ যে সাম্যাবস্থা লাভ করে। টেবিলের উপর একখানা বই রয়েছে, এখানে বইখানা 'ইকুইলিব্রিয়াম' অবস্থায় আছে। বইখানার নিম্নমুখী ভার-শক্তি টেবিলের ঊর্ধ্বমুখী ভার-সহন-শক্তির সমান; তাই বইখানা স্থিরাবস্থায় রয়েছে। (ব্যালান্স ↑)

ইগ্‌নিস-ফেটুয়াস (ignis-fatuus) —আলেয়া; ইংরেজিতে একে বলে 'উইলো-দি-উইস্প' ↑। পতিত, বা পরিত্যক্ত জলাভূমিতে মাঝে-মাঝে যে অস্থায়ী অগ্নিশিখা জ্বলে উঠতে দেখা যায়। বিভিন্ন জৈব পদার্থ পচে মাটি থেকে ফস্‌ফিউরেটেড হাইড্রোজেন ↑, অথবা অন্য কোন দাহ্য গ্যাস বেরিয়ে বায়ুর সংস্পর্শে এসে স্বতঃই জ্বলে ওঠে; ফলে এরূপ অস্থায়ী অগ্নিশিখার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

ইগ্নিয়াস রক (igneous rock) — আগ্নেয়শিলা; ভূ-গর্ভের উত্তাপে গলিত খনিজ পদার্থাদি আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ থেকে উপরে উঠে যে শিলা, বা প্রস্তর-স্তর গঠিত হয়েছে।

ইগ্নিশন-পয়েন্ট (ignition point)— জ্বলনাংক; কোন দাহ্য পদার্থ যে উত্তাপে জ্বলে ওঠে। যে তাপমাত্রায় পৌঁছুলে কোন পদার্থ জ্বলতে সুরু করে, তাকে বলা হয় ওই পদার্থের ইগ্নিসন-পয়েন্ট, বা জ্বলনাংক। এই তাপমাত্রা বিভিন্ন দাহ্য পদার্থের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয়ে থাকে।

ইটিয়োলজি (etiology) — কোন রোগোৎপত্তির মূল কারণ সম্বন্ধীয় তত্ত্বীয় বিজ্ঞান। কোন রোগের 'ইটিয়োলজি' বললে কি-কি কারণে জীবদেহে সেই রোগের লক্ষণাদি প্রকাশ পেয়েছে তার শারীরবৃত্তীয় তথ্যাদি বুঝায়।

ইডিয়োমিটার
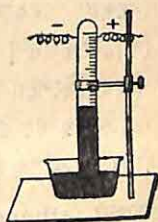
ইডিয়োমিটার (eudiometer) — রাসায়নিক সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ ক্রিয়ায় বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থের আয়তনের পরিবর্তন (সংকোচন, বা প্রসারণ) রসায়নাগারে যে যন্ত্রের সাহায্যে নিরূপণ করা হয়।

ইথার (ether) — বর্ণহীন ও দাহ্য একটি তরল জৈব রাসায়নিক পদার্থ, $C_2H_5.O.C_2H_5$; বিশেষ এক রকম মিষ্ট গন্ধযুক্ত। জীবদেহের উপর এর অ্যানেস্থেটিক ↑ প্রভাব আছে। ইথাইল অ্যাল্‌কোহলকে ↑ গাঢ় সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড দিয়ে নির্জলিকরণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে ইথার তৈরী করা হয়।

রাসায়নিক গঠনের হিসাবে একে তাই 'সাল্‌ফিউরিক ইথার,' বা **ডাই-ইথাইল ইথার**-ও বলা হয়।

ইথার (e t h e r) — বিশ্ব চরাচরের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত একটা কাল্পনিক পদার্থ ; যার মাধ্যমে তাপ, আলোক, বেতার প্রভৃতি বিভিন্ন শক্তি-তরঙ্গ প্রবাহিত হয় বলে সাধারণতঃ মনে করা হয়।

ইথাইল অ্যাল্‌কোহল (e t h y l alcohol) — সুরাসার ; সা ধা র ণ অ্যাল্‌কোহল। বর্ণহীন, দাহ্য তরল পদার্থ, উগ্র গন্ধবিশিষ্ট, তীব্র কটু স্বাদযুক্ত। শর্করা জাতীয় পদার্থকে এক রকম এন্‌জাইমের↑ প্রভাবে বিশেষ ধরনের গাঁজন - ক্রিয়ার (ফার্মেণ্টেশন ↑) সাহায্যে প্রস্তুত হয়। ঔষধ হিসেবে ও বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যথেষ্ট প্রয়োজন হয়ে থাকে। (অ্যাল্‌কোহল ↑)।

ইথেন (ethane)—এক রকম বর্ণহীন, গন্ধহীন, দাহ্য গ্যাস ; প্যারাফিন↑ জাতীয় বিশেষ একটা হাইড্রোকার্বন। রাসায়নিক সংকেত C_2H_6।

ইথিলিন (ethylene)—বর্ণহীন, মিষ্ট গন্ধযুক্ত একটি দাহ্য গ্যাসীয় জৈব যৌগিক পদার্থ। অলিফিন↑ শ্রেণীর গ্যাসীয় হাইড্রোকার্বন। রাসায়নিক সংকেত C_2H_4।

ইনোকুলেশন (innoculation) — কোন বিশেষ রোগ-জীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্যে সেই জীবাণুর নিস্তেজিত অবদ্রব সুস্থদেহে প্রবেশ করানোর প্রক্রিয়া ; টিকা (ভ্যাক্‌সিনেশন ↑) দেওয়া। কোন রাসায়নিক পদার্থের সম্পৃক্ত দ্রবণে (স্যাচুরেটেড সল্যুশন ↑) সেই পদার্থের দুই-একটি কণিকা ফেলিয়া স্ফটিকীকরণ (ক্র স্টা লি জে শ ন ↑) প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করবার পদ্ধতিকেও ই. ন. বলা হয়।

ইন্‌কিউবেশন পিরিয়ড (incubation period) — দেহে কোন জীবাণু সংক্রমণের সময় থেকে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার সময় পর্যন্ত কাল-ব্যবধান। বিভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে একই জীবাণুর শক্তি বিস্তারের এই ব্যবধান কাল বিভিন্ন হতে পারে, — এটা নির্ভর করে ব্যক্তি বিশেষের রক্তের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর।

ইন্‌ভিট্রো (in vitro) — গবেষণাগারের সীমিত পরীক্ষা ; যা কোন কাচের পাত্রে (টেস্টটিউব প্রভৃতি) পরিচালিত হয়। **ভিট্রো** মানে 'কাচ'। কোন রাসায়নিক পদার্থের জীবাণুনাশক, অথবা অপর কোন কার্যকরী শক্তি নির্ধারণের জন্য প্রথমতঃ গবেষণাগারে কাচের পাত্রে যে-সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়।

ইন্‌ভিভো (i n v i v o) — কোন রাসায়নিক পদার্থের 'ইন্‌ভিট্রো' পরীক্ষালব্ধ গুণাগুণ মানুষ, বা জীবাণু-দের উপরে যাচাই করবার জন্যে যে বাস্তব ও ব্যবহারিক পরীক্ষাদি করা হয়।

ইন্‌ভার্স রেসিও (inverse ratio) —বিপরীত, বা ব্যস্ত অনুপাত। কোন রাশি 'ক' যে অনুপাতে বাড়ে

তদনুপাতে অপর কোন রাশি 'খ' যদি কমে, তাহলে ঐ রাশিদ্বয়কে পরস্পর পরস্পরের 'ব্যস্ত, বা বিপরীত আনুপাতিক' (ইন্ ইন্ভার্স রেসিও) বলা হয়।

ইন্ভার্টিব্রেট (invertebrate) — অ-মেরুদণ্ডী প্রাণী ; যে সকল প্রাণীর মেরুদণ্ড, বা শিরদাঁড়া নেই। নিম্ন-শ্রেণীর প্রাণী ; যেমন, বিভিন্ন পোকা-মাকড়, কেঁচো, শামুক প্রভৃতি। এদের সমষ্টিগতভাবে **ইন্ভার্টিব্রাটা** বলা হয়।

ইন্ভোলিউট (involute) — কোন ঘূর্ণায়মান চক্রের গায়ে দড়ি জড়ানো থাকলে ঐ দড়ির প্রত্যেকটি বিন্দুর চক্রাকার গতিপথকে ঐ মূল চক্রের 'ইনভোলিউট' বলা হয়। প্রদত্ত চিত্রে 'ক-খ' দড়ি চক্রের ('বৃত্ত-1') গায়ে ক্রমে জড়ানো হচ্ছে, দড়ির 'ব' বিন্দু সঞ্চালিত হয়ে $ব_1$ অবস্থানে এলে আর একটি বৃত্ত (বৃত্ত-2) সৃষ্টি হবে, যার বৃত্তাংশ ব-$ব_1$ দ্বারা রচিত হবে।

ইন্ভোলিউট

এই বৃত্ত-2 হলো 'বৃত্ত-1'-এর **ইন্-ভোলিউট**। আবার 'বৃত্ত-1'-কে বলে 'বৃত্ত-2'-এর **ইভোলিউট**। যন্ত্রবিদ্যায় এরূপ বিভিন্ন জটিল গাণিতিক আলো-চনার জন্য এর প্রয়োজন হয়ে থাকে।

ইণ্টেন্সিটি (intensity) — কোন শক্তির প্রাবল্য, বা আতিশয্যের সূচক-পরিমাণ। শব্দের (সাউণ্ড ↑) ইণ্টেন্সিটি হলো ধ্বনির উচ্চগ্রাম ; আলোকের ইণ্টেন্সিটি বললে তার ঔজ্জ্বল্যের পরিমাণ (ক্যাণ্ডেল পাওয়ার ↑) বুঝায়। তড়িৎ, বা চৌম্বক শক্তির ইণ্টেন্সিটি বললে তড়িৎ, বা চৌম্বক শক্তির তীব্রতা, বা চাপ বুঝায়। বিভিন্ন শক্তির ইণ্টেন্সিটি বিভিন্ন নির্দিষ্ট এককে প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

ইন্কুবেটর (incubator)—বাক্সের মত একটা যন্ত্র, যার অভ্যন্তরভাগে প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট তাপমাত্রার সমতা রক্ষার ব্যবস্থা থাকে। তাপের এই সমতা রক্ষার যান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বলে থার্মোষ্টাট্ ↑ ;—এতে এমন যন্ত্র-কৌশল থাকে যাতে প্রয়োজনীয় তাপমাত্রায় পৌছুলেই তাপ পরিবহনের যোগা-যোগ ছিন্ন হয়ে যায়, তাপমাত্রা আর বাড়তে পারে না। এ-রকম যন্ত্রে সাধারণতঃ হাঁস, মুরগী প্রভৃতির ডিম ফোটানো হয়। বিশেষ ব্যবস্থায় অপুষ্ট শিশুদেরও এর মধ্যে উপযুক্ত তাপে রেখে সজীব ও পরিপুষ্ট করে তোলা যায়। জীববিদ্যার পরীক্ষা-দির জন্যে জীবাণুদের এর মধ্যে রেখে অনেক সময় বাঁচিয়ে ও বাড়িয়ে তোলা হয়ে থাকে।

ইন্ক্যাণ্ডেসেন্স (incandescence) — ভাস্বরতা, প্রদীপ্তি ; অত্যধিক উত্তপ্ত অবস্থায় সাধারণতঃ ধাতব বস্তুতে যে উজ্জ্বল প্রদীপ্ত অবস্থা দৃষ্ট হয় ; যেমন, বিজলী-বাতির তার।

ইন্ক্যাণ্ডেসেন্ট ল্যাম্প (incandescent lamp) — কোন পদার্থ না জ্বালিয়ে কেবল তাকে অত্যধিক উত্তপ্ত ভাস্বর করে যে বাতিতে আলোক

সৃষ্টি করা হয়। ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌বের সরু তারের (ফিলামেণ্ট ↑) মধ্যে দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহের ফলে ওটা জ্বলে না, কেবল প্রদীপ্ত হয়েই আলো ছড়ায়। প্রজ্বলিত গ্যাসের আলোতে প্রধানতঃ থোরিয়াম ↑ ও সিরিয়াম ↑ ধাতুর বিশেষ কোন সল্ট-মাখানো ম্যাণ্টেল ↑ প্রদীপ্ত হয়ে আলো বিকিরণ করে।

ইণ্টার-সেলুলার (intercellular) — আন্তঃকোষ; উদ্ভিদ, বা জীবদেহের সংগঠক পাশাপাশি বিভিন্ন কোষের মধ্যবর্তী পারস্পরিক ব্যবধান।

ইণ্টারনোড (internode)—উদ্ভিদের কাণ্ড, বা শাখার যে সব স্থানে পাতা গজায় তাকে বলে **নোড**; আর দু'টা নোডের মধ্যবর্তী অংশকে বলা হয় ইণ্টারনোড, বা পত্রান্তর-ব্যবধান।

ইণ্টারনোড

ইণ্টারন্যাশন্যাল ডেট্-লাইন (international date-line) — যদি কোন লোক পূর্ব দিকে চলতে থাকে, তাহলে পৃথিবীর আহ্নিক গতির (পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে) জন্যে সে ক্রমে আগে সূর্যোদয় দেখবে, ঘড়ির সময় তার এগিয়ে যাবে। আবার, পশ্চিম দিকে চলতে থাকলে তার সময় পিছিয়ে যাবে। এজন্যে সময়, বা তারিখের একটা স্থিরতা রক্ষার জন্যে গ্রিনউইচ (0° দ্রাঘিমা) থেকে 180° দূরে, অর্থাৎ 180° দ্রাঘিমা-রেখায় উপস্থিত হলে পূর্বদিকে অগ্রসরমান যাত্রীর সময় পূর্ণ 24 ঘণ্টা অগ্রবর্তী হয়। কাজেই তারিখ ঠিক রাখবার জন্যে তাকে এক দিন বাদ দিতে হয়, অর্থাৎ দু'দিনের একই তারিখ ধরা হয়। আর পশ্চিম দিকের যাত্রীর এক দিন কমে যায় বলে সে তার তারিখের সঙ্গে এক দিন যোগ করে নেয়, অর্থাৎ পরের দিনের তারিখ ধরে নেয়। এভাবে আন্তর্জাতিক হিসেবে তারিখ নির্ধারণের জন্যে উক্তরূপ সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। ওই 180° দ্রাঘিমা-রেখাকে এজন্যে আন্তর্জাতিক তারিখ-রেখা, বা 'ইণ্টারন্যাশন্যাল ডেট্-লাইন' বলা হয়।

ইণ্টারন্যাল কম্বাস্‌শন ইঞ্জিন (internal combustion engine) — যে ইঞ্জিনের অভ্যন্তরে কোন উপযুক্ত জ্বালানি জ্বেলে তার দহনে উৎপন্ন ও আবদ্ধ গ্যাসের চাপকে যান্ত্রিক কৌশলে গতি-শক্তিতে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। এর জ্বালানি সাধারণতঃ পেট্রল, কেরোসিন, ডিজেল ↑ তেল প্রভৃতি হয়ে থাকে। পিষ্টন-লাগানো বায়ুনিরুদ্ধ একটা আবদ্ধ সিলিণ্ডারের মধ্যে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে জ্বলন-ক্রিয়া চলতে থাকে, গ্যাস সৃষ্টি হয়। সেই গ্যাসের চাপে পিষ্টনটা দ্রুত চলাচল করে, আর ইঞ্জিন চলতে থাকে। মোটর গাড়ীতে পেট্রল ↑ পুড়িয়ে এ-রকম ইঞ্জিনই চালানো হয়।

ইণ্টিজার (integer) — পূর্ণ সংখ্যা, বা রাশি; যেমন, 1, 5, 10, 100 ইত্যাদি; কিন্তু $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, 2·5 ইত্যাদি ভগ্নাংশিক সংখ্যা, ইণ্টিজার নহে।

ইণ্টিগ্র্যাল ক্যাল্‌কুলাস (integral calculus) — গণিত বিজ্ঞানের একটি

শাখা বিশেষ; বিভিন্ন ক্ষুদ্রাংশের সমষ্টি নির্ধারণের গাণিতিক প্রণালী। কোন প্রকার পরিবর্তনের (হ্রাস, বৃদ্ধি, গতি প্রভৃতির) হার, অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ে ঐ পরিবর্তনের নির্দিষ্ট পরিমাণ জানলে অপর যে-কোন সময়ে তার সম্ভাব্য পরিমাণ এই প্রণালীর সাহায্যে নির্ধারণ করা যায়। কোন দেশে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার এবং কোন এক সময়ে মোট লোকসংখ্যা কত, তা জানলে দশ বছর পরে লোকসংখ্যা কত হবে, এরূপ সব তথ্যাদি এই গাণিতিক প্রণালীতে সহজে নির্ণয় করা যেতে পারে। এরূপ গাণিতিক সমাধানে প্রতি ঘণ্টা, বা প্রতি দিনের বৃদ্ধির সমষ্টি বিশেষ সূত্রানুসারে নির্ধারিত হয়ে থাকে।

ইণ্টেস্টাইন (intestine) — অন্ত্র; উদরাভ্যন্তরস্থ ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্রসহ সমগ্র নাড়ীভুঁড়ি। পাকস্থলীর (স্টম্যাক ↑) পরবর্তী সুদীর্ঘ যে সরু

ইন্টেস্টাইন

নল কুণ্ডলীকৃতভাবে জড়ানো অবস্থায় আছে তাকে বলে ক্ষুদ্রান্ত্র (small intestine), এবং উহাকে পরিবেষ্টন করে যে মোটা নলপথ রয়েছে তাকে বলে বৃহদন্ত্র (large intestine)। কোলন (colon) ↑ ।

ইণ্ডাক্শন (induction) — কোন পদার্থকে তড়িতাবিষ্ট করবার একটা বিশেষ কৌশল। পদার্থটা তড়িৎ-সুপরিবাহী হলে নিকটস্থ কোন তড়িৎ-প্রবাহের প্রভাবে ওর মধ্যেও তড়িৎ-শক্তি সঞ্চারিত হয়ে থাকে। পরস্পরের সংস্পর্শ-শূন্যভাবে রক্ষিত কোন পদার্থে এরূপ তড়িৎ-সংক্রমণকে বলে ইণ্ডাক্শন।

ইণ্ডাক্শন কয়েল (induction coil) — নিম্ন-চাপের তড়িৎ-শক্তি থেকে উচ্চতর চাপের তড়িৎ-শক্তি উৎপাদনের একটা যান্ত্রিক কৌশল। নরম লোহার রডের গায়ে ধাতব তার জড়িয়ে তার উপরে আর একটা বৃহত্তর ব্যাসের তার-কুণ্ডলী (কয়েল) সামান্য ব্যবধানে স্থাপন করা হয়; নীচের তার-কুণ্ডলীটিকে বলে প্রাইমারি কয়েল; আর উপরেরটা হলো সেকেণ্ডারি কয়েল। প্রাইমারি
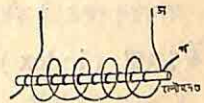
ইণ্ডাক্সন কয়েল

কয়েলে অল্প কয়েকটি মাত্র পাক থাকে, আর সেকেণ্ডারি কয়েলে থাকে অপেক্ষাকৃত সরু তারের অনেকগুলো পাক। যান্ত্রিক কৌশলে প্রাইমারি কয়েলের মধ্যে (ইলেক্ট্রিক বেলের ↑ মত) এমনভাবে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালানো হয়, যাতে সেই প্রবাহিত তড়িৎস্রোত যান্ত্রিক পদ্ধতিতে অতি দ্রুত পর্যায়ক্রমিকভাবে দিক পরিবর্তন করে এবং পরিবর্তী তড়িৎ-স্রোত

(অল্টার্নেটিং কারেন্ট ↑) উৎপাদিত হয়। এর ফলে ইণ্ডাক্‌সনের ↑ প্রভাবে সেকেণ্ডারি কয়েলের মধ্যেও উচ্চ চাপের অনুরূপ তড়িৎ-শক্তির উন্মেষ ঘটে।

ইণ্ডিগো (indigo)—নীলবর্ণের জৈব রাসায়নিক পদার্থ ; একটি গ্লুকোসাইড ↑ জাতীয় যৌগ। সাধারণভাবে পদার্থটা 'ইণ্ডিক্যান' নামে পরিচিত। 'ইণ্ডিগোফেরা' নামক এক জাতীয় উদ্ভিদ থেকে নিষ্কাশিত হয়ে থাকে। এই ইণ্ডিগো, বা নীলের জন্যে ওই উদ্ভিদের চাষ এখন আর হয় না ; কারণ, রাসায়নিক পদ্ধতিতে কৃত্রিম নীল তৈরীর সহজসাধ্য কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে।

ইণ্ডিয়াম (indium)—মৌলিক ধাতব পদার্থ ; অত্যন্ত নরম ধাতু। সীসার চেয়েও নরম বলে মসৃণ চলাচলের জন্যে অনেক সময় যন্ত্রাদির বেয়ারিং-এর ↑ উপরে এর একটা পাত্‌লা আবরণ দেওয়া হয়।

ইণ্ডেক্স (index) — সূচক-সংখ্যা ; $y^3 = y \times y \times y$, এখানে ^{3} হলো ইণ্ডেক্স, বা সূচক ; একটি ত্রিবর্গ সূচক সংখ্যা।

ইণ্ডেক্স নোটেশন (index notation) — অতি বৃহৎ, বা অতি ক্ষুদ্র সংখ্যা লিখনের পদ্ধতি ; যেমন — $10{,}000 = 10^4$; $1/10{,}000 = 10^{-4}$।

ইন্‌ফিনিটি (infinity) — অসীম, বা অনন্ত রাশি, বা সংখ্যা ; যে রাশি ধারণাযোগ্য যে-কোন বৃহত্তম রাশির চেয়েও বড়। এইরূপ রাশির কল্পনা করা যায় মাত্র ; '∞' এই সাংকেতিক চিহ্ন দিয়ে গণিতে একে প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

ইন্‌ফিনিটিসিম্যাল (infinitisimal) — ধারণাতীত ক্ষুদ্রতম রাশি ; কোন রাশি যদি ক্রমাগত ক্ষুদ্র হতে থাকে, অথচ কখন অস্তিত্বহীন শূন্যও না হয়, তবে সেই অন্তিম ক্ষুদ্রতম রাশিকে 'ইন্‌ফিনিটিসিম্যাল' বলে বোঝানো হয়।

ইন্‌ফ্রা-রেড রে (infra-red ray) — অদৃশ্য অব-লোহিত রশ্মি। সূর্যালোকের বর্ণালীর এক প্রান্তে যে লাল বর্ণের স্তর থাকে তার চেয়েও বৃহত্তর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের রশ্মি আমরা আর চোখে দেখতে পাই না। লাল রশ্মির পরবর্তী এই অদৃশ্য রশ্মি হলো 'ইন্‌ফ্রা-রেড', বা অব-লোহিত রশ্মি। এটা আলোক, বা দৃশ্য বর্ণধর্মী নয়, সম্পূর্ণ তাপধর্মী; সূর্যের বিকিরিত তাপরশ্মি। এর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য দৃশ্য আলোক-রশ্মির চেয়ে বেশী, কিন্তু বেতার-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা কম।

ইন্‌ফ্রা সাউণ্ড (infra sound) — মোটামুটি 30-এর কম স্পন্দন-সংখ্যার শব্দ-তরঙ্গ। কখন-কখন বহু দূরে বোমা বিস্ফোরণের ফলে সেই উৎস থেকে আগত অতি মৃদু স্পন্দনের শব্দ মানুষের শ্রুতিগোচর না হলেও 'ফিজ্যাণ্ট' প্রভৃতি কোন-কোন পাখী সেই শব্দও অনুভব করতে পারে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। বেতার-যান্ত্রিক ব্যবস্থায় আজকাল এরূপ 'ইন্‌ফ্রা সাউণ্ড' মানুষেরও শ্রুতিগোচর করা সম্ভব হয়েছে।

ইন্‌ফ্লোরেসেন্স (inflorescence) —বহু পুষ্পের সমাবেশ-বিন্যাস; কোন উদ্ভিদের একই বৃন্তে একাধিক ফুলের পরস্পর যৌথভাবে উৎপত্তির অবস্থা ; যেমন, আমের পুষ্পমঞ্জরী।

ইন্‌ভার (invar) — একটা সংকর ধাতু ; 63·8% লৌহ, 36% নিকেল ও ·02% কার্বন মিশিয়ে তৈরী হয়। তাপের হ্রাস-বৃদ্ধিতে এর আয়তনের বিশেষ কোন হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। এজন্যে দামী ঘড়ির ব্যালান্স-হুইল ↑ ও অন্যান্য সূক্ষ্ম যন্ত্রাংশ নির্মাণে এই সংকর-ধাতু যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ইন্‌ভার্ট সুগার (invert sugar) — সমপরিমাণ গ্লুকোজ ↑ ও ল্যাভুলোজ ↑ শর্করার সংমিশ্রণ ; যা ইক্ষু চিনির (কেন্‌-সুগার ↑) রাসায়নিক রূপান্তরের ফলে উৎপন্ন হয়ে থাকে। ইক্ষুচিনির রাসায়নিক নাম হলো **সুক্রোজ** ↑। এর জলীয় দ্রবণে এক রকম এন্‌জাইমের ↑ প্রভাবে, অথবা কোন মৃদু অ্যাসিড দিয়ে ফুটালে, ওই সুক্রোজের হাইড্রোলিসিস-এর ↑ ফলে গ্লুকোজ ও ল্যাভুলোজ নামক দু'টি আইসোমার ↑ সমপরিমাণে সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই রাসায়নিক প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'ইন্‌ভার্সন অব কেন্‌-সুগার'।

ইন্‌ভার্টেজ (invertase) — এক রকম বিশেষ জৈব পদার্থ, বা এন্‌জাইম ↑ ; যা সাধারণতঃ ঈষ্টের ↑ মধ্যে থাকে। এই এন্‌জাইমটি ইক্ষুচিনির রূপান্তর ঘটিয়ে গ্লুকোজ ও ল্যাভুলোজ নামক শর্করা উৎপন্ন করে থাকে। (ইন্‌ভার্ট সুগার ↑)

ইন্‌ভোলিউশন (involution) — বিশেষ মানসিক বিকার, বা রোগ ; যেমন, **ইন্‌ভোলিউশন্যাল মেলা-ঙ্কোলিয়া** — যে মানসিক অবস্থায় মানুষ পারিপার্শ্বিকতার প্রতি ভ্রূক্ষেপ-হীনভাবে স্থবিরবৎ শুব্ধ ও আত্ম-কেন্দ্রীক হয়ে থাকে ; রোগ বিশেষ।

ইনসুলেশন (insulation) — তড়িৎ, বা তাপশক্তির পরিবহন বন্ধ করবার ব্যবস্থা। কোন তড়িতাবিষ্ট বস্তু থেকে তড়িৎ, বা উত্তপ্ত বস্তু থেকে তাপের পরিবহন প্রতিরোধ করবার কৌশল। তড়িৎ, বা তাপের পরিবহন রোধ করবার ক্ষমতা যে-সব পদার্থের আছে তাদের বলা হয় ইন্‌সুলেটর ↑।

ইন্‌সুলিন (insulin) — জীবদেহের প্যান্‌ক্রিয়াস ↑ গ্ল্যাণ্ডে উৎপন্ন একটি হর্মোন ↑। এর অভাবে ডায়াবিটিস, বা বহুমূত্র-রোগ জন্মে। কোন সুস্থ জীবদেহ থেকে ইন্‌সুলিন নিয়ে ডায়াবিটিস রোগীকে ইঞ্জেক্‌সন করে দেওয়া হয় ; এতে রক্তের শর্করার ভাগ কমে যায়, রোগের উপশম ঘটে। জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় 'ইন্‌সুলিন' রস ভুক্ত খাদ্যাদির শর্করা-উপাদানের সমতা রক্ষা করে।

ইন্‌সুলেটর (insulator) — প্রতি-রোধক, বা অ-পরিবাহী পদার্থ ; 'ইন্‌সুলেট' মানে বাধা দেওয়া, বা প্রতিরোধ করা। যে সব পদার্থের মাধ্যমে তড়িৎ পরিবাহিত হয় না, তাদের বলা হয় ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইন্‌সুলেটর ; যেমন—রাবার ↑, পোর্সিলেন ↑ প্রভৃতি। ভাল তড়িৎ-পরিবাহী

ধাতব তারের গায়ে এ-জন্য রাবারের আস্তরণ দিয়ে তড়িতের অযথা নির্গমণ, বা অপচয় রোধ, অর্থাৎ অ-পরিবাহী করা হয়। একই উদ্দেশ্যে টেলিগ্রাফের ↑ খুঁটির মাথায় পোর্সিলেনের নির্মিত এক রকম বাটির গায়ে লাগিয়ে বৈদ্যুতিক তার টানা হয়। আবার, তাপের বিকিরণ রোধ করবার জন্যে উত্তপ্ত পদার্থের গায়ে অ্যাস্‌বেস্টস ↑, ফেল্ট ↑ প্রভৃতির আবরণ দেওয়া হয়, যে-হেতু তাপ-শক্তির পক্ষে এ-সব হলো 'ইন্‌সুলেটর', বা তাপ-প্রতিরোধক পদার্থ।

ইনার্ট (inert)—নিষ্ক্রিয় ; যে পদার্থের কোন রাসায়নিক ক্রিয়া নেই ; কোন পদার্থের সঙ্গেই যার রাসায়নিক মিলন ঘটে না। হিলিয়াম, নিয়ন, ক্রিপ্‌টন, আর্গন ↑ প্রভৃতি গ্যাসকে **ইনার্ট গ্যাস** বলে।

ইনার্সিয়া (inertia) — জাড্য ; জড় বস্তুর নিজস্ব অবস্থায় থাকার প্রবণতা। বাইরের কোন শক্তি প্রয়োগ না করলে কোন জড় বস্তু, স্থির থাকলে বরাবর স্থিরই থাকবে ; আর চলমান থাকলে বরাবর একই দিকে একই গতিতে চলতে থাকবে। জড় বস্তুর এই প্রবণতা, বা ধর্মকে বলে ইনার্সিয়া, বা জাড্য। শক্তি প্রয়োগ ব্যতীত জড়ের গতি, বা স্থিতির কোন পরিবর্তন সম্ভব নয়।

ইনোকুলেশন (inoculation) — রোগ-বীজাণুর টিকা ; কোন রোগের জীবাণু সুস্থ জীবদেহে সামান্য পরিমাণে প্রবেশ করিয়ে সেই রোগের প্রতিরোধ-শক্তি বৃদ্ধি করবার ব্যবস্থা। বিজ্ঞানী পাস্তুর ↑ এর আবিষ্কারক। বাইরে থেকে কোন রোগ-জীবাণু নিয়ে সুস্থ দেহে প্রবেশ করালে ওই রোগের একটা মৃদু আক্রমণ ঘটে ; এর ফলে ওই রোগের তীব্র আক্রমণ প্রতিরোধ করবার একটা শক্তি (ইমিউনিটি ↑) স্বভাবতঃই প্রাণিদেহে সৃষ্টি হয়ে থাকে। পূর্বে সজীব জীবাণু নিয়ে এরূপ টিকা দেওয়া হোত, এখন মৃত জীবাণু, অথবা তাদের দেহ-নিঃসৃত রস, (টক্সিন ↑, অ্যান্টিটক্সিন) প্রভৃতির টিকা দিয়েও আশানুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছে। (ভ্যাক্‌সিনেশন ↑)

ইপ্‌সম সল্ট (epsom salt) — ম্যাগ্নেসিয়াম সাল্‌ফেটের বিশেষ নাম; সাধারণতঃ বলে **ম্যাগ সাল্‌ফ**, $MgSO_4.7H_2O$। সাদা স্ফটিকাকার পদার্থ, জলে দ্রবণীয়, বিরেচক ও ক্ষার-ধর্মী। কোষ্ঠ-কাঠিন্য রোগে জোলাপ-জাতীয় ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

ইপিকাক্‌ (ipecac)—ব্রেজিল দেশের এক রকম উদ্ভিদজাত অ্যাল্‌কালয়েড ↑ পদার্থ; এর মধ্যে অ্যামিটিন ↑ নামক ভেষজ পদার্থ রয়েছে। ঔষধটির প্রয়োগে রোগীর ঘাম হয়, বমির উদ্রেক করে। উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগে আমাশয় রোগে বিশেষ ফলপ্রদ ; শুষ্ক কাসির শ্লেষ্মা তরল করবার জন্যেও ব্যবহৃত হয়।

ইভাপোরেশন (evaporation) — বাষ্পীভবন ; উত্তাপের প্রভাবে তরল পদার্থের স্বতঃই বাষ্পে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া। কর্পূর, পেট্রল প্রভৃতি

অনেক পদার্থ স্বাভাবিক তাপেই দ্রুত বাষ্পীভূত হয়ে উবে যায়, এদের বলা হয় **ভোলাটাইল,** বা উদ্বায়ী পদার্থ। উন্মুক্ত পাত্রে জল রাখলেও এই প্রক্রিয়ায় স্বভাবতঃই তা ধীরে ধীরে বাষ্পীভূত হয়ে যায়। অধিকতর তাপ প্রয়োগ করলে বাষ্পীভবন প্রক্রিয়া দ্রুততর হয়ে থাকে। (বয়েলিং ↑)

ইভোলিউসন (evolution) — জৈব অভিব্যক্তি ; ক্রম-বিবর্তন। ক্ষুদ্র এক-কোষী জীব (উদ্ভিদ, বা প্রাণী) থেকে বহুকোষী জটিল গঠন-বিশিষ্ট উন্নত জীবের ক্রম-বিকাশ। কোটি কোটি বছরে এই 'ইভোলিউসন', বা ক্রম-বিবর্তনের ফলে এককোষী অতি সরল জীব প্রোটোজোয়া ↑, বা আদ্যপ্রাণী থেকে বর্তমান বহুকোষী জটিল গঠনের উন্নত জীব-জন্তু ও মানুষের উৎপত্তির ধারাক্রম।

ইমাল্‌সন (emulsion) — অবদ্রব ; মিশ্র তরল পদার্থ। একটি তরলের মধ্যে অপর কোন তরল, বা কঠিন পদার্থ যদি এমনভাবে অতি সূক্ষ্ম কণি-কায় প্রায় একীভূত হয়ে মিশে থাকে যে, তারা স্বভাবতঃ আর পৃথক হ'তে পারে না। জলে আর তেলে বিশেষ-ভাবে ফেটালে এরূপ ইমাল্‌সন হয়, তেলের সূক্ষ্ম কণিকাগুলো জলের কণিকার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে যায়। এভাবে জলের সঙ্গে প্রোটিন ↑ ও ল্যাক্টোজ ↑ সম্বলিত স্নেহ-পদার্থের স্বাভাবিক ইমাল্‌সন, অর্থাৎ অবদ্রব হলো দুধ।

ইমিউনিটি (immunity) — জীব-দেহের রোগ-প্রতিরোধক ক্ষমতা। এরূপ ক্ষমতা স্বাভাবিক, বা জন্মগতও হতে পারে ; আবার বিশেষ-বিশেষ রোগ-জীবাণুর ভ্যাক্‌সিন ↑ ইত্যাদি প্রয়োগেও জন্মানো যায়। এই রোগ-প্রতিরোধ শক্তি, বা ইমিউনিটির তার-তম্যের জন্যেই একই পারিপার্শ্বিক অবস্থায় থেকেও কেউ রোগাক্রান্ত হয়, কেউ বা সুস্থ থাকে।

ইম্মিসিব্‌ল (immiscible)—পরস্পর একীভূত হয়ে মিশে যায় না, এমন ; তরল পদার্থের বেলায়ই কথাটা সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়ে থাকে ; যেমন, জল আর তেল পরস্পর ইম্মিসিব্‌ল ; ইমাল্‌সন ↑ হয় মাত্র।

ইমেজ (image) — প্রতিচ্ছায়া ; কোন বস্তু থেকে আগত আলোক-রশ্মি দর্পণে প্রতিফলিত, বা লেন্সে ↑ প্রতি-সরিত হলে তার যে প্রতিবিম্ব পড়ে। এই প্রতিবিম্ব সোজাসুজি দর্শকের চোখে পড়তে পারে, আবার কোন পর্দার উপরেও ফেলা যায়। একে বলে 'রিয়েল ইমেজ', বা সদ্ প্রতি-বিম্ব। প্রতিবিম্ব আবার ভার্চুয়াল ↑ বা অ-প্রকৃতও হতে পারে। সাধারণ আয়নায় আমরা 'ভার্চুয়াল ইমেজ', বা অসদ্ প্রতিবিম্ব দেখি। এখানে আলোক-রশ্মির প্রত্যক্ষ প্রতিফলন হয় না; কাজেই তাতে দৃষ্ট প্রতিচ্ছায়া পর্দার উপর ফেলা যায় না।

ইয়োলো স্পট (yellow spot) — চক্ষু-গোলকের পশ্চাদ্বর্তী রেটিনার (retina) ↑ যেখানে দর্শন-স্নায়ুগুলির প্রান্তভাগ যুক্ত রয়েছে তার পার্শ্ববর্তী

যে বিন্দুতে দর্শনানুভূতি সর্বাধিক পরিস্ফুট হয়, সুস্পষ্ট দেখায়। আবার, এই স্নায়ুগুচ্ছের মধ্যবর্তী এক স্থানের একটি বিন্দু সম্পূর্ণ দর্শনানুভূতিহীন, যাকে বলে চক্ষুর 'অন্ধকার-বিন্দু' (blind spot)।

ইয়োলো স্পট

ইল্যাস্টিসিটি (elasticity) — স্থিতিস্থাপকতা; পদার্থের যে ধর্ম, বা বৈশিষ্ট্যের জন্যে চাপ দিলে তার আকার-আয়তন বদলে যায়; চাপ, বা টান ছেড়ে দিলে আবার পূর্ব আকার-আয়তনে স্বতঃই ফিরে আসে। এরূপ পদার্থকে বলা হয় **ইল্যাস্টিক,** বা স্থিতিস্থাপক পদার্থ; রাবার এর একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত। অধিকাংশ পদার্থেরই কিছু-না-কিছু ইল্যাস্টিসিটি অবশ্যই আছে; সামান্য বলে তা সাধারণতঃ চোখে ধরা পড়ে না।

ইলিক্সির (elixir) — সুমিষ্ট, সুস্বাদু ও সুগন্ধী তরল ঔষধ। **ইলিক্সির অব লাইফ**—প্রাচীন অ্যাল্‌কেমিস্টদের ↑ পরিকল্পিত ও আকাঙ্খিত 'জীবন-রসায়ন', বা সঞ্জীবনী সুধা।

ইলিপ্‌স (ellipse) — জ্যামিতিক উপবৃত্ত; কোন ঘনায়তনিক কোণকে (চিত্রানুযায়ী) বাঁকাভাবে পার্শ্বচ্ছেদ করলে যে ডিম্বাকার বৃত্ত-রেখা সৃষ্টি হয়। এরূপ উপবৃত্তের অভ্যন্তরে, এমন দু'টি বিন্দু থাকে পরিধির যে-কোন বিন্দু থেকে যাদের দূরত্বের সমষ্টি সর্বদা স্থির (একই) হয়ে থাকে। চিত্রে $P_1F_1 + P_1F_2 = P_2F_1 + P_2F_2 =$ স্থির রাশি। ঐ বিন্দু-দ্বয়কে বলা হয় উপ-বৃত্তের উৎকেন্দ্র, বা **ফোকাস**। সৌরমণ্ডলের গ্রহগুলি এরূপ উপবৃত্তীয় কক্ষ-পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে, সূর্য রয়েছে সেই উপবৃত্ত-পথের যে-কোন একটি ফোকাসে।
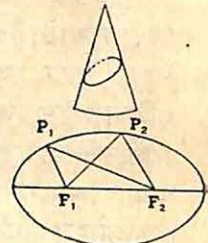
ইলিপ্‌স

ইলিপ্‌সয়েড (ellipsoid) — কোন উপবৃত্তকে (ইলিপ্‌স ↑) তার অক্ষের চারদিকে ঘোরালে যে ঘনায়তনিক ক্ষেত্র রচিত হয়। চিত্রের উপবৃত্তটির অক্ষ অ-অ$_1$, যার চারদিকে উহাকে চক্রাকারে ঘুরানো হ'চ্ছে।
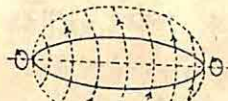
ইলিপ্‌সয়েড

ইলিয়াম (ilium) — মানব-দেহে মেরুদণ্ডের নিম্নভাগে সংলগ্ন চক্রাকারে যুক্ত যে অস্থি-জোট রয়েছে, তাকে বলে পেল্‌ভিস ↑ (pelvis), বা শ্রোণী-চক্র। এই শ্রোণীচক্রের দুই পার্শ্বস্থ ঊর্ধ্বভাগের চওড়া অস্থিখণ্ড-দ্বয়কে বলে ইলিয়াম; সাধারণ কথায় 'কোমরের দুই দিকের হাড়'।

ইলেক্‌ট্রন (electron) — পদার্থের পরমাণুর সংগঠক ঋণ-তড়িৎ কণিকা। মৌলিক পদার্থের পরমাণুর কেন্দ্র ,

বা নিউক্লিয়াসের ↑ চারদিকে এক, বা একাধিক এরূপ ঋণ-তড়িৎ কণিকা চক্রাকারে পরিভ্রমণ করে (অ্যাটমিক স্ট্রাক্‌চার ↑)। হাইড্রোজেন-পরমাণুর নিউক্লিয়াসের চারদিকে একটি মাত্র ইলেক্‌ট্রন ঘুরছে। বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুতে এরূপ ইলেক্‌ট্রনের সংখ্যা বিভিন্ন হয়ে থাকে।

ইলিয়াম (ileum) — আমাদের খাদ্য-নালীর (অ্যালিমেণ্টারি ক্যানেল ↑) ক্ষুদ্রান্ত্র-অংশের শেষ প্রান্তভাগ ; যার

ক্ষুদ্রান্ত্রের ইলিয়াম সংযোগ

নলমুখ বৃহদন্ত্রের সিকাম (caecum) ↑ অংশে প্রবেশ করেছে।

ইলেক্‌ট্রন (elektron) — অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, ম্যাগ্নেসিয়াম ও জিঙ্কের একটি বিশেষ আনুপাতিক সম্মিলনে প্রস্তুত এক প্রকার সংকর-ধাতুর ব্যবসায়িক নাম ; যন্ত্র-বিজ্ঞানে, বিশেষতঃ অ্যারোপ্লেনের যন্ত্রাংশ নির্মাণে বহুল ব্যবহৃত হয়।

ইলেক্‌ট্রন মাইক্রোস্কোপ (electron microscope) — সাধারণ মাইক্রোস্কোপ, বা অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃশ্য বস্তু থেকে বিকিরিত, বা প্রতিফলিত আলোক-রশ্মি যন্ত্রের লেন্সের মাধ্যমে এসে আমাদের চোখে পড়ে। যন্ত্রটির বিভিন্ন লেন্সের সাহায্যে বর্ধিতাকারে দৃশ্য বস্তুর সেই প্রতিবিম্ব আমরা দেখতে পাই। কিন্তু দ্রষ্টব্য বস্তুটা যদি আলোক-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য অপেক্ষাও ক্ষুদ্র হয়, তবে আর তা থেকে অলোক-তরঙ্গ প্রতিফলিত হতে পারে না ; ফলে, সেরূপ অতি সূক্ষ্ম বস্তু সাধারণ মাইক্রোস্কোপে অদৃশ্য থেকে যায়। এখন, ক্যাথোড - রে - টিউব ↑ যন্ত্রের ক্যাথোড-প্রান্ত থেকে ইলেক্‌ট্রনের যে ধারা-প্রবাহ বেরোয় তার প্রকৃতি আলোক-রশ্মিরই অনুরূপ বটে ; কিন্তু এর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সাধারণ আলোক-রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের চেয়ে অনেক কম। কাজেই ইলেক্‌ট্রনের এই ধারা-রশ্মিতে প্রতিফলিত হয়ে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র (যা সাধারণ মাইক্রোস্কোপে ↑ অদৃশ্য) কণিকাও পরিদৃষ্ট হতে পারে। ইলেক্‌ট্রন-মাইক্রোস্কোপ যন্ত্রে জটিল যান্ত্রিক কৌশলে এরূপ প্রতিফলনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মোটামুটিভাবে বলা যায়, এতে দ্রষ্টব্য বস্তুর উপরে ইলেক্‌ট্রনের সমান্তরাল ধারারশ্মি নিক্ষিপ্ত হয়, আর যন্ত্রের এক বিশেষ চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে প্রতিফলিত রশ্মি কেন্দ্রীভূত হয়ে বস্তুটার বর্ধিতাকার প্রতিচ্ছায়ার সৃষ্টি করে। এই প্রতিচ্ছায়া এক রকম বিশেষ প্রতিপ্রভ (ফ্লোরেসেণ্ট ↑) পর্দার উপরে ফেলা হয় এবং ক্যামেরায় তার আলোক-চিত্রও তোলা যায়।

ইলেক্‌ট্রন লেন্স (electron lens)— ইলেক্‌ট্রন ↑ কণিকার ধারারশ্মি যে বিশেষ চৌম্বক ক্ষেত্রের (ম্যাগ্নেটিক ফিল্ড ↑) প্রভাবে এক বিন্দুতে এনে সংহত (ফোকাস ↑) করা সম্ভব হয়েছে,

যেমন কাঁচের লেন্সে ↑ প্রতিসরিত আলোক-রশ্মি একস্থানে সংহত হয়। ইলেক্‌ট্রন-মাইক্রোস্কোপে ↑ এরূপ যে চৌম্বক ক্ষেত্রকে সাধারণ লেন্সের মত ব্যবহার করা হয় তাকে বলা হয় 'ইলেক্‌ট্রন লেন্স'।

ইলেক্‌ট্রনিক্স (electronics) — ইলেক্‌ট্রনের ধর্ম ও গতিবিধি সম্বন্ধীয় তত্ত্বীয় বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের যে শাখায় রেডিও ভাল্‌ব ↑ , ক্যাথোড-রে-টিউব ↑ প্রভৃতি যন্ত্রাদি (যাদের মধ্যে মুক্ত ইলেক্‌ট্রন-কণিকা চলাচল করানো হয়) বিষয়ক জটিল তথ্যাদি আলোচিত হয়ে থাকে।

ইলেক্‌ট্রিসিটি (electricity) — তড়িৎ, বা বিদ্যুৎ শক্তি। পদার্থের পারমাণবিক গঠনে যে ঋণ-তড়িৎ-বিশিষ্ট ইলেক্‌ট্রন ↑ কণিকা রয়েছে বিভিন্ন উপায়ে তাদের উত্তেজিত করলে যে শক্তির উদ্ভব হয়। খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ছয় শত বছর পূর্বে **অ্যাম্বার** ↑ নামক পদার্থে এই শক্তির প্রথম পরিচয় লাভ করেন থেল্‌স নামে এক বিজ্ঞানী। বিশেষ ব্যবস্থায় কোন তড়িৎ-পরিবাহী পদার্থের মধ্যে দিয়ে এই শক্তিকে প্রবাহিত করা যায়। একে আবার তাপশক্তি, আলোকশক্তি, বা যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করাও যেতে পারে। এই তড়িৎ-শক্তিকে বিশেষ ব্যবস্থায় কোন পদার্থের মধ্যে স্থিরভাবে আবদ্ধ রাখা যায়, তখন একে বলে **স্ট্যাটিক ইলেক্‌ট্রিসিটি**, বা স্থির-তড়িৎ। যখন একে কোন বিদ্যুৎ-পরিবাহী ধাতব তারের মাধ্যমে প্রবাহিত করে আলোক, উত্তাপ প্রভৃতি শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়, তখন তাকে বলা হয় **কাইনেটিক,** বা **কারেন্ট** ইলেক্‌ট্রিসিটি, অর্থাৎ চল-বিদ্যুৎ। সাধারণতঃ ধাতব পদার্থ মাত্রই উৎকৃষ্ট তড়িৎ-পরিবাহী (ইলেক্‌ট্রিক্যাল কণ্ডাক্টর) হয়ে থাকে।

ইলেক্‌ট্রিক কারেণ্ট (electric current) — তড়িৎ-শক্তির ধারা-প্রবাহ ; কোন পরিবাহী ধাতব তারের ভিতর দিয়ে ধারাকারে ইলেক্‌ট্রন-কণিকার গতিস্রোত। তড়িৎ-শক্তির উচ্চচাপের ফলে ইলেক্‌ট্রন, বা ঋণ-তড়িৎ কণিকাগুলো প্রকৃতপক্ষে ধন-তড়িৎ কণিকা, বা প্রোটনের ↑ বিপরীত দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। তড়িৎ-প্রবাহের এই গতি-পথ তারের মাধ্যমে সর্বদা অবিচ্ছিন্ন (সম্পূর্ণ চক্রাকারে) রাখতে হয়; একেই বলে **ইলেক্‌ট্রিক সার্কিট**। ওই তার কোথাও বিচ্ছিন্ন হলেই প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। প্রবাহ সৃষ্টির পদ্ধতি অনুসারে ইলেক্‌ট্রিক কারেণ্ট বস্তুতঃ দু'-রকম — এ. সি. (অল্টারনেটিং কারেণ্ট ↑) এবং ডি. সি. (ডাইরেক্ট কারেণ্ট)। এ. সি. প্রবাহে তড়িৎ-শক্তির চাপ ক্রমাগত অতি দ্রুত হ্রাস-বৃদ্ধি করা হয় ; এক দিকে হঠাৎ চাপ বেড়ে যায়, মুহূর্তে কমে গিয়ে বিপরীত দিকে বেড়ে যায়। প্রবাহের এই গতি পরিবর্তন সেকেণ্ডে 50 বার, বা তারও বেশী হয়ে থাকে। এজন্যে একে বাংলায় 'পরিবর্তী-

প্রবাহ' বলা হয়। ডি. সি. প্রবাহে তড়িৎ-শক্তি, অর্থাৎ ইলেক্ট্রনের ধারা-প্রবাহ ক্রমাগত একই দিকে সমানভাবে প্রবাহিত হয়ে থাকে, গতি-পথের দিক পরিবর্তন হয় না। তাই একে বলা হয় ডাইরেক্ট, বা 'একমুখী প্রবাহ'।

ইলেক্‌ট্রিক জেনারেটর (electric generator) — যে যন্ত্রের সাহায্যে তড়িৎ-শক্তি উৎপাদিত হয়; ডায়-নামো ↑ যন্ত্র। এই যন্ত্র বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন যান্ত্রিক পদ্ধতির হতে পারে। তড়িৎ-শক্তি উৎপাদন করবার যান্ত্রিক কেন্দ্রকে বলে **পাওয়ার স্টেশন**; এ সব কেন্দ্র সাধারণতঃ দু-রকম হয়ে থাকে: **থার্মাল** ↑ ও **হাইড্রো ইলেক্‌ট্রিক** ↑ পাওয়ার ষ্টেশন। তেল, কয়লা প্রভৃতি জ্বালানির সাহায্যে উত্তাপ সৃষ্টি করে যে-সব জেনারেটরের যন্ত্র চালানো হয় তাদের বলে থার্মাল, বা তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র; আর জল-স্রোতের শক্তি নিয়ন্ত্রিত করে যে জেনারেটর চালানো হয়, তাকে বলে হাইড্রো - ইলেক্‌ট্রিক ↑ জেনারেটর, অর্থাৎ জল-শক্তিতে চালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। আবার, বাষ্পের, বা জলস্রোতের চাপে টার্বাইন ↑ চালিত ও পারমাণবিক শক্তি (নিউক্লিয়ার এনার্জি ↑) চালিত বিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্রও উদ্ভাবিত হয়েছে। বিরাট শক্তি-শালী এরূপ বিভিন্ন ষ্টেশন থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি তারের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজের জন্যে দূর-দূরান্তে সরবরাহ করা হয়।

ইলেক্‌ট্রিক ল্যাম্প (electric lamp) — তড়িৎ-শক্তির প্রভাবে আলোক উৎপাদনের বাতি। তড়িৎ-প্রবাহের ফলে বিশেষ-বিশেষ ধাতুর (সাধারণতঃ টাংষ্টেন ↑ ধাতুর) সরু তার অত্যুত্তপ্ত ও প্রদীপ্ত হয়ে আলোক বিকিরণ করে। ওই সরু তার, বা ফিলামেণ্ট ↑ থাকে বায়ুশূন্য, বা নিষ্ক্রিয় কোন গ্যাসে পূর্ণ কাচ-গোলকের মধ্যে, যাকে বলে ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌ব। এই হলো সাধারণ ইলেক্‌ট্রিক ল্যাম্প। ইদানিং নিয়ন ↑ গ্যাস-ভরতি বাল্‌বের প্রচলন হয়েছে। কাঁচের বাল্‌ব, বা টিউবের মধ্যে নিয়ন গ্যাস ভর্তি করে তার দুই প্রান্তে দু'টা ধাতব চাক্‌তি, বা জড়ানো তার-কুণ্ডলী জুড়ে দেওয়া হয়। ওই দু'টা চাক্‌তি, বা তারের মাধ্যমে নিয়ন গ্যাসের ভিতর দিয়ে তড়িৎ-স্ফূরণ ঘটালে সুদৃশ্য লাল রং-এর আলোক বিকিরিত হয়। বাল্‌বের মধ্যে নিয়ন ছাড়া অন্যান্য ফ্লোরেসেণ্ট ↑ গ্যাস ভরতি করেও এভাবে বিভিন্ন বর্ণের সুদৃশ্য আলোক সৃষ্টি করা যায়।
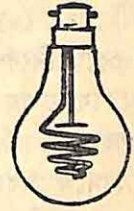
নিয়ন-ল্যাম্প

ইলেক্‌ট্রিক বেল (electric bell) — বৈদ্যুতিক শক্তিতে ঘণ্টা ধ্বনি-উৎপাদক যন্ত্র। বেল, ইলেক্‌ট্রিক ↑।

ইলেক্‌ট্রাম (electrum) — স্বর্ণ ও রৌপ্যের একটি আকরিক ধাতু-সংকরের বিশেষ নাম। এরূপ রৌপ্য-

মিশ্রিত খনিজ স্বর্ণ কোথাও কোথাও পাওয়া যায়। কখন কখন অলঙ্কারাদিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ইলেক্‌ট্রো-এন্সেফালোগ্রাম (electro-encephalogram)—ইলেক্‌ট্রো-এন্সেফালোগ্রাফ নামক যন্ত্রের সাহায্যে অঙ্কিত মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্রগুলোর বিশেষ বৈদ্যুতিক স্পন্দনের গতি-প্রকৃতি নির্দেশক রেখা-চিত্র। মস্তিষ্কের কোষগুলোর অতি মৃদু স্পন্দন বহু সহস্র গুণ বর্ধিত হয়ে তরঙ্গের আকারে কাগজে রেখাপাত করে। এই রেখা দেখে মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্নায়ুর কার্যকারিতার তারতম্য বুঝা যায়। যেমন, একজন সুস্থ লোকের মস্তিষ্ক থেকে সেকেণ্ডে 8 থেকে 13-টি তরঙ্গ-রেখা পাওয়া যায়; কিন্তু মৃগী রোগাক্রান্ত কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই তরঙ্গ-রেখা সেকেণ্ডে মাত্র 6, বা 7-টার বেশী হয় না। মস্তিষ্কের স্নায়ু-বৈকল্য নিরূপণের জন্য বিভিন্ন অবস্থায় রোগীর মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্নায়ু-কেন্দ্রের এরূপ তড়িত্তরঙ্গের আকৃতি ও প্রকৃতির বিভিন্নতা লক্ষিত হয়ে থাকে।

ইলেক্‌ট্রো-কম্‌প্লেক্স (electro complex) — মনোবিকার বিশেষ; যার ফলে কোন-কোন বালিকা পিতার প্রতি অত্যধিক আকৃষ্ট হয়; পরন্তু মাতার প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে। এটা যেন কতকটা বিপরীতধর্মী বৈদ্যুতিক আকর্ষণের মত।

ইলেক্‌ট্রো-কার্ডিওগ্রাম (electro cardiogram) — বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে এক রকম যান্ত্রিক কৌশলে অঙ্কিত হৃৎস্পন্দনের রেখাচিত্র। এরূপ যন্ত্রকে বলা হয় **ইলেক্‌ট্রো-কার্ডিও গ্রাফ**। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অনিয়মিত হলে এই যন্ত্রের সাহায্যে তার অবস্থা নিরূপণ করা হয়; রেখা-চিত্রের ধরন দেখে হৃৎপিণ্ডের কার্যকারিতার ত্রুটি-বিচ্যুতি সহজেই ধরা যায়। সংক্ষেপে বলে ই. সি. জি. (E. C. G.)।

কার্ডিয়োগ্রাম

ইলেক্‌ট্রো-কেমিস্ট্রি (electro chemistry) — ইলেক্‌ট্রোলিসিস↑ সম্পর্কিত রসায়ন শাস্ত্র; তড়িৎ-প্রবাহের প্রভাবে বিশেষ ব্যবস্থায় বিভিন্ন পদার্থের সাংগঠনিক ও রাসায়নিক যে-সব পরিবর্তন ঘটে তৎ-সম্পর্কীয় বিজ্ঞান।

ইলেক্‌ট্রোথেরাপি (electro-therapy) — মানসিক রোগের বিশেষ বৈদ্যুতিক চিকিৎসা-পদ্ধতি; মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্নায়ুকেন্দ্রে বিশেষ ব্যবস্থায় মৃদু তড়িৎ-প্রবাহ চালিয়ে মাংসপেশীর বিক্ষেপ সৃষ্টি করে', কখন-কখন বা রোগীর চেতনা-বিলুপ্তি ঘটিয়ে বিভিন্ন প্রকার মনোবিকার সৃষ্টিকারী বিকল মস্তিষ্ক-স্নায়ুগুলিকে (cranial nerves) ক্রমে স্বাভাবিক করে তোলা হয়।

ইলেক্‌ট্রোড (electrode)—তড়িৎ-দ্বার; তড়িৎ-পরিবাহী কোন পদার্থে তৈরী যে দণ্ড, চাক্‌তি, বা তার-কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ কোন তরল, বা গ্যাসীয় পদার্থের মধ্যে

প্রবিষ্ট হয়, অথবা তা থেকে বেরিয়ে যায়। যে তড়িৎ-দ্বার দিয়ে কোন তরল ইলেক্‌ট্রোলাইট ↑ পদার্থের, বা তার জলীয় দ্রবণের মধ্যে তড়িৎ-স্রোত প্রবেশ করে তাকে বলে **অ্যানোড** ↑, বা ধন-তড়িৎদ্বার; আর যেটা দিয়ে তড়িৎ-স্রোত বেরিয়ে যায় তাকে বলে **ক্যাথোড** ↑, বা ঋণ-তড়িৎদ্বার।

ইলেক্‌ট্রোমোটিভ ফোর্স (electromotive force)— বৈদ্যুতিক চাপশক্তি; এই চাপশক্তির প্রভাবেই তড়িৎ-স্রোত ধাতব তারের পূর্ণ বর্তনীর মধ্যে ধন-তড়িদ্দ্বার থেকে ঋণ-তড়িদ্দ্বারের পথে প্রবাহিত হয়। তড়িতের এই চাপ-শক্তি ভোল্ট ↑ এককে পরিমিত হ'য়ে থাকে।

ইলেক্‌ট্রোমিটার (electrometer) — যে যন্ত্রের সাহায্যে তড়িৎ-শক্তির চাপ, অর্থাৎ ভোল্টেজ ↑ মাপা হয়। তড়িতের চাপ নিরূপণের জন্যে নানা রকম যান্ত্রিক ব্যবস্থার ইলেক্‌ট্রোমিটার, বা ভোল্টমিটার ↑ যন্ত্র আছে।

ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগ্‌নেট (electromagnet)—বৈদ্যুতিক তার-জড়ানো লৌহদণ্ড; কাঁচা লোহার এই দণ্ডটা সোজা, বা ইংরেজী U অক্ষরের আকারে বাঁকানো ও হতে পারে। জড়ানো ওই ধাতব তারের মাধ্যমে তড়িৎ-প্রবাহ চালালে দণ্ডটা সাময়িক-ভাবে বিশেষ চৌম্বক শক্তি লাভ করে; একেই বলা হয় ইলেক্‌ট্রোম্যাগ্‌নেট; বাংলায় একে বলে তড়িৎ-চুম্বক। ওই তারের মধ্যে তড়িৎপ্রবাহ যতক্ষণ চলে দণ্ডের চৌম্বক ধর্মও বস্তুতঃ ততক্ষণ মাত্র থাকে।
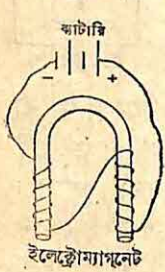
ব্যাটারি

ইলেক্ট্রোম্যাগ্‌নেট

ইলেক্‌ট্রোলাইট (electrolyte)— তড়িৎ-বিশ্লেষ্য পদার্থ; ইলেক্ট্রোলিসিস্ প্রক্রিয়ায় যে পদার্থের দ্রবের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলাচল করে। এরূপ ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ-প্রবাহ ওই পদার্থের তড়িতাহিত পরমাণুর (আয়ন ↑) মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। কপার-সাল্‌ফেট, বা তুঁতের জলীয় দ্রবণের মধ্যে দু'টি ইলেক্‌ট্রোড ↑ বসিয়ে ব্যাটারির তার জুড়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালানো হলে ব্যাটারি থেকে বিদ্যুৎ-প্রবাহ অ্যানোডের ↑ মধ্য দিয়ে ওই দ্রবণের মাধ্যমে ক্যাথোডে ↑ পৌঁছে, আবার ব্যাটারিতে ফিরে যায়। এর ফলে ওই দ্রবের কপার সালফেট, অর্থাৎ ইলেক্‌ট্রোলাইট পদার্থটি বিশ্লিষ্ট হয়ে তার ঋণ-তড়িতাবিষ্ট সাল্‌ফেট, আয়নগুলো ক্যাথোড থেকে অ্যানোডে চলে যায়; আর ধন-তড়িতাবিষ্ট কপার (তামা) আয়নগুলো অ্যানোড থেকে ক্যাথোডে যায়। এভাবে তামার সূক্ষ্ম কণিকা ক্যাথোডের গায়ে জমে তার একটা পাত্‌লা আস্তরণের সৃষ্টি করে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় **ইলেক্‌ট্রোপ্লেটিং** ↑। আর ওই দ্রবের কপার সাল্‌ফেট, যা বিশ্লিষ্ট হয়, তাকে বলে ইলেক্‌ট্রোলাইট, অর্থাৎ তড়িৎ-বিশ্লেষ্য পদার্থ।

ইলেক্‌ট্রোলিসিস (electro-

lysis) — তড়িৎ-বিশ্লেষণ। বিশেষ বিশেষ ইলেক্‌ট্রোলাইট ↑ পদার্থের দ্রবের মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহ চালালে ওই সব পদার্থের রাসায়নিক বিশ্লেষণ ঘটে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় ইলেক্‌ট্রোলিসিস্‌, বাংলায় বলা হয় তড়িৎ-বিশ্লেষণ। প্রবাহের ক্যাথোড ← ও অ্যানোড ↑ তড়িদ্দ্বার ছু'টির মধ্যে ওই পদার্থের পরমাণুগুলো আয়নায়িত হয়ে পড়ে, আর সেই আয়ন ↑ কণিকাগুলোর মাধ্যমে তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত হতে থাকে। দ্রবীভূত ইলেক্‌ট্রোলাইট পদার্থটির রাসায়নিক উপাদানগুলোর ধনাত্মক আয়ন (ধাতব) কণিকা সমূহ চলে গিয়ে ক্যাথোড ↑ দ্বারের গায়ে জমে এবং ঋণাত্মক আয়ন-কণিকা সব অ্যানোড-দ্বারে বিমুক্ত হয়। পদার্থের এরূপ বিশ্লেষণের হার নির্ভর করে প্রধাণতঃ দ্রাবক ও দ্রাব্য পদার্থ ছু'টির এবং ইলেক্‌ট্রোডের রাসায়নিক গঠন ও প্রকৃতির উপরে।
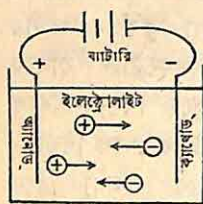
ইলেক্‌ট্রোলিসিস্‌

ইলেক্‌ট্রোলিটিক কপার (electrolytic copper) — ইলেক্‌ট্রোলিসিস প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত অতি বিশুদ্ধ তামা; তামার কোন রাসায়নিক লবণ (কপার সল্ট ↑) থেকে ইলেক্‌ট্রোলিসিস ↑ প্রক্রিয়ায় ক্যাথোডের গায়ে যে অতি বিশুদ্ধ ধাতব তামা কণিকাকারে সঞ্চিত হয়।

ইলেক্‌ট্রোপ্লেটিং (electro-plating)—কোন ধাতব জিনিসের উপরে ইলেক্‌ট্রোলিসিস ↑ প্রক্রিয়ার সাহায্যে অন্য কোন ধাতুর সূক্ষ্ম আস্তরণ দেওয়ার বিশেষ রাসায়নিক পদ্ধতি। সাধারণতঃ এরূপ প্রক্রিয়াকে বাংলায় 'গিল্‌টি করা' বলা হয়। এভাবে কপার-প্লেটিং, সিল্‌ভার-প্লেটিং, গোল্ড-প্লেটিং প্রভৃতি করবার ব্যবস্থা করা যায়। যে ধাতুর আস্তরণ দিতে হবে তার কোন সল্টকে করতে হবে ইলেক্‌ট্রোলাইট ↑; আর ঋণ-তড়িৎ-দ্বার, বা ক্যাথোড ↑ প্রান্তে ঝুলানো থাকবে বিশেষভাবে পরিষ্কৃত ধাতব জিনিসটা, যার গায়ে ইলেক্‌ট্রোলিসিস্‌ ↑ প্রক্রিয়ায় দ্রবের ইলেক্‌ট্রোলাইট ↑ সল্টটির ধাতব উপাদানের সূক্ষ্ম কণিকাগুলো গিয়ে লেগে যাবে।

ইলেক্‌ট্রোস্কোপ (electroscope) — যে যন্ত্রের সাহায্যে তড়িৎ-শক্তির অস্তিত্ব নিরূপণ করা হয়। এ-জন্যে সাধারণতঃ গোল্ড-লিফ্‌-ইলেক্‌ট্রোস্কোপ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যন্ত্রটা হলো একটা বদ্ধ-মুখ কাঁচের জার; কোন একটি তড়িৎ-পরিবাহী ধাতব দণ্ডের সঙ্গে লাগানো সোনার ছু-খানা পাত্‌লা পাত্‌ ওই জারের মধ্যে ঝোলানো থাকে। উপরে ওই ধাতব দণ্ডের সঙ্গে কোন জিনিসকে বৈদ্যুতিক তার দিয়ে সংযোগ করলে, যদি তাতে তড়িৎ শক্তি থাকে, তবে তা ওই দণ্ডের
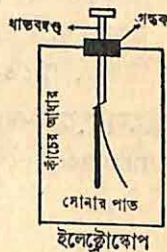
ইলেক্‌ট্রোস্কোপ

ভিতর দিয়ে সোনার পাত দু'খানাকে তড়িতাবিষ্ট করবে ; আর তাতে সম-তড়িতাবিষ্ট হওয়ার ফলে পাত্ দু'খানা পরস্পর থেকে সরে ফাঁক হয়ে যাবে। তারের সংযোগ কেটে দিলে পাত্ দু-খানা তড়িৎ-বিহীন হয়ে আবার জুড়ে যাবে। কোন পদার্থে অতি সামান্য তড়িৎ-শক্তির অস্তিত্বও এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে সহজেই নিরূপণ করা যায়।

ইলেক্‌ট্রোস্ট্যাটিক্স (electro-statics) — স্থির-তড়িৎ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। ফ্লানেল, বা সিল্ক দিয়ে ঘসলে কাচের দণ্ডে তড়িৎ সঞ্চারিত হয় ; এই তড়িৎশক্তি কাচে স্থির, অর্থাৎ প্রবাহবিহীন অবস্থায় থাকে। ধাতব তারের মাধ্যমে তড়িতের যেরূপ সঞ্চলন, বা প্রবাহ সৃষ্টি হয়, কাচের স্থির-তড়িতে তেমন হয় না। এরূপ স্থির, অর্থাৎ স্থিতিশীল তড়িৎ-শক্তি সম্বন্ধীয় বিভিন্ন তথ্যের আলোচনা বিজ্ঞানের এই শাখার অন্তর্গত।

ইলুট্রিয়েশন (elutriation) — পদার্থের অতি সূক্ষ্ম কণিকাসমূহ পৃথকীকরণের একটি প্রক্রিয়া। চূর্ণিত অদ্রাব্য পদার্থে জল দিয়ে নেড়ে রেখে দিলে তার বৃহত্তর কণিকাগুলো থিতিয়ে তলায় জমে, অতি সূক্ষ্ম কণিকাগুলো উপরের জলে অদৃশ্যভাবে ভাসতে থাকে। উপরের এই জল সাবধানে ঢেলে নিয়ে বাষ্পীভবন (evaporation) প্রক্রিয়ার সাহায্যে পদার্থটির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অতি-মসৃণ কণিকাসমূহ পাওয়া যায়। এই প্রক্রিয়াকে বলে ইলুট্রিয়েশন।

ইয়েলো-ফিভার (yellowfever)— পীতজ্বর ; দক্ষিণ আমেরিকার এক রকম মারাত্মক ব্যাধি। স্থানীয় এক জাতীয় মশার দংশনে সংক্রামিত হয়। এ-রোগে লিভার, পাকস্থলী প্রভৃতির প্রদাহ ও স্ফীতি ঘটে, গাত্রচর্ম হল্‌দে হয়ে যায়, রোগী কালো বমি করে। আজকাল এর প্রতিষেধক ঔষধাদি আবিষ্কৃত হয়েছে।

ইস্টম্যান (Eastman), জর্জ — আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট পদার্থ-বিজ্ঞানী ; জন্ম নিউইয়র্কে 1854 খৃঃ, মৃত্যু 1932 খৃঃ। আলোকচিত্র শিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধন, দ্রুত ফটো-গ্রাফির ↑ জড়ানো সিনেমা-ফিল্ম ↑ ব্যবহারের পদ্ধতির উদ্ভাবন 1884 খৃঃ। বিশ্ব-বিখ্যাত কোড্যাক ক্যামেরা ↑ নির্মাণ 1888 খৃঃ। উপার্জিত বিপুল ধন-সম্পত্তি জনহিতে ও শিক্ষাবিস্তারে দান করে গেছেন।

ঈষ্ট (yeast) — ছত্রাক জাতীয় এক রকম এককোষী উদ্ভিদ ; কোরকোদ্‌গম (budding) পদ্ধতিতে দ্রুত বংশ-বৃদ্ধি করে। এর সাহায্যে বিভিন্ন জৈব পদার্থের গাঁজন-ক্রিয়া সংঘটিত হয়। পাউরুটি নরম ও ফাঁপা করবার জন্যে ময়দার সঙ্গে অনেক সময় ঈষ্ট মিশিয়ে নেওয়া হয়। চিনির রস ঈষ্ট দিয়ে গাঁজিয়ে মদ্য প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। ঈষ্টে বিভিন্ন রকম এন্‌জাইম ↑ থাকে ; যাদের প্রভাবে

কার্বোহাইড্রেট পদার্থে এরূপ বিভিন্ন রাসায়নিক রূপান্তর সম্ভব হয়ে থাকে।

উ

উইলো (willow) — এক জাতীয় বৃক্ষের সাধারণ নাম ; পাশ্চাত্য দেশে জলাভূমি অঞ্চলেই প্রধানতঃ জন্মে। 'হোয়াইট উইলো', 'উইপিং উইলো' প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। সাধারণতঃ সাদা ফুল ফোটে, পাতা ফলকাকৃতি, কাণ্ড দৃঢ়, অথচ নরম। বিভিন্ন শ্রেণীর উইলো কাঠ থেকে ক্রিকেটের ব্যাট, বাস্কেট, ঝুড়ি প্রভৃতি তৈরি হয়ে থাকে।

উইলো-দি-উইস্‌প (willow-the-wisp)—আলেয়া, ইগ্নিস ফেটুয়াস ↑ ; পতিত জলাভূমি অঞ্চলে জৈব পদার্থাদি পচে' কখন-কখন ফস্‌ফিউরেটেড হাইড্রোজেন ↑ প্রভৃতি স্বভাব-দাহ্য গ্যাস জন্মে এবং তা বায়ুর সংস্পর্শে জ্বলে উঠে জলাভূমিতে যে অপস্রিয়মান ক্ষণস্থায়ী আলোক-শিখা রাত্রিকালে পরিদৃষ্ট হয়।

উইণ্ড পাইপ (wind-pipe) — শ্বাস-নালী ; নাসিকার পশ্চাদ্‌ভাগ থেকে গলদেশের যে নল-পথে শ্বাসবায়ু গিয়ে ফুস্‌ফুসে পৌঁছায়। এই শ্বাস-নালী 'ট্রেকিয়া' নামেও অভিহিত হয়ে থাকে। ল্যারিংস ↑ হলো এই নল-পথেরই ঊর্ধ্বাংশ।

উইণ্ড পাইপ

উইণ্ড মিল (wind mill) — বায়ু-প্রবাহের বেগ-শক্তির নিয়ন্ত্রণে চালিত যন্ত্র বিশেষ। নৌকার পালের মত ব্যবস্থায় বায়ু-প্রবাহের বেগ-শক্তি সংহত করে কৌশলে যন্ত্রের চাকা ঘোরানো হয়। সাধারণতঃ শস্যাদি চূর্ণ করা ও জল উপরে তোলবার কাজে অদ্যাপি কোন-কোন দেশে এ-যন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রথম দিকে ছিল এক-দণ্ডী 'পোস্ট-মিল' ; পরে 'টাওয়ার মিল' উদ্ভাবিত হয়, যার ঘূর্ণায়মান শীর্ষভাগের চারিদিকে সাধারণতঃ ক্যান্‌ভাসের চারখানা পাল, বা ধাতব ব্লেড লাগানো থাকে। কোন জ্বালানি ব্যতিরেকে কেবলপ্রাকৃতিকশক্তির সাহায্যে এরূপ যন্ত্র চালনায় কাজ পাওয়া বেশ লাভজনক। আজকাল পালের পরিবর্তে হাল্‌কা ধাতব ব্লেড লাগিয়ে উন্নত ধরনের অধিকতর কার্যকরী 'উইণ্ড মিল' তৈরী হয়েছে। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে এর সাহায্যে ইদানিং আবার সস্তায় কিছু তড়িৎ-শক্তি উৎপাদনেরও ব্যবস্থা হয়েছে।

উইম্‌সহার্স্ট মেসিন (Wimshurst machine) — স্থির-তড়িৎ (স্ট্যাটিক ইলেক্‌ট্রিসিটি ↑) উৎপাদনের জন্য উদ্ভাবিত এক প্রকার যন্ত্র। প্রধানতঃ এতে কাচ-নির্মিত কতকগুলি ঘূর্ণায়মান প্লেটের সঙ্গে ধাতব প্লেটের ঘর্ষণের ফলে তড়িৎ উৎপাদিত হয় এবং তা কৌশলে সঞ্চিত করে রাখবার ব্যবস্থা থাকে।

উড্ কক্ (wood cock)—দীর্ঘ সরল চঞ্চুবিশিষ্টএক প্রকার পক্ষী ; আমাদের দেশে এদের বলে 'কাঠ-ঠোক্‌রা'।

আরক্ত ধূসর বর্ণের পালকে আচ্ছাদিত, আর তার মা ঝে মা ঝে কালো রেখাযুক্ত। সাধারণতঃ এরা মাটির গর্তে, বা বড় গাছের কো ট রে বাস করে।

উড্ কক্

উড্ মেটাল (wood metal)—একটা সংকর ধাতুর বিশেষ নাম। 50 % বিস্‌মাথ, 25 % সীসা, 12·5 % টিন, 12·5% ক্যাড্‌মিয়াম ↑ মিশিয়ে এটা তৈরী। মাত্র 71° সেন্টিগ্রেড উত্তাপে গলে যায়। এরূপ নিম্ন-গলনাংকের জন্যে এ দিয়ে অনেক সময় বড়-বড় বাড়ীর জলের পাইপের মুখ বন্ধ করা থাকে। আগুন লাগলে ওই জোড়া-মুখ সহজেই গলে খুলে যায়, আর জল বেরিয়ে আগুনের ব্যাপ্তি রোধ করে।

উড্ ন্যাপ্‌থা (wood naptha)—একটা বর্ণহীন বিষাক্ত তরল পদার্থ; বিশেষ কৌশলে কাঁচা কাঠ চোলাই (ডিস্টিলেশন ↑) করে পাওয়া যায়। এ-জন্যে একে উড্ স্পিরিট, বা উড্-অ্যাল্‌কোহলও বলে। এর রাসায়নিক নাম হলো মিথাইল অ্যালকোহল (CH_3OH)। বিশেষ দ্রাবক হিসেবে বিভিন্ন রসায়ন-শিল্পে প্রচুর ব্যবহৃত হয়। অ্যাল্‌কোহলের (ইথাইল ↑) সঙ্গে এই বিষাক্ত পদার্থটা মিশিয়ে অপেয় করে জ্বালানি ও দ্রাবক হিসেবে ব্যবহার্য 'মিথিলেটেড স্পিরিট' ↑ তৈরী করা হয়।

উড্ স্পিরিট (wood spirit)—মিথাইল অ্যালকোহল ↑, (CH_3OH)। সাধারণতঃ কাঠ চোলাই করে তৈরী হয় বলে এই নাম। এই তরল দাহ্য পদার্থটি **উড্ অ্যাল্‌কোহল** ↑, অথবা **উড্ ন্যাপ্‌থা** ↑ নামেও পরিচিত।

উডেন ট্যংগ (wooden tongue)—গবাদি পশুর রোগ বিশেষ। এ রোগে পশুদের মুখ-গহ্বর ও খাদ্যনালী, বিশেষতঃ জিহ্বা এক রকম ছত্রাক (ফাঙ্গাস ↑) জাতীয় বিশেষ জীবাণুর আক্রমণে স্ফীত ও শক্ত হয়ে ওঠে। (অ্যাক্টিনোমাইকোসিস ↑)।

উল-ফ্যাট (wool-fat)—ল্যানোলিন (lanolin) ↑

উল্‌ফ্রাম (wolfram)—মৌলিক ধাতু; পারমাণবিক ওজন 183·92, পারমাণবিক সংখ্যা 74, সাংকেতিক চিহ্ন W; উলফ্রাম ধাতুকে সাধারণতঃ **ট্যাংষ্টেন** ↑ বলা হয়। ধাতুটা অত্যন্ত কঠিন, অথচ সহজেই এর সরু তার, বা পাত্ করা যায়; এতে আবার মরচেও ধরে না। অত্যধিক তাপ সহন-ক্ষমতার জন্যে এ-দিয়ে বৈদ্যুতিক হিটার, ইস্ত্রি প্রভৃতির তার-কুণ্ডলী তৈরী করা হয়; এর গলনাংক 3370° সেন্টিগ্রেড।

উল্‌ফ্রামাইট (wolframite)—উল্‌ফ্রাম ↑, বা টাংষ্টেন ↑ ধাতুর স্বভাবজাত লৌহ-মিশ্রিত অক্সাইড ($FeWO_4$) খনিজ; সাধারণতঃ এই খনিজ থেকেই উল্‌ফ্রাম ধাতুটা নিষ্কাশিত হয়ে থাকে।

'রেলের পাটি' 0° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ↑ (ফ্রিজিং পয়েণ্ট ↑) অপেক্ষা 25° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অধিক উষ্ণতার দিনে দৈর্ঘ্যে বর্ধিত হবে 40 × 25 × ·000011 ফুট, অর্থাৎ প্রায় $\frac{1}{8}$ ইঞ্চি।

এক্সপ্যাণ্ডিং ইউনিভার্স (expanding universe) — আমাদের এই পৃথিবীসহ সমগ্র সৌরমণ্ডল ও পরিদৃষ্ট সাধারণ নক্ষত্ররাজি অনন্ত মহাশূন্যে চলমান এক বিরাট নীহারিকা-পুঞ্জের (গ্যালাক্সি ↑) অন্তর্গত ; মহাশূন্যে যে সুদীর্ঘ ছায়াপথ (মিল্‌কি-ওয়ে ↑) পরিদৃষ্ট হয় তারই অংশ। বিশাল সাহারার বুকে এক কণা বালুকার মতো আমাদের পৃথিবী এরই একটু নগণ্য অংশ মাত্র। অনন্ত মহাশূন্যে এরূপ বহু নীহারিকা-পুঞ্জ রয়েছে। বিশেষ শক্তিশালী টেলিস্কোপ ↑ যন্ত্রের সাহায্যে গৃহীত বিভিন্ন নীহারিকা-পুঞ্জের আলোক-রশ্মির বিশেষ বর্ণালি-বিশ্লেষণে (ডপ্‌লার এফেক্ট ↑) মনে হয়, ঐসব নীহারিকা-পুঞ্জ, বা গ্যালাক্সি যেন আমাদের গ্যালাক্সি থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। এই হিসাবে বলা যায়, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্প্রসারিত হচ্ছে, — নিখিল বিশ্ব আয়তনে যেন ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। আলোচ্য এ. ই. কথাটা দিয়ে এই তথ্যটি প্রকাশ করা হয়।

এক্সপেক্টোর‍্যাণ্ট (expectorant) — ঠাণ্ডা লাগলে যে ঔষধে গলার শ্লেষ্মা তরল হয়ে সর্দি-কাশির উদ্বেগ দূর হয়।

এক্সপোনেণ্ট (exponent)—গণিতশাস্ত্রে যে সংখ্যার দ্বারা কোন রাশির মূল্যমানের প্রকৃত সংজ্ঞা নির্দিষ্ট হয় ; যেমন — x^3 রাশির মূল রাশি x-এর এক্সপোনেণ্ট হলো 3 ; একে মূল রাশির 'ঘাত', বা 'সূচক সংখ্যা'ও বলা হয়।

এক্সপোনেন্সিয়াল ডিকে (exponential decay) — কোন রাশি যদি প্রতি একক সময়ে (প্রতি সেকেণ্ড, মিনিট ইত্যাদিতে) একটা নির্দিষ্ট ভগ্নাংশিক অনুপাতে হ্রাস পেতে থাকে, তাহলে এরূপ হ্রাসকে এ. ডি. বলে। কোন পাত্রের জল যদি চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ু অপেক্ষা 25° ডিগ্রি অধিক উত্তপ্ত থাকে এবং এক মিনিট পরে যদি তার উত্তাপ হয় 20° ডিগ্রি, তাহলে তার তাপ হ্রাস হলো 5° ডিগ্রি ; অর্থাৎ প্রাথমিক তাপ 25° ডিগ্রির $\frac{1}{5}$ (এক-পঞ্চমাংশ) হ্রাস হলো। আবার পরবর্তী মিনিটে যদি তার তাপ হয় 16° ডিগ্রি (20° ডিগ্রি থেকে) তাহলে তাপের হ্রাস হলো 4° ডিগ্রি, অর্থাৎ 20° ডিগ্রির $\frac{1}{5}$ (এক-পঞ্চমাংশ)। এরূপ সমভগ্নাংশিক অনুপাতের ক্রম-হ্রাসকেই বলা হয় এ. ডি.। 'ডিকে' মানে ক্ষয়, বা হ্রাস। (নিউটন্‌স ল অব কুলিং ↑)।

এক্সপোনেন্সিয়াল ফাংসন (exponential function) — গণিতশাস্ত্রে 'ফাংসন' মানে সম্বন্ধ ; যেমন, 'y = 2x' রাশির দ্বারা x এবং y'এর মূল্যমানের সমীকরণ নিরূপিত হচ্ছে। এখানে x যদি হয় 3, তাহলে y হবে 6 ; এটা হলো সাধারণ ফাংসন। কিন্তু

$y=2^x$ সমীকরণে x এবং y'এর সম্বন্ধকে বলা হয় এক্সপোনেন্সিয়াল ফাংসন। এখানে x হলো একটা স্থির, বা ধ্রুব রাশির (এখানে 2-এর) একটা অধ্রুব, বা পরিবর্তনশীল সূচক (এক্সপোনেণ্ট ↑)। অতএব, x যদি হয় 3, তাহলে $y=2^3$, অর্থাৎ 8 ; x যদি হয় 1, তাহলে $y=2^1$, অর্থাৎ 2 ; এভাবে x এবং y'এর ফাংসন, বা, সম্বন্ধ এতে হয় পরিবর্তনশীল।

এক্সপ্লোসিভ (e x p l o s i v e) — বিস্ফোরক পদার্থ ; যে-সব মিশ্র, বা যৌগিক পদার্থে অতি দ্রুত রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে, আর তার ফলে প্রচুর গ্যাস ও তাপের উদ্ভব হয়। গান-পাউডার ↑, নাইট্রোগ্লিসারিন ↑, অ্যামাটল ↑ প্রভৃতি বিভিন্ন বিস্ফোরক পদার্থে সামান্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দিলে, বা সামান্য আঘাত-জনিত উত্তাপে সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে। এ-জাতীয় পদার্থের উপাদানগুলোর মধ্যে অতি দ্রুত রাসায়নিক সং-যোজন, বা বিয়োজন ক্রিয়া ঘটে এবং বিস্ফোরণের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এর ফলেই কামান, বন্দুক প্রভৃতির আবদ্ধ খোলের মধ্যে সহসা প্রচুর গ্যাস, ধূম ও উত্তাপের সৃষ্টি হয় এবং তারই প্রচণ্ড চাপে মুহূর্ত মধ্যে গোলা-গোলি মহাবেগে ছুটে বেরোয়।

এক্স-রে (X-ray) — রঞ্জেন, বা রন্ট-গেন রশ্মি ; জার্মাণ বিজ্ঞানী রন্ট-গেন 1895 খৃষ্টাব্দে যে এক প্রকার অদৃশ্য, অথচ ভেদকারী তেজঃরশ্মি আবিষ্কার করেন। ইহা আলোক ও বেতার তরঙ্গের অনুরূপ; কিন্তু অত্যন্ত ক্ষুদ্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের (এক সেন্টিমিটারের লক্ষাধিক ভগ্নাংশের কাছাকাছি) এক বিশেষ তরঙ্গ-স্পন্দনের ফলে এই অদৃশ্য রশ্মির সৃষ্টি হয়। 'এক্স-রে-টিউব' হলো বিশেষ আকারের বায়ুশূন্য একটা কাঁচ-গোলক। বিশেষ ব্যবস্থায় ওই টিউবের ভিতরে ইলেক্ট্রন-কণিকার ধারা অতি দ্রুতবেগে ছুটে গিয়ে একটা ধাতব চাক্‌তির উপরে পড়ে এবং সেখান থেকে এই অদৃশ্য

এক্স-রে টিউব
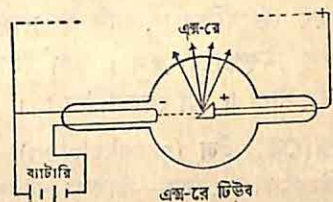
রশ্মির, বা এক্স-রে'র উদ্ভব ঘটে থাকে। সাধারণ আলোক-রশ্মি যে-সব পদার্থ ভেদ করতে পারে না, এক্স-রশ্মি তাদের ভেদ করে চলে যায়। এই এক্স-রশ্মির সাহায্যে দেহের মাংস-পেশী ভেদ করে ভিতরের হাড় ও যন্ত্রাদির ছায়া ফটোগ্রাফিক ↑ প্লেটে মুদ্রিত করা যেতে পারে। এভাবে দেহাভ্যন্তরের যন্ত্রপাতি ও অস্থি-পঞ্জরের অবস্থা সহজে পরীক্ষা করা সম্ভব হয়ে থাকে। আবার বিভিন্ন স্ফটিকাকার পদার্থের আভ্যন্তরীণ কেলাসন ও আণবিক গঠনও এর সাহায্যে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়। এই সকল প্রক্রিয়াকে বলে 'এক্স-রে অ্যানালিসিস'।

এক্স-রে স্পেকট্রোমিটার (X-ray spectrometer) — যে যন্ত্রের

সাহায্যে রঞ্জেন-রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য মাপা যেতে পারে। এই যন্ত্রে ফটোগ্রাফিক প্লেট লাগিয়ে বিভিন্ন কৌশলে এক্স-রশ্মির এক রকম আলোক-চিত্র তোলবারও ব্যবস্থা করা যায়, তখন যন্ত্রটাকে বলা হয় 'এক্স-রে স্পেক্‌ট্রোগ্রাফ'।

এক্সিপিয়েণ্ট (excipient) — ব্যবহারের স্থবিধার জন্যে বিভিন্ন ঔষধাদিতে যে-সব নিষ্ক্রিয় পদার্থ মিশ্রিত করা হয়, যেমন — বিভিন্ন মলমে ভেসেলিন ↑, চর্বি ইত্যাদি; তরল মিক্‌শ্চারে জল; গুড়া মিক্‌শ্চারে স্টার্চ ↑, বা কেয়োলিন ↑।

এক্সোস্কেলিটন (exoskeleton) — বহিঃকংকাল; যেমন—কাঁকড়া, কচ্ছপ, চিংড়ি প্রভৃতি ও বিভিন্ন পোকামাকড়ের দেহের বাহিরে যে শক্ত আবরণ, বা খোলস থাকে। প্রাণীদের নখর, পাখীদের পালকও বহিঃকংকাল পর্যায়ভুক্ত।

এক্সিউভিয়া (exeuvia) — প্রাণীর পরিত্যক্ত পাত্‌লা বহিস্বক; যেমন, সাপের খোলস। একডাইসিস ↑।

এক্সোগ্যামি (exogamy) — গোত্রান্তরে বিবাহ; স্বকীয় বংশের, বা আত্মজনের বাহিরে বিবাহ করবার সামাজিক রীতি; যেমন হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত। **এণ্ডোগ্যামি** (endogamy) হলো স্বগোত্র বিবাহ; যেমন মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত।

এক্সোজেনাস (exogenous) — বহির্জাত; জনক-দেহের বাইরে থেকে উৎপন্ন জীব; যেমন — হাইড্রা ↑ ঈস্ট ↑ প্রভৃতি। এদের মূল দেহ থেকে ক্ষুদ্র গুঁটিকাকারে দেহাংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে নূতন জীব সৃষ্টি হয়। এরূপ জীবশ্রেণীকে বলে 'এক্সোজেনাস'।

এক্সোডার্ম (exoderm) — বহিস্বক; জীব-দেহের উপরিস্থিত অতি সূক্ষ্ম চামড়া। সাধারণ কথায় 'স্নুনছাল'।

এক্সোথার্মিক (exothermic) — তাপ-উদ্গারী; রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপশক্তি উদ্ভূত হয়, অর্থাৎ রাসায়নিক পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়, এমন বিক্রিয়া। এরূপ এক্সোথার্মিক রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যে যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হয় তাকে বলে 'এক্সোথার্মিক কম্পাউণ্ড'। হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন হয় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ↑, এটি একটি এক্সোথার্মিক কম্পাউণ্ড; $H_2 + Cl_2 = 2HCl +$ 43,600 ক্যালোরি ↑।

এডিংটন (Eddington), স্যার আর্থার — বৃটিশ পদার্থবিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিদ; জন্ম 1882 খৃঃ, মৃত্যু 1944 খৃঃ। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যোতির্বিদ্যার অধ্যাপক। আইনস্টাইনের ↑ আপেক্ষিকতা বাদের সার্থকতা ও ব্যাপকতা প্রতিপাদন, এবং বিশ্বের ক্রমবৃদ্ধি (এক্সপ্যাণ্ডিং ইউনিভার্স ↑) সম্পর্কীয় মতবাদের প্রবর্তক। নক্ষত্রের গঠন ও পদার্থের সাম্য, বা স্থিতি বিষয়ক মূল্যবান গবেষণার জন্য সমধিক প্রসিদ্ধি। জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বহু বিখ্যাত গ্রন্থের প্রণেতা।

এডিসন (Edison), টমাস আল্‌ভা — আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত তড়িৎ-বিজ্ঞানী ও যন্ত্রবিশারদ ; মিলানে জন্ম 1847 খৃঃ, মৃত্যু 1931 খৃঃ। বাল্যে শিক্ষাবিমুখ, ট্রেনে সংবাদপত্র বিক্রেতা হিসাবে জীবিকার্জন ; পরে ট্রেনেই ক্ষুদ্র সংবাদপত্র মুদ্রণ ও প্রকাশ। এক সময়ে তারবার্তা (টেলিগ্রাফ ↑) সম্পর্কে দক্ষতা অর্জনের সুযোগ লাভ। কৈশোরে মাইকেল ফ্যারাডে ↑ রচিত তড়িৎবিজ্ঞানের পুস্তক পাঠে বিজ্ঞান চর্চায় উদ্‌বুদ্ধ হন ; নিজের ক্ষুদ্র গবেষণাগারে তড়িৎ সম্বন্ধীয় কারিগরি দক্ষতা অর্জন করেন। প্রথমেই ভোট গ্রহণ ব্যবস্থার বৈদ্যুতিক যন্ত্র উদ্ভাবন এবং টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের ↑ বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার উন্নতি সাধন। 1879 খৃঃ বৈদ্যুতিক বাতির কার্বন-ফিলামেণ্ট ↑ আবিষ্কার ; যার ফলে সাধারণ ইলেকট্রিক ল্যাম্পের সবিশেষ প্রচলন সম্ভবপর হয়েছে। সুলভে তড়িৎ সরবরাহের উপযোগী করে ডায়নামো ↑ যন্ত্রের উন্নতি-বিধান। আধুনিক গ্রামোফোনের ভিত্তিস্বরূপ ফোনোগ্রাফ ↑ যন্ত্র, ছায়াচিত্রের প্রাথমিক যন্ত্র কাইনোটোস্কোপ ↑, নিকেল-আয়রন সেল ↑ প্রভৃতি অসংখ্য যন্ত্র উদ্ভাবন। জীবনে মোটামুটি সহস্রাধিক নূতন যন্ত্রের উদ্ভাবন ও পেটেণ্ট গ্রহণ। ব্যবহারিক বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতি সাধন করে 'বিজ্ঞানের যাদুকর' বলে খ্যাতি অর্জন।

এন্‌কোণ্ড্রোমা (encondroma) — দেহাভ্যন্তরস্থ অনাবশ্যক তরুণাস্থি-পিণ্ড (কার্টিলেজ ↑) ; দূষিত অস্থির স্থানবিশেষে যে কোমল তরুণাস্থি-পিণ্ডের সৃষ্টি হয়, কিন্তু যার কোনরূপ স্ফীতি বাইরে থেকে লক্ষিত হয় না। অস্থি-সংযোগের তরুণাস্থির বহির্দৃষ্ট স্ফীতিকে (যেমন—আর্থারাইটিস ↑, বা গেঁটেবাত রোগে সাধারণতঃ হয়ে থাকে) বলে **একোণ্ড্রোমা**।

এন্‌জাইম (enzyme) — উৎসেচক পদার্থ ; বিভিন্ন জীবের দেহকোষ থেকে নিঃসৃত বিশেষ ধরনের জৈব রাসায়নিক পদার্থ। জীবদেহের আভ্যন্তরীণ বিপাকীয় ক্রিয়ায় বিভিন্ন শ্রেণীর এন্‌জাইমের বিভিন্ন রাসায়নিক কার্যকারিতা থাকে। ক্যাটালিটিক ↑ পদার্থের মত এ-গুলো বিশেষ-বিশেষ বিপাকীয় (মেটাবলিজম, metabolism ↑) ক্রিয়া ত্বরান্বিত করে। এক-এক রকম এন্‌জাইমের আবার এক-এক রকম নির্দিষ্ট রাসায়নিক শক্তি দেখা যায়। ঈষ্ট ↑ ও কোন-কোন ছত্রাক থেকে যে এন্‌জাইম সৃষ্টি হয়, তা শর্করাকে অ্যাল্‌কোহলে ↑ পরিবর্তিত করে। মুখের লালাতে টায়ালিন ↑ নামক এক রকম এন্‌জাইম থাকে, যার প্রভাবে সংঘটিত রাসায়নিক ক্রিয়ার সাহায্যে খাদ্যের শ্বেতসার (স্টার্চ) শর্করায় পরিণত হয়ে থাকে। পেপ্‌সিন ↑ নামক এন্‌জাইম আমিষ জাতীয় খাদ্য হজম করায়।

এন্‌ডেমিক ডিজিজ (endemic disease) — আঞ্চলিক রোগ। পৃথিবীর বিশেষ কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে সাধারণতঃ যে রোগের প্রাদুর্ভাব

সম্বৎসর দেখা যায় ; যেমন, আমাশয় ভারতের একটা এন্‌ডেমিক রোগ, কিন্তু ইংলণ্ডের নয়। (যদিও ইংলণ্ডেও যে মাঝে-মাঝে কারো এ-রোগ হয় না, এমন নয়।)

এণ্ডোকার্ডাইটিস (endocarditis) — হৃৎপিণ্ডের অন্তঃপ্রদাহ রোগ বিশেষ; হৃৎপিণ্ডের আবরক প্রাচীরের অভ্যন্তরস্থ পর্দার স্ফীতি ও প্রদাহ। 'এণ্ডো' মানে অভ্যন্তর, বা ভিতর।

এণ্ডোক্রাইন গ্ল্যাণ্ড (endocrine gland) — অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি ; দেহাভ্যন্তরস্থ যে-সব বহির্মুখশূন্য গ্রন্থি, বা গ্ল্যাণ্ড↑ থেকে বিভিন্ন হর্মোন↑ রস নিঃসৃত হয়ে অন্তর্নালি দিয়ে সরাসরি রক্তে মিশ্রিত হয়; যেমন— হঠাৎ কোন রকম ভয় পেলে অ্যাড্রিন্যাল গ্ল্যাণ্ড থেকে অ্যাড্রিনেলিন↑ নামক হর্মোন-রস নিঃসৃত হয়ে রক্তে মিশে যায় ; এর ফলে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া দ্রুততর হয়, গাত্রচর্ম ফ্যাকাশে হয়ে যায়। আমাদের শরীরের বিভিন্ন অংশে এ-রকম পিটুইটারি↑, থাইমাস↑, থাইরয়েড↑ প্রভৃতি আরও নানা রকম অন্তঃস্রাবী নালীশূন্য গ্রন্থি, বা গ্ল্যাণ্ড আছে। এ-গুলো থেকে বিভিন্ন হর্মোন নিঃসৃত হয়ে ভিতরে-ভিতরে রক্তে মিশে দেহ-যন্ত্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়া সম্পন্ন করে।

এণ্ডোটক্সিন (endotoxin) — যে-সব টক্সিন↑ পদার্থ, বা বিষ-রস জীবাণু-বিশেষের দেহের অবিচ্ছেদ্য অংশস্বরূপ, যা ছেঁকে, বা ধুয়ে জীবাণু থেকে পৃথক করা যায় না ; যেমন—টাইফয়েড টক্সিন, যা টাইফয়েড-জীবাণুর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকে। টিটেনাস্ জীবাণুর টক্সিন পৃথক করা যায় বলে তাকে বলা হয় 'এক্সোটক্সিন'।

এণ্ডোথার্মিক (endothermic) — তাপ-শোষক ; যে ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপ হ্রাস পায়, অর্থাৎ রাসায়নিক পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে তাপমাত্রা কমে যায়। এ-রকম রাসায়নিক বিক্রিয়াকে বলে 'এণ্ডোথার্মিক রিঅ্যাকসন', এবং এর ফলে যে যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় 'এণ্ডোথার্মিক কম্পাউণ্ড'। হাইড্রোজেন↑ ও আইয়োডিনের↑ রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন হাইড্রায়োডিক অ্যাসিড হলো একটা এণ্ডোথার্মিক কম্পাউণ্ড ; $H_2 + I_2 = 2HI - 12{,}200$ ক্যালোরি↑ তাপ শক্তি। (এক্সোথার্মিক↑)।

এণ্ডোস্পার্ম (endosperm) — উদ্ভিদের বীজকোষের অভ্যন্তরভাগে সঞ্চিত খাদ্য-ভাণ্ডার ; ভাবী উদ্ভিদ-শিশুর জন্যে সঞ্চিত এই বীজ-শাঁসই মানুষ ও অপরাপর জীবজন্তু খাদ্যরূপে গ্রহণ করে ; যেমন—ধান, গম, ভুট্টা, নারিকেল প্রভৃতি।

এন্‌সেফালিটিস (encephalitis) — মস্তিষ্কের প্রদাহজনিত রোগ বিশেষ ; মগজের যে-কোন রকম স্নায়বিক বিকৃতি, বা বিকলতা। **এন্‌সেফালিটিক লেথারজিকা** (encephalitic lethargica) হলো ভাইরাস-↑ জনিত এক রকম মস্তিষ্ক-রোগ, যাতে মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্র অবসাদগ্রস্ত হয়ে

রোগী শারীরিক ও মানসিক শক্তি হারায় এবং সর্বদা তন্দ্রাচ্ছন্ন, বা বাহ্যিক বোধশূন্য হয়ে থাকে।

এনামেল (enamel) — কাঁচ জাতীয় পদার্থের সঙ্গে টিন-ডাইঅক্সাইড (SnO_2) প্রভৃতি বিভিন্ন ধাতব পদার্থ উপযুক্ত উত্তাপে গলিয়ে-মিশিয়ে যে মসৃণ ও চক্‌চকে পদার্থ তৈরী হয়। বিভিন্ন ধাতব বাসনপত্রের উপর এর একটা পাতলা আবরণ দিয়ে সুদৃশ্য করা হয়। মাটি, বা পোর্সিলেনে ↑ তৈরী পাত্রাদির উপরেও অনেক সময় এরূপ 'এনামেল' করা হয়ে থাকে।

এনার্জি (energy) — শক্তি ; কার্য সম্পাদনের ক্ষমতা। এনার্জি প্রধানতঃ পোটেন্‌সিয়্যাল ↑ ও কাইনেটিক ↑, এই দু'ধরনের হতে পারে। পাহাড়ের উপরে যে জল সঞ্চিত হয়ে আছে তাতে পোটেন্‌সিয়্যাল এনার্জি ↑ (স্থিতি-শক্তি) রয়েছে। উচ্চে অবস্থিতির জন্যে ওই জল একটা শক্তি, বা কর্মক্ষমতা লাভ করেছে। যখন প্রবাহিত হয়ে নীচে নামবে তখন ঐ জলের বেগে মাটি কেটে পাথর ভেঙ্গে শক্তি প্রকাশ পাবে ; পোটেন্‌সিয়্যাল এনার্জি এ-ভাবে কাইনেটিক এনার্জিতে (গতি শক্তিতে) রূপান্তরিত হবে। শক্তির বিনাশ নেই ; বিশেষ ব্যবস্থায় এক শক্তিকে অপর শক্তিতে পরিবর্তিত করা যায় মাত্র। তাপ-শক্তি, বিদ্যুৎ-শক্তি, রাসায়নিক শক্তি, আলোক-শক্তি প্রভৃতি শক্তির বিভিন্ন রকমের বিকাশ দেখা যায়।

এপিগ্লটিস (epiglottis) — মানুষের শ্বাস-নালীর (গ্লটিস, glottis ↑) উর্ধ্বভাগে সংলগ্ন ক্ষুদ্র একটি সঞ্চলনশীল মাংসল পর্দা ; চর্বিত খাদ্য গলাধঃকরণের সময় এই এপিগ্লটিসটি ভাল্‌ব (valve) ↑ -এর মত নীচে নেমে শ্বাসনালী, অর্থাৎ গ্লটিসের নালীমুখ

এপিগ্লটিস (ই. গ.)

বন্ধ করে রাখে, যার ফলে খাদ্যবস্তু শ্বাসনালীতে প্রবেশ করতে পারে না। বাংলায় বলে অধিজিহ্বা, আল্‌জিভ।

এপিগাইন্‌স (epigyns)—স-পুষ্পক উদ্ভিদের শ্রেণী বিশেষ; যাদের ফুলের দলপত্র ও রেণুস্থলী-বাহী পরাগ-দণ্ডগুলি (স্ট্যামেন ↑) গর্ভাশয়কে (ওভারি ↑) চক্রাকারে পরিবেষ্টিত করে রাখে। আভ্যন্তরীণ পথে (চিত্রে ফুলের এরূপ অভ্যন্তর ভাগ প্রদর্শিত হয়েছে) রেণু-নিষেকের ফলে এদের গর্ভাশয়ে বীজ জন্মায়।

এপিগাইন্‌স

এপিডার্মিস (epidermis) — জীবদেহের বহিস্ত্বক ; উদ্ভিদ-পত্র, বা বিভিন্ন প্রাণীর, বিশেষতঃ মানুষের গাত্রচর্মের উপরের পাত্‌লা পর্দা, বা ত্বক। সাধারণ কথায় আমরা যাকে 'নুণছাল' বলি। (এক্টোডার্ম ↑)।

এপিডায়াস্কোপ (epidiascope)—ছায়াচিত্রের সাধারণ এক রকম যন্ত্র বিশেষ। একে এপিস্কোপ ও ডায়াস্কোপ↑ উভয় পদ্ধতিতেই ব্যবহার করা যায়। বিশেষ ব্যবস্থায় এতে চিত্রিত স্বচ্ছ স্লাইড, বা ফটোগ্রাফিক ফিল্মের উপর আলোক-রশ্মি ফেলে দেওয়াল, বা পর্দার উপরে সোজাসুজি
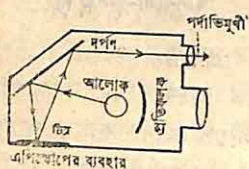
এপিডায়াস্কোপ

তার ছবির প্রতিচ্ছায়া ফেলা যায়। প্রতিফলক লেন্সের সাহায্যে তীব্র আলোক-রশ্মি সংহত হয়ে স্লাইড, বা ফিল্মের ভিতর দিয়ে পর্দার উপরে গিয়ে ছায়াছবি পড়ে। এই ব্যবস্থায় এ-যন্ত্রকে বলে **ডায়াস্কোপ**। এপিস্কোপের কৌশলও প্রায় অনুরূপ। কেবল এর মধ্যে আলোক-রশ্মি একটা দর্পণে প্রতিফলিত করে প্রত্যক্ষভাবে কোন বস্তু, বা ছবির উপর ফেলা হয়, তা থেকে প্রতিফলিত রশ্মি আবার ওই দর্পণেই পুনরায় প্রতিফলিত হয়ে পর্দায় ছায়া ফেলে। চিত্র থেকে উভয় ব্যবস্থার পার্থক্য সহজেই মোটামুটি বুঝা যাবে।

এপিজিল (epigeal) — বিশেষ উদ্ভিদশ্রেণী ; হাইপোজিল↑।

এপিফাইট (epiphyte) — ফার্ন↑ জাতীয় এক শ্রেণীর পরগাছা; যা অপর কোন উদ্ভিদের গায়ে জন্মে বেড়ে ওঠে ; কিন্তু সেই অবলম্বন-বৃক্ষের রস এরা সাধারণতঃ শোষণ করে না। এই শ্রেণীর এক প্রকার 'অর্কিড'↑ প্রদত্ত চিত্রে দেখানো হয়েছে।

এপিফাইট

এপিফাইসিস্ (epiphysis) — কঠিন অস্থি-খণ্ডের অগ্রভাগে গঠিত কোমল ও অপরিপুষ্ট তরুণাস্থি (কার্টিলেজ↑), যার গঠন অনেকটা স্পঞ্জের মত। বাল্য ও কৈশোর বয়সের এই তরুণাস্থিই পরিণত বয়সে ক্রমে শক্ত হয়ে প্রকৃত অস্থিতে পরিণত হয়।

এফারভেসেণ্ট লিক্যুইড (effervescent liquid) — প্রচুর গ্যাস উৎপাদক তরল পদার্থ। গ্যাসীয় পরিপৃক্ততার, বা কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে যে তরল পদার্থ থেকে বুদ্‌বুদের আকারে প্রভূত গ্যাস উত্থিত হতে থাকে; সোডা-ওয়াটারে↑ যেমন দেখা যায়। সিড্‌লিট্‌জ↑ পাউডারে জল দিলেও এরূপ **এফারভেসেন্স** লক্ষিত হয়ে থাকে।

এফিমেরিস (ephemeris) — গ্রহাদির দৈনিক গতি-পঞ্জী ; গগনমণ্ডলে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ ও নক্ষত্রাদির আপাত গতিজনিত তুলনামূলক অবস্থানগুলোর নির্দেশক পর্যবেক্ষণ-লিপি।

এফিমেরপ্টেরা (ephemeroptera) — দিনজীবী পতঙ্গ বিশেষ ; যেমন,

'মে-ফ্লাই' নামক পতঙ্গ, যারা মাত্র এক দিন জীবিত থাকে, দিনের শেষে মরে যায়। আবার, **এফিমেরাল** মানে স্বল্পজীবী; পতঙ্গ শ্রেণীর অতি ক্ষুদ্র প্রাণী, যারা অল্প সময় মাত্র বেঁচে থাকে এবং স্বভাবতঃই মরে যায়। এই শ্রেণীর ক্ষণজীবী ক্ষুদ্র পতঙ্গও পৃথিবীতে অনেক আছে।

এফিমেরপ্টেরা

এফিড্রিন (ephedrine) — চীনদেশীয় এক প্রকার উদ্ভিদজাত অ্যাল্‌ক-লয়েড ↑ ভেষজ পদার্থ। মস্তিষ্কে ঠাণ্ডা লেগে, বা হাঁপানি রোগে অনেক সময় রোগীর নাসিকা ও গলদেশে যে অত্যধিক রক্ত ও শ্লেষ্মার সঞ্চার হয় তা হ্রাস করবার জন্যে এবং হৃৎ-পিণ্ড সতেজ রাখতে ঔষধ হিসেবে এটা অনেক সময় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। রাসায়নিক পদ্ধতিতেও প্রস্তুত হয়েছে।

এবোনাইট (ebonite) — খুব শক্ত কালো এক রকম পদার্থ; রাবারের সঙ্গে গন্ধক মিশিয়ে তৈরী। এতে গন্ধকের পরিমাণ সাধারণতঃ থাকে 30%; একে 'ভাল্কেনাইট' ↑, অথবা 'ভাল্কেনাইজ্‌ড রাবার'ও ↑ বলা হয়। জিনিসটার তড়িৎ, বা তাপ পরি-বহনের ক্ষমতা নেই বলে বিভিন্ন যন্ত্রাদিতে ব্যবহৃত হয়।

এমব্রায়ো (e m b r y o) — ভ্রূণ; মাতৃগর্ভস্থ জীব-শিশু (ফিটাস ↑)। উদ্ভিদে বীজে, অথবা জীব-মাতার গর্ভাধারে অবস্থিত ক্রমবর্ধমান পূর্ণাঙ্গ শিশু-সন্তান।

এম্‌ব্রায়ো

এম্‌ব্রায়োলজি (embryology) —ভ্রূণ-বিদ্যা; গর্ভস্থ ভ্রূণের ক্রম-বিকাশ সম্পর্কিত বিজ্ঞান। পরিপুষ্ট ও স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে জন্মাবার পূর্বে কোন জীবশিশুর জীবনেতিহাসের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাদির পর্যালোচনা।

এমারি (emery) — কোরাণ্ডাম ↑ নামক বিশেষ খনিজ অ্যালুমিনিয়াম-অক্সাইড ও আয়রন-অক্সাইডের চূর্ণ এক সঙ্গে মিশিয়ে এমারি তৈরী হয়। অত্যন্ত কঠিন বলে এ দিয়ে ঘসে ধাতব দ্রব্যাদি পরিষ্কার করা হয়। মোটা কাগজে এমারি-চূর্ণ শিরিষের আঠার সাহায্যে লাগিয়ে তৈরী হয় 'এমারি-পেপার'।

এমিটিক (emetic) — যে-ঔষধ সেবনে বমির (**এমিসিস** emesis) উদ্রেক করে এবং ভুক্ত খাদ্য পাকস্থলী থেকে বেরিয়ে আসে। বিষ, বা বিষাক্ত খাদ্য খেয়ে অসুস্থ হলে এরূপ ঔষধ প্রয়োগ করা হয়।

এমিটিন (emetine) — আমাশয় রোগের ঔষধ বিশেষ; ইপিকাক ↑ শ্রেণীর ভেষজ উদ্ভিদ থেকে নিষ্কাশিত একটি অ্যাল্‌কালয়েড ↑।

এলিমেণ্ট (element) — মৌলিক পদার্থ। প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতেরা ক্ষিতি, অপ্‌, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম —

এই পাঁচটিকে মৌলিক পদার্থ হিসেবে 'পঞ্চভূত' আখ্যা দিয়ে গেছেন। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, এ-গুলোকে মৌলিক পদার্থ বলা যায় না। এমন কি, এদের সবগুলো পদার্থের সংজ্ঞার মধ্যেও পড়ে না; যেমন — তেজঃ হলো শক্তি, পদার্থ নয়। যে সব পদার্থ একই প্রকার পরমাণুর সমবায়ে গঠিত, কোন রকম বিশ্লেষণেই যে পদার্থে অন্য কোন গুণ, বা ধর্মের অণু-পরমাণু মেলে না, তাদের বলে এলিমেণ্ট, বা মৌলিক পদার্থ। পৃথিবীতে মোট বিরানব্বইটি মৌলিক পদার্থ, বা মৌলপাওয়া গেছে; অপরাপর যাবতীয় পদার্থই ওই সব মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন যৌগিক রূপ। ইদানিং অবশ্য আরও ছয়টি দুষ্প্রাপ্য মৌলের সন্ধান পাওয়া গেছে; — কাজেই এখন মৌলিক পদার্থের সংখ্যা 98-টি বলা যায়। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ কঠিন, তরল ও বায়বীয় এই ত্রিবিধ অবস্থারই আছে (পরিশিষ্টে মৌলিক পদার্থগুলোর তালিকা ↑)।

এস্টার (ester) — বিশেষ এক শ্রেণীর জৈব রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ; যা বিভিন্ন জৈব অ্যাসিডের সঙ্গে অ্যালকোহলের রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন হয়; যেমন—ইথাইল অ্যাল্‌কোহল ↑ ও অ্যাসিটিক অ্যাসিডের মিলনে হয় 'ইথাইল অ্যাসিটেট্'; যাকে ইথাইল, বা আসিটিক এস্টারও বলা হয়। প্রাকৃতিক নিয়মে বিভিন্ন উদ্ভিজ ও প্রাণিজ তৈল ও চর্বিতে বিভিন্ন রকম এস্টার যুক্ত রয়েছে। কোন-কোন শ্রেণীর এস্টার সুগন্ধযুক্ত তরল পদার্থ; তাই সেগুলো সুগন্ধী প্রসাধন দ্রব্য, সিরাপ প্রভৃতি প্রস্তুত করতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

এসেন্সিয়্যাল অয়েল (essential-oil) — স্বভাবজাত সুগন্ধী তৈল জাতীয় জৈব পদার্থ; বিভিন্ন ফুলে প্রাকৃতিক রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জন্মায়। রাসায়নিক পদার্থ হিসেবে এগুলো 'এস্টার' ↑ শ্রেণীর জৈব যৌগিক পদার্থ। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে আজকাল অনুরূপ সুগন্ধী কৃত্রিম তৈল প্রস্তুত করাও সম্ভব হয়েছে।

ও

ওঅ্যারলেস (wireless) — বেতার; মাধ্যম হিসেবে কোনরূপ তারের যোগাযোগ ব্যতীতই সঙ্কেত, অথবা শব্দ দূরে প্রেরণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। ইলেক্‌ট্রো ম্যাগ্নেটিক ↑ তরঙ্গ-প্রবাহের সাহায্যে এরূপ শব্দ-সঙ্কেত প্রেরণ করা সম্ভব হয়ে থাকে। ওঅ্যারলেস, বা বেতারযন্ত্রে এরূপ শাব্দিক তড়িৎ-তরঙ্গ প্রেরণ ও গ্রহণের এই যান্ত্রিক কৌশল ইটালিয়ান বিজ্ঞানী মার্কোনি 1895 খৃষ্টাব্দে প্রথম উদ্ভাবন করেন।

ওকার (ochre)—মৃত্তিকা ও প্রস্তরাদিমিশ্রিত অবিশুদ্ধ প্রাকৃতিক ফেরিক-অক্সাইড (Fe_2O_3); লৌহের একটি খনিজ অক্সাইড আকরিক বিশেষ। হলদে আভাযুক্ত লাল বর্ণের জন্য

জিনিসটা সাধারণতঃ লাল রং, বা পেইণ্ট হিসেবে 'রেড অক্সাইড' নামে প্রচুর ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ওজোন (ozone) — অক্সিজেন গ্যাসের প্রত্যেকটি অণু দুইটি পরমাণুর সমবায়ে গঠিত (O_2) ; কোন প্রকারে তিনটি অক্সিজেন-পরমাণু মিলিত হলে সৃষ্টি হয় ওজোন গ্যাস (O_3)। এ-জন্যে ওজোনকে অক্সিজেনের একটি অ্যালোট্রোপ ↑ বলা যায়। গ্যাসটা সামান্য নীলাভ, বিশেষ সক্রিয় রাসায়নিক শক্তিসম্পন্ন। বায়ুমণ্ডলে অতি সামান্য পরিমাণে মিশে আছে। বিশেষতঃ সমুদ্র-তীরের বায়ুতে ওজোনের ভাগ বেশী বলে সমুদ্র-বায়ু স্বাস্থ্যকর। বায়ু, বা অক্সিজেনের মধ্যে প্রাকৃতিক কারণে নিঃশব্দ মৃদু তড়িৎ-স্ফূরণের ফলে ওজোন গ্যাস সৃষ্টি হয়ে থাকে।

ওজোনাইড (ozonide)—ওজোন ↑ ঘটিত জৈব রাসায়নিক পদার্থের সাধারণ নাম। কোন জৈব যৌগিকের দুইটি কার্বন-পরমাণুর মুক্ত ভ্যালেন্সি ↑ বণ্ডের মধ্যে বিশেষ প্রক্রিয়ায় ওজোন-পরমাণু সংবদ্ধ হয়ে যে যৌগিকের সৃষ্টি হয় ; যেমন — ইথিলিন ওজোনাইড।

ওপ্যাল (opal) — মূল্যবান প্রস্তর বিশেষ ; বাংলায় সাধারণতঃ এটা 'গোদন্ত মণি' নামে পরিচিত। জিনিসটা দুধের মত সাদা, স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল ; আলোক বিচ্ছুরণের ফলে এর ক্রুষ্ট্যালের ↑ ভিতরে বিভিন্ন বর্ণের চাকচিক্য দেখা যায়।

ওপেক (opaque) — অস্বচ্ছ, বা অনচ্ছ ; যার ভিতর দিয়ে দেখা যায় না। যাতে আলোক-রশ্মি প্রতিহত হয়, ভিতরে প্রবেশ করে না। যেমন, কাঁচ হলো স্বচ্ছ, বা 'ট্রান্সপ্যারেণ্ট' পদার্থ ; কিন্তু কাঠ অস্বচ্ছ, বা 'ওপেক' পদার্থ।

ওপেন হার্থ প্রোসেস (open-hearth process)—কাঁচা লোহাকে স্টীলে ↑ রূপান্তরিত করবার একটা পদ্ধতি। চিত্রে প্রদর্শিত বিশেষ ধরনের চুল্লী, অর্থাৎ ফার্নেসে কাঁচা লোহাকে (কাস্ট আয়রন ↑) মরিচা-ধরা পুরাতন টুকরা-লোহা প্রভৃতি সহ
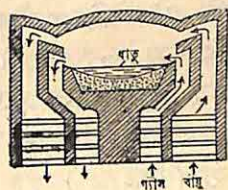
ওপেন হার্থ

একসঙ্গে দ্রবীভূত করা হয়। লোহার মরিচার (আয়রন অক্সাইডের) অক্সিজেনে ঐ গলিত লৌহের সঙ্গে সংমিশ্রিত পদার্থাদি ও ফার্নেসের তলদেশস্থ আস্তরণের চুন ও বালুকাদি অক্সিডাইজড ↑ হয়ে যায়। বিশেষ ব্যবস্থায় অত্যুত্তপ্ত প্রোডিউসার ↑ গ্যাস তখন ঐ তরল লৌহের উপরে প্রবাহিত করা হয়। মোটামুটি এইরূপ জটিল প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত বিশুদ্ধ তরল লৌহের সঙ্গে প্রয়োজনানুরূপ কার্বনের সংমিশ্রণে স্টিল ↑, বা ইস্পাত তৈরী হয়ে থাকে।

ওভাম (o v u m) — ডিম্বাণু ; স্ত্রী-প্রজনন-কোষ (প্রায় ·01 ইঞ্চি ব্যাসার্ধ-বিশিষ্ট ডিম্বাকার)। একটা সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ আবরণে আবৃত এই ডিম্ব-কোষের সঙ্গে গর্ভাশয়ের ভিতরে পুং-প্রজনন কোষের মিলন ঘটলে উভয়ের কেন্দ্রীণস্থ ক্রোমোসোমের ↑ পারস্পরিক একীভূত সংযোগে নূতন জীব-কোষের উৎপত্তি হয় ; যা পরিবর্ধিত হয়ে ভ্রূণের (এম্ব্রায়ো ↑) সৃষ্টি হয়ে থাকে। বহুবচনে **ওভা**, ডিম্বাণুগুলি।

ওভারি (o v a r y) — গর্ভাশয়, বা গর্ভাধার ; জননী-জঠরস্থ যে জৈবাধারে ডিম্বাণুর (ওভাম ↑) সঙ্গে পুং-জনন কোষ, বা স্পার্মের ↑ মিলনে ভ্রূণের উৎপত্তি ঘটে। উদ্ভিদের বীজাধারকেও ওভারি বলে ;—ফুলের নিম্নাঙ্গের যে আধারে ডিম্ব-কোষের সঙ্গে পরাগ-রেণুর একীভূত মিলনে উদ্ভিদ-বীজ সৃষ্টি হয় (পিষ্টিল ↑)

ওভিউল (ovule) — উদ্ভিদদেহের স্ত্রী-প্রজনন-কোষ, যা থেকে উদ্ভিদ-বীজ গঠিত হয় (ওভাম ↑)।

ওভিডাক্ট (oviduct) — ডিম্বপ্রসূ প্রাণিদেহের যে নলপথে ডিম্ব প্রসূত হয় ; **ওভি**-(ovi-) ডিম্ব, অর্থাৎ ওভা-সম্বন্ধীয় ; ডাক্ট (duct) নল-পথ।

ওভিপেরাস (oviparous) — ডিম্ব-প্রসূ প্রাণী ; যেমন পক্ষীকুল ও সর্প, টিকটিকি প্রভৃতি বিভিন্ন সরীসৃপ।

ওম্ (o h m) — পদার্থমাত্রই তড়িৎ-প্রবাহে কিছু-না-কিছু বাধা দেয় ; যে পদার্থে এই বাধা যত কম পদার্থটা তত ভাল তড়িৎ-পরিবাহী হয়। তড়িৎশক্তি পরিবহনে পদার্থের এই স্বাভাবিক বাধা পরিমাপের একক হলো 'ওম্'। কোন তড়িৎ-পরিবাহী পদার্থের এই বাধা এক 'ওম্' হবে, যদি এক ভোল্ট ↑ তড়িৎ-চাপের ফলে ওর মধ্যে মাত্র এক অ্যাম্পিয়ার ↑ তড়িৎস্রোত প্রবাহিত হয়। সাধারণ ইলেক্ট্রিক লাইটের ফিলামেন্টের ↑ মধ্যে তড়িৎ-পরিবহনে এই বাধার পরিমাণ সচরাচর প্রায় 400 থেকে 700 ওম্ হয়ে থাকে।

ওম্স-ল (Ohm's l a w) — কোন তড়িৎ-পরিবাহী পদার্থের তারের মধ্যে প্রবাহিত তড়িৎশক্তি ওর প্রান্ত-দ্বয়ের তড়িৎ-চাপের (ভোল্টেজ ↑) পার্থক্যের সঙ্গে আনুপাতিক হয়ে থাকে। যেমন — দুই ভোল্ট ↑ তড়িৎ-চাপের ব্যবধান থাকলে যদি এক অ্যাম্পিয়ার তড়িৎ প্রবাহিত হয়, তাহলে চার ভোল্ট তড়িৎ-চাপে দুই অ্যাম্পিয়ার তড়িৎ প্রবাহিত হবে। এভাবে দেখা যায়, কোন পদার্থের তড়িৎ-চাপ (ভোল্ট ↑) ÷ তড়িৎপ্রবাহ (অ্যাম্পিয়ার ↑) = তড়িৎ-প্রবাহের বাধা (ওম্স)।

-ওমা (-oma) — রোগগ্রস্ত দেহাংশের স্ফীতি (টিউমার ↑) সূচক শব্দাংশ ; যেমন — **নিউরোমা** (neuroma) স্থানীয়ভাবে স্নায়ুর (নার্ভ ↑) স্ফীতি ; **মাইওমা** (myoma) মাংস-পেশীর টিউমার ; **লাইপোমা** (lipoma) চর্বি, বা মেদ-জনিত টিউমার।

ওবেলিয়া (obelia) — উদ্ভিদাকৃতি জলজ জীবাণু বিশেষ। এই শ্রেণীর জীবকোষের গায়ে সূক্ষ্ম গুঁটিকার উদ্ভব হয়ে-হয়ে ক্রমে বৃক্ষশাখায় ন্যায় বর্ধিত হতে থাকে এবং আবার তাতে নূতন নূতন গুঁটিকা গজায়। এভাবে গুঁটিকা ও বৃন্তের নব-নব উদ্গমে সবটা উদ্ভিদের মত শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট দেখায়। এই গুঁটিকা-গুলির এক-একটা মুখ-গহ্বর থাকে, যার সাহায্যে খাদ্য গ্রহণ করে' তারা সংবর্ধিত হয়। এ-গুলি আবার ক্রমে মূল দেহ থেকে বিচ্যুত হয়ে জলে ভেসে বেড়ায় এবং নূতন ওবেলিয়া সৃষ্টি হয়। (চিত্রে × 590 বর্ধিত)।

ওবেলিয়া

ওয়াট্ (watt) — যে-কোন শক্তি পরিমাপের একক ; প্রতি সেকেণ্ডে যে একক-পরিমাণ শক্তি উদ্ভূত, বা ব্যয়িত হয়। এক ওয়াট হলো প্রতি সেকেণ্ডে এক জুল ↑ শক্তির সমান। সাধারণতঃ তড়িৎ-শক্তির পরিমাপ করতেই ওয়াট কথাটা বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয় ; ইলেক্ট্রিক ল্যাম্পের তড়িৎ পরি-বহনের ক্ষমতা ওয়াট এককে প্রকাশ করা হয়। ডি. সি. তড়িৎ-প্রবাহের অ্যাম্পিয়ার সংখ্যাকে তড়িৎ-চাপের ভোল্ট সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে গুণফল হবে তড়িৎশক্তির পরিমাপক এই ওয়াট সংখ্যা। (1000 ওয়াট = 1 কিলো-ওয়াট = $1\frac{1}{3}$ হর্স-পাওয়ার ↑ ; বাংলায় বলে অশ্ব-শক্তি)।

ওয়াটার অব ক্রুষ্ট্যালিজেসন (water of crystalisation) — স্ফটিকী-করণ প্রক্রিয়ায় কোন যৌগের সঙ্গে যে-জলের রাসায়নিক সংযোগ ঘটে। বিশেষ - বিশেষ পদার্থের স্ফটিক (ক্রুস্ট্যাল ↑) গঠনে বিভিন্ন নির্দিষ্ট সংখ্যক জলীয় অণু সংযুক্ত হয়। আবার কোনরূপে এই জল বিশুষ্ক, বা বিদূরীত করলে স্ফটিকের আকার ও গঠন নষ্ট হয়ে যায় ; কিন্তু মূল পদার্থ টির রাসা-য়নিক গঠন একই থাকে। কপার সাল্-ফেট, অর্থাৎ তুঁতের প্রত্যেকটি অণুর সঙ্গে জলের পাঁচটি অণু মিলে কপার-সাল্ফেটের স্ফটিক গঠিত হয় ($CuSO_4$, $5H_2O$); ফিট্‌কিরি, বা অ্যালামের ↑ স্ফটিকে থাকে জলের 24-টি অণু।

ওয়াটার গ্যাস (water gas) — এক রকম জ্বালানি গ্যাস, কার্বন-মনক্সাইড ও হাইড্রোজেন গ্যাসের সংমিশ্রণ। উত্তপ্ত কয়লার উপরে প্রবা-হিত জলীয় বাষ্পের প্রভাবে উৎপন্ন হয় বলে নাম দেওয়া হয়েছে ওয়াটার (জলীয়) গ্যাস। উত্তপ্ত বায়ুপ্রবাহ চালিয়ে কয়লার স্তর উত্তপ্ত করে তার মধ্যে জলীয় বাষ্প প্রবাহিত করা হয়। জলীয় বাষ্পে কয়লা ঠাণ্ডা হয়ে যায়, আবার উত্তপ্ত বায়ুপ্রবাহ চালানো হয়। বার-বার এরূপ করবার ফলে কয়লা (কার্বন) আংশিকভাবে জারিত হয়ে কার্বন মনক্সাইড ও জলের হাই-ড্রোজেন গ্যাসের ওই সংমিশ্রিত জ্বালানি গ্যাস উৎপন্ন হয়ে থাকে।

ওয়াটার গ্লাস (water glass) — সোডিয়াম, বা পটাসিয়াম সিলি-

কেটের ↑ বিশেষ নাম। পদার্থটা কাঁচের মত স্বচ্ছ, জলে দ্রাব্য। কোন জিনিসের উপর এর জলীয় দ্রবের একটা পাত্‌লা আস্তরণ দিলে হাওয়া প্রবেশ করতে পারে না। এভাবে অনেক সময় ডিম সংরক্ষণ করা হয়। এ দিয়ে বস্ত্রাদি পরিষ্কার করাও চলে। সাবান ও পেষ্টবোর্ড শিল্পে পদার্থটা যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ওয়াটার ইকুইভ্যালেন্ট (water-equivalent) — কোন বস্তুর উষ্ণতা (টেম্পারেচার ↑) এক ডিগ্রি বৃদ্ধি করতে যে পরিমাণ তাপশক্তি (ক্যালোরি ↑) শোষিত হয়ে যতটা জলের (অনুরূপ) এক ডিগ্রি উষ্ণতা-বৃদ্ধি ঘটে, তার ওজন-পরিমাণই হলো ঐ বস্তুর ও. ই.। অন্য কথায় বলা যায়, কোন বস্তুর তাপ-ধারণের শক্তি (থার্মাল ক্যাপাসিটি ↑) যে পরিমাণ জলের তাপধারণ-শক্তির সমান তাই হলো বস্তুটার ও. ই.। যেমন — কোন একটা লৌহখণ্ডের উষ্ণতা এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ↑ বৃদ্ধি করতে যদি 200 ক্যালোরি তাপশক্তি (হিট্ ↑) ব্যয়িত হয় তাহলে ঐ 200 ক্যালোরিতে যতটা জলের উষ্ণতা এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ↑ বাড়বে, জলের সেই গ্র্যাম-সংখ্যা। আমরা জানি, 200 ক্যালোরি তাপে 200 গ্র্যাম ↑ বিশুদ্ধ জলের এক ডিগ্রি উষ্ণতা বৃদ্ধি হয় ; কাজেই ঐ লৌহখণ্ডের ও. ই. হলো 200 গ্র্যাম।

ওয়াটার পাওয়ার (water power) — জলপ্রবাহের বেগ-শক্তিতে চালিত টারবাইন ↑ প্রভৃতির যান্ত্রিক কৌশলে উৎপাদিত তড়িৎশক্তি। (হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিক পাওয়ার ↑)

ওয়াটার মার্ক (water mark) — জল-ছাপ(কাগজে) ; কাগজের ভিতরে কোন লেখা, বা ছবির যে স্বচ্ছ ছাপ থাকে ; কাগজটা আলোর দিকে ধরলে যা দেখা যায়। কলে কাগজের মণ্ড একটা পাটাতনের উপরে রোলা-রের সাহায্যে পিশে মসৃণ ও সমতল পাতে পরিণত করা হয়। এই রোলা-রের গায়ে প্রয়োজনীয় লেখা, বা ছবির সামান্য উঁচু ছাঁচ লাগানো থাকে, বিশেষ ব্যবস্থায় তারই একটা স্বচ্ছ ছাপ কাগজে অঙ্কিত হয়ে যায়।

ওয়াটার লাইন (water line) — খালি অবস্থায় জাহাজের খোলের নিমজ্জন-সীমা, অর্থাৎ কেবল মাত্র স্বকীয় ওজনে কোন জাহাজের খোল যে দাগ পর্যন্ত জলের তলায় নিমজ্জিত হয়ে ভেসে থাকে। সর্বাধিক বোঝাই হয়ে খোলের যে দাগ পর্যন্ত জলে ডুবলে জাহাজ নিরাপদ থাকবে তাকে বলে **লোড ওয়াটার লাইন।**

ওয়াটার্ড সিল্ক (watered silk) — বিভিন্ন ডিজাইনে কুঞ্চিত এক রকম রেশম বস্ত্র। এর ব্যবহারিক নাম 'ময়রে' (moire) সিল্ক। জলসিক্ত রেশম-বস্ত্র কৌশলে নানাভাবে ছোট ছোট ভাঁজে রেখে যান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রচণ্ড চাপ দিয়ে এরূপ কোঁচ্‌কানো সিল্ক তৈরী করা হয়। আবার নানারকম দাগ-কাটা রোলার চেপেও এরূপ রেশম-বস্ত্র তৈরী করা যেতে পারে।

ওয়ার্ক (work) — কার্য; শক্তি প্রয়োগে কোন বস্তুকে যদি কোন বিরুদ্ধ শক্তির প্রভাব প্রতিহত করে স্থানান্তরিত করা হয় তাহলে ঐ প্রযুক্ত শক্তির ফলে ওয়ার্ক, বা কার্য সম্পাদিত হয়েছে, বলা হয়। যেমন মাধ্যাকর্ষণ শক্তির (গ্রাভিটেসন ↑) বিরুদ্ধে দৈহিক শক্তির প্রয়োগে কোন বস্তু উত্তোলন করলে দৈহিকশক্তি ঐ বস্তুর উপরে কার্য, বা ওয়ার্ক সম্পন্ন করলো। ওয়ার্কের পরিমাণ = প্রযুক্ত শক্তি × স্থানচ্যুতির পরিমাণ (উচ্চতা, বা দৈর্ঘ্য)। ওয়ার্কের সাধারণ একক হলো ফুট/পাউণ্ড, বা আর্গ ↑।

ওয়াশ লেদার (wash leather) — রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত এক রকম অতি কোমল মেষ-চর্ম, যা দিয়ে কাচ ও ধাতব পদার্থাদি ঘসে পরিষ্কার, বা পালিশ করা হয় (স্যাময় লেদার ↑)।

ওয়াশিং সোডা (washing soda) — সাধারণ কাপড়-কাঁচা সোডা; সাদা, ক্ষুদ্র স্ফটিকাকার রাসায়নিক পদার্থ; অবিশুদ্ধ সোডিয়াম কার্বনেট ($Na_2CO_3.10\,H_2O$)।

ওয়াশার (washer)—বল্টু, বা স্ক্রু শক্ত করে আঁটবার জন্যে তাতে চামড়া, বা কোন ধাতু-নির্মিত ছিদ্র-যুক্ত যে চাকৃতি পরানো হয়।

ওয়েল্ডিং (welding)—ধাতু-বিগলন পদ্ধতি। উপযুক্ত উত্তাপে গলিয়ে ধাতব পদার্থ জোড়া দেওয়ার প্রক্রিয়া। (অক্সি-অ্যাসিটিলিন ফ্লেম ↑।)

ওয়েভ লেংথ (wave length) — তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য; আলোক, শব্দ, বেতার প্রভৃতি বিভিন্ন শক্তি বিভিন্ন রূপ তরঙ্গের আকারে প্রবাহিত হয়। স্থির জলে একটা ঢিল ফেললে যেমন জলের তরঙ্গ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, এদেরও তেমনি হয়। একে বলে শক্তির তরঙ্গ-গতি (ওয়েভ-মোশন)। বিভিন্ন শক্তি-তরঙ্গের আকার ও দৈর্ঘ্য বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। এরূপ

ওয়েভ লেংথ

কোন একটি তরঙ্গের এক শীর্ষ থেকে পরবর্তী তরঙ্গের অনুরূপ শীর্ষের ব্যবধান, বা দূরত্বের মাপকে বলে ওয়েভ-লেংথ, বা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য। দৃশ্য আলোক-রশ্মির ওয়েভ-লেংথ মোটামুটি 4×10^{-5} থেকে 8×10^{-5} সেন্টিমিটার ↑; এক্স-রশ্মির ↑ ওয়েভ লেংথ প্রায় 10^{-6} থেকে 10^{-9} সেন্টিমিটার হয়ে থাকে। 10^{-5} সেন্টিমিটার = ·00001, অর্থাৎ এক সেন্টিমিটারের এক লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র।

ওয়েভ ব্যাণ্ড (wave band) — বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের (ওয়েভ লেংথ ↑) অনুরূপ তরঙ্গ সমাবেশে গঠিত তরঙ্গ-মালা; যেমন, লং ওয়েভ, মিডিয়াম ওয়েভ ও সর্ট ওয়েভ (পরিশিষ্টে রেডিও-তরঙ্গ ↑)। বেতার, অর্থাৎ রেডিও ↑ যন্ত্রে 'মিডিয়াম ওয়েভ ব্যাণ্ড' বলতে 100 থেকে 1000 মিটার ↑ দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ-মালা বুঝায়।

ওয়েট অ্যাণ্ড ড্রাই বাল্‌ব থার্মোমিটার (wet and dry bulb thermometer) — আর্দ্র ও শুষ্ক গোলক তাপমান যন্ত্র ; (হাইগ্রোমিটার ↑) ।

ওয়েদার সিপ (weather ship) — আবহাওয়ার (বায়ুর চাপ, গতি, আর্দ্রতা প্রভৃতি) অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য বিশেষতঃ অশান্ত অ্যাটলাণ্টিক মহাসাগরে যে সকল জাহাজ নিয়মিত চলাচল করে। আন্তর্জাতিক বিমান পোত ও জাহাজ চলাচলের নিরাপত্তার জন্যে এ-গুলি থেকে আবহাওয়ার বিবরণ নিয়মিতভাবে বিভিন্ন দেশে প্রচারিত হয়ে থাকে। বিশ্বের প্রধান প্রধান রাষ্ট্রগুলির অনেকগুলি জাহাজ এই কাজে নিযুক্ত আছে (মিটিরিওলজি ↑)।

ওয়েষ্টন সেল (weston cell) — নির্দিষ্ট পরিমাণ স্থির ভোল্টেজ ↑ বিশিষ্ট তড়িৎ-উৎপাদক এক রকম যন্ত্র, বা সেল ↑। মার্কারি, ক্যাড্‌মিয়াম ↑ ও এদের সাল্‌ফেট ↑ সল্টের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এ-জাতীয় সেল ↑ থেকে নির্দিষ্ট ভোল্টেজের তড়িৎ-প্রবাহ পাওয়া যায়। এতে 26° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় স্থিরভাবে 1·8183 ভোল্ট ↑ তড়িৎ উৎপাদিত হয় বলে ইহা প্রামাণ্য সেল হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ক

কক্‌, রবার্ট (Cock, Robert) — জার্মান জীবাণু-বিজ্ঞানী ; জন্ম 1843 খৃঃ, মৃত্যু 1916 খৃঃ। জীবাণু-বিদ্যার গবেষণায় অসামান্য কৃতিত্ব, প্রায় পাস্তুরের ↑ সমকক্ষ। যক্ষা ও কলেরা রোগোৎপাদক জীবাণু আবিষ্কার ; আন্‌থাক্স ↑ রোগের প্রতিষেধক টিকা উদ্ভাবন। 1905 খৃস্টাব্দে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ। কলেরার জীবাণু ও তাদের কার্যকারিতা সম্বন্ধীয় তথ্যাদি আবিষ্কার করেন কক্‌, আর স্পেনীয় বিজ্ঞানী ফেনার তার প্রতিষেধক টিকা বার করেন; যার পদ্ধতি আবার সংশোধন করেন ফরাসী বিজ্ঞানী ডাঃ হপ্‌কিন ↑। বর্তমানে অবশ্য বিজ্ঞানী কোলে প্রবর্তিত কলেরার প্রতিষেধক ইঞ্জেক্‌শন দেওয়ার পদ্ধতি প্রচলিত আছে।

কন্‌জার্ভেশন অব এনার্জি (conservation of energy) — শক্তির অবিনশ্বরতা। জগতে কোন প্রকার শক্তিই মূলতঃ সৃষ্টি করা যায় না ; শক্তির বিনাশও নেই। এক রকম শক্তিকে অন্য রকম শক্তিতে পরিবর্তিত করা যায় মাত্র। ইলেক্‌ট্রিক হিটার, স্টোভ প্রভৃতিতে তড়িৎশক্তিকে তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়। ইঞ্জিনে কয়লার তাপ-শক্তিকে কৌশলে গতীয় শক্তিতে (কাইনেটিক এনার্জি ↑) রূপান্তরিত করা হয়। কিন্তু মূলতঃ আমরা কোন শক্তি সৃষ্টি করতে পারি না ; পরন্তু কোন শক্তিকে একেবারে বিনষ্ট করাও যায় না। শক্তি সম্বন্ধীয় এই তথ্যটিকে বলা হয় 'প্রিন্সিপ্‌ল অব কন্‌জার্ভেশন অব এনার্জি' অর্থাৎ শক্তির অবিনাশিতা সূত্র। এই সূত্র পদার্থের বেলায়ও সত্য ; পদার্থেরও

উৎপত্তি, বা বিলুপ্তি নেই, বিভিন্ন বিক্রিয়ায় পদার্থের রূপান্তর ঘটে মাত্র। একে বলে 'কন্‌জার্ভেশন অব ম্যাটার,' বা পদার্থের অবিনশ্বরতা।

কঞ্জাংটিভা (conjunctiva) — চক্ষু-গোলকের উপরিভাগে বিস্তৃত স্বচ্ছ আচ্ছাদন-পর্দা ; যার মধ্যভাগ কিঞ্চিৎ স্থূল হয়ে চোখের কৃষ্ণ-তারকা অংশের সৃষ্টি হয়েছে। কঞ্জাংটিভার ওই মধ্যভাগকেই বলা হয় কর্ণিয়া ↑। কঞ্জাংটিভার প্রদাহ-জনিত রোগকে বলে '**কঞ্জাংটিভাইটিস**'।

কণ্ডাইল (condyle)—দেহের কোন-কোন অস্থির গোলাকার প্রান্তভাগ। পেশী-বন্ধনীর সাহায্যে এইরূপ দুইটি কণ্ডাইল পরস্পর মিলিয়া কব্‌জার মত সঞ্চালনক্ষম অস্থি-সংযোগ গঠিত হয় ; যেমন হাটুতে।

কণ্ডিউট (c o n d u i t) — বিদ্যুৎ সরবরাহের তার অনেক ক্ষেত্রে যে পাইপের ভিতর দিয়ে টানা হয়। জল সরবরাহের যে মোটা পাইপ মাটির তলা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তাকেও কণ্ডিউট পাইপ বলে।

কণ্ডিসন্‌ড রিফ্লেক্স (conditioned reflex) —প্রত্যক্ষ সংযোগশূন্যভাবে, অর্থাৎ বহিঃস্থ কোন উত্তেজকের প্রভাবে জীবদেহে যে প্রতিক্রিয়া স্বতঃই প্রকাশ পায় তাকে ইংরেজীতে বলে **রিফ্লেক্স**, অর্থাৎ স্বাভাবিক জৈব প্রতিক্রিয়া ; যেমন — সামনে খাদ্য দেখলে ক্ষুধার্ত ব্যক্তির জিবে স্বভাবতঃই জল আসে, লালা-রস ঝরে। এখানে খাদ্যবস্তু হলো বাহিরের উত্তেজক, আর তার 'রিফ্লেক্স' হলো লালা-নিঃসরণ। বিশেষ শিক্ষা, বা অভ্যাসের ফলে এরূপ স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার কার্য-কারণ সম্বন্ধ বদলে গেলেও জীবদেহে যে প্রক্ষিপ্ত প্রতি-ক্রিয়া ঘটতে দেখা যায় তাকে বলে 'কণ্ডিসন্‌ড রিফ্লেক্স', অর্থাৎ পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া। যেমন—একটা ক্ষুধার্ত কুকুরকে খাদ্য পরিবেশনের সময়ে প্রতিবারেই যদি ঘণ্টাধ্বনি করা হয়, তাহলে ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে-সঙ্গে খাদ্য দেখল, আর কুকুরের জিবে জল এল। এভাবে কিছু দিন অভ্যস্ত হলে ঘণ্টা-ধ্বনি শুনলেই কুকুরটার জিবে জল আসবে, তার জন্যে আর খাদ্যের আবশ্যক হবে না। একেই বলে ক. রি.। খাদ্যের গন্ধে, বা দর্শনে লালা আসে, এই স্বাভাবিক রিফ্লেক্সের পরিবর্তে 'কণ্ডিসন্‌ড রিফ্লেক্স' হলো ঘণ্টাধ্বনির পরোক্ষ প্রভাবে লালা নিঃসরণ। শারীর বিজ্ঞানের এই তথ্য ও তাৎপর্যাদি সম্পর্কে গবেষণার সূত্র-পাত করেন রাশিয়ার স্বনামধন্য বিজ্ঞানী প্যাভ্‌লভ ↑।

কণ্টুর লাইন (contour line) — মানচিত্রে যে-সকল রেখা টেনে কোন দেশের সমান উচ্চতা-বিশিষ্ট বিভিন্ন স্থান সমূহ দেখানো হয়ে থাকে।

কণ্টুর লাইন

কন্‌ভেক্স লেন্স (convex lens) — উত্তল কাচখণ্ড, বা লেন্স ↑; অর্থাৎ যে বক্রতল কাচ-খণ্ডের মধ্যভাগ মোটা, অর্থাৎ যার তল-বক্রতা বাইরের দিকে। পক্ষান্তরে, মধ্যভাগ ভিতরের দিকে বক্র হলে তাকে বলে অবতল, বা **কন্‌কেভ লেন্স**। (লেন্স ↑)

কন্‌ভেক্স লেন্স

কনকেভ লেন্স

কনিফেরা (conifera) — মুক্তবীজী উদ্ভিদ; ফার, পাইন প্রভৃতি জাতীয় যে-সব উদ্ভিদের বীজ কোন কঠিন বীজাধারের (ওভারি ↑) মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। এরূপ উন্মুক্ত বীজোৎপাদক উদ্ভিদকে ক্ষেত্র বিশেষে আবার জিম্‌নোস্পার্ম ↑ ও বলা হয়। বায়ুপ্রবাহের সাহায্যে এদের ফুলে রেণু-নিষেক ঘটার ফলে ওইরূপ মুক্ত বীজ উৎপন্ন হয়ে থাকে। চিত্রে 'প' পাইন, 'ফ' ফার গাছ এবং 'ব' এ-জাতীয় মুক্ত বীজ দেখানো হয়েছে।

কনিফেরা

কক্রফ্‌ট (Cockcroft), স্যার জন গড্‌লাস — বৃটিশ পদার্থবিজ্ঞানী, জন্ম ইয়র্কশায়ারে 1897 খৃঃ, মৃত্যু 1967 খৃঃ। পারমাণবিক শক্তি সম্বন্ধে মূল্যবান গবেষণা। পরমাণু বিজ্ঞানের জটিল তথ্যাদি আবিষ্কারের জন্য 1951 খৃঃ নোবেল পুরস্কার লাভ। বহু কাল যাবৎ বৃটিশ পরমাণু শক্তি কমিশনের অধিকর্তা হিসেবে অশেষ খ্যাতি ও কৃতিত্ব অর্জন।

কম্পাল্‌শন নিউরোসিস (compulsion neurosis) — মানসিক রোগ, বা মনোবিকার বিশেষ; যাতে রোগী অহেতুক কোন অর্থহীন কাজ নিয়মিতভাবে করতে উৎসুক হয়ে থাকে; যেমন, পথ চলতে চলতে রাস্তার ধারে প্রত্যেকটা ল্যাম্প পোষ্ট ছুঁয়ে যাবে। এ-রোগে অকারণ এরূপ এক-একটা মানসিক বাধ্যবাধকতা জন্মায়।

কম্পেন্‌সেশন ব্যালান্স (compensation balance) — ঘড়ির এক রকম বিশেষ ধরনের 'ব্যালান্স হুইল', যা এমনভাবে তৈরী যে, বায়ুমণ্ডলীর উষ্ণতার পরিবর্তনে তার আয়তনের কিছু পরিবর্তন হলেও তার ঘূর্ণন, বা আবর্তনের কাল-পরিমাণ একই থাকে, সঠিক সময় নির্দেশের কোন ব্যাঘাত ঘটে না। এরূপ তাপপ্রতিষেধক ব্যালান্স হুইলে (চিত্রানুযায়ী) দু'দিকের বক্র অংশদ্বয় বিভিন্ন ধাতুতে তৈরী হয়। উষ্ণতাবৃদ্ধির ফলে ধাতু-দ্বয় বিভিন্ন হারে (কোয়িফিসিয়েণ্ট অব এক্সপ্যান্সন ↑) বর্ধিত হওয়ার ফলে অধিকতর বেঁকে যায় এবং উভয় অংশের ভারসাম্য কেন্দ্রাভিমুখী হয়। এর ফলেই ঐ হুইল, বা চক্রের আবর্তন, অর্থাৎ দোলনের কাল (পেণ্ডুলাম ↑)-পরিমাণ সর্বদা সঠিক ও সুনির্দিষ্ট থাকে।
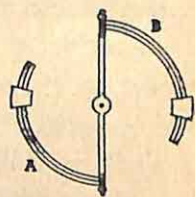
কম্পেনসেশন ব্যালান্স

কম্পোজিটা (compo sita) —
সপুষ্পক উদ্ভিদের একটি শ্রেণী বিশেষ ; ডেইজি প্রভৃতি যে-সব সপুষ্পক উদ্ভিদের প্রত্যেকটি ফুল বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পূর্ণাঙ্গ ফুলের পাশাপাশি একত্র সমাবেশে গঠিত হয়ে থাকে।

কম্পোষ্ট (compost) — এক রকম উদ্ভিজ্জ সার ; লতা-পাতা প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ পদার্থ পচিয়ে এরূপ সার প্রস্তুত করা হয়। বিভিন্ন জীবাণুর প্রভাবে এর মধ্যে উদ্ভিদের পরিপোষক নাই-ট্রোজেন-বহুল উৎকৃষ্ট সার জন্মায়।

কমিউটেটর (commutator) — এক প্রকার বৈদ্যুতিক যন্ত্র ; যার সাহায্যে তড়িৎ-প্রবাহের গতি পরিবর্তন করা সম্ভব হয়। বিভিন্ন ইলেকট্রিক সার্কি-টের ↑ তড়িৎ-প্রবাহকে পর-পর সংগ্রহ করবার, অথবা কোন তড়িৎ-প্রবাহকে বিভিন্ন সার্কিটে প্রেরণ করবার জন্যেও
কমিউটেটর
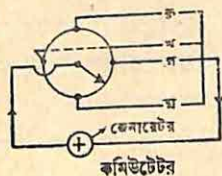
এ-যন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সাধারণতঃ ডায়নামো ↑ যন্ত্রে প্রয়োজনানুসারে অল্টারনেটিং (এ. সি.) ↑ কারেন্টকে ডাইরেক্ট (ডি. সি.) ↑ কারেণ্টে পরি-বর্তিত করবার জন্যেই এই কমিউটেটর যন্ত্র সচরাচর ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

কমেট (comet) — ধূমকেতু ; উজ্জ্বল গ্যাসীয় জ্যোতিষ্ক বিশেষ। মহাশূন্যে সুদীর্ঘ অধিবৃত্ত কক্ষপথে এরূপ জ্যোতিষ্ক মহাবেগে ছুটে চলে। সূর্যের আকর্ষণে কদাচিৎ সৌর মণ্ডলে প্রবেশ করায় পৃথিবী থেকে অল্প কালের জন্যে দেখা যায়। এর একটা অত্যুজ্জ্বল কেন্দ্রীয় অংশ ও কিঞ্চিৎ অনুজ্জ্বল দীর্ঘ পুচ্ছ দৃষ্ট হয়ে থাকে।

করপাস্‌ল(corpuscle)—সূক্ষ্ম পদার্থ-কণিকা, জীবকোষ (সেল ↑); যেমন, **ব্লাড-করপাস্‌ল** — রক্ত-কণিকা, বা রক্ত-কোষ। **করপাস্‌কুলার থিওরি অব লাইট** — আলোকের কণিকা-তত্ত্ব, যাতে আলোক-রশ্মিকে প্রচণ্ড গতিশীল অগণিত অতিসূক্ষ্ম কণিকার (ফোটন ↑) ধারা বলে প্রমাণ করা হয়েছে।

করোনা (corona) — সূর্য-গ্রহণের (ইক্লিপ্‌স, সোলার ↑) সময়ে সূর্যের চারিদিকে যে সাদা পরিমণ্ডল দেখা যায়। এটা সূর্যের ক্রোমোস্ফিয়ারের ↑ বহির্বলয় অংশ। কুয়াশার দিনে, বা ঘসা-কাচের ভিতর দিয়ে দেখলে সূর্যের চারদিকে এরূপ একটি শ্বেতাভ বলয় দৃষ্ট হয়ে থাকে।

করোনারি আর্টারি (coronary artery) — হৃৎপিণ্ডে রক্ত চলাচলের জন্যে তার দু'দিকে যে-দু'টি রক্তবহা নালি থাকে। **করোনারি থ্রম্বো-সিস** — রোগ বিশেষ, যাতে হৃৎপিণ্ডের উক্ত নালি-পথের কোথা-ও রক্ত জমাট বেঁধে রক্তের
করোনারি আর্টারি

সঞ্চলন বন্ধ হয়ে যায়, (থ্রম্বাস ↑)

ফলে হৃৎস্পন্দন থেমে গিয়ে সহসা রোগীর মৃত্যু ঘটে। বস্তুতঃ একে করোনারি অক্লুসান। বলাই সঙ্গত।

করোনারি সার্কুলেশন (coronary circulation) — হৃৎপিণ্ডে রক্ত-স্রোতের প্রবেশ ও নিষ্ক্রিমনের চক্রাবর্তন ; যার ফলে শিরা ও ধমনীর পথে সারা দেহে রক্ত চলাচল করে।

করোলা (corolla) — ফুলের বীজ-কোষের চারদিকে চক্রাকারে সজ্জিত বর্ণবৈচিত্র্যময় দলপত্র সমূহ, বা ফুলের পাপড়ি। এদের প্রধান কাজ হলো ফুলের বীজকোষে রেণু-নিষেকের সাহায্যের জন্যে বর্ণ-শোভায় প্রলুব্ধ করে কীট-পতঙ্গ-দের আকৃষ্ট করা।

করোলা

করোলারি (corollary) — অনু-সিদ্ধান্ত ; গণিতশাস্ত্রে, বিশেষতঃ জ্যামিতিতে কোন সত্য প্রমাণ করলে অপর যে সত্যটি সঙ্গে-সঙ্গে স্বতঃই প্রমাণিত হয়ে যায়, তাকে মূল প্রমাণ-টির করোলারি বলা হয়।

করোসিভ সাব্লিমেট (corrosive sublimate) — মার্কিউরিক ক্লোরাই-ডের ($HgCl_2$) একটি বিশেষ নাম। বিষাক্ত পদার্থ বলে জীবাণু-নাশক ঔষধাদিতে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয় ; ফটোগ্রাফিতেও। এর কিছু ব্যবহার আছে। **করোসন** মানে ক্ষয়, বা জারণ, **করোসিভ** মানে ক্ষয়কারী, যার সংস্পর্শে পদার্থাদি ক্ষয়ে যায় ; যেমন — অ্যাসিডের সংস্পর্শে ধাতব পদার্থ ক্ষয়ে যায়, বা জারিত হয়।

কলেরা (cholera) — গ্রীষ্মপ্রধান দেশের একটি সংক্রামক রোগ ; খাদ্য-পানীয়ের সঙ্গে এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম জীবাণু (চিত্র দ্রষ্টব্য) মানুষের রক্তে অনু-প্রবিষ্ট হয়ে এ-রোগ সংক্রামিত হয়ে থাকে ; প্রচুর ভেদ-বমি হয়ে দেহের জলীয় অংশ নিঃশেষ হয়ে গিয়ে রোগী প্রধানতঃ দুর্বলতায় মারা যায়। কলেরা-জীবাণু **ফ্লাজেলা** (flage-lla)। শ্রেণীভুক্ত।
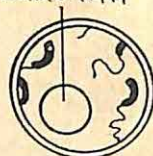
কলেরা জীবাণু

কষ্টিক অ্যাল্‌কালি (caustic al-kali) — কস্টিক পটাস (পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড, KOH) এবং কস্টিক সোডা (সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড, NaOH)। এ-গুলো অত্যন্ত ক্ষারধর্মী; হাতে লাগলে হাত জ্বলে যায়। বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্পে ও গবেষণাগারে এই দু'রকম কস্টিক অ্যালকালি ক্ষারের যথেষ্ট প্রয়োজন হয়ে থাকে।

কস্‌মিক-রে (cosmic ray) — মহা-জাগতিক রশ্মি। মহাশূন্য থেকে অতি সূক্ষ্ম বিভিন্ন মৌল-কণা, প্রকৃতপক্ষে তড়িতাবিষ্ট (আয়নায়িত।) তেজঃ কণিকা সমূহ বায়ুমণ্ডল ভেদ করে এসে পৃথিবী-পৃষ্ঠে অহরহঃ বর্ষিত হচ্ছে (কস্‌মিক রেডিয়েশন)। এই তড়িৎ-কণিকার অজস্র ধারা আসছে অতি সূক্ষ্ম তরঙ্গের আকারে, আর তা অদৃশ্য আলোক-রশ্মির মত মহাশূন্যে চারি-দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। সুদীর্ঘ পথ

অতিক্রম করবার সময় এদের সংগঠক নিউট্রন↑, প্রোটন↑প্রভৃতি বিভিন্ন কণিকার পরস্পর সংঘাতে মেসন↑ নামে আর এক রকম নূতন কণিকার সৃষ্টি হয়। ভূ-পৃষ্ঠে যে কস্‌মিক রশ্মি পৌঁছায় তার প্রায় তিন-চতুর্থাংশই এই মেসন-কণিকা। জগতের সৃষ্টি-রহস্যের মূলে এই অদৃশ্য রশ্মির প্রভাব কতখানি তা আজও বিশেষ গবেষণার বিষয় হয়ে রয়েছে।

কস্‌মোগনি (cosmogony)—বিশ্বের সৃষ্টি-রহস্যের আলোচনা-বিজ্ঞান; গ্রহ নক্ষত্রাদির সৃষ্টি, বা উৎপত্তি সম্পর্কীয় বিভিন্ন মতবাদের আলোচনা।

কস্‌মোলজি (cosmology)—জ্যোতির্বিজ্ঞানের একটি শাখা; বিভিন্ন জ্যোতিষ্কের আকার, আয়তন, গতি-প্রকৃতি ও পারস্পরিক সম্পর্কাদি বিষয়ক তত্ত্বীয় বিজ্ঞান।

কাইজ্‌মা (chiasma) — X-এর আকারে পরস্পর-ছেদী রেখা, বা সূত্র; মানব-দেহে এরূপ আকারের স্নায়ু-তন্তু আছে; যেমন, **অপ্টিক কাইজ্‌মা** (optic chiasma) ঊর্ধ্ব-মস্তিকের অভ্যন্তরে পরস্পর-ছেদী এরূপ দর্শন-স্নায়ুতন্তুর একটি ছেদ-সংযোগ রয়েছে।

অপ্টিক কাইজ্‌মা

কাইজ্‌মা

কাইনেম্যাটিক্স (kinematics)—গতি-বিজ্ঞান; কোন চলমান বস্তুর গতিবেগ, ত্বরণ (অ্যাক্সিলারেশন↑), শক্তি, ভর প্রভৃতি বিষয়ক তথ্যাদির আলোচনাদি বিজ্ঞানের যে শাখার অন্তর্গত। (কাইনেটিক এনার্জি↑)

কাইনেটিক এনার্জি (kinetic energy) — গতীয় শক্তি; গতির প্রভাবে চলমান বস্তুতে যে শক্তি সঞ্চারিত হয়; যেমন—জলস্রোত, বা বায়ু-প্রবাহের বেগশক্তি, যার প্রভাবে টার্বাইন↑, উইণ্ড মিল↑ প্রভৃতি চলে। এই শক্তি সাধারণতঃ আর্গ↑, বা ফুট-পাউণ্ড্যাল↑এককে পরিমিত হয়ে থাকে। এর পরিমাণ নির্ধারণের সূত্র হলো $E=\frac{1}{2}mv^2$ (এখানে E হলো এনার্জি, বা শক্তি, m হলো বস্তুর মাস্‌↑বা ভর, আর v হলো বস্তুটার গতিবেগ।)

কাইমোগ্রাফ (kymograph) — শ্বাস-প্রশ্বাস, হৃৎস্পন্দন প্রভৃতির গতি-নির্দেশক এক রকম যন্ত্র বিশেষ। এ-যন্ত্রে ভূষাকালি মাখানো একটা গোলাকার পাত্রের গায়ে এক রকম কলমের সূক্ষ্মাগ্র-ভাগ লাগানো থাকে। বিশেষ বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় দেহের সংস্পর্শে ওই কলমটি বিভিন্ন স্পন্দনের গতি অনুযায়ী কম্পিত হয় এবং তড়িৎপ্রভাবে ঘূর্ণায়মান পাত্রটার গায়ে তদনুযায়ী রেখাপাত করে।
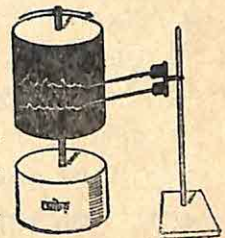
কাইমোগ্রাফ

কাইফোসিস (kyphosis) — মেরু-দণ্ডের বক্রতা-জনিত রোগ বিশেষ; যাতে পৃষ্ঠের ঊর্ধ্বভাগ উঁচু ও নিম্নভাগ

নিচু হয়ে পড়ে, যার ফলে দেহকাণ্ড ইংরেজী s অক্ষরের মত বেঁকে যায়।

কার্টিলেজ (cartilage) — তরুণাস্থি ; প্রাণিদেহের নরম হাড়। উপযুক্ত পরিমাণ ক্যালসিয়ামের ↑ অভাবে অপরিপুষ্ট এরূপ অস্থি নমনীয় ও স্থিতিস্থাপক হয়ে থাকে। শিশুদের দেহে যথেষ্ট কার্টিলেজ থাকে, যা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণ ক্যালসিয়াম পেয়ে পরিপুষ্ট ও কঠিন হাড়ে পরিণত হয়। অবশ্য বয়স্ক লোকের দেহেও স্থানবিশেষে স্বভাবতঃই তরুণাস্থি থাকে।

কার্ডিনাল (cardinal) — প্রধান, সবিশেষ প্রয়োজনীয় ; যেমন — কম্পাস ↑ যন্ত্রের 'কার্ডিনাল পয়েণ্টস' হলো পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ এই চারিটি দিক-নির্দেশক বিন্দু চতুষ্টয়।

কার্ডিয়াজল (cardiazol) — কর্পূর (ক্যাম্ফর ↑) থেকে প্রস্তুত এক প্রকার রাসায়নিক ভেষজ পদার্থের ব্যবহারিক নাম। মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের উপরে এর ভেষজ-উত্তেজক প্রভাবের ফলে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া এবং হৃৎপিণ্ডের কার্যকারিতা সুনিয়ন্ত্রিত হয়। বিভিন্ন নার্কোটিক ↑ পদার্থাদির বিষ-ক্রিয়া প্রশমনে এবং কোন-কোন মানসিক রোগেও পদার্থটা ব্যবহৃত হয়।

কার্ডিয়োগ্রাম (cardiogram) — যান্ত্রিক ব্যবস্থায় হৃৎস্পন্দনের গতি-প্রকৃতি নির্দেশক রেখাচিত্র। **কার্ডি** মানে হৃৎপিণ্ড, **কার্ডিয়াক** হৃৎপিণ্ড (হার্ট ↑) সম্বন্ধীয়। ইলেক্‌ট্রো-কার্ডিয়োগ্রাম ↑ ।

কার্নালাইট (carnalite) — পটাসিয়াম ও ম্যাগ্নেসিয়াম-ঘটিত আকরিক লবণ বিশেষ ; কোন কোন লবণ-হ্রদের বিশুষ্ক তলদেশে খনিজ আকারে পাওয়া যায়। এটা কখন কখন জমির সার হিসাবে কিছু-কিছু ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক ধাতব পটাসের ↑ প্রধান খনিজ উৎস।

কার্নিভোরা (carnivora) — মাংসভূক প্রাণিগোষ্ঠি ; যেমন — সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি। গরু, ছাগল প্রভৃতি হলো **হার্বিভোরা** ↑ , মানে তৃণভূক প্রাণী।

কার্বন (carbon) — মৌলিক পদার্থ ; সাংকেতিক চিহ্ন C, পারমাণবিক ওজন 12·01, পারমাণবিক সংখ্যা 6 ; এটা খনিজ কয়লা, কাঠ-কয়লা, ভূষাকালি, গ্র্যাফাইট ↑ , হীরক প্রভৃতি বিভিন্ন আকারে (অ্যালোট্রপি ↑)
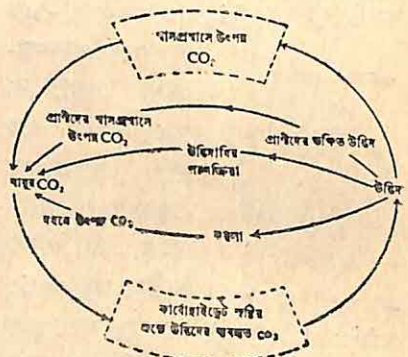
কার্বনের চক্রগতি

পাওয়া যায়। যে-কোন খাদ্যের কার্বন উপাদানের দহনক্রিয়ার ফলেই জীবদেহে তাপ ও শক্তির সঞ্চার হয়। বিভিন্ন ধাতব পদার্থের সঙ্গে এর রাসায়নিক

মিলনে বিভিন্ন কার্বাইড ↑ সল্ট সৃষ্টি হয়ে থাকে। বাতাসে কিছু কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস মিশ্রিত থাকে; এজন্যে চূণের জল খোলা বাতাসে রাখলে সাদা হয়ে যায়, ক্যালসিয়াম কার্বনেট তৈরী হয়। জীবের দেহাভ্যন্তরে শ্বাস-বায়ুর অক্সিজেন খাদ্যের কার্বন উপাদানকে পুড়িয়ে কার্বন-ডাইঅক্সাইড ↑ গ্যাস সৃষ্টি করে, আর তা নিশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে বায়ুতে মিশে যায়। এদিকে উদ্ভিদ আবার ফোটোসিন্থেসিস ↑ প্রক্রিয়ায় সেই কার্বন-ডাইঅক্সাইড টেনে নিয়ে তার কার্বন-অংশ আত্মস্থ করে' দেহের পুষ্টি সাধন করে, আর অক্সিজেন বাতাসে ছেড়ে দেয়। আবার এভাবে পরিপুষ্ট কার্বন-বহুল উদ্ভিজ্জ খাদ্যাদি খেয়ে প্রাণীরা বেঁচে থাকে। এ-সব প্রাকৃতিক ও জৈবিক ব্যবস্থায় কার্বন প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে ক্রমাগত চক্রাকারে নিয়ত ঘুরছে; এই প্রাকৃতিক ব্যবস্থাকে বলে **কার্বন সাইক্ল**, অর্থাৎ কার্বনের চক্রগতি। এভাবে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের আনুপাতিক পরিমাণ ঠিক থাকছে, জীব-জগৎ রক্ষা পাচ্ছে।

কার্পাল বোন্‌স

কার্পাল (carpal)— **কার্পাস** (carpus), অর্থাৎ হাতের কব্‌জি সম্বন্ধীয়; যেমন, **কার্পাল বোন্‌স** (bones) হলো হাতের কব্‌জি-সংলগ্ন প্রায় গোলাকার অস্থিখণ্ডসমূহ (চিত্রে)। **মেটা কার্পাল বোন্‌স** (metacarpal bones)—কার্পালের পরবর্তী, অর্থাৎ করতল ও অঙ্গুলীর অস্থিখণ্ডসমূহ।

কার্বনিফেরাস রক (carboniferous rock) — ভূ-স্তরের অঙ্গারীভূত কঠিন শিলা; ভূ-গর্ভের যে স্তরে কয়লা সঞ্চিত আছে। ভূ-গর্ভের চাপ ও তাপে প্রাচীন যুগের বৃক্ষরাজি রূপান্তরিত হয়ে এই কয়লা-শিলা স্তরের উৎপত্তি ঘটেছে। ভূ-তাত্ত্বিক গবেষণায় স্থির হয়েছে, পৃথিবীর এই কঠিন অঙ্গার-শিলাস্তর আনুমানিক 25 কোটি বছর পূর্বে গঠিত হয়েছে।

কার্বনিক অ্যাসিড (carbonic acid) —বস্তুতঃ কার্বন-ডাইঅক্সাইড (CO_2) গ্যাসের জলীয় দ্রব, H_2CO_3; অত্যন্ত মৃদু একটা অ্যাসিড। উন্মুক্ত রাখলে এর প্রায় সম্পূর্ণ কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস বেরিয়ে বাতাসে মিশে যায়। এর রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন সল্টই হলো বিভিন্ন **কার্বনেট**। রাসায়নিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্র বিশেষে এ থেকে (অ্যাসিড সল্ট ↑) বাই-কার্বনেট-ও সৃষ্টি হয়ে থাকে। চাপ প্রয়োগ করে কৌশলে প্রচুর কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস জলে দ্রবীভূত ও সম্পৃক্ত করে সোডা ওয়াটার ↑ তৈরী করা হয়; মূলতঃ জিনিসটা কার্বনিক অ্যাসিডের জলীয় দ্রবণ।

কার্বলিক অ্যাসিড (carbolic acid) —এর অপর নাম ফিনল ↑; রাসায়নিক সূত্র C_6H_5OH; সাদা স্ফটিকা-

কার পদার্থ। জলে দ্রবণীয়, বিষাক্ত পদার্থ, তীব্র অ্যাসিড-ধর্মী, যাতে লাগে তা পুড়ে ক্ষয়ে যায়। একটা বিশেষ গন্ধ আছে। বীজাণুরোধক (ডিস্ইন্ফ্যাক্টাণ্ট ↑) পদার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়; রং ও প্লাস্টিক ↑ শিল্পেও এর যথেষ্ট প্রয়োজন হয়।

কার্বাইড (carbide)— নানা প্রকার ধাতব কার্বাইড হতে পারে, বিশেষ-ভাবে 'ক্যালসিয়াম কার্বাইড' বুঝায়। ক্যালসিয়াম ও কার্বনের যৌগিক, পদার্থ, CaC_2 ; বিশুদ্ধ অবস্থায় সাদা থাকে, কিন্তু সাধারণতঃ এক রকম ধূসর বর্ণের কঠিন পদার্থরূপেই পাওয়া যায়। এর মধ্যে জল দিলে এসিটিলিন ↑ গ্যাস (C_2H_2) জন্মায়, যা বার্ণারে জ্বালালে আলো দেয়। একেই বলে 'কার্বাইড লাইট'। ক্যালসিয়াম অক্সাইড ↑, অর্থাৎ চূনের সঙ্গে কার্বন মিশিয়ে ইলেক্ট্রিক চুল্লীতে উচ্চ তাপে উত্তপ্ত করে ক্যালসিয়াম কার্বাইড তৈরী করা হয়।

কার্বোহাইড্রেট (carbohydrate)— এক শ্রেণীর রাসায়নিক পদার্থের সাধারণ নাম। বিভিন্ন অনুপাতে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের জৈব যৌগিক পদার্থ; সাধারণ রাসায়নিক সূত্র HCOH. শ্বেতসার, শর্করা, গ্লুকোজ ↑ সেলুলোজ ↑ (কাঠের আঁস) প্রভৃতি হলো বিভিন্ন কার্বোহাইড্রেট পদার্থ। খাদ্যের কার্বোহাইড্রেট উপাদানই জীবের দেহাভ্যন্তরে মৃদু দহনের ফলে ও বিভিন্ন বিপাকীয় ক্রিয়ায় দেহের তাপ ও শক্তি জোগায়।

কার্বোর‍্যাণ্ডাম (carborundum)— গাঢ় ধূসর বর্ণের এক রকম সুকঠিন ও ক্ষুদ্র স্ফটিকাকার পদার্থের বিশেষ নাম; রাসায়নিক হিসেবে জিনিসটা হলো 'সিলিকন কার্বাইড' (SiC)। এর কাঠিন্য প্রায় হীরকের মত। ধাতব অস্ত্র-শস্ত্রের ধার ঘসে তীক্ষ্ণ করবার জন্যে এর চূর্ণ ব্যবহৃত হয়। সিলিকা ↑ (SiO_2), অর্থাৎ বালি ও কয়লা মিশিয়ে ইলেক্ট্রিক ফার্নেসে ↑ প্রায় 2000° সেন্টিগ্রেড তাপে গলিয়ে রাসায়নিক সংযোগে পদার্থটা প্রস্তুত করা হয়।

কার্বুরেটর (carburettor)—পেট্রল-চালিত ইঞ্জিনের একটা যন্ত্রাংশ বিশেষ। এর যান্ত্রিক ব্যবস্থায় জ্বালানি তেলের সূক্ষ্ম ধারার সঙ্গে প্রয়োজনানুরূপ বায়ু মিশ্রিত হয়ে সিলিণ্ডারের মধ্যে যায়; আর সেখানে বিশেষ এক বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট অগ্নি স্ফুলিঙ্গের (ইলেক্ট্রিক স্পার্ক) সংস্পর্শে ওই গ্যাসীয় মিশ্রণের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটে' দহনক্রিয়া চলে। এই প্রক্রিয়াকে বলে 'ইণ্টারন্যাল কম্বাস্‌সন' ↑, বা আভ্যন্তরীণ দহনক্রিয়া। এর ফলে উৎপন্ন গ্যাসের চাপে ইঞ্জিন চলে।
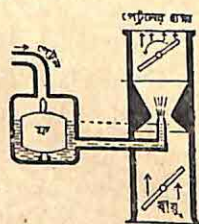
কার্বুরেটর

কার্মিনেটিভ (carminative) — অম্ল-নাশক ঔষধ; যে ঔষধের ক্রিয়ায় পাকস্থলীর মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত অম্ল (হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড) ক্ষরণের ফলে উদ্ভূত অস্বস্তি ও বায়ুর প্রকোপ

প্রশমিত হয় ; যেমন—খাবার সোডা, অর্থাৎ 'বাইকার্বনেট অব সোডা' ↑।

কালার ইণ্ডেক্স (colour index)—দীর্ঘতর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের (লাল) রশ্মি আমাদের চোখে উজ্জ্বলতর দেখায় সত্য, কিন্তু ফটোগ্রাফিক প্লেটের ↑ উপর তার প্রভাব ক্ষুদ্রতর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোক-রশ্মি অপেক্ষা কম। সুতরাং রক্তবর্ণের কোন নক্ষত্র চোখে উজ্জ্বল দেখাবে, কিন্তু ফটোগ্রাফে তাকে অনুজ্জ্বল প্রতিভাত হবে। এই দুই অবস্থায় কোন নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্যের পার্থক্য নিরূপক পরিমাপকে ঐ নক্ষত্রের কা. ই. বলা হয়। এ থেকে দূরাগত আলোক-রশ্মির ঔজ্জ্বল্যের বিভিন্নতার সাহায্যে রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। তা থেকে আবার উৎসের (নক্ষত্রের) উষ্ণতাও (টেম্পারেচার ↑) সহজেই নির্ণয় করা যেতে পারে। জীবদেহের রক্তের 'কালার ইণ্ডেক্স' হলো প্রত্যেকটি রক্তকোষে যতটা পরিমাণ হিমোগ্লোবিন ↑ রয়েছে। এই পরিমাণের, বা কালার ইণ্ডেক্সের উপরেই রক্তের অক্সিজেন ↑ শোষণ করবার ক্ষমতা নির্ভর করে।

কাষ্ট আয়রন (cast iron)— ঢালাই লোহা ; বস্তুতঃ অবিশুদ্ধ ভঙ্গুর লৌহ, যাকে **পিগ-আয়রন** ↑ বলা হয়। খনিজ লৌহ-প্রস্তর থেকে 'ব্লাষ্ট ফার্নেস'-এর সাহায্যে প্রথমে এই অবিশুদ্ধ লৌহ পাওয়া যায়। এর মধ্যে 2% থেকে 4·5% কার্বন, সামান্য কিছু ম্যাঙ্গানিজ ↑, গন্ধক, সিলিকন ↑ প্রভৃতি মিশ্রিত থাকে। গলিয়ে ছাঁচে ঢেলে এ দিয়ে রেলিং, কড়াই প্রভৃতি বিভিন্ন জিনিস তৈরী করা হয়। ভঙ্গুর বলে এ-রকম লোহাকে পুড়িয়ে পিটিয়ে কোন জিনিস তৈরী করা যায় না ; আগে একে স্টিল ↑, অথবা 'রট্ আয়রন',-এ রূপান্তরিত করে নিতে হয়।

কিউমুলাস্ (cumulous) — ঘনীভূত মেঘপুঞ্জ ; যে মেঘরাশি উপরের বায়ু-স্তরের ঠাণ্ডায় কিছুটা জমে ঘণীভূত হওয়ার ফলে তার প্রান্তদেশ আকাশের গায়ে সুস্পষ্ট রেখায় পরিদৃষ্ট হয়।

কিউমুলাস মেঘ

কিড্‌নি (kidney) — বৃক্ক ; বক্ষ-পঞ্জরের নিম্নভাগে অবস্থিত ফুস্‌ফুস্ (লাংস ↑) ও প্লীহার (স্পিল্‌ন ↑) নীচের দিকে মেরুদণ্ডের দুই পার্শ্বে সংলগ্ন দুইটি নরম ডিম্বাকার প্রত্যঙ্গ। এদের ভিতর দিয়ে রক্তের দূষিত জলীয় বর্জ্য অংশ(মূত্র) ছেঁকে বেরিয়ে মূত্রস্থলিতে চলে যায়। আমাদের দেহ-কাণ্ডের অভ্যন্তরে দু'পাশে এরূপ দু'টা কিড্‌নি, বা বৃক্ক পরস্পর যুক্ত রয়েছে। দেহের জৈবিক ক্রিয়ায় অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ।
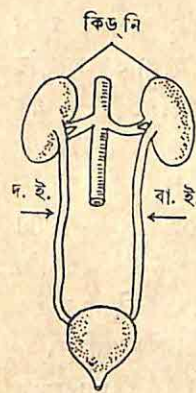
কিড্‌নি, বা বৃক্কদ্বয়

কিপ্‌স অ্যাপারেটাস (Kipp's

apparatus)—রসায়নাগারে বিভিন্ন গ্যাস উৎপাদনের জন্যে ব্যবহৃত এক রকম যন্ত্র। উত্তাপ ব্যতিরেকে কঠিন পদার্থের উপর তরল পদার্থের (অ্যাসিডের) রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে কোন গ্যাস উৎপন্ন হলে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যতক্ষণ
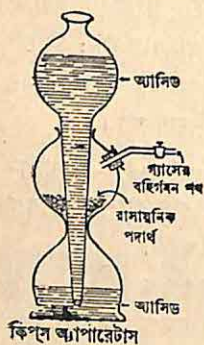
কিপ্‌স অ্যাপারেটাস

এর থেকে গ্যাস ব্যবহার করা হয় ততক্ষণ মাত্র গ্যাসটা উৎপন্ন হয়ে থাকে। নির্গমন-নল বন্ধ করলে ভিতরের গ্যাসের চাপে অ্যাসিড উপরের পাত্রে উঠে যায়, আর গ্যাসের উৎপাদনও সঙ্গে-সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায়।

কিলো- (kilo-) — মেট্রিক এককে 'হাজার' অর্থে শব্দটা ব্যবহৃত হয়; যেমন, কিলোগ্রাম হলো এক হাজার গ্রাম↑; **কিলোমিটার** — এক হাজার মিটার↑; কিলোওয়াট↑ কিলোসাইক্‌ল↑ ইত্যাদি।

কিলোওয়াট (kilowatt) — 1000 ওয়াট↑; 746 ওয়াট = এক অশ্বশক্তি (হর্স পাওয়ার↑)। এই হিসেবে এক কিলোওয়াট = প্রায় $1\frac{1}{3}$ অশ্বশক্তি।

কিলোগ্রাম ক্যালোরি (kilogram calorie) — যে-পরিমাণ তাপশক্তির (হিট↑) প্রভাবে এক কিলোগ্রাম (1000 গ্রাম) অতি বিশুদ্ধ জল 15° থেকে 16° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় উন্নীত হয়ে থাকে।

কিলোসাইক্‌ল (kilocycles) — প্রতি সেকেণ্ডে কোন পরিবর্তী তড়িৎ-প্রবাহের (অল্টার্নেটিং কারেণ্ট↑) এক হাজার বার পূর্ণ আবর্তন, বা দিক পরিবর্তন যদি ঘটে। তড়িৎ-বিজ্ঞানে পরিবর্তী প্রবাহের গতি-পরিবর্তনকে, (অর্থাৎ '+' ধন-তড়িদ্দ্বার থেকে '−' ঋণ-তড়িদ্দ্বারে পৌঁছে পুনরায় ধন-তড়িৎ-দ্বারে প্রত্যাবর্তনকে) বলে এক **সাইক্‌ল**। আবার, বেতার-কেন্দ্র থেকে রেডিও↑-তরঙ্গের বিক্ষেপণ প্রতি সেকেণ্ডে এক হাজার বার হলেও কিলোসাইক্‌ল বলা হয়।

কেজিন (casein) — দুধের প্রোটিন অংশ; শুষ্ক ছানা, সামান্য হল্‌দে পদার্থ। গরম দুধে অ্যাসিড, বা কোন অম্ল পদার্থ মেশালে কেজিনের ভাগ পৃথক হয়ে পড়ে। কৃত্রিম সুতা, প্ল্যাস্টিক↑, রং, পেইণ্ট প্রভৃতি নানা শিল্পে এর ব্যবহার আছে। কেজিন দিয়ে যে প্ল্যাস্টিক তৈরী হয় তাতে সহজেই সুদৃশ্য রং ধরে, দামেও সস্তা পড়ে। এ-দিয়ে বোতাম, ফাউণ্টেন পেন প্রভৃতি বিভিন্ন মসৃণ ও সুদৃশ্য জিনিস তৈরী করা হয়ে থাকে। গ্যালালিথ (galalith)↑।

কেপ্‌লার (Kepler), জোহান — জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী; জন্ম 1571 খৃষ্টাব্দ, মৃত্যু 1630 খৃঃ। বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ টাইকো ব্রাহির↑ সুযোগ্য ছাত্র ও সহকারী। সুপ্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ; জ্যোতির্বিজ্ঞানে অসামান্য দান। সৌর মণ্ডলীয় গ্রহসমূহের গতি-বিষয়ক তিনটি সূত্র আবিষ্কারে সমধিক

প্রসিদ্ধি ; এই 'কেপ্‌লারস্ ল', বা সূত্র তিনটিঃ (1) প্রত্যেকটি গ্রহ সূর্যকে তার উপকেন্দ্র দ্বয়ের একটিতে রেখে উপবৃত্তীয় কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করছে, (2) কোন গ্রহের সৌর-পরিক্রমা-কালের বর্গফল সূর্য থেকে তার দূরত্বের ঘনফলের সঙ্গে আনু-পাতিক হবে, (3) পরিক্রমাকালে সূর্য থেকে কোন গ্রহের উপবৃত্ত-পথের সং-যোজক ব্যাসার্ধ-রেখা সময়ের সম-ব্যব-ধানে সর্বদা সমান দূরত্ব অতিক্রম করে।

কেফিন (caffeine)—সাদা স্ফটিকাকার জৈব রাসায়নিক পদার্থ ; গলনাংক 235° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। কফি ও চায়ের পাতা থেকে নিষ্কাশিত একটা অ্যাল্‌কালয়েড ↑ পদার্থ। মৃদু উদ্দীপক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় ; হৃৎপিণ্ডের উপর এর ভেষজ-শক্তি আছে।

কেমোথিরাপি (chemotherapy) — চিকিৎসা পদ্ধতি বিশেষ ; যাতে কোনরূপ রাসায়নিক পদার্থ ঔষধ হিসাবে প্রয়োগ করে রোগ-জীবাণু ধ্বংস করা হয় ; কিন্তু রোগীর শরীরের উপর তার কোন প্রভাব বিস্তার করে না ; যেমন — নিউমোনিয়া ↑ রোগে সাল্‌ফোনেমাইড ↑ দেওয়া হয়, সিফি-লিসে স্যাল্‌ভার্সন ↑। সাধারণ ঔষধে রোগের যন্ত্রণা ও উপসর্গগুলো কমায়, এবং রোগের প্রতিরোধ-শক্তি বাড়ায়; কিন্তু কেমোথিরাপির ঔষধে কেবল জীবাণুনাশের কাজ করে মাত্র।

কেল্‌ভিন (Kelvin) উইলিয়াম টমসন, লর্ড— বৃটিশ বিজ্ঞানী ও আবিষ্কারক ; বেলফাস্টে জন্ম 1824 খৃঃ, মৃত্যু 1907 খৃঃ। মাত্র 22 বছর বয়সে ইংল্যাণ্ডের গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকৃতি বিজ্ঞা-নের অধ্যাপক, —একাদিক্রমে 53 বছর অধ্যাপনা ও গবেষণা। বহু মূল্য-বান তথ্য আবিষ্কার ও যন্ত্র উদ্ভাবন ; পৃথিবীর বয়স নির্ধারণ, আলোকের তরঙ্গ-গতি, গ্যাসীয় মিশ্রণের সূত্র, অ্যাব্‌সোলিউট ↑ টেম্পারেচার স্কেল (কেল্‌ভিন স্কেল $0°K = -273°C$), তড়িৎশক্তি পরিমাপক বিভিন্ন যন্ত্র, দিগ্‌দর্শন যন্ত্র (নৌ-বিভাগের চুম্বকীয় কম্পাস) প্রভৃতি বহু মূল্যবান অবদান। তড়িৎ-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি বিধান; লিডেন জার ↑ নিয়ে এঁর অভিনব পরীক্ষার ফলাফলের উপরে হার্জের ↑ বেতার-তরঙ্গ আবিষ্কারের কৃতিত্ব নির্ভরশীল। আমেরিকার সঙ্গে ইংলণ্ডের টেলিগ্রাফ সংযোগ সাধনে অ্যাট্‌-লাণ্টিক মহাসাগরের তলদেশে বৈদ্যু-তিক তার সন্নিবেশের সফল পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য অবিস্মরণীয় কৃতিত্ব অর্জন।

কুইক লাইম (quick lime)—পোড়া চুন, ক্যালসিয়াম অক্সাইড, CaO; ভাঁটিতে পাথর পুড়িয়ে তৈরী হয়। বাড়ীঘর তৈরী করতে ইটের গাঁথু-নিতে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। এতে জল দিলে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে (এক্সো-থার্মিক ↑) এবং জলের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তৈরী হয় কলিচুন, (ক্যাল-সিয়াম হাইড্রক্সাইড) $Ca(OH)_2$, যাকে বলে 'স্লেক্‌ড লাইম ↑'।

কুইক সিল্‌ভার (quick silver) — পারদ, বা মার্কারির ↑ বিশেষ নাম।

কুরি, (Curie) **পিরি**—ফরাসী পদার্থ-বিজ্ঞানী; প্যারিসে জন্ম 1859 খৃঃ, মৃত্যু 1906 খৃঃ। পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা (রেডিও অ্যাক্টিভিটি ↑) সম্বন্ধীয় গবেষণার জন্য প্রসিদ্ধি; স্ত্রী মেরি কুরির সাহায্য ও সহযোগিতায় পিচ্ ব্লেণ্ড ↑ থেকে 1898 খৃঃ তেজস্ক্রিয় ধাতু পোলোনিয়াম ও রেডিয়াম ↑ আবিষ্কার। 1903 খৃস্টাব্দে হেন্রি বেকারেলের ↑ সঙ্গে কুরি-দম্পতীও যুগ্মভাবে পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। কেলাসিত পদার্থের তড়িৎ-ধর্ম সম্বন্ধেও মূল্যবান গবেষণা। অকালে মাত্র 47 বছর বয়সে প্যারিসের রাজপথে দুর্ঘটনায় জীবনাবসান।

কুরি (Curie), **ম্যাডাম মেরি**—পোল্যাণ্ডের ওয়ারস নগরে জন্ম 1867 খৃঃ, মৃত্যু 1934 খৃঃ। অধ্যাপক পিরি কুরির ছাত্রী; 1895 খৃঃ তাঁকে বিবাহ। তেজস্ক্রিয় ধাতু পোলোনিয়াম ↑ ও রেডিয়াম ↑ আবিষ্কারের জন্য স্বামী পিরি কুরির সঙ্গে কৃতিত্বের সমভাগী; 1903 খৃঃ যুগ্মভাবে নোবেল পুরস্কার লাভ। স্বামী পিরি কুরির মৃত্যুর পরে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ-বিদ্যার অধ্যাপিকা। তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে উন্নততর গবেষণা; 1911 খৃঃ রসায়ন-বিজ্ঞানে পুনরায় নোবেল পুরস্কার লাভ। ওয়ারস বিশ্ববিদ্যালয়ে রেডিওলজি ↑ বিভাগের অধ্যক্ষ অধ্যাপিকা পদে নিযুক্তি 1919 খৃঃ।

কন্যা **ইরিন কুরিও** খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ছিলেন; ইনিও তাঁর স্বামী ফ্রেডারিক **জোলিও কুরির** সঙ্গে যুগ্মভাবে 1935 খৃঃ রসায়ন-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

কুলম্ব (Coulomb), **চার্লস অগাস্টাইন**. ডি.—ফরাসী পদার্থবিজ্ঞানী, জন্ম 1736 খৃঃ, মৃত্যু 1806 খৃঃ। তড়িৎ ও চুম্বক বিজ্ঞানে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবিষ্কার ও সূত্র নির্ধারণ। নামানুসারে তড়িৎ-শক্তির পরিমাণ-সূচক 'কুলম্ব' ↑ একক প্রচলিত।

কুলম্ব (coulomb) — তড়িৎ-শক্তির একক পরিমাণ: প্রতি সেকেণ্ডে এক অ্যাম্পিয়ার ↑ তড়িৎ-প্রবাহের ফলে যে-পরিমাণ তড়িৎশক্তি ব্যয়িত হয়। ইলেক্‌ট্রোলিসিস ↑ প্রক্রিয়ায় এক কুলম্ব তড়িতের প্রভাবে কোন সিলভার-সল্টের জলীয় দ্রবণ থেকে ·001118 গ্র্যাম ↑ রৌপ্য-কণিকা বিশ্লিষ্ট হয়ে থাকে।

কুশ (Kush), **ডাঃ পলিকার্প**—মার্কিন পদার্থ-বিজ্ঞানী, জন্ম জার্মানীতে 1911 খৃষ্টাব্দে। কলম্বিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসাবে পরমাণুর উপাদানিক গঠন-বিন্যাস সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা। 1933 খৃঃ নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত বৃটিশ বিজ্ঞানী মরিস ডিরাক কর্তৃক প্রবর্তিত 'পদার্থের পারমাণবিক গঠন' সম্পর্কীয় মতবাদের সংশোধন ও উন্নততর ব্যাখ্যা। 1955 খৃষ্টাব্দে ডাঃ ডব্লু. ই. ল্যাম্বের ↑ সঙ্গে যুগ্মভাবে নোবেল পুরস্কার লাভ।

কোএঞ্জাইম (coenzyme) — জীব-দেহে বিভিন্ন এঞ্জাইমের ↑ জৈব রাসায়নিক ক্রিয়ার সহায়ক বিভিন্ন প্রকার

জৈব পদার্থকে বলে কোএঞ্জাইম ; এ-গুলি বস্তুতঃ বিভিন্ন ভিটামিন ↑, অথবা ভিটামিন-ঘটিত পদার্থ। দেহাভ্যন্তরস্থ বিশেষ-বিশেষ জৈব ক্রিয়ায় এঞ্জাইমের উপযোগিতা অসাধারণ; কিন্তু এগুলি পরিমাণে থাকে অতি সামান্য। আবার বিভিন্ন কোএঞ্জাইম, বা ভিটামিনের পরিমাণ আরও কম; কিন্তু তাদের অভাবে এঞ্জাইমের কার্যকারিতা সার্থক হয় না। কাজেই স্বাস্থ্যের পক্ষে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিমাণে হলেও কোএঞ্জাইম, বা ভিটামিন অপরিহার্য।

কোকেইন (cocaine) — অ্যাল্‌ক্যালয়েড ↑ শ্রেণীর এক রকম সাদা ও কঠিন উদ্ভিজ্জ পদার্থ; 'কোকা' নামক এক প্রকার উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত। পদার্থটি বিশেষ অ্যানেস্থেটিক ↑ শক্তিসম্পন্ন; কিন্তু এর উগ্র মাদকতা দোষ আছে, দুরন্ত নেশার জিনিস। আজকাল কৃত্রিম উপায়ে রসায়নাগারেই কোকেইন প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে।

কোচিনিল (cochineal) — 'কক্কাস-কক্‌টি' নামক এক প্রকার পোকার বিশুষ্ক দেহাবশেষ থেকে যে স্বাভাবিক উজ্জ্বল লাল রং নিষ্কাশিত হয়।

কোপারনিকাস সিস্‌টেম (Copernicus system)—ষোড়শ শতাব্দীতে বিজ্ঞানী কোপারনিকাস প্রচার করেন যে, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ সব আপন-আপন নির্দিষ্ট কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে ঘুরছে; জ্যোতির্বিদ্যায় সৌর পরিবারের গতি সম্পর্কীয় এই মতবাদ পরীক্ষিত ও সর্বতোভাবে প্রমাণিত হয়েছে। কোপারনিকাসের এই 'সূর্য-কেন্দ্রীক বিশ্ব' মতবাদ কো. সি. বলে পরিচিত। তার আগে টলেমি ↑ নামক এক পণ্ডিতের এরূপ এক ভ্রান্ত মতবাদ প্রচলিত ছিল যে, পৃথিবীকে কেন্দ্র করেই সূর্য ও গ্রহগুলি ঘুরে চলেছে; যেমন আমরা সহজ বুদ্ধিতে সাদা চোখে দেখতে পাই।

কোমা (coma) — সম্পূর্ণ অচৈতন্য অবস্থা। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে কঠিন রোগীর এরূপ অচৈতন্য অবস্থাকে 'কোমা' বলা হয়।

কোরাণ্ডাম্‌ (corrundum) — অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের সাদা স্ফটিকাকার কঠিন দানা। এর কাঠিন্যও কার্বোর‍্যাণ্ডামের ↑ মত, প্রায় হীরকের তুল্য। এর চূর্ণ দিয়ে যান্ত্রিক ব্যবস্থায় অস্ত্রাদিতে শান্‌-দেওয়ার ও পালিশ করবার চক্রাকার পাথর তৈরী হয়।

কোলন (colon) — বৃহদন্ত্রের বিশেষ নাম; ক্ষুদ্রান্ত্রের নিম্নাংশ থেকে খাদ্যনালীর যে অপেক্ষাকৃত মোটা অংশ ডান দিক থেকে সোজা উপরে উঠে গিয়ে ঘুরে আবার বাঁ-দিক থেকে নীচে নেমে গেছে। এর ওই ডান দিকের অংশকে বলে ঊর্ধ্বগামী কোলন, পরবর্তী অংশ সমান্তরাল কোলন, আর বাঁ-দিকের অংশকে বলে নিম্নগামী কোলন।

কোলন

কোলাইটিস (colitis) — আন্ত্রিক প্রদাহ-রোগ বিশেষ; যাতে বৃহদন্ত্রের কোলন ↑ অংশের স্ফীতিজনিত যন্ত্রণা অনুভূত হয়ে থাকে।

কোলাজেন (collagen) — প্রাণি-দেহের অস্থি ও পেশী-তন্তুর সংগঠক প্রোটিন ↑ জাতীয় পদার্থ। প্রাণীর ঐ সকল দেহাংশ জলে সিদ্ধ করলে জেলির ↑ আকারে পাওয়া যায় ; যা প্রোটিনবহুল জেলি-খাদ্য প্রস্তুত করতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

কোলয়েড (colloid)—কর্দমাক্ত জলে কাদা-মাটির কণিকাগুলো অপেক্ষাকৃত বড় বড়, জলে মিশে যায়; কিন্তু সময়ে থিতিয়ে তলায় জমে। পক্ষান্তরে, লবণ-গোলা জলে লবণের অণুগুলো জলের অণুর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিলে যায়; দ্রাব্য ও দ্রাবক নিজে থেকে আর আলাদা হতে পারে না। এই দুই অবস্থার মাঝামাঝি হলে সেই দ্রাব্য পদার্থটি 'কোলয়েড' অবস্থায় আছে বলা হয়। কোন পদার্থ কোলয়েড অবস্থায় এমন অতি সূক্ষ্ম কণিকায় পরিণত হয় যে, দ্রাবক পদার্থের মধ্যে সেগুলো সমানভাবে সর্বক্ষণ ভেসে থাকে। প্রকৃত দ্রবের ন্যায় একেবারে দ্রাবকের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে যায় না সত্য, কিন্তু ফিল্‌ট্রেসন ↑ প্রক্রিয়ায়ও তাকে পৃথক করা যায় না। পদার্থের এরূপ অবস্থাকে বলে 'কোলয়েড্যাল স্টেট'। কোন তরল দ্রবের মধ্যে কোন কঠিন দ্রাব্য বস্তু কোলয়েড্যাল অবস্থায় থাকলে ওই দ্রবকে বলা হয় অবদ্রব, বা **কোলয়েড্যাল সল্যুসন**। দুধকে জলে প্রোটিন ↑, ফ্যাট্ ↑ প্রভৃতির এরূপ একটা কোলয়েড্যাল সল্যুসন বলা যেতে পারে।

কোলেষ্টেরল (cholesterol) — প্রাণিদেহের সকল কোষে, বিশেষতঃ স্নায়ুকোষে সঞ্জাত এক প্রকার জৈব রাসায়নিক পদার্থ, যা দেহের চর্বি ও তৈল জাতীয় পদার্থের নিয়ন্ত্রণে ও হর্মোন ↑ গঠনে সাহায্য করে। এর আধিক্যে রক্ত ঘনীভূত হয়ে সঞ্চলন ব্যাহত হয় এবং হৃদ্‌রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। সদ্য-প্রসূতির প্রথম স্তন্যদুগ্ধে যেমন হয়ে থাকে ; সন্তান প্রসবের পরে কোন জীবমাতার স্তন্যে প্রথম কয়েক দিন কোলেস্টেরলের আধিক্য-হেতু দুগ্ধ বিশেষ ঘনীভূত হয়ে থাকে।

কোসাইন (cosine)—সংক্ষেপে বলে 'কস্' ; ত্রিকোণমিতি গণিতে কৌণিক পরিমাপের একটা নির্দিষ্ট অনুপাত,— ভূমি : অতি-ভূজ। চিত্রে ABC কোণের কোসাইন, বা 'কস্' বললে BC/ABবুঝায়;

কোসাইন
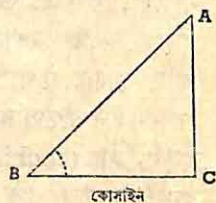
এভাবে অন্যান্য অনুপাত **কোট্যাঞ্জেণ্ট**, বা 'কট' হলো ভূমি : লম্ব, অর্থাৎ BC / AC ; আর **কোসিক্যাণ্ট**, বা 'কোসেক' হলোঅতিভূজঃ লম্ব, অর্থাৎ AB/AC.

কোয়াণ্টাম থিয়োরি (quantum theory) — বিকিরিত শক্তির ভর-তত্ত্ব। কোন উত্তপ্ত বস্তু, বা আলোক-শিখা থেকে যে তাপশক্তি বিকিরিত হয় তা নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয় না, হয় তেজঃশক্তির সূক্ষ্ম কণিকার

তরঙ্গায়িত বিচ্ছুরণের মাধ্যমে। শক্তির এই বিশেষ কণিকাগুলোকে বলা হয় 'কোয়াণ্টা' ; এ-গুলো সর্বক্ষেত্রে সমান আকারের নয়, বিকিরণের তীব্রতা (ফ্রিকোয়েন্সি ↑) অনুসারে এদের ভর ও আকার বাড়ে-কমে। যেমন—লাল আলোর কোয়াণ্টামগুলো নীল আলো থেকে বিচ্ছুরিত কোয়াণ্টাম অপেক্ষা আকারে ও ভরে ক্ষুদ্রতর। বিভিন্ন শক্তির বিভিন্ন কোয়াণ্টামের পরিমাণ, অর্থাৎ ভর নির্ধারণের গাণিতিক সূত্র আবিষ্কার করেন বিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী **ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক** ↑। বিশেষ-বিশেষ শক্তির এক-একটি কোয়াণ্টামের আকার ও ভর নির্ভর করে তার বিকিরণের 'ফ্রিকোয়েন্সি' ↑, অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে বিকিরণের তরঙ্গ-সংখ্যার উপরে। কোয়াণ্টাম = ফ্রিকোয়েন্সি × একটি ধ্রুবক রাশি, যাকে বলা হয় 'প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক', অর্থাৎ ($6{\cdot}547 \times 10^{-27}$ আর্গ / সেকেণ্ড)।

কোয়াণ্টাম মেকানিক্স (quantum mechanics) — পরমাণুর সংগঠক ইলেকট্রন ↑, প্রোটন ↑ প্রভৃতি কণিকার তড়িতাধানের বিচার-বিশ্লেষণের জন্যে যে বিশেষ শক্তি-তত্ত্ব (মেকানিক্স ↑) প্রযুক্ত হয়। বিশেষ বিচারে শক্তির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণিকা (কোয়াণ্টাম ↑) তরঙ্গাকারে চলে, যেমন — আলোক-তরঙ্গ অনেক সূক্ষ্ম 'ফোটন' ↑ কণিকার প্রবাহ বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। পরমাণু-কণিকার এরূপ তরঙ্গ-ধর্মের তথ্যাদি এই 'কোয়াণ্টাম মেকানিক্স' তত্ত্বের সাহায্যে নির্ধারিত হয়ে থাকে। জটিল সব গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে জানা যায়, শক্তির বিচ্ছুরণের ক্ষেত্রে কোথায়, কখন, কোন্ কণিকাগুলো অধিক সংখ্যায় সন্নিবিষ্ট হবে ; আবার তা থেকে কোন বিশেষ শক্তি-কণিকার সম্ভাব্য অবস্থানও জানা যায়।

কোয়াসার (quaser) — জ্যোতির্বিজ্ঞানে সাম্প্রতিক আবিষ্কৃত মহাকাশের সুদূর প্রত্যন্ত দেশে ভ্রাম্যমাণ এক শ্রেণীর অতি রহস্যময় জ্যোতিষ্ক। পৃথিবী থেকে এদের কল্পনাতীত গড় দূরত্ব হিসাব করা হয়েছে প্রায় তিন মহাপদ্ম (বিলিয়ন ↑) আলোক-বর্ষ (light year, 'লাইট ইয়ার' ↑)। ইংরেজী 'Quasi Stellar Radio Source' কথাটি থেকে কোয়াসার নামটি গঠিত হয়েছে। অতি শক্তিশালী রেডিও টেলিস্কোপ ↑ ও অপ্টিক্যাল স্পেক্ট্রোগ্রাফ ↑ যন্ত্রের সাহায্যে এদের বেতার-তরঙ্গের তড়িৎ-বিভব, বর্ণালী - বৈশিষ্ট্য প্রভৃতির জটিল পরীক্ষা- নিরীক্ষায় কোয়াসার শ্রেণীর জ্যোতিষ্কের সম্বন্ধে নানা তথ্য জানা গিয়েছে। এদের কোন - কোনটির আলোক-চিত্রও পাওয়া গেছে। কোন-কোন কোয়াসারের ঔজ্জ্বল্য এত অধিক যে, শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্রে প্রত্যক্ষ করাও সম্ভব হয়েছে। এদের এক-একটির দ্যুতি প্রায় দশ হাজার সূর্যের দ্যুতির সমান বলে মনে হয়; এরা আবার সেকেণ্ডে প্রায় দেড় লক্ষ মাইল বেগে বিভিন্ন কক্ষপথে সুদূরে ছুটে যাচ্ছে (হয়তো সৌরমণ্ডলীয় গ্রহগুলির মত কোন এক মহাসূর্যের

চারদিকে উপবৃত্তীয় পথে পরিভ্রমণ করছে)। মানুষের এতাবৎ পরিচিত গ্রহ, নক্ষত্র, নীহারিকা প্রভৃতির সঙ্গে এদের বিকিরণ, দ্যুতি, বেতার-বিভব, দূরত্ব, গতিবিধি কোন-কিছুরই মিল নেই ; এরা যেন অপর কোন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের জ্যোতিষ্ক। এই কোয়াসার অদ্যাপি জ্যোতির্বিজ্ঞানের এক মহা বিস্ময়। এদের উৎপত্তি, প্রকৃতি, গতি-বিধি ও আচরণাদি সম্পর্কে এযাবৎ বিশেষ কোন বৈজ্ঞানিক মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নি।

কোয়াড্রিল্যাটারাল ফিগার (quadrilateral figure) — জ্যামিতিক চতুর্ভুজ ক্ষেত্র ; চারিটি সরল রেখায় আবদ্ধ যে-কোন সামতলিক ক্ষেত্র। চতুর্ভুজ অনেক রকমের হতে পারে : (ক) **স্কোয়ার,** বা বর্গক্ষেত্র, সমবাহু ও সমকোণী চতুর্ভুজ ; (খ) **রম্বাস,**

কোয়াড্রিল্যাটারাল ফিগার

সমবাহু কিন্তু অসমকোণী চতুর্ভুজ ; (গ) **প্যারালালোগ্রাম,** যে চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুদ্বয় সমান ও সমান্তরাল ; (ঘ) **রেক্ট্যাঙ্গেল,** যে চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুদ্বয় সমান ও সমান্তরাল এবং কোণগুলি সমকোণ ; (ঙ) **ট্রাপিজিয়াম,** যে চতুর্ভুজের চারিটি বাহুই অসমান ও অসমান্তরাল ; (চ) **ট্রাপিজয়েড,** যে চতুর্ভুজের বাহু চতুষ্টয় অসমান, কিন্তু কোন দুটি বিপরীত বাহু সমান্তরাল।

ক্যাকোডিল (cacodyl) — আর্সেনিক-ঘটিত রাসায়নিক পদার্থ ; বিশেষ এক রকম দুর্গন্ধযুক্ত এবং বিষাক্ত। পদার্থটা মিশিয়ে তরলায়িত রাবার তাড়াতাড়ি ঘনীভূত করে সহজেই প্রয়োজনানুরূপ ঘনত্ববিশিষ্ট, বা কঠিন করা যেতে পারে।

ক্যাটায়ন (cation)—ধন-তড়িতাবিষ্ট আয়ন কণিকা। ইলেক্‌ট্রোলিসিস ↑ প্রক্রিয়ায় দ্রবীভূত ইলেক্‌ট্রোলাইটের ↑ ধাতব উপাদানের এই ক্যাটায়নগুলোই ঋণ-তড়িৎদ্বার, বা ক্যাথোড ↑ -প্লেটের ঋণ-তড়িৎশক্তির আকর্ষণে ছুটে গিয়ে তার গায়ে লেগে যায়। অ্যানায়ন (anion) ↑ ।

ক্যাটালিস্ট (catalyst)—অনুঘটক ; যে-সব পদার্থ অন্যান্য পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়া দ্রুততর করে, অথচ নিজে ওই রাসায়নিক ক্রিয়ায় কোনরূপ অংশ গ্রহণ করে না, অপরিবর্তিত থাকে। এরূপ পদার্থকে **ক্যাটালাইট**-ও বলা হয়। রসায়ন-শিল্পে নানা রকম ধাতব ক্যাটালিস্ট ব্যবহৃত হয়। সোনা, প্ল্যাটিনাম প্রভৃতি ধাতুর সামান্য পরিমাণ চূর্ণ, বা কোন ধাতব অক্সাইড মেশালে বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক ক্রিয়া বিশেষ দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় **ক্যাটালিসিস**। আবার, অনেক ক্ষেত্রে কোন-কোন বিশেষ জৈব পদার্থও ক্যাটালিস্টের কাজ করে থাকে (এন্‌জাইম ↑) ; যেমন —

ঈষ্টের ↑ সাহায্যে চিনির জলীয় দ্রবণ অতি সহজেই অ্যালকোহলে ↑ পরিণত হয়।

ক্যাটাপ্লেক্সি (cataplexy) — যে রোগে জীবদেহ সহসা অসাড় ও নিশ্চল হয়ে পড়ে, বাক্‌শক্তি লোপ পায়; কিন্তু চেতনা হারায় না। প্রধানতঃ চেষ্টীয় স্নায়ুতন্ত্রের (মোটর নার্ভ ↑) সাময়িক বিকলতাই হলো এ-রোগের কারণ ; স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র (ভলাণ্টারি নার্ভ সিস্টেম) কার্যকরী থাকায় রোগী সব দেখে ও বোঝে ; কিন্তু কোন অঙ্গ-সঞ্চালন, বা কর্মোদ্যমের শক্তি থাকে না। আচম্‌কা প্রচণ্ড ক্রোধ, বা ভীতি উদ্রেকের ফলে ব্যক্তি বিশেষের কখন-কখন এরূপ অবস্থা হয়ে থাকে।

ক্যাটাফোরেসিস (cataphoresis) — কোলয়েড্যাল ↑ সল্যুসনের মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহের ফলে ক্যাথোড ↑ প্লেট, অর্থাৎ ঋণ-তড়িদ্দ্বারের দিকে ধন-তড়িতাবিষ্ট কোলয়েড কণিকা (ক্যাটায়ন ↑) গুলোর মধ্যে যে গতিশীলতা সৃষ্টি হয়। কোলয়েড কণিকার এরূপ সঞ্চলন-প্রবণতাকেই বলা হয় ক্যা. স.। (ইলেক্‌ট্রোলিসিস ↑)

ক্যাটার‍্যাক্ট (cataract) — চোখের 'ছানি', রোগ বিশেষ ; সাধারণতঃ বার্ধক্য-হেতু অক্ষি-তারকার উপরে যে অনচ্ছ পর্দা পড়ে দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হয়ে যায়।

ক্যাটালেপ্‌সি (catalepsy)—স্নায়ু-রোগ বিশেষ; যাতে রোগীর মানসিক অনুভূতি ও চেতনা বিলুপ্ত হয় এবং দেহের মাংস-পেশী শক্ত হয়ে ওঠে। এরূপ অবস্থায় অনেক সময় রোগীকে মৃত বলে ভুল হয়। সহসা সাময়িক স্নায়বিক বিপর্যয়ই এ-রোগের কারণ; এটা প্রকৃতপক্ষে মৃগী (এপিলেপ্‌সি ↑) রোগেরই একটা বিশেষ অবস্থা।

ক্যাটাবোলিজ্‌ম (catabolism)— গঠনাত্মক বিপাকীয় ক্রিয়া, বা মেটাবলিজ্‌ম ↑। ভুক্ত দ্রব্যাদির জটিল গঠনের উপাদানগুলি দেহাভ্যন্তরে যে বিশেষ প্রক্রিয়ায় বিশ্লিষ্ট হয়ে বিভিন্ন সরল গঠনের রাসায়নিক পদার্থে পরিণত হয় এবং দেহকোষগুলিকে পুষ্টি-রস সরবরাহ করে' পরিপুষ্ট করে; বিশেষতঃ এই বিপাকীয় ক্রিয়ায়ই প্রাণিদেহে প্রয়োজনীয় তাপের সমতা রক্ষিত হয়ে থাকে।

ক্যাড্‌মিয়াম (cadmium)—মৌলিক ধাতু ; সাদা ও নরম পদার্থ। সাংকেতিক চিহ্ন Cd ; পারমাণবিক ওজন 112·41, পারমাণবিক সংখ্যা 48. জিঙ্ক ↑ ,বা দস্তার সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় খনিজরূপে পাওয়া যায়। অতি নিম্ন-গলনাংকের বিভিন্ন প্রকার ধাতু-সংকর (ফিউজিব্‌ল অ্যালয় ↑) তৈরী করবার কাজে এটা যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। ইলেক্‌ট্রোপ্লেটিং ↑ প্রক্রিয়াতেও ধাতুটার কিছু ব্যবহার আছে।

ক্যাথোড (cathode) — ঋণ-তড়িৎ-দ্বার (নেগেটিভ ইলেক্‌ট্রোড ↑) ; ইলেক্‌ট্রোলিসিস ↑ , আর্ক ল্যাম্প ↑ প্রভৃতি বিভিন্ন বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় তড়িৎ-প্রবাহের ঋণ-তড়িৎ প্রান্ত। আর ধন-তড়িৎ প্রান্তকে বলে

অ্যানোড↑। এই ক্যাথোড এবং অ্যানোড উভয় তড়িৎ-দ্বারই সাধারণতঃ বিশেষ-বিশেষ তড়িৎ-পরিবাহী পদার্থে তৈরী করা হয়। ক্যাথোড থেকে ঋণ-তড়িতাবিষ্ট ইলেকট্রন কণিকা-

সমূহ (অ্যানায়ন↑) ধারাকারে ছুটে গিয়ে অ্যানোডে পৌঁছায়। বস্তুতঃ এভাবেই এক্স-রে টিউব↑, রেডিও ভাল্ব↑ প্রভৃতি যন্ত্রে ইলেকট্রন-কণিকা ক্যাথোড থেকে বেরিয়ে আধারের অভ্যন্তরস্থ স্বল্প চাপের গ্যাসে পূর্ণ, বা প্রায় বায়ু-শূন্য ব্যবধান অতিক্রম করে ধারাকারে ছুটে অতি দ্রুত অ্যানোডে (ধন-তড়িৎদ্বারে) চলে যায়।
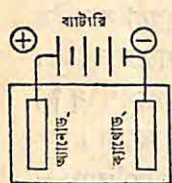
ক্যাথোড-রে-টিউব (cathode ray tube) — সামান্য পরিমাণ গ্যাসে ভর্তি, অথবা মোটামুটি বায়ু-শূন্য যে
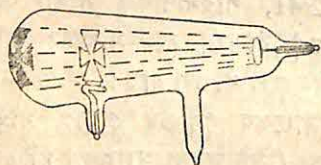
ক্যাথোড-রে-টিউব

বিশেষ আকারের টিউবের মধ্যে ঋণ-তড়িৎদ্বার (ক্যাথোড↑) থেকে ধারাকারে ইলেকট্রন↑ কণিকাগুলোর প্রবাহের ব্যবস্থা করা হয়। ইলেক্ট্রনের এই ধারা-প্রবাহের ধর্ম অদৃশ্য আলোক-রশ্মির অনুরূপ; এ-জন্যে একে ক্যাথোড-রশ্মি বলা হয়। এই 'ক্যাথোড-রে-টিউব' নামক যন্ত্রে ওই ক্যাথোড-রশ্মিগুলোকে বিভিন্ন যান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রতিফলিত ও নিয়ন্ত্রিত করে নিয়ে একটি বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ-মাখানো পর্দার উপরে ফেলা যায়। এর ফলে পর্দার যে-যে জায়গায় ওই রশ্মি পতিত হয় সেই-সেই জায়গা-গুলো প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে; আর, তার পশ্চাতে পর্দাটির ছায়া পড়ে। এই ব্যবস্থার সাহায্যে বিভিন্ন বৈদ্যুতিক স্পন্দনের পরিমাপ ও ইলেকট্রন সম্বন্ধীয় নানা তথ্যাদি নিরূপণ করা চলে। এজন্যে এরূপ যন্ত্রকে ক্যাথোড-রে-**অসিলোস্কোপ**-ও বলা হয়।

ক্যানাডা ব্যাল্‌সাম (canada balsam) — রজন জাতীয় এক রকম উদ্ভিজ্জ আঠালো পদার্থ। ব্যাল্‌সাম↑ মাত্রেরই একটা সুগন্ধ আছে। উদ্বায়ী পদার্থ; নানা রকম ঔষধে ব্যবহৃত হয়। এ-দিয়ে কাঁচের পাতের উপরে কাঁচের পাত্ এঁটে লাগানো যায়।

ক্যাণ্ডেলপাওয়ার(candle-power) — আলোকের ঔজ্জ্বল্য পরিমাপের একক বিশেষ। আলোকের কোন উৎস থেকে কতটা আলোক-রশ্মি বিকিরিত হচ্ছে, তা আজকাল **'ক্যাণ্ডেলা'** এককে প্রকাশ করা হয়; পূর্বে হোত একটা নির্দিষ্ট মাপের মোমবাতির বিকিরিত আলোকের ঔজ্জ্বল্যের তুলনামূলক হিসেবে, অর্থাৎ 'ক্যাণ্ডেল পাওয়ারে'। ক্যাণ্ডেলা হলো এক বর্গ সেন্টিমিটার আয়তনের কৃষ্ণবর্ণ কোন ধাতব চাক্‌তি 1773·5° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড (প্ল্যাটিনাম↑ ধাতুর গল-নাংক উষ্ণতা) তাপে প্রদীপ্ত ও

ভাস্বর হয়ে যতটা আলো বিকিরণ করে তার 60 ভাগের এক ভাগ। এই ঔজ্জ্বল্যকে **নিউ-ক্যাণ্ডেল পাওয়ার**-ও বলা হয়। কোন একটা 40 ওয়াটের ↑ সাধারণ ইলেক্‌ট্রিক বাতির ঔজ্জ্বল্য প্রায় 36 'নিউ ক্যাণ্ডেল পাওয়ার', বা ক্যাণ্ডেলা ; আর 100 ওয়াটের বাতির ঔজ্জ্বল্য সাধারণতঃ প্রায় 120 'ক্যাণ্ডেল পাওয়ার' হয়ে থাকে।

ক্যাপ্‌ষ্ট্যান (capstan) — জাহাজে লৌহ-নির্মিত ড্রামের আকার-বিশিষ্ট যে যন্ত্রটা ঘুরিয়ে তার গায়ে দড়ি, বা শিকল জড়ানো হয়। জাহাজ টেনে তীরভূমিতে সংলগ্ন করতে, বা ভারী নঙ্গর তুলতে ও ফেলতে সচরাচর এ-যন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
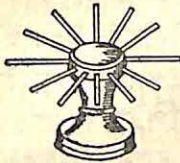
ক্যাপষ্ট্যান

ক্যাপিলারি (capillary)—কৈশিক ; চুলের মত সূক্ষ্মতা-বিশিষ্ট ('কেপিল' মানে চুল)। **ক্যাপিলারি টিউব**— কাচের অতি সূক্ষ্ম, বা কৈশিক নল। **ক্যাপিলারি অ্যাট্রাক্সন** — যে আকর্ষণের ফলে সূক্ষ্ম নলপথে তরল পদার্থ অগ্রসর হয়, বা উপরে উঠে যায়। তরল পদার্থের অণুগুলি কৈশিক নলের প্রাচীর-গাত্র বেয়ে একটা গতিশীলতা লাভ করে। ব্লটিং-কাগজে কালি শোষে, প্রদীপের পলিতা বেয়ে তেল উপরে উঠে যায় বস্তুতঃ এই আকর্ষণেরই ফলে।

ক্যামেরা-লুসিডা (camera lucida) —দর্পণের মত একটা যন্ত্রাংশ বিশেষ। এর সাহায্যে মাইক্রোস্কোপে ↑ পরিদৃষ্ট বস্তুর হুবহু প্রতিচ্ছবি পার্শ্বস্থিত কাগজের উপরে ফেলা যায়। মাইক্রোস্কোপে কোন ক্ষুদ্র জিনিসের বর্ধিতাকার প্রতিচ্ছবি দেখে তার ভিতরকার সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ করা যায় সত্য, কিন্তু তার কোন স্থায়ী প্রতিচ্ছবি রাখা যায়না। এ-জন্যে মাইক্রোস্কোপের আইপিসের ↑ কাছে বিশেষ ধরনের একখানা দর্পণ এমনভাবে সংলগ্ন থাকে যার সাহায্যে সেই বর্ধিতাকারের চিত্রছায়া পার্শ্বস্থ কাগজের উপরে প্রতিফলিত করা যায়। এর উপরে পেন্সিল টেনে সহজেই সেই চিত্র হুবহু এঁকে রাখা যেতে পারে।

ক্যারাপেস (carapace) — যে-কোন প্রাণী-দেহের বহিরাবরক কঠিন খোলা; যেমন, কচ্ছপ জাতীয় প্রাণীর শক্ত খোলস।

কচ্ছপের ক্যারাপেস

ক্যারেট (carat) — (1) সোনা, মণি, মুক্তা প্রভৃতি ওজন করবার এক রকম সূক্ষ্ম মাপ ; প্রায় $\frac{1}{5}$ গ্র্যাম ↑, বা 3·17 গ্রেণ। (2) সোনার বিশুদ্ধতা পরিমাপের একক হিসেবেই ক্যারেট কথাটা সবিশেষ প্রচলিত। সোনায় কতটা খাদ আছে তা এ-দিয়ে প্রকাশ করা হয়। খাদ-মেশানো সোনার 24 ভাগের মধ্যে কত ভাগ খাটি সোনা আছে তা এই ক্যারেটের হিসেবে

প্রকাশ করা হয়ে থাকে ; যেমন — '24-ক্যারেট' সোনা হলো খাঁটি সোনা ; '18-ক্যারেট' সোনা বললে 24 ভাগের মধ্যে 18 ভাগ খাঁটি সোনা, আর 6 ভাগ খাদ আছে, বুঝতে হবে।

ক্যাল্‌কুলাস (calculus) — গণিত-শাস্ত্রের শাখা বিশেষ। কোন ক্রমাগত পরিবর্তনশীল রাশি সম্পর্কে বিভিন্ন গাণিতিক সমাধানের পদ্ধতি এতে আলোচিত হয়। 'ক্যাল্‌কুলাস' গণিত দু-রকম — ডিফারেন্সিয়্যাল ও ইন্টি-গ্র্যাল। এদের সাহায্যে নানা রকম উচ্চতর গাণিতিক জটিল তথ্যের সমাধান করা সম্ভব হয়ে থাকে।

ক্যাল্‌সাইট (calcite) — প্রাকৃতিক ক্যালসিয়াম কার্বনেট; কঠিন স্ফটিকা-কার খনিজ পদার্থ। পৃথিবীর অধিকাংশ প্রস্তর এই পদার্থে গঠিত।

ক্যাল্‌সিয়াম (calcium) — সাদা ও নরম এক প্রকার মৌলিক ধাতব পদার্থ ; সাংকেতিক চিহ্ন Ca, পার-মাণবিক ওজন 40·08, পারমাণবিক সংখ্যা 20; এর বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ প্রকৃতিতে নানাভাবে নানা আকারে ছড়িয়ে আছে। এর অক্সাইড যৌগ, CaO, হলো সাধারণ পোড়া-চুন, হাই-ড্রক্সাইড $Ca(OH)_2$ জলীয় কলি-চুন ; ক্যালসিয়াম কার্বনেট, $CaCO_3$, হলো খড়িমাটি (চক্‌ ↑) ও বিভিন্ন প্রস্তর। শুষ্ক ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, $CaCl_2$, অন্য পদার্থের জল শুষে নেয় ; রঞ্জন-শিল্পেও যৌগটি যথেষ্ট দরকার হয়। ক্যালসিয়াম সাল্‌ফেট, $CaSO_4$, তাড়াতাড়ি শুকিয়ে শক্ত হয় বলে এ-দিয়ে 'প্ল্যাষ্টার-অব-প্যারিস' ↑ তৈরী হয়ে থাকে। প্রাণিদেহের হাড় ও দাঁতের প্রধান উপাদান হলো ক্যাল্‌-সিয়াম ফস্‌ফেট। ক্যালসিয়াম অক্সা-ইডকে (CaO) কুইক-লাইম ↑ বলে ; এর মধ্যে জল দিলে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে তা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, এবং উৎপন্ন হয় ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড, $Ca(OH)_2$, যার রাসায়নিক নাম হলো স্লেক্‌ড লাইম ↑, যাকে বাংলায় বলে কলি-চূন।

ক্যালিস্‌ (caliche) — অবিশুদ্ধ প্রাকৃতিক সোডিয়াম নাইট্রেট ↑ ($NaNO_3$)। আমেরিকার চিলি অঞ্চলে খনিজরূপে প্রচুর পাওয়া যায়, তাই একে **চিলি সল্ট-পিটার**ও বলে। বাংলায় এটা 'সোরা' নামে পরিচিত। নাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুতি এবং বিভিন্ন বাজি ও বারুদ প্রভৃতি তৈরি করবার কাজে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ক্যালিপার্স (callipers) — সামান্য দূরত্ব, বা দৈর্ঘ্য নিখুঁতভাবে মাপবার সহায়ক এক রকম যন্ত্র। কোন তার, বা রডের ব্যাস এ-দিয়ে সহজে মাপা যায়। সরু পাইপের ভিতর ও বাহি-রের ব্যাস মাপবার জন্যেও এটা বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
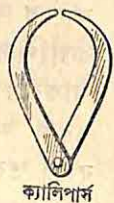
ক্যালিপার্স

ক্যালোমেল (calomel) — পারদ ও ক্লোরিনের একটা যৌগিক পদার্থের বিশেষ নাম ; যার রাসায়নিক নাম মার্কিউরিয়াস ক্লোরাইড (Hg_2CI_2)। বিশেষ ভারী, সাদা, অদ্রাব্য, বিষাক্ত

পদার্থ ; সামান্য পরিমাণে জোলাপ হিসেবে ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

ক্যালোরি (calorie)—কোন পদার্থে নিহিত মোট উত্তাপ, বা তাপশক্তি পরিমাপের একক বিশেষ। এক গ্র্যাম জল 1° সেন্টিগ্রেড উত্তপ্ত করতে যে পরিমাণ তাপ দরকার হয়; অন্য কথায় 1° সেন্টিগ্রেড উত্তপ্ত 1 গ্র্যাম জল ঠাণ্ডা করলে যতটা তাপ-শক্তি বিমুক্ত হয়, তাই হলো এক ক্যালোরি। বিশেষতঃ এক গ্র্যাম জল 14·5° থেকে 15·5° সেন্টিগ্রেড উত্তপ্ত করতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয়, সেই পরিমাণ তাপকে এক 'স্মল ক্যালোরি' বা **'গ্র্যাম ক্যালোরি'** বলা হয়। আর 1000 গ্র্যাম-ক্যালোরি তাপকে বলে 'কিলোগ্র্যাম ক্যালোরি', বা এক **'লার্জ ক্যালোরি'**। বিভিন্ন খাদ্যের তাপ - উৎপাদনের শক্তি ক্যালোরি এককে উল্লেখ করা হয়।

ক্যালোরিফিক ভ্যালু (calorific value) — কোন জ্বালানি পদার্থের তাপ উৎপাদক শক্তির পরিমাপ। কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ জ্বালানি সম্পূর্ণ-রূপে জ্বলে ভস্মীভূত হলে যে পরিমাণ তাপশক্তি পাওয়া যায়, তাকেই বলে পদার্থটার 'ক্যালোরিফিক ভ্যালু'। যেমন — এক পাউণ্ড কয়লা জ্বলে যত পাউণ্ড-ক্যালোরি তাপ বিমুক্ত হয় ওই কয়লার ক্যালোরিফিক ভ্যালু, বা 'থার্মাল ইউনিট' † হবে তত।

ক্যালোরিমিটার (calorimeter)—কোন পদার্থে নিহিত, বা পরিবাহিত তাপের পরিমাণ নির্ধারণ করবার জন্যে ব্যবহৃত যন্ত্র বিশেষ। এরূপ সাধারণ যন্ত্রে প্রধানতঃ থাকে তামা, বা অন্য কোন ধাতুতে নির্মিত একটা বিশেষ আকারের পাত্র। এই ধাতুটার 'স্পেসিফিক হিট্' † জানা থাকলে ওই পাত্রের জলে রেখে বিভিন্ন কৌশলে কোন উত্তপ্ত পদার্থে নিহিত তাপ-শক্তির মোট ক্যালোরি পরিমাণ থার্মোমিটারের † সাহায্যে সহজেই হিসাব করে বার করা যায়।

ক্যালোরিমিটার
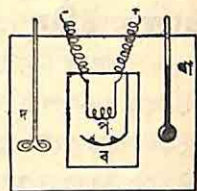
ক্যাল্‌সিফেরল (calciferol)—'ভিটামিন-ডি'-এর রাসায়নিক নাম ; কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত 'ভিটামিন-ডি'। খাদ্যে এর অভাবে শিশুদের হাড় শক্ত হয় না, রিকেট্ † রোগ দেখা দেয়। এর রাসায়নিক বিক্রিয়ায় দেহের অস্থিতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ লাইম †, বা ক্যালসিয়াম সরবরাহ হয়। স্বভাবতঃ বিভিন্ন জান্তব চর্বি, ঈস্ট †, ছত্রাক প্রভৃতির মধ্যে আলট্রা-ভায়োলেট † রশ্মির প্রভাবে পদার্থটার অস্তিত্ব লক্ষিত হয়ে থাকে। পদার্থটা **রেডিওষ্টল** নামেও পরিচিত।

ক্যালামাইন (calamine) — আকরিক জিঙ্ক সিলিকেট (হাইড্রাস), H_2ZnSiO_5 ; এই খনিজ থেকেই প্রধানতঃ জিঙ্ক †, অর্থাৎ দস্তা ধাতুটা নিষ্কাশিত হয়ে থাকে। সাধারণভাবে কখন কখন জিঙ্ক কার্বনেটকেও ($ZnCO_3$) ক্যালামাইন বলে এবং

এই নামে জিনিসটা কোন-কোন ঔষধের মলমেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ক্যান্থারাইডিন্ (cantheridine)— এক প্রকার কীটের দেহ-নিঃসৃত ভেষজ গুণ-সম্পন্ন জৈব পদার্থ বিশেষ। কেশ-বর্ধক গুণের জন্যে সচরাচর কেশ-তৈলে ব্যবহৃত হয়ে থাকে; গাত্রচর্ম রঙিন করতেও এর ব্যবহার আছে। সাধারণতঃ এই শ্রেণীর কীট স্পেন দেশেই পাওয়া যায়; লম্বায় এরা প্রায় আধ ইঞ্চি হয়ে থাকে।

ক্যাভেণ্ডিস (Cavendish), হেনরি — বৃটিশ বিজ্ঞানী, জন্ম 1731 খৃঃ, মৃত্যু 1810 খৃঃ। লর্ড বংশীয় ধনীর সন্তান; বৈজ্ঞানিক গবেষণায় কালাতিপাত। প্রধানতঃ বায়ু ও জলের উপাদানগত আয়তনিক বিশ্লেষণ এবং হাইড্রোজেন প্রভৃতি গ্যাসের রাসায়নিক তথ্যাদি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা। তড়িৎ ও তাপ সম্পর্কে বিবিধ তথ্য আবিষ্কার। পৃথিবীর ওজন নির্ধারণের জন্য ভূ-গোলকের গুরুত্ব (ডেন্সিটি ↑) আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে এক সুবিখ্যাত পরীক্ষার জন্য সমধিক খ্যাতি;—পৃথিবীর গড় গুরুত্ব 5·52 নির্ধারণ। বিপুল সম্পত্তি বৈজ্ঞানিক গবেষণার উন্নতির উদ্দেশ্যে দান; এই অর্থে তাঁর মৃত্যুর পরে কেম্ব্রিজে সুপ্রসিদ্ধ 'ক্যাভেণ্ডিস লেবরেটরি' স্থাপিত হয়েছে।

ক্যাম্ফর (camphor) — কর্পূর; উদ্ভিজ্জ উদ্বায়ী একটি কঠিন পদার্থ। রাসায়নিক সংকেত $C_{10}H_{16}O$; বিশেষ একটা গন্ধযুক্ত সাদা স্ফটিকাকার জৈব যৌগিক। বিশেষ এক শ্রেণীর উদ্ভিদের কাঠ, ডালপালা ও শিকড় থেকে উর্ধ্বপাতন (সাব্লিমেসন ↑) প্রক্রিয়ায় পাওয়া যায়। কৃত্রিম সেলুলোজ ↑ তৈরী ও অন্যান্য বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্পে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইদানিং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম কর্পূর, বা ক্যাম্ফর তৈরী করাও সম্ভব হয়েছে।

ক্যারোটিন (carotene) — স্বভাবজাত জৈব রাসায়নিক পদার্থ বিশেষ; 'ভিটামিন-এ'নামে পরিচিত। লাল্‌চে বর্ণের অতি ক্ষুদ্র স্ফটিকাকার পদার্থ। উদ্ভিদের সবুজ-কণা (পত্র-হরিৎ, বা ক্লোরোফিল ↑) সংগঠনের সহায়ক উপাদান। টাট্‌কা শাক-সব্জি, ফলমূল ও মাখনে অতি সূক্ষ্ম পরিমাণে পাওয়া যায়।

ক্রষ্ট্যাল (crystal)—কেলাস; স্ফটিক; কঠিন পদার্থের কোন সুনির্দিষ্ট জ্যামিতিক আকারের দানা। বিশুদ্ধ অবস্থায় তরলায়িত, বা দ্রবিত প্রায় সব রাসায়নিক পদার্থই বিশেষ ব্যবস্থায় একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক তলবিশিষ্ট কেলাসের আকারে জমে। তলের সংখ্যা ও আকার-আকৃতির বিভিন্নতা অনুসারে ক্রষ্ট্যাল নানা রকমের হয়; যেমন, কিউবিক (সমচতুষ্কোণ ষড়তল) পিরামিড্যাল (ত্রিকোণ গম্বুজাকার), প্রিজ্‌মেটিক (ত্রি-শিরা), মনোক্লিনিক (সূক্ষ্ম কাঠির মত), হেক্সাগন্যাল ↑, টেট্রাগন্যাল ইত্যাদি।

ক্রষ্ট্যালিজেসন (crystallisation)— স্ফটিকীকরণ, বা কেলাসন পদ্ধতি;

পদার্থের কেলাস গঠনের রাসায়নিক প্রক্রিয়া। বিশুদ্ধ রাসায়নিক পদার্থকে তরলায়িত, বা পরিপৃক্ত দ্রবিত অবস্থায় উত্তপ্ত করে সহসা ঠাণ্ডা করলে, বা তার মধ্যে সামান্য কিছু দানা ফেলে দিলে কেলাসন-প্রক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং ধীরে ধীরে সবটা কেলাসিত হয়ে পড়ে। বিভিন্ন পদার্থের কেলাস বিভিন্ন আকারের হয়ে থাকে (কৃষ্ট্যাল ↑)। কোন-কোন পদার্থের কেলাস আবার দ্রাবক জলের নির্দিষ্ট সংখ্যক অণু নিয়ে গঠিত হয়। কেলাসের সংগঠক এই জলকে বলা হয় **'ওয়াটার অব কৃষ্ট্যালিজেসন'** ↑, বাংলায় বলে কেলাস-জল ; যেমন, ফিট্‌কারি, বা অ্যালামে ↑ থাকে 24-টি জলীয় অণু ; তুঁতে, বা 'কপার সাল্‌ফেট' কৃস্ট্যালে 5-টি ; হিরাকস, অর্থাৎ 'ফেরাস সাল্‌ফেট' (গ্রীন ভিট্রিয়ল ↑) কৃস্ট্যালে জলের 7-টি অণু থাকে।

কৃষ্ট্যালোগ্রাফি (crystalography) — কেলাসন বিদ্যা ; বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের বিভিন্ন আকারের কেলাসের গঠন-বৈচিত্র্য, জ্যামিতিক আকৃতি, রাসায়নিক ধর্ম ও গুণাগুণ প্রভৃতি সম্পর্কীয় বিজ্ঞান। কেলাসের এরূপ সব বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে বিভিন্ন পদার্থের রাসায়নিক পরিচয় ও গুণাগুণ অনেকটা নির্ভুলভাবে জানা যায়।

কৃষ্ণান (Krishnan), ডাঃ কে. এস.— খ্যাতনামা ভারতীয় পদার্থ-বিজ্ঞানী, মাদ্রাজে জন্ম 1898 খৃঃ ; মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এস-সি, এবং পরে ডি. এস-সি। কলিকাতার 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন ফর দি কাল্‌টিভেসন অব সায়েন্স' প্রতিষ্ঠানে গবেষণা,—স্যার সি. ভি. রামনের ↑ একান্ত সহযোগী এবং 'রামন এফেক্ট' ↑ আবিষ্কারের কাজে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সহায়ক। রয়্যাল সোসাইটির ফেলো (এফ. আর. এস) 1940 খৃঃ ; ভারতীয় সায়েন্স কংগ্রেসের সভাপতি 1948 খৃঃ। পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় নানা মৌলিক গবেষণার জন্যে বিপুল খ্যাতি ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।

ক্রাউন গ্লাস (crown glass)—অধিকতর তাপসহ এক জাতীয় উৎকৃষ্ট কাচ (গ্লাস ↑) ; সাধারণ সোডা-গ্লাসের ↑ মত সহজে ভাঙ্গে না, বা অধিক তাপেও গলে না। ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌ব ও রসায়নাগারের যন্ত্রপাতি তৈরী করতে সাধারণতঃ এই শ্রেণীর কাচ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ক্রায়োলাইট (cryolite) — সোডিয়াম অ্যালুমিনিয়াম ফ্লোরাইড, Na_3AlF_6 ; সাদা প্রস্তরবৎ খনিজ পদার্থ। অ্যালুমিনিয়াম ↑ ধাতু সাধারণতঃ এই খনিজ থেকেই নিষ্কাশিত হয়ে থাকে।

ক্রিম অব টার্টার (cream of tartar) — পোটাসিয়াম হাইড্রোজেন টা র্টা রে ট, $COOK.(CHOH)_2.COOH$, নামক রাসায়নিক পদার্থের বিশেষ নাম। প্রায় অদ্রাব্য সাদা স্ফটিকাকার পদার্থ ; মদ্য প্রস্তুতকালে (আর্গল ↑) পাত্রের গায়ে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়ই জমে থাকে। বেকিং

পাউডারের ↑ একটা প্রয়োজনীয় উপাদান।

ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গল (critical angle)—সংকট কোণ। অধিকতর ঘনত্ব-বিশিষ্ট কোন স্বচ্ছ পদার্থের (যেমন, কাঁচের) মধ্য দিয়ে আলোক-রশ্মি অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা পদার্থের (যেমন, বায়ুর) মধ্যে প্রবেশ করবার সময়ে ওই আলোক-রশ্মি দুই মাধ্যমের সাধারণ-তলে যে আপতন-কোণ (অ্যাঙ্গেল অব ইন্সিডেন্স, রিফ্লেক্‌সন ↑) সৃষ্টি করে তা যদি একটা নির্দিষ্ট ডিগ্রি পরিমাণের বেশী হয়, তাহলে ওই আলোক-রশ্মি হাল্‌কা পদার্থের মধ্যে (বায়ুতে) আর প্র তি স রি ত (রিফ্রাক্সন ↑) হয় না, সাধারণ-তল থেকে প্রতিফলিত হয়ে পুনরায় সেই ঘনতর পদার্থেই ফিরে আসে। আলোক-রশ্মির এরূপ প্রতিফলনকে বলা হয় **ইণ্টারন্যাল রিফ্লেক্‌সন্‌**, বা আভ্যন্তরীণ প্রতি-ফলন। আর ওই নির্দিষ্ট ডিগ্রি-পরিমাপের আপতন-কোণকে বলা হয় ওই ঘনতর পদার্থটির ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গল। সাধারণ কাঁচের এই ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গল হলো 42° ডিগ্রি।

ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গল

ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার (critical temperature) — সংকট তাপ-মাত্রা; যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় পৌঁছালে কোন গ্যাসকে একটা নির্দিষ্ট চাপ (ক্রিটিক্যাল প্রেসার ↑) প্রয়োগ করেই তরল করা সম্ভব হয়। ওই তাপমাত্রার ঊর্ধে কেবল মাত্র চাপের পরিমাণ বাড়িয়েই কোন গ্যাস কখন তরল করা সম্ভব হয় না।

ক্রিটিক্যাল প্রেসার (critical pressure)—সংকট চাপ; কোন গ্যাসীয় পদার্থ তার নির্দিষ্ট ক্রিটিক্যাল টেম্পা-রেচারের ↑ উষ্ণতা, বা তাপমাত্রায় উপনীত হলে যে-পরিমাণ চাপ প্রয়োগের ফলে তাকে তরল করা সম্ভব হয়। কোন গ্যাসকে তার এই ক্রি. টে., বা তার কম উত্তপ্ত অবস্থায় কেবলমাত্র চাপ বৃদ্ধি করে সহজেই তরল করা যেতে পারে; ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচারের অধিক উত্তপ্ত অবস্থায় অত্যধিক চাপ প্রয়োগ করেও কোন গ্যাসকে তরল করা সম্ভব হয় না।

ক্রিটিক্যাল ভেলোসিটি (critical velocity) — প্রতি সেকেণ্ডে অন্ততঃ-পক্ষে সাত মাইল (ঘণ্টায় প্রায় 25,000 মাইল) গতিবেগ দিতে পারলে কোন বস্তু পৃথিবীর মাধ্যা-কর্ষণের টান প্রতিহত করে মহাশূন্যে চলে যেতে পারে। এই গতিবেগকে পার্থিব বস্তুর ক্রিটিক্যাল ভেলোসিটি বলা হয়। (স্পুট্‌নিক ↑, রকেট ↑)।

ক্রিপ্‌টন (krypton) — মৌলিক নিষ্ক্রিয় গ্যাসীয় পদার্থ (রেয়ার গ্যাস ↑); পারমাণবিক ওজন 83·7, পারমাণবিক সংখ্যা 36; বায়ুমণ্ডলের প্রায় 10 লক্ষ ভাগে এক ভাগ মাত্র এই গ্যাসটি পাওয়া যায়। এর কোন রকম রাসায়নিক ক্রিয়াই নেই।

ক্রিপ্‌টল (cryptol) — কাদা মাটি,

গ্রাফাইট ↑ ও কোরাণ্ডামের ↑ একটা সংমিশ্রণের বিশেষ নাম। তড়িৎ-রোধক পদার্থ হিসেবে জিনিসটা ইলেক্ট্রিক ফার্নেস (তড়িৎ-চুল্লী) নির্মাণে ব্যবহার করা হয়।

ক্রিপ্টোগ্যাম (cryptogam) — অপুষ্পক উদ্ভিদ ; যেমন — শ্যাওলা, ছত্রাক (ফাঙ্গাস ↑), ফার্ণ ↑ প্রভৃতি। **ফ্যানেরোগ্যাম** (phanerogam) হলো সপুষ্পক উদ্ভিদ শ্রেণী।

ক্রিয়োজোট (creosote) — এক রকম পাংশু-বর্ণের তৈলাক্ত পদার্থ ; আলকাত্‌রা থেকে বাষ্পীকরণ (ডিস্টিলেসন ↑) প্রক্রিয়ার সাহায্যে পাওয়া যায়। এর মধ্যে ফিনল ↑ ও ক্রিসল ↑ নামক তরল রাসায়নিক পদার্থ কিছু মিশ্রিত থাকে। বিশেষ অন্তর্ধূম-পাতন প্রক্রিয়ায় কাঠ থেকেও পদার্থটা কিছু পরিমাণে পাওয়া যায়। কাঠ সংরক্ষণের জন্যে এই ক্রিয়োজোট তেল মাখানো হয়ে থাকে। এর বীজাণু প্রতিরোধক (ডিস্‌ইন্‌ফেক্টিং ↑) গুণও যথেষ্ট আছে। সাধারণ ফিনাইল ↑ তৈরী করতে ক্রিয়োজোট তেল সচরাচর ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ক্রিসল (cresol) — আলকাত্‌রা (কোল-টার ↑) থেকে আংশিক বাষ্পীকরণ (ফ্রাক্সন্যাল ডিষ্টিলেসন ↑) প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত বর্ণহীন তরল রাসায়নিক জৈব যৌগ, $CH_3 . C_6H_4 . OH$; একটি জীবাণুরোধক পদার্থ। 'লাইসল' ↑ নামক এন্টিসেপ্টিক ↑ ঔষধ প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়। কোন-কোন বিস্ফোরক পদার্থ, প্লাষ্টিক ↑ এবং বিভিন্ন রং তৈরি করতেও পদার্থটার ব্যবহার আছে। (ক্রিয়োজোট ↑)।

ক্রুক্‌স (Crooks), স্যার উইলিয়াম— বৃটিশ পদার্থ-বিজ্ঞানী ও রাসায়নিক ; জন্ম লণ্ডনে 1832 খৃঃ, মৃত্যু 1919 খৃঃ। পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা (রেডিও অ্যাক্টিভিটি ↑) সম্পর্কে মূল্যবান গবেষণা। হাল্‌কা গ্যাসের মাধ্যমে তড়িৎ প্রবাহের ফলে বর্ণোজ্জ্বল আলোক বিকিরণের 'ক্রুক্‌স টিউব' ↑ নামক যন্ত্র উদ্ভাবন। থ্যালিয়াম ↑ নামক মৌলিক ধাতুটি আবিষ্কারে সমধিক প্রসিদ্ধি।

ক্রুক্‌স টিউব (Crook's tube) — অতি সামান্য বায়ু-চাপবিশিষ্ট (প্রায় বায়ুশূন্য) একটি বিশেষ আকারের কাচ-গোলকের মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহ
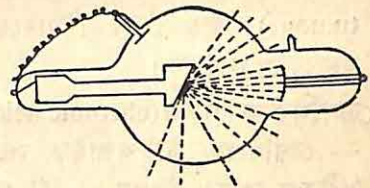
বিশেষ ধরণের ক্রুক্‌স টিউব

চালালে গোলকটি এক রকম হাল্‌কা সবুজ আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এ-থেকে তড়িৎ (ইলেক্ট্রন ↑) সম্পর্কীয় বিশেষ তথ্যাদি জানা গেছে। বস্তুতঃ এটা এক বিশেষ ধরনের 'ক্যাথোড-রে টিউব' ↑ মাত্র। আবিষ্কারক বিজ্ঞানী ক্রুক্‌সের নামানুসারে যন্ত্রটা সবিশেষ পরিচিত হয়েছে।

ক্রুক্‌স গ্লাস (Crook's glass)—এক রকম বিশেষ কাচ, যা আলোক-রশ্মির

পক্ষে স্বচ্ছ, কিন্তু তাপ-রশ্মির পক্ষে অনচ্ছ, অর্থাৎ নিরোধক।

ক্রুসিফেরা (crucifera) — সপুষ্পক উদ্ভিদের বিশেষ এক শ্রেণীর নাম। এই শ্রেণীর উদ্ভিদের প্রত্যেকটি ফুলে মাত্র চারটি দল-পত্র, অর্থাৎ পাপ্ড়ি থাকে।

ক্রুসিফেরা

ক্রেনিয়াম (cranium)—মাথার খুলি (skull); মস্তিষ্কের আবরক অস্থি-গোলক। **ক্রেনিয়ো** (cranio) মানে মাথার খুলি সম্বন্ধীয়; যেমন — **ক্রেনিয়োটমি** (craniotomy) মাথার খুলির ব্যবচ্ছেদ প্রক্রিয়া, বা পদ্ধতি; প্রসবের দুঃসাধ্যতায় মৃত সন্তানের মাথার খুলি কেটে প্রসব করানোর, বা মস্তিষ্কের স্ফীতি (brain-tumour)-জনিত রোগ নিরাময়ের জন্য যেরূপ করা হয়।

ক্রোমিক অ্যাসিড (chromic acid) — ক্রোমিয়াম ট্রাইঅক্সাইড জলে দ্রবীভূত করলে উৎপন্ন হয় (H_2CrO_4); এর বিভিন্ন ধাতব সল্টকে বলে **ক্রোমেট**। বিভিন্ন ক্রোমেট-সল্ট রং (পেইন্ট ↑) তৈরী করতে ও ফটোগ্রাফি শিল্পে ব্যবহৃত হয়। লেড-ক্রোমেটকে বলে **ক্রোম-ইয়োলো**; এটা এক রকম হল্‌দে রং হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আবার ক্রোম-অ্যালাম ↑ হলো ক্রোমিয়াম-পটাসিয়াম সালফেট সল্ট; যা রঞ্জন-শিল্পে ও চামড়া ট্যান করবার কাজে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ক্রোমিয়াম (chromium)—মৌলিক ধাতু, সাদা কঠিন পদার্থ; সাংকেতিক চিহ্ন Cr, পারমাণবিক ওজন 52·01, পারমাণবিক সংখ্যা 24; প্রাকৃতিক ক্রোম-আয়রন (ক্রোমাইট ↑) খনিজ থেকে নিষ্কাশিত হয়। মরিচা-হীন ইস্পাত তৈরী করতে এবং ক্রোমিয়াম-প্লেটিং-এর (ইলেক্‌ট্রোপ্লেটিং ↑) কাজে ধাতুটার যথেষ্ট প্রয়োজন হয়।

ক্রোমোসোম (chromosome) — জীবের দেহ-কোষের নিউক্লিয়াস ↑, বা কেন্দ্রীণে অবস্থিত অতি ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম সূত্রবৎ আণুবীক্ষণিক জৈব পদার্থ। কোন রং মেশালে জীব-কোষের একটা অংশে রং ধরে, বাকী অংশ বর্ণহীন থেকে যায়। এই রঙিন অংশকে বলা হয় **ক্রোম্যাটিন** ↑। কোন জীব-কোষ ভেঙ্গে ফেললে তার ওই ক্রোম্যাটিন অংশ কোষের কেন্দ্রীণস্থ সূক্ষ্ম কাঠির মত ক্রোমোসোমগুলোর গায়ে লেগে যায়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এ-সব ব্যাপার নানাভাবে পরিষ্কার লক্ষ্য করা গেছে। বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভিদ ও প্রাণীর জনন-কোষে বিভিন্ন সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে। মানুষের কোষে 48-টি মাত্র ক্রোমোসোম রয়েছে। এ-রকম বিভিন্ন জীবের জনন-কোষে বিভিন্ন নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে; অর্থাৎ একই জাতীয় জীবের প্রত্যেকটি কোষে ক্রোমোসোমের সংখ্যা নির্দিষ্ট। এই ক্রোমোসোমের সংখ্যা ও গঠনের উপর জীবমাত্রেরই স্বাভাবিক প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যাদি নির্ভর করে (জিন্ ↑)।

ক্রোমোস্ফিয়ার (chromosphere)

— সূর্যের বহির্ভাগের প্রদীপ্ত গ্যাসীয় পরিমণ্ডল। এই স্তর সূর্যের ফোটো-স্ফিয়ার ↑ অংশকে বেষ্টন করে আছে। সূর্য-গ্রহণের সময় দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সৌর গোলকের এই স্তরের উজ্জ্বল আলোকচ্ছটা পরিষ্কারভাবে লক্ষ্য করা সম্ভব হয়ে থাকে।

ক্রোম্যাটিন (chromatin) — জীব-কোষের সংগঠক উপাদানের যে অংশ কোন-কোন রং শোষণ করে রঞ্জিত হয়ে ওঠে ; কিন্তু অবশিষ্ট অংশে কোন রং ধরে না। (**ক্রোম** মানে বর্ণ, বা রঞ্জক পদার্থ)

ক্রোম্যাটিক অ্যাবারেসন (chromatic aberration) — লেন্সের যে ত্রুটির ফলে আলোক-রশ্মি তার মাধ্যমে প্রতিসরিত (রিফ্রাক্সন ↑) হয়ে একই বিন্দুতে (ফোকাস ↑) কেন্দ্রীভূত হয় না ; বিভিন্ন বর্ণ-রশ্মি বিভিন্ন বিন্দুতে মিলিত, বা কেন্দ্রীভূত হয়ে এক রকম মিশ্র বর্ণালীর (স্পেকট্রাম ↑) সৃষ্টি করে। এরূপ লেন্সের ↑ মাধ্যমে দৃষ্ট বস্তু পরিষ্কার দেখা যায় না, বিভিন্ন বর্ণে ঝাপ্‌সা প্রতিভাত হয়ে থাকে। (অ্যাবারেসন ↑ ও অ্যাক্রোমেটিক ↑)।

ক্রোম্যাটোগ্রাফি (chromatography) — রাসায়নিক বিশ্লেষণের একটা পদ্ধতি বিশেষ ; যাতে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের জলীয় দ্রবণ 'ফুলার্স আর্থ' ↑, অ্যালুমিনা ↑ প্রভৃতি শোষণক্ষম পদার্থের দীর্ঘ স্তরের মধ্য দিয়ে চালিত করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন পদার্থের দ্রবণ ঐ শোষক-স্তরের বিভিন্ন উচ্চতা, বা দূরত্ব অবধি অগ্রসর হয়। এরূপ চলাচলের দ্রুততা ও গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করে বিভিন্ন গুণানুযায়ী বিভিন্ন উপাদানের অস্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা যায়।

ক্রোনোমিটার (chronometer) — সঠিক সময়-নিরূপক এক রকম যন্ত্র, বা ঘড়ি। সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন সময় নিরূপণের জন্যে এই যন্ত্র আজকাল বিভিন্ন মান-মন্দিরে ও সমুদ্রগামী জাহাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ক্রোনোস্কোপ (chronoscope) — সময়ের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ (যেমন, সেকেণ্ডের সহস্রাংশ) পর্যন্ত পরিমাপের একটা যন্ত্র বিশেষ। প্রধানতঃ এর কৌশলটা হলো প্রতি সেকেণ্ডে (সময়ের ভগ্নাংশ অনুসারে) প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্পন্দন-বিশিষ্ট একটা টিউনিং-ফর্ক ↑ এমনভাবে স্পন্দিত করা হয় যাতে তার প্রতি স্পন্দনে একটা চাকার এক-একটা দাঁত ঘুরে যায় এবং তার ফলে যান্ত্রিক কৌশলে চলমান কাগজের উপরে সময়ের সূক্ষ্ম বিভাগের দাগ পড়ে।

ক্লিনিক (clinic) — চিকিৎসাগার ; যেখানে কোন রোগ নিরাময়ের জন্য ডাক্তারের পরামর্শ ও চিকিৎসার সাহায্য পাওয়া যায়।

ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার (clinical thermometer) — 'ক্লি নি ক্যা ল' কথাটার অর্থ হলো শয্যাশায়ী রোগী সম্পর্কীয়। তাই, রোগীর দেহের তাপ নির্ধারণের জন্যে বিশেষ ধরনের যে থার্মোমিটার ↑ বা 'তাপমান যন্ত্র' ব্যবহৃত হয় তাকে বলে ক্লি. থা.। এর

তাপমাত্রা ফারেন্‌হাইট ↑ স্কেলে নিরূপিত হয়ে থাকে।

ক্লিনোমিটার (clinometer) — যে বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে পাহাড়-পর্বতের ঢালের কোণ মাপা হয়, অর্থাৎ সমতল ভূমি থেকে কতটা কোণে ঢালু হয়ে পাহাড়ের শীর্ষ উপরের দিকে উঠেছে তার পরিমাণ জানা যায়।

ক্লোর‍্যাল (chloral) — বর্ণহীন, কটু গন্ধবিশিষ্ট এক প্রকার তৈলাক্ত রাসায়নিক পদার্থ, $CCl_3.CHO$; অ্যালকোহলের ↑ সঙ্গে ক্লোরিনের ↑ রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয়ে থাকে। ঘুমের ঔষধ (নার্কোটিক ↑) হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সাদা স্ফটিকাকার কঠিন পদার্থ। জলের সঙ্গে এর রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন পদার্থকে বলে 'ক্লোর‍্যাল হাইড্রেট'।

ক্লোরিন (chlorine) — মৌলিক গ্যাসীয় পদার্থ ; পারমাণবিক ওজন 35·457. পারমাণবিক সংখ্যা 17, সাংকেতিক চিহ্ন Cl ; সবুজাভ হল্‌দে ভারী গ্যাস, শ্বাস-রোধকারী তীব্র গন্ধ বিশিষ্ট ও বিষাক্ত। এর বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ পৃথিবীতে নানা আকারে প্রচুর ছড়ানো রয়েছে। সাধারণ খাদ্য-লবণ হলো সোডিয়াম ক্লোরাইড, NaCl ; পৃথিবীর অধিকাংশ জিনিসেই কম-বেশী এই লবণ বিদ্যমান। সমুদ্রের জলে প্রচুর লবণ দ্রবীভূত আছে (সি-ওয়াটার ↑)। হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন হয় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, HCl ; যার বিভিন্ন সল্ট হলো **ক্লোরাইড**। সোডিয়ামক্লোরাইড মিশ্রিত সমুদ্র-জল থেকে ইলেক্ট্রোলিসিস ↑ প্রক্রিয়ায় ক্লোরিন সহজে এক রকম বিনামূল্যে পাওয়া যায়। এই গ্যাসের সাহায্যে পানীয় জল জীবাণু মুক্ত করা হয় ; এই প্রক্রিয়াকে বলে জল **ক্লোরিনেট** করা। বস্ত্রাদি সাদা (ব্লিচিং ↑) করতে ও জীবাণুনাশক পদার্থ (ব্লিচিং পাউডার ↑) প্রভৃতি তৈরী করতে ক্লোরিন গ্যাস যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ক্লোরেলা (chlorela)—এক জাতীয় গাঢ় সবুজ শ্যাওলা (অ্যাল্‌জি ↑)। সাম্প্রতিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে, এর মধ্যে মানুষের জীবন ধারণের উপযোগী প্রোটিন, শর্করা, কার্বোহাইড্রেট, স্নেহ পদার্থ, ভিটামিন প্রভৃতি সব উপাদানই যথোপযুক্ত পরিমাণে বর্তমান ; — পৃথিবীর খাদ্য-সমস্যার সমাধানে বিপুল সম্ভাবনাপূর্ণ। জল ও স্থল সর্বত্র এর উৎপাদন সহজসাধ্য ; এরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোষবিভাজন প্রক্রিয়ায় অতি দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে। কার্বন-ডাইঅক্সাইড ↑ আত্মীকরণের শক্তিও এদের অতি প্রবল ; এ-জন্যে সাবমেরিন ↑ ও রকেট ↑ অভিযানের আবদ্ধ কক্ষের বায়ুতে অক্সিজেনের সমতা রক্ষায় সমর্থ বলে পরীক্ষিত।

ক্লোরোফর্ম(chloroform)—বর্ণহীন উদ্বায়ী তরল পদার্থ ; সুমিষ্ট গন্ধযুক্ত ; রাসায়নিক সূত্র $CHCl_3$, 'ট্রাইক্লোরো মিথেন'। অ্যানেস্থেটিক ↑ শক্তির জন্যে অস্ত্র-চিকিৎসার সময়ে

সাধারণতঃ এ-দিয়ে রোগীকে অসাড় ও অনুভূতিশূন্য করে নেওয়া হয়।

ক্লোরোপিক্রিন (chloropicrine)— এক রকম তৈলাক্ত তরল রাসায়নিক পদার্থ, CCl_3NO_2। পিক্রিক↑ অ্যাসিডের সঙ্গে ক্লোরিনের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উৎপন্ন। মারাত্মক বিষাক্ত। উপযুক্ত পরিমাণে ও সাবধানে জীবাণুনাশক ও ছত্রাক-ধ্বংসী পদার্থ হিসেবে অনেক সময় ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ক্লোরোফিল (chlorophyll)—পত্র-হরিৎ; উদ্ভিদের পত্রাদির কোষে সবুজ বর্ণের যে অতি সূক্ষ্ম পদার্থ-কণিকা থাকে; এ গুলিকে **ক্লোরোপ্লাস্ট**-ও বলে। আধুনিক পরীক্ষায় দেখা গেছে, উদ্ভিদের এই সবুজ-কণা, বা ক্লোরোফিল দু-রকম 'ক্লোরোফিল-এ' হরিদ্রাভ সবুজ বর্ণ; আর 'ক্লোরোফিল-বি' নীলাভ সবুজ। সূর্য-কিরণের মাধ্যমে উদ্ভিদ এই ক্লোরোফিলের সাহায্যে শক্তি আহরণ করে এবং বায়ুর কার্বন-ডাইঅক্সাইড ও জলীয় বাষ্পের রাসায়নিক সংযোগ ঘটিয়ে শর্করা উৎপন্ন করে, অক্সিজেন বিমুক্ত হয়ে পুনরায় বাতাসে মিশে যায়। উদ্ভিদের এই রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ক্লোরোফিল ক্যাটালিষ্টের↑ কাজ করে মাত্র (ফটো-সিন্থেসিস্↑)।

ক্লোরোমাইসিটিন (chloromycetin) — ছত্রাক জাতীয় এক প্রকার জৈব পদার্থ থেকে নিঃসৃত জীবাণু-প্রতিরোধক পদার্থ। ঔষধ হিসেবে টাইফয়েড রোগে বিশেষ ফলপ্রদ। বিশেষতঃ দক্ষিণ আমেরিকায় এই জাতীয় ছত্রাক প্রচুর জন্মায়। এই ছত্রাক আজকাল উপযুক্ত কৃত্রিম পরিবেশে রসায়নাগারেই প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়ে থাকে।

গ

গথিক টাইপ (Gothic type) — পূর্বে ছাপার কাজে ব্যবহৃত, অধুনা অপ্রচলিত এক ধরনের ইংরেজী অক্ষর। এরূপ অক্ষর বিভিন্ন রেখা-বিন্যাসে কারুকার্য করা ছিল। **গথিক আর্চ** — সূক্ষ্মাগ্র গম্বুজাকার বিশেষ ধরনের এক প্রকার ইমারতী গাঁথুনির খিলান।
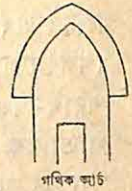
গথিক আর্চ

গনো (gono) — প্রজনন, বা প্রসবন সম্বন্ধীয়; যেমন, **গন্যাড** (gonad) হলো স্ত্রী, বা পুরুষের যে গ্ল্যাণ্ডের↑ মধ্যে জনন-কোষসমূহ উৎপন্ন হয়।

গনোকক্কাই (gonococci) — যে রোগ-জীবাণুর (ব্যাক্‌টিরিয়া↑) সংক্রমণে 'গনোরিয়া' নামক কুৎসিত ও কষ্টদায়ক যৌন-ব্যাধির সৃষ্টি হয়।

গয়টার (goitre) — গলগণ্ড রোগ; প্রধানতঃ থাইরয়েড↑ গ্ল্যাণ্ডের স্ফীতি-জনিত রোগ বিশেষ। ভুক্ত খাদ্যে যথোপযুক্ত পরিমাণে আয়োডিনের↑ অভাবেই সাধারণতঃ এ-রোগ হয়ে থাকে। (এক্সোথ্যাল্‌মিক গয়টার↑)।

গল ব্লাডার (gall-bladder)— পিত্তাশয়। যকৃৎ (লিভার↑)-সংলগ্ন এই পিত্তাশয় থেকে নিঃসৃত সবুজ

বর্ণের পিত্ত-রস (বাইল ↑) খাদ্যের তৈলাক্ত অংশ পরিপাকে সাহায্য করে। এই পিত্ত-রস লিভারের নিম্নাংশে সংলগ্ন যে-থলিতে সঞ্চিত হয়ে থাকে তাকে শারীরবৃত্তে বলা হয় পিত্তাশয়, বা 'গল ব্লাডার'।

গল ব্লাডার

গলষ্টোন (gall-stone) — পিত্তাশয়ে (গল ব্লাডার ↑) সঞ্জাত প্রস্তরবৎ কঠিন পদার্থ-পিণ্ড; পিত্ত-রসের (বাইল ↑) স্বাভাবিক নিঃসরণ ও কার্যকারিতা ব্যাহত হলে তা পিত্তস্থলীর ভিতরে জমে এরূপ কঠিন দানার আকার ধারণ করে। কঠিন যন্ত্রণাদায়ক রোগ বিশেষ।

গাইগার কাউণ্টার (Geiger counter) — যে যন্ত্রের সাহায্যে তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে বিকিরিত রশ্মি (আল্ফা, বিটা ও গামা রশ্মি ↑), অথবা কস্মিক ↑ রশ্মি সমূহের অস্তিত্ব এবং তাদের সংগঠক ফোটন ↑ কণিকার সংখ্যা জানা যায়। মোটামুটি এ-যন্ত্রে থাকে ধন-তড়িদ্দ্বার (অ্যানোড ↑) হিসাবে একটা সূক্ষ্ম ধাতব তার, যাকে বেষ্টন করে থাকে ঋণ-তড়িদ্দ্বার (ক্যাথোড ↑) হিসাবে একটা সম-অক্ষবিশিষ্ট ক্ষুদ্র ধাতব সিলিণ্ডার। এই সবশুদ্ধ থাকে একটা হাল্কা গ্যাসপূর্ণ আধারে আবদ্ধ। উক্ত ক্যাথোড ও অ্যানোডের মধ্যে প্রায় 1000 ভোল্ট ↑ তড়িৎ-বিভবের ব্যবধান রক্ষা করা হয়। তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিকিরিত রশ্মির 'ফোটন' কণিকাগুলি এই যান্ত্রিক ব্যবস্থায় আয়নায়িত (আয়নিজেসন ↑, আয়ন ↑) হয়ে তড়িৎ-প্রান্তদ্বয়ের ভোল্টেজের ↑ পরিবর্তন ঘটায় এবং তা ভোল্টমিটারে ↑ ধরা পড়ে। এর সাহায্যে তেজক্রিয়তার অস্তিত্বই কেবল নহে, আয়নায়িত ফোটন কণিকার সংখ্যাও নির্ধারিত হয়ে থাকে।

গাউট (g o u t) — মেদবৃদ্ধি-জনিত সাধারণ বাত রোগ। এতে সময়-সময় আবার রক্তে ইউরিক ↑ অ্যাসিড মিশে তার বিষ-ক্রিয়ায় দেহের বিভিন্ন অস্থি-সংযোগে ও মাংসপেশীতে ক্যালসিয়াম কার্বনেটের কঠিন স্তর জমে যায়, মুখ্যতঃ যার ফলে স্বাভাবিক রক্ত-সঞ্চালন-ক্রিয়া ব্যাহত হয়ে দেহের অংশ বিশেষের স্ফীতি ঘটে ও সঞ্চালনে বেদনা বোধ হয়।

গাটাপার্চা (guttapercha) — অনেকটা রবারের মত এক প্রকার উদ্ভিজ্জ পদার্থ। মালয়ে উৎপন্ন এক শ্রেণীর উদ্ভিদের রস (ল্যাটেক্স ↑) জমিয়ে গাটাপার্চা তৈরী হয়ে থাকে। অত্যন্ত দাহ্য পদার্থ। তড়িৎ-রোধক (ইন্সুলেটর ↑) পদার্থ হিসেবে অনেক সময় বৈদ্যুতিক তারে ও যন্ত্রাদিতে এর আবরণ দেওয়া হয়।

গান কটন (gun-cotton) — নাইট্রোসেলুলোজ ↑, অর্থাৎ সেলুলোজ নাইট্রেটের বিশেষ নাম। অতি উগ্র বিস্ফোরক পদার্থ। তূলা, কাঠের আঁাস প্রভৃতি সেলুলোজ ↑ জাতীয় পদার্থের উপর নাইট্রিক অ্যাসিডের রাসায়নিক

বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়। অনেক সময় বন্দুকের বারুদ হিসাবে ব্যবহৃত হয় বলে এই নাম।

গান পাউডার (gun-powder) — পটাসিয়াম নাইট্রেট (সল্ট পিটার ↑), গন্ধক ও কয়লার গুঁড়ার সংমিশ্রণে তৈরী একটি বিস্ফোরক পদার্থ ; যা দিয়ে বোমা-পট্‌কা তৈরী হয়। এই বারুদে আগুন দিলে, বা আঘাত-জনিত উত্তাপেই অতি দ্রুত বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত হয়, যার ফলে বিস্ফোরণ ঘটে, এবং সহসা প্রচুর গ্যাস ও ধূম জন্মায়। কামান-বন্দুকের আবদ্ধ খোলের মধ্যে এরূপ বিস্ফোরণের ফলেই প্রচণ্ড শব্দ হয় ও উৎপন্ন গ্যাসের চাপে গোলা-গোলি দুরন্ত বেগে ছুটে বেরোয়।

গান মেটাল (gun metal) — তামা, দস্তা (জিঙ্ক ↑) ও টিনের সংমিশ্রণে প্রস্তুত একটা সংকর-ধাতু। সামান্য নীলাভ ধূসর বর্ণের এক প্রকার ব্রোঞ্জ ↑ ; এর মধ্যে প্রায় 90% তামা, 6 থেকে 8% টিন এবং 2 থেকে 4% দস্তা সংমিশ্রিত থাকে।

গাম অ্যারাবিক (gum arabic) — অ্যাকেসিয়া নামক এক রকম উদ্ভিদের বিশুদ্ধ রস ; সাধারণ গঁদের আঠা। আঠা হিসেবে ব্যবহৃত হয়, কোন-কোন ঔষধের ট্যাবলেট প্রস্তুতিতেও লাগে। প্রকৃতিতে আরও নানা রকম গাম আছে ; সবই উদ্ভিজ্জ পদার্থ।

গামা-আয়রন (gama-iron) — অত্যধিক তাপ-সহনশীল এক রকম (ইস্পাত) লোহা, যাকে **অষ্টেনাইট**ও বলা হয়। সামান্য কার্বন, নিকেল ↑ ; ম্যাঙ্গানিজ ↑ প্রভৃতি মিশিয়ে সাধারণ লোহাকে এরূপ বিশেষ ধরনের ষ্টিল ↑, বা ইস্পাতে পরিণত করা হয়। আবার, বিশেষ কঠিন এক রকম ব্রাস ↑, বা পিতলকে বলে **গামা-ব্রাস**। (ব্রাস ↑)

গামা-রে (g a m a-r a y) — গামা রশ্মি ; বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় (রেডিও-অ্যাক্টিভ ↑) পদার্থ থেকে যে বিশেষ এক শ্রেণীর অতি সূক্ষ্ম তেজঃ-রশ্মি তরঙ্গাকারে বিচ্ছুরিত হয়। এই রশ্মি এক্স-রশ্মির ↑ অনেকটা অনুরূপ ; কিন্তু তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আরও কম। এটা প্রকৃত-পক্ষে তড়িৎ-চৌম্বকীয় এক প্রকার বিশেষ তরঙ্গ-ধারা। তেজ-স্ক্রিয় পদার্থ থেকে ইলেক্‌ট্রনের তরঙ্গ-ধারা (বিটারশ্মি ↑) বিচ্ছুরণের সঙ্গে-সঙ্গে এই গামা-তরঙ্গেরও সৃষ্টি হয়। গামা-রশ্মি খুব মোটা ধাতব বাধাও ভেদ করে যেতে পারে ; কিন্তু দু-মাইলের অধিক বায়ু-স্তর ভেদ করে যেতে পারে না। এই রশ্মি প্রাণিদেহের রক্ত-কোষ বিনষ্ট করে ফেলে ; কাজেই প্রাণীদের পক্ষে এটা বিশেষ মারাত্মক। তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে আল্‌ফা, বিটা ও গামা নামে তিন প্রকার তেজঃরশ্মি বিচ্ছুরিত হয়ে থাকে।

বিভিন্ন রশ্মির বিচ্ছুরণ

গিয়ার (gear) — যন্ত্রাদিতে ব্যবহৃত দাঁত-কাটা চাকাকে বলে **গিয়ার-হুইল**। এরূপ বিভিন্ন চাকার পরস্পর

সন্নিবেশকে বলে গিয়ার। ইঞ্জিনের যান্ত্রিক বেগ-শক্তি স্থির থাকলেও একটা গিয়ার-হুইল ঘুরিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন চাকার সংযোগ কমিয়ে-বাড়িয়ে চলযান যন্ত্রের সামগ্রিক গতি-বেগের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটানো সম্ভব হয়ে থাকে। মোটর গাড়ীর ইঞ্জিনে থাকে একটা গিয়ার-বক্স, যার মধ্যে বিভিন্ন মাপের সাধারণতঃ তিনটি গিয়ার-হুইল সন্নিবিষ্ট থাকে।
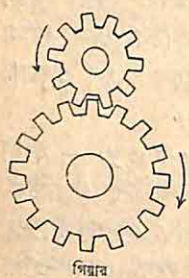
গিয়ার

গেইজার (geyser) — (1) উষ্ণ-প্রস্রবণ ; ভূ-গর্ভ থেকে স্বভাবতঃ গরম জলের যে ধারা উৎসারিত হয়। (2) যে যন্ত্রে প্রবিষ্ট জল বিশেষ ব্যবস্থায় প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে উত্তপ্ত হয়ে নল-পথে বেরিয়ে আসে। শীত-প্রধান দেশে এরূপ যন্ত্র স্নানের ঘরে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যন্ত্রের উপর দিকের নলপথে জলপ্রবেশ করে। সেই জল অভ্যন্তরস্থ অনেক-গুলো উত্তপ্ত চাক্‌তির উপর দিয়ে গড়িয়ে নামে। এভাবে জল গরম হয়ে নীচের নলপথে বেরিয়ে আসে। যন্ত্রটার নিম্নভাগে গ্যাসের উনান জ্বালানো থাকে, তার উত্তাপে ভিতরের ওই চাক্‌তিগুলো উত্তপ্ত হয়।
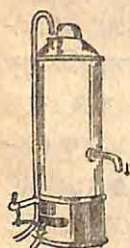
গেইজার যন্ত্র

গেজ (g a u g e) — পরিমাপক যন্ত্র ; যেমন — পেট্রল-গেজ, প্রেসার-গেজ ইত্যাদি। আবার-সরু তারের ব্যাস নিখুঁতভাবে মাপ-বার জন্যে **মাই-ক্রোমিটারগেজ** নামক যন্ত্র (প্রদত্ত চিত্র↑) ব্যবহৃত হয়। রেললাইনের দু'টা লৌহ-পাটির মাঝে 7 ফুট ব্যবধান থাকলে বলে **ব্রড গেজ** এবং 3 ফুট 6 ইঞ্চি ব্যবধান থাকলে বলে **ন্যারো-গেজ** লাইন।

মাইক্রোমিটার গেজ.

গে-লুসাক (Gay Lusac) লুই জোসেফ — ফরাসী পদার্থ-বিজ্ঞানী ; জন্ম 1778 খৃঃ, মৃত্যু 1850 খৃষ্টাব্দ। অবশ্য বিভিন্ন রাসায়নিক গবেষণায়ই সমধিক প্রসিদ্ধি ; আয়োডিনের↑ রাসায়নিক ধর্মাদি নির্ণয় ; সাল-ফিউরিক (H_2SO_4) ও অক্স্যালিক [$(COOH)_2 . 2H_2O$] অ্যাসিড উৎপাদনের নূতন প্রণালী উদ্ভাবন ; রাসায়নিক মিলনের ফলে বিভিন্ন গ্যাসীয় সংমিশ্রণের আয়তনের পরি-বর্তন বিষয়ক সূত্র (গে-লুসাক্স-ল↑) প্রভৃতি আবিষ্কারে সবিশেষ প্রসিদ্ধি ও খ্যাতি অর্জন।

গে-লুসাক্স্-ল (Gay-Lusac'slaw) — বিভিন্ন গ্যাসের রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন যৌগিক পদার্থটাও যদি গ্যাসীয় হয়, তবে ওই উৎপন্ন গ্যাসীয় যৌগটির আয়তন হবে উৎপাদক গ্যাস দুটির আয়তনের আনুপাতিক। এই নিয়ম অনুযায়ী এক সি. সি. অক্সিজেন ও দুই সি. সি. হাইড্রো-জেনের মিলনে হবে দুই সি.সি. জলীয়

বাষ্প। অবশ্য 100° সেন্টিগ্রেডের বেশী তাপে এই রাসায়নিক সংযোগ ঘটানো চাই ; নতুবা উৎপন্ন পদার্থ গ্যাসীয় (বাষ্প) হবে না, হবে অতি সামান্য পরিমাণ জল। আবার সর্বদা একই তাপ ও চাপে উৎপাদক ও উৎপন্ন গ্যাসগুলোর আয়তন মাপতে হবে। ফরাসী বিজ্ঞানী গে-লুসাক্ ↑ গ্যাসীয় বিক্রিয়ার এই সূত্র নির্ধারণ করেন ; সকল প্রকার গ্যাসীয় বিক্রিয়ায় সূত্রটি সমভাবে খাটে।

গেস্‌লার টিউব (Geissler tube) — বিভিন্ন গ্যাসের মাধ্যমে তড়িৎ-প্রবাহের ফলে উৎপন্ন বিভিন্ন বর্ণের দীপ্তি এর যান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরীক্ষা করা হয়। এটা একটা লম্বা কাচের-টিউব মাত্র। (অবশ্য এই কাচের টিউব বিভিন্ন আকার-আকৃতিরও হতে পারে)। বায়ু-শূন্য টিউবটার ভিতরে সামান্য পরিমাণ কোন পরীক্ষণীয় গ্যাস পূর্ণ থাকে। ওর ভিতরে তড়িৎ-প্রবাহ চালালে আবদ্ধ গ্যাসের পরমাণু-গুলো ইলেক্‌ট্রন ↑ কণিকার সংঘাতে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। বিভিন্ন গ্যাসের মধ্যে এ-রকম দীপ্তি বিভিন্ন বর্ণ ও ঔজ্জ্বল্য-বিশিষ্ট হয়ে থাকে।
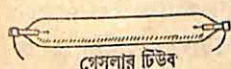
গেস্‌লার টিউব

গোল্ড (gold) — সোনা ; মৌলিক ধাতু, পারমাণবিক ওজন 197·2, পারমাণবিক সংখ্যা 79, সাংকেতিক চিহ্ন Au (লেটিন 'অরাম', aurum, থেকে)। উজ্জ্বল হলদে নমনীয় পদার্থ। সহজেই একে পাত ও তারে পরিণত করা যায় ; মরিচা ধরে না, কোন অ্যাসিডেও গলে না। কেবল মাত্র 'অ্যাকোয়া রিজিয়া' ↑ নামক মিশ্র অ্যাসিডে সোনা দ্রবীভূত হয়। পৃথিবীর কোন-কোন স্থানে বিশুদ্ধ স্বর্ণ-রেণু পাওয়া যায় ; আবার কোথাও বিভিন্ন ধাতব পদার্থ ও প্রস্তরাদির সঙ্গে মিশ্রিত অবিশুদ্ধ খনিজরূপেও থাকে। পূর্বে এরূপ অবিশুদ্ধ খনিজ প্রস্তর থেকে অ্যামালগাম ↑ প্রক্রিয়ায় সোনা নিষ্কাশিত হতো। বিশুদ্ধ সোনা নরম ; তামা, বা রূপা মিশিয়ে সোনার ধাতু-সংকর তৈরী করা হয়, (ক্যারেট ↑) এবং তা অপেক্ষাকৃত কঠিন বলে এ-দিয়ে স্বর্ণমুদ্রা ও অলঙ্কারাদি প্রস্তুত হয়। সোনার কোন-কোন যৌগিক পদার্থ ফটোগ্রাফির ↑ কাজেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

গোল্ড - লিফ ইলেক্‌ট্রোস্কোপ (gold-leaf electroscope) — ইলেক্‌ট্রোস্কোপ ↑।

গোল্ডেন অয়েণ্টমেণ্ট (golden ointment) — চক্ষুরোগের এক প্রকার মলমের বিশেষ নাম ; চর্বি, বা ভেসেলিন ↑ জাতীয় পদার্থে হল্‌দে বর্ণের অতি বিশুদ্ধ 'পারদ ভস্ম' (মার-কিউরিক অক্সাইড, Hg_2O) মিশিয়ে তৈরী করা হয়।

গ্যাংওয়ে (gang way) — বৃহদাকার নৌকা, অথবা বড় জাহাজে আরোহণ, বা তা-থেকে অবতরণের সুবিধার জন্যে সহজে স্থাপন ও অপসারণের

গ্যাংওয়ে

যোগ্য যে হাল্কা সিড়ির সেতু সাধারণতঃ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

গ্যাংগ্রিন (gangrine) — নালি ঘা, অন্তঃপ্রসারী ক্ষত। বিশেষ জীবাণুর প্রকোপে রক্ত-চলাচল বন্ধ হয়ে স্থানীয় মাংস-কোষগুলি (সেল↑) মরে-মরে ক্রমে ভিতরের দিকে এগিয়ে এরূপ ক্ষতের সৃষ্টি। **গ্যাস গ্যাংগ্রিন**—যে নালি-ঘায়ে বিশেষ জীবাণুর (ব্যাচিলাস↑) বিষ-ক্রিয়ায় দূষিত মাংসের অভ্যন্তরে গ্যাস জন্মে ও মাংসপেশী ঝাজ্‌রা হয়ে স্পঞ্জের মত হয়ে যায়।

গ্যামাক্সেন (gammexane)—বিশেষ এক প্রকার আণবিক গঠন-বিশিষ্ট বেঞ্জিন-হেক্সাক্লোরাইড ($H_6C_6Cl_6$) নামক রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহারিক নাম। সাদা গুঁড়া আকারে পাওয়া যায় ; কীট-পতঙ্গ-নাশক বিশেষ শক্তিশালী বিষাক্ত পদার্থ।

গ্যামিট (gamete)—প্রজনন-কোষ ; পুরুষ, বা স্ত্রী-যৌনকোষ ; যাদের পরস্পর মিলনে উৎপন্ন হয় নূতন জীবকোষ, যা মাতৃগর্ভে ক্রমে ভ্রূণে (ফিটাস↑) পরিণত হয়।

গ্যামিটোসাইট্‌স (gametocytes) — যে-সব জীবাণু-কোষ উপযুক্ত পরিবেশে কোন জীবদেহের অভ্যন্তরে প্রজনন-কোষে রূপান্তরিত হয়; যেমন —ম্যালেরিয়ার জীবাণু-কোষ মশকের দ্বারা সংক্রামিত হয়ে মানুষের রক্তে নূতন-নূতন প্রজনন-কোষ সৃষ্টি করে এবং বংশবৃদ্ধি ঘটায়।

গ্যাল্ভ্যানাইজ্‌ড আয়রন (galvanised iron)—জিঙ্ক, অর্থাৎ দস্তার একটা পাত্‌লা আবরণ দেওয়া লোহার জিনিস। দস্তা গলিয়ে তার মধ্যে (অ্যাসিডের সাহায্যে সুপরিষ্কৃত) লোহার জিনিস ডুবিয়ে নিলেই এরূপ গ্যাল্ভ্যানাইজ্‌ড আয়রন পাওয়া যায়, অর্থাৎ লোহার উপরে দস্তার একটা পাত্‌লা আস্তরণ ধরে। এই প্রক্রিয়াকে বলে **গ্যাল্ভ্যানাইজিং**। লোহায় মরিচা ধরা বন্ধ করবার জন্যে এরূপ প্রক্রিয়া করা হয়। ঘরের চালার ঢেউ-টিন এভাবে তৈরী হয় ; প্রকৃতপক্ষে জিনিসটা টিন↑ নয়, জিঙ্কের↑ পাত্‌লা আস্তরণযুক্ত ঢেউ-তোলা লোহার পাত মাত্র।

গ্যাল্ভানি (Galvani), লুইগি — ইটালীয় জীব-বিজ্ঞানী ; বোলোন সহরে জন্ম 1737 খৃঃ, মৃত্যু 1798 খৃঃ। ছিলেন শারীরবৃত্তের অধ্যাপক ; ব্যাং-এর দৈহিক গঠন সম্পর্কে গবেষণার কালে 1762 খৃঃ জীবদেহে তড়িতের অস্তিত্ব আবিষ্কারে অবিস্মরণীয় কীর্তি। নামানুসারে জীবদেহের মৃদু তড়িৎ-প্রবাহ 'গ্যালভানি প্রবাহ' নামে খ্যাত।

গ্যাল্ভ্যানোমিটার (galvanometer) — সামান্য তড়িৎ-প্রবাহের অস্তিত্ব নির্দেশক এক প্রকার বৈদ্যুতিক যন্ত্র। সাধারণ গ্যালভ্যানোমিটারে লম্বভাবে দণ্ডায়মান একটা বৃত্তাকার স্কেলের উপরে একটা কাঁটা ঘুরে তড়িৎ-প্রবাহ নির্দেশ করে। বস্তুতঃ তড়িৎ-চুম্বকীয় শক্তির প্রভাবেই এরূপ হয়ে থাকে। বিশেষ ধরনের গ্যাল্ভ্যানোমিটারে চৌম্বক-

ক্ষেত্রের প্রভাবে ঘূর্ণায়মান ওই সূক্ষ্ম কাঁটাটির সঙ্গে অতি ক্ষুদ্র একখানা দর্পণ সংলগ্ন থাকে। অতি সামান্য তড়িৎ-প্রবাহের ফলেও ওই দর্পণে প্রতিফলিত আলোক-রশ্মি পরিবর্ধিত কোণে ঘুরে অতি সামান্য তড়িতের অস্তিত্বও জ্ঞাপন করতে পারে। গ্যাল্‌ভ্যানো-মিটারে সাধারণতঃ তড়িৎ-শক্তির অতি ক্ষীণ প্রবাহ নির্দেশ করে মাত্র, অ্যাম্‌-মিটারের ↑ মত এ-দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহের পরিমাণ মাপা সম্ভব হয় না।
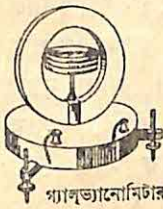
গ্যালভ্যানোমিটার

গ্যালাক্টোস (galactose) — দুগ্ধ-শর্করার প্রধান উপাদান। প্রাণিদুগ্ধে বর্তমান মোট শর্করার (সুগার অব মিল্ক ↑) প্রায় অর্ধাংশ হলো এই গ্যালাক্টোস। মানুষের মস্তিষ্কে ও উদ্ভিদদেহেও এই রাসায়নিক পদার্থটা সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়।

গ্যালাক্সি (galaxy) — ছায়াপথ; মহাশূন্যে অসংখ্য নক্ষত্র ও জ্যোতিষ্ক-রাজীর নিকট সমাবেশে গঠিত পরি-মণ্ডল। সহস্র সহস্র আলোক-বর্ষ ↑ দূরে মহাশূন্যে এরূপ অগণিত গ্যালাক্সি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রয়েছে। আমাদের সৌর পরিবার ও দৃষ্ট-অদৃষ্ট নক্ষত্ররাজি এরূপ বিভিন্ন ছায়াপথের অন্তর্গত। এরূপ জ্যোতিষ্ক সমাবেশকে কখন-কখন আবার 'মিল্‌কি-ওয়ে' ↑ বলে।

গ্যালিলিও (Galileo), গেলিলি — ইটালীয় বিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিদ; তৎকালে অভূতপূর্ব প্রতিভাবান। ফ্লোরেন্সে জন্ম 1564 খৃঃ, মৃত্যু 1642 খৃঃ। পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপনা-কালে জ্যোতির্বিজ্ঞানে বৈপ্লবিক মতবাদের জন্য কর্মচ্যুতি। পেডুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে বহু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার; গগন পর্যবেক্ষণের উপযোগী নূতন দূরবীক্ষণ যন্ত্র উদ্ভাবন। কোপার্নিকাসের ↑ প্রবর্তিত সূর্য-কেন্দ্রিক বিশ্বের মতবাদ সমর্থন; বৃহস্পতি গ্রহের একাধিক উপগ্রহ, সৌরকলঙ্ক, সূর্যের আবর্তন প্রভৃতি নূতন-নূতন বহু তথ্যাবিষ্কার। পৃথিবী-কেন্দ্রিক বিশ্ব সম্বন্ধে বাইবেলের উক্তির বিরুদ্ধতার অভিযোগে বৃদ্ধ বয়সে পোপের আদেশে রোমে কারা-রুদ্ধ। প্রচলিত ধর্মভাবের অনুরোধে ও বন্ধুবর্গের পরামর্শে অগত্যা সখেদে 'সূর্যই পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে' টলেমির ↑ এই ভ্রান্ত মতবাদে স্বীকৃতি দিয়ে নিষ্কৃতি লাভ ও স্বদেশে প্রত্যা-বর্তন। শেষ জীবনে সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন।

পিসার গির্জায় দোলায়মান বাতি লক্ষ্য করে যৌবনেই দোলক-যন্ত্রের (পেণ্ডুলাম ↑) কালানুপাত সূত্র আবিষ্কার। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কার্যকারিতা, চৌম্বক শক্তির ব্যাখ্যা, তাপমান যন্ত্র উদ্ভাবন প্রভৃতি বহু মূল্যবান অবদান। এক কথায় গ্যা-লিলিও ছিলেন সে-যুগের জ্ঞানধারার বহু অগ্রগামী প্রতিভাবান পণ্ডিত; বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক বিরাট বিস্ময়।

গ্যালিলিও টেলিস্কোপ (Galileo telescope)—সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইটালীয় বিজ্ঞানী গ্যালিলিও ↑

ওারের) মধ্যে কোল-গ্যাস ↑ ও বায়ুর সংমিশ্রণে মৃদু দহন-ক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত গ্যাসীয় চাপ-শক্তির নিয়ন্ত্রণে এই শ্রেণীর ইঞ্জিন চলে। 1870 খৃঃ কোল-গ্যাসের ↑ সাহায্যে প্রথম আবিষ্কৃত হয়। ক্রমে নানারূপ উন্নতি ঘটেছে ; নিকোলাস অটো নামক এক যন্ত্রবিদ্ চার-পর্যায়ের (4-Stroke, অর্থাৎ গ্যাসীয় মিশ্রণের পর্যায়ক্রমিক আংশিক দহনের প্রতি বিস্ফোরণে ইঞ্জিনের পিস্টনটা চার বার ওঠা-নামা করে) বিশেষ গ্যাস-ইঞ্জিন উদ্ভাবন করেন। সর্বশেষে 1936 খৃঃ **গ্যাস টার্বাইন** ↑ চালিত ইঞ্জিন উদ্ভাবিত হয়েছে।

গ্যাস-কার্বন (gas-carbon) — কোল-গ্যাস ↑ উৎপাদনের জন্যে যে সুবৃহৎ বক-যন্ত্রে (রেটর্ট ↑) অন্তর্ধূম পাতন প্রক্রিয়ায় কয়লা চোলাই করা হয়, তার গায়ে এক রকম বিশুদ্ধ কার্বন (কয়লা) জমে থাকে ; একেই গ্যাস-কার্বন বলে। এরূপ বিশুদ্ধ কার্বন একটা উৎকৃষ্ট তড়িৎ-পরিবাহী পদার্থ ; এ-দিয়ে সাধারণতঃ বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদির ইলেক্‌ট্রোড ↑ তৈরী করা হয়।

গ্যাস গ্যাংগ্রিন (gas gangrene)— বিশেষ এক প্রকার নালী-ঘা (গ্যাং-গ্রিন ↑), যাতে জীবাণুরা ক্ষতের ভিতরে গ্যাস সৃষ্টি করে এবং ক্ষত-স্থান স্ফীত হয়ে উঠে ভিতরে-ভিতরে পচন ধরে।

গ্যাস মাস্ক (gas-mask) — গ্যাস-মুখোস ; যুদ্ধক্ষেত্রে বিষাক্ত গ্যাস ও ধূম থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে সৈনি-কেরা যে বিশেষ এক প্রকার মুখোস পরে। শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে এর ছিদ্র-পথে কার্বনের গুঁড়ার একটা স্তর ও তার গায়ে একটা ফিল্টার-প্যাড থাকে। এর ভিতর দিয়ে বায়ু চলাচল করতে পারে, কিন্তু ভারী বিষাক্ত গ্যাস ও ধূম আটকে যায়। বায়ু, কার্বন-মনক্সাইড, কোল-গ্যাস ↑ প্রভৃতি হাল্‌কা বলে এতে তেমন আটকায় না। কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত রাসায়নিক ভারী বিষাক্ত গ্যাসগুলো থেকেই এরূপ মাস্কের ব্যবহারকারীরা রক্ষা পেয়ে থাকে।

গ্যাস ম্যাণ্টেল (gas-mantle) — গ্যাস লাইটে যে জালি-আবরণটা প্রদীপ্ত হয়ে আলো দেয়। সিল্ক জাতীয় সূতায় বোনা এই জালি প্রায় 99% থোরিয়াম অক্সাইড ও 1% সিরিয়াম অক্সাইডের সংমিশ্রণের প্রক্রিয়ায় অদাহ্য হয়ে পড়ে এবং ওই দুটি ধাতব পদার্থের সূক্ষ্ম কণিকাগুলো প্রদীপ্ত হয়েই আলো ছড়ায়। বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্যে জালিটাকে এরূপ অদাহ্য ও দীপ্তিক্ষম করা হয়ে থাকে।

গ্যাসোমিটার (gasometer) — গ্যাস-সরবরাহ কেন্দ্রে প্রচুর পরিমাণ গ্যাস সঞ্চয় ও সংরক্ষণের উপযোগী বিশেষ ধরনের এক রকম আধার। সাধারণ গ্যাসোমিটার হলো, ইষ্টক ও সিমেণ্টের তৈরী প্রকাণ্ড পাত-কুঁয়ার মত একটা জলপূর্ণ আধার, যার মধ্যে ধাতব পাতে-তৈরী একটা প্রকাণ্ড ড্রাম উল্টে ভাসমান রাখা হয়। উৎপাদিত গ্যাসকে নলপথে ওই জলপূর্ণ আধারে প্রবেশ করালে জল

অপসারিত হয়ে ড্রামের ভিতরে গ্যাস জমতে থাকে; আর আবদ্ধ গ্যাসের চাপে ড্রামটা ক্রমে জলের উপরে ভেসে ওঠে। প্রয়োজন অনুসারে ওই সঞ্চিত গ্যাস পৃথক নলপথে নিয়ে না না কাজে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। আবদ্ধ গ্যাস বেরিয়ে যেতে ড্রামটা আবার ক্রমে-ক্রমে জলে নিমজ্জিত হয়ে পূর্বাবস্থানে নীচে নেমে আসে।
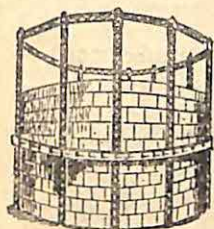
সাধারণ গ্যাসোমিটার

গ্যাসোলিন (gasoline) — খনিজ তৈল; পেট্রল ↑, মোটর - স্পিরিট প্রভৃতি প্রচুর গ্যাসোৎপাদক হাল্‌কা খনিজ তেলের বিশেষ নাম। বস্তুতঃ পেট্রোলিয়াম ↑ থেকে প্রাপ্ত বর্ণহীন উদ্বায়ী সকল দাহ্য তরল পদার্থ।

গ্যাষ্ট্রাইটিস (gastritis) — পাকস্থলীর প্রদাহ-জনিত রোগ বিশেষ। সাধারণতঃ অত্যধিক মদ্যপান, দীর্ঘ কাল বিশেষ গুরুপাক খাদ্যাদি ভোজনের অভ্যাস, প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে অনেকের এ-রোগ জন্মায়। **গ্যাস্ট্রো, গ্যাস্ট্রিক** মানে পাকস্থলী সম্বন্ধীয়; যেমন, **গ্যাস্ট্রিক আল্‌সার** (gastric ulcer) পাকস্থলীর ক্ষত-রোগ।

গ্যাষ্ট্রোপোডা (gastropoda) — শামুক জাতীয় যে-সব প্রাণী দেহাভ্যন্তরস্থ পাকস্থলী - সংলগ্ন নরম এক রকম মাংসপেশী খোলসের মুখে বিস্তার করে' তার সংকোচন প্রসারণের দ্বারা চলাফেরা করে, এবং আঠালো রসসিক্ত ওই মাংসপেশীর সাহায্যে খাড়া অবলম্বন-স্থানেও লেপ্‌টে থাকতে ও চলতে পারে।

গ্যাষ্ট্রোপোডা

গ্র্যাম (gram/-me) — সি. জি. এস. সিষ্টেমে ↑ পদার্থের ওজন পরিমাপের মৌলিক একক বিশেষ; 4° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় এক ঘন সেন্টিমিটার (সি. সি.) ↑ বিশুদ্ধ জলের ওজনের প্রায় সমান। 1000 গ্র্যাম = এক কিলো-গ্র্যাম।

গ্র্যাম-অ্যাটম (gram-atom) — গ্র্যাম এককে মৌলিক পদার্থগুলোর পারমাণবিক ওজন-পরিমাণ; যেমন, গন্ধকের (সালফার ↑) গ্র্যাম-অ্যাটম, অর্থাৎ গ্র্যাম-অ্যাটমিক ওয়েট হলো 32·066 গ্র্যাম।

গ্র্যাম ইকুইভ্যালাণ্ট (gram-equivalent — কোন মৌলিক পদার্থের যত গ্র্যামের ↑ সঙ্গে এক গ্র্যাম হাইড্রোজেন, বা আট গ্র্যাম অক্সিজেনের রাসায়নিক মিলন ঘটতে পারে, সেই গ্র্যাম-সংখ্যাকে ঐ মৌলিক পদার্থের গ্র্যা. ই. বলে। একে অনেক সময় মৌলিক পদার্থের **ইকুইভ্যালাণ্ট ওয়েট**-ও বলা হয়।

গ্র্যাম-ক্যালোরি (gram-calorie) — এক গ্র্যাম ↑ বিশুদ্ধ জলের উষ্ণতা 14·5° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ↑ থেকে 15·5° সেন্টিগ্রেডে উন্নীত করতে যতটা তাপ-শক্তির (হিট, heat ↑) প্রয়োজন

হয়। এটা তাপ-শক্তির একটা একক বিশেষ। (ক্যালোরি ↑)

গ্র্যাম-মলিকিউল (gram molecule) — গ্র্যাম এককে কোন রাসায়নিক যৌগিক পদার্থের আণবিক ওজন। একে অনেক সময় **মোল**-ও বলা হয়। যেমন, জলের (H_2O) মোল, বা গ্র্যাম-মলিকিউল হলো 18 গ্র্যাম।

গ্র্যামিনিভোরাস (graminivorous) — তৃণভোজী ; যে-সব প্রাণী ঘাস খেয়ে জীবন ধারণ করে। 'গ্র্যামিনি' মানে ঘাস, বা তৃণ।

গ্র্যানাইট (granite) — মোটা দানাযুক্ত সু-কঠিন এক শ্রেণীর প্রস্তর বিশেষ। গ্রানাইট শ্রেণীর ফেলস্পার ↑, কোয়ার্জ ↑ প্রভৃতি পাথরে সাধারণতঃ সামান্য কিছু অভ্র (মাইকা ↑) মিশ্রিত থাকে। গ্র্যানাইট পাথরের ঘর্ষণে আগুন জলে ওঠে ; এ-জন্যে একে সাধারণ কথায় বলে 'চক্‌মকি পাথর'।

গ্র্যাফাইট (graphite) — কার্বন জাতীয় পিচ্ছিল পদার্থ ; কার্বনের একটা অ্যালোট্রোপ ↑। একে **ব্ল্যাক লেড**, বা **প্লাম্বাগো**-ও বলা হয়। আমরা যাকে লেড-পেন্সিল বলি তার শিষ্ গ্র্যাফাইটে তৈরী হয়, লেড (সীসা) নয়। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি তৈরীর কাজে এর যথেষ্ট ব্যবহার আছে।

গ্রাউণ্ড নাট (ground-nut) — চীনা বাদাম ; গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এক প্রকার বর্ষজীবী উদ্ভিদের মূলে কঠিন আবরণযুক্ত যে ফল মাটির নীচে জন্মায়। তৈলাক্ত সুস্বাদু শাঁষ, খাদ্য-মূল্য প্রচুর, নিষ্পেষণে তেল পাওয়া যায়। ছিব্‌ড়ার প্রোটিন উপাদান দিয়ে 'আর্ডিল' নামক কৃত্রিম সূত্র প্রস্তুত হয়, যা রেশম, পশম প্রভৃতির সঙ্গে মিশিয়ে বস্ত্রাদি বোনা হয়।

গ্রাউণ্ড স্পিড (ground-speed) — প্রতিকূল বায়ু-প্রবাহের গতি প্রতিহত করে যে আপেক্ষিক গতিতে এরোপ্লেন উর্ধাকাশে সঞ্চরণ করে ; যেমন — প্রতিকূল বায়ুর গতি ঘণ্টায় 30 মাইল এবং এরোপ্লেনের নিজস্ব যান্ত্রিক গতি ঘণ্টায় 200 মাইল হলে তার গ্রা. স্পি. হবে ঘণ্টায় 170 মাইল।

গ্রাউণ্ড-রে (ground-ray) — যে-সব রেডিও-তরঙ্গ স্টেশনের প্রেরক-যন্ত্র থেকে বেরিয়ে সোজাসুজি গ্রাহক-যন্ত্রে গিয়ে পৌঁছায় ; প্রবাহের পথে উচ্চাকাশের বায়ুস্তরের কোথাও প্রতিফলিত হয়ে নিম্নমুখী দিক পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না (হেভিসাইড কেনেলি লেয়ার ↑)। অল্প দূরত্বের স্থানেই এরূপ বেতার-তরঙ্গ প্রেরণ করা সম্ভব। এরূপ বেতার-তরঙ্গকে **গ্রাউণ্ড ওয়েভ**-ও বলা হয়।

গ্র্যাণ্ড মল (grand mal) — এপিলেপ্‌সি, অর্থাৎ মৃগী-রোগের বিশেষ কঠিন, বা দুরারোগ্য প্রকার-ভেদ। সাধারণ মৃগী-রোগকে বলা হয় **পেটিট মল** (petit mal)।

গ্র্যাভিটেশন (gravitation) — অভিকর্ষণ শক্তি। পার্থিব সকল বস্তুকেই পৃথিবী অবিরত তার কেন্দ্রের দিকে টানছে ; পৃথিবীর এই আকর্ষণ-শক্তির ফলেই গাছের ফল মাটিতে পড়ে। একেই বলা হয় **'ফোর্স অব**

গ্র্যাভিটি'; বাংলায়, বলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। কোন বস্তুর ওজন হলো তার উপরে পৃথিবীর এই টান, বা মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির পরিমাণ। কেবল পৃথিবী নয়, বস্তুতঃ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সকল গ্রহ-নক্ষত্রাদি পরস্পর পরস্পরকে টানছে, একে বলা হয় অভিকর্ষণ শক্তি, বা **'ফোর্স অব গ্র্যাভিটেশন'**। বিভিন্ন গ্রহাদির মধ্যে এই অভিকর্ষণ শক্তি সম্পর্কে বিজ্ঞানী নিউটনের সূত্র (ল অব গ্র্যাভিটেশন) হলো এই যে, বিভিন্ন গ্রহের পারস্পরিক আকর্ষণ-শক্তির পরিমাণ তাদের বস্তুভর (মাস ↑) ও দূরত্ব-ব্যবধানের উপর নির্ভর করে ; এবং তা তাদের পরস্পরের ভরের গুণফলের সমানুপাতিক, আর দূরত্বের বর্গফলের বিপরীত (ব্যস্ত) আনুপাতিক হয়ে থাকে।

গ্র্যাভিটেশন্যাল ইউনিট (gravitational unit)— গ্র্যাম ↑ , পাউণ্ড ↑ প্রভৃতি হলো বস্তুর ওজন পরিমাপের একক ; এই এককে বস্তুর ওজন (ওয়েট ↑), অর্থাৎ তার উপরে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের (ফোর্স অব গ্রাভিটি ↑) পরিমাণ বুঝায়। কাজেই বস্তুর ওজনের এই একক-পরিমাণ ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে পরিবর্তনশীল এবং এদের গ্র্যা. ই. বলে। পক্ষান্তরে ডাইন ↑ এবং পাউণ্ড্যাল ↑ গ্র্যাভিটেশন্যাল ইউনিট নয় ; এর কারণ, শেষোক্ত এককগুলি বস্তুতে সঞ্জাত শক্তির একক (unit of force) বুঝায়, বস্তুর ওজনের উপরে নির্ভরশীল নয়। ভূ-তলে, বা আকাশে, পৃথিবীতে, বা চাঁদে সর্বত্র এদের পরিমাণ সমান থাকে।

গ্রাভিমেট্রিক অ্যানালিসিস gravimetric analysis) — মাত্রিক বিশ্লেষণ। কোন যৌগিক পদার্থের রাসায়নিক বিশ্লেষণের যে পদ্ধতিতে সংগঠক উপাদানগুলির শতাংশিক ওজন-পরিমাণ নির্ধারিত হয়ে থাকে। (অ্যানালিসিস ↑)।

গ্রাহাম বেল (Graham Bell) — প্রখ্যাত পদার্থ-বিজ্ঞানী ও যন্ত্রবিদ্ ; জন্ম স্কটল্যাণ্ডে 1847 খৃষ্টাব্দ, মৃত্যু 1922 খৃষ্টাব্দ। টেলিফোন যন্ত্রের আবিষ্কর্তা ; মাত্র 29 বছর বয়সে 1876 খৃঃ 10 মে তারিখে সর্ব প্রথম টেলিফোনের ↑ যান্ত্রিক কৌশল জনসমক্ষে প্রদর্শন করেন। বধিরদের জন্য 'অডিওমিটার' যন্ত্র, ফোনোগ্রাফের ↑ রেকর্ড, ইণ্ডাক্সন ব্যালান্স প্রভৃতি উদ্ভাবন ; ব্যোমযান সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা।

গ্রাহাম্‌স ল অব ডিফিউসন (Graham's law of diffusion)— ডিফিউসন মানে অনুপ্রবেশ ; কোন গ্যাসীয় (বা তরল) পদার্থ অপর কোন গ্যাসীয় (বা তরল) পদার্থের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে পরস্পরের ঘনত্বের সমতা সাধন করতে চায়। গ্যাস ও তরল পদার্থের এরূপ মিশ্রণের, বা অনুপ্রবেশের স্বাভাবিক প্রবণতাকে বলে 'ডিফিউসন'। কোন হাল্‌কা গ্যাস বায়ু-মধ্যে অধিকতর দ্রুত অনুপ্রবেশ করে, অর্থাৎ ছড়িয়ে যায় ; কিন্তু ভারী

গ্যাস ছড়ায় ধীরে ধীরে। এ সম্পর্কে বিজ্ঞানী গ্রাহামের সূত্র হলোঃ কোন গ্যাসের মধ্যে অপর কোন গ্যাসের অনুপ্রবেশের গতি হবে তার ঘনত্বের বর্গমূলের সঙ্গে বিপরীত, বা ব্যস্ত আনুপাতিক(ইন্‌ভার্স প্রোপোরসন ↑) হারে ; যেমন — অক্সিজেন গ্যাসের ঘনত্ব (ডেন্সিটি ↑) হাইড্রোজেনের 16 গুণ ; সুতরাং অক্সিজেন গ্যাস হাইড্রোজেন গ্যাসের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হবে হাইড্রোজেনের ($1/\sqrt{16} = 1/4$) এক-চতুর্থাংশ বেগে।

গ্রিক ফায়ার (Greek fire)—জলের সংস্পর্শে অগ্নি-উৎপাদক এক প্রকার রাসায়নিক মিশ্রণ বিশেষ। এরূপ রাসায়নিক সংমিশ্রণ প্রাচীন গ্রীকগণ নৌ-যুদ্ধে ব্যবহার করতো বলে এই নাম। সংমিশ্রণটা জলের সংস্পর্শে এলেই জ্বলে উঠতো। সম্ভবতঃ এটা গন্ধক, ন্যাপ্‌থা ↑, চুন (কুইক লাইম ↑) প্রভৃতি মিশিয়ে তৈরী এক প্রকার আগুনে-বোমা ছিল।

গ্রিন ভিট্রিয়ল (green vitriol)—ফেরাস্ সাল্‌ফেট ; লোহার সঙ্গে মৃদু সাল্‌ফিউরিক ↑ অ্যাসিডের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উৎপন্ন সাল্‌ফেট সল্টের বিশেষ নাম। জলের 7-টি অণুসহ স্ফটিকাকার পদার্থ, সবুজ বর্ণ ; রাসায়নিক সূত্র $FeSO_4 . 7H_2O$; বাংলায় বলে 'হিরাকস'।

গ্রিনউইচ টাইম (Greenwichtime) —আন্তর্জাতিক প্রমাণ-কাল। পৃথিবীর আবর্তন-হেতু ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন স্থানীয় সময়ে সূর্যোদয় হয়। এর ফলে একই ঘড়িতে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন স্থানীয় সময় নির্দেশ করে। এজন্য সারা পৃথিবীতে আনুপাতিক সঠিক সময় নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডের গ্রিনউইচ সহরের স্থানীয় সময়কে প্রামাণ্য (মূল) সময় (স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম) ধরা হয়। গ্রিনউইচকে 0° ডিগ্রি লঙ্গিচিউডে ↑ অবস্থিত বলে ধরা হয়েছে (প্রাইম মেরিডিয়ান ↑)। এই 'গ্রিনউইচ সময়' পেলে পৃথিবীর যে-কোন স্থানের প্রামাণ্য সময় (স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম ↑) দ্রাঘিমার (লঙ্গিচিউড ↑) ব্যবধান অনুযায়ী হিসাব করে বার করা যেতে পারে।

গ্রেন (grain) — ইংলণ্ডীয় ওজনের একক বিশেষ। এক পাউণ্ডের 7000 ভাগের এক ভাগ ; = ·0648 গ্র্যাম।

গ্রেট সার্কেল (great circle)—কোন গোলকের কেন্দ্র ভেদ করে সমতলভাবে কেটে ফেললে যে বৃত্তরেখা সৃষ্টি হয়ে থাকে। ভূ-গোলকের এরূপ গ্রেট সার্কেল হলো

বিষুব-রৈখিক বৃত্ত (ইকোয়েটর ↑), বা যে-কোন দ্রাঘিমা বরাবর বৃত্তরেখা। ভূ-পৃষ্ঠের যে-কোন গ্রেট সার্কেলের দুইটি বিন্দুর সংযোজক সরল রেখা, অর্থাৎ তার কোন আর্ক ↑ -কে বলা হয় **জিয়োডিসিক** ↑ লাইন।

গ্রেপ সুগার (grape sugar) — গ্লুকোজ ↑।
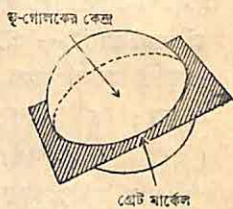
গ্লবার্স সল্ট (Glauber's salt) — সোডিয়াম সাল্‌ফেট ; যাকে সাধারণভাবে সোডা-সাল্‌ফ বলে। স্ফটিকাকার পদার্থ, রাসায়নিক সূত্র Na_2SO_4 $10H_2O$ (ওয়াটার অব ক্রুস্ট্যালিজেসন ↑), একটা বিরেচক পদার্থ ; জোলাপ হিসেবে ঔষধরূপে অনেক সময় ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

গ্লটিস (glottis) — স্বর-নালীর ছিদ্র-পথ ; শব্দ উৎপাদনের জন্য যে সূত্রগুলি কম্পিত হয় তাদের মধ্যবর্তী নল-পথ ; যা উচ্চগ্রামের শব্দ উৎপাদনের সময় অপেক্ষাকৃত সরু ও কিছু খাওয়ার সময় সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। (এপিগ্লটিস ↑)

গ্লুকোমা (glaucoma)—চোখের এক প্রকার রোগ বিশেষ ; চক্ষু-গোলকের অভ্যন্তরে অত্যধিক জল সঞ্চিত হয়ে তার অতিরিক্ত চাপের ফলে সাধারণতঃ এ-রোগ জন্মায়।

গ্ল্যাণ্ড (gland)—জৈব গ্রন্থি ; জীবের দেহাভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন জৈব উপাঙ্গ, বা ক্ষুদ্র জৈবাধার। এ-গুলি থেকে দেহের

গ্ল্যাণ্ড
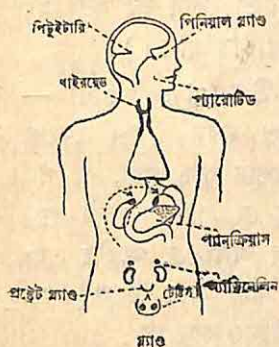
বিশেষ বিশেষ গ্ল্যাণ্ডের পরিচয়

স্বাভাবিক পুষ্টি, বৃদ্ধি ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য রক্ষার উপযোগী জটিল গঠনের বিভিন্ন জৈব রস (হর্মোন ↑) নিঃসৃত হয়। জীব-দেহের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের উত্তেজক ও নিয়ন্ত্রক এরূপ বিভিন্ন হর্মোন, বা উত্তেজক রস নিঃসরণের জন্যে দেহে দু'রকম গ্ল্যাণ্ড আছে— অন্তঃস্রাবী ও বহিঃস্রাবী। প্যান্‌ক্রিয়াস ↑, থাইরয়েড ↑, অ্যাড্রিনেলিন ↑, পিটুইটারি ↑ প্রভৃতি হলো অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি (এণ্ডোক্রাইন গ্ল্যাণ্ড ↑); আর শুক্র, দুগ্ধ, ঘর্ম প্রভৃতি নিঃসরণের জন্যে আছে বিভিন্ন বহিঃস্রাবী গ্রন্থি। লিম্‌ফেটিক গ্রন্থিগুলির মাধ্যমে রক্ত-রসও (লিম্‌প ↑) পরিস্রুত হয়ে গিয়ে রক্তস্রোতে মেশে। আর অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিগুলির অভ্যন্তরে বিভিন্ন হর্মোন উৎপন্ন হয় ; যেগুলির বহির্নিঃসরণ নেই, ভিতরে-ভিতরে রক্ত-স্রোতের সঙ্গে মিশে গিয়ে দেহের বিভিন্ন জৈব ক্রিয়া সম্পন্ন করে।

গ্লাইওমা (glioma) — বিশেষতঃ মস্তিষ্কের, কখন-কখন বা মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে উদ্ভূত বিভিন্ন প্রকার দুষ্ট স্ফোটক। যে-কোন অঙ্গের স্ফীতিজনিত রোগেকে সাধারণভাবে বলা হয় — ওমা (-oma) ↑।

গ্লাইকল (glycol)—বিভিন্ন অনুপাতে কার্বন ও হাইড্রোজেন পরমাণুর মিলনে বিভিন্ন হাইড্রোকার্বন ↑ উৎপন্ন হয়। অ্যালিফেটিক ↑, অথবা প্যারাফিন ↑ শ্রেণীর বিশেষ হাইড্রোকার্বনগুলির সাধারণ রাসায়নিক গঠন হলো $CH_3 \cdots CH_3$; যেমন — ইথেন ↑ ($CH_3.CH_3$)। এরূপ হাইড্রোকার্বনের অণু গঠনে দুটা হাইড্রোজেন-পরমাণুর

সঙ্গে দুটা হাইড্রক্সিল (OH) গ্রুপ যুক্ত হলে তাদের রাসায়নিক নাম হয় গ্লাইকল; যেমন—ইথিলিন গ্লাইকল ($CH_2OH. CH_2OH$); বর্ণহীন সুমিষ্ট তরল পদার্থ। শীত-প্রধান দেশে মোটর গাড়ীর ইঞ্জিনে ব্যবহৃত জল ঠাণ্ডায় যাতে জমে না যায় তার জন্য জলের সঙ্গে পদার্থটা অনেক সময় মেশানো হয়ে থাকে।

গ্লাইকোসুরিয়া (glycosuria) — কিড্‌নি ↑, বা বৃক্কের বিকলতার ফলে নিঃসৃত মূত্রে শর্করার (সুগার ↑) আধিক্য-জনিত জৈব বিক্রিয়া; এটা বহুমূত্র (ডায়েবেটিস ↑) রোগের প্রথম লক্ষণ বলে ধরা হয়।

গ্লাইসিন (glycine) — অ্যামিনো-অ্যাসিটিক ↑ অ্যাসিড; বিভিন্ন শ্রেণীর প্রোটিন ↑ উপাদানে বিভিন্ন প্রকার অ্যামিনো অ্যাসিড ↑ গঠিত হয়ে থাকে। গ্লাইসিন হলো এই শ্রেণীর সরলতম গঠনের একটি অ্যামিনো-অ্যাসিড; একে **গ্লাইকোকল**-ও বলা হয়।

গ্লাইসিমিয়া (glycemia) — প্রাণি-দেহের রক্তে মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে শর্করা (সুগার ↑) সঞ্চারিত হয়ে যে এক প্রকার ডায়েবিটিস ↑ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়; এটা অবশ্য এক প্রকার রক্ত-দুষ্টির অবস্থা। **হাইপার গ্লাইসিমিয়া** হলো রক্তে অত্যধিক শর্করা, বা গ্লুকোজের ↑ মিশ্রণ-জনিত গুরুতর রক্তদুষ্টি রোগ বিশেষ।

গ্লাইকোজেন (glycogen) — জান্তব শ্বেতসার, (কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট); বিভিন্ন শ্বেতসার জাতীয় পদার্থের সঙ্গে গ্লুকোজের ↑ রাসায়নিক মিলনে প্রাণী-দেহের যকৃৎ ও অন্যান্য স্থানে এরূপ পদার্থ উৎপন্ন হয়। পদার্থটা এক প্রকার জটিল গঠনের হাইড্রো-কার্বন ↑ বিশেষ। প্রাণী-দেহের মাংস-পেশীর মধ্যে এ-পদার্থ যথেষ্ট থাকে।

গ্লাস (glass)—কাঁচ; কঠিন, ভঙ্গুর ও স্বচ্ছ পদার্থ। রাসায়নিক হিসেবে ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম প্রভৃতি ধাতুর সিলিকেট ↑ সল্ট। বালি (সিলিকা ↑), সোডিয়াম কার্বনেট ও কলি চূণ, অর্থাৎ ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড, $Ca(OH)_2$ একসঙ্গে গলিয়ে সাধারণ সোডা-গ্লাস ↑ তৈরী হয়। সোডিয়াম কার্বনেটের বদলে লেড, পটাসিয়াম, বেরিয়াম ↑ প্রভৃতি ধাতুর কার্বনেট দিয়ে, আর সিলিকার বদলে বোরন-অক্সাইড গলিয়ে ক্রাউন গ্লাস ↑, ফ্লিন্ট গ্লাস ↑ প্রভৃতি নানা রকমের কাঁচ তৈরী হয়ে থাকে। উপযুক্ত প্রক্রিয়ায় অ্যানিলিং ↑ করে কাঁচের সহজ-ভঙ্গুরতা দোষ দূর করা হয়ে থাকে (ওয়াটার গ্লাস ↑)।

গ্লাস উল (glass wool) — কাঁচের উত্তপ্ত নরম পিণ্ড থেকে যান্ত্রিক ব্যবস্থায় সূক্ষ্ম সূতা, বা পেঁজা তুলার মত যে পদার্থ তৈরী হয়। অদ্রাব্য বলে অ্যাসিড, ক্ষারীয় দ্রবণ প্রভৃতি এর মধ্য দিয়ে ছেঁকে (ফিল্ট্রেসন ↑) পরিষ্কার করা হয়।

গ্লিসারিন (glycerine) — সিরাপের মত ঘন, মিষ্ট স্বাদযুক্ত তরল পদার্থ; রাসায়নিক সূত্র $CH_2OH. CHOH.$

CH_2OH ; জলে বিশেষ দ্রবণীয়। একে **গ্লিসারল**-ও বলা হয়। বিভিন্ন প্রকার চর্বি ও উদ্ভিজ্জ তেলের মধ্যে ফ্যাটি অ্যাসিডের ↑ সংযোগে গ্লিসারাইড ↑ যৌগ আকারে থাকে। সাবান তৈরীর সময়ে (স্যাফোনিফিকেশন ↑) তেল ও চর্বি থেকে গ্লিসারিন পৃথক হয়ে যায়। প্ল্যাস্টিক ↑, বিভিন্ন বিস্ফোরক পদার্থ, ঔষধ প্রভৃতি নানা জিনিস উৎপাদনের কাজে এর যথেষ্ট ব্যবহার আছে।

গ্লিসারাইড (glyceride) — জৈব ফ্যাটি অ্যাসিডের সঙ্গে গ্লিসারিনের রাসায়নিক সংযোগে গঠিত যৌগিক পদার্থ। গ্লিসারাইড নানা রকম হতে পারে ; এ-গুলো সবই গ্লিসারিনের এস্টার ↑ জাতীয় যৌগ। বস্তুতঃ জান্তব চর্বি ও উদ্ভিজ্জ তেল মাত্রই হলো বিভিন্ন শ্রেণীর গ্লিসারাইড।

গ্লু (glue) — জীবজন্তুর বিশুষ্ক চামড়া, হাড় প্রভৃতি জলে সিদ্ধ করলে যে বিশেষ এক প্রকার আঠালো ক্বাথ (জিলেটিন ↑) পাওয়া যায়। সাধারণ ভাবে অবশ্য যে-কোন আঠালো পদার্থকেই (অ্যাডিসিভ ↑) গ্লু বলা হয়।

গ্লুকোজ (glucose)—শর্করা বিশেষ, $C_6H_{12}O_6$; একে ডেক্স্ট্রোজ ↑, বা গ্রেপ-সুগারও বলা হয়। বর্ণহীন, স্ফটিকাকার, জলে দ্রবণীয়। ফুলের মধু ও সুমিষ্ট ফলে পাওয়া যায়। সাধারণ চিনি ও কার্বোহাইড্রেট ↑ জাতীয় সকল পদার্থই মানুষের দেহাভ্যন্তরে বিপাকীয় ক্রিয়ায় ক্রমে গ্লুকোজে রূপান্তরিত হয় ; আর তারই মৃদু দহনে দেহের তাপ ও শক্তি উপজাত হয়ে থাকে। হাইড্রোলিসিস ↑ প্রক্রিয়ার সাহায্যে শ্বেতসার (স্টার্চ) ও অন্যান্য কার্বোহাইড্রেট পদার্থ থেকে কৃত্রিম উপায়ে আজকাল প্রচুর গ্লুকোজ তৈরী করা হচ্ছে।

গ্লুকোসাইড (glucoside) — গ্লুকোজের বিভিন্ন প্রকার জৈব অ্যাল্‌কালয়েড ↑ যৌগ। এ-গুলির গঠনে গ্লুকোজের ↑ একটা হাইড্রোজেন-পরমাণুর জায়গায় কোন জৈব র‍্যাডিক্যাল ↑ জুড়ে যায় ; পদার্থটা আর শর্করা থাকে না, মিষ্টত্ব হারায়। বিভিন্ন প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদেরা স্বভাবতঃই তাদের দেহের মধ্যে এরূপ রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটায়, আর বিভিন্ন গঠনের গ্লুকোসাইড শ্রেণীর অ্যাল্‌কালয়েড সৃষ্টি হয়। অ্যাস্পিরিন ↑, ডিজিটেলিন, ইণ্ডিক্যান ↑ প্রভৃতি এই শ্রেণীর জৈব পদার্থ।

গ্লুটেন (gluten) — জৈব রাসায়নিক পদার্থ ; বস্তুতঃ ময়দার প্রোটিন ↑ অংশ। কৌশলে বারম্বার ধুয়ে-ধুয়ে ময়দার শ্বেতসার (স্টার্চ ↑) অংশ অপসারিত করলে যে সামান্য কিছু আঠালো পদার্থ অবশিষ্ট থাকে।

গ্লেসিয়ার (glacier) — হিমবাহ ; সমুদ্র-জলে সঞ্চরণশীল বরফ-স্তূপ, বা তুষার-স্তর। হিমপ্রধান অঞ্চলে, বা উচ্চ পর্বতগাত্রে তুষার-পাতের ফলে ক্রমে সঞ্চিত হয়ে যে স্তরীভূত বরফরাশির সৃষ্টি হয় এবং যথেষ্ট ভারী হলে যা সময়-সময় ঢালু পথে নীচে নামে। এই-ই অনেক সময় সমুদ্রে

পড়ে জলস্রোতে ভেসে বেড়ায়, যাকে বলে **আইসবার্গ** (iceberg)।

গ্লেসিয়্যাল অ্যাসিটিক অ্যাসিড (glacial acetic acid) — বিশুদ্ধ অ্যাসিটিক অ্যাসিড ; এর হিমাংক মাত্র 26·8° সেন্টিগ্রেড। এর কম উষ্ণতায় অ্যাসিডটা কঠিন অবস্থায় থাকে ; তখন এটা হয় বর্ণহীন স্ফটিকাকার পদার্থ। 'গ্লেসিয়্যাল' মানে বরফের মত চক্‌চকে কঠিন।

ঘ

ঘোষ (Ghose), স্যার জ্ঞানচন্দ্র — খ্যাতনামা বাঙালী রসায়নবিদ্ ; জন্ম 1894, 14 সেপ্টেম্বর, মৃত্যু 1959, 21 জানুয়ারি। শিক্ষা কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ ; লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ডি. এস-সি। ঢাকা ও পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের অধ্যাপক। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি 1939 খৃষ্টাব্দ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস - চ্যান্সেলর। বিভিন্ন বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর ও ভারতের জাতীয় পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য। ইংরাজ সরকার কর্তৃক 1943 খৃঃ 'নাইট' উপাধিতে এবং ভারতীয় জাতীয় সরকার কর্তৃক 1954 খৃঃ 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিতে ভূষিত। রসায়নের বিভিন্ন তাত্ত্বিক ও কারিগরী গবেষণায় অশেষ কৃতিত্ব অর্জন। শিক্ষা, শিল্প ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য স্মরণীয়।

চ

চক (chalk) — বিশেষ এক শ্রেণীর খনিজ ক্যালসিয়াম কার্বনেট, $CaCO_3$; প্রাচীন যুগের সামুদ্রিক আণুবীক্ষণিক জীবের কঠিন খোলা জমে এর সৃষ্টি হয়েছে ; বাংলায় বলে খড়িমাটি। রাসায়নিক হিসেবে পদার্থটা সাদা এক রকম নরম প্রস্তর বিশেষ। স্কুলের ব্ল্যাকবোর্ডে যে পেন্সিল-চক দিয়ে লেখা হয়, তা সাধারণতঃ ক্যালসিয়াম সালফেটে ($CaSO_4$) তৈরী, এই কার্বনেট চক নয়।

চন্দ্রশেখর (Chandrasekhar), ডাঃ স্ব্রহ্মনম — সুবিখ্যাত ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞ। শিক্ষা মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়। কেম্ব্রিজ ট্রিনিটি কলেজের ফেলো। হার্ভার্ড মানমন্দিরে প্রদত্ত বক্তৃতায় জ্যোতির্বিজ্ঞানে বিশেষ গাণিতিক পাণ্ডিত্যের জন্য আন্তর্জাতিক বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞান সমিতির উচ্চ সম্মান লাভ। আমেরিকায় রাষ্ট্রীয় 'রাসেল লেক্‌চারার' পদে নিযুক্তি ; চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইয়ার্কিন মান-মন্দিরের গবেষক ও সহকারী অধ্যাপক। জ্যোতির্বিজ্ঞানের বহু জটিল গাণিতিক তত্ত্বের সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন।

চাইনিজ হোয়াইট (chinese white) — জিঙ্ক অক্সাইড, ZnO ; সাদা চূর্ণ। পদার্থটা জলে গলে না ; তেলে মিশিয়ে এ দিয়ে সাদা রং তৈরী হয়। বাংলায় বলে 'সবেদা'।

চারকোল (charcoal) — জৈব

পদার্থের পোড়া কয়লা; অবিশুদ্ধ কার্বন ↑ বিশেষ। নানা রকমের চারকোল হয়,—বায়ু-হীন আবদ্ধ অবস্থায় কাঠ পুড়িয়ে হয় 'উড-চারকোল' (কাঠ-কয়লা); আর প্রাণিদেহের হাড়, রক্ত, মাংস ইত্যাদি এভাবে পুড়িয়ে হয় 'অ্যানিম্যাল চারকোল' ↑। সব রকম চারকোলই হয় অত্যন্ত ছিদ্র-বহুল ও হাল্কা। এ-জন্যে পদার্থটা তরল ও বায়বীয় পদার্থ দ্রুত শুষে নেয়। বিভিন্ন জৈব পদার্থের রঙীন জলীয় দ্রব বর্ণহীন করতে বিভিন্ন প্রকার চারকোল উৎকৃষ্ট ফিল্টারের ↑ কাজ করে।

চার্লস-ল (Charl's law) — গ্যাস মাত্রেরই 0° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপে যে-আয়তন থাকে তা প্রতি ডিগ্রি-সেন্টিগ্রেড তাপ-বৃদ্ধিতে 1/273 ভগ্নাংশিক হারে বৃদ্ধি পায়; অবশ্য সেই গ্যাসের চাপ সর্বদা যদি সমান রাখা যায়। এটাই হলো বিজ্ঞানী চার্লসের প্রবর্তিত সম-চাপে গ্যাসীয় তাপ ও আয়তন বৃদ্ধি সম্বন্ধীয় সূত্র (গ্যাস ↑)। অন্য কথায় বলা যায়, অপরিবর্তিত চাপে সব গ্যাসের আয়তনই তার অ্যাব্‌সোলিউট ↑ তাপের সমানুপাতিক হয়ে থাকে।

চায়না ক্লে (china clay)—প্রাকৃতিক অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট, $Al_2O_3 . 2SiO_2 . 2H_2O$; কিছু উত্তপ্ত করলেই পদার্থটার জলীয় উপাদান (ওয়াটার অব ক্রস্ট্যালিজেসন ↑) চলে গিয়ে এর ক্রষ্টাল-গঠন বদলে যায়, অতি সূক্ষ্ম চূর্ণে পরিণত হয়। এ-দিয়ে পোর্সিলিন ↑ তৈরী হয়ে থাকে। পদার্থ টাকে **কেওলিন**-ও বলা হয়।

চিকেন পক্স (chicken pox)—'জল-বসন্ত' রোগ; যাতে সামান্য জ্বরের সঙ্গে প্রায় সর্বাঙ্গে জলপূর্ণ ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র স্ফোটক উদ্ভূত হয়। সংক্রামক জীবাণু-রোগ; কিন্তু মারাত্মক নয়। সাধারণতঃ শিশুদেরই দ্রুত আক্রমণ করে। জল-বসন্তের স্ফোটক সাধারণতঃ বুকে ও পিঠেই বেশি হয় (আর, 'স্মল-পক্স', বা গুঁটি-বসন্তের স্ফোটক বেশি হয় সাধারণতঃ হাতে, পায়ে ও মুখে)।

চিজ (cheese) — জান্তব দুধের দই জীবাণুর প্রভাবে বিশেষ প্রক্রিয়ায় পচিয়ে ও পরে শুকিয়ে প্রস্তুত বিশেষ এক প্রকার প্রোটিন-বহুল খাদ্য বস্তু; খাদ্যমূল্য ও বিশেষ গন্ধের জন্য পাশ্চাত্য দেশে উপাদেয় খাদ্য হিসেবে সমধিক প্রচলিত।

চিন্‌চিলা (chinchilla)—ইঁদুরের মত দেখতে এক রকম ক্ষুদ্র রোমশ প্রাণী; অপেক্ষাকৃত লম্বা পা এবং মোটা লোমশ লেজ বিশিষ্ট। দক্ষিণ আমেরিকায় পাওয়া যায়। এদের সুদৃশ্য নরম লোম উচ্চমূল্যে বিক্রীত হয় এবং মহিলাদের সৌখিন জামায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

চিন্‌চিলা

চিনোপোডিয়াম অয়েল (chenopodium oil) — উদ্ভিজ্জ ভেষজ

তৈল বিশেষ ; কৃমি-রোগ নাশক। অন্ত্রের কৃমি-কীট বিনষ্ট করতে ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

চিলি সল্টপিটার (chili saltpetre) — প্রাকৃতিক অবিশুদ্ধ সোডিয়াম নাইট্রেট, $NaNO_3$; দক্ষিণ আমেরিকার চিলি রাজ্যে পদার্থটা খনিজ আকারে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। অবশ্য সাধারণতঃ সল্টপিটার ↑, বা 'নাইটার' বলতে পটাসিয়াম নাইট্রেট (KNO_3) বুঝায়। (ক্যালিস্ ↑)

চেইন (chain) — দৈর্ঘ্য পরিমাপের একটি ইংলণ্ডীয় একক বিশেষ ; = 100 লিংক, বা 22 গজ ; এক মাইলের 80 ভাগের এক ভাগ।

চেইন (chain), অ্যাটমিক — রাসায়নিক পদার্থের গঠনে পরমাণুগুলো যেভাবে পরস্পরের সঙ্গে সংবদ্ধ থাকে ; এটা যেন পরমাণুদের শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থা। পরমাণুর এই সংযোগ-শৃঙ্খল দু'রকমের হতে পারে,—সারিবদ্ধভাবে, যাকে বলে 'ওপেন চেইন' ; আবার আংটির মত গোল হয়েও তারা জুড়তে পারে, এরূপ হলে বলা হয় 'ক্লোস্ড চেইন'। অ্যালিফেটিক কম্পাউণ্ড ↑ গুলো 'ওপেন চেইন' পরমাণু-শৃঙ্খলে (ভ্যালেন্সি-বণ্ড ↑) গঠিত। বেঞ্জিনের (C_6H_6) পারমাণবিক গঠনে কার্বন ও হাইড্রোজেন-পরমাণুগুলো ক্লোস্ড চেইনে সংবদ্ধ থাকে ; আর বুটেনের ↑ (C_4H_{10}) রাসায়নিক গঠন হলো ওপেন চেইনের একটা দৃষ্টান্ত।
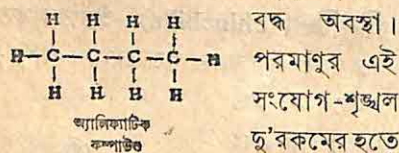
```
H   H   H   H
|   |   |   |
H—C—C—C—C—H
|   |   |   |
H   H   H   H
```

অ্যালিফ্যাটিক কম্পাউণ্ড
'ওপেন চেইন' সংযোগ

চেইন রিঅ্যাকশন (chain reaction) — পরমাণুর কেন্দ্রীণ ভাঙ্গার ধারাবাহিক প্রক্রিয়া ; নিউট্রন ↑ কণিকার ধারাবাহিক দ্রুত সংঘাতে কোন-কোন পদার্থের পরমাণু-কেন্দ্রীণ পর্যায়ক্রমে যেভাবে ভাঙ্গতে থাকে (ফিসন ↑)। অ্যাটম-বোমার প্রচণ্ড ধ্বংসকারী শক্তি এরূপ চেইন রিঅ্যাকশনের ফলেই উদ্ভূত হয়ে থাকে। পরমাণুর কেন্দ্রীণ (নিউক্লিয়াস ↑) বিভাজনের কাজ অতি সামান্য সময়ের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে সংঘটিত হয়ে সমষ্টিগতভাবে প্রচণ্ড পারমাণবিক শক্তির উদ্ভব ঘটায়। পদার্থেয় সংগঠক অগণিত পরমাণুর এরূপ ধারাবাহিক বিভাজন-ক্রিয়াকে বলা হয় 'চেইন রিঅ্যাকশন'।

চেম্বার অ্যাসিড (chamber acid) — 'সীসক প্রকোষ্ঠ' পদ্ধতিতে প্রস্তুত অবিশুদ্ধ সালফিউরিক ↑ অ্যাসিড ; যা সীসার পাতে তৈরী আবদ্ধ প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে সালফার-ডাই-অক্সাইড গ্যাসকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় জারিত করে উৎপাদন করা হয়। এতে বিশুদ্ধ অ্যাসিড থাকে শতকরা 65 ভাগ মাত্র। একে বাংলায় বলা যায় 'প্রকোষ্ঠ অ্যাসিড'। সাধারণ কাজে এই অবিশুদ্ধ সালফিউরিক অ্যাসিডই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

চেঞ্জ অব স্টেট (change of state) — পদার্থের অবস্থান্তর ; পদার্থ মাত্রই কঠিন, তরল ও বায়বীয় এই ত্রিবিধ

অবস্থার যে-কোন একটি অবস্থায় থাকে। উপযুক্ত তাপ ও চাপের প্রভাবে পদার্থের বিভিন্ন অবস্থান্তর ঘটানো যায় ; একেই বলে 'চেঞ্জ অব স্টেট'। তরল জল উপযুক্ত-রূপে ঠাণ্ডা করলে জমে কঠিন বরফে পরিণত হয় ; তা আবার উত্তপ্ত করলে জলীয় বাষ্পে, অর্থাৎ গ্যাসীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। এই হলো জলের 'চেঞ্জ অব স্টেট'। এমন যে কঠিন লোহা, তা-ও অত্যধিক উত্তাপে গলে তরল হয় ; এমন কি, তাপমাত্রা অত্যধিক বৃদ্ধি করতে পারলে তাকে গ্যাসীয় অবস্থায় রূপান্তরিত করাও সম্ভব হতে পারে।

চ্যাসিস (chassis) — মোটর গাড়ী প্রভৃতির নিম্নস্থ লৌহ-কাঠামো ; যার উপরে গাড়ীর যন্ত্রাদি ও প্রকোষ্ঠ সন্নিবিষ্ট হয়ে পূর্ণাঙ্গ গাড়ী তৈরী হয়।

চোক ড্যাম্প (choke damp) — কয়লা খনির অভ্যন্তরস্থ আবদ্ধ বায়ুতে 'ফায়ার ড্যাম্প' ↑ (মিথেন ↑ গ্যাস, CH_4) জ্বলে উঠে বিস্ফোরণ ঘটায়। এর ফলে উৎপন্ন কার্বন মনক্সাইড (CO) ও কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) গ্যাসের সংমিশ্রণকে বলে **আফ্‌টার ড্যাম্প** ↑, যাকে 'চোক ড্যাম্প' ও বলা হয় ; কারণ এই গ্যাসে মানুষের শ্বাসরোধ হয়ে আসে।

জ

জণ্ডিস (jaundice)—কাম্‌লা রোগ ; যকৃতের দোষে রক্ত-স্রোতে পিত্তরস (বাইল ↑) সঞ্চালিত হয়ে ক্রমে দেহের চামড়া এ-রোগে ফ্যাকাসে হলদে হয়ে যায়। আবার, রক্তের লোহিত কণিকাগুলো বিকৃত হয়ে অনেক ক্ষেত্রে হিমোগ্লোবিনের ↑ অভাবেও এ-রোগ হতে পারে।

জলিবোট (jolly boat) — মাল খালাস, বা বোঝাই করবার জন্যে উপকূল ও দূরবর্তী জাহাজের মধ্যে মালপত্র নিয়ে যাতায়াতকারী মনুষ্য-চালিত ছোট জলযান।

জাইগোট (zygote)—স্ত্রী ও পুরুষের যৌন কোষের সংযোগে গর্ভাধারে যে সম্মিলিত প্রজনন-কোষ গঠিত হয় ; নিষিক্ত ডিম্ব-কোষ।

জাইমেস (zymase) — খমির, বা ঈস্টের ↑ মধ্যে বর্তমান যে এঞ্জাইম ↑ শ্রেণীর জৈব পদার্থ শর্করাকে অ্যালকোহলে ↑ পরিণত করে। মূলতঃ এটা একটা প্রোটিন ↑ জাতীয় জৈব পদার্থ। বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক ক্রিয়ায় এই শ্রেণীর পদার্থ, বা জাইমেস ক্যাটালিষ্ট ↑ হিসেবে কাজ করে।

জাইমোজেন (zymogen) — যে-সব জৈব পদার্থ দেহাভ্যন্তরে বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পাদনক্ষম বিভিন্ন এঞ্জাইমে ↑ রূপান্তরিত হয়।

জাইরেশন (gyration) — কোন স্থির অক্ষদণ্ড, বা কেন্দ্রের চারিদিকে কোন বস্তুর ঘূর্ণন, বা পৌনপৌনিক আবর্তনের গতীয় অবস্থা।

জাইরোস্কোপ (gyroscope) —এক রকম যন্ত্র ; প্রকৃতপক্ষে এটা কুম্ভকারের চাকা, অথবা লাট্টুর মত ; একটা অক্ষদণ্ডের চারদিকে ঘূর্ণায়মান একটা ভারী চক্র মাত্র। দণ্ডটাকে

হেলিয়ে-বাঁকিয়ে যে-দিকেই মুখ করে চক্রটাকে ঘুরিয়ে দেওয়া যাক না কেন, অবস্থান - নিরপেক্ষ-ভাবে চক্রসহ দণ্ডটা সর্বদা সেই দিকেই মুখ করে ঘুরতে থাকে।

জাইরেসন

বিশেষ ব্যবস্থায় (সাধারণতঃ তড়িৎপ্রবাহের সাহায্যে) চক্রটা সমভাবে আবর্তিত হতে থাকে ; আর ওই আবর্তিত চক্র-সমেত (যন্ত্রটার পাদ-পীঠ যে-দিকেই ঘুরে, বা বেঁকে যায় না কেন) অক্ষ-দণ্ডটা সর্বদা সেই নির্দিষ্ট-মুখী হয়েই স্থির থাকে। অবশ্য চক্র-টার ঘূর্ণন-বেগ হ্রাস পেলে দণ্ডটার সেই স্থিরাবস্থান-ধর্ম লোপ পায়। ওই ঘূর্ণায়মান চক্রের অক্ষ-দণ্ডের দিক পরিবর্তনের এই নিষ্ক্রিয়-তাকে বলে **জাইরোস্কোপিক ইনার্সিয়া,** 'ঘূর্ণন-জনিত জাড্য'।

নমুনা জাইরোস্কোপ

যন্ত্রটা অতি সাধারণ ; কিন্তু বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর কার্যকারিতা অপরিসীম। এর সাহায্যে চালকহীন এরোপ্লেন, রকেট ↑, টর্পেডো প্রভৃতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অভিষ্ট লক্ষ্য-বস্তুর দিকে সোজা চালিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে।

জাইরো-কম্পাস (gyro-compass) —বিশেষ এক প্রকার দিগ্‌দর্শন যন্ত্র ; যাতে জাইরোস্কোপের ↑ সাহায্যে ভৌগোলিক দিক সহজেই নির্ণীত হয়। সাধারণ কম্পাসের ↑ মত কোন চৌম্বক শলাকা না থাকায় এরূপ কম্পাসে 'ম্যাগ্নেটিক স্টর্ম' ↑ প্রভৃতির জন্যে কখন দিক-নির্ণয়ের কোন অসুবিধা ঘটে না। সাধারণতঃ সমুদ্র-গামী জাহাজে এরূপ 'জাইরো-কম্পাস' ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর ফ্রেমে-আঁটা জাইরোস্কোপের ↑ অক্ষদণ্ডটা ভৌগো-লিক উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত করে তড়িৎ-প্রভাবে চক্রটাকে সমভাবে ঘূর্ণায়মান রাখা হয়। জাহাজ যে দিকেই ঘুরে যাক, অক্ষদণ্ডটা সর্বদা সেই উত্তর-দক্ষিণেই মুখ করে থাকে ; ফলে সহজেই দিক-নির্ণয় করা সম্ভব হয়। যন্ত্রটার ফ্রেমে সংলগ্ন পরস্পর-যুক্ত দু'দিকে পারদ-ভর্তি দুটা পাত্র থাকে ; পৃথিবীর আবর্তনের
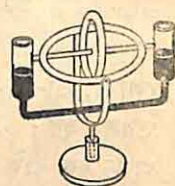
জাইরো-কম্পাস
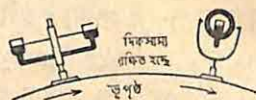
জাইরো-কম্পাসের সংশোধন ব্যবস্থা

ফলে জাইরোস্কোপের অক্ষ-তলের অবস্থানের যে পরিবর্তন ঘটে ওই পারদ এদিকে-ওদিকে প্রয়োজনানুরূপ চলাচল করার ফলে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সর্বদা সংশোধিত হতে থাকে।

জাইরোষ্ট্যাট (gyrostat)—জাইরো-স্কোপের যেরূপ যান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিক্ষুব্ধ সমুদ্রবক্ষে জাহাজ স্থির রাখা যায়। এরূপ যন্ত্রকে আবার কখন-কখন **জাইরোষ্ট্যাবিলাইজার**-ও বলা হয়। জাহাজের তলায় সাধারণতঃ খাড়াভাবে ঘূর্ণায়মান একটা প্রকাণ্ড

জাইরোস্কোপ ↑ চক্র লাগানো হয়। এর ফলে তরঙ্গাঘাতে জাহাজ সহজে তেমন দোলখায় না, জাইরোস্কোপটার খাড়া অক্ষদণ্ডের স্থিরাবস্থানের জন্যে জাহাজটা স্থির থাকে। এ ছাড়া 'মনোরেল সিষ্টেম' (অর্থাৎ একটা মাত্র লাইনের উপরে রেলগাড়ীর চলাচল) এরূপ জাইরোস্ট্যাটের বিশেষ ব্যবহারের ফলেই সম্ভব হয়েছে।
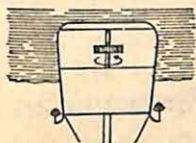
জাইরোষ্ট্যাট

জাইলেম (xylem)—উদ্ভিদের বিভিন্ন কলা-তন্ত্রের (টিস্যু সিস্টেম ↑) সংগঠক কোষগুলির একটি বিশেষ প্রকারভেদ। ফ্লোয়েম ↑ ও জাইলেম নামক দুই প্রকার কোষ-কলার সূক্ষ্ম নালীপথে উদ্ভিদেরা সারা দেহে খাদ্যরসের সংবহন-ক্রিয়া সম্পাদন করে।

জাইলোনাইট (xylonite)—ফটোগ্রাফিক ফিল্ম প্রস্তুতিতে যে বিশেষ শ্রেণীর সেলুলয়েড ↑ (অর্থাৎ সেলুলোজ থেকে প্রস্তুত প্লাস্টিক ↑ পদার্থ) ব্যবহৃত হয়।

জার্মান সিল্ভার (German silver) — সাদা এক রকম সংকর-ধাতু; তামা, দস্তা ও নিকেল ধাতুর সংমিশ্রণে গঠিত। বিভিন্ন অনুপাতে এদের মেশানো হয়ে থাকে; সাধারণতঃ 5 ভাগ তামা, 2 ভাগ দস্তা এবং 2 ভাগ নিকেল মিশিয়ে এই মরিচা-বিহীন ও চক্চকে সাদা সংকর-ধাতুটা তৈরী হয়ে থাকে।

জার্মিসাইড (germicide)—জীবাণুনাশক পদার্থ; যে-সব রাসায়নিক পদার্থের বিভিন্ন জার্ম ↑, বা রোগ-জীবাণু ধ্বংস করবার শক্তি আছে।

জার্মেনিয়াম (germanium) — মৌলিক ধাতু; সাংকেতিক চিহ্ন Ge, পারমাণবিক ওজন 72·6, পারমাণবিক সংখ্যা 32; সাদা ও ভঙ্গুর ধাতব পদার্থ। এই মৌল ধাতুটার বিভিন্নমুখী তড়িৎ-তরঙ্গ নিয়ন্ত্রিত করে একমুখী (পোলারিজেসন ↑) করবার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। ধাতুটার এই বিশেষ ধর্মের জন্যেই এর সাহায্যে অধুনা-আবিষ্কৃত ট্র্যান্জিস্টর ↑ (রেডিও ↑) যন্ত্র তৈরী করা সম্ভব হয়েছে।

জিওডেসি (geodesy) — ভূ-পৃষ্ঠের কোন বিস্তৃত অঞ্চলের যে বিশেষ মানচিত্র ভূ-পৃষ্ঠের বক্রতা, অর্থাৎ গোলত্ব অনুযায়ী দৃষ্টিকোণে (পার্সপেক্টিভ ↑) অঙ্কন করা হয় তাকে বলে **জিওডেটিক ম্যাপ**। এরূপ মানচিত্র অঙ্কনের পদ্ধতি, বা কলাবিদ্যাকে বলে 'জিওডেসি'।

জিওডেটিক লাইন (geodetic line) — কোন বক্রতল জিনিসের উপরিস্থিত যে-কোন দুটি বিন্দুর বক্রতলতা অনুযায়ী অঙ্কিত ক্ষুদ্রতম সংযোজক-রেখা।

জিওগ্রাফি (geography) — ভূগোল বিজ্ঞান; ভূ-পৃষ্ঠের গঠন, অবস্থান, প্রাকৃতিক অবস্থা, জলবায়ু, জীবনধারা প্রভৃতি সম্পর্কীয় আলোচনা-শাস্ত্র। বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত: **ফিজিক্যাল জি.** ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন আঞ্চলিক উচ্চতা, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, মরু অঞ্চল,

অরণ্য প্রভৃতি বিষয়ক আলোচনা; গাণিতিক ভূগোল, বা **ম্যাথ্‌মেটিক্যাল জি.** হলো পৃথিবীর আকার আয়তন, গতি, ঋতু-পরিবর্তন প্রভৃতি বিষয়ক তাত্ত্বিক আলোচনা-বিদ্যা; **ক্লাইমেটোলজি** বিভিন্ন স্থানের উষ্ণতা, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা, জলবায়ু প্রভৃতি বিষয়ক বিজ্ঞান। পৃথিবীর জলভাগ এবং স্থলভাগের আকার-আয়তন, গঠন - বৈশিষ্ট্য ও তার প্রাকৃতিক কারণ প্রভৃতির বিশেষ আলোচনা হয়ে থাকে **জিওমর্ফোলজি** শাখায়। 'মানবিক ভূগোল', বা **হিউম্যান জি.** শাখায় হয় ভূ-পৃষ্ঠের আঞ্চলিক অবস্থা ও গঠন-প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন মানব-গোষ্ঠির দৈহিক ও চারিত্রিক বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যাদির আলোচনা। এ-ছাড়া আবার ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন তথ্যজ্ঞাপক বিশেষ বিশেষ মানচিত্র অঙ্কনের বিদ্যাকে বলা হয় **কার্টোগ্রাফি**।

জিওমর্ফোলজি (geomorphology) — প্রাকৃতিক ভূগোল; জিওগ্রাফি ↑।

জিওমেট্রি (geometry) —জ্যামিতি, বা রেখা-গণিত। বিভিন্নরূপ সরল ও বক্র রেখায় গঠিত বিভিন্ন আকারের ত্রিভুজ, বৃত্ত, ক্ষেত্র, রেখা, কোণ প্রভৃতি বিষয়ক গাণিতিক তথ্যানুসন্ধান-বিদ্যা। অনেকে মনে করেন, প্রাচীন মিশরে গৃহ নির্মাণ ও জমি জরিপ-কার্যে এরূপ রেখা-গণিতের সূত্রপাত হয়েছিল; আবার হয়তো আর্য-যুগের ব্রাহ্মণগণ বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান-ক্ষেত্র রচনার জন্যে ভারতেই এ বিদ্যার চর্চা সুরু করেন। কিন্তু খৃঃ পূঃ 300 অব্দে গ্রীক পণ্ডিত ইউক্লিড-ই সর্ব-প্রথম সুসম্বদ্ধভাবে জ্যামিতি-বিদ্যার চর্চা প্রবর্তন করেন। ক্রমে 'প্লেন জিওমেট্রি' 'সলিড জিওমেট্রি', 'কনিক সেকসন,' কো-অর্ডিনেট জিওমেট্রি প্রভৃতি বিভিন্ন শাখায় এ-বিদ্যার নানা জটিল তথ্যাদির বিভিন্ন রূপ গাণিতিক চর্চা প্রবর্তিত হয়েছে।

জিওমেট্রিক প্রোগ্রেসন (geometric progression) — গাণিতিক হিসাবের একটি পদ্ধতি; সংক্ষেপে বলা হয় জি.পি.। যে-সব রাশি-মালার পরবর্তী রাশি পূর্ববর্তী রাশির একটি নির্দিষ্ট গুণিতক হয়, অর্থাৎ পূর্ববর্তীটিকে কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে পরবর্তী সংখ্যাটি পাওয়া যায়, যেমন—3, 9, 27, 81 প্রভৃতি। এরূপ রাশি-মালাকে বলে জ্যামিতিক ক্রমবর্ধমান রাশি-মালা; সংক্ষেপে 'জি. প্রো'। উল্লিখিত রাশিমালায় নির্দিষ্ট গুণিতক, অর্থাৎ সাধারণ অনুপাত হলো 3। যদি এরূপ রাশি-মালায় n সংখ্যক রাশি থাকে, প্রথম রাশি a, সাধারণ অনুপাত r, এবং শেষ রাশি L ধরা হয়; তাহলে এরূপ রাশি-মালার সমষ্টির গাণিতিক সূত্র হবে $S = a(r^n - L)/(r - L)$ এবং শেষ রাশি L হবে $a \times r^{n-1}$।

জিওলাইট (geolite) — খনিজ 'ক্যা ল সি য়া ম-অ্যা লু মি নি য়া ম সিলিকেট' (সামান্য সোডিয়াম ও পটাসিয়াম মিশ্রিত)। পদার্থটার খর

জল কোমলায়নের বিশেষ ক্ষমতা আছে। আজকাল খর-জল (হার্ড-ওয়াটার ↑) কোমল করবার জন্যে ব্যবহৃত অন্যান্য পদার্থকেও সাধারণভাবে অনেক সময় 'জিওলাইট' বলা হয়।

জিওলজি (geology) — ভূ-বিদ্যা ; ভূ-স্তরের মাটি, পাথর, বিভিন্ন খনিজ সম্পদ প্রভৃতি সহ পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগের অবস্থা, প্রকৃতি, গঠন প্রভৃতি সম্বন্ধীয় তথ্যাদি বিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচিত হয়ে থাকে।

জিঙ্ক (zinc) — দস্তা ; মৌলিক ধাতু। পারমাণবিক ওজন 65·38, পারমাণবিক সংখ্যা 30, সাংকেতিক চিহ্ন Zn; নীলাভ সাদা কঠিন পদার্থ। সচরাচর এর খনিজ কার্বনেট (ক্যালামাইন, $ZnCO_3$) ও সাল্‌ফাইড (জিঙ্ক ব্লেণ্ড, ZnS) থেকেই ধাতুটা নিষ্কাশিত হয়ে থাকে। পিতল (ব্রাস ↑) প্রভৃতি সংকর-ধাতু তৈরী ও লোহার জিনিস গ্যাল্‌ভ্যানাইজ ↑ করতে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়।

জিঙ্ক ব্লেণ্ড (zinc blende — প্রাকৃতিক 'জিঙ্ক সালফাইড', ZnS ; এই অবিশুদ্ধ খনিজ পদার্থ থেকেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে জিঙ্ক ধাতু নিষ্কাশিত হয়ে থাকে।

জিন (gene) — জীবের বংশানুক্রমের মূল কণিকা। জীব কোষের (সেল ↑) কেন্দ্রীণের মধ্যে থাকে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র সূত্রাকার ক্রোমোসোম ↑ ; এই ক্রোমোসোমের সংগঠক এক-একটি সূক্ষ্ম কণিকাকে বলে জিন। বিভিন্ন জাতীয় জীবের দেহ-কোষে বিভিন্ন নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে। এই ক্রোমোসোমের সংখ্যা ও গঠন-বিন্যাসের তারতম্যেই বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর জৈবিক পার্থক্য ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়। অতি ক্ষুদ্র দানার মত কতকগুলো জিন-কণিকা মালার মত সূত্রাকারে গ্রথিত হয়েই এক-একটি ক্রোমোসোম গঠিত। এর প্রত্যেকটি জিনে জীবের দেহ ও মনের এক-একটি বৈশিষ্ট্য নিহিত থাকে। এ-রকম বিভিন্ন জিনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য মিলিত হয়ে সমষ্টিগতভাবে এক-এক জীবের এক-এক রকম আকৃতি-প্রকৃতি বংশানুক্রমে প্রকাশ পায়। মানুষের প্রজনন-কোষের কেন্দ্রীণে 24-টি ক্রোমোসোম থাকে; স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলিত, বা নিষিক্ত কোষে (জাইগোট ↑) থাকে 24-জোড়া অর্থাৎ 48-টি ; ইঁদুরের কোষে থাকে 4-জোড়া, অর্থাৎ 8-টি ক্রোমোসোম। তেজস্ক্রিয় পদার্থের তেজঃ বিকিরণে, অথবা অ্যাটম-বোমার বিস্ফোরণে যে গামা-রশ্মির ↑ উদ্ভব হয় তার প্রভাবে ক্রোমোসোমের সংগঠক বিভিন্ন জিন-কণিকা বিকৃত হয়ে গিয়ে জীবের আকৃতি-প্রকৃতি বদলে যায় বলে ইদানিং প্রমাণিত হয়েছে।

জিন্‌স (Jeans), স্যার জেমস — সু-বিখ্যাত বৃটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞ ; জন্ম 1877 খৃঃ, মৃত্যু 1946 খৃঃ। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের সৃষ্টি-তত্ত্ব (কস্‌মোলজি ↑) সম্পর্কীয় আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতবাদের প্রবর্তক। জ্যোতির্বিজ্ঞানের বহু বিখ্যাত গ্রন্থের রচয়িতা।

জিপ্সাম (gypsum) — হাইড্রেটেড ক্যালসিয়াম সালফেট, $CaSO_4 \cdot 2H_2O$; ধাতব খনিজ পদার্থ, দেখতে সাদা। বিশুদ্ধ ক্যালসিয়াম সালফেট সামান্য উত্তপ্ত করে 'প্লাস্টার অব প্যারিস' ↑ তৈরি করা হয়।

জিলাটিন (gelatine) — প্রাণিদেহের হাড় ও কার্টিলেজ ↑ জলে ফুটালে জেলির ↑ মত যে ঘন পদার্থ পাওয়া যায়। জিনিসটা এক রকম জটিল গঠনের প্রোটিন ↑ জাতীয় পদার্থ ; স্বাদহীন, জলে দ্রবণীয়। বিশুদ্ধ জিলাটিন নানা রকম খাদ্যাদিতে মেশানো হয়। ফটোগ্রাফির ↑ কাজে, বস্ত্র-শিল্প প্রভৃতিতেও এর ব্যবহার আছে।

জিবারিলিক অ্যাসিড (jeberilic acid) — উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও শস্যোৎপাদক শক্তির বিশেষ উদ্দীপক একটি জৈব রাসায়নিক পদার্থ ; দেখতে সাদা, সূক্ষ্ম কেলাসিত দানা, জলে দ্রবণীয়। ধানগাছের সহসা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, অথচ অকাল মৃত্যুর জন্যে দায়ী 'জিবারেলা ফিউজিকুরয়' নামক ছত্রাক থেকে পদার্থটা সম্প্রতি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নিষ্কাশিত হয়েছে। বিভিন্ন উদ্ভিদের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে এবং ফলন বাড়াতে এর অদ্ভূত ক্ষমতা প্রতিপন্ন হয়েছে। প্রাণিদেহের সঙ্গে তুলনায় পদার্থটি যেন উদ্ভিদের 'থাইরক্সিন হর্মোনের ↑' (থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড ↑) মত কাজ করে।

জুওলজি (Zoology)—প্রাণিবিদ্যা ; বিভিন্ন সব জীব-জন্তুর গঠন, আকৃতি, প্রকৃতি প্রভৃতি সম্পর্কীয় বিজ্ঞান।

জুগুলার ভেইনস (jugular veins) — গ্রীবাদেশীয় রক্তবহা শিরাসমূহ, যাদের ভিতর দিয়ে মস্তিষ্ক থেকে রক্ত হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে। 'জুগুলার' মানে গ্রীবা, বা গলা সম্বন্ধীয়।

জুপিটার (Jupiter)—বৃহস্পতি গ্রহ ; সৌর-পরিবারের বৃহত্তম জ্যোতিষ্ক। আয়তনে পৃথিবীর প্রায় 318 গুণ বড় ; সূর্য থেকে এর দূরত্ব প্রায় 4,830 লক্ষ মাইল। সূর্যের গ্রহগুলোর দূরত্বের ক্রমপর্যায়ে এর স্থান হলো পঞ্চম ; মঙ্গল ও শনি গ্রহের মাঝামাঝি এক নির্দিষ্ট কক্ষ-পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। পৃথিবীর প্রায় 12 বছরে বৃহস্পতির এক বছর হয় ; অর্থাৎ নিজ কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে আসতে পৃথিবীর হিসেবে এর লাগে প্রায় 12 বছর। সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণে এই গ্রহের 12-টা উপগ্রহ, বা চাঁদ দেখা গেছে। সম্ভবতঃ গ্রহটার কোন গ্যাসীয় আবরণ, বা বায়ুমণ্ডল নেই ; উপরিভাগ অত্যন্ত শীতল বলে অনুমিত হয়েছে, তাপমাত্রা প্রায় - 50° সেন্টিগ্রেড হবে।

জুল (Joule), জেম্স প্রেস্কট — বৃটিশ পদার্থ-বিজ্ঞানী ; জন্ম ম্যাঞ্চেস্টারে 1818 খৃঃ, মৃত্যু 1889 খৃঃ। তাপ ও তড়িৎ সম্বন্ধে বহু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ; বাষ্পীয় ইঞ্জিনের উন্নতি সাধন, তাপ ও তড়িৎ-শক্তির পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয়। তড়িৎ-শক্তির একক নির্ধারণ, যা তাঁর নামানুসারে জুল ↑ একক বলে পরিচিত ; $= 10^7$ আর্গ ↑।

জুল (joule)—সাধারণভাবে তড়িৎশক্তির একটি একক বিশেষ ; আবার

যে-কোন প্রকার শক্তির একক হিসেবেও অনেক সময় 'জুল' ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এক জুল = 10^7 আর্গ↑ (ফুট-পাউণ্ড্যাল↑)। এক অ্যাম্পিয়ার↑ তড়িৎ-প্রবাহ এক ওম্‌↑ তড়িৎ-বাধা অতিক্রম করে এক সেকেণ্ড চলতে যে পরিমাণ তড়িৎ-শক্তির প্রয়োজন হয়, তাই হলো এক জুল ; বৃটিশ বিজ্ঞানী জুলের↑ নামানুসারে।

জেট (jet) — (1) অত্যন্ত কঠিন চক্‌চকে এক রকম খনিজ পদার্থ ; রাসায়নিক হিসেবে পদার্থটা হলো 'অ্যানথ্রাসাইট' ↑ জাতীয় অতি কঠিন কার্বন বিশেষ। প্রাচীনকালে এ দিয়ে অলঙ্কারাদি তৈরী হোত; সে-যুগের অনেক পুরাতন কবরের মধ্যে অনেক জায়গায় এর তৈরী অলঙ্কার-পত্র পাওয়া গেছে। (2) গ্যাস, বা তরল পদার্থ নির্গমণের সরু নল-পথ।

জেট প্লেন (jet plane) — জেট-চালিত বিমান পোত। এক বিশেষ কৌশলে এর ইঞ্জিনে গতি সঞ্চারিত হয়, যাকে বলে 'জেট-প্রোপালসন'।
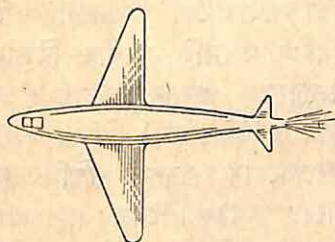
সাধারণ জেট প্লেন

মোটামুটি এর কৌশলটা হলো ঃ সামনে দিয়ে হাওয়া সবেগে ভিতরে ঢুকে ইঞ্জিনের জ্বালানি তেলের (পেট্রল↑) সঙ্গে মিশ্রিত হয়। আবদ্ধ আধারে উচ্চ চাপের বায়ুর মধ্যে ওই তেল প্রজ্বলিত হলে উৎপন্ন গ্যাস-মিশ্রিত বায়ু সরু নল-পথে (জেট↑) প্রচণ্ড বেগে পেছন দিক থেকে বেরুতে থাকে। গ্যাসীয় পদার্থের ওই পশ্চাৎ-গতির ফলে বিমান-পোত সম্মুখগতি লাভ করে। বন্দুক ছুঁড়লে বারুদের বিস্ফোরণে উৎপন্ন গ্যাসের প্রবল চাপে গুলিটা সবেগে সামনে বেরিয়ে যায়; আর তার প্রতিক্রিয়ায় পেছন দিকে চালকের হাতে বন্দুকের একটা ধাক্কা লাগে। বন্দুকের এই পশ্চাৎ-গতির বৈজ্ঞানিক কারণ অনেকটা জেট-প্রোপালসনের অনুরূপ। শূন্যপথে হাউই যে কারণে সবেগে উপরে উঠে যায়, জেট প্লেনের গতিও অনেকটা তদনুরূপ।

জেট প্লেনের ভিতরের ব্যবস্থা

জেড (jade) — দুধের মত সাদা কিঞ্চিৎ সবুজাভ মূল্যবান প্রস্তর বিশেষ ; অলঙ্কারাদিতে ব্যবহৃত হয়। রাসায়নিক গঠনে বিভিন্ন, কিন্তু দৃশ্যতঃ একই রূপ এই শ্রেণীর নানা প্রকার প্রস্তর পাওয়া যায়।

জেপ্‌লিন (Zeppelin), কাউণ্ট ভন — জার্মাণ যন্ত্রবিদ্‌ ও উদ্ভাবক ; জন্ম 1836 খৃঃ, মৃত্যু 1917 খৃঃ। 'জেপ্‌লিন' নামক সে-যুগের এক বিশেষ ধরনের প্রথম বিমানপোত আবিষ্কারে চিরস্মরণীয়।

জেম (gem) — অলঙ্কারাদিতে ব্যবহারের জন্য সুদৃশ্য আকারে কাটা ও পালিশ করা বিভিন্ন মূল্যবান প্রস্তর, বা রত্ন। ডায়মণ্ড ↑, রুবি ↑, স্যাফায়ার ↑ প্রভৃতি বর্ণোজ্জ্বল ও মূল্যবান প্রস্তরগুলি কেটে ও পালিশ করে এরূপ রত্ন তৈরীর শিল্প বহু প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত আছে।

জেম্স ওয়াট (James Watt) — স্কটল্যাণ্ডবাসী বিখ্যাত যন্ত্রবিদ ; জন্ম 1736 খৃঃ, মৃত্যু, 1819 খৃঃ। ষ্টিম ইঞ্জিনের ↑ আবিষ্কর্তা ; যার যান্ত্রিক ব্যবস্থায় রেল, ষ্টীমার, কল-কারখানা প্রভৃতি প্রচলনের ফলে শিল্পজগতে নবযুগের প্রবর্তক। গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের মেকানিক, অর্থাৎ যন্ত্রশিল্পী ছিলেন। বাষ্পীয় ইঞ্জিনের ক্রমোন্নতি বিষয়ক সুদীর্ঘ গবেষণায় জীবনপাত।

জেনার (Jenner), এডওয়ার্ড — ইংলণ্ডের এক পল্লীবাসী ডাক্তার; জন্ম 1769 খৃঃ, মৃত্যু 1823 খৃষ্টাব্দ। গোবসন্তের মৃদু বীজ মনুষ্যদেহে সংক্রামিত করে দুরারোগ্য বসন্তরোগের প্রতিষেধক টিকা আবিষ্কার করেন। এরূপ টিকা অদ্যাপি প্রচলিত ; অবশ্য এই পদ্ধতির জীবাণুঘটিত মূল তথ্য নির্ধারণ করেন বিজ্ঞানী পাস্তর ↑ ।

-জেনাস (-genous) — কোন কিছু থেকে উৎপন্ন, বা জাত ; যেমন— **অটোজেনাস** ভ্যাক্সিন ↑ হলো কোন রোগীর দেহের জীবাণুঘটিত দূষিত ক্ষতের রস আবার সেই রোগীর দেহে প্রবেশ করিয়ে যে টিকা, বা ভ্যাক্সিন দিয়ে সেই রোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হয় ; একে **অটোভ্যাক্সিন**ও বলে। **এণ্ডোজেনাস,** দেহের অভ্যন্তরে উৎপন্ন ; **অ্যাক্রোজেনাস** দেহের বাহিরে উৎপন্ন কোন কিছু।

জেনারেটর (generator) —তড়িৎ-উৎপাদক যন্ত্র। তড়িৎশক্তি উৎপাদনের বিভিন্ন পাওয়ার ষ্টেশনে বিভিন্ন পদ্ধতির জেনারেটর ব্যবহৃত হয়। উৎপাদিত তড়িৎ-প্রবাহের প্রকারভেদে জেনারেটর মূলতঃ দু-রকম— এ. সি. এবং ডি. সি.। জেনারেটর যন্ত্র চলে সাধারণতঃ দু'রকম শক্তিতে —থার্ম্যাল ও হাইড্রলিক। কয়লা, বা কোন জ্বালানি তেল প্রভৃতি পুড়িয়ে সেই তাপের সাহায্যে চালিত যে জেনারেটর যন্ত্রে তড়িৎ উৎপাদিত হয় তাকে বলা হয় 'থার্ম্যাল জেনারেটর' ; আর, জল-স্রোতের গতিবেগ নিয়ন্ত্রিত করে তার শক্তিতে যে জেনারেটর চালানো হয় তাকে বলে 'হাইড্রলিক জেনারেটর'।

জেনেটিক্স (genetics) —প্রজনবিদ্যা. অর্থাৎ জৈবিক উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ক তথ্যাদি সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। স্ত্রী-পুরুষের প্রজনন-কোষের (শুক্র-কোষ ও ডিম্ব-কোষ) বিভিন্ন সংখ্যক ক্রোমোসোম ↑ পরস্পর সম্মিলিত হয়ে তাদের সংগঠক জিনের ↑ পারস্পরিক সংযোগে গঠিত নূতন জীবকোষ সৃষ্টি হয়, যার মাধ্যমে পিতামাতার বৈশিষ্ট্যসমূহ সন্তানে পরিবাহিত হয়ে থাকে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও অন্যান্য কারণে অবশ্য পিতামাতার বৈশিষ্ট্যা-

দির কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটতে পারে। এ-সব সম্পর্কীয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও মতবাদকে বলা হয় জেনেটিক্স। উদ্ভিদ ও প্রাণী যে-কোন জীবের ক্ষেত্রেই বংশানুক্রমের গবেষণালব্ধ তথ্যাদি জীববিজ্ঞানের এই শাখায় পর্যালোচিত হয়ে থাকে।

জেনেসিস (genesis) — জৈব অভিব্যক্তি, বা বংশধারা; কোন উদ্ভিদ, বা প্রাণীর যে পূর্ব-পুরুষ থেকে ক্রমবিবর্তনের ধারায় বর্তমান জীবজগতের উৎপত্তি হয়েছে তার পর্যালোচনা।

জেনিথ (zenith) — ভূ-পৃষ্ঠে দণ্ডায়মান কোন ব্যক্তির সোজা মাথার উপরে নভোমণ্ডলে অবস্থিত সর্বোচ্চ যে বিন্দু কল্পনা করা হয়। জ্যোতির্বিত্থায় 'সেলেশ্চিয়াল স্ফিয়ারে' ↑ এরূপ সর্বোচ্চ (জেনিথ) বিন্দু কল্পনা করে নিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিভিন্ন গণনাদির সমাধান করা হয়ে থাকে।

জেল (jell) — জেলির মত ঘন ও আঠালো কোন কোলয়ড্যাল সলিউসন ↑ ; এর আঠালো-ঘনত্ব এত অধিক হতে পারে যে, তা প্রায় স্থিতিস্থাপক পদার্থের মত হয়। অল্প জলে যথেষ্ট পরিমাণ জিলাটিন ↑ মিশিয়ে নাড়লে যেমন হয়ে থাকে।

জেলিগ্নাইট (gelignite)—এক রকম বিস্ফোরক পদার্থ বিশেষ। নাইট্রোগ্লিসারিন ↑, নাইট্রোসেলুলোজ ↑, সল্ট পিটার ↑ (পটাসিয়াম নাইট্রেট, KNO_3) ও কাঠের গুঁড়া বিশেষ অনুপাতে মিশিয়ে এই প্রচণ্ড বিস্ফোরক পদার্থটা তৈরী হয়।

জোডিয়াক (Zodiac) — সূর্যের রাশিচক্র ; সেলেশ্চিয়াল স্ফিয়ারের ↑ যে অংশের উপর দিয়ে সূর্যের বার্ষিক গতি লক্ষিত হয়। সারা বছরে সূর্য আপাতদৃষ্টিতে এইরূপ একটি নির্দিষ্ট পথে পরিভ্রমণ করে বলে প্রতীয়মান হয়ে থাকে। (প্রকৃতপক্ষে সূর্য স্থির রয়েছে, পৃথিবীর গতির জন্যেই এরূপ দেখায়।) সূর্যের এই আপাতদৃষ্ট ভ্রমণ-পথকে বলা হয় জোডিয়াক, বা রাশিচক্র। জ্যোতির্বিত্থায় এই জোডিয়াক, বা রাশিচক্রকে 12-টি ভাগে ভাগ করে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট প্রভৃতি দ্বাদশ রাশির পরিকল্পনা করে জ্যোতির্বিত্থার গণনাদি করা হয়ে থাকে।

জ্যাভেলি ওয়াটার (javelli-water) — পটাসিয়াম হাইপোক্লোরাইটের (KOCl) জলীয় দ্রবণ ; একে 'ইউ-ডি-জ্যাভেলি'ও বলা হয়। পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইডের (KOH) ঠাণ্ডা জলীয় দ্রবণের মধ্যে ক্লোরিন গ্যাস প্রবাহিত করলে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে এর উৎপত্তি ঘটে। বস্ত্রাদি বর্ণহীন (ব্লিচিং ↑) করতে ও বীজাণুনাশক পদার্থ হিসেবে অনেক সময় ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

জ্যান্থোফিল (xanthophyll) — হল্‌দে রঙের জৈব রাসায়নিক পদার্থ-কণিকা; কচি পাতার সবুজ-কণিকা, বা ক্লোরোফিলের ↑ রূপান্তরের ফলে যা উদ্ভিদের বিশীর্ণ পত্রাদিতে উৎপন্ন হয়।

ট

টক্সিন (t o x i n) — আণুবীক্ষণিক জীবাণুরা প্রাণিদেহের পেশীতন্তুর

মধ্যে যে-সব বিষ-রস ছড়ায়। দেহের কোন জীবাণুদুষ্ট অংশ থেকে এই টক্সিন, বা বিষ-রস রক্ত-প্রবাহে মিশে গেলে রক্তের **টক্সিমিয়া** অবস্থা বলা হয়। যে-সব প্রোটিন পদার্থ দেহাভ্যন্তরে উপজাত কোন টক্সিনের বিষ-ক্রিয়া নষ্ট করে তাদের বলে **টক্সয়েড** ; আর, কোন টক্সিনের বিষ-ক্রিয়া প্রতিরোধ করবার জন্যে দেহমধ্যে স্বভাবতঃই যে-সব বিষঘ্ন পদার্থের সৃষ্টি হয় তাদের বলে **অ্যাণ্টিটক্সিন**।

টক্সিকোলজি (toxicology)—জীব-দেহের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জীবাণু-নিঃসৃত বিষ-রসের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও তার ফলাফল বিষয়ক তথ্যাদি বিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচিত হয়।

টক্সামিন (toxamin)—যে-সব পদার্থ দেহ মধ্যে ভিটামিনের কার্যকরী শক্তি নষ্ট করে ফেলে ; যেমন, ভিটামিন-বি ডিমের সাদা অংশের সঙ্গে মিশে গিয়ে এমন পদার্থের সৃষ্টি করে যাতে ওই ভিটামিন↑ দেহের আর কোন কাজেই আসে না। এখানে ডিমের সাদা অংশকে টক্সামিন, বা 'ভিটামিন নাশক' পদার্থ বলা হয়।

টটোম্যারিজ্‌ম (tautomerism)—কোন যৌগিক পদার্থে তার দু-রকম আইসোমার↑ এক সঙ্গে মিশে থাকার অবস্থা। বিশেষ-বিশেষ যৌগের রাসায়নিক গঠনে এরূপ দুই রকম আইসোমারের পারস্পরিক অনুপাত মোটামুটি স্থির থাকে। এর এক রকম আইসোমার যদি আলাদা করে ফেলা যায়, তাহলে অন্য আইসোমারটির কতক অংশের গঠন বদলে গিয়ে প্রথমটার মত হয়ে অনুপাতের স্থিরতা রক্ষা করে থাকে। এই রকম পদার্থকে 'টটোম্যারিক' পদার্থ বলে। কোন কোন রাসায়নিক ক্রিয়ায় মনে হয়, পদার্থটার মধ্যে এক রকম বিশেষ আইসোমার আছে ; আবার কোন ক্ষেত্রে মনে হয়, যেন পদার্থটার রাসায়নিক গঠনে অপর আর এক রকম আইসোমারও রয়েছে।

টন (ton) — ইংলণ্ডীয় ওজনের একক বিশেষ ; প্রায় 27 মণ। কয়লা প্রভৃতি ওজন করতে যুক্তরাষ্ট্রে একে বলে **লঙ্‌ টন**, = 2240 পাউণ্ড ; ধাতব পদার্থাদি ওজন করতে ব্যবহৃত হয় **শর্ট টন**, = 2000 পাউণ্ড। 'মেট্রিক টন' হলো 1000 কিলোগ্রাম↑, বা 2204·6 পাউণ্ড ; একে আবার **টনি**-ও বলা হয়।

টন্‌সিল (tonsil) — মুখ-গহ্বরের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত জিহ্বামূলের দু'পাশের দুটি ক্ষুদ্র গ্ল্যাণ্ড↑, বা গ্রন্থি। এই গ্ল্যাণ্ড দুটি এক প্রকার লিম্প↑ উৎপাদন করে ; যার বিশেষ জৈবক্রিয়ায় মানুষের কণ্ঠ-নালীতে রোগ-সংক্রমণ প্রতিরোধ করে দেহ সুস্থ ও নিরোগ রাখে।

টন্‌সিল-দ্বয়

টনিক (tonic) — সাধারণ স্বাস্থ্যপ্রদ ঔষধ। **-টনিক**, যেমন হাইপার-টনিক↑ সল্যুসন্‌স, গাঢ়তর দ্রবণ। আইসোটনিক↑ সল্যুসন্‌স মানে

যে-সব বিভিন্ন দ্রবণের গাঢ়ত্ব পরস্পরের সমান।

টম্‌সম, (Thomson) স্যার জোসেফ জন — প্রখ্যাত বৃটিশ পদার্থ-বিজ্ঞানী, ম্যানচেষ্টারে জন্ম 1856 খৃস্টাব্দ, মৃত্যু 1940 খৃঃ। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত পদার্থ-বিজ্ঞানের 'ক্যাভেণ্ডিস' অধ্যাপক। তড়িতের আয়ন ↑ কণিকা মতবাদের সম্প্রসারণ এবং পরমাণুর গঠন-বৈচিত্র্যে ইলেক্‌ট্রনের ↑ অস্তিত্ব আবিষ্কারে বিশেষ খ্যাতি অর্জন। 1906 খৃঃ পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ। পুত্র স্যার জর্জ পাগেট টমসনও প্রখ্যাত পদার্থ-বিজ্ঞানী। পরমাণু-শক্তি সম্বন্ধীয় গবেষণায় স্মরণীয় কীর্তি; 1937 খৃঃ নোবেল পুরস্কার লাভ। প্রথম 'অ্যাটম বম্‌ব' ↑ উৎপাদনের গবেষকগোষ্ঠীর অন্যতম বিজ্ঞানী।

…**টমি** (…tomy)—ব্যবচ্ছেদ, কাটা; যেমন **লিথোটমি** মানে মূত্রাধার (ইউরিন-ব্লাডার) কেটে তার ভিতরে উৎপন্ন পাথর (পাথুরি-রোগ) অপসারণ করে ফেলা (লিথো = প্রস্তর)। **অ্যা না ট মি** মানে শব-ব্যবচ্ছেদ; শারীরবৃত্তের শিক্ষায় মৃত দেহ কেটে আভ্যন্তরীণ গঠন-বৈচিত্র্য ও অঙ্গসংস্থানের প্রত্যক্ষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

টর্টিকলিস (torticollis)—মানুষের ঘাড়-মাথা এক-দিকে বেঁকে গিয়ে যে দৈহিক বিকৃতি ঘটে, রোগ বিশেষ; অত্যধিক শৈত্যে, বা অন্য কোন কারণে ঘাড়ের শিরা ও মাংসপেশীর সংকোচনের ফলে এরূপ হয়।

টরিড জোন (torrid zone) — ভূ-পৃষ্ঠের গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চল, অর্থাৎ পৃথিবীর বিষুব-রৈখিক আঞ্চলিক ভূ-ভাগ। ভৌগোলিক বিষুব বৃত্তের (ইকোয়েটর ↑) 23°30′ উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষ-রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী ভূ-খণ্ড জুড়ে এই অঞ্চল বিস্তৃত।

টরিসেলি (Toricelli) ইভেঞ্জিলেটা — ইটালীয় বিজ্ঞানী, জন্ম 1608 খৃঃ, মৃত্যু 1647 খৃঃ। দীর্ঘদিন গ্যালেলিওর ↑ ছাত্র ও সহকারী। 1643 খৃঃ বায়ুমণ্ডলের চাপ নির্ধারণের মৌলিক তথ্য আবিষ্কার এবং প্রথম চাপমান যন্ত্র (ব্যারোমিটার ↑) উদ্ভাবন। এই যন্ত্রে 'টরিসেলিয়ান ভ্যাকুয়াম' ↑ সৃষ্টির জন্যে স্মরণীয়।

টরিসেলিয়ান ভ্যাকুয়াম (Torricellian vaccum) — এক মুখ বন্ধ, অন্যূন 32 ইঞ্চি লম্বা একটা কাঁচনলের মধ্যে পারদ ভর্তি করে আর একটা পারদ-ভর্তি পাত্রের উপর উল্‌টে ধরলে ওই কাঁচ নলের মধ্যস্থ পারদ খানিকটা নেমে যায়। এভাবে কাঁচ-নলটার উপরের দিকে যে সম্পূর্ণ শূন্য-স্থান সৃষ্টি হয়, সেখানে বায়ু থাকে না, সামান্য পারদ-বাষ্প থাকতে পারে মাত্র। এরূপ বায়ুশূন্য স্থানকে বলে 'টরিসেলিয়ান ভ্যাকুয়াম'। ইতালীয়
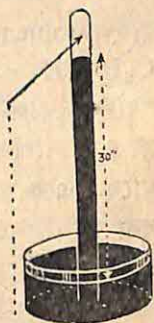
টরিসেলিয়ান ভ্যাকুয়াম

বিজ্ঞানী টরিসেলি ↑ এরূপ কাঁচনলে পারদ-স্তম্ভের উচ্চতা মেপে বায়ুর চাপ নির্ধারণের কৌশল উদ্ভাবন করেছিলেন। কৌশলটা এক রকম সাধারণ ব্যারোমিটার ↑ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

টলেমি (Tolemy), ক্লডিয়াস টলেমিসাস — মিশরীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী ; আনুমানিক খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে আলেক্‌জান্দ্রিয়ায় আবির্ভাব। পৃথিবী-কেন্দ্রিক সৌর জগতের মতবাদ প্রচার ; (টলেমিয় বিশ্ব সংজ্ঞা হলো : পৃথিবী স্থির রয়েছে সূর্য ও গ্রহ-নক্ষত্র তাকে প্রদক্ষিণ করছে)। সহস্রাধিক বছর পরে টলেমির এই মতবাদ কোপার্নিকাস ↑ ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করেন। গ ণি তে র ত্রিকোণমিতি শাখার প্রবর্তক। ভূ-মণ্ডলের প্রথম মানচিত্র অঙ্কন ; বহুলাংশে ভ্রান্তিপূর্ণ হলেও পৃথিবীর এই প্রথম মানচিত্র অনেকটা প্রামাণ্য ও সে-যুগের পক্ষে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচায়ক।

টলুইন (toluene)—মিথাইল বেঞ্জিন, $C_6H_5CH_3$; বর্ণহীন দাহ্য তরল পদার্থ। কোল-টার ↑, অর্থাৎ আলকাত্‌রা থেকে নিষ্কাশিত হয়ে থাকে। একে অনেক সময় **টলুঅল**ও বলা হয়। এ থেকে নানারকম রং, ঔষধ, স্যাকারিন প্রভৃতি পাওয়া যায়। টি-এন-টি ↑ (ট্রাই-নাইট্রো-টলুইন) প্রভৃতি বিস্ফোরক পদার্থ প্রস্তুত করতেও এর প্রয়োজন হয়।

টাইপ মেটাল (type metal) — সীসা, অ্যান্টিমনি ও টিনের সংকর-ধাতু ; এর মধ্যে সাধারণতঃ 60% সীসা (লেড ↑), 30% অ্যান্টিমনি এবং 10% টিন থাকে। মুদ্রণকার্যের জন্যে এ-দিয়ে ছাপার টাইপ তৈরী হয়ে থাকে। অ্যান্টিমনি থাকায় উত্তপ্ত তরলীকৃত সংকর ধাতুটা ঢালাই করে ঠাণ্ডা করলে তা আয়তনে ছোট না হয়ে বরং একটু বেড়ে যায় ; এর ফলে অক্ষরগুলো নিখুঁত পরিষ্কার ওঠে।

টাইটেনিয়াম (titanium)—মৌলিক ধাতব পদার্থ ; পারমাণবিক ওজন 47·9, পারমাণবিক সংখ্যা 22 ; অনেকটা লোহার অনুরূপ ধাতু। সহজেই এর তার ও পাত করা যেতে পারে। এর খনিজ যৌগিক আকরিক অনেক পাওয়া যায়। এর অক্সাইড, TiO_2. সাদা 'ভার্নিস রং' হিসেবে ব্যবহৃত হয়। টাইটেনিয়াম মিশিয়ে বিভিন্ন সংকর-ধাতুও তৈরী হয়ে থাকে। উৎকৃষ্ট ইস্পাত তৈরী করতে টাংস্টেনের ↑ সঙ্গে সামান্য কিছু টাইটেনিয়ামও লোহার সঙ্গে অনেক সময় মেশানো হয়ে থাকে। কাঁচ-শিল্পেও এর ব্যবহার আছে।

টাংষ্টেন (tungsten) — মৌলিক ধাতু ; এর অপর নাম **উলফ্রাম** ↑। বৈদ্যুতিক বাতির ফিলামেণ্ট ↑ এ-দিয়ে তৈরী করা হয়। বিশেষ ধরনের ইস্পাত (টাংস্টেন-স্টিল) তৈরী করতেও এর প্রয়োজন হয়ে থাকে।

টার্গাম (tergum)—প্রাণীর পৃষ্ঠদেশ ; বিশেষণে 'টারগাল' (tergal); যেমন, **টারগাল মাস্‌ল** (tergal muscle), পৃষ্ঠীয় মাংসপেশী।

টার্টার (tartar) — পটাসিয়াম টার্টারেট সল্টের বিশেষ নাম; প্রধানতঃ অ্যাসিড-পটাসিয়াম টার্টারেটকে বলে **ক্রিম অব টার্টার,** যা মদ্য প্রস্তুতকালে মদ্য-ভাণ্ডের মধ্যে স্বভাবতঃ জমে (আর্গল↑)। জিনিসটা জোলাপ হিসেবে ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। পটাসিয়াম ও অ্যান্টিমনির মিলিত টার্টারেট-কে বলে **টার্টার-এমিটিক**↑, যা সর্দি-কাশির একটা বিশিষ্ট ঔষধ; কিন্তু পরিমাণ বেশি হলে এর বিষক্রিয়া দেখা যায়। বয়স্ক লোকের দাঁতের উপরে যে পদার্থের বাদামী আবরণ পড়ে তা প্রধানতঃ ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট; সাধারণ কথায় বলা হয় 'টার্টার'।

টার্টারিক অ্যাসিড (tartaric acid) —বিশেষ একটা জৈব অ্যাসিড; সাদা স্ফটিকাকার পদার্থ, জলে দ্রবণীয়। এর রাসায়নিক স্থত্র COOH.(CH.OH.)$_2$ COOH; আঙ্গুর ফলের রস থেকে পাওয়া যায়। আর্গল↑ থেকেই বেশীর ভাগ টার্টারিক অ্যাসিড উৎপাদিত হয়ে থাকে। এর বিভিন্ন সল্টকে বলে **টার্টারেট**। রঞ্জন-শিল্পে, কাপড় ছাপার কাজে প্রচুর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বেকিং পাউডার↑, সিড্‌লিজ পাউডার↑ ইত্যাদি প্রস্তুত করতে প্রয়োজন হয়ে থাকে।

টার্টারেট (tartarate) — টার্টারিক অ্যাসিডের↑ বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক লবণ, বা সল্ট↑। (টার্টার↑)

টার্টার এমিটিক (tartar emetic) —পটাসিয়াম ও এন্টিমনির↑ মিলিত টার্টারেট↑ লবণের ব্যবহারিক নাম। টার্টার-এমিটিক ঔষধ হিসেবে সর্দি-কাশিতে ব্যবহৃত হয়; মাত্রাধিক্যে অবশ্য বিষক্রিয়া ঘটে।

টার্মোলিন (turmoline)—বোরন ও অ্যালুমিনিয়ামের যুগ্ম সিলিকেটে↑ গঠিত স্বচ্ছ ও মূল্যবান প্রস্তর বিশেষ। সাধারণতঃ বর্ণহীন থাকে; কখন কখন নীল, বা লাল রঙেরও দেখা যায়।

টার্পেণ্টাইন (turpentine) — তারপিন তেল; পাইন গাছ থেকে নিঃসৃত রজন-জাতীয় আঠালো রস চোলাই করে এই তেল পাওয়া যায়। রাসায়নিক হিসেবে পদার্থটা বিশেষ এক শ্রেণীর তরল হাইড্রোকার্বন↑ মাত্র। উৎকৃষ্ট দ্রাবক পদার্থ হিসেবে কখন-কখন রং, ভার্নিস প্রভৃতি তৈরী করতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে; তেলটার কিছু ভেষজ গুণও আছে।

টার্সাল বোন্‌স (tarsal bones)— পদতলের পশ্চাদ্ভাগের পরস্পর সংলগ্ন খণ্ডাস্থি-সমূহ; **মেটাটার্সাল্‌স** (metatarsals) —'টার্সাল' অস্থিগুলির পরবর্তী, অর্থাৎ পদতলের অগ্রভাগের অপেক্ষাকৃত লম্বা খণ্ডাস্থি-সমূহ। **কার্পাল বোন্‌স** (carpal bones)↑।

টার্সাল বোন্‌স

টারবাইন (turbine) — এক রকম

যন্ত্র বিশেষ ; যার সাহায্যে মোটর, বা ইঞ্জিনের অনুরূপ কার্যকরী-শক্তি উৎপাদন করা সম্ভব হয়ে থাকে। এর যান্ত্রিক কোশলটা হলো : সরু নলপথে জলীয় বাষ্প, বায়ু, বা জলের প্রবাহ এসে সবেগে একটা প্রকাণ্ড চাকার চাওড়া ব্লেডগুলোর উপরে পর্যায়ক্রমে আঘাত করতে থাকে ; এর ফলে
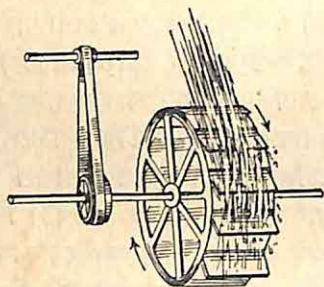
টার্বাইন জলচক্র

চাকাটা দ্রুত ঘুরতে আরম্ভ করে। ওই চাকার সঙ্গে সংযুক্ত ইঞ্জিন, বা মোটরের চাকাও ঘুরে সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে। এভাবে চালিত গ্যাস-টারবাইন, বা ওয়াটার-টারবাইনের সাহায্যে বিভিন্ন যন্ত্র চালানো হয়। টারবাইনের কৌশলে চালিত যন্ত্রকে **টার্বো** বলে ; যেমন—টার্বো-ইঞ্জিন, টার্বো-জেনারেটর ↑ ইত্যাদি।

টি. এন. টি. (T. N. T.) — ট্রাই-নাইট্রোটলুইন নামক বিস্ফোরক পদার্থের সংক্ষিপ্ত নাম। ফিকে হলদে, স্ফটিকাকার কঠিন পদার্থ। বিশেষ নাইট্রেসন ↑ প্রক্রিয়ার সাহায্যে টলুইনের ↑ সঙ্গে নাইট্রোজেনের রাসায়নিক মিলনের ফলে এই তীব্র বিস্ফোরক পদার্থটি উৎপন্ন হয়ে থাকে। পদার্থটাকে আবার অনেক সময় **টোটাইল**ও বলা হয়।

টিউবারকূল—উদ্ভিদ, বা প্রাণিদেহের কোথাও স্থানীয় জৈব কোষগুলির স্ফীতির ফলে যে এক রকম গোলাকার পদার্থ-পিণ্ডের উদ্ভব হয়। আবার জীবের দেহাভ্যন্তরে বিভিন্ন তন্তুর (টিস্যু ↑) গায়ে যক্ষ্মারোগের (টিউবারকুলিসিস ↑) জীবাণুরা যে-সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকার সৃষ্টি করে সেগুলিকেও টি. ল. বলে।

টিউবারকুলিসিস — যক্ষ্মারোগ, এ-রোগে সাধারণতঃ 'টিউবারকুলিস' নামক বিশেষ এক শ্রেণীর জীবাণুর (ব্যাচিলি ↑) সংক্রমণে প্রধানতঃ ফুস্ফুস্ আক্রান্ত হয়। (চিত্রে কাঠির মতগুলি জীবাণু, আর গোলাকারগুলি রক্ত-কণিকার 'ব্লাড্সেল ↑' প্রায় এক হাজার গুণ বর্ধিত আকার প্রদর্শিত হয়েছে।)
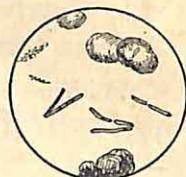
টিউবার্কেল ব্যাচিলাস

টিউবারকুলিন (tuberculin) — টি. স. ব্যাচিলি ↑ থেকে নিষ্কাশিত এক প্রকার জৈব পদার্থ, যা প্রয়োগ করে কেহ যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়েছে কিনা, তার প্রতিষেধক পরীক্ষা করা হয়ে থাকে।

টিউমার (tumour) — দূষিত জীব-কোষের স্ফীতি। জীবাণু-দুষ্ট কোষগুলি যদি বাড়তে থাকে এবং সংলগ্ন সব তন্তু-কোষগুলিকে ক্রমাগত ভেঙ্গে ফেলে, তাহলে তা ক্যান্সার ↑ রোগে

পরিণত হয়। যদি কোন টিউমারের কোষগুলি কেবল নিজেরাই আয়তনে বাড়ে, কিন্তু চারদিকের সুস্থ তন্তুগুলিকে ঠেলে সরিয়ে দেয়, তাহলে তা তেমন মারাত্মক হয় না।

টিউনিং ফর্ক (tuning fork)—ধাতু-নির্মিত লম্বা সাঁড়াশি-আকৃতি যন্ত্র বিশেষ; শব্দ-বিজ্ঞানের পরীক্ষায়
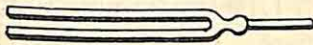
টিউনিংফর্ক

ব্যবহৃত হয়। আঘাত করলে এর দুটি অংশ সমভাবে স্পন্দিত হয়ে একটি মাত্র বিশুদ্ধ ধ্বনি সৃষ্টি করে।

টিন (tin) — মৌলিক ধাতব পদার্থ; পারমাণবিক ওজন 118·7, পারমাণবিক সংখ্যা 50, সাংকেতিক চিহ্ন Sn (ষ্ট্যানাম)। রূপোর মত সাদা; সহজেই এর তার ও পাত করা যায়। এর খনিজ অক্সাইড, SnO_2 (টিন-স্টোন) এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় কার্বনের সঙ্গে উত্তপ্ত করে ধাতুটা সাধারণতঃ নিষ্কাশিত হয়। সাধারণ তাপমাত্রায় জল, বা বায়ুর সংস্পর্শে এর কোন বিকৃতি ঘটে না, অর্থাৎ মরচে ধরে না; কিন্তু 18° সেন্টিগ্রেডের কম তাপে ধূসর বর্ণ (অ্যালোট্রপিক ↑ টিন) হয়ে যায়; একে বলে **টিন প্লেগ**। নানা রকম সংকর-ধাতু তৈরী ও টিন-প্লেটিং-এর কাজে প্রয়োজন হয়। লোহার চাদরে টিনের পাতলা আস্তরণ দিয়ে সাধারণ টিন-প্লেট তৈরী হয়ে থাকে।

টিনম্যান্‌স সল্ডার (tinman's solder)—সাধারণ রাং-ঝাল (সল্ডার ↑), যা প্রধানতঃ সীসা ও টিনের সংমিশ্রণে প্রস্তুত হয়। মিশ্রণটা সহজে অল্প তাপে গলে এবং ধাতু ঝালাইয়ের কাজে ব্যবহৃত হয়।

টিণ্ড্যাল এফেক্ট (Tyndall effect) — আলোক-রশ্মির পথে অতি সূক্ষ্ম পদার্থ-কণিকা পড়লে ওই আলোকের যে বিচ্ছুরণ ঘটে। কোন ক্ষুদ্র ছিদ্র-পথে রোদ ঢুকলে ঘরের বাতাসে ভাসমান ধূলিকণাগুলো এর ফলে পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে; ধূলিকণার উপর আলোকের প্রতিফলন ও বিচ্ছুরণের ফলেই অদৃশ্য আলোক-রশ্মি দৃশ্য হয়ে ওঠে। অতি সূক্ষ্ম কণিকার উপর নীল আলোক-তরঙ্গই বিশেষভাবে বিচ্ছুরিত হয়। আকাশের রং প্রধানতঃ এ জন্যেই নীল দেখায়। আলট্রা-মাইক্রোস্কোপ ↑ যন্ত্রে এই টিণ্ড্যাল এফেক্টের জন্যেই জলে ভাসমান অদৃশ্য কণিকাগুলো দৃষ্টিগোচর হয়ে ওঠে। বৃটিশ বিজ্ঞানী টিণ্ড্যাল আলোকের প্রতিফলন ও বিচ্ছুরণ সম্পর্কিত এই তথ্য উদ্‌ঘাটন করেন।

টিটেনাস (titanus) — ধনুষ্টংকার রোগ; জীবাণু-ঘটিত কঠিন ব্যাধি। প্রধানতঃ জীবজন্তুর মলমূত্র থেকে 'টিটেনাস' নামক এক প্রকার জীবাণু কোন ক্ষতের ভিতর দিয়ে দেহের রক্তে অনুপ্রবেশ করে এবং সরাসরি গিয়ে মেরুদণ্ড আক্রমণ করে। এর ফলে সুষুম্না-কাণ্ডের সংকোচনে পৃষ্ঠদেশের মাংসপেশীগুলিও সংকোচিত হয় এবং দেহ বেঁকে যায়। ইদানিং

জীবাণু-ঘটিত এই দুশ্চিকিৎস ব্যাধির 'অ্যান্টিটিটেনাস' নামক ইঞ্জেকসনের প্রচলন হয়েছে।

টিনিটাস (t i n n i t u s) — কানে অকারণ শ্রুত ভোঁ-ভোঁ শব্দ ; রোগ বিশেষ। এটা বাইরের কোন শব্দ নয় ; দুর্বলতা ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিকৃতি-জনিত আনুষঙ্গিক উপসর্গ।

টিণ্টোমিটার (tintometer) — যে যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন পদার্থের বর্ণের তুলনামূলক প্রভেদ নিরূপণ করা যায় ; এতে প্রধানতঃ প্রামাণ্য কোন নির্দিষ্ট বর্ণের কাচ, বা দ্রবণের সঙ্গে যান্ত্রিক কৌশলে অন্যান্য পদার্থের বর্ণের তুলনা করা হয়।

টেক্‌নোলজি (technology) — শিল্প-বিজ্ঞান, বা প্রযুক্তি-বিদ্যা ; শিল্প-দ্রব্যাদি প্রস্তুতির কাজে সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির ব্যবহারিক প্রয়োগ-বিদ্যা।

টেন্‌সন (tension) — টান ; কোন পদার্থের সংকোচনের স্বাভাবিক শক্তি ; যেমন—যান্ত্রিক শক্তি প্রয়োগে ধাতুর তার, বা দণ্ড প্রস্তুত করবার সময় তার মধ্যে যে সংকোচন-প্রবণতা সৃষ্টি হয়। কখন-কখন বৈদ্যুতিক চাপ (ভোল্টেজ ↑) নির্দেশ করতেও কথাটা ব্যবহৃত হয়, যেমন—**হাই-টেন্‌সন ব্যাটারী** ↑।

টেম্পারেচার (temperature) — উষ্ণতা, বা তাপমাত্রা ; কোন পদার্থ কতটা উত্তপ্ত, বা ঠাণ্ডা, অর্থাৎ তার মধ্যে নিহিত তাপশক্তির পরিমাণ-জ্ঞাপক অবস্থা যে এককে প্রকাশিত হয়। পদার্থের উষ্ণতার, অর্থাৎ তার তাপমাত্রা, বা টেম্পারেচারের যে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে তা থার্মোমিটার ↑ যন্ত্রের সাহায্যে নির্ধারিত হয়ে থাকে। কোন পদার্থে নিহিত মোট তাপ-শক্তিকে বলে হিট ↑। হিট ও টেম্পারেচার এক জিনিস নয়। টেম্পারেচার পদার্থের উষ্ণতার মাত্রা, বা তাপীয় অবস্থা সম্বন্ধীয় ধারণা জন্মায় মাত্র ; আর পদার্থের হিট, অর্থাৎ মোট তাপ-শক্তির পরিমাণ ক্যালোরি ↑ এককে নির্ধারিত হয়। বিভিন্ন প্রকার থার্মোমিটার ↑ যন্ত্রে বিভিন্ন স্কেলের এককে টেম্পারেচার মাপা হয় ; যেমন — সেন্টিগ্রেড ↑, ফারেনহাইট ↑ ও রুমার ↑।

থার্মো-মিটার

টেম্পারিং (tempering) **অব ষ্টিল** — ইস্পাতে পান্ দেওয়া। সাধারণ ইস্পাতে তৈরী জিনিসে উপযুক্তরূপ কাঠিন্য দেওয়ার জন্যে প্রথমে তাকে বিশেষভাবে উত্তপ্ত করে সহসা তেল, বা জলে ডুবিয়ে সাধারণতঃ টেম্পার করা হয়। যাকে বাংলায় বলে 'পান দেওয়া'। বিভিন্ন শ্রেণীর স্টিলে ↑ টেম্পারিং-এর কৌশল আবার বিভিন্ন-রূপ হয়ে থাকে।

টেণ্টাক্‌ল (tentacle)—শুঙ্গ ; বিশেষ বিশেষ প্রাণীর সম্মুখভাগে প্রলম্বিত নমনীয় দেহাংশ ; যা জড়িয়ে, বা ঘুরিয়ে তারা শিকার ধরে, আবার এ-গুলি উহাদের স্পর্শেন্দ্রিয়েরও কাজ করে ; এ-গুলির সাহায্যে প্রাণীরা

চলার পথের বাধা অনুভব করতে পারে; যেমন, অক্টোপাসের ↑ বাহুগুলি; শামুক, আরশোলা প্রভৃতি জীবের মুখের পার্শ্ববর্তী সরু নলসমূহ।

টেণ্ড্রিল (tendril)—বিভিন্ন লতানে উদ্ভিদের আকর্ষ, বা শুঙ্গ; অর্থাৎ লতার গাঁটে-গাঁটে যে-সব সূত্রবৎ লম্বা ও নরম অংশ বেরোয় এবং যে-গুলির সাহায্যে অবলম্বনস্বরূপ তারা নিকটবর্তী ডাল-পালা, বা কোন-কিছু জড়িয়ে-জড়িয়ে আঁকড়ে ধরে বেয়ে ওঠে, বা এগিয়ে যায়।

উদ্ভিদের আকর্ষ

টেরাটোলজি (teratology) — অস্বাভাবিক ও অতিপ্রাকৃত আকৃতি-বিশিষ্ট জীবের গঠন-বৈশিষ্ট্যাদি সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা-বিদ্যা; যেমন — মানুষের বেলায় দৈত্যাকৃতি লোক, বা অতি খর্বাকৃতি বামন, অথবা কোন যুক্তদেহ যমজ শিশুর অস্বাভাবিকতার বিভিন্নরূপ জৈবিক কারণাদি নির্ধারণের বিদ্যা।

টেলিওলজি (teleology) — প্রাণী ও উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন ও আকার-আকৃতির ক্রমপরিণতি সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যাদি (তাদের উৎপত্তি উদ্দেশ্য ও ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে) যে বিজ্ঞানে আলোচিত হয়। আবার, ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রের যে আলোচনায় জাগতিক বস্তু, বা তত্ত্বের উৎপত্তি ও পরিণতি ব্যাখ্যা করা হয় তাকেও টে. জি. বলা হয়।

টেলিগনি (telegony) — একই স্ত্রী-লোকের, (বা স্ত্রী-প্রাণীর) বিভিন্ন স্বামীর ঔরসজাত সন্তানদের মধ্যে পরবর্তী স্বামীর জাত সন্তানে পূর্ব-স্বামীর কোন-কোন বৈশিষ্ট্যের যে সম্ভাব্য প্রভাব বর্তায়।

টেলিগ্রাফ (telegraph)—বৈদ্যুতিক তারের মাধ্যমে দূরবর্তী স্থানে সাংকেতিক ভাষায় সংবাদ প্রেরণ করবার যন্ত্র। এর ট্রান্সমিটার, বা প্রেরক-যন্ত্রের একটা চাবি টিপলে তড়িৎ-স্রোত তারের মাধ্যমে সঙ্গে-সঙ্গে দূরবর্তী গ্রাহক-যন্ত্রের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় (ক্লোস্ড সার্কিট ↑); চাবিটা ছেড়ে দিলেই প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। প্রেরক-যন্ত্রের চাবিটা চেপে ধরা ও ছেড়ে দেওয়ার সময়ের কম-বেশির উপরে গ্রাহক-যন্ত্রে দু-রকম শব্দ সৃষ্টি করে — হ্রস্ব শব্দ 'টরে' ও দীর্ঘ শব্দ 'টক্কা'। মোর্স নামে এক বিজ্ঞানী ইংরাজীর 26-টা অক্ষর এই 'টরে' ও 'টক্কা' শব্দ দু'টা বিভিন্ন রকমে সাজিয়ে একটা সাংকেতিক ভাষার উদ্ভাবন করেন। এই ব্যবস্থায় গ্রাহক-যন্ত্রের ওই শব্দ-বৈচিত্র্য লক্ষ্য করে অক্ষরগুলো বুঝে নেওয়া যায়। পরে সেই অক্ষরগুলো সাজিয়ে সমস্ত সংবাদটা এর থেকে সহজেই বুঝা যেতে পারে। প্রেরক-যন্ত্র থেকে গ্রাহক-যন্ত্রে আগত মৃদু তড়িৎ-প্রবা-

হকে অবশ্য রিলে ↑ করে বাড়িয়ে নেওয়া হয়।

টেলিপ্রিণ্টার (teleprinter) — টেলিগ্রাফের ↑ যান্ত্রিক ব্যবস্থায় দূরাগত সংবাদের স্বয়ংক্রিয় লিখন-যন্ত্র। বিশেষ যান্ত্রিক কৌশলে টেলিগ্রাফের 'টরে-টক্কা' শব্দ আপনা থেকে যন্ত্রস্থ কাগজের উপর বিন্দু ও রেখায় অঙ্কিত হয়ে এক রকম সাংকেতিক লেখার সৃষ্টি করে। আজকাল আবার এর এমন উন্নত যান্ত্রিক কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে, যার সাহায্যে টেলিগ্রাফে আগত সংবাদ একেবারে টাইপ-রাইটারে ছাপা হয়ে বেরিয়ে আসে। এরূপ যন্ত্রকে বলে টেলিপ্রিণ্টার, বা **টেলিটাইপ**।

টেলিফোন (telephone)—দূরভাষ যন্ত্র; বৈদ্যুতিক তারের মাধ্যমে দূরবর্তী লোকের সঙ্গে কথা বলার যন্ত্র। মুখের কথার শব্দ-তরঙ্গ প্রেরণ ও গ্রহণের জন্যে এর প্রধান অংশ হলো 'ট্রান্সমিটার' ও 'রিসিভার' যন্ত্র। ট্রান্সমিটারে থাকে একটা কার্বন-মাইক্রোফোন ↑; ওর মুখে কথা বললে শব্দ-তরঙ্গের সংঘাতে ওই মাইক্রোফোনের পর্দা শব্দানুযায়ী কম্পিত হয়। এর ফলে মাইক্রোফোনের পর্দায় তড়িৎ-প্রবাহের পথে প্রতিবন্ধকতার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে এবং তদনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত বৈদ্যুতিক স্পন্দন দূরবর্তী রিসিভার-যন্ত্রে গিয়ে পৌছায়। রিসিভার-যন্ত্রে থাকে একটা বাঁকানো চুম্বকের দুই প্রান্তে সংলগ্ন লোহার দু'টি টুকরোর (পোল-পিস্) গায়ে জড়ানো তার-কুণ্ডলী (কয়েল ↑)। লোহার একখানা পাত্‌লা পর্দা (ডায়াফ্রাম ↑) ওই কয়েল দুটার সামনে আল্‌তোভাবে সংলগ্ন থাকে। ট্রান্সমিটার ↑ থেকে আগত বৈদ্যুতিক স্পন্দন রিসিভারের ওই কয়েলে সঞ্চারিত হয়, আর ওই লোহার পর্দাখানা তদনুযায়ী স্পন্দিত হতে থাকে। ওই পর্দা, বা ডায়াফ্রামের এরূপ নিয়ন্ত্রিত স্পন্দনে রিসিভার, বা গ্রাহক-যন্ত্রে পুনরায় তদনুযায়ী শব্দ-তরঙ্গ সৃষ্টি হয়ে শ্রুতিগোচর হয়।

টেলিফটো লেন্স (telephoto lens) — দূরের জিনিস পরিষ্কারভাবে দেখবার উপযোগী টেলিস্কোপের ↑ মধ্যে যে বিশেষ ধরনের লেন্সের ↑ মুখে ফটোগ্রাফিক ক্যামেরা লাগিয়ে দূরবর্তী বস্তুর সুস্পষ্ট ছবি তোলা যায়। এরূপ লেন্স ব্যবহারের ফলে দূরবর্তী বস্তুর প্রতিচ্ছবি টেলিস্কোপের সাধারণ যান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্যামেরার ফোকাসের ↑ মধ্যে এসে যায় এবং ফটোগ্রাফির ↑ সাধারণ নিয়মে তার ফটো ওঠে। এতে ক্যামেরার সাধারণ লেন্সের জায়গায় বিশেষ ধরনের একখানা কন্‌কেভ ↑ লেন্স এবং একখানা কনভেক্স ↑ লেন্স যুগ্মভাবে লাগানো থাকে।

টেলিভিসন (television) — যে যন্ত্রের সাহায্যে কোন বস্তু, বা দৃশ্যের ছায়াচিত্র কৌশলে দূরবর্তী স্থানে প্রেরণ করে পর্দায় ফুটিয়ে তোলা যায়; সংক্ষেপে বলে টি. ভি. (T. V)। যে বস্তুর প্রতিকৃতি দূরে পাঠাতে হবে

তার উপর যথোপযুক্ত আলোকপাত করলে প্রেরক-যন্ত্রের মধ্যে আলো-ছায়ার তীব্রতার তারতম্যানুযায়ী যান্ত্রিক কৌশলে সূক্ষ্ম (ফটো-ইলেক্ট্রিক ↑) তড়িত্তরঙ্গ উৎপাদিত হয় এবং
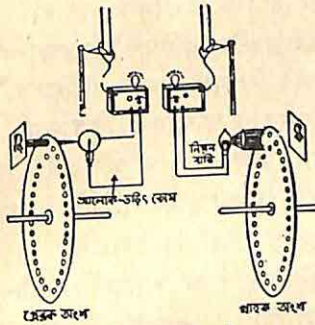
টেলিভিসন যন্ত্রের মোটামুটি নক্সা

তা আবার বেতার-তরঙ্গের (ইলেক্ট্রোম্যাগ্নেটিক ওয়েভ ↑) ন্যায় চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সেই তড়িতরঙ্গ দূরবর্তী গ্রাহক-যন্ত্রে গিয়ে পৌছায় এবং বিশেষ ব্যবস্থায় তার উৎপাদক আলোক-রশ্মির তীব্রতার তারতম্যানুযায়ী পুনরায় আলোক-রশ্মির সৃষ্টি করে। এভাবে প্রেরক-যন্ত্রস্থ আলোক-রশ্মির তীব্রতার হ্রাস-বৃদ্ধি অনুযায়ী গ্রাহক-যন্ত্রের মধ্যেও আলোক-রশ্মির হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে এবং তদনুযায়ী আলো-ছায়ার সৃষ্টি করে। এভাবে দূরবর্তী প্রেরক-যন্ত্রের সম্মুখস্থ চিত্র, বা দৃশ্যের অবিকল প্রতিচ্ছবি গ্রাহক - যন্ত্রের সম্মুখস্থ পর্দায় ফুটিয়ে তোলে। শত শত মাইল দূরবর্তী লোকের অঙ্গভঙ্গি সহ সম্যক চিত্র এভাবে গ্রাহক-যন্ত্রের পর্দায় ফুটে ওঠে; আর একই সঙ্গে সাধারণ রেডিও ↑ যন্ত্রের ব্যবস্থায় তার মুখের কথাও শোনা যায়।

টেলিস্কোপ (telescope) — দূরবীক্ষণ যন্ত্র; বহু দূরবর্তী বস্তুর প্রতিচ্ছবি বর্ধিতাকারে দেখবার জন্যে উদ্ভাবিত যন্ত্র। 1603 খৃষ্টাব্দে গ্যালিলিও ↑ প্রথম আবিষ্কার করেন; ক্রমে অবশ্য এ-যন্ত্রের নানারূপ উন্নতি সাধিত হয়েছে। সম্প্রতি ম্যাউন্ট প্যালোমার বীক্ষণাগারে স্থাপিত 200˝ ইঞ্চি ব্যাসের প্রতিফলক-লেন্সযুক্ত টেলিস্কোপে লক্ষ লক্ষ আলোক-বর্ষ (লাইট-ইয়ার ↑) দূরের জ্যোতিষ্কও দেখা যাচ্ছে। টেলিস্কোপ দু'রকম হতে পারে: **রিফ্র্যাক্টিং টেলিস্কোপ** যন্ত্রের অব্জেক্টিভে ↑ থাকে একখানা অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর উত্তল (কনভেক্স ↑) লেন্স, যার ভিতর দিয়ে প্রতিসরিত হয়ে দ্রষ্টব্য বস্তুর ক্ষুদ্র, অথচ পরিষ্কার প্রতিচ্ছায়া যন্ত্রের ভিতরে পড়ে। ওই প্রতিচ্ছায়া আবার আইপিসের ↑ অবতল (কন্কেভ ↑) লেন্সে প্রতিফলিত হয়ে বর্ধিতাকারে দৃষ্টিগোচর হয়। আবার **রিফ্লেক্টিং টেলিস্কোপ** যন্ত্রের অব্জেক্টিভে ← থাকে লেন্সের বদলে একখানা অবতল (কন্কেভ) দর্পণ, যাতে প্রতিফলিত হয়ে দ্রষ্টব্য বস্তুর ছায়া যন্ত্রের ভিতরে পড়ে, যা আবার আইপিসের লেন্সে প্রতিসরিত হয়ে বর্ধিতাকারে দেখা যায়। এ-সব দূরবীক্ষণ যন্ত্র গ্রহ-নক্ষত্রাদি
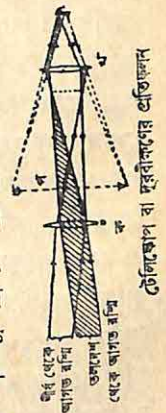
টেলিস্কোপ বা দূরবীক্ষণের প্রতিফলন

পর্যবেক্ষণের জন্যেই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এতে দৃশ্য বস্তুর উল্‌টো ছায়া পড়ে বলে ভূ-পৃষ্ঠের দূরবর্তী জিনিস দেখা অসুবিধাজনক। এ-জন্যে আবার একখানা প্রিজম ↑ বিশেষ ব্যবস্থায় এরূপ টেলিস্কোপে লাগানো হয়, যার ফলে উল্টো ছায়া সোজা হয়ে এসে দর্শকের চোখে পড়ে। (বাইনোকুলার ↑)

ট্যাকোমিটার (tachometer) — যে যন্ত্রের সাহায্যে প্রতি মিনিটে ইঞ্জিনের চাকার ঘূর্ণন-সংখ্যা জানা যায় ; একে গাড়ীর গতি-নির্ধারক যন্ত্রও বলা যায়। 'ট্যাক্‌···' মানে হলো গতি ; 'ট্যাকি···' মানে দ্রুত, যেমন —**ট্যাকিকার্ডিয়া,** দ্রুত হৃৎস্পন্দন।

ট্যান্‌টালাম (tantalum)—মৌলিক ধাতু ; অত্যন্ত কঠিন পদার্থ। হাইড্রোফ্লোরিক ↑ অ্যাসিড ছাড়া অন্য কোন অ্যাসিডেই গলে না। উত্তাপ ও অ্যাসিডের ক্রিয়া প্রতিরোধক কোন কোন ধাতু-সংকর (অ্যালয় ↑) প্রস্তুত করতে ব্যবহৃত হয়। ধাতুটার গ্যাস শোষণের ক্ষমতাও যথেষ্ট প্রবল ; এ-জন্যে ভ্যাকুয়াম ↑ নল তৈরী করতে অনেক সময় ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ট্যানিং (tanning)—জীবজন্তুর কাঁচা চামড়াকে যে প্রক্রিয়ার সাহায্যে ব্যবহারোপযোগী তৈরী পাকা চামড়ায় (লেদার) পরিণত করা হয়। এজন্যে ট্যানিক ↑ অ্যাসিড, বিভিন্ন শ্রেণীর ট্যানিন ↑ , অ্যালাম ↑ প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে বিভিন্ন প্রক্রিয়া করা হয়ে থাকে। ক্রোমিয়াম ↑ -ঘটিত বিভিন্ন সল্টও ট্যানিং-এর কাজে দরকার হয়ে থাকে।

ট্যানিক অ্যাসিড (tannic acid)—বিশেষ এক প্রকার উদ্ভিদের 'গল্‌-নাট' নামক ফল থেকে নিষ্কাশিত জৈব রাসায়নিক অ্যাসিড ; সাদা গুঁড়া, জলে দ্রবণীয়। হরিতকী, বহেড়া প্রভৃতি দেশীয় নানা রকম উদ্ভিদের ফল থেকেও এ-জাতীয় বিভিন্ন অ্যাসিডের অ্যালকালয়েড ↑ পাওয়া যায়; এগুলো সব **ট্যানিন** নামে পরিচিত। এদের মধ্যেও ট্যানিক অ্যাসিড বিভিন্ন পরিমাণে যুক্ত থাকে। চর্ম-শিল্পে (ট্যানিং ↑) ও কালি তৈরী করতে ব্যবহৃত হয়।

ট্যাল্‌ক (talc) — নরম এক শ্রেণীর পাথরের মসৃণ চূর্ণ। পদার্থটা দিয়ে সাধারণতঃ গায়ে মাখার (ট্যালকাম্‌) পাউডার তৈরী হয়। রাসায়নিক হিসেবে পাথরটার গঠনে প্রধানতঃ থাকে ম্যাগ্নেসিয়াম সিলিকেট ↑।

ট্যালো (tallow)—বিশোধিত জান্তব চর্বি। বিশেষতঃ গরু, ভেড়া প্রভৃতির চর্বি থেকেই বিভিন্ন প্রকার বিশোধন-প্রক্রিয়ায় ট্যালো তৈরী হয়ে থাকে। রাসায়নিক হিসেবে এটা নানা শ্রেণীর গ্লিসারাইড ↑ পদার্থে গঠিত। বর্ণ, গন্ধ ও স্বাদহীন এবং নির্দোষ বলে পদার্থটা বিভিন্ন খাদ্য-বস্তুতে মিশ্রিত করা হয়। উৎকৃষ্ট ও উন্নত সাবান-শিল্পেও এর ব্যবহার আছে।

ট্রয়-ওয়েট (Troi weight) — মণি-মুক্তা, সোনা-রূপা মাপবার ইংলণ্ডীয় সূক্ষ্ম ওজন পরিমাণ ঃ

1 গ্রেণ = ·0648 গ্র্যাম
20 গ্রেণ = 1 স্ক্রুপল
24 গ্রেণ = 1 পেনিওয়েট
3 স্ক্রুপল = 1 ড্রাম
8 ড্রাম = 1 আউন্স ট্রয় =
1·1 আউন্স (অ্যাভয়ড্রুপয়েজ ↑)

ট্রাইটিয়াম (tritium) — হাইড্রোজেনের তৃতীয় আইসোটোপ ↑; একে **ট্রাইটন**-ও বলে। স্বাভাবিক হাইড্রোজেন-পরমাণুর কেন্দ্রীণে থাকে একটি মাত্র প্রোটন ↑ কণিকা। হাইড্রোজেনের ডয়েটেরিয়াম ↑ আইসোটোপে থাকে একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন ↑ কণিকা; আর এই ট্রাইটিয়ামের কেন্দ্রীণে থাকে একটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রন কণিকা। অ্যাটমিক ফিউসন ↑ প্রক্রিয়ার সাহায্যে এই ট্রাইটিয়ামের কেন্দ্রীণে (নিউক্লিয়াস ↑) অতিরিক্ত আর একটি প্রোটন যোগ করলে হিলিয়াম ↑ অণুর সৃষ্টি হয়।

ট্রাইহাইড্রল (trihydrol) — যে পদার্থের অণু তিনটি জলীয় অণুর (H_2O) সমন্বয়ে গঠিত হয়; যেমন, H_6O_3, অর্থাৎ $(H_2O)_3$।

ট্রাইসেপ্‌স

ট্রাইসেপ্‌স (triceps) — মানুষের বাহুদ্বয়ের ঊর্ধ্ব-পশ্চাদ্ভাগস্থ মাংসপেশী; যার সংকোচন-প্রসারণের ফলে হাত সহজেই ওঠা-নামা করতে পারে এবং কাজকর্ম করা সম্ভব হয়ে থাকে।

ট্রাইপ্লেক্স (triplex) — তিনটি স্তর, বা অংশ-বিশিষ্ট; যেমন, **ট্রাইপ্লেক্স গ্লাস** — পৃথক তিনখানা পাত্‌লা কাচের পাত্‌ জুড়ে যে-কাচ তৈরি হয়। নিরাপত্তার জন্যে মোটর গাড়ীর জানালায় এরূপ কাচ ব্যবহৃত হয়। সহজে ভাঙ্গে না; ভাঙ্গলেও টুক্‌রা ছিট্‌কে বিপদ ঘটায় না। এরূপ **ট্রাইপ্লেক্স উড**-ও তৈরী করা হয়, যাকে সচরাচর আমরা বলি **'প্লাইউড'**।

ট্রাইবেসিক অ্যাসিড (tribasic acid) — যে-সব অ্যাসিডের আণবিক গঠনে ধাতুর দ্বারা প্রতিস্থাপন-যোগ্য এমন তিনটা হাইড্রোজেন-পরমাণু থাকে যেগুলো একে-একে অপসারিত করে তিন রকম ধাতব সল্ট গঠিত হতে পারে। ফস্‌ফরিক অ্যাসিড (H_3PO_4) হলো এ-রকম একটা অ্যাসিড; এর সোডিয়াম সল্ট তিন রকমের হতে পারে: (i) Na_3PO_4, (ii) Na_2HPO_4, (iii) NaH_2PO_4 (সল্ট হলো শেষোক্ত দুটি অ্যাসিড, বা হাইড্রোজেন ফস্‌ফেট সল্ট ↑)।

ট্রাকোমা (trachoma) — এক রকম সংক্রামক ও কষ্টদায়ক চক্ষুরোগ; এ-রোগে চোখের কঞ্জাংটিভা ↑ স্ফীত হয় এবং চোখের পাতার তলায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকা জন্মায়। কঞ্জাংটিভার পর্দা ও কর্ণিয়া ↑ এ-রোগে অনচ্ছ হয়ে পড়ে এবং দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হয়ে যায়।

ট্রান্‌জিষ্টর (transistor) — অতি-সূক্ষ্ম তড়িৎ-তরঙ্গ গ্রহণোপযোগী ইলেক্‌ট্রনিক ↑ যন্ত্রাংশ বিশেষ; প্রধানতঃ জার্মেনিয়াম ↑ ধাতুর ক্রিষ্ট্যালে ↑

তৈরী হয়; যা ইলেক্ট্রিক রেডিও যন্ত্রের ভ্যাকুয়াম ভাল্ব ↑, বা ডায়োডের ↑ অনুরূপ কাজ করে; কিন্তু স্থায়িত্বে, ক্ষুদ্রতায় ও ক্ষমতায় অধিকতর সুবিধাজনক। অতি ক্ষীণ তড়িৎ-শক্তির প্রভাবে দূরাগত তড়িত্তরঙ্গের ইলেক্ট্রন ↑ কণিকার ধারা পরিগ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণের অভাবনীয় ক্ষমতা। রেডিও, অ্যারোপ্লেন প্রভৃতিতে সূক্ষ্ম বেতার-তরঙ্গ গ্রহণের সর্বাধুনিক (1948 খৃঃ, আমেরিকা) আশ্চর্য আবিষ্কার।

ট্রান্সফিউসন (transfusion) — সুস্থ লোকের দেহের রক্ত, বা রক্তরস (লিম্প ↑) রক্তশূন্য (অ্যানিমিয়া ↑) রোগীর শিরায় প্রবেশ করানোর প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত রক্ত রোগীর রক্তের অনুরূপ পর্যায়ের হওয়া দরকার; যে-কোন লোকের রক্ত যে-কোন রোগীর দেহে কার্যকরী হয় না। এ-সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও রক্ত সংরক্ষণের জন্যে আজকাল বড় বড় হাসপাতালে 'ব্ল্যাড-ব্যাঙ্ক' নামক সংরক্ষণাগার স্থাপিত হয়েছে।

ট্রান্সভার্স ওয়েভ (transverse wave) — প্রবাহ-পথের লম্বভাবে
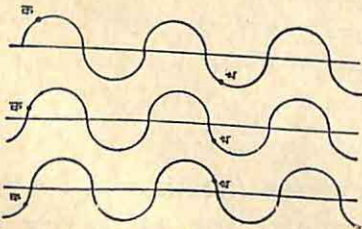
ট্রান্সভার্স ওয়েভ

স্পন্দিত বস্তু-কণিকার সঞ্চরণ, বা গতির ফলে বায়ু, অথবা ইথারে ↑ যে তরঙ্গস্পন্দনের সৃষ্টি হয়। এরূপ তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য হলো, স্পন্দিত পদার্থের কণিকাগুলোই উপরে-নীচে সঞ্চলনের ফলে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। প্রকৃতপক্ষে কোন বস্তু-কণিকা স্পন্দিত না হয়েও আলোক ও বেতার প্রভৃতি শক্তি তরঙ্গাকারে সঞ্চালিত হয়, কিন্তু তা ট্রান্সভার্স নয়; তা হলো লঙ্গিচিউডিন্যাল ↑। জলে যে তরঙ্গের সৃষ্টি হয় তা ট্রান্সভার্স ওয়েভের একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

ট্রান্সম্যুটেশন অব এলিমেণ্ট (transmutation of element) — একটা মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক গঠন বদলে ফেলে অন্য কোন মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়া। এক সময় অ্যাল্‌কেমিস্টরা ↑ এরই চেষ্টা করতেন; পরে এটা অসম্ভব বলে পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু সাম্প্রতিককালে স্বয়ংপ্রভ, বা তেজষ্ক্রিয় (রেডিও-অ্যাক্‌টিভ ↑) পদার্থের তথ্যাদি আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে দেখা গিয়েছে যে, রেডিও-অ্যাক্‌টিভ পদার্থে এরূপ পারমাণবিক মৌলিক পরিবর্তন অহরহঃই ঘটে থাকে। ইউরেনিয়াম ↑ ধাতু তেজঃবিকিরণের ফলে ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হয়ে শেষে সীসায় পরিণত হয়ে যায়। তাছাড়া নিউক্লিয়ার পদার্থ-বিদ্যার পরীক্ষাদিতে সাইক্লোট্রোন ↑ নামক যন্ত্রের সাহায্যে নিউট্রন ↑ কণিকা, আল্‌ফা ↑ কণিকা প্রভৃতির দ্রুত সংঘাতে বেরিলিয়াম ↑ ধাতুকে কার্বনে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়েছে। এভাবে বিভিন্ন জটিল

প্রক্রিয়ার সাহায্যে বিশেষ-বিশেষ মৌলিক পদার্থকে অন্য রকম মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়েছে। এক দিন হয়তো সেই প্রাচীন অ্যাল্‌কেমিস্টদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী লোহাকে সোনা করাও সম্ভব হতে পারে।

ট্রান্সফর্মার (transformer) — যে যান্ত্রিক ব্যবস্থার সাহায্যে অল্টারনেটিং ↑ (পরিবর্তী) তড়িৎ-প্রবাহের চাপের (ভোল্টেজ ↑) হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়ে ধারা-প্রবাহের (কারেন্ট) পরিবর্তন করা সম্ভবপর হয়ে থাকে। এর মূল ব্যবস্থা হলো: বৈদ্যুতিক তারের একটা ছোট কয়েলের চারদিক ঘিরে আর একটা বড় কয়েল (তার-কুণ্ডলী) এমন ভাবে রাখা হয় যেন দুটার মাঝে কিছু ফাঁক (ইন্‌সুলেটেড) থাকে। ছোট কয়েলটাকে বলে **প্রাইমারি** কয়েল, আর বড়টাকে বলে **সেকেণ্ডারি** কয়েল। মধ্যবর্তী প্রাইমারি কয়েলের মধ্যে একটা লোহার রড দিলে আরও ভাল কাজ হয়। এখন প্রাইমারি কয়েলের মধ্যে অল্টারনেটিং কারেন্ট প্রবাহিত হলে ইণ্ডাক্‌সনের ↑ ফলে সেকেণ্ডারি কয়েলে মধ্যেও ওই অল্টারনেটিং কারেন্টের তড়িৎ-প্রবাহ সঞ্চারিত হয়; কিন্তু তার ভোল্টেজের পরিবর্তন ঘটে থাকে। তড়িৎ-প্রবাহের ভোল্টেজের এরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ভর করে ওই দুই কয়েলে জড়ানো তারের পাকের সংখ্যার উপর। সেকেণ্ডারি কয়েলে প্রাইমারি কয়েল অপেক্ষা তারের পাক যদি বেশি থাকে তাহলে তার ভোল্টেজ তদনুযায়ী বেড়ে যায়। এরূপ ব্যবস্থাকে বলা হয় '**স্টেপ-আপ ট্রান্সফর্মার**'। আর, সেকেণ্ডারি কয়েলে প্রাইমারির চেয়ে পাকের সংখ্যা কম হলে ভোল্টেজও তদনুযায়ী কমে যায়। একে বলে '**স্টেপ-ডাউন ট্রান্সফর্মার**'।
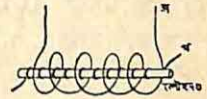
স্টেপডাউন' ট্রান্সফর্মারের ব্যবস্থা

'ষ্টপ-আপ' ট্রান্সফর্মারের ব্যবস্থা

ট্রান্সইউরেনিক এলিমেণ্ট (transuranic elements) — যে সব মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক ওজন ইউরেনিয়ামের ↑ চেয়ে বেশি। মেণ্ডেলিফের 'পিরিয়ডিক টেবল'-এ ↑ এরূপ কয়েকটা মৌলিক পদার্থের উল্লেখ ছিল। ক্রমে আবিষ্কৃত হওয়ার পরে এদের নাম দেওয়া হয়েছে—নেপচুনিয়াম ↑ (93), প্লুটোনিয়াম ↑ (94), অ্যামিরিসিয়াম (95), কুরিয়াম (96), বার্কেলিয়াম (97), ক্যালিফোর্নিয়াম (98)। ইউরেনিয়ামের পারমাণবিক ওজন 92; এগুলোর পা. ও. পর্যায়ক্রমে তার চেয়ে বেশি; তাই এদের ট্রান্সইউরেনিক মৌলিক পদার্থ বলা হয়। অদ্যাপি পৃথিবীতে এ-রকম স্বাভাবিক মৌলিক পদার্থের সন্ধান অবশ্য পাওয়া যায় নি; তবে উপযুক্ত কৌশলে কেন্দ্রীণের রূপান্তর বিক্রিয়ার (নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন ↑) সাহায্যে

এগুলোর অস্তিত্বের অস্থায়ী সন্ধান মাত্র পাওয়া গেছে।

ট্রিগনোমেট্রি (trigonometry) — ত্রিকোণমিতি ; গণিতশাস্ত্রের একটি বিশেষ শাখা। ত্রিভূজের বা ও কোণের বিভিন্ন অনুপাত (রেসিও, যেমন — সাইন ↑, কস্ ↑, ট্যান প্রভৃতি) নিয়ে এই শাখায় বিভিন্ন গাণিতিক তথ্যের সমাধান করা হয়।

ট্রোপোস্ফিয়ার (troposphere) — পৃথিবীর নিকটবর্তী, অর্থাৎ সর্বনিম্ন বায়ুমণ্ডলীয় স্তর। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় 10 মাইল উচ্চতা-বিশিষ্ট এই স্তরেই পৃথিবীর আবহাওয়া নিয়ন্ত্রিত হয়। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে এই বায়ু-স্তরের যত উর্ধে ওঠা যায় বায়ু-মণ্ডলের উষ্ণতা ও চলাচল প্রভৃতি ক্রমে-ক্রমে তত হ্রাস পেতে থাকে। (অ্যাট্‌মস্ফিয়ার ↑)

ডকুমেণ্টারি ফিল্ম (documentary film) — প্রামাণ্য চলচ্চিত্র। কাল্পনিক আখ্যান নয়, এমন যে-সব বাস্তব চলচ্চিত্র সংবাদ প্রচারের জন্যে, অথবা লোক-শিক্ষার উদ্দেশ্যে তোলা হয়ে থাকে।

ডগষ্টার (dogstar) — 'সিরিয়াস' নামক নক্ষত্রটির প্রচলিত নাম; গগন-মণ্ডলের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র।

ডপলার (Doppler), ক্রিশ্চিয়ান জোহান — আষ্ট্রিয়াবাসী পদার্থ-বিজ্ঞানী, জন্ম 1803 খৃঃ, মৃত্যু 1853 খৃষ্টাব্দ। শব্দ-বিজ্ঞানের বহু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা : শ্রোতা ও উৎসের ব্যবধানের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে শ্রুত শব্দের ধ্বনিগ্রামের উন্নতি-অবনতি বিষয়ক বৈজ্ঞানিক তথ্য বিশ্লেষণ। (ডপ্‌লার এফেক্ট ↑)। অনুরূপ শব্দ-তরঙ্গঘটিত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্যের সমাধানে 'ডপ্‌লার প্রিন্সিপ্‌ল' ↑ সবিশেষ খ্যাত। এই তথ্যের সাহায্যে নক্ষত্রের গতি, সূর্যের আবর্তন প্রভৃতি জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিভিন্ন জটিল তথ্যাদিও নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে।

ডপ্‌লার এফেক্ট (Doppler effect) — ডপ্‌লার ↑ কর্তৃক ব্যাখ্যাত শব্দ-বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক সূত্র বিশেষ। শব্দের ধ্বনিগ্রাম (পিচ্ ↑, তীব্রতা) বস্তুতঃ শব্দ-তরঙ্গের ফ্রিকোয়েন্সির ↑ উপরে নির্ভরশীল ; অর্থাৎ 'ফ্রিকোয়েন্সি' হলো প্রতি সেকেণ্ডে কতগুলি শব্দ-তরঙ্গ উত্থিত হলো, এবং শ্রোতার কানে এল, সেই সংখ্যা। ধরা যাক্, একটা রেল ইঞ্জিন বাঁশি বাজিয়ে ছুটছে, বাঁশির শব্দের একটা বিশিষ্ট ধ্বনি আছে ; কারণ, সেই শব্দের নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি আছে। ট্রেনটা যদি শ্রোতার দিকে এগিয়ে আসে তাহলে তার গতির দ্রুততা অনুসারে শব্দ-তরঙ্গগুলি অধিকতর সংখ্যায় (প্রতি সেকেণ্ডে) শ্রোতার কানে আসবে, কাজেই ফিকোয়েন্সি বেড়ে যাবে ; ফলে, শব্দের ধ্বনিগ্রামও বাড়বে। ট্রেনটা শ্রোতার থেকে দূরে যেতে থাকলে বাঁশির শব্দ-তরঙ্গ ক্রমে কম সংখ্যায় শ্রোতার কানে আসবে ; কাজেই তার ফ্রিকোয়েন্সি কমবে, ধ্বনির তীব্রতাও তদনুযায়ী কমবে। উৎসের প্রকৃত ধ্বনি ও শব্দ-তরঙ্গের

ফ্রিকোয়েন্সি একই থেকেও শ্রোতার কানে শব্দের এইরূপ বিভিন্নতার কারণ শব্দ-বিজ্ঞানে 'ডপ্‌লার এফেক্ট' বলে খ্যাত।

ডপ্‌লার প্রিন্সিপল (Doppler-principle) —কেবল শব্দ-তরঙ্গেরই নয়, যে-কোন তরঙ্গ মাত্রেরই অনুরূপ ধর্ম বিজ্ঞানী ডপ্‌লার↑ প্রতিপন্ন করেন এবং এই সাধারণ সূত্র 'ডপ্‌লার প্রিন্সিপ্‌ল' নামে খ্যাত। কোন নক্ষত্র যদি পৃথিবী থেকে ক্রমে দূরে সরে যায়, তাহলে তার আলোক-তরঙ্গের ফ্রিকোয়েন্সি↑ ক্রমে কমে যাবে এবং তাকে অধিকতর লাল দেখাবে (লাল আলোক-রশ্মির ফ্রিকোয়েন্সি কম বলে)। আলোক-রশ্মির বর্ণালি বিশ্লেষণ করে ডপ্‌লারের এই সূত্রের সাহায্যে সূর্যের আবর্তন, নক্ষত্রের আপেক্ষিক গতি প্রভৃতি বিশ্ব-রহস্যের বহু অজ্ঞাত তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে।

ডর্ম্যাণ্ট (dormant) — সুপ্ত, বা নিষ্ক্রিয়অবস্থায় আছে, অর্থাৎ কোনরূপ ক্রিয়াশীল নয়, এমন।

ডলড্রাম (doldrum) — ভূ-বিষুব-রেখার 4° উত্তর থেকে 4° দক্ষিণ পর্যন্ত নিরক্ষীয় অঞ্চল। পৃথিবীর আবর্তনের ফলে উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের পরস্পর বিপরীত-মুখী বায়ুমণ্ডলীয় চাপের ফলে এই অঞ্চলের সমুদ্রে বায়ু-প্রবাহ প্রায় থাকে না, ঝড়-ঝঞ্ঝা কম হয়; কিন্তু এ-অঞ্চলে সাধারণতঃ প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে।
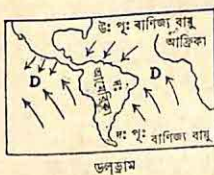
ডলড্রাম

ডলোমাইট (dolomite) — ক্যালসিয়াম ও ম্যাগ্নেসিয়াম ধাতুর আকরিক, যুগ্ম-কার্বনেট ($MgCO_3.CaCO_3$); সাদাটে কঠিন প্রস্তর বিশেষ। পর্বতাদি প্রধানতঃ এ দিয়ে গড়া। একে **পার্লস্পার**-ও বলা হয়। বিভিন্ন ধাতু-নিষ্কাশনের চুল্লী তৈরী করতে পদার্থটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ডলি (dolly) — চাকার উপরে একটা প্লাটফর্ম বিশিষ্ট এক রকম হাল্‌কা গাড়ী। চলচ্চিত্রের ছবি তোলবার সময় এরূপ গাড়ীর উপরে ক্যামেরা ও ফটোগ্রাফার থাকে এবং প্রয়োজনমত এরূপ মোটর-চালিত গাড়ী চালিয়ে ধাবমান, অর্থাৎ চলন্ত লক্ষ্যবস্তুর চলচ্চিত্র তোলা সম্ভব হয়।

ডলি

ডয়েটেরিয়াম (deuterium)—হেভি হাইড্রোজেন↑; হাইড্রোজেনের একটা আইসোটোপ↑; যার অ্যাটমিক ওয়েট 2 (সাধারণ হাইড্রোজেনের অ্যা. ওয়েট 1)। এর কেন্দ্রীণ, বা নিউক্লিয়াসে থাকে একটি প্রোটন↑ এবং একটি নিউট্রন↑ (সাধারণ হাইড্রোজেন-পরমাণুর কেন্দ্রীণে কোন নিউট্রন থাকে না)। এই হেভি হাইড্রোজেন, অর্থাৎ ডয়েটেরিয়ামের কেন্দ্রীণকে বলে **ডয়েটেরন**।

ডাইঅ্যাটমিক (diatomic) — দ্বি-

পরমাণুক ; কোন মৌলিক পদার্থের অণু দুটি পরমাণুর সংযোগে গঠিত হলে তাকে বলা হয় ডাইঅ্যাটমিক মৌল ; যেমন—হাইড্রোজেনের এক-একটি অণু দুটি করে হাইড্রোজেন-পরমাণুর সংযোগে গঠিত, H_2।

ডাইয়ুরেটিক (diuretic)—যে ঔষধে প্রস্রাবের প্রবাহ ও পরিমাণ বৃদ্ধি করে; যথোপযুক্ত মূত্র-বৃদ্ধিকর ঔষধ।

ডাইকটিলিডন(dicotyledon)—দ্বি-বীজপত্রী উদ্ভিদ ; যে-সকল উদ্ভিদের বীজে দুইটি ভ্রূণ-পত্র থাকে। এই শ্রেণীর বীজ গজিয়ে বীজ-পত্রদ্বয়সহ মাটি থেকে উপরে উঠে যায়।

ডাইক্রোমেট (dichromate) — বাইক্রোমেট সল্টকে কখন-কখন ডাই-ক্রোমেটও বলা হয়। ক্রোমেট ↑ সল্টের অ্যাসিড র‍্যাডিক্যাল ↑ CrO_4, (যেমন, পটাসিয়াম ক্রোমেট, K_2CrO_4) ; আর ডাইক্রোমেটের র‍্যাডিক্যাল হলো Cr_2O_7, (যেমন, পটাসিয়াম ডাইক্রোমেট $K_2Cr_2O_7$); ডাইক্রোমেট সল্টগুলি বিশেষ জারক পদার্থ (অক্সিডাইজিং এজেন্ট ↑)।

ডাইলেকট্রিক (dielectric) — যে-সব পদার্থ তড়িৎ-প্রবাহ প্রতিরোধ করে ; যেমন — বায়ু, রাবার, অভ্র (মাইকা ↑), কাগজ প্রভৃতি। এজন্য কণ্ডেন্সারের ↑ বিভিন্ন প্লেটের মাঝে মাঝে প্রতিরোধক হিসাবে (ইন্সুলেটর ↑) এরূপ পদার্থ দেওয়া হয়।

ডাইবেসিক অ্যাসিড (dibasic acid) — যে অ্যাসিডে ↑ প্রতিস্থাপন-যোগ্য দুটি হাইড্রোজেন-পরমাণু থাকে, যেমন — H_2SO_4 ; কিন্তু HCl নয়। এরূপ অ্যাসিডের রাসায়নিক ক্রিয়ায় দু' রকম ধাতব লবণ হতে পারে,— শমিত লবণ, K_2SO_4, অর্ধশমিত লবণ $KHSO_4$, (অ্যাসিড সল্ট ↑)।

ডাইরেক্ট ডাই (direct dye) — যে-সব রঞ্জক পদার্থ তুলা, রেয়ন ↑ , বা বিভিন্ন সেলুলোজ ↑ জাতীয় পদার্থকে কোন প্রকার 'মরড্যাণ্ট' ↑ ব্যতিরেকেই রঞ্জিত করতে পারে। সাধারণতঃ এই শ্রেণীর রঞ্জক দ্রব্যের জলীয় দ্রবণের সঙ্গে সাহায্যকারী হিসেবে কিছু সোডিয়াম-ক্লোরাইড, বা সোডিয়াম সালফেট সল্ট মিশিয়ে নেওয়া হয় মাত্র।

ডাইরেক্ট কারেণ্ট (direct current) — যে তড়িৎস্রোত সর্বদা স্থিরভাবে একই দিকে প্রবাহিত হয় ; অল্টারনেটিং ↑ (পরিবর্তী) কারেণ্টের মত ক্রমাগত দিক পরিবর্তন করে না। সংক্ষেপে বলে ডি. সি. তড়িৎপ্রবাহ।

ডাইমর্ফিজ্‌ম (dimorphism) — কোন কঠিন পদার্থের গঠনে দু-রকম বিভিন্ন আকারের স্ফটিক, বা ক্রিস্ট্যাল ↑ সমাবেশের অবস্থা। এ-রকম পদার্থকে বলে **ডাইমর্ফাস**।

ডাইভিং বেল (diving bell) — এক প্রকার ধাতব (ঘণ্টাকৃতি, অথবা বাক্সের মত) আধারে করে পর্যবেক্ষণ বা অনুসন্ধানের জন্যে ডুবুরীরা জলের নীচে নামে। এই বিরাট আধারটার তলার দিকটা থাকে খোলা, কিন্তু একটা পাইপ দিয়ে উপর থেকে এমন ভাবে বাতাস পাম্প করে ঢোকান

হয় যাতে প্রবিষ্ট বায়ুর চাপে নীচের জল আধারটার ভিতরে আর ঢুকতে পারে না ; ডুবুরী স্বচ্ছন্দে ওর ভিতরে
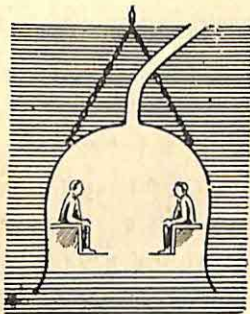
ডাইভিং বেল

থাকতে পারে। প্রয়োজন শেষ হলে ডুবুরী ইঙ্গিতে জানায়, আর উপর থেকে শিকলে - বাঁধা আধারটাকে সময়মত টেনে তোলা হয়।

ডাইনামিক্‌স (dynamics) — শক্তি ও গতি সম্বন্ধীয় ব্যবহারিক বিজ্ঞান। যেমন, **অ্যারোডাইনামিক্‌স** বায়ু-প্রবাহের গতিশক্তি সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান ; **হাইড্রো - ডাইনামিক্‌স** জলশক্তি বিষয়ক বিজ্ঞান।

ডাইয়েন্‌সেফালন (diencephalon) — মধ্য-মস্তিষ্ক ; মস্তিষ্কের যে অংশে এণ্ডোক্রাইন (endocrine)↑ গ্ল্যাণ্ড-গুলির ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয় ; শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়া (emotion) সমূহের মূল ভিত্তিস্থল।

ডাক্‌টলেস গ্ল্যাণ্ড (ductless gland) —এণ্ডোক্রাইন ↑ গ্ল্যাণ্ড, বা অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি। দেহের অভ্যন্তরস্থ যে-সব গ্রন্থির জৈব রস (হর্মোন ↑) অন্তর্নিঃ-স্থত হয়ে সরাসরি রক্তস্রোতে মিশে যায়। এ-সব গ্ল্যাণ্ড থেকে হর্মোন নিঃসরণের কোন বহির্মুখ থাকে না।

ডাক্টাইল (ductile)—প্রসার্য ; ঠাণ্ডা অবস্থায়ই আঘাতে, বা টানে ধাতুর আয়তন-বৃদ্ধি ; যেমন, সোনা একটা ডা. ল. ধাতু, কিন্তু ষ্টিল ↑ নয়। **ডাক্‌-টাইলিটি**, ধাতুর প্রসার্যতা ধর্ম।

ডাচ মেটাল (Dutch metal) — তামা ও দস্তার মিশ্রণে তৈরী বিশেষ একটি সংকর-ধাতু। বস্তুতঃ এই শ্রেণীর সংকর-ধাতুকে সাধারণ কথায় বলা হয় পিতল, বা ব্রাস ↑।

ডাচ লিকুইড (Dutch liquid) — ইথিলিন ডাইক্লোরাইড, $C_2H_4Cl_2$; বর্ণহীন ও তৈলাক্ত তরল পদার্থ। একটি উৎকৃষ্ট দ্রাবক ; ধূম-উৎপাদক পদার্থ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।

ডায়মণ্ড (diamond)—হীরক ; রাসা-য়নিক হিসেবে পদার্থটা মূলতঃ কার্বন, বা কয়লা ; কার্বনের একটা প্রাকৃতিক অ্যালোট্রোপ ↑। সাধা-রণতঃ বর্ণহীন, উজ্জ্বল স্ফটিকাকার মূল্যবান পদার্থ। পরিচিত সকল পদার্থের মধ্যে সব চেয়ে কঠিন। কৃত্রিম উপায়ে হীরকের প্রায় অনুরূপ পদার্থ তৈরী করা যেতে পারে ; প্রায় 3500° সেন্টিগ্রেডে গলিত লোহার মধ্যে বিশুদ্ধ কার্বন গলিয়ে সহসা ঠাণ্ডা করে ফেললে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরক-কণা পাওয়া যায়। ময়সাঁ নামে এক বিজ্ঞানী এভাবে এক রকম কৃত্রিম হীরক তৈরী করেছিলেন ; কিন্তু প্রক্রিয়াটা ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য বলে স্বভাবজাত হীরক অপেক্ষাও জিনিসটা অধিক মূল্যবান হয়ে পড়ে।

ডায়নামো (dynamo) — তড়িৎ-উৎপাদক যন্ত্র বিশেষ। যন্ত্রটা এক রকম জেনারেটর ↑, যার সাহায্যে যান্ত্রিক শক্তিকে তড়িৎ - শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়। এই যন্ত্রে সাধারণতঃ ডাইরেক্ট কারেণ্ট (ডি. সি.) তড়িৎ উৎপন্ন হয়ে থাকে। মোটামুটি এর যান্ত্রিক কৌশলটা হলো ঃ একটা শক্তিশালী ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগ্‌নেটের ↑ দুই প্রান্তের মাঝে বৈদ্যুতিক তার-কুণ্ডলী (কয়েল ↑) স্থাপিত হয়। এই ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগ্‌-নেটটাকে বলে 'ফিল্ড ম্যাগ্‌নেট' আর ওই কয়েলকে বলে 'আর্মে-চার' ↑। এই ফিল্ড ম্যাগ্‌নেটটাকে সবেগে ঘোরানো হয়। এই ঘূর্ণনের ফলে ইণ্ডাক্‌সনের ↑ প্রভাবে আর্মে-চারে তড়িৎ-শক্তি সঞ্চারিত হয়। আর্মেচার থেকে এই তড়িৎ-শক্তি তড়িৎ - পরিবাহী তারের মাধ্যমে প্রবাহিত করে নিয়ে বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিভিন্ন পাওয়ার স্টেশনে বিভিন্ন গঠন ও যান্ত্রিক পদ্ধতির ডায়নামো চালিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়।

ডায়াথার্মানাস (diathermanous) — যে-সব পদার্থের ভিতর দিয়ে তাপ-রশ্মি অবাধে প্রবাহিত হয়, যেমন—কোয়ার্টজ ↑ ও ফ্লোর-স্পার ↑ ; কিন্তু আলোক-রশ্মির পক্ষে স্বচ্ছ হলেও যে-সব কাচের ভিতর দিয়ে তাপ-রশ্মি ভেদ করে যায় না, তাদের বলে **অ্যাডায়াথার্মানাস** পদার্থ।

ডায়াফোরেটিক (diaphoretic) — ঘর্ম-নিঃসরণকারী ঔষধ; যে-সব ঔষধ ব্যবহারে রোগীর অত্যধিক ঘাম হয়।

ডায়াস্টোল (diastole) — শ্বাস-ক্রিয়ায় প্রবিষ্ট বায়ুর চাপে হৃৎপিণ্ডের সম্প্রসারণ, বা আয়তন-বৃদ্ধি ; আর, নিঃশ্বাসে হৃৎপিণ্ডের সংকোচনকে বলে **সিস্টোল** (systole)। রক্ত-চাপের রোগীর রক্ত - চলাচলের চাপের পরিমাণ যন্ত্রের সাহায্যে এই ডায়াস্টোল ও সিস্টোল-জনিত চাপ নিরূপণ করা হয় এবং এইভাবে রক্তের উর্ধচাপ ও নিম্নচাপ জেনে হৃৎপিণ্ডের অবস্থাও জানা যেতে পারে। স্বাভা-বিক স্বাস্থ্যে হৃৎপিণ্ডের **ডায়াস্টো-লিক** ও **সিস্টোলিক** চাপের পরিমাণ রোগীর বয়স ও স্বাস্থ্য অনুযায়ী মোটা-মুটি নির্দিষ্ট থাকে।

ডায়েষ্টেজ (diastase) — গম, বার্লি প্রভৃতিতে জাত এক রকম এন্‌-জাইম ↑ পদার্থ, যা শ্বেতসারকে শর্করায় রূপান্তরিত করে। ওই সব খাদ্য-শস্যের মণ্ড করে বিশেষ ব্যবস্থায় গাঁজিয়ে (ফার্মেণ্টেসন ↑) নিয়ে পরে শুকিয়ে ফেললে **মল্ট** ↑ তৈরি হয়। এই মল্টের মধ্যে থাকে ডায়েস্টেজ। বিশেষ ব্যবস্থায় মল্টকে পুনরায় গাঁজিয়ে মদ্য প্রস্তুতির সময়ে ওর ডায়েস্টেজ অংশ মল্টের প্রধান উপা-দান স্টার্চ ↑, বা শ্বেতসার অংশকে **মল্টোজ** ↑ নামক শর্করায় পরি-বর্তিত করে ফেলে।

ডাল্‌টন (Dalton), জন — প্রখ্যাত বৃটিশ রাসায়নিক ও পদার্থবিদ ; জন্ম:

ক্যাম্বারল্যাণ্ডে 1766 খৃস্টাব্দ, মৃত্যু 1844 খৃস্টাব্দ। ম্যাঞ্চেষ্টার কলেজে গণিত ও প্রকৃতি-বিজ্ঞানের অধ্যাপক। বর্ণ-অন্ধত্ব (কালার ব্লাইণ্ডনেস) সম্বন্ধে সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রকাশ ; পদার্থের পারমাণবিক গঠন সম্বন্ধীয় মতবাদের (ডাল্‌টন্‌স অ্যাটমিক থিয়োরি ↑) জন্য সমধিক প্রসিদ্ধি। বিভিন্ন মৌলিকপদার্থের পারমাণবিক ওজন (অ্যাটমিক ওয়েট ↑) নির্ধারণে চিরস্মরণীয় কীর্তি।

ডাল্‌টনিজ্‌ম (daltonism) — দৃষ্টি-দোষ বিশেষ ; লাল ও সবুজ বর্ণের পার্থক্য নির্ধারণের অক্ষমতা ; বিশেষ এক প্রকার বর্ণান্ধতা।

ডালটন্‌স অ্যাটমিক থিওরি (Dalton's atomic theory) — অ্যাটমিক থিওরি ↑ ।

ডালেন (Dullen), নিল্‌স গুস্তভ — সুইডেনবাসী পদার্থ-বিজ্ঞানী ; জন্ম স্টেন্‌স্ট্রুপে 1869 খৃঃ, মৃত্যু 1937 খৃঃ। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকযন্ত্র উদ্ভাবনে কৃতিত্ব। বার্দ্ধক্যে দৃষ্টিশক্তিহীন হয়েও 1930 খৃঃ 'লাইট হাউস' ও সামুদ্রিক বিপদ-সংকেত যানে ব্যবহারোপযোগী স্বয়ং-ক্রিয় বাতি আবিষ্কার। দুগ্ধ দোহন যন্ত্র ও বায়ু-সংকোচক (কম্প্রেসন পাম্প ↑) যন্ত্রের প্রভূত উন্নতি সাধন। পদার্থ বিজ্ঞানে 1912 খৃঃ, 'নোবেল পুরস্কার' লাভ করেন।

ডারুইন (Darwin) **চার্ল্‌স** —বৃটিশ প্রকৃতি-বিজ্ঞানী ; জন্ম 1809 খৃঃস্টাব্দ, মৃত্যু 1882 খৃঃ। বাল্যে ছিলেন শিক্ষা-বিমুখ, কিন্তু চিন্তাশীল। ধর্ম-যাজকের পেশা অবলম্বনের জন্যে কৈশোরে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন। প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটনের প্রেরণায় দীর্ঘকাল সমুদ্র-ভ্রমণ। জীবের ক্রম-বিকাশ, বা অভিব্যক্তি (evolution) সম্বন্ধে সুদীর্ঘ গবেষণা ও মতবাদ প্রচার। জীবের ক্রমবিবর্তন সম্বন্ধে ডারুইনের মতবাদ হলো : জীব-মাত্রেরই মূল উৎস এক ও অভিন্ন ; কেবল পারিপার্শ্বিকতা, জৈবিক প্রয়োজন, জীবন-যুদ্ধের প্রতিযোগিতা প্রভৃতির প্রভাবে কালক্রমে কোটি-কোটি বছরে ক্রম-পরিবর্তনের ধারায় বিভিন্ন জীবের উদ্ভব হয়েছে। মূলতঃ একেই সাধারণভাবে বলে ডারুইনের 'অভিব্যক্তিবাদ' (থিওরি অব ইভো-লিউসন ↑)।

ডিউ পয়েণ্ট (dew-point) — যে উষ্ণতা, বা তাপমাত্রায় বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প জমতে সুরু করে এবং জলে পরিণত হয়ে শিশির সৃষ্টি হয়। উত্তপ্ত বাতাসে যে-পরিমাণ জলীয় বাষ্প থাকতে পারে, তাপ কমে গেলে সেই পরিমাণ জলীয় বাষ্পেই ওই বাতাস অত্যধিক সম্পৃক্ত হয়ে ওঠে; ফলে, অতিরিক্ত বাষ্প জলে পরিণত হয়। শীতের রাত্রে বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে মোটামুটি এ-জন্যেই শিশিরপাত হয়।

ডিউয়ার ফ্ল্যাস্ক (Dewar flask) — এক রকম কাঁচ-পাত্র, যার মধ্যে রেখে কোন পদার্থের উষ্ণতা বহুক্ষণ বজায় রাখা যায়। এর মধ্যে ঠাণ্ডা জিনিস ঠাণ্ডা থাকে, গরম জিনিস গরম থাকে, —বাইরের তাপে ভিতরের জিনিসের

তাপ সহসা পরিবর্তিত হয় না। এরূপ আবদ্ধ পাত্রকে সাধারণ কথায় বলাহয়থার্মো-ফ্ল্যাস্ক ↑। এর কৌশলটা হলো: পাত্রটার গায়ে থাকে দুটা দেওয়াল, দুই দেয়ালের মাঝখানটা থাকে বায়ুশূন্য। এভাবে বাইরের বায়ুর সংস্রব-শূন্য হওয়ায় ভিতরের উত্তাপ পরিবাহিত, বা বিকিরিত হয়ে জিনিসটার তাপ সহজে পরিবর্তিত হতে পারে না। আবার ভিতরের পাত্রটার বহির্গাত্রে পারদ-ঘটিত একটা আস্তরণ দেওয়া থাকায় তাপের বিকিরণ আরও অনেকটা কমে যায়। পাত্রটার মুখে মোটা কর্কের একটা ছিপি আঁটা থাকে। ব্যবহারের সুবিধার জন্যে সাধারণতঃ এরূপ কাঁচ-পাত্র একটা ধাতুনির্মিত আধারের মধ্যে এঁটে বসানো থাকে।

ডিউয়ার ফ্লাস্ক
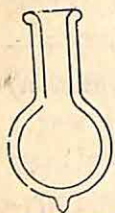
ডিওডিনাম (duodenum) — পাকস্থলীর নিম্নাংশ-সংলগ্ন ক্ষুদ্রান্ত্রের সংযোজক প্রায় এক ফুট অংশ; ক্ষুদ্রান্ত্রের উর্ধ্বাংশের যে নল-পথে ভুক্ত খাদ্য পাকস্থলী থেকে ক্ষুদ্রান্ত্রে আসে।

ডিককৃসন (decoction) — উদ্ভিজ্জ পদার্থের ক্বাথ। ভেষজ গুণসম্পন্ন লতা-পাতা জলে সিদ্ধ করে তার যে ক্বাথ, বা নির্যাস তৈরী হয়। এরূপ বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ ক্বাথ ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিভিন্ন কবিরাজী পাচন-গুলো সব এরূপ পদার্থ।

ডিকম্পোজিশন (decomposition) — যৌগিক পদার্থের উপাদানগুলোর পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া; বিভিন্ন কৌশল ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে এরূপ করা সম্ভব হয়। যেমন, মারকিউরিক অক্সাইড উত্তপ্ত করলে যৌগিকটার 'ডিকম্পোজিশন' ঘটে, অর্থাৎ তার উপাদান মার্কারি (পারা) ও অক্সিজেন গ্যাস পৃথক (ডি-কম্পোজড্) হয়ে যায়।

ড্রিঙ্কার অ্যাপারেটাস (Drinker apparatus — আয়রন লাংস ↑।

ডিকেড (decade)—দশ বছর, দশক; যেমন, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক হলো 1900 থেকে 1910 সাল পর্যন্ত; প্রথম ডিকেড।

ডিকোফেন (decophane) — ডি. ডি. টি. (D. D. T.) ↑ নামক জীবাণু-নাশক ঔষধের ব্যবহারিক নাম।

ডিক্যাণ্টেশন (decantation) — কঠিন ও তরল পদার্থের কোন সংমিশ্রণ থেকে কঠিন পদার্থটাকে পৃথক করে ফেলবার একটা সহজ প্রক্রিয়া। পরিস্রাবণ (ফিল্ট্রেসন ↑) প্রক্রিয়ার বদলে সংমিশ্রণটা স্থিরভাবে রেখে দিলে মিশ্রিত অদ্রাব্য কঠিন পদার্থ সব থিতিয়ে তলায় জমে, উপর থেকে তরল পদার্থটা সাবধানে ঢেলে নেওয়া যায়। এ-প্রক্রিয়াটি মিশ্রণের ক্ষেত্রেই খাটে। কঠিন পদার্থটা তরল পদার্থের মধ্যে দ্রবীভূত থাকলে এভাবে পৃথক করা সম্ভব হয় না।

ডিগ্রি (degree) —বিভিন্ন পরিমাপের আংশিক একক পরিমাণ; যেমন, থার্মোমিটারের ↑ ডিগ্রি পরিমাপ হলো বিভিন্ন স্কেলে (ফারেন্‌হিট ↑,

সেন্টিগ্রেড ↑ ও রুমার ↑) উষ্ণতার নির্দিষ্ট ভগ্নাংশিক মাপ; 98·4°F, 100°C ইত্যাদি। আবার জ্যামিতিক কোণের পরিমাপ, এক সমকোণ = 90° ডিগ্রি; এক সমকোণের 1/90 অংশ হলো এক ডিগ্রি কোণ।

ডিজেল (Diesel), রুডল্‌ফ—প্রখ্যাত জার্মান যন্ত্রবিদ-বিজ্ঞানী; প্যারিসে প্রবাসী জার্মান-পরিবারে জন্ম 1858 খৃস্টাব্দ, মৃত্যু 1912 খৃঃ। অন্তর্দাহী (ইণ্টারন্যাল কম্বাস্‌সন ↑) ইঞ্জিনের আবিষ্কারক, যা 'ডিজেল ইঞ্জিন' ↑ নামে খ্যাত। ইংলণ্ড যাত্রাপথে জাহাজে নিখোঁজ, মৃত্যু রহস্যাবৃত।

ডিজেল ইঞ্জিন (Diesel engine)—বিশেষ ধরনের ইণ্টারন্যাল কম্বাস্‌সন ইঞ্জিন ↑; যা পেট্রোলিয়াম-জাত ভারী তেল (ডিজেল অয়েল) পুড়িয়ে চালানো হয়। মোটর গাড়ীর ইঞ্জিনের মত এতে ইলেক্‌ট্রিক স্পার্কের ↑ সাহায্যে তেল জ্বালানো হয় না। এর ইঞ্জিনের আবদ্ধ কক্ষে প্রচণ্ড চাপে বাতাস উত্তপ্ত করে তোলা হয়, তার পরে কৌশলে তার মধ্যে সূক্ষ্ম ধারায় সজোরে ডিজেল তেল প্রবেশ করিয়ে তাকে বাষ্পায়িত করা হয়। আবদ্ধ কক্ষের ওই চাপিত বায়ুর উত্তাপে এই বাষ্পায়িত তেল জ্বলে ওঠে; আর এর ফলে উৎপন্ন গ্যাসের প্রবল চাপে ইঞ্জিনে গতি-শক্তি সঞ্চারিত হয়।

ডিটোনেটিং গ্যাস (detonating gas)—দু'ভাগ হাইড্রোজেন ও এক ভাগ অক্সিজেন গ্যাসের সংমিশ্রণ। এর মধ্যে সামান্য অগ্নি সংযোগ, বা তড়িৎ-স্ফুরণ করলে প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হয়ে গ্যাস দু'টার রাসায়নিক মিলন ঘটে, উৎপন্ন হয় জল। রাসায়নিক বিস্ফোরক পদার্থের মত এই গ্যাসীয় সংমিশ্রণটা 'ডিটোনেট' করে বলে এই নাম দেওয়া হয়েছে।

ডিটোনেটর (detonator)—মার্কারি ফুল্‌মিনেট ↑ ও অন্যান্য যে-সব সহজ-বিস্ফোরক পদার্থের সাহায্যে অন্যান্য সব বিস্ফোরক পদার্থের অতি দ্রুত বিস্ফোরণ ঘটানো সম্ভব হয়। রাইফেল, বন্দুক প্রভৃতির কার্তুজের মাথায় এ-রকম পদার্থ দেওয়া থাকে। প্রথমে এরূপ পদার্থের বিস্ফোরণের ফলেই পরে কার্তুজের বারুদও বিস্ফোরিত হয়ে থাকে।

ডিপ্‌থেরিয়া (diphtheria)—কণ্ঠনালীর প্রদাহজনিত রোগ বিশেষ; যাতে গলার ভিতরটা ফুলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে। বিশেষতঃ শিশুদেরই এই সংক্রামক রোগ হয় অতি সূক্ষ্ম এক শ্রেণীর বিশেষ জীবাণুর বিষ-ক্রিয়ায়; যাদের বলা হয় **ডিপ্‌থারয়েড ব্যাসিলি** (diphtheroid bacilli)।

ডিপ্‌থারয়েড

ডিপোলারাইজার (depolariser)—বৈদ্যুতিক সেলের ↑ 'পজিটিভ প্লেট', বা ধন-তড়িদ্বারের উপর গ্যাস জমে গিয়ে তড়িৎ উৎপাদন অনেক সময় বন্ধ হয়ে যায়, বা হ্রাস পায়।

এই অবস্থাকে বলা হয় সেলের **পোলারিজেশন** ↑ ; যেমন— জিঙ্ক-কপার সেলের অভ্যন্তরে কপার (তামা) প্লেটের উপর হাইড্রোজেন গ্যাসের একটা আস্তরণ পড়ে গিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ বন্ধ করে ফেলে। তড়িৎ উৎপাদনের এরূপ বাধা দূর করবার জন্যে যে-সব পদার্থ ব্যবহৃত হয় তাদের বলা হয় ডিপোলারাইজার ; যেমন — ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড (MnO_2) সাধারণতঃ ড্রাই-সেলে ↑ ডিপোলারাইজার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ডিনামাইট (dynamite) — বিশেষ এক প্রকার তীব্র বিস্ফোরক পদার্থ ; বিজ্ঞানী নোবেল ↑ কর্তৃক আবিষ্কৃত। 'কিসেলগার' নামক ছিদ্রবহুল এক রকম বালিমাটির সঙ্গে নাইট্রো-গ্লিসারিন ↑ নামক তরল বিস্ফোরক পদার্থ মিশিয়ে তৈরী হয়। সাধারণতঃ ডিনামাইটের বিস্ফোরণে পাহাড়-পর্বত ভেঙ্গে বিদীর্ণ করে সুড়ঙ্গ-পথ তৈরী করা হয়ে থাকে।

ডিফ্র্যাক্সন(deffraction)—আলোক-রশ্মির অপবর্তন। সাধারণ আলোক-রশ্মির তরঙ্গ-প্রবাহ কোন অস্বচ্ছ পদার্থে বাধা পেলে সামান্য বেঁকে যায়। ওই বাধাপ্রাপ্ত রশ্মিকে কৌশলে কোন পর্দার উপর ফেললে বিভিন্ন বর্ণের এক রকম বর্ণালির (স্পেক্-ট্রাম ↑) সৃষ্টি করে। কোন রঙীন (একবর্ণী) রশ্মি হলে এরূপ অবস্থায় পর্দার উপরে পর্যায়ক্রমে কালো রেখার সঙ্গে ওই বর্ণের রেখা ফুটে ওঠে। আলোক-তরঙ্গের এই গতি-প্রকৃতিকে ডিফ্র্যাক্সন, বা আলোকের অপবর্তন বলে। কেবল আলোক-তরঙ্গই নয়, অন্যান্য শক্তি-তরঙ্গের বেলায়ও এরূপ অপবর্তন অনেক ক্ষেত্রে লক্ষিত হয়ে থাকে।

ডিফ্র্যাক্সন গ্রেটিং (deffraction grating) — আলোক-রশ্মি, বা অন্য কোন তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ-প্রবাহকে তার বিভিন্ন সংগঠক তরঙ্গমালায় বিশ্লিষ্ট করে ফেলবার যন্ত্রবিশেষ। এর
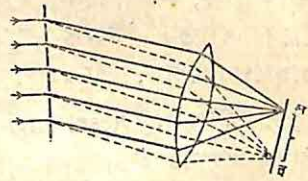
ডিফ্রাক্সন গ্রেটিং

যান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রাথমিক তরঙ্গ বিভিন্ন তরঙ্গে বিভক্ত হয়ে বর্ণালির সৃষ্টি করে। এ-জন্যে সাধারণতঃ এক খণ্ড কাঁচের উপরে সমদূরবর্তী ও সমান্তরালভাবে অসংখ্য দাগ কাটা হয় ; প্রতি ইঞ্চিতে 14,000 থেকে 20,000 পর্যন্ত এরূপ সূক্ষ্ম দাগ কাটা হয়ে থাকে। এর উপরে ফেললে প্রাথমিক রশ্মির বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের তরঙ্গগুলো ওই অতি সূক্ষ্ম কাটা-দাগের মধ্য দিয়ে প্রতিসরিত হয়ে আলাদা হয়ে যায়। এর ফলে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের তরঙ্গে বিভিন্ন বর্ণ সৃষ্টি করে; আর, একখানা উত্তল লেন্সের মাধ্যমে পর্দার উপরে বর্ণালি ফুটে ওঠে। কোন রশ্মি, বা তরঙ্গ-প্রবাহ কিরূপ বিভিন্ন তরঙ্গের সমবায়ে গঠিত, তা এই কৌশলে ধরা যায়। কাঁচের

বদলে অনুরূপ দাগ-কাটা ধাতব পাতও ব্যবহার করা যায় ; প্রতি-সরণের বদলে এর উপরে তরঙ্গ-মালা প্রতিফলিত হয়ে বর্ণালির সৃষ্টি করে। একে তখন বলে **রিফ্লেক্শন গ্রেটিং**। এরূপ যান্ত্রিক ব্যবস্থায় দাগ-কাটা কাঁচ, বা ধাতব পাত সমতল, অথবা অবতল দু'রকমেরই ব্যবহার করা যেতে পারে।

ডিসেক্শন(dissection)—ব্যবচ্ছেদ ; কোন উদ্ভিদ, বা প্রাণীর দেহাংশ কেটে উহার গঠন-বিন্যাস পর্যবেক্ষণ করার প্রক্রিয়া ; যেমন উদ্ভিদ-বিদ্যা ও শারীর বৃত্তের চর্চায় করা হয়। **ডিসেক্ট** (dissect), কাটা, বা ব্যবচ্ছেদ করা।

ডিষ্টিলেশন (distillation) — পাতন পদ্ধতি, যাকে সাধারণ কথায় বলে 'চোলাই করা' ; যে প্রক্রিয়ায় তরল পদার্থকে উপযুক্ত তাপ প্রয়োগে বাষ্পীয় পদার্থে রূপান্তরিত করে পুন-রায় তার তাপ কমিয়ে তরল অবস্থায় নিয়ে আসা হয়। এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে যে বিশুদ্ধ তরল পদার্থ পাওয়া যায় তাকে বলে 'ডিষ্টিলেট', বা পাতিত পদার্থ। অবিশুদ্ধ তরল পদার্থ এই প্রক্রিয়ায় বিশুদ্ধ, বা বিশোধিত করা হয়। পদার্থটা উদ্বায়ী হলে অবশ্য এ প্রক্রিয়ায় কাজ হয় না। আবার, বিভিন্ন স্ফুটনাঙ্কের তরল পদার্থ মিশ্রিত থাকলেও এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে কৌশলে তাদের একে-একে আলাদা করা যেতে পারে। এই প্রক্রিয়াকে 'ফ্রাক্সন্যাল ডিষ্টিলেশন' ↑, বা আংশিক পাতন-ক্রিয়া বলে।

ডিহাইড্রেশন (dehydration) — জলশূন্য করা, বা বিশুষ্কীকরণ ; যেমন —ডিম, বা দুধ থেকে যান্ত্রিক কৌশলে তার জলীয় অংশ সম্পূর্ণ দূরীভূত করলে বিশুষ্ক চূর্ণ পাওয়া যায় ; যেমন, মিল্ক পাউডার ও 'এগ পাউডার' প্রভৃতি (সেন্ট্রিফ্রুগাল ↑ মেসিন)। সাধারণতঃ স্বাভাবিক উষ্ণতায় কোন বায়ুশূন্য (ভ্যাকুয়াম ↑) পাত্রে, বা কোন জল-শোষক পদার্থের সংস্পর্শে রেখে খাদ্যাদির নির্জলীকরণও বুঝায়, যাতে খাদ্য দ্রব্যের স্বাভাবিক খাদ্য-মূল্য বজায় থাকে। (অ্যান্‌হাইড্রাস ↑)

ডি. ডি. টি. (D. D. T.)—কীটপতঙ্গ-নাশক এক রকম রাসায়নিক পদার্থের সংক্ষিপ্ত নাম; এর পূর্ণ নাম হলো,'ডাই-ক্লোরো - ডাইফিনাইল - ট্রাইক্লোরো-ইথেন' (dichloro-diphenyle-tri-chloroethane)। সাদা গুঁড়া, সামান্য সুমিষ্ট গন্ধযুক্ত। বিভিন্ন কীট-পতঙ্গ নাশক রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে সব-চেয়ে শক্তিশালী। একে আবার কখন কখন '**ডিকোফেন**'-ও ↑ বলা হয়।

ডেক্‌ষ্ট্রিন (dextrine) — সামান্য কিছু অ্যাসিড মিশিয়ে বিশেষ প্রক্রিয়ায় শ্বেত-সার পদার্থ জলে ফুটালে যে আঠালো বস্তু পাওয়া যায়। একে **ষ্টার্চ গাম**-ও বলা হয়। শ্বেতসার (স্টার্চ ↑) পদার্থের আংশিক হাইড্রোলিসিস ↑ প্রক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন বিভিন্ন কার্বোহাইড্রেট ↑ শ্রেণীর উপাদানের সংমিশ্রণে জিনিসটা উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ ডাকটিকেট, খাম প্রভৃতিতে এ-জাতীয় উৎকৃষ্ট গাম, বা আঠা লাগানো থাকে।

ডেক্‌ষ্ট্রোজ (dextrose) — পাকা ফলের সুমিষ্ট রস থেকে নিষ্কাশিত এক শ্রেণীর শর্করা, বা চিনি ; যেমন, গ্রেপ সুগার ↑। রাসায়নিক হিসেবে এটা উদ্ভিজ্জ গ্লুকোজ ↑ বিশেষ।

ডেকাপোডা (decapoda) — দশটি পদবিশিষ্ট প্রাণী; ('ডেকা' মানে দশ সংখ্যক), আর'পড্' অর্থে পদ বুঝায়; যেমন — কাঁকড়া।

ডেকাপোডা

ডেট্ লাইন (date line) — ইণ্টারন্যাশন্যাল ডেট্ লাইন ↑।
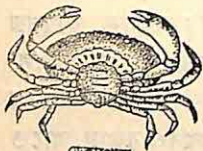
ডেণ্ট (dent) — দাঁত ; **ডেণ্টেট** (dentate)—দন্তসমন্বিত ; যেমন — **ডেণ্টেট হুইল** (dentate wheel), দাঁতওয়ালা, বা খাঁজ-কাটা চাকা।

ডেণ্টাইন (dentine) — হাড়ের মত শক্তক্যালসিয়াম-ঘটিত যে উপাদানে দাঁত নির্মিত ; **ডেণ্টিসন** (dentition)—শিশুর দন্তোদ্গম, মাড়ির দন্ত-বিন্যাস; **ডেণ্টিস্ট** (dentist) — দন্ত-চিকিৎসক।

ডেণ্টাইন

ডেন্‌সিটি (density)— বস্তুর ঘনত্বের পরিমাণ। কোন পদার্থের নির্দিষ্ট আয়তনে কি-পরিমাণ বস্তু বর্তমান আছে, তা এর এককে প্রকাশ করা হয়। যে-কোন পদার্থের এক ঘন সেন্টিমিটার ↑ (সি. সি) আয়তনে যত গ্রাম ↑ বস্তু রয়েছে তাই হলো পদার্থটার ডেন্‌সিটি। এ-হিসাবে কোন পদার্থের স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি ↑ ও ডেন্‌সিটি সংখ্যাগতভাবে সাধারণতঃ একই হয়ে থাকে।

ডেভি, স্যার হাম্‌ফ্রি (Davy, Sir Humphry) — বৃটিশ রাসায়নিক ; কর্নওয়ালে জন্ম 1778 খৃঃ, মৃত্যু 1829 খৃস্টাব্দ। লণ্ডনের রয়্যাল ইনষ্টিটিউটে সুদীর্ঘকাল রসায়নের অধ্যাপক। যৌবনেই 'নাইট্রাস অক্সাইড' (লাফিং গ্যাস ↑) আবিষ্কার করেন। হীরক ও অঙ্গারের রাসায়নিক অভিন্নতা প্রতিপাদন। কয়লাখনির অভ্যন্তরে 'ফায়ার ড্যাম্প' ↑ গ্যাসের বিস্ফোরণে সংঘটিত দুর্ঘটনা নিবারণের উদ্দেশ্যে 'নিরাপদ বাতি' (ডেভিজ্ সেফ্‌টি ল্যাম্প ↑) উদ্ভাবনেই বিশেষ কৃতিত্ব ও খ্যাতি অর্জন।

ডেভি ল্যাম্প (Davy lamp) — বিজ্ঞানী হাম্‌ফ্রি ডেভি কয়লার খনির মধ্যে নিরাপদে ব্যবহারের উপযোগী যে বাতি উদ্ভাবন করেছিলেন। একে অবশ্য 'ডেভিজ্ সেফ্‌টি ল্যাম্প'-ও বলা হয়। কয়লার খনির মধ্যে অনেক সময় বিভিন্ন দাহ্য গ্যাস প্রচ্ছন্ন থাকে, অগ্নিশিখার সংস্পর্শে এলেই এগুলো জ্বলে উঠে মারাত্মক বিস্ফোরণ ঘটায়। এরূপ বিপদ নিবারণের জন্যে ডেভির উদ্ভাবিত এই ল্যাম্পের বৈশিষ্ট্য হলো, এর আলোক-শিখ

ডেভি ল্যাম্প
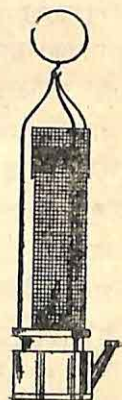
একটা লোহার জালির চিম্‌নির মধ্যে জ্বলে। দাহ্য গ্যাস ভিতরে ঢুকলে জ্বলে ওঠে সত্য, কিন্তু তার অগ্নিশিখা সহজে জালের বাইরে ছড়াতে পারে না; কারণ, ওই ধাতব জাল তাপ শোষণ করে নেয়, জালির বাইরের গ্যাস সহসা জ্বলে ওঠার মত উত্তপ্ত হতে পারে না। শ্রমিকেরা সতর্ক হয়।

ডেল্‌টা রে (delta ray) — অপেক্ষাকৃত মন্দ গতির ইলেক্‌ট্রন কণিকার ধারা-প্রবাহ। অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতব পদার্থের উপর আল্‌ফা রশ্মি ↑ পড়লে এরূপ ডেল্‌টা রশ্মির, অর্থাৎ বিশেষ এক কণিকা-ধারার উৎপত্তি হয়। এই ডেল্‌টা-কণিকার ধারা (বা রশ্মি) আল্‌ফা কণিকার প্রবাহ-পথের লম্বভাবে তরঙ্গাকারে ধীরে ধীরে বিচ্ছুরিত হতে থাকে। মূলতঃ আল্‌ফা-কণিকা হলো হিলিয়াম ↑ গ্যাসের পরমাণু-কেন্দ্রীণ, বা নিউক্লিয়াস।

ডেল্‌টা মেটাল (delta metal) — বিশেষ একটি সংকর ধাতু; এটা সাধারণতঃ 55% তামা, 43% দস্তা, সামান্য কিছু লোহা ও অপরাপর ধাতু গলিয়ে-মিশিয়ে তৈরী হয়ে থাকে।

ডেলিকোয়েসেণ্ট (deliquescent) —যে-সব পদার্থ বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প শুষে নিয়ে ধীরে ধীরে সেই জলে দ্রবিত হয়। খোলা হাওয়ায় রাখলে ডেলিকোয়েসেণ্ট, বা উদ্‌গ্রাহী পদার্থ সব এভাবে ক্রমে দ্রবিত হয়ে পড়ে; যেমন — অবিশুদ্ধ খাদ্য-লবণ, বা সোডিয়াম ক্লোরাইড।

ডেসিকেটর (dessicator) — বিভিন্ন পদার্থ বিশুষ্ক রাখবার জন্যে রসায়নাগারে ব্যবহৃত এক বিশেষ আকারের কাঁচ-পাত্র। বিশেষতঃ বিভিন্ন ডেলিকোয়েসেণ্ট ↑ পদার্থ বিশুষ্ক রাখবার জন্যেই এটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কাঁচের পাত্রটার মুখে থাকে বায়ু-নিরোধক ঢাক্‌না; তলদেশে ফসফরাস পেণ্টক্সাইড (P_2O_5), ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ($CaCl_2$) প্রভৃতি কোন হাইগ্রোস্কোপিক ↑, অর্থাৎ জলাকর্ষী পদার্থ দেওয়া থাকে।

ডেসিকেটর

ডেস্‌ট্রাক্‌টিভ ডিস্টিলেশন (destructive distillation)— অন্তর্ধূম-পাতন প্রক্রিয়া; আবদ্ধ পাত্রে বায়ুশূন্য অবস্থায় কোন পদার্থ অত্যুত্তপ্ত করে তার রাসায়নিক বিয়োজন সাধন করবার প্রক্রিয়া; যার ফলে ওই পদার্থের বিভিন্ন উপাদান উদ্‌বায়িত (ডিষ্টিলেসন ↑) হয়ে পৃথক হয়ে যায়। কয়লা থেকে এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে কোলগ্যাস ↑, আলকাত্‌রা (কোলটার ↑) প্রভৃতি বিশ্লিষ্ট হয়ে থাকে। এভাবে কাঁচা কাঠ চোলাই করে মিথাইল অ্যালকোহল ↑, অ্যাসিটিক অ্যাসিড ↑ প্রভৃতি বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যায়।

ড্রপ্‌সি (dropsy) — দেহের কোন অঙ্গে অস্বাভাবিক জলাধিক্য রোগ; সাধারণতঃ রক্তহীনতার ফলে দেহের কোন বিশেষ অঙ্গে চামড়ার

তলায়, বা মাংসপেশীর মধ্যে অত্যধিক জল জমে যায়, যেমন — শোথ, উদরী বেরিবেরি প্রভৃতি রোগে হয়ে থাকে।

ড্রসোমিটার (drosometer) — যে যন্ত্রের সাহায্যে কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভূ-পৃষ্ঠের কোন্ অঞ্চলের বায়ুমণ্ডলে কতটা জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে জল-কণায় পরিণত হয় (শিশির, কুয়াশা প্রভৃতির আকারে) তার পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব হয়ে থাকে।

ড্রসোফিলা (drosophila) — এক রকম ফলের পোকা, বা পতঙ্গ বিশেষ ; ফলের মধ্যেই এরা জন্মায়। জীববিদ্যায় বংশানুবৃত্তির (হেরিডিটি ↑) পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অনেক সময় এরা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ড্রাই ব্যাটারি (dry battery) — তড়িৎ উৎপাদনের জন্যে যে-সব ব্যাটারি ↑, বা সেলের ↑ গঠনে বিক্রিয়ক রাসায়নিক পদার্থগুলি জল-শূন্য বিশুদ্ধ অবস্থায় ব্যবহার করা হয়, যেমন — সাধারণ টর্চের ব্যাটারি। অধিকাংশ ব্যাটারিতে রাসায়নিক পদার্থের জলীয় দ্রবণই ব্যবহৃত হয় ; যাদের বলে 'ওয়েট ব্যাটারি'।

ড্রাই আইস (dry ice)— অত্যধিক চাপিত অবস্থায় উপযুক্তরূপে ঠাণ্ডা করলে কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস তরল হয়ে পড়ে। বিশেষ প্রক্রিয়ায় সহসা সম্প্রসারিত, অর্থাৎ সূক্ষ্ম ধারায় নির্গত করলে ওই তরল পদার্থের তাপ আরও হ্রাস পেয়ে কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এরূপ কঠিন কার্বন ডাই অক্সাইডকে বলে 'ড্রাই-আইস'। এর প্রধান বিশেষত্ব হলো এই যে, পদার্থটা কঠিন অবস্থা থেকে সরাসরি গ্যাসীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয়, তরল হয় না। হিম-ঘর, রেফ্রিজারেটর ↑ প্রভৃতি হিমায়ক যন্ত্রে অনেক সময় ড্রাইআইস ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ড্রাই সেল (dry cell) — তড়িৎ-শক্তির উৎপাদক বিশেষ এক শ্রেণীর ব্যাটারি ↑। এদের মধ্যে কোন তরল পদার্থ ব্যবহৃত হয় না ; এ-জন্যেই এদের ড্রাই (শুষ্ক) সেল বলে,
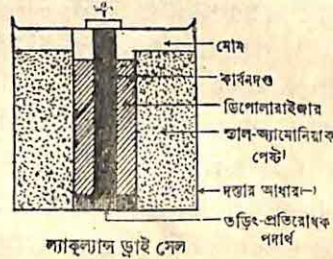
ল্যাক্ল্যান্স ড্রাই সেল

যেমন—'লেক্ল্যান্স সেল' ↑। জিঙ্কের তৈরী খোলের মধ্যে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের একরকম কাই ইলেক্ট্রোলাইট ↑ হিসেবে ভরতি থাকে ; আর তার মধ্যস্থলে থাকে একটা কার্বন-দণ্ডের ইলেকট্রোড ↑। ডিপোলারাইজার ↑ হিসেবে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড, MnO_2, ব্যবহৃত হয়। টর্চের ব্যাটারি সাধারণতঃ এরূপ এক রকম ড্রাই-সেল মাত্র।

ড্রেজার (dredger)—মাটি কাটা ও উঁচু-নীচু সমতল করবার এক রকম যন্ত্র বিশেষ। এরই বিশেষ এক

জমি সমতলকারী ড্রেজার

রকম যান্ত্রিক ব্যবস্থায় জলের তলা থেকে কাদা-মাটি তুলে ফেলে জল-পথের গভীরতা বৃদ্ধি করা যায়।

থ

থাইমল (t h y m o l) — ফেনল ↑ জাতীয় একটি জৈব রাসায়নিক পদার্থ, $C_{10}H_{14}O$; সাদা, স্ফটিকাকার, সামান্য গন্ধযুক্ত। বিশেষ উদ্ভিজ্জ তেল থেকে পাওয়া যায়। পদার্থটার কিছু ভেষজ গুণ এবং বীজাণু-প্রতিরোধক শক্তিও সামান্য কিছু আছে।

থাইমাস গ্ল্যাণ্ড (thymus gland) —শিশুদের বক্ষাস্থির ঠিক নিচে অবস্থিত একটি বিশেষ জৈব গ্রন্থি। নবজাত শিশুর এই গ্ল্যাণ্ডটি ↑ দু'বছর বয়সের পরে ক্রমে ছোট হতে থাকে, প্রায় 13 বছর বয়সে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়। মনে হয়, শৈশবে দেহের বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণেই এর কাজ শেষ হয়; পরবর্তী বয়সের শ্লথ বৃদ্ধির জন্যে আর এর দরকার হয় না।

থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড (thyroid gland) —গল-নালীর স্বরযন্ত্রের নিম্নভাগে সামনের দিকে থাকে এই অন্তঃস্রাবী (এণ্ডোক্রাইন ↑) জৈব গ্রন্থি টি। এর মধ্যে খাদ্যের আয়োডিন ↑ উপাদান এসে জমে এবং **থাইরক্সিন** (thyroxine) নামক হর্মোন ↑ সৃষ্টি হয়, যা দেহের বৃদ্ধি ও শক্তি লাভের পক্ষে বিশেষ সহায়ক। এই গ্রন্থিটির বিকৃতি, বা নিষ্ক্রিয়তার ফলে উপযুক্ত পরিমাণ থাইরক্সিন হর্মোন নিঃসরণের অভাবে দেহের বৃদ্ধি ও মনের বিকাশ শ্লথ হয়ে পড়ে। ভুক্তখাদ্যে আয়োডিনের ↑ অভাবে সাধাণরতঃ এই গ্ল্যাণ্ডটি কার্যকারিতা ব্যাহত হয়ে অস্বাভাবিক বেড়ে যায় ও গলগণ্ড হয়ে থাকে।

থার্ম (therm) — অতি উচ্চ তাপ পরিমাপের একক বিশেষ; প্রায় 56 গ্যালন ↑ বরফ-জল যে পরিমাণ তাপের প্রয়োগে ফুটে ওঠে, তাকে বলে এক থার্ম, যা প্রায় 252 লক্ষ ক্যালোরির ↑ সমান। আবার, এক থার্ম হলো এক লক্ষ 'বৃটিশ-থার্মাল-ইউনিট', সংক্ষেপে বি. টি. ইউ (B. T. U)। আবার সাধারণভাবে তাপের পরিমাণ, বা শক্তি বুঝাতেও 'থার্ম' শব্দ ব্যবহৃত হয়। 'থার্মাল' মানে, তাপ সম্বন্ধীয়। কোন পদার্থের **থার্মাল ক্যাপাসিটি** বললে বুঝতে হবে, যে পরিমাণ তাপ-শক্তির (যত বৃটিশ থার্মাল ইউনিটের) প্রয়োগে সেই পদার্থের তাপমাত্রা এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড মাত্র বৃদ্ধি পায়।

থার্ম্যাল নিউট্রন (thermal neutron) — অতি ধীরগতি এবং তদনুযায়ী অত্যল্প শক্তিবিশিষ্ট নিউট্রন ↑ কণিকা। 'অ্যাটমিক পাইল' ↑ যন্ত্রে নিউক্লিয়ার ফিসন ↑ প্রভৃতি প্রক্রিয়ায় ডয়েটেরন (হেভি হাইড্রোজেন ↑) ও গ্রাফাইট মডারেটরের প্রতিক্রিয়ার ফলে অনেক সময় এই 'থার্মাল নিউট্রন' কণিকার উদ্ভব হয়ে থাকে।

থার্মিট (thermit)—অ্যালুমিনিয়াম-চূর্ণ ও আয়রন-অক্সাইডের সংমিশ্রণে গঠিত পদার্থ। একে **থার্মাইট**-ও বলা হয়। এই সংমিশ্রণে অগ্নি সংযোগ করলে প্রচণ্ড তাপ উৎপন্ন হয়ে থাকে। আয়রন-অক্সাইড থেকে মুক্ত অক্সিজেন অ্যালুমিনিয়ামের দহনকার্যে সহায়তা করে; আর, এর ফলে ওই গলিত আয়রন (লোহা) জমে ধাতব ভাঙ্গা জিনিস জুড়ে যায়। এই থার্মিট প্রক্রিয়ার সাহায্যে লোহার যন্ত্রাদির ভাঙ্গা অংশ জুড়ে (ওয়েল্ডিং ↑) মেরামত করা হয়।

থার্মোআয়নিক্স (thermionics)—উত্তাপের ফলে কোন কোন পদার্থ থেকে ইলেকট্রন ↑ কণিকার ধারা-প্রবাহ, বা রশ্মি নির্গত হয়; প্রকৃত পক্ষে এটা ঋণাত্মক আয়ন-কণিকার (ক্যাটায়ন ↑) ধারা। এর মধ্যে পদার্থ-বিজ্ঞানের বহু জটিল তত্ত্ব ও তথ্যাদি নিহিত রয়েছে। এতৎ-সম্পর্কীয় বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির গবেষণাকে বলে 'থার্মোআয়নিক্স'।

থার্মো - ইলেকট্রিসিটি (thermo-electricity) — বিশেষ ব্যবস্থায় তাপ-শক্তি সরাসরি তড়িৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যে তড়িৎ-প্রবাহের সৃষ্টি করে। বিভিন্ন ধাতব পদার্থের মধ্যে তাপমাত্রার বৈষম্যের ফলে (থার্মোকাপ্‌ল ↑, থার্মোপাইল ↑ প্রভৃতি যন্ত্রে) এরূপ থার্মোইলেকট্রিসিটির উদ্ভব হয়ে থাকে।

থার্মোকাপ্‌ল (thermocouple)—পদার্থের উষ্ণতা, বা তাপমাত্রা পরিমাপের এক রকম যন্ত্র বিশেষ। দুটা বিভিন্ন ধাতব তারের (যেমন, তামা ও লোহা) দুই প্রান্ত জুড়ে নিয়ে দু-জায়গায় লাগানো হয়। কোন এক জায়গার উষ্ণতা যেন মাপতে হবে, অপর জায়গা তাহলে হতে হবে
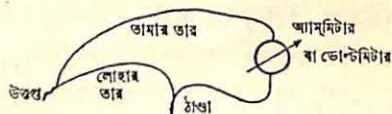
থার্মোকাপ্‌ল (তথ্যগত চিত্র)

অপেক্ষাকৃত নিম্নতাপযুক্ত, অর্থাৎ ঠাণ্ডা, এবং এর উষ্ণতা জানা থাকা চাই। ওই দুই স্থানের তাপের বিভিন্নতার জন্যে ওই সংযোজক তারের মধ্যে তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত হবে। এভাবে উৎপন্ন তড়িৎ-শক্তিকে বলা হয় **থার্মোইলেকট্রিসিটি,** বা তাপীয় বিদ্যুৎ। ওর একটা তারের কোথাও কেটে তার দুই প্রান্ত গ্যালভ্যানোমিটারের ↑ সঙ্গে জুড়ে দিয়ে এই তড়িৎ-প্রবাহের শক্তি মাপা যায়। এর ভোল্টেজ ↑ জেনে ওই দুই স্থানের তাপ-বৈষম্যও হিসাব করে জানা যেতে পারে। এভাবে এক স্থানের উষ্ণতা জানা থাকায় অপর স্থানের উষ্ণতা সহজেই নির্ধারিত হয়।

থার্মোকেমিষ্ট্রি (thermo-chemistry)—বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন তাপের তথ্যাদি সম্পর্কীয় বিজ্ঞান। বিভিন্ন পদার্থের রাসায়নিক মিলনে কোন-কোন ক্ষেত্রে তাপ উদ্ভূত হয়, কোন-কোন ক্ষেত্রে আবার তাপ হ্রাস পেয়ে থাকে (এক্সোথার্মিক ↑, এণ্ডোথার্মিক ↑)। এভাবে উৎপন্ন তাপশক্তির পরিমাণ ও তথ্যাদি হলো থার্মোকেমিষ্ট্রির আলোচ্য বিষয়।

থার্মোগ্রাফ (thermograph) — এক রকম তাপমান যন্ত্র ; এর সাহায্যে কোন পদার্থের বিভিন্ন সময়ে উষ্ণতার বিভিন্নতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পদার্থের উষ্ণতার যে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে, তা এ-রকম যন্ত্রে রেখাঙ্কিত হয়ে থাকে এবং তা দেখে কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে তার তাপমাত্রা কত ছিল তা সহজেই জানা যেতে পারে।

থার্মোডাইনামিক্স (thermodynamics) — উত্তাপের প্রভাবে বিশেষ-বিশেষ অবস্থায় বিভিন্ন পদার্থে গতি-শক্তি, তড়িৎ-শক্তি প্রভৃতি যে-সব বিভিন্ন শক্তির উদ্ভব ঘটে তার সূত্র, প্রকৃতি ও তথ্যাদি সম্পর্কীয় গাণিতিক বিজ্ঞান।

থার্মোপাইল (thermopile) — কোন উত্তপ্ত পদার্থ থেকে বিকিরিত তাপ-রশ্মি (হিট-রেডিয়েশন ↑) পরিমাপের জন্যে ব্যবহৃত এক রকম যন্ত্র বিশেষ। অ্যান্টিমনি ও বিস্‌মাথ ↑ ধাতুর কতকগুলো দণ্ড একটার পর একটার দুই প্রান্ত পরস্পর জুড়ে এ-যন্ত্র তৈরী হয়। এভাবে প্রকৃতপক্ষে কয়েকটা থার্মোকাপ্‌ল ↑ শ্রেণীবদ্ধ-ভাবে সজ্জিত থাকে। ওই ধাতব দণ্ডগুলো যাতে উত্তপ্ত পদার্থ থেকে বিকিরিত তাপ-রশ্মি সম্যক শোষণ করে নিতে পারে তার জন্যে অনেক সময়ে ওইগুলোর গায়ে ভূষা-কালি মাখানো হয়। বিভিন্ন ধাতব দণ্ডের এরূপ সংযোগ-প্রান্তগুলো তাপ-রশ্মির অভিমুখে রাখলে থার্মো-ইলেক্‌ট্রিক (থার্মোকাপ্‌ল ↑) প্রবাহের উদ্ভব হয়। এই তড়িৎ-প্রবাহ সূক্ষ্ম গ্যালভ্যানোমিটার ↑ যন্ত্রের সাহায্যে মেপে বিকিরিত তাপের পরিমাণ সহজেই নির্ধারণ করা সম্ভব হয়ে থাকে।

থার্মোপ্লাস্টিক (thermoplastic) — যে সকল প্ল্যাষ্টিক ↑ পদার্থ যথোপযুক্ত উত্তাপের প্রভাবে প্রয়োজনানুরূপ নমনীয় হয় এবং ছাঁচে ঢেলে যে-কোন আকার দেওয়া যায়, আর ঠাণ্ডা হলে শক্ত হয়ে পড়ে। উত্তাপের সাহায্যে এই বিশেষ শ্রেণীর প্ল্যাষ্টিক পদার্থের জিনিস বার-বার গলিয়ে নরম করে ফেলে আবার নূতন জিনিস তৈরী করা যায় ; কিন্তু পদার্থটার স্বকীয় ধর্ম, বা গুণের কোনরূপ পরিবর্তন সাধারণতঃ ঘটে না।

থার্মোফ্ল্যাস্ক (thermoflask) — সম-তাপ পাত্র (ডিউয়ার ফ্ল্যাস্ক ↑)।

থার্মোমিটার (thermometer) — তাপমান যন্ত্র ; যার সাহায্যে বিভিন্ন পদার্থের তাপ, বা উষ্ণতার হ্রাস-বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়। তাপের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে স্বভাবতঃই বিভিন্ন পদার্থের আয়তনেরও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে ; কোন পদার্থের আয়তনের এই পরিবর্তনের হার লক্ষ্য করে পদার্থটার উষ্ণতারও পরিমাপ করা সম্ভব হয়। এভাবে গ্যাস-থার্মোমিটার ↑ মার্কারি-থার্মোমিটার, প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের তাপ-পরিমাপক যন্ত্র হতে পারে। সাধারণ থার্মোমিটারে মার্কারি, বা পারদ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। খানিকটা পারদ ক্ষুদ্র একটা কাঁচ-

গোলকে ভর্তি থাকে; আর তার সংলগ্ন একটা দাগ-কাটা বন্ধমুখ সরু কাঁচ-নলের মধ্যে পারদ-সূত্র গোলকটার উষ্ণতা অনুযায়ী ওঠা-নামা করে থাকে। উত্তাপ বৃদ্ধি পেলে ওই কাঁচ-গোলকের পারদ আয়-তনে বেড়ে পারদ-সূত্র কাঁচ-নলের মধ্যে উঠে যায়। কাঁচনলের গায়ে দাগ-কাটা ডিগ্রি-স্কেল দেখে পারদ-সূত্রের উচ্চতা থেকে উষ্ণ-তার পরিমাণ নিরূপণ করা সম্ভব হয়।

থার্মোমিটা

থার্মোমিটার (ক্লিনিক্যাল) (thermo-meter, clinical)—জ্বর হলে দেহের উষ্ণতা নিরূপণের জন্যে যে থার্মো-মিটার ব্যবহার করা হয়ে থাকে; (ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার ↑)।

থার্মোমিটার (গ্যাস) (thermo-meter, gas) — যে তাপমান যন্ত্রে কোন গ্যাসীয় পদার্থের আয়তনের হ্রাস-বৃদ্ধি লক্ষ্য করে সংলগ্ন পদার্থের উষ্ণতা নির্ধারণ করা হয়। গ্যাস-থার্মোমিটার দু-রকমের হতে পারে। কোন গ্যাসের আয়তন স্থির রেখে তাপের তারতম্যে ওর গ্যাসীয় চাপের যে পরিবর্তন ঘটে; অথবা, চাপ স্থির রেখে আয়তনের যে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে তা মেপে উষ্ণতার পরিমাণ নির্ধারণ করা যেতে পারে। তাপমান যন্ত্র হিসেবে এরূপ গ্যাস-থার্মোমিটার তেমন কিছু সুবিধাজনক নয়; এজন্যে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না। কেবল 'অ্যাব্‌সোলিউট টেম্পারেচার' ↑ স্থির করবার জন্যে এর ব্যবহার আছে।

থার্মোমিটার (ম্যাক্সিমাম্ অ্যাণ্ড মিনিয়াম্) (thermometer, maximum and minimum) — এক রকম বিশেষ ধরনের তাপমান যন্ত্র; যাতে বিভিন্ন সময়ে কোন বস্তুর উচ্চতম ও নিম্নতম উষ্ণতা চিহ্নিত হয়ে থাকে। এ-রকম তাপমান যন্ত্রে কাঁচ-গোলকের মধ্যে অ্যালকোহল ↑ ভরতি থাকে, তার উপরে (কাঁচ-নলের অভ্যন্তরে) সামান্য পারদ রক্ষিত হয়। উত্তাপে অ্যালকোহল আয়তনে বাড়ে, আর তার চাপে ওই পারদ টুকু কাঁচের সরু নল-পথে উঠে যায়। কাঁচ-নলের ওই পারদ-সূত্রের দু'দিকে লোহার দু'টি ছোট টুকরা দেওয়া থাকে, যাদের বলে 'ইণ্ডেক্স'। তাপ-বৃদ্ধির ফলে ওই পারদ-সূত্র একটি ইণ্ডেক্স ঠেলে উপরে তোলে; আর তাপ কমলে পারদ-সূত্র নেমে যায়, আর উপরের ইণ্ডেক্সটা সেখানে আটকে থাকে। নলের গায়ে ডিগ্রি-স্কেলের দাগের সঙ্গে মিলিয়ে এর অবস্থান দেখে উচ্চতম (ম্যাক্সিমাম) তাপমাত্রা সহজেই স্থির করা যায়। পারদ-সূত্রের নিম্নবর্তী অপর ইণ্ডেক্সটা যেখানে থেকে যায় সেখানকার স্কেল দেখে নিম্নতম (মিনিমাম্) তাপমাত্রা বুঝা যায়।
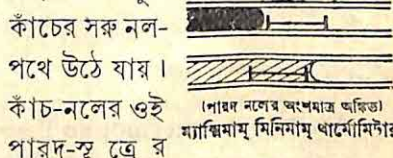
(পারদ নলের অংশমাত্র অঙ্কিত)
ম্যাক্সিমাম্ মিনিমাম্ থার্মোমিটার

থার্মোষ্টাট (thermostat) — কোন

আবদ্ধ স্থানের, বা আধারের উষ্ণতা স্থির রাখবার জন্যে উদ্ভাবিত এক রকম যন্ত্র। ইনক্যুবেটর ↑, রেফ্রিজারেটর ↑ প্রভৃতি যন্ত্রের আভ্যন্তরীণ তাপ এই যন্ত্রের সাহায্যে প্রয়োজনীয় উষ্ণতায় স্থির রাখা সম্ভব হয়ে থাকে। উত্তপ্ত হলে ধাতব পদার্থ মাত্রই আয়তনে বাড়ে; কিন্তু সব ধাতু সমান বাড়ে না। একই উত্তাপে লোহা এবং পিতলের আয়তন-বৃদ্ধির পরিমাণ স্বভাবতঃই বিভিন্ন হয়ে থাকে; পিতল বাড়ে বেশি। এখন লোহা ও পিতলের

থার্মোষ্টাট্

দুটো দণ্ডের দুই প্রান্ত জুড়ে একসঙ্গে বাঁকিয়ে চিত্রে প্রদর্শিত আকারে সংলগ্ন করা হয়। কোন আবদ্ধ স্থানের অধিক উষ্ণতায় এর পিতলের দণ্ডটা অপেক্ষাকৃত বেশি বেড়ে গিয়ে সোজা হতে চায়; এর ফলে নিচের অংশ একটু ফুলে উঠে 'ঠ' তড়িৎ-দ্বারে লেগে যায়। এই অবস্থায় বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে আভ্যন্তরীণ তাপ কমতে থাকে। আবার এভাবে যখন উষ্ণতা বেশি হ্রাস পায় তখন পিতলের দণ্ডটার আয়তন কমে গিয়ে যুগ্ম দণ্ডটার বক্রতা পূর্বাবস্থায় আসে, আর 'উ' তড়িৎদ্বারে লেগে 'ঠ' তড়িৎদ্বার বিযুক্ত হয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় তাপ আবার বাড়তে থাকে। এভাবে ওই আবদ্ধ স্থানের তাপ প্রয়োজনের চেয়ে বেশি, বা কম হতে পারে না, উষ্ণতা মোটামুটি স্থির থাকে। যন্ত্রটা যতক্ষণ প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট উষ্ণতায় থাকে ততক্ষণ যুগ্ম দণ্ডটা 'উ' বা 'ঠ' কোন তড়িৎ-দ্বারেই লাগে না; এই অবস্থায় উষ্ণতার হ্রাস, অথবা বৃদ্ধি ঘটাবার যান্ত্রিক ব্যবস্থাও নিষ্ক্রিয় থাকে।

থার্মেল (thermel) — যে-সব যন্ত্রে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় সংলগ্ন বস্তুর উষ্ণতা (টেম্পারেচার ↑) মাপা যায়; যেমন, থার্মোকাপ্‌ল ↑, থার্মোস্টাট যন্ত্র ↑ প্রভৃতি।

থার্মোসাইফন (thermo-siphon) — যে বিশেষ যান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোন আধারের মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এক নল দিয়ে ঠাণ্ডা জল ঢোকে, অন্য নল দিয়ে গরম জল বেরিয়ে যায়; কাজেই আধারটি কখন বেশি উত্তপ্ত হয় না। মোটর গাড়ীর রেডিয়েটর ↑ ঠাণ্ডা রাখতে এই ব্যবস্থা থাকে। উত্তপ্ত জলের এইরূপ চলাচল আপনা থেকে বিশেষ সাইফন ↑ ব্যবস্থায় সম্পন্ন হয়, কোন পাম্প লাগে না।

থায়ো অ্যাসিড (thio-acid) — সাল্‌ফার (গন্ধক) সমন্বিত অ্যাসিডের বিশেষ নাম। এই শ্রেণীর অ্যাসিড সাধারণ অ্যাসিডের অক্সিজেনের স্থলে বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সাল্‌ফার-পরমাণু নিয়ে গঠিত হয়; যেমন— সাধারণ কার্বনিক অ্যাসিড হলো H_2CO_3; পক্ষান্তরে, থায়োকার্বনিক অ্যাসিড হলো H_2CS_3.

থিওব্রোমিন (theobromine) — কেফিনের ↑ প্রায় অনুরূপ গুণবিশিষ্ট একটি রাসায়নিক পদার্থ; এর আরাম-দায়ক ও কিছু উত্তেজক গুণের জন্যে

চকোলেট প্রভৃতি খাদ্য বস্তুতে অনেক সময় ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

থিলিয়াম (thelium)—জৈব কোষের স্তর; যেমন—**এপিথিলিয়াম** হলো কোন জৈব পদার্থের উপরিভাগে বিন্যস্ত কোষ-স্তর; আর, **মেসো-থিলিয়াম** হলো মধ্যবর্তী স্তর, এবং **হাইপোথিলিয়াম,** নিম্নবর্তী স্তর।

থিয়োডোলাইট (theodolyte)—দূরবর্তী কোন বস্তু, বা স্থানের কৌণিক ব্যবধান পরিমাপের জন্য উদ্ভাবিত যন্ত্র বিশেষ; জমি জরিপ করবার কাজে

থিয়োডোলাইট (মোটামুটি গঠন)

ব্যবহৃত হয়। এর প্রধান অংশ হলো ভূ-পৃষ্ঠের দূরবর্তী জিনিস দেখবার উপযোগী (টেরেষ্ট্রিয়াল) একটা টেলি-স্কোপ ↑; যেটাকে ডিগ্রি - চিহ্নিত একটা গোলাকার স্কেলের উপর ঘুরিয়ে দূরের বস্তু লক্ষ্য করা হয়। ওই স্কেলের গায়ে টেলিস্কোপটার অবস্থান লক্ষ্য করে দৃষ্ট বস্তুর অবস্থানের কৌণিক ব্যবধান ও হিসেব করে তার দূরত্ব নির্ধারিত হয়ে থাকে।

থেরাপিউটিক (therapeutic) — কোন রোগ নিরাময়ের জন্যে উপযুক্ত ঔষধাদি প্রয়োগের ব্যবস্থা; রোগের চিকিৎসা-পদ্ধতি। **থেরাপি** (therapy) অর্থ রোগের চিকিৎসা; যেমন—হাইড্রোথেরাপি ↑, কেমোথেরাপি ↑ রোডিওথেরাপি ↑ প্রভৃতি।

থোরিয়াম (thorium) — মৌলিক ধাতু। সাংকেতিক চিহ্ন Th, পার-মাণবিক ওজন 232·12, পারমাণবিক সংখ্যা 90; গাঢ় ধূসরবর্ণ তেজস্ক্রিয় পদার্থ। মোনাজাইট ↑ নামক খনিজ পদার্থের মধ্যে সিরিয়াম ↑ ধাতুর সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। এর অক্সাইড (ThO_2) গ্যাস-ম্যাণ্টেল ↑ তৈরী করতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

থোর‍্যাক্স (thorax) — প্রাণিদেহের বক্ষদেশ, বা বক্ষাস্থি-পঞ্জর; **থোর‍্যাক** মানে বক্ষ-সম্বন্ধীয়।

থোর‍্যাকোপ্লাষ্টি (thoracoplasty) — এক প্রকার অদ্ভুত চিকিৎসা-পদ্ধতি; এতে প্রয়োজনমত বক্ষ-পঞ্জরের এক ধারের একাধিক অস্থি- (পাঁজরার হাড়) কেটে বাদ দেওয়া হয়, যাতে উপরের চাপে সে-দিকের ফুস্-ফুসটা চেপে কুঁচকে যায়, শ্বাস-বায়ু ঢুকে আর ফুলতে পারে না। এভাবে রোগগ্রস্ত ফুস্ফুসটা বিশ্রাম পায় এবং আবার সুস্থ হয়ে উঠতে পারে। কঠিন যক্ষ্মারোগে এ-পদ্ধতি কখন-কখন অবলম্বিত হয়ে থাকে।

থ্যালামাস (thalamus) — (উদ্ভিদ সম্পর্কে) দলপত্র; বৃন্তের অপেক্ষাকৃত বর্ধিত শীর্ষদেশ, যাকে ঘিরে ফুলের পাঁপড়ি, বা দলগুলি জন্মায়। একে ফুলের রিসেপ্টেক্‌ল-ও বলে। (মনুষ্য সম্পর্কে) মগজের (ব্রেন ↑) নিম্নস্থ সুষুম্নাকাণ্ড-সংলগ্ন ডিম্বাকৃতি পদার্থ-পিণ্ড দু'টি; দেহের বিভিন্ন নার্ভ ↑, বা

স্নায়ুর স্পন্দন এই থ্যালামাস-পিণ্ডের মাধ্যমে গুরু-মস্তিষ্কে (সেরিব্রাম ↑) গিয়ে পৌঁছায় এবং বিভিন্ন অনুভূতি, চিন্তা, কর্মপ্রেরণা প্রভৃতির সাড়া জাগায়। মানুষের স্নায়ুতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে থ্যালামাসের কার্যকারিতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য। একে 'থ্যালামি' (thalami)-ও বলা হয়।

থ্যালিয়াম (thallium) — মৌলিক ধাতব পদার্থ ; সাংকেতিক চিহ্ন Tl, পারমাণবিক ওজন 204·39, পারমাণবিক সংখ্যা 81. অনেকটা সীসার মত সাদা ও ভারী, কিন্তু অপেক্ষাকৃত নরম ও প্রসার্য ধাতু। সহজেই এর সূক্ষ্ম তার ও পাত্ করা যায়।

থ্যালাসোফাইট (thalassophyte) — সামুদ্রিক উদ্ভিদ ; সমুদ্রের জলে উৎপন্ন বিভিন্ন প্রকার শৈবাল, লতা, গুল্ম প্রভৃতি। **থ্যালাস** (thalass) মানে সমুদ্র।

থ্যালোফাইট (thallophyte) — প্রাথমিক স্তরের উদ্ভিদ শ্রেণী ; যেমন — শৈবাল (অ্যাল্‌গি ↑), ছত্রাক (ফাঙ্গি ↑) প্রভৃতি ; যাদের মূল, কাণ্ড, পাতা প্রভৃতি উদ্ভিদাংশের পৃথক অস্তিত্ব পরিস্ফুট নয়। এ-সব উদ্ভিদ-দেহকে বলে **থ্যালাস** (thallus)।

থ্রম্বিন (thrombin) — দেহের কোন স্থান কেটে গেলে কর্তিত পেশী-কোষগুলি থেকে এক প্রকার সূক্ষ্ম জৈব-রস নির্গত হয়ে রক্তের **প্রোটোথ্রম্বিন** উপাদানকে থ্রম্বিনে রূপান্তরিত করে। এই থ্রম্বিনের রাসায়নিক ক্রিয়ায় আবার রক্তের ফাইব্রিনোজেন ↑ (যা রক্তে মাত্র ⅓% থাকে) উপাদান জমে গিয়ে সূক্ষ্ম সূত্রবৎ হয়ে ওঠে, যার মধ্যে রক্তের জলীয় অংশ শুষে গিয়ে রক্ত দ্রুত জমাট বেঁধে যায়। দেহের কোন অংশ কেটে-কুটে গেলে এভাবে রক্ত জমাট বেঁধে কাটা-স্থান থেকে রক্ত পড়া স্বভাবতঃই বন্ধ হয়ে যায়।

থ্রম্বোসিস (thrombosis) — রোগ বিশেষ। এ-রোগে দেহের কোন রক্তবহা নালি-পথের কোথাও সহসা রক্ত জমাট বেঁধে যায়। এরূপ জমাট-বাঁধা রক্তে হৃৎপিণ্ডের 'করোনারি আর্টারি' ↑ রুদ্ধ হয়ে গেলে হঠাৎ রোগীর মৃত্যু ঘটে। দেহের কোথাও রক্ত এভাবে জমাট বেঁধে যাওয়ার অবস্থাকে বলে **থ্রম্বাস**। ধমনীর রক্ত এভাবে কোথাও জমাট বাঁধার অবস্থাকে চিকিৎসা-শাস্ত্রে ইদানীং অক্লুসন ↑ -ও বলা হয়।

ন

নটিক্যাল মাইল (nautical mile) —জাহাজ চলাচলে ব্যবহৃত জলপথের দূরত্বের মাপ বিশেষ ; যার পরিমাণ এক ডিগ্রি ল্যাটিচিউডের ↑ ষাট ভাগের এক ভাগ। মোটামুটি 6080 ফুট, বা 1·515 মাইল (সাধারণ) ধরা হয়। এই সামুদ্রিক দূরত্বকে আবার কখন কখন **নট**-ও বলা হয়।

নর্ম্যাল সল্ট (normal salt)—কোন বিক্রিয়ক অ্যাসিডের সব কয়টি হাইড্রোজেন-পরমাণু বেসের ↑ ধাতব পরমাণুর দ্বারা অপসারিত হয়ে যে রাসায়নিক লবণ গঠিত হয় ; পূর্ণ-শমিত

লবণ ; যেমন, সোডিয়াম সাল্‌ফেট, Na_2SO_4 ; কিন্তু সোডিয়াম বাই-সাল্‌ফেট, $NaHSO_4$ নর্ম্যাল সল্ট নয়। একে বলে অর্ধ-শমিত লবণ, অথবা 'অ্যাসিড সল্ট' † (acid salt)।

নর্ম্যালসল্যুসন (normal solution) — এক লিটার † দ্রবণে কোন রাসায়নিক পদার্থের এক গ্রাম-ইকুইভ্যালেণ্ট † পরিমাণ দ্রবিত থাকলে সেই দ্রবণকে বলে ন. স. ; যেমন—সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিডের আণবিক ওজন (মলিকুলার ওয়েট †)98, কিন্তু ইকুইভ্যালেণ্ট ওয়েট † হলো 49 ; সুতরাং এক লিটার দ্রবণে যদি 49 গ্রাম † বিশুদ্ধ সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড দ্রবিত থাকে তবে তা হবে সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিডের নর্ম্যাল সল্যুসন।

নাইক্রোম (nichrome)—নিকেল ও ক্রোমিয়াম † সংকর-ধাতুর ব্যবসায়িক নাম। সবিশেষ তাপসহ; সাধারণতঃ ইলেক্‌ট্রিক হিটারের তার-কুণ্ডলী এ-দিয়ে তৈরী হয়ে থাকে।

নাইটার (nitre) — সল্ট পিটার † ; পটাসিয়াম নাইট্রেট, KNO_3.

নাইট্রাস অক্সাইড (nitrous oxide) —বর্ণহীন, মিষ্ট গন্ধবিশিষ্ট গ্যাসীয় যৌগিক পদার্থ, N_2O; গ্যাসটা নাকে গেলে হাসির উদ্রেক করে, এ-জন্যে একে **লাফিং গ্যাস** † -ও বলা হয়। সামান্য অ্যানেস্থেটিক † শক্তির জন্যে গ্যাসটা দন্ত-চিকিৎসায় আগের দিনে কখন-কখন ব্যবহৃত হোত।

নাইট্রাস অ্যাসিড (nitrous acid) —নাইট্রোজেন-ঘটিতএকটি অতি মৃদু অ্যাসিড। নাইট্রোজেন-ট্রাইঅক্সাইড, N_2O_3, জলে দ্রবিত করলে পাওয়া যায়। নাইট্রোজেন-পারঅক্সাইড, NO_2, গ্যাস জলে দ্রবীভূত করলে নাইট্রিক অ্যাসিডের সঙ্গে-সঙ্গে কিছু নাইট্রাস অ্যাসিড-ও (HNO_2) উৎপন্ন হয়ে থাকে।

নাইট্রাইট (nitrite) — নাইট্রাস অ্যাসিডের(HNO_2) বিভিন্ন সল্টকে † বলা হয় নাইট্রাইট; যেমন, সোডিয়াম নাইট্রাইট, ($NaNO_2$), ইথাইল নাইট্রাইট প্রভৃতি। সোডিয়াম, বা পটাসিয়ামের নাইট্রাইট সল্ট হৃদ্‌-রোগে ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

নাইট্রাইড (nitride)—নাইট্রোজেন-ঘটিত বাইনারি † কম্পাউণ্ড। অত্যধিক উত্তাপে ক্যালসিয়াম, ম্যাগ্নেসিয়াম, বোরন প্রভৃতি ধাতব পদার্থের সঙ্গে নাইট্রোজেন গ্যাসের সরাসরি রাসায়নিক মিলনে বিভিন্ন নাইট্রাইড যৌগিক উৎপন্ন হয়।

নাইট্রিক অ্যাসিড (nitric acid)— বর্ণহীন তরল একটি অজৈব অ্যাসিড, HNO_3; একে **অ্যাকোয়াফর্টিস**-ও বলে। তীব্র অ্যাসিড-গুণসম্পন্ন,প্রায় সব পদার্থ ক্ষয় করে ফেলে। সোনা, রূপা, প্ল্যাটিনাম (নোবল মেটাল †) ব্যতীত সব ধাতু এতে দ্রবীভূত হয়ে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে ধাতব নাই-ট্রেট † সল্ট উৎপন্ন হয় ; আর বাদামী বর্ণের নাইট্রোজেন - ডাইঅক্সাইড (NO_2) গ্যাস বেরোয়। পটাসিয়াম, বা সোডিয়াম নাইট্রেটের (চিলি সল্টপিটার †) সহিত সাল্‌ফিউরিক
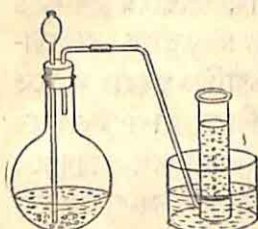
অ্যাসিডের ↑ রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে রসায়নাগারে এই নাইট্রিক অ্যাসিডতৈরী করা হয়ে থাকে। অন্য পক্ষে, উত্তপ্ত প্লাটিনামের ↑ উপর দিয়ে অ্যামোনিয়া গ্যাস-মিশ্রিত বায়ু প্রবাহিত করেও অ্যাসিডটা সহজে প্রচুর পরিমাণে তৈরী করা যেতেপারে। এই প্রক্রিয়ায় প্ল্যাটিনাম ক্যাটালিস্টের ↑ কাজ করে মাত্র; অ্যামোনিয়ার (NH_3) সঙ্গে বায়ুর অক্সিজেন ↑ গ্যাস মিলে নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্পে নাইট্রিক অ্যাসিড প্রভূত পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

রসায়নাগারে HNO_3 প্রস্তুত প্রণালী

নাইট্রিক অক্সাইড (nitric oxide) বর্ণহীন একটি গ্যাসীয় যৌগিক পদার্থ, NO (নাইট্রোজেনের মনক্সাইড)। অক্সিজেন গ্যাস, বা বায়ুর সংস্পর্শে জারিত হয়ে গ্যাসটা সঙ্গে - সঙ্গে নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড, বা পার-ক্সাইড, NO_2, নামক বাদামী বর্ণের গ্যাসে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

নাইট্রেট (nitrate)—নাইট্রিক অ্যাসিডের (HNO_3) বিভিন্ন সল্ট; জৈব, অথবা অজৈব উভয় প্রকার বেসের ↑ সঙ্গেই নাইট্রেট র‍্যাডি-ক্যালের ↑ (NO_3) সংযোগে নাইট্রেট সল্ট গঠিত হতে পারে; যেমন—পটাসিয়াম নাইট্রেট, KNO_3, (নাইটার ↑, বা সল্টপিটার ↑); সোডিয়াম নাইট্রেট, $NaNO_3$, সেলুলোজ ↑ নাইট্রেট, ইথাইল ↑ নাইট্রেট ইত্যাদি।

নাইট্রেসন (nitration) — বিভিন্ন নাইট্রাইট ↑ সল্টকে নাইট্রেট ↑ সল্টে রূপান্তরিত করবার প্রক্রিয়া; মূলতঃ এক প্রকার জারণ-পদ্ধতি; যেমন, পটাসিয়াম নাইট্রাইট, KNO_2, নাই-ট্রেসনের ফলে পটাসিয়াম নাইট্রেটে, KNO_3, পরিবর্তিত হয়। মাটির মধ্যে বিভিন্ন জীবাণুর প্রভাবে এই নাইট্রেসন - প্রক্রিয়া স্বভাবতঃই সং-ঘটিত হয়ে থাকে (নাইট্রোজেন সাই-কল ↑)। উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহ মাটিতে পচে বিশেষ-বিশেষ জীবাণুর (নাইট্রি-ফাইং ব্যাক্টিরিয়া ↑) সাহায্যে এরূপ জারণ-ক্রিয়া সংঘটিত হয় এবং নাই-ট্রেট-সল্ট উৎপন্ন হয়ে থাকে। জীবাণু-দের এই প্রক্রিয়াকে সচরাচর বলা হয় **নাইট্রিফিকেশন**।

নাইট্রোজেন (nitrogen)—মৌলিক গ্যাসীয় পদার্থ; সাংকেতিক চিহ্ন N, পারমাণবিক ওজন 14·008, পার-মাণবিক সংখ্যা হলো 7; অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে বায়ুমণ্ডলের প্রায় পাঁচ ভাগের চার ভাগ অধিকার করে রয়েছে। গন্ধহীন, অদৃশ্য ও সাধারণ অবস্থায় সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় গ্যাস। এর আকরিক যৌগিক পদার্থ হলো 'চিলি সল্ট পিটার' ↑, $NaNO_3$। জীব-জগতের পক্ষে নাইট্রোজেন একান্ত প্রয়োজনীয়; প্রত্যক্ষভাবে না হলেও নাইট্রোজেন ব্যতীত কোন উদ্ভিদ, বা

প্রাণী বাঁচতে পারে না (নাইট্রোজেন সাইক্‌ল ↑)।' খাদ্যের প্রোটিন ↑ উপাদানের গঠনে নাইট্রোজেন একটি অপরিহার্য মৌল। এর বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ জমির উৎকৃষ্ট সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে (ফার্টিলাইজার ↑)।

নাইট্রোজেন সাইক্‌ল (nitrogen cycle)—নাইট্রোজেন-চক্র ; প্রকৃতির বিচিত্র ব্যবস্থায় নাইট্রোজেন-ঘটিত বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ খাদ্যের মাধ্যমে উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের প্রয়োজন মেটায় ; আবার, বিভিন্ন জীবাণুর প্রভাবে তাদের দেহাবশেষ থেকে নানাভাবে পুনরায় নাইট্রোজেন মুক্ত হয়। বিভিন্ন জীবাণুর প্রভাবে মাটির বিভিন্ন অজৈব উপাদান বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনের সংযোগে বিভিন্ন অজৈব নাইট্রেট ↑ লবণে
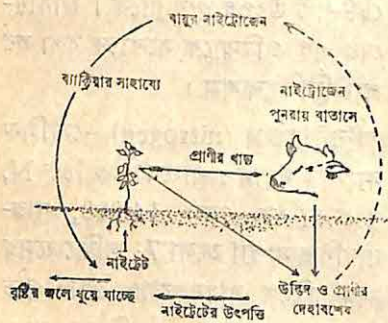
নাইট্রোজেন সাইক্‌ল

পরিণত হয়। উদ্ভিদ তার পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্যে ওই সব নাইট্রেটের জলীয় দ্রবণ মাটি থেকে শুষে নিয়ে আত্মসাৎ করে। উদ্ভিদ-দেহের নাইট্রোজেন-ঘটিত প্রোটিন ↑ পদার্থ আবার প্রাণীরা খাদ্যরূপে গ্রহণ করে। তার পর উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহ মাটিতে পচে মিশে যায়, প্রাণীদের মল-মূত্রও মাটিতে মেশে। এভাবে নাইট্রোজেন-ঘটিত যৌগিক পুনরায় মাটিতে চলে যায়। বিশেষ জীবাণুর প্রভাবে এর কতকাংশ গ্যাসরূপে বায়ুমণ্ডলে মিশে যায়, আর কতকাংশ নাইট্রেট আকারে পুনরায় উদ্ভিদ-দেহে ফিরে আসে। এভাবে গ্যাসীয় নাইট্রোজেন স্বভাবতঃই বায়ুমণ্ডল থেকে উদ্ভিদ ও প্রাণীর মাধ্যমে মাটি ও বায়ুর মধ্যে পর্যায়ক্রমে চক্রগতিতে চলাচল করছে। নাইট্রোজেন গ্যাসের এই প্রাকৃতিক চক্রাবর্তন পদ্ধতিকে বলে নাইট্রোজেন-সাইক্‌ল।

নাইট্রোজেন ফিক্সেশন (nitrogen fixation)— নাইট্রোজেন-সংবন্ধন ; জীবজগতের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্যে নাইট্রোজেনের একান্ত প্রয়োজন ; কিন্তু কোন জীবের পক্ষে সে-প্রয়োজন সোজাসুজি বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন থেকে সিদ্ধ হয় না। এজন্যে গ্যাসটাকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সাহায্যে কৌশলে সংবদ্ধ করে ব্যবহারের উপযোগী যৌগিকে রূপান্তরিত করে নিতে হয়। বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এভাবে তৈরী করা হয় অ্যামোনিয়া ↑ (NH_3), বিভিন্ন নাইট্রেট সল্ট এবং নাইট্রোজেন-ঘটিত নানা শ্রেণীর যৌগিক ; যেগুলি জমির সাররূপে ব্যবহৃত হয় এবং উদ্ভিদেরা তাদের জলীয় দ্রবণ খাদ্য-রস হিসেবে শোষণ করে। আবার মাটির মধ্যে নানারকম 'নাইট্রিফাইং' জীবাণুর প্রভাবেও

একাজ স্বভাবতঃই সিদ্ধ হয়ে থাকে (নাইট্রোজেন সাইক্ল ↑)।

নাইট্রো-গ্লিসারিন (nitro-glycerine)— গ্লিসারিন ↑ ও নাইট্রিক অ্যাসিডের রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন একটি তৈলাক্ত তরল যৌগিক পদার্থ, $C_3H_5(NO_3)_3$; একে আবার 'গ্লিসারাইল ট্রাইনাইট্রেট'-ও বলে। ঈষৎ হল্‌দে বর্ণের ভারী পদার্থ। অতি সামান্য আঘাতেই জিনিসটা ভীষণ শব্দে বিস্ফোরিত হয়। এটা এককভাবে বিস্ফোরক পদার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। তরল পদার্থ বলে বিস্ফোরক হিসেবে এর ব্যবহার অসুবিধাজনক ; এর সঙ্গে কৌশলে কিসেলগার ↑ মিশিয়ে ডিনামাইট ↑ তৈরী হয়।

নাইট্রো-চক (nitro-chalk) — ক্যালসিয়াম কার্বনেট ↑ ($CaCO_3$) ও অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটের ($NH_4.NO_3$) সংমিশ্রিত পদার্থ। সাধারণতঃ এই সংমিশ্রণ জমির সাররূপে অনেক সময় ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

নাইট্রো-বেঞ্জিন (nitro-benzene) — হল্‌দে বর্ণের তৈলাক্ত তরল পদার্থ, $C_6H_5NO_2$; বস্তুতঃ বেঞ্জিনের ↑ সঙ্গে নাইট্রিক অ্যাসিডের রাসায়নিক মিলনে যৌগটা উৎপন্ন হয়ে থাকে। বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে এই যৌগিক পদার্থটা থেকে পাওয়া যায় অ্যানিলিন ↑ ; এই অ্যানিলিন থেকে আবার বিভিন্ন রং ও সুগন্ধ দ্রব্যাদি তৈরী হয়ে থাকে।

নাইট্রো-সেলুলোজ (nitro-cellulose)—তূলা, কাষ্ঠতন্তু প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ (সেলুলোজ ↑) পদার্থের উপরে বিশেষ ব্যবস্থায় গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিডের (HNO_3) রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন যৌগিক পদার্থ। একে সেলুলোজের বিশেষ এক প্রকার 'নাইট্রিক এস্টার'-ও ↑ বলা যায় ; অবশ্য একে 'সেলুলোজ নাইট্রেট' বলাই সঙ্গত ; কিন্তু নাইট্রো-সেলুলোজ কথাটাই বিশেষভাবে প্রচলিত। অনেক সময় পদার্থটাকে **গান-কটন** ↑ -ও বলা হয় ; কারণ, এটা উগ্র বিস্ফোরক পদার্থ। বিভিন্ন শ্রেণীর নাইট্রোসেলুলোজ সেলুলয়েড ↑ ও কৃত্রিম রেশম (আর্টিফিসিয়াল সিল্ক ↑), রেয়ন ↑ প্রভৃতি তৈরীর জন্যেও যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

নাইট্রো-হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (nitro-hydrochloric acid) — অ্যাকোয়া-রিজিয়া ↑ ; এক ভাগ তীব্র নাইট্রিক অ্যাসিড ও 4-ভাগ তীব্র হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের মিশ্রণ। এতে সোনা (নোবেল মেটাল ↑) দ্রবীভূত হয়। অগ্নিমান্দ্য ও লিভারের দোষে জলের সঙ্গে এর দু-এক ফোঁটা দিয়ে অতি লঘু দ্রবণ ঔষধ হিসাবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

নাইলন (nylon) — এক রকম প্ল্যাস্টিক ↑ পদার্থে তৈরী সুতার ব্যবহারিক নাম। এই সুতা দিয়ে মোজা, জামার কাপড়, সৌখিন শাড়ী প্রভৃতি তৈরী হয় ; দেখতে অনেকটা সিল্কের মত বলে একে আর্টিফিসিয়াল সিল্ক ↑ -ও বলা যেতে পারে। রাসায়নিক হিসেবে পদার্থটা হলো অ্যাডি-

পিক ↑ অ্যাসিডের এক রকম পলিমার ↑। এই অ্যাডিপিক অ্যাসিড পাওয়া যায় ফিনল ↑ থেকে। অ্যাসিডটার বিশেষ পলিমারিজেশনের ↑ ফলেই এই নাইলন জাতীয় প্ল্যাস্টিকের সৃষ্টি হয়। এই পলিমার পদার্থটাকে উত্তাপে তরল করে যন্ত্রের সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে ধারাকারে চেপে বার করা হয়, আর বাইরের ঠাণ্ডায় তা শক্ত হয়ে নরম ও মসৃণ সূতার আকার ধারণ করে।

নাদির (nadir) — কোন লোকের ঠিক মাথার উপরে উর্ধে সেলেশ্চিয়াল স্ফিয়ারে ↑ অবস্থিত কল্পিত সর্বোচ্চ বিন্দুকে বলে জেনিথ ↑। জেনিথের বিপরীত বিন্দু, অর্থাৎ কোন লোকের বরাবর পায়ের নীচে (পৃথিবীর অপর দিকের) সেলেশ্চিয়াল স্ফিয়ারে অবস্থিত সর্বনিম্ন বিন্দুকে বলা হয় 'নাদির'। জ্যোতির্বিদ্যার গণনাদিতে নভোমণ্ডলে এরূপ বিন্দু কল্পিত হয়।

নার্কোটিক (narcotic) — ঘুমের ঔষধ ; যে-সব পদার্থের রাসায়নিক প্রভাবে নিদ্রার উদ্রেক হয়, দেহে অবসাদ ও আচ্ছন্ন ভাব দেখা দেয়। আফিম ও মর্ফিন জাতীয় অ্যালক্যালয়েড ↑ এবং ভেরোনল, লুমিনল ↑ প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ 'নার্কোটিক ড্রাগ' বলে পরিচিত। নার্ক- (narc-) মানে নিদ্রা।

নার্কোলেপ্‌সি (narcolepsy) — অদ্ভুত একটা রোগ বিশেষ ; যাতে রোগী সহসা সময়ে-অসময়ে অজ্ঞাতে ঘুমিয়ে পড়ে ; ঘুম প্রতিরোধ করবার তার কোন ক্ষমতা থাকে না।

নার্কোসিস (narcosis) — অত্যন্ত গাঢ় নিদ্রা, বা নিদ্রাচ্ছন্ন ভাব ; ঘুমের ঔষধ ব্যবহারে যেমন হয়।

নার্কোটিক ড্রাগ (narcotic drug) — বিভিন্ন ঘুমের ঔষধ।

ন্যাচারাল গ্যাস (natural gas) — কোন-কোন স্থানে, বিশেষতঃ তৈলখনি অঞ্চলে, ভূগর্ভ থেকে যে-সব গ্যাস স্বভাবতঃ নির্গত হয়। বিভিন্ন উৎসের এরূপ গ্যাস হয় বিভিন্ন দাহ্য গ্যাসের সংমিশ্রণ। সাধারণতঃ হাইড্রোজেন ও মিথেন ↑ প্রভৃতি নানারকম দাহ্য গ্যাসীয় হাইড্রোকার্বন ↑ ও হিলিয়াম ↑ প্রভৃতি মৌলিক গ্যাস এর মধ্যে সংমিশ্রিত থাকে।

ন্যাট্রিয়াম (natrium)—সোডিয়াম ↑ ধাতু ; সোডিয়ামের এই ল্যাটিন নাম থেকেই ধাতুটার সাংকেতিক চিহ্ন 'Na' করা হয়েছে।

ন্যাট্রন (natron) — খনিজ পদার্থ বিশেষ ; মূল রাসায়নিক হিসেবে জিনিসটা হলো সোডিয়াম সেস্‌কুইকার্বনেট, $Na_2CO_3 . NaHCO_3 . 2H_2O$; সাদা স্ফটিকাকার পদার্থ।

ন্যাপ্‌থা (naphtha) — বিভিন্ন হাইড্রোকার্বনের ↑ এক বিশেষ শ্রেণীর সংমিশ্রণকে সাধারণভাবে ন্যাপ্‌থা বলা হয়। প্যারাফিন অয়েল ↑ ও আল্‌কাতরা (কোল-টার ↑) প্রভৃতি থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর ন্যাপ্‌থা পাওয়া যায়। ডেস্ট্রাক্‌টিভ ডিস্টিলেশন ↑ প্রক্রিয়ার সাহায্যে কাঠ থেকেও এক

রকম ন্যাপ্থা বেরোয়, যাকে বলে উড্-ন্যাপ্থা ↑। এর মধ্যে প্রধানতঃ থাকে অবিশুদ্ধ মিথাইল অ্যালকোহল, CH_3OH. (উড্ স্পিরিট ↑)

ন্যাপ্থলিন (napthalene) — বিশেষ একটা হাইড্রোকার্বন, $C_{10}H_8$; সাদা, স্ফটিকাকার, তীব্র গন্ধবিশিষ্ট কঠিন পদার্থ। পেট্রোলিয়াম ↑ ও কোল-টার ↑ থেকে বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে পাওয়া যায়। বাজারে ন্যাপ্থলিনের বল বিক্রি হয়, যাকে ইংরেজীতে বলে **মথ-বল**; কারণ, জামা-কাপড়ে ন্যাপ্থলিন দিয়ে রাখলে এর গন্ধে পোকা-মাকড় আসে না। এ ছাড়া বিভিন্ন শ্রেণীর রঞ্জক পদার্থ তৈরী করতেও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ন্যাপ্থলিন দরকার হয়।

ন্যাসেণ্ট গ্যাস (nascent gas) — বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে যে গ্যাস সদ্য উদ্ভূত হয়; — 'জায়মান গ্যাস'। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রথম উৎপত্তিকালে বিভিন্ন মৌল গ্যাস পারমাণবিক অবস্থায় বিশেষ রাসায়নিক ক্ষমতাসম্পন্ন থাকে; একে তখন ন্যাসেণ্ট গ্যাস, বা 'ন্যাসেণ্ট অবস্থার' গ্যাস বলা হয়; যেমন, ন্যাসেণ্ট হাইড্রোজেন, ন্যাসেণ্ট অক্সিজেন ইত্যাদি রাসায়নিক ক্রিয়ায় বিশেষ সক্রিয়।

নিউক্লিও-প্রোটিন (nucleo-protein) — যে প্রোটিন ↑ পদার্থের সঙ্গে নিউক্লিক ↑ অ্যাসিড যুক্ত থাকে; প্রাণী-দেহের বিভিন্ন জীব-কোষ, বা সেলের ↑ কেন্দ্রীণ, বা নিউক্লিয়াস ↑ এই শ্রেণীর জৈব পদার্থে গঠিত।

নিউক্লিক অ্যাসিড (nucleic acid) — অত্যন্ত জটিল গঠনের একটি জৈব অ্যাসিড; যাতে প্রধানতঃ নাইট্রোজেন, শর্করা জাতীয় হাইড্রোকার্বন ও ফস্ফোরিক ↑ অ্যাসিডের সন্ধান পাওয়া যায়। স্বভাবতঃ দু'রকমের নি. অ্যা. পাওয়া গেছে: এক রকম পাওয়া গেছে থাইমাস ↑ গ্ল্যাণ্ডে, ও প্রাণিদেহের জীবকোষের কেন্দ্রীণে; আর এক রকম ঈষ্ট ↑ থেকে।

নিউক্লিয়ন (nucleon) — কোন পদার্থের পরমাণু-কেন্দ্রীণের সংগঠক এক প্রকার বিশেষ কণিকা; যা ক্ষেত্রবিশেষে ধন-তড়িতাহিত প্রোটন ↑ বা তড়িদ্বিহীন নিউট্রন ↑ হতে পারে।

নিউক্লিয়াস (nucleus) — কেন্দ্রীয় বস্তু, অথবা কেন্দ্রীণ পদার্থ; মৌলিক পদার্থের প্রতিটি পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ধন-তড়িৎবিশিষ্ট মূল বস্তু-কণিকা। এই কেন্দ্রীয় বস্তু ধন-তড়িৎ বিভবের প্রোটন ↑ ও তড়িৎ-বিহীন নিউট্রন ↑ কণিকার সমবায়ে গঠিত (অ্যাটমিক স্ট্রাক্চার ↑)। উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহের সংগঠক প্রত্যেকটি জীবকোষের অভ্যন্তরেও এরূপ এক রকম কেন্দ্রীয় বস্তু, বা নিউক্লিয়াস রয়েছে।

নিউক্লিয়ার চার্জ (nuclear charge) — পরমাণুর কেন্দ্রীয় বস্তু, বা নিউক্লিয়াসের প্রোটন ↑ কণিকায় যে ধন-তড়িৎশক্তি নিহিত থাকে। এই তড়িৎবিভবের পরিমাণ ওর চারিদিকে ভ্রাম্যমাণ ইলেক্ট্রন ↑ কণিকাগুলোর ঋণ-তড়িৎবিভবের সমষ্টির সমান; কিন্তু বিপরীত, অর্থাৎ ঋণ

তড়িৎ-ধর্মী। পরমাণুর নিউক্লিয়াসে অবস্থিত প্রোটন-কণিকার সংখ্যা ওর চারদিকে ভ্রাম্যমাণ ইলেক্ট্রন কণিকাগুলোর সংখ্যার সমান। মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক সংখ্যা (অ্যাটমিক নাম্বার ↑) তার পরমাণুর এই কেন্দ্রীয় তড়িৎ-শক্তির একক সংখ্যায়, অর্থাৎ তার চারদিকে পরিভ্রমণকারী ইলেক্ট্রন - কণিকার সংখ্যার দ্বারা প্রকাশিত হয়ে থাকে।

নিউক্লিয়ার ফিজিক্স (nuclear physics) — বিজ্ঞানের যে শাখায় পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ নিউক্লিয়াসের গঠন ও তার সংগঠক বিভিন্ন কণিকা (প্রোটন ↑, নিউট্রন ↑, পজিট্রন ↑ ইত্যাদি) সম্বন্ধীয় বিশেষ তথ্যাদির পরীক্ষা ও গবেষণাদি করা হয়। এক কথায় বলা যায়, পরমাণুর কেন্দ্রীণের গঠন ও শক্তি সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান।

নিউক্লিয়ার ফিসন (nuclear fission)—ইউরেনিয়াম প্রভৃতি কয়েকটি ভারী ধাতুর পরমাণুগুলোকে তাদের কেন্দ্রীণের সংগঠন বিভিন্ন শক্তি-কণিকায় বিশ্লিষ্ট করার, বা ভেঙ্গে ফেলার প্রক্রিয়া। কথাটার মানে হলো, পরমাণু-বিভাজন, বা পরমাণু-ভাঙ্গা। অ্যাটমিক পাইল ↑, সাইক্লোট্রন ↑ প্রভৃতি বিভিন্ন যন্ত্রে সাধারণতঃ নিউট্রন - কণিকার সংঘাতে বিশেষ জটিল কৌশলে এরূপ পরমাণু-ভাঙ্গার কাজ নিষ্পন্ন করা হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলে প্রভূত পারমাণবিক শক্তির উদ্ভব ঘটে, পদার্থ শক্তিতে রূপান্তরিত হয় (অ্যাটম বম্, atom bomb ↑)।

নিউক্লিয়ার ট্রান্সম্যুটেশন(nuclear transmutation) — কোন-কোন ভারী মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াসের আভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক পরিবর্তনের (নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন ↑) ফলে তাদের মৌলিক গঠন বদলে যায়। এর ফলে এক পদার্থ অপর কোন পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে পড়ে। এরূপ পরিবর্তনকে বলে নিউক্লিয়ার ট্রান্সম্যুটেশন। ইউরেনিয়াম প্রভৃতি কয়েকটি তেজস্ক্রিয় পদার্থ তেজ-বিকিরণের ফলে স্বভাবতঃই এভাবে অন্য পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে যায় (ট্রান্সম্যুটেগন অব এলিমেণ্ট ↑)।

নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্শন (nuclear reaction) — যে প্রক্রিয়ায় কোন পদার্থের পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মৌলিক গঠন বদলে গিয়ে অপর কোন নতুন পদার্থের পরমাণুর উদ্ভব ঘটে, অথবা ওই মৌলিক পদার্থেরই আইসোটোপ ↑ সৃষ্টি হয়। রেডিওঅ্যাক্টিভ ↑, বা তেজস্ক্রিয় পদার্থের ক্ষেত্রে ক্রমাগত তেজ-বিকিরণের ফলে স্বভাবতঃই এই প্রক্রিয়ায় পদার্থের রূপান্তর ঘটে থাকে। আবার, কৃত্রিম উপায়ে সাইক্লোট্রন ↑ প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে প্রোটন, নিউট্রন ↑ প্রভৃতি কণিকার ধারাবাহিক সংঘাতেও পরমাণুর নিউক্লিয়াসের এরূপ মৌলিক রূপান্তর ঘটানো ইদানিং সম্ভবপর হয়েছে। (চেইন রিঅ্যাক্শন ↑)

নিউট্রন (neutron) — পরমাণুর কেন্দ্রীণ, বা নিউক্লিয়াসের ↑ সংগঠক তড়িদ্বিহীন বিশেষ এক শক্তি-কণিকা

(অ্যাটমিক স্ট্রাক্চার ↑)। ধন-তড়িৎ-বিশিষ্ট প্রোটন ↑ কণিকা ও তড়িৎ-বিহীন এই নিউট্রন কণিকার সমবায়ে মৌলিক পদার্থগুলোর নিউক্লিয়াস, বা কেন্দ্রীণ গঠিত। প্রোটনের চেয়ে নিউট্রনের ভর সামান্য (শতকরা এক ভাগ) কিছু বেশি। কেবল মাত্র হাইড্রোজেন-পরমাণুতে কোন নিউট্রন কণিকা নেই ; আছে মাত্র একটা প্রোটন, যার চারদিকে একটা মাত্র ইলেক্ট্রন ঘুরছে। হেভি হাইড্রো-জেনের ↑ নিউক্লিয়াসে অবশ্য একটা প্রোটন ও একটা নিউট্রন থাকে। তড়িৎবিহীন হওয়ার ফলে নিউট্রন-কণিকাকে বিশেষ ব্যবস্থায় কেন্দ্রচ্যুত করে ফেলা যায়। মূলতঃ এভাবেই 'নিউক্লিয়ার ফিসন' ↑ সম্ভব হয়ে থাকে; একেই বাংলায় বলা হয় পরমাণু-বিভাজন (অ্যাটম বম্ ↑)।

নিউট্রিনো (neutrino) — তড়িৎ-বিহীন অতি সূক্ষ্ম প্রাথমিক বস্তু-কণা। পদার্থ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন জটিল তথ্যের সমাধান করবার জন্যে এরূপ সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম মূল বস্তু-কণিকার কল্পনা করা হয়েছে। কস্মিক ↑, বা মহাজাগতিক রশ্মির মেসন ↑ কণিকা সমূহ এরূপ কল্পিত নিউট্রিনো কণিকার সমবায়ে গঠিত বলে মনে করা হয়।

নিউটন, (Newton) স্যার আইজ্যাক — সুপ্রসিদ্ধ বৃটিশ বিজ্ঞানী ; লিঙ্কল্ন-শায়ারে জন্ম 1642 খৃঃ, মৃত্যু 1727 খৃষ্টাব্দ। কেম্ব্রিজ ট্রিনিটি কলেজে শিক্ষা, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা। রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি 1703 খৃষ্টাব্দ থেকে আমৃত্যু। বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের জন্য 1705 খৃঃ সম্মানজনক 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত।

গণিত, পদার্থ-বিদ্যা ও জ্যোতি-বিজ্ঞানে অপূর্ব প্রতিভা ও অবি-স্মরণীয় অবদান। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির (গ্রাভিটেসন ↑) সূত্র আবিষ্কার, যা এ-যুগে আইনস্টাইনের ↑ আপেক্ষি-কতাবাদের (থিয়োরি অব রিলে-টিভিটি ↑) সূত্রানুসারেও অভ্রান্ত প্রতিপন্ন। বস্তুতঃ নিউটনের 1687 খৃস্টাব্দে প্রকাশিত 'প্রিন্সিপিয়া' নামক গ্রন্থের তথ্যাদির উপরেই আপে-ক্ষিকতা-বাদ মূলতঃ প্রতিষ্ঠিত। বস্তুর গতি সম্বন্ধীয় সূত্রত্রয় (নিউটন্স ল অব মোসন ↑) আবিষ্কার, বর্ণালির (স্পেক্ট্রাম ↑) বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ, আলোক-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি-সাধন ; যদিও আলোক সম্বন্ধীয় তাঁর কণিকাবাদ (কর্পাস্কুলার থিয়োরি ↑) পরে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন। প্রতিফলক দূরবীক্ষণ (রিফ্লেক্টিং টেলিস্কোপ ↑) যন্ত্র উদ্ভাবন করে আধুনিক জ্যোতি-বিজ্ঞানের ভিত্তি পত্তন ; গ্রহ-নক্ষত্রের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ। গণিতের 'বাইনোমিয়াল থিয়োরেম' এবং 'ডিফারেন্সিয়াল ক্যাল্কুলাস' নামক বিশেষ গাণিতিক পদ্ধতি উদ্ভাবন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অমূল্য অবদান ; বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী।

নিউটনস্-ল-অব মোসন (Newton's laws of motion) — বিখ্যাত ইংরাজ বিজ্ঞানী নিউটন ↑ পদার্থের গতি সম্পর্কে যে তিনটি সূত্র প্রবর্তন

করে গেছেন : (1) বহিঃস্থ কোন শক্তির প্রভাব ব্যতীত নিশ্চল বস্তু বরাবর নিশ্চল থাকবে, চলমান বস্তু বরাবর একই দিকে একই বেগে চলতে থাকবে। (2) চলমান বস্তুর ভর-বেগের (মোমেণ্টাম ↑) হার প্রযুক্ত শক্তির আনুপাতিক হবে; আর, তার ওই গতি হবে শক্তি যে-দিকে প্রযুক্ত হয়েছে সেই দিকে। (3) কোন শক্তি প্রযুক্ত হলেই তার সমপরিমাণ একটা বিপরীত শক্তির উদ্ভব হবে (যেমন, বন্দুক ছুঁড়লে সম্মুখগামী চাপ-শক্তির প্রভাবে গুলিটা বেগে সামনে ছুটে যায়, আর তার ফলে উদ্ভূত বিপরীত শক্তির প্রভাবে বন্দুকটা পেছনে ধাক্কা দেয় (জেট্ প্লেন ↑)।

নিউটনস্-ল-অব কুলিং (Newton's law of cooling) — উত্তপ্ত পদার্থ থেকে তাপের বিকিরণ সম্পর্কে নিউটন যে সূত্র প্রবর্তন করে গেছেনঃ কোন পদার্থ যে-হারে তার তাপ হারিয়ে ঠাণ্ডা হয়, তা ওই উত্তপ্ত পদার্থ থেকে তার সংলগ্ন পারিপার্শ্বিক পদার্থের (বায়ুর) তাপ-বৈষম্যের সঙ্গে আনুপাতিক হয়ে থাকে। পদার্থটা চারদিকের বায়ু অপেক্ষা 40° ডিগ্রি বেশি উত্তপ্ত হলে যদি প্রতি মিনিটে তার 10° ডিগ্রি তাপ কমে, তবে ওই তাপ-বৈষম্য 20° ডিগ্রি হলে মিনিটে ওর তাপ 5° ডিগ্রি হারে কমবে। অবশ্য এই তাপ-বৈষম্যের পরিমাণ অত্যধিক হলে অনেক সময় এ-নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারে।

নিউটনিয়ান ডিস্ক (Newtonian disc) — বর্ণালির (স্পেক্‌ট্রাম ↑) সপ্তবর্ণের ধারাবাহিক ও আনুপাতিক-ভাবে বিভিন্ন বর্ণ-রঞ্জিত গোলাকার চাক্‌তি বিশেষ। এই চাক্‌তিখানা অতি দ্রুত ঘোরালে কোন বর্ণই লক্ষিত হয় না, সাদা প্রতিভাত হয়। সপ্তবর্ণের যথাযথ সমাবেশে বর্ণহীন সাদার (যেমন সূর্য-রশ্মি) উৎপত্তি হয়। এই তথ্যের প্রমাণ করবার জন্যে নিউটন উক্তরূপে বিভিন্ন বর্ণরঞ্জিত চক্র-পরীক্ষার প্রবর্তন করেন। (স্পেক্‌ট্রাম ↑)
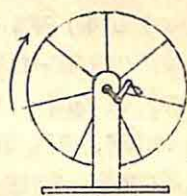
নিউটনিয়ান ডিস্ক

নিউমারেটর (numerator) — ভগ্নাংশিক রাশির ভাজ্য সংখ্যা, অর্থাৎ ভগ্নাংশের উপরের সংখ্যাটি; বাংলায় বলে 'লব' রাশি; যেমন — $\frac{2}{5}$ ভগ্নাংশের 2 হলো নিউমারেটার, আর নিচেরটি, বা ভাজক সংখ্যাটিকে বলে 'ডিনোমিনেটর', বা 'হর' রাশি।

নিয়াম- (pneum-) — বায়ু; যেমন, **নিয়োমেটিক টায়ার** (pneumatic tyre) গাড়ীর বায়ুপূর্ণ চাকা; **নিয়োম্যাটিক্স** (pneumatics) — বায়ুর (বা কোন গ্যাসের) চাপ, ওজন, ঘনত্ব, প্রবাহ প্রভৃতি সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক তথ্য-বিদ্যা।

নিউমোনিয়া (pneumonia) — ফুস্‌ফুসের (লাংস, lungs ↑) প্রদাহ-জনিত রোগ; যাতে ফুস্‌ফুস ফুলে শ্বাসকষ্টসহ

জ্বর হয়। **নিউমো-** (pneumo-) ফুস্‌ফুস সম্বন্ধীয়, বা -ঘটিত ; **নিউমোকক্কাই** (pneumococci) যে বিশেষ জীবাণু, বা ব্যাক্‌টেরিয়ার ↑ সংক্রমণে নিউমোনিয়া রোগ হয়।

নিউরাস্থেনিয়া (neurasthenia) — স্নায়বিক দৌর্বল্য ; অত্যধিক পরিশ্রম, ভগ্নস্বাস্থ্য, বা দুশ্চিন্তার ফলে শারীরিক ও মানসিক অবসাদের অবস্থা।

নিউরোসিস (neurosis) — রোগ বিশেষ ; কোন কঠিন, অথবা অপ্রিয় ব্যাপার এড়াবার চেষ্টায় অবচেতন মনের প্রতিক্রিয়ায় যে রোগ-লক্ষণ প্রকাশ পায়। যেমন, কোন শক্ত কাজ দেখলেই হয়তো হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়ে ওঠে, বা অকারণে ভীত, বা উত্তেজিত হয়ে পড়ে। **নিউরোটিক** মানে হলো নিউরোসিস রোগগ্রস্ত ; অকারণে, বা সামান্য কারণে যখন কেহ উত্তেজিত ও ভাবপ্রবণ হয়ে পড়ে।

নিউরোলেমা (neurolemma) — প্রাণিদেহের স্নায়ুর আবরক সূক্ষ্ম পর্দা; একে অনেক সময় **নিউরিলেমা** (neurilemma) -ও বলা হয়। **নিউরোন** (neurone) মানে স্নায়ু-সূত্রসহ এক-একটি স্নায়ুকোষ (nerve-cell)।

নিউরাইটিস (neuritis) — কোন স্নায়ুর, বা তার বহিরাবরক পর্দার প্রদাহ-জনিত রোগ।

নিওপ্রিন (neoprene)—ক্লোরোপ্রিন থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত এক প্রকার কৃত্রিম রাবারের ↑ ব্যবহারিক নাম ; গাড়ীর টায়ার, টিউব প্রভৃতি তৈরী করতে বহুল প্রচলিত। ক্লোরোপ্রিন ↑ তৈরী হয় অ্যাসিটিলিন ↑ ও হাইড্রোক্লোরিক ↑ অ্যাসিডের বিশেষ রাসায়নিক বিক্রিয়ায়।

নিওলিথিক পিরিয়ড (neolithic period) — নব (উন্নত) প্রস্তর যুগ ; প্রাচীন প্রস্তর-যুগের শেষ ভাগ ; যখন থেকে মানুষ মসৃণ ও উন্নত ধরনের প্রস্তর-নির্মিত হাতিয়ার ও তৈজসাদি তৈরী করতে শিখেছে। প্রায় 10,000 বছর পূর্বেকার যুগ।

নিকেল (nickel) — মৌলিক ধাতু ; সাংকেতিক চিহ্ন Ni, পারমাণবিক ওজন 58·69, পারমাণবিক সংখ্যা 28 ; লোহার মত চৌম্বক-শক্তিসম্পন্ন, সাদা ধাতব পদার্থ। মরিচা ধরে না ; এ-জন্যে ইলেক্‌ট্রোলিসিস ↑ প্রক্রিয়ায় লোহার জিনিসের উপরে নিকেলের একটা পাতলা আস্তরণ ধরানো হয়। এই প্রক্রিয়াকে **নিকেল - প্লেটিং** বলে। নিকেল-স্টিল ↑, নিক্রোম ↑ প্রভৃতি বিভিন্ন সংকর-ধাতু তৈরী করতে দরকার হয়। কোন কোন রাসায়নিক ক্রিয়ায় নিকেল একটি উৎকৃষ্ট ক্যাটালিস্টের ↑ কাজ করে। গন্ধক ও আর্সেনিকের ↑ সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় 'নিকোলাইট' নামক খনিজ থেকে ধাতুটা নিষ্কাশিত হয়ে থাকে।

নিকেল-স্টিল (nickel-steel) — স্টিল (ইস্পাত-লৌহ) ও নিকেলের সংমিশ্রণে উৎপন্ন বিশেষ সংকর-ধাতু ; সাদাটে ও সুকঠিন। এর মধ্যে নিকেলের ভাগ সাধারণতঃ 6% পর্যন্ত থাকে।

নিকেল-সিলভার (nickel-silver) — প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন অনু-

পাতে তামা, দস্তা ও নিকেলের সংমিশ্রণে তৈরী এক প্রকার সংকর-ধাতুর বিশেষ নাম। এর মধ্যে কিন্তু সিলভার, বা রৌপ্য কিছুমাত্র থাকে না ; কিন্তু রূপার মত সাদা ও মরিচা-বিহীন। সাধারণতঃ এতে 60% তামা, 20% নিকেল ও 20% দস্তা (জিঙ্ক ↑) সংমিশ্রিত থাকে।

নিকোটিন (nicotine)—একটি জৈব রাসায়নিক পদার্থ, $C_{10}H_{14}N_2$; বর্ণহীন, বিষাক্ত ও তৈলাক্ত তরল পদার্থ। সাধারণতঃ তামাকের পাতা থেকে নিষ্কাশিত এক প্রকার অ্যালকালয়েড ↑। কীটপতঙ্গ-নাশক বিষাক্ত পদার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

নিক্রোম (nichrome) — নিকেল ও ক্রোমিয়ামের ↑ এক রকম সংকর-ধাতুর ব্যবহারিক নাম। এর মধ্যে সামান্য কিছু লোহা, ম্যাঙ্গানিজ ও সিলিকা ↑ -ও দেওয়া হয়। বিশেষ কঠিন ও তাপসহ বলে অত্যধিক উত্তাপেও এর বিশেষ কোনরূপ অবস্থান্তর ঘটে না ; উত্তাপে প্রদীপ্ত ও ভাস্বর হয়ে উঠে। এ জন্যে বৈদ্যুতিক উনানে (হিটার) এর তার-কুণ্ডলী সচরাচর ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

নিয়ন (neon) — মৌলিক গ্যাসীয় পদার্থ। সাংকেতিক চিহ্ন Ne, পারমাণবিক ওজন 20·183, পারমাণবিক সংখ্যা 10 ; বর্ণহীন, গন্ধহীন গ্যাস ; সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় পদার্থ (অন্যতম ইনার্ট গ্যাস ↑)। বায়ুমণ্ডলে অতি সামান্য পরিমাণে আছে,—প্রায় 50,000 ভাগে একভাগ মাত্র। তরলীকৃত বায়ু থেকে 'ফ্র্যাক্‌সন্যাল ডিস্টিলেশন' ↑ প্রক্রিয়ার সাহায্যে পৃথক করা হয়। ইদানীং যে রঙ্গিন আলোর প্রচলন হয়েছে, যাকে **নিয়ন-সাইন** বলা হয়, তা স্বচ্ছ কোন আবদ্ধ আধারের স্বল্পীকৃত নিয়ন গ্যাসের মাধ্যমে তড়িৎ-প্রবাহের ফলেই সম্ভব হয়।

নিয়ন ল্যাম্প (neon lamp) — ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌ব, বা কাচের লম্বা টিউব বায়ুশূন্য করে তার মধ্যে সামান্য নিয়ন ↑ গ্যাসের মাধ্যমে তড়িৎ-প্রবাহের ব্যবস্থা করে যে আলো তৈরী করা হয়। অল্প চাপের ওই নিয়ন গ্যাসের মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহের প্রভাবে সুদৃশ্য গোলাপী-লাল আলোক সৃষ্টি হয়ে থাকে। এরূপ নিয়ন-বাতির ফিলামেণ্ট ↑ থাকে দু'টা পৃথক ধাতব চাক্‌তি, (বা একটা চাক্‌তি ও একটা তার-কুণ্ডলী)। তড়িৎ-প্রবাহের ফলে নিয়ন গ্যাসের তড়িতাবিষ্ট কণিকাগুলো (আয়ন ↑) চাক্‌তি দুটোর গায়ে পরিবর্তীভাবে ক্রমাগত আঘাত করতে থাকে। এর ফলেই অতি সুদৃশ্য আলোকরশ্মির উৎপত্তি ঘটে।

নিয়ন-ল্যাম্প

নিয়াণ্ডার্থ্যাল ম্যান

নিয়াণ্ডার-থ্যাল ম্যান (neanderthal man)—

প্রাগৈতিহাসিক যুগের জান্তব ধরনের আকৃতি-বিশিষ্ট মানুষ। প্রায় লক্ষ বছর আগে পৃথিবীর কোন-কোন স্থানে এই জাতীয় মানুষ বাস করতো বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে ; অধুনা বিলুপ্ত। বর্তমান মনুষ্যজাতি এদের বংশধর নয়।

নেক্রোপ্‌সি (necropsy)—সন্দেহের ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ নির্ণয়ের জন্যে মৃতদেহের পরীক্ষা-নিরীক্ষা (পোষ্ট-মর্টেম ↑)। **নেক্রো** মানে মৃত। **নেক্রোসিস** (necrosis) জীবন্ত প্রাণিদেহের কোন স্থানীয় কোষ-সমূহের মৃত্যু-জনিত বিকৃতি।

নেপচুন (neptune) — সৌর পরিবারের একটি গ্রহ ; এটি প্লুটো ↑ ও ইউরেনাস ↑ গ্রহদ্বয়ের মধ্যবর্তী একটা নিজস্ব কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে আমাদের হিসেবে এর প্রায় 164·8 বছর লাগে। সূর্য থেকে এর দূরত্ব প্রায় 280 কোটি মাইল হবে ; আয়তনে পৃথিবীর প্রায় 17 গুণ বড়। পৃথিবীর চাঁদের মত এর একটা মাত্র উপগ্রহ দেখা যায়।

নেপচুনিয়াম (neptunium) — মৌলিক ধাতব পদার্থ ; পারমাণবিক সংখ্যা 93 ; এটি অন্যতম একটি ট্রান্স-ইউরেনিক ↑ এলিমেণ্ট। তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম ↑ ধাতু থেকে আবিস্কৃত হয়েছে ; একটি অস্থায়ী তেজস্ক্রিয় (রেডিও অ্যাক্‌টিভ ↑) মৌল।

নেবুলা (nebula) — নভোমণ্ডলের স্থানে-স্থানে যে এক রকম মেঘবৎ উজ্জ্বল পদার্থ-কুণ্ডলী পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে। সম্ভবতঃ ঘনীভূত মহাজাগতিক তেজস্ক্রিয় পদার্থ-কণিকার ঘন সমাবেশে এগুলো গঠিত। লক্ষ লক্ষ বছরের নৈসর্গিক প্রক্রিয়ায় ক্রমে জমাট বেঁধে এ-থেকেই নূতন-নূতন তারকার সৃষ্টি হয়েছে, আজও হচ্ছে বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন।

নেবুলা

নেবুলাইজার (nebulizer) — এক রকম যন্ত্র বিশেষ, যা থেকে কোন তরল পদার্থ মেঘের মত বাষ্পাকারে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। সভা-সমিতি ও উৎসবে আতর, গোলাপ-জল প্রভৃতি সুগন্ধি তরল পদার্থ এ-দিয়ে অভ্যাগত লোকের গায়ে মাথায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়। গল-ক্ষত রোগে তরল ঔষধাদি প্রয়োগের জন্যেও এ-যন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
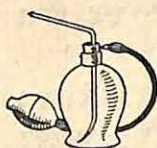
অ্যাটোমাইজার

নেফিলাইট (nephelite) — মেঘের মত ঘোলাটে সাদা পদার্থ ; যেমন, সোডিয়াম-অ্যালুমিনিয়াম-সিলিকেট যৌগিক, যা ইগ্নিয়াস ↑ প্রস্তরের মধ্যে পাওয়া যায়। **নেফ** (neph-) মানে 'মেঘ'। **নেফোগ্রাফ** (nephograph) — মেঘের আলোকচিত্র গ্রহণ-যোগ্য বিশেষ ক্যামেরা, যন্ত্র। **নেফোস্কোপ** (nephoscope) মানে আকাশে মেঘের গতি মাপতে যে যন্ত্র

ব্যবহৃত হয় ; এর সাহায্যে মেঘের গতিবেগ জেনে ঊর্ধ্বাকাশে বায়ু-প্রবাহের গতিও জানা যায়।

নেফ্রাইটিস (nephritis) — বৃক্ক, অর্থাৎ কিড্‌নির ↑ প্রদাহ-জনিত রোগ বিশেষ। 'নেফ্রোসিস' হলো কিড্‌নি ↑ সম্বন্ধীয় যে-কোন রোগ।

নেস্‌লার সল্যুসন (Nessler's solution) — পটাসিয়াম হাই-ড্রক্সাইডের ↑ জলীয় দ্রবের মধ্যে-মার্কারি-আয়োডাইড ও পটাসিয়াম আয়োডাইড দ্রবীভূত করে যে সল্যুসন, বা দ্রবণ তৈরী করা হয়। রাসায়নিক পরীক্ষায় অ্যামোনিয়ার অস্তিত্ব পরীক্ষার জন্যে এটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অ্যামোনিয়ার সঙ্গে এর রাসায়নিক ক্রিয়ায় বাদামী রং ফুটে ওঠে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা (প্রিসিপিটেট্ ↑) অধঃক্ষিপ্ত হয়।

নোড (node) — (পদার্থ-বিদ্যায়) যে-কোন তরঙ্গের পাদ-বিন্দু; তরঙ্গের শীর্ষ-বিন্দুকে বলা হয় 'এন্টিনোড' (চিত্র ↑)। (জ্যোতির্বিদ্যায়) কোন গ্রহ, বা নক্ষত্রের কক্ষ-পথ (অর্বিট ↑) যে বিন্দুতে ইক্লিপ্‌টিক্‌কে ↑ (অর্থাৎ যে কক্ষ-পথে সূর্য সম্বৎসরে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে বলে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়) ছেদ করে। (গণিতে) কোন বক্ররেখার দুই প্রান্তীয় অংশ যে বিন্দুতে পরস্পর ছেদ করে' একটি কোণ সৃষ্টি করে। (উদ্ভিদবিদ্যায়) বিশেষ বিশেষ উদ্ভিদ-কাণ্ডের গাঁট, বা সংযোগ-গ্রন্থি ; যেমন—ঘাস, বাঁশ প্রভৃতির যেখানে পাতা গজায়, বা প্রশাখা বেরোয়।
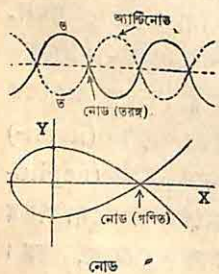
নোড

নোবেল, (Nobel) অ্যালফ্রেড — সুইডেনের রসায়ন-বিজ্ঞানী, স্টক-হোল্‌মে জন্ম 1833 খৃঃ, মৃত্যু 1896 খৃঃ। ডিনামাইট ↑ ও অন্যান্য বহুবিধ বিস্ফোরক পদার্থের আবিষ্কারক। যুদ্ধের গোলা-বারুদ তৈরী, খনি-খনন, পর্বত-বিদারণ প্রভৃতি কাজে বিস্ফো-রকের ব্যবহার প্রবর্তন ; প্রভূত অর্থোপার্জন। সঞ্চিত বিপুল অর্থ জগতের সাংস্কৃতিক কল্যাণে দান। (পরিশিষ্টে নোবেল পুরস্কার ↑)।

নোবল মেটাল (noble metal) — সোনা, রূপা ও প্ল্যাটিনাম ↑ ধাতু। জলে-বাতাসে এ-গুলোয় মরিচা ধরে না, অথবা সাধারণ কোন অ্যাসিডেও এ-গুলো দ্রবীভূত হয় না (অ্যাকোয় রিজিয়া ↑)। এজন্যে এ-সব ধাতুকে সম্ভ্রান্ত ধাতু, বা 'নোবল মেটাল' বলা হয়। অন্যান্য সব ধাতুকে সাধারণতঃ বলে 'বেজ্ মেটাল' (base metal), বা নিকৃষ্ট ধাতু।

নোভা (nova) — যে-সব নক্ষত্র হঠাৎ তীব্র আলোক ছড়িয়ে উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে, পরে সহসা আবার নিষ্প্রভ হয়ে পড়তে দেখা যায়। সম্ভবতঃ ওই সব নক্ষত্রের দেহপিণ্ড কোন কারণে সহসা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে ; যার ফলে প্রভূত শক্তির উদ্ভব হওয়ায়

সাময়িক এরূপ উজ্জ্বলতা প্রকাশ পায়। এরূপ অবস্থার পরে আবার নক্ষত্রটা পূর্বতন আয়তনে আসে ও নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। (সুপার নোভা ↑)

নোভোকেইন (novocaine) — কোকেনের ↑ সমক্রিয়া-বিশিষ্ট ঔষধ বিশেষ; যে ঔষধ সাধারণতঃ দাঁত তোলবার সময়ে দন্ত-মূলকে বেদনার অনুভূতিহীন অসাড় করতে ইন্‌জেক্‌সন করে প্রয়োগ করা হয়।

প

পজিট্রন (positron) — ধন-তড়িৎ বিশিষ্ট একটি বিশেষ মৌলিক কণিকা; এর ভর ও তড়িৎ-বিভবের পরিমাণ ঋণ-তড়িতাহিত ইলেক্‌ট্রন ↑ কণিকার সমান, কিন্তু বিপরীত-ধর্মী। এই পজিট্রন কণিকা অতি স্বল্পক্ষণস্থায়ী; এক সেকেণ্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ সময় এর স্থিতিকাল লক্ষিত হয়েছে। কস্‌মিক ↑ রশ্মির পর্যবেক্ষণের ফলে এর অস্তিত্ব সর্বপ্রথম ধরা পড়ে। বিভিন্ন কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় (রেডিও-অ্যাক্‌টিভ ↑) পদার্থ থেকে অন্যতম মূল শক্তি-কণা হিসেবে পজিট্রন কণিকা নির্গত হয়ে থাকে এবং বিশেষ সূক্ষ্ম যান্ত্রিক কৌশলে এর অস্তিত্ব লক্ষিত হয়। (অ্যান্টিম্যাটার ↑)

পটাস (potash) — প্রধানতঃ পটাসিয়াম কার্বনেট সল্ট, K_2CO_3 বুঝায়। আবার পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইডকেও পটাস বলা হয়; যেমন, কস্টিক পটাস, KOH; সাধারণভাবে অবশ্য সব রকম পটাসিয়াম সল্টকেই ↑ সচরাচর পটাস বলা হয়ে থাকে।

পটাসিয়াম (potassium)—মৌলিক ধাতব পদার্থ। এর ল্যাটিন নাম 'ক্যালিয়াম' থেকে এর সাংকেতিক চিহ্ন K হয়েছে। পারমাণবিক ওজন 39.096, পারমাণবিক সংখ্যা 19; সাদা, নরম ও বিশেষ রাসায়নিক শক্তিসম্পন্ন ধাতু; অনেকাংশে সোডিয়াম ধাতুর অনুরূপ। কার্ণেলাইট ↑ প্রভৃতি বিভিন্ন খনিজ থেকে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এর বিভিন্ন সল্ট জমির উর্বরা-শক্তি বৃদ্ধি করতে সাররূপে ব্যবহৃত হয়। জীবজগতের পক্ষে অত্যাবশ্যক মৌল; সব রকম জীবদেহেই অল্পাধিক পরিমাণে পটাসিয়াম থাকে।

পটাসিয়াম ব্রোমাইড (potassium bromide) — পটাসিয়াম ও ব্রোমিনের ↑ রাসায়নিক মিলনের ফলে উৎপন্ন সল্ট, KBr; সাদা স্ফটিকাকার কঠিন পদার্থ। একে 'পটাস ব্রোমাইড'-ও বলা হয়। কোন কোন রোগে ঔষধ হিসেবে এবং ফটোগ্রাফির ↑ কাজে পদার্থটা যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

পটাসিয়াম ডাইক্রোমেট (potassium dichromate) —পটাসিয়াম ও ক্রোমিক ↑ অ্যাসিডের রাসায়নিক মিলনে গঠিত একটি যৌগিক পদার্থ $K_2Cr_2O_7$; একে **পটাস বাইক্রোমেট**-ও বলা হয়। লাল স্ফটিকাকার পদার্থ, জলে বিশেষ দ্রবণীয়। ক্রোম-আয়রণ ↑ নামক খনিজের সঙ্গে পটাসিয়ামের রাসায়নিক ক্রিয়ার সাহায্যে যৌগিকটা সহজে উৎপন্ন হয়। এটি

একটি উৎকৃষ্ট জারক পদার্থ ; বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়ায় অক্সিজেন সরবরাহ করে (অক্সিডাইজিং এজেণ্ট ↑); রঞ্জন-শিল্পে পদার্থটা যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়।

পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট (potassium permanganate)—সাধারণ কথায় বলে পটাস পারম্যাঙ্গানেট, $KMnO_4$; গাঢ় লাল, স্ফটিকাকার পদার্থ, জলে দ্রবণীয়। এর লাল জলীয় দ্রবণ রসায়নাগারে অক্সিডাইজিং এজেণ্ট ↑ হিসেবে অনেক সময় ব্যবহৃত হয়। জীবাণু-নাশক ও জীবাণু-প্রতিরোধক পদার্থ হিসেবেও এর যথেষ্ট ব্যবহার আছে।

পন্‌স ভেরোলাই (pons varolii) — পন্‌স (pons) মানে সেতু, বা সংযোজক। মানুষের গুরু-মস্তিষ্কের (সেরিব্রাম, cerebrum ↑) নিম্নকাণ্ডীয় ভাগ বেষ্টন করে লঘু-মস্তিষ্কের (সেরিবেলাম) স্নায়ু-রজ্জুগুলি জড়িয়ে থেকে যেখানে সমগ্র মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে মানুষের বিভিন্ন মস্তিষ্ক-স্নায়ুর সংযোগ সাধিত হয়েছে।

পন্‌স ভেরোলাই

পলি- (poly-) — 'বহুসংখ্যক' অর্থে কথার পূর্বে ব্যবহৃত হয়ে থাকে ; যেমন — পলিগন, পলিবেসিক ↑, পলিমার ↑ ইত্যাদি।

পলিগন (polygon) — বহু কোণ (কাজেই বহু বাহু) - বিশিষ্ট সরল রৈখিক ক্ষেত্র। সাধারণতঃ চতুষ্কোণের বেশি হলেই সব সরল-রৈখিক ক্ষেত্রকে পলিগন বলা যায়। তবে পাঁচ কোণ-বিশিষ্ট হলে **পেণ্টাগন,** ছয় কোণ—**হেক্সাগন,** সাত কোণ—**হেপ্টাগন,** দশ কোণ—**ডেকাগন** প্রভৃতি বিশেষ নামও ব্যবহৃত হয়। **'গন'** (gon) মানে কোণ, বা অ্যাঙ্গেল ↑।

পলিথিন (polythene) — ইথিলিন হাইড্রোকার্বন ↑ (C_2H_6) থেকে উৎপাদিত নাইলন ↑ জাতীয় প্ল্যাষ্টিক ↑ পদার্থ। এই শ্রেণীর পলিমার ↑ পদার্থের বৈশিষ্ট্য হলো এটা নমনীয়, অভঙ্গুর ও জলে অদ্রাব্য ; এতে জলীয় বাষ্পও শোষিত হয় না। বিশেষতঃ বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদিতে ব্যবহৃত হয়। জলের বালতি, পাইপ প্রভৃতি বহু জিনিস ইদানীং এই জাতীয় প্লাষ্টিক দিয়ে তৈরী হয়ে থাকে।

পলিমর্ফিক (polymorphic) — যে সব পদার্থের গঠনে বিভিন্ন স্ফটিকাকার রূপ একই সঙ্গে থাকে ; যেমন, টিটানিয়াম অক্সাইড একটি প. ক. যৌগ ; যেহেতু এর গঠনে তিন রকম বিভিন্ন আকারের ক্রিস্ট্যাল ↑ লক্ষিত হয়ে থাকে।

পলিমর্ফ স (polymorphs) — রক্তে সাধারণ আকারের শ্বেত-কণিকাগুলো রক্ত-কোষের লোহিত-কণিকাগুলোর সঙ্গে যে-ভাবে অঙ্গাঙ্গী মিশে থাকে তাদের বলে পলিমর্ফ। ক্ষতাদির ভিতর দিয়ে রক্তে সংক্রামিত রোগ-

জীবাণুদের (ব্যাক্টেরিয়া ↑) ধ্বংস করে' রক্তের শ্বেত-কণিকার এই পলিমর্ফ কণিকাগুলোই জীব-দেহে রোগ সংক্রমণে বাধা দেয়।

পলিমারিজেশন (polymerization) — যে প্রক্রিয়ার ফলে কোন পদার্থের একাধিক অণুর রাসায়নিক সংযোগের ফলে বৃহত্তর একক অণুবিশিষ্ট অন্য কোন নূতন পদার্থের সৃষ্টি হয়। এতে উৎপন্ন পদার্থটার আণবিক ওজন প্রাথমিক অণুর সংখ্যানুপাতে বেড়ে যায়, কিন্তু মূল রাসায়নিক গঠন একই থাকে। অ্যাসিট্যাল্ডিহাইড ($CH_3.CHO$) অণু পলিমারিজেশন প্রক্রিয়ার ফলে প্যারাল্ডিহাইড $(CH_3CHO)_3$ অণুতে পরিণত হয় ; অ্যাসিট্যাল্ডিহাইডের তিনটা অণু একসঙ্গে মিলে গিয়ে প্যারাল্ডিহাইড অণু গঠিত হয়ে থাকে। প্রাথমিক পদার্থ অ্যাসিট্যাল্ডিহাইডকে এজন্যে বলা হয় **মনোমার** (monomer) পদার্থ এবং প্যারাল্ডিহাইড হলো **পলিমার** (polymer) পদার্থ। আরও নানা রকম ভাবে পলিমারিজেশন হতে পারে। একই হাইড্রোকার্বন ↑ অণু পরস্পর শৃঙ্খলিত হয়েও পলিমার সৃষ্টি হতে পারে ; যেমন, ইথিলিন ↑ ($CH_2.CH_2$) পলিমারিজেশনের ফলে স্বাভাবিক রাবারের উপাদান আইসোপ্রিন ↑ সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন প্ল্যাষ্টিক জাতীয় পদার্থ, কৃত্রিম সূতা (নাইলন ↑ , রেয়ন ↑ প্রভৃতি) এরূপ বিভিন্ন শ্রেণীর পলিমার পদার্থে গঠিত, কৃত্রিম উপায়ে তৈরী। আবার অনেক স্বাভাবিক পদার্থও বিভিন্ন পলিমার অণুতে গঠিত থাকতে পারে। কৃত্রিম উপায়ে উৎপন্ন প্ল্যাষ্টিক জাতীয় বিভিন্ন পদার্থ নানা রকম জটিল পলিমারিজেশন প্রক্রিয়ার ফলেই গঠিত হয়ে থাকে।

পলিমার (polymer) — পলিমারি-জেশনের ফলে উৎপন্ন পদার্থ (পলি-মারিজেশন ↑)। কোন মনোমার ↑ পদার্থের বহু সংখ্যক অণুর পারস্পরিক সংযোগে যে পলিমার পদার্থ গঠিত হয় তাকে বলা হয় 'হাই-পলিমার'।

পলিবেসিক (polybasic) — যে অ্যাসিডের গঠনে ধাতুর বিক্রিয়ায় অপসারণ-যোগ্য দুই, বা ততোধিক হাইড্রোজেন-পরমাণু থাকে ; যেমন— ফস্‌ফোরিক অ্যাসিড, H_3PO_4 (ট্রাই-বেসিক) ; সোডিয়ামের সঙ্গে বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে এর তিন রকম সল্ট গঠিত হতে পারে ; যেমন —নর্ম্যাল ↑ (পূর্ণশমিত) সোডিয়াম ফস্‌ফেট Na_3PO_4 ; সোডিয়াম হাইড্রোজেন-ফস্‌ফেট, Na_2HPO_4, এবং সোডিয়াম ডাইহাইড্রোজেন ফস্‌ফেট, NaH_2PO_4, (অ্যাসিড সল্ট ↑)।

পাই (pi)—(1) যে কোন জ্যামিতিক বৃত্তের (সার্কল্ ↑) পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত - বোধক স্থির রাশি ; যা সংক্ষেপে π চিহ্ন দ্বারা প্রকাশিত হয় ; $=22/7$, বা 3·14159 ; (2) অধুনা অপ্রচলিত ভারতীয় এক রকম মুদ্রা বিশেষ ; $=\frac{1}{3}$ পয়সা (পুরাতন)।

পাইরিন (pyrene) — (1) একটা বিশেষ হাইড্রোকার্বন, $C_{16}H_{10}$;

হল্‌দে স্ফটিকাকার পদার্থ। আলকাতরা (কোল-টার ↑) থেকে পদার্থটা পাওয়া যায়। (2) কার্বন-টেট্রাক্লোরাইড, CCl_4, নামক তরল পদার্থকেও কখন কখন 'পাইরিন' বলা হয়; অগ্নি-নির্বাপনের জন্যে অনেক সময় ফায়ার-এক্‌ষ্টিঙ্গুইসার ↑ যন্ত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

পাইরাইট্‌স (pyrites) — এক শ্রেণীর ধাতব খনিজ পদার্থের সাধারণ নাম। সাধারণতঃ এগুলো বিভিন্ন ধাতুর সালফাইড যৌগিকরূপে থাকে; যেমন, আয়রন পাইরাইটস, FeS_2; কপার পাইরাইটস, $CuFeS_2$ (কপার ও আয়রনের সম্মিলিত সালফাইড আকরিক) ইত্যাদি।

পাইরিডিন (pyridine) — কোল-টার ↑ থেকে প্রাপ্ত একটা বিশেষ জৈব রাসায়নিক পদার্থ, C_5H_5N; বর্ণহীন দুর্গন্ধযুক্ত তরল পদার্থ। উৎকৃষ্ট দ্রাবক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ কখন-কখন ঔষধরূপেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দুর্গন্ধযুক্ত ও অপেয় করে কেবল মাত্র জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের জন্যে অনেক সময় অবিশুদ্ধ অ্যালকোহলের ↑ সঙ্গে পাইরিডিন মিশ্রিত করে 'মিথিলেটেড স্পিরিট' ↑ তৈরি করা হয়।

পাইরো-(pyro-)—আগুন, বা উত্তাপ অর্থে রাসায়নিক শব্দের পূর্বে ব্যবহৃত হয়; যেমন — পাইরোবোরিক অ্যাসিড (সাধারণ বোরিক ↑ অ্যাসিড উত্তপ্ত করে পাওয়া যায়)। উত্তাপের সাহায্যে রাসায়নিক পদার্থের বিয়োজন প্রক্রিয়াকে বলে **পাইরোলিসিস।** পাইরোমিটার ↑, পাইরোফোরিক অ্যালয় ↑ ইত্যাদি।

পাইরোক্ল্যাস্টিক রক (pyroclastic rock) — আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ থেকে লাভার ↑ সঙ্গে উৎক্ষিপ্ত প্রস্তরাদির খণ্ডিত অংশরাশি সঞ্চিত হয়ে যে পাহাড়ের সৃষ্টি হয়।

পাইরোগ্যালল (pyrogalal) — একে 'পাইরোগ্যালিক অ্যাসিড'ও বলে; গ্যালিক ↑ অ্যাসিডকে 200° সেন্টিগ্রেডে উত্তপ্ত করে পাওয়া যায়। সাদা স্ফটিকাকার কঠিন পদার্থ, জলে দ্রবণীয়। রাসায়নিক হিসেবে পদার্থটা হলো ট্রাই-হাইড্রক্সিবেঞ্জিন, $C_6H_3(OH)_3$। পদার্থটা মুক্ত অক্সিজেন গ্যাস সম্যক শোষণ করাতে এবং ফটোগ্রাফির কাজে ব্যবহৃত হয়।

পাইরোফোরিক অ্যালয় (pyrophoric alloy) — যে সব সংকর-ধাতু ঘষলে, বা ঠুক্‌লে সহসা অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বেরোয়। এই শ্রেণীর বিভিন্ন অ্যালয় ↑ দিয়েই সিগারেট-লাইটারের ফ্লিণ্ট ↑ তৈরি করা হয়। সাধারণতঃ জিনিসটা সিরিয়াম ↑, লৌহ প্রভৃতি ধাতব পদার্থের বিভিন্ন অনুপাতের সংমিশ্রণে গঠিত অত্যন্ত কঠিন এক রকম ধাতু-সংকর।

পাইরোমিটার (pyrometer) — অত্যধিক উষ্ণতা, বা তাপমাত্রা পরিমাপের উপযোগী যন্ত্র বিশেষ। সাধারণ থার্মোমিটারে ↑ উচ্চ তাপমাত্রা মাপা সম্ভব হয় না; কারণ, অত্যধিক তাপে যন্ত্রের কাঁচ-নলই গলে যায়।

এই পাইরোমিটার যন্ত্র উত্তপ্ত পদার্থের মধ্যে দেওয়া হয় না। অত্যুত্তপ্ত পদার্থ থেকে বিচ্ছুরিত তাপ-রশ্মির প্রভাবে বিভিন্ন ধাতব দণ্ডের সংযোগস্থলে যে তড়িৎশক্তি উৎপাদিত হয় (থার্মো-কার্পল ↑) গ্যাল্‌ভ্যানোমিটারের ↑ সাহায্যে তা মেপে উৎসের তাপমাত্রা নির্ধারণ করা সম্ভবপর হয়ে থাকে। এ-জন্যে একে **থার্মো-ইলেক্‌ট্রিক থার্মোমিটার**-ও বলা যেতে পারে। বিভিন্ন ব্যবস্থায় 'রেডিয়েশন পাইরোমিটার', 'অপ্টিক্যাল পাইরোমিটার' প্রভৃতি এই শ্রেণীর বিভিন্ন রকম উষ্ণতামান-যন্ত্র তৈরি হয়েছে।

পাইরোলুসাইট (pyrolusite) — ম্যাঙ্গানিজ ধাতুর একটি বিশেষ খনিজ পদার্থ। প্রাকৃতিক ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড, MnO_2; ক্ষুদ্র স্ফটিকাকার কৃষ্ণবর্ণ কঠিন পদার্থ। প্রধানতঃ এই খনিজ থেকেই ম্যাঙ্গানিজ ↑ ধাতুটা নিষ্কাশিত হয়ে থাকে।

পাইরেক্সিয়া (pyrexia) — দেহের তাপবৃদ্ধি; জ্বরের অবস্থা। **পাইরেটিক** মানে জ্বর সম্বন্ধীয়; যেমন—অ্যাস্পিরিন ↑ হলো একটা অ্যান্টি-পাইরেটিক ঔষধ।

পাইরেক্স গ্লাস (pyrex glass) — এক শ্রেণীর কাচের ব্যবহারিক নাম; যার মধ্যে সিলিকার ↑ ভাগই বেশি থাকে। বিশেষ বিশুদ্ধ, নিষ্ক্রিয় ও তাপসহ কাচ; রাসায়নিক পরীক্ষায় এ-জাতীয় কাচের যন্ত্রাদিই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। (গ্লাস ↑)

পাইল (pile)—অ্যাটমিক পাইল ↑।

পাইলট প্ল্যাণ্ট (pilot plant) — কোন শিল্প-সামগ্রী উৎপাদনের জন্যে গবেষণাগারে প্রথমে যে ক্ষুদ্রাকৃতি যন্ত্র তৈরি করা হয়; উৎপাদন-প্রচেষ্টা সফল হলে যার অনুকরণে বৃহদাকার যন্ত্র বসিয়ে তার শিল্প-প্রস্তুতির কল-কারখানা স্থাপিত হয়ে থাকে।

পাউণ্ড (pound) — পদার্থের ভর পরিমাপের ইংলণ্ডীয় একক; = 453·592 গ্রাম। বায়ুশূন্য আধারে রক্ষিত প্ল্যাটিনাম ধাতুর তৈরী একটা সিলিণ্ডারের বস্তু-পরিমাণকে (মাস্ ↑) এক পাউণ্ড ধরা হয়েছে। বস্তু-ভরের এই এককটিকে 'ইম্পিরিয়াল স্ট্যাণ্ডার্ড পাউণ্ড' বলা হয়; বৃটিশ মিউজিয়ামে এটা সংরক্ষিত আছে। পাউণ্ডে আবার মাধ্যাকর্ষণ শক্তির একক, অর্থাৎ পদার্থের ওজনও বুঝায়। উল্লিখিত এক পাউণ্ড ভর-বিশিষ্ট কোন বস্তুকে পৃথিবী যে শক্তিতে (গ্রাভিটেশন ↑) আকর্ষণ করে, অর্থাৎ বস্তুটার ওজনকেও বলে এক পাউণ্ড। এভাবে পাউণ্ড এককে সাধারণতঃ বস্তুর ভর (মাস্ ↑) ও ওজন (ওয়েট ↑) উভয়ই প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

পাউণ্ড্যাল (poundal)—ফুট-পাউণ্ড-সেকেণ্ডের (এফ্. পি. এস.) হিসেবে বল-শক্তির (ফোর্স ↑) একক বিশেষ। যে পরিমাণ শক্তির প্রভাবে এক পাউণ্ড ভর-বিশিষ্ট কোন বস্তুর গতি প্রতি সেকেণ্ডে এক ফুট হারে পরিবর্তিত হয়। এক পাউণ্ড্যাল বল-শক্তি এক পাউণ্ড ↑ ওজন, বা মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির প্রায় 32 ভাগের এক ভাগ।

পাওয়ার (power) — (1) যান্ত্রিক শক্তিতে সম্পাদিত কার্য, বা ওয়ার্কের ↑ হার; নির্দিষ্ট একক সময়ে কতটা ওয়ার্ক ↑ সম্পাদিত হয় তার পরিমাণ, (হর্স-পাওয়ার ↑)। (2) গুণিতকের সাংকেতিক (ইণ্ডেক্স) রাশি; যেমন, y^3 হলো y 'টু-দি-পাওয়ার' 3 = y × y × y.

পাওয়ার (power), (লেন্সের ↑) — কোন লেন্সের পাওয়ার হলো 1 ÷ (সাধারণতঃ মিটার ↑ এককে লেন্সের ফোক্যাল লেংথ ↑)। ফোক্যাল দৈর্ঘ্য 2 মিটার হলে সে-লেন্সের পাওয়ার হবে $\frac{1}{2}$ = 0·5 **ডাইঅপ্টার** (লেন্সের পাওয়ারের একক)। এই পাওয়ার কন্‌কেভ ↑ (অবতল) লেন্সে '−' মাইনাস, আর কনভেক্স ↑ (উত্তল) লেন্সে '+' প্লাস বলে চশমার লেন্সের পাওয়ার উল্লেখ করা হয়।

পাওয়ার অ্যালকোহল (power alcohol)—অবিশুদ্ধ ইথাইল অ্যালকোহল ↑, যা কল-কারখানার ইঞ্জিনে জ্বালানি হিসেবে অনেক সময় ব্যবহৃত হয়। ইঞ্জিনে 'পাওয়ার,' অর্থাৎ শক্তি উৎপাদন করে বলে এই নাম।

পামিটিক অ্যাসিড (palmitic acid)—একটা জৈব অ্যাসিড; চর্বি-জাতীয় বিশেষ এক প্রকার ফ্যাটি ↑ অ্যাসিড, $C_{15}H_{31}COOH$; মোমের মত নমনীয় কঠিন পদার্থ। বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ তৈল ও চর্বিজাতীয় পদার্থের মধ্যে 'ট্রাইপামিটিন' নামক যৌগিক পদার্থের আকারেই প্রধানতঃ এই অ্যাসিডটা পাওয়া যায়।

পার (par-)—'অতিরিক্ত' অর্থে রাসায়নিক শব্দের পূর্বে ব্যবহৃত হয়; যেমন, পারঅক্সাইড — স্বাভাবিক অপেক্ষা অতিরিক্ত অক্সিজেন-যুক্ত অক্সাইড যৌগিক। এরূপ পারম্যাঙ্গানেট ↑, পারক্লোরেট ইত্যাদি।

পারপ্লেক্স (p a r p l e x) — বিশেষ পলিমারিজেশন ↑ প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত মিথাইল-মিথাক্রোলাইট নামক এক প্রকার অতি স্বচ্ছ ও সুকঠিন প্ল্যাস্টিক পদার্থের ব্যবহারিক নাম। বুলেট-প্রুফ কৃত্রিম কাচ; বিশেষ এক প্রকার থার্মো-প্লাস্টিক ↑ পদার্থ। আজকাল অ্যারোপ্লেন ↑, মূল্যবান মোটর গাড়ী প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়। এই কৃত্রিম জৈব কাচ আমেরিকায় ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে সচরাচর **লুসাইট** ↑ নামে অভিহিত হয়ে থাকে।

পারফেক্ট গ্যাস (perfect gas) — বিভিন্ন গ্যাসের আয়তন, উষ্ণতা ও চাপের পারস্পরিক সম্বন্ধ কতকগুলো নিয়মে বাঁধা (চার্লস-ল ↑, বয়েলস্-ল ↑)। কিন্তু এ-সব নিয়ম কোন গ্যাসের ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণরূপে খাটে না। যে সব গ্যাস এই সকল গ্যাসীয় সূত্র, বা নিয়ম সম্পূর্ণরূপে মেনে চলে বলে-মনে করা হয়, তাদের বলা হয় পার ফেক্ট, অথবা **আইডিয়াল গ্যাস**। অবশ্য এ হিসাবে সর্বাংশে পারফেক্ট গ্যাস সচরাচর পাওয়া যায় না, কল্পনা করা হয় মাত্র।

পারম্যাঙ্গানেট (parmanganate) — পা র ম্যা ঙ্গা নি ক অ্যাসিডের ($HMnO_4$) বিভিন্ন সল্ট ↑; যেমন,

পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, $KMnO_4$, সোডিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, $NaMnO_4$, প্রভৃতি। উৎকৃষ্ট জীবাণুনাশক ও বীজবারক পদার্থ। পারম্যাঙ্গানেট সল্ট মাত্রেই রাসায়নিক ক্রিয়ায় অক্সিজেন সরবরাহ করে বলে এ-গুলো **অক্সিডাইজিং এজেন্ট** ↑ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পারম্যাঙ্গানেট বললে সাধারণতঃ পটাস পারম্যাঙ্গানেটই ($KMnO_4$) বুঝায়।

পার্গেটিভ (purgative) — কোষ্ট-পরিষ্কারক ঔষধ; যেমন — ক্যাষ্টর অয়েল, ম্যাগ্ সাল্ফ ↑ ইত্যাদি।

পার্ম অ্যালয় (perm alloy) — লোহা ও নিকেল ঘটিত এক শ্রেণীর সংকর-ধাতু; এ-গুলো উচ্চ চৌম্বক শক্তিসম্পন্ন হয়ে থাকে। বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদির বিভিন্ন অংশ এ-দিয়ে তৈরি হয়। এরূপ বৈদ্যুতিক যন্ত্রে পরিবর্তী (অল্টারনেটিং ↑) তড়িৎ-প্রবাহে চুম্বকীয় শক্তির অপচয় কম হয়।

পার্ল (pearl) — মুক্তা; শুক্তি, অর্থাৎ ঝিনুকের দেহ-নিঃসৃত এক প্রকার জৈব রস খোলার মধ্যে জমে কঠিন হয়ে এর সৃষ্টি হয়। উজ্জ্বল সাদা মূল্যবান পদার্থ; কিন্তু রাসায়নিক হিসেবে মূলতঃ জিনিসটা হলো ক্যালসিয়াম কার্বনেট, $CaCO_3$, অর্থাৎ এক রকম প্রস্তর মাত্র।

পার্ল অ্যাস (pearl ash) — পটাসিয়াম কার্বনেটের, (K_2CO_3) বিশেষ নাম; কাঠের ছাই থেকে এই পটাস সল্টটা পাওয়া যায় বলে এই নাম।

পার্ল স্পার (pearl spar) — একটা যুগ্ম কার্বনেট খনিজের বিশেষ নাম; ম্যাগ্নেসিয়াম ও ক্যালসিয়ামের স্বভাবজাত মিশ্র কার্বনেট, $MgCO_3$ $CaCO_3$; একে আবার ডলোমাইট-ও ↑ বলে। পৃথিবীর অধিকাংশ কঠিন প্রস্তর প্রধানতঃ এ দিয়ে গঠিত।

পার্লাইট (pearlite) — এক প্রকার ইস্পাত (স্টিল ↑); যা প্রায়-বিশুদ্ধ লৌহ (ফেরাইট, ferrite ↑) ও আয়রন-কার্বাইডের ↑ সূক্ষ্ম কণিকার অঙ্গাঙ্গী সংমিশ্রণে গঠিত।

পাস্তর (Pasteur), লুই — ফরাসী রসায়ন-বিজ্ঞানী; জন্ম 1822 খৃঃ, মৃত্যু 1895 খৃঃ। জীবাণু-বিজ্ঞানের গবেষণায় অসাধারণ কৃতিত্ব। 1857 খৃস্টাব্দে অ্যালকোহল ↑ ও দুধের গাঁজন-ক্রিয়ার ব্যাখ্যা প্রচার করে বায়ু-বাহিত অদৃশ্য জীবাণুর প্রভাব বিশ্লেষণ। সংক্রামক ব্যাধির জীবাণু-ঘটিত কারণ নিরূপণ; অদৃশ্য সব রোগ-জীবাণুর কার্যকারিতা প্রমাণ ও প্রতিকার ব্যবস্থায় 'টিকা' প্রবর্তন। পরবর্তীকালে প্রাণী-দেহের ক্ষতচিকিৎসায় লিষ্টারের ↑ জীবাণু-প্রতিরোধক (অ্যান্টিসেপ্টিক ↑) ঔষধ আবিষ্কারের ভিত্তি স্থাপন। দুশ্চিকিৎস অ্যান্থ্রাক্স ↑, হাইড্রোফোবিয়া ↑ প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধক টিকা আবিষ্কার। দুধের বিশেষ পাস্তরিজেশন ↑ প্রক্রিয়া উদ্ভাবন। জীবাণু-তত্ত্বের আবিষ্কারে আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানে যুগান্তকারী ব্যবস্থাদির প্রবর্তক।

পাস্তরিজেশন (pasteurisation) — কোন তরল পদার্থ (বিশেষতঃ দুধ)

উপযুক্ত উত্তাপে কিছুক্ষণ ফুটিয়ে তার ভিতরের জীবাণু ধ্বংস করে ফেলবার প্রক্রিয়া। দুধ সাধারণতঃ 65° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উত্তাপে 30 মিনিট কাল ফুটিয়ে ধীরে-ধীরে ঠাণ্ডা করলে তা সব রকম দূষিত জীবাণুমুক্ত, অর্থাৎ 'পাস্তরাইজড' হয়ে সহজে আর পচে না। বিভিন্ন জিনিস এভাবে জীবাণু মুক্ত করা যেতে পারে। পাস্তর ↑ কর্তৃক উদ্ভাবিত বলে পদ্ধতিটি 'পাস্তরিজেশন' নামে পরিচিত।

পুলি (pulley) — যন্ত্রবিশেষ, যাতে একটি ঘূর্ণ্যমান চক্রের উপরিস্থিত লম্বা দড়ি টেনে ভারী বস্তু সহজে উপরে তোলা যায়; দড়িগাছার এক প্রান্তে ভারী জিনিস বেঁধে অপর প্রান্ত ধরে টানলে চক্রটির (পুলির) ঘূর্ণনের ফলে অল্প বল প্রয়োগে অধিক ভারী জিনিস উপরে উঠে যায়। এতে যথেষ্ট যান্ত্রিক সুবিধা (mechanical advantage) লাভ করা সম্ভব হয়ে থাকে।

পুলি

প্যাকিডার্ম (pachyderm) — মোটা ও শক্ত চামড়া-বিশিষ্ট প্রাণিগোষ্ঠি; যেমন—হাতি, গণ্ডার প্রভৃতি। প্যাকি-(pachy-) মানে মোটা, পুরু।

প্যাপিন (papain) — কাঁচা পেঁপের দুগ্ধবৎ সাদা রস। প্রোটিন ↑ জাতীয় খাদ্যবস্তু জীর্ণ করবার এর এক অসাধারণ রাসায়নিক ক্ষমতা আছে; একটি উদ্ভিজ্জ অ্যাল্‌কালয়েড ↑। এর বিশুদ্ধ চূর্ণ যকৃৎ, বা লিভারের কার্যকারিতা-বৃদ্ধিকর ঔষধাদিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

প্যান্‌ক্রিয়াস (pancreas) — পাকস্থলীর নিম্নস্থ নলপথের পশ্চাদ্ভাগে সংলগ্ন পত্রাকার একটি প্রত্যঙ্গ; পাকস্থলীর নির্গমমুখের প্রায় তিন ইঞ্চি নিচে এই প্যা. স. থেকে বিভিন্ন জারক-রস ভুক্ত খাদ্যের সঙ্গে মিশে ক্ষুদ্রান্ত্রে (স্মল ইণ্টেস্টাইন ↑) যায়। চার রকম বিভিন্ন জারক-রস এ থেকে নিঃসৃত হয়ে থাকে, যাদের একটা হলো ইন্‌সুলিন ↑, নামক হর্মোন ↑; প্রধানতঃ যার অভাবে বহুমূত্র, অর্থাৎ 'ডায়েবিটিস' ↑ রোগ দেখা দেয়।
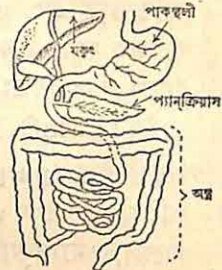
প্যান্‌ক্রিয়াস

প্যান্‌ক্রোমেটিক ফিল্ম (panchromatic film) — ফটোগ্রাফির সাধারণ ফিল্মে লাল বর্ণ, বা আলোকরশ্মি ধরা পড়ে না; কিন্তু বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে প্যান্‌ক্রোমেটিক ফিল্মের উপরে লাল বর্ণ সমেত সকল বর্ণের তারতম্যই যথাযথভাবে সাদা-কালোতে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। এর ফলে অর্থোক্রোমেটিক ↑ ফিল্মের চেয়েও এতে বিভিন্ন বর্ণানুপাতিক ঔজ্জ্বল্যবিশিষ্ট স্পষ্টতর আলোক-চিত্র পাওয়া যায়।

প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডস (parathyroid glands) — থাইরয়েড ↑

গ্ল্যাণ্ডের পাশে ও পশ্চাতে অবস্থিত ছোট-ছোট চারটি গ্ল্যাণ্ড ↑, বা গ্রন্থি। এগুলি থেকে নিঃসৃত হর্মোন ↑ রস আমাদের দেহে ক্যালসিয়াম ↑ এবং ফস্‌ফরাসের ↑ ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। এই অন্তঃস্রাবী (অ্যাণ্ডোক্রাইন ↑) গ্রন্থিগুলির অত্যধিক সক্রিয়তায় হাড়ে ক্যাল্‌সিয়াম উপাদান কমে গিয়ে হাড় দুর্বল হয়ে পড়ে; পক্ষান্তরে, রক্তে ক্যালসিয়ামের ভাগ বাড়ে ও ফস্‌ফরাসের ভাগ কমে যায়। এর ফলে স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে।

প্যারাফর্ম (paraform) — প্যারা-ফর্ম্যাল্ডিহাইড নামক জৈব রাসায়নিক পদার্থের বিশেষ নাম; ফর্ম্যাল্ডি-হাইডের একটি পলিমার ↑ যৌগিক। জিনিসটা উত্তপ্ত করলে সহজেই ফর্ম্যাল্ডিহাইডে রূপান্তরিত হয়ে যায়। প্রচুর ধূম-উৎপাদক পদার্থ।

প্যারামোসিয়াম (paramoecium) — আদ্যপ্রাণী-গোষ্ঠীর অন্যতম ক্ষুদ্র জলচর প্রাণী বিশেষ; যাদের অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতিরেকেও লক্ষ্য করা যেতে পারে। এদের আকার-আকৃতি চিত্রে দ্রষ্টব্য।

প্যারামোসিয়াম

প্যারাফিন (paraffin) — মিথেন, ইথেন, প্রোপেন, বুটেন, পেন্টেন প্রভৃতি হাইড্রোকার্বনগুলোর সাধারণ নাম। এই শ্রেণীর সব হাইড্রো-কার্বনকেই প্যারাফিন হাইড্রো-কার্বন ↑ বলা হয়। এ-গুলো গ্যাসীয়, তরল, বা কঠিন সব অবস্থারই আছে; এদের যে-গুলোতে কার্বনের ভাগ কম সে-গুলো হয় গ্যাসীয়, (যেমন — মিথেন ↑, ইথেন ↑ প্রভৃতি গ্যাস); কার্বনের ভাগ বেড়ে হয় তরল প্যারাফিন, (যেমন পেন্টেন, হেক্সেন প্রভৃতি); আবার, কার্বনের ভাগ যে-গুলোতে আরও বেশি সে-গুলো কঠিন প্যারাফিন (ওয়াক্স), যা দিয়ে মোমবাতি, বিভিন্ন মলম, পালিশ প্রভৃতি তৈরি হয়ে থাকে।

প্যারাফিন অয়েল (paraffin oil) — বিভিন্ন তরল হাইড্রোকার্বনের সংমিশ্রণ; খনিজ পেট্রোলিয়াম ↑ থেকে ফ্রাক্সন্যাল ডিস্টিলেশন ↑ প্রক্রিয়ার সাহায্যে পাওয়া যায়। সাধারণ জ্বালানি তেল, বা কেরোসিন, মোবিল অয়েল, পেট্রল ↑ প্রভৃতি হলো বিভিন্ন শ্রেণীর প্যারাফিন অয়েল। এর কোন কোনটা দিয়ে বাতি জ্বালানো হয়; কোনগুলো আবার ইঞ্জিন, মোটর প্রভৃতির অন্তর্দাহী জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

প্যারাল্ডিহাইড (paraldehyde) — অ্যাসিট্যাল্ডিহাইড ↑ নামক জৈব যৌগের পলিম্যারিজেশন ↑ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন পদার্থ, $(CH_3CHO)_3$; জীবদেহ অনুভূতি-শূন্য ও তন্দ্রাচ্ছন্ন করবার জন্যে এই তরল পদার্থ কখন-কখন ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

প্যারালালোপিপেড
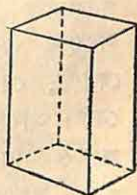
প্যারালালোপিপেড (parallelopiped) —

পরস্পর-মুখী সমান্তরাল ছয়টি তল-বিশিষ্ট লম্বাটে আকারের কঠিন কোন বস্তু, অথবা ঐরূপ জ্যামিতিক আকারের কোন সরলরৈখিক ক্ষেত্র। চিত্রে প্রদর্শিত আকার।

প্যারালিসিস (paralysis) — পক্ষাঘাত রোগ ; মস্তিষ্ক, বা স্নায়ুতন্ত্রের বিকলতায় আংশিক, বা সামগ্রিকভাবে দেহের মাংস-পেশীর অসাড়তা ও সঞ্চালনের অক্ষমতা-জনিত ব্যাধি। একেবারে অসাড় না হয়ে মাংসপেশী দুর্বল ও স্বল্প সঞ্চালনক্ষম হলে সে অবস্থাকে বলে **প্যারিসিস** (paresis)।

প্যারাল্যাক্স (parallax) — কোন দূরবর্তী বস্তুকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্য করলে তার অবস্থান তুলনামূলকভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায় বলে ভ্রম হয়। এভাবে দর্শকের গতি, বা স্থান পরিবর্তনের ফলে দৃষ্ট বস্তুরও অবস্থান বদলে যায় বলে দূর থেকে মনে হয়। এই দৃষ্টি-ভ্রমকেই বলে প্যারাল্যাক্স। পৃথিবীর দৈনিক গতি-জনিত প্যারাল্যাক্সের ফলে দূরবর্তী গ্রহ-নক্ষত্রের দৃষ্ট অবস্থান ও প্রকৃত অবস্থান এক থাকে না ; যেখানে দেখছি, সেখানে ওটা প্রকৃতপক্ষে নেই। আবার পৃথিবীর বার্ষিক গতির ফলেও আর এক রকম প্যারাল্যাক্স হয়। মহাকাশে গ্রহ-নক্ষত্রাদি পর্যবেক্ষণের গাণিতিক হিসাবে এরূপ প্যারাল্যাক্স - জনিত ভ্রম সংশোধন

প্যারাল্যাক্স

করে নেওয়া সর্ব ক্ষেত্রেই আবশ্যক হয়ে থাকে (অ্যাবারেসন ↑)।

প্যারাসাইট (parasite) — পরগাছা ও পরজীবী প্রাণী ; যে সব প্রাণী, বা উদ্ভিদ অপর কোন জীব, বা উদ্ভিদকে আশ্রয় করে ও তাদের দেহ-রস শোষণ করে বেঁচে থাকে ; যেমন — অন্ত্রের কৃমি-কীট, মাথার উকুন প্রভৃতি। আবার, অর্কিড ↑ প্রভৃতি এরূপ নানা রকম পরগাছা শ্রেণীর উদ্ভিদও আছে।

প্যারাসাইট অর্কিড

প্যারোটিড গ্ল্যাণ্ড (parotid gland) — মুখের নিম্ন-চোয়ালের প্রান্তে, কর্ণমূলের কাছে অবস্থিত একটি বিশেষ গ্ল্যাণ্ড ↑। এর কাজ হলো মুখে লালা (স্যালিভা ↑) রস নিঃসরণ করা। বিভিন্ন স্যালিভারি গ্ল্যাণ্ডের (salivary glands) অন্যতম এই গ্ল্যাণ্ডের স্ফীতি ও প্রদাহের লক্ষণ প্রকাশ পেয়ে 'মাম্‌স্', বা 'গলফাঁস' নামক ভাইরাস ↑ -ঘটিত এক প্রকার রোগ হয়ে থাকে।
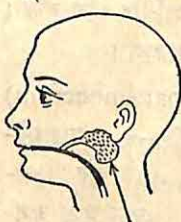
প্যারোটিড গ্ল্যাণ্ড

প্যারিস গ্রিন (Paris green) — রাসায়নিক পদার্থ ; কপার আর্সেনাইট এবং কপার অ্যাসিটেটের যুগ্ম যৌগিক সল্ট $Cu(CH_3COO)_2.3\ Cu(AsO_2)_2$; একে আবার 'সুইন্‌ফার্ট গ্রিন'-ও বলা হয়। সাধা-

রণতঃ কীটপতঙ্গ-নাশক পদার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

প্যালাডিয়াম (palladium) — মৌলিক ধাতব পদার্থ। সাংকেতিক চিহ্ন Pd. পারমাণবিক ওজন 166·7, পারমাণবিক সংখ্যা 46 ; রূপোর মত সাদা ধাতু ; প্ল্যাটিনামের প্রায় অনুরূপ। কোন - কোন খনিজ পদার্থে প্ল্যাটিনামের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়ায় ক্যাটালিস্ট ↑ হিসেবে এবং বিশেষ-বিশেষ সংকর - ধাতু তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। হাইড্রোজেন গ্যাস শোষণ করবার ক্ষমতা এর অতি প্রবল।

প্যালিওণ্টোলজি (palaeontology) — প্রাচীন কালের বিভিন্ন প্রাণীর জীবাশ্ম (ফসিল ↑) প্রভৃতির গবেষণার ফলে পৃথিবীতে জীবের উদ্ভব ও বংশধারা নির্ধারণ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। এরূপ **প্যালিওবোটানি** হলো প্রাচীন কালের শিলীভূত উদ্ভিদাদির পর্যালোচনার দ্বারা পৃথিবীতে উদ্ভিদের ক্রমবিকাশের ধারা সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। **প্যালিও** (paleao-) মানে প্রাচীন, বা প্রাগৈতিহাসিক।

প্যালিওজোইক (palaeozoic) — প্রায় 50 কোটি বছরের অতীত যুগ, যখন পৃথিবীতে আদি জীব-সত্তার উদ্ভব হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। **প্যালিওসিন** যুগ হলো যখন থেকে বর্তমান কালের উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছে বলে' ধরা হয় ; প্রায় 5 কোটি বছর পূর্বের যুগ।

প্যালুড্রিন (paludrin)—ম্যালেরিয়া জ্বরের জীবাণুনাশক ঔষধবিশেষের ব্যবসায়িক নাম।

প্যালিসেড লেয়ার (palisade layer) — উদ্ভিদ-পত্রের উপরিস্থিত বহিস্ত্বকের (এপিডার্মিস, epidermis ↑) নিম্নবর্তী লম্বাকার কোষ-কলার স্তর (layer); এই কোষসমূহের মধ্যেই উদ্ভিদের সবুজ-কণা (ক্লোরোফিল, chlorophyll ↑) থাকে।
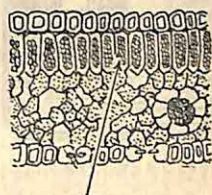
প্যালিসেড লেয়ার

প্যাস্ক্যাল (Pascal), ব্লেসি — ফরাসী ধর্মযাজক ও দার্শনিক ; জন্ম 1623 খৃঃ, মৃত্যু 1662 খৃঃ। পদার্থবিদ্যা ও গণিতে অসামান্য কৃতিত্ব ; ধর্মযাজকের কার্যাবকাশে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও গণিত চর্চা। বায়ুর ওজন ও তরল পদার্থের স্থিতি-শক্তির সূত্র নির্ধারণ। 'হাইড্রলিক প্রেস' ↑ যন্ত্র উদ্ভাবন। গণিতের 'কনিক সেক্সন' ও 'ইন্‌ফিনিটিসিম্যাল ক্যালকুলাস' প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ন এবং 'সম্ভাবনা বাদ' (থিয়োরি অব প্রোবেবিলিটি) প্রবর্তনের জন্য চিরস্মরণীয়।

প্যাস্ক্যাল্‌স-ল (Pascal's law)— জলের (বা, যে-কোন তরল পদার্থের) চাপ সম্বন্ধে বিজ্ঞানী প্যাস্ক্যাল ↑ কর্তৃক প্রবর্তিত সূত্র। কোন আবদ্ধ পাত্রস্থ তরলের কোন অংশে চাপ দিলে

সেই চাপ সমভাবে সব দিকে পরিবাহিত হয়। তরলের এক জায়গায় চাপ প্রয়োগ করলে তার সর্বত্র সেই চাপ গিয়ে সমভাবে পৌছায়। তরলের এই বৈশিষ্ট্যের ফলে এক বর্গ ইঞ্চিতে 2 পাউণ্ড চাপ প্রয়োগ করলে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে 2 পাউণ্ড হিসেবে 100 বর্গ ইঞ্চিতে মোট 200 পাউণ্ড পরিমাণ বর্ধিত চাপ পড়বে। প্যাস্‌ক্যালের এই সূত্রের ব্যবহারিক প্রয়োগে 'হাইড্রলিক প্রেস' ↑ যন্ত্র তৈরি হয়েছে।
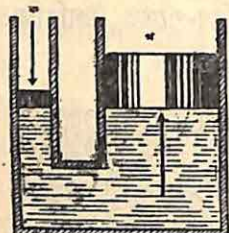
হাইড্রলিক প্রেসারের পরীক্ষা

প্যাসিভ আয়রন (passive iron) — যে লোহার উপরিভাগে আয়রন-অক্সাইডের ↑ (মরিচার) একটা পাত্‌লা আবরণ ধরিয়ে তাকে বিভিন্ন অ্যাসিডের রাসায়নিক প্রভাব থেকে রক্ষা করা যেতে পারে। তীব্র নাইট্রিক ↑ অ্যাসিডে অল্পক্ষণ ডুবিয়ে, অথবা কোন অক্সিডাইজিং ↑ পদার্থের সাহায্যে অক্সাইডের আবরণ দিয়ে লোহাকে 'প্যাসিভ' (নিষ্ক্রিয়) করা যায়। ক্রোমিয়াম, নিকেল, টিন প্রভৃতি ধাতুও এভাবে 'প্যাসিভ' করা যেতে পারে। এরূপ সব ধাতুকে বলে 'প্যাসিভ মেটাল'। সাধারণতঃ কোন অ্যাসিডের সঙ্গে সহজে এদের রাসায়নিক সংযোগ, বা বিক্রিয়া ঘটে না।

পিউমিস (pumice) — স্পঞ্জের মত বিশেষ সছিদ্র এক প্রকার হাল্‌কা পাথর; আগ্নেয়গিরি থেকে উৎক্ষিপ্ত গলিত লাভা ↑ প্রস্তরীভূত হয়ে অনেক স্থানে এরূপ হালকা পাথরের সৃষ্টি হয়ে থাকে, যাকে বলে 'পিউমিস স্টোন।'

পিক্রিক অ্যাসিড (picric acid) — চক্‌চকে হলদে স্ফটিকাকার কঠিন পদার্থ, $C_6H_2(NO_2)_3OH$; রাসায়নিক গঠনের হিসেবে একে ট্রাই-নাইট্রো-ফিনল ↑ বলা যেতে পারে। এটা বিষাক্ত ও বিস্ফোরক পদার্থ। এর জলীয় দ্রব পোড়া-ঘায়ে ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কোন-কোন রঞ্জক পদার্থে ও বিস্ফোরক হিসেবে এর প্রচুর ব্যবহার আছে।

পিগ্‌ আয়রন (pig iron) — অবিশুদ্ধ লৌহ; লোহার বিভিন্ন খনিজ পদার্থ থেকে ব্লাস্ট ফার্নেস ↑ প্রক্রিয়ার সাহায্যে যে লৌহ নিষ্কাশিত হয়। এই শ্রেণীর অবিশুদ্ধ লোহা দিয়েই রেলিং, কড়াই প্রভৃতি ঢালাইয়ের কাজ করা হয়; এ-জন্যে একে সাধারণতঃ ঢালাই-লোহা, বা 'কাস্ট আয়রন' বলে।

পিগ্‌মেণ্ট (pigment) — যে সব রঞ্জক পদার্থ তেল, বা কোন আঠালো পদার্থে মিশিয়ে বিভিন্ন জিনিসের উপরিভাগে আস্তরণের মত রং ধরানো হয়। বিভিন্ন রঞ্জক পদার্থ (ডাই ↑) ও পিগ্‌মেণ্ট রঙের মধ্যে পার্থক্য এই যে, ডাই-শ্রেণীর রঞ্জক পদার্থ সাধারণতঃ জলে দ্রবণীয় হয়; আর সেই দ্রব জিনিসের তন্তু, বা আঁসের মধ্যে ঢুকে যায়। কিন্তু পিগ্‌মেণ্ট জলে দ্রবণীয় নয়, এর সূক্ষ্ম

কণিকাগুলো জিনিসের উপরিভাগে লেগে থাকে মাত্র; প্রয়োজন হলে তাকে ঘসে উঠিয়ে ফেলা যায়।

পিচব্লেণ্ড (pitch blende) — প্রধানতঃ এটা ইউরেনিয়াম ↑ অক্সাইডের (U_3O_8) আকরিক একটা খনিজ পদার্থ। এর মধ্যে আবার সামান্য পরিমাণে রেডিয়াম ↑-ও থাকে। এই পিচব্লেণ্ড আকরিক থেকেই মাদাম কুরি ↑ রেডিয়াম নামক তেজস্ক্রিয় ধাতুটি আবিষ্কার করেন। পূর্ব আফ্রিকা, বোহিমিয়া প্রভৃতি স্থানে পিচব্লেণ্ড প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ড (pituitary gland) — মানুষের গুরু-মস্তিষ্কের নিম্নভাগে মটর দানার মত যে অন্তঃস্রাবী গ্ল্যাণ্ড, বা গ্রন্থিটি সন্নিবিষ্ট আছে। দেহের সব অন্তঃস্রাবী (এণ্ডোক্রাইন ↑) গ্ল্যাণ্ডের কার্যকারিতার উপরে এর বিশেষ একটা নিয়ন্ত্রণ-প্রভাব আছে। এই গ্রন্থিটি থেকে ছয় রকম বিভিন্ন হর্মোন ↑ নিঃসৃত হয় বলে জানা গেছে; দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি, যৌন শক্তি, উদ্যম প্রভৃতির নিয়ন্ত্রণে এই গ্ল্যাণ্ডটির কার্যকারিতা মানবদেহের পক্ষে অপরিহার্য ও অত্যাবশ্যক। এর স্বাভাবিকতার অভাবে দেহের বৃদ্ধি ও যৌন শক্তি বিলম্বিত ও ব্যাহত হয়; আবার এই গ্ল্যাণ্ডের অতি-সক্রিয়তায় অল্প বয়সেই যৌনবোধ প্রবল হয়, এবং সব ইন্দ্রিয়ই অত্যধিক সক্রিয় হয়ে অকালে বার্দ্ধক্য আসে।

পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ড

পিটুইট্রিন (pituitrin) — পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ড ↑ থেকে নিঃসৃত অন্যতম হর্মোন ↑, বা উত্তেজক রস; এর প্রভাবে সন্তান প্রসবের সময়ে প্রসূতির গর্ভাধার (ইউটেরাস ↑) সঙ্কুচিত হয়ে সুপ্রসবে সাহায্য করে। মানবদেহের উপরে এই হর্মোনটির আরও নানা গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়া রয়েছে।

পিথাগোরাস (Pithagorus) — গ্রীক দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ; আনুমানিক জীবনকাল 570 খৃঃ পূঃ থেকে 500 খৃঃ পূঃ। ধ্বনি-বিজ্ঞানে অমূল্য অবদান; শব্দ-তরঙ্গের ক্রমিক পর্যাবৃত্তির তারতম্যে সঙ্গীতে বিভিন্ন রাগ-রাগিনীর উদ্ভব সম্পর্কীয় তথ্য প্রচার। গণিতের বিভিন্ন আনুপাতিক সূত্রের সম্প্রসারণ; জ্যামিতির বিখ্যাত উপপাদ্য (পিথাগোরাস থিয়োরেম ↑) প্রবর্তন। মানবাত্মার অবিনশ্বরতা ও পূর্বজন্ম বিষয়ক মতবাদের প্রবর্তক।

পিথাগোরাস থিওরেম (Pithagorus theorem) — একটি জ্যামিতিক উপপাদ্য বিশেষ; সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের বর্গক্ষেত্র তার অপর দুই বাহুর উপরিস্থিত বর্গক্ষেত্র দ্বয়ের সমষ্টির সমান হয়ে থাকে।

পিনিয়ন (pinion) — যন্ত্রাদির ক্ষুদ্রাকার দাঁত-কাটা চাকা, যা অপর কোন অপেক্ষাকৃত বড় চাকার ঘূর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে; যেমন, ঘড়ির যান্ত্রিক ব্যবস্থায় নানা রকম ছোট - বড় 'পিনিয়ন-হুইল' থাকে।

পিপেট (pipette) — তরল পদার্থ পরিমাপের জন্যে আয়তনের দাগ-কাটা সরু কাচ-নল; রসায়নাগারে মুখ দিয়ে চুষে সুনির্দিষ্ট অল্প পরিমাণ তরল পদার্থ তুলে নিতে, অথবা অন্য কোন তরল পদার্থে মেশাতে যে-নল ব্যবহার করা হয়।

পিরিয়ডিক টেবল (periodic table) — মৌলিক পদার্থ-গুলোর পারমাণবিক সংখ্যার হিসেবে তৈরী একটা ছক-কাটা পর্যায়ক্রমিক তালিকা। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের গুণ ও ধর্মের যে পৌনঃপৌনিক পট পর্যায়-ক্রম লক্ষিত হয় সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানী মেণ্ডেলিফ ↑ একটা সুসম্বন্ধ সূত্র নির্ধারণ করেছিলেন, যা **পিরিয়ডিক-ল** নামে পরিচিত। এই সূত্রানুসারে তিনি তদবধি আবিষ্কৃত মৌলিক পদার্থগুলোকে তাদের গুণ ও ধর্মের পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে এই 'পিরিয়ডিক টেবল', বা 'পর্যায়ক্রমিক ছক' তৈরি করে গেছেন। একে 'মেণ্ডেলিফস্ পিরিয়ডিক টেবল' বলা হয়। এতে সমগোত্রীয় মৌলিক পদার্থগুলো তাদের রাসায়নিক গুণ ও ধর্মানুসারে এবং পারমাণবিক সংখ্যানুযায়ী নির্দিষ্ট ব্যবধানে ও নির্দিষ্ট শ্রেণীতে বিন্যস্ত রয়েছে। এই ছকে কোন মৌলিক পদার্থের স্থান দেখে তার গুণ, ধর্ম ও বৈশিষ্ট্যাদি প্রায় সুনির্দিষ্টভাবে অনুমান করা যায়। মেণ্ডেলিফ তাঁর এই পিরিয়ডিক টেবল-এ তৎকাল পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত কতকগুলি মৌলিক পদার্থের স্থান শূন্য রেখে সেগুলির অস্তিত্ব ও গুণাগুণ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীও করে গেছেন। তাঁর সেই সম্ভাবনা অনুযায়ী পরে সে-সব নূতন মৌলিক পদার্থগুলি একে একে আবিষ্কৃত হয়েছে।

পিস্টিল (pistil)—ফুলের স্ত্রী-প্রজনন অঙ্গ; ফুলের মধ্যবর্তী যে-অংশ বীজাধার (গর্ভাশয়, ওভ্যারি ↑), গর্ভমুণ্ড (ষ্টিগ্‌মা ↑) এবং এদের সংযোজক গর্ভদণ্ড (স্টাইল ↑) নিয়ে গঠিত।

ফুলের 'পিষ্টিল' অংশ
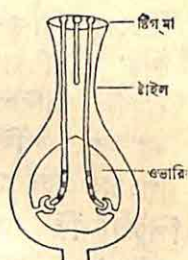
পেট্রল (petrol) — খনিজ পেট্রোলিয়াম ↑ থেকে শোধিত ও পৃথকীকৃত যে হাল্‌কা দাহ্য তৈল পাওয়া যায়। রাসায়নিক হিসেবে পদার্থ টা হেক্সেন, হেপ্টেন, অক্টেন ↑ প্রভৃতি নানারকম হাইড্রোকার্বনের জটিল সংমিশ্রণ মাত্র। এ-গুলো ছাড়া আরও অনেক জৈব দাহ্য পদার্থ এর মধ্যে মিশ্রিত থাকে। একে **গ্যাসোলিন**-ও বলা হয়। উৎকৃষ্ট হাল্‌কা জ্বালানী তেল হিসেবে বর্তমান যুগে এর মূল্য সর্বাধিক। মোটর, এরোপ্লেন প্রভৃতির সর্ব প্রকার 'ইন্টারন্যাল কম্বাস্‌সন ইঞ্জিন' ↑ এই জ্বালানী তেলে চলে।

পেট্রোলিয়াম (petroleum) — স্বভাবজাত বিভিন্ন হাইড্রোকার্বনের ↑ তরল সংমিশ্রণ। এর মধ্যে নানারকম

জৈব রাসায়নিক পদার্থ সংমিশ্রিত রয়েছে। ভূ-গর্ভে সঞ্চিত এই অবিশুদ্ধ ঘন তরল দাহ্য পদার্থ পাম্প করে তোলা হয়। বিভিন্ন দেশের পেট্রোলিয়ামের রাসায়নিক গঠন অবশ্য কতকটা বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে; আমেরিকার পেট্রোলিয়ামে প্যারাফিনের ↑ ভাগ অপেক্ষাকৃত বেশি; আবার রাশিয়ার পেট্রোলিয়ামে বেঞ্জিন ↑ প্রভৃতি হাইড্রোকার্বনের আধিক্য দেখা যায়। ফ্রাক্‌সন্যাল ডিস্টিলেশন ↑, অর্থাৎ আংশিক বাষ্পীকরণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে এই অবিশুদ্ধ খনিজ পেট্রোলিয়াম থেকে পেট্রল ↑, প্যারাফিন অয়েল ↑, ভেসেলিন ↑, বা **পেট্রোলিয়াম জেলি**, প্যারাফিন-ওয়াক্স প্রভৃতি পাওয়া যায়।

পেট্রোলিয়াম ইথার (petroleum ether)—খনিজ পেট্রোলিয়াম ↑ থেকে প্যারাফিন ↑ শ্রেণীর হাল্‌কা ও তরল হাইড্রোকার্বনগুলোর যে সংমিশ্রণ পাওয়া যায়। এর মধ্যে প্রধানতঃ থাকে পেন্টেন ↑ এবং হেক্সেন ↑ নামক দু'রকম হাইড্রোকার্বন।

পেট্রোলেটাম (petroletum) — পেট্রোলিয়াম ↑ থেকে প্রাপ্ত একটা মিশ্র ও ভারী হাইড্রোকার্বন; একে 'পেট্রোলিয়াম জেলি', বা ভেসেলিন-ও বলা হয়। অবিশুদ্ধ খনিজ পেট্রোলিয়াম শোধন করবার সময়ে ফ্রাক্‌সন্যাল ডিস্টিলেশন ↑ প্রক্রিয়ায় এই নরম পদার্থটা পাওয়া যায়। জিনিসটা বিভিন্ন হাইড্রোকার্বনের সংমিশ্রণে গঠিত; সাদা, বা হল্‌দে বর্ণের নরম (অর্ধ-কঠিন) একটা তৈলাক্ত পদার্থ।

পেট্রোলজি (petrology)— প্রস্তর-বিজ্ঞান; প্রস্তরের গঠন, গুণাগুণ, বয়স নির্ধারণ প্রভৃতি সম্বন্ধীয় আলোচনা-শাস্ত্র। পেট্রো-, পেট্রি (petro-, petri-) মানে প্রস্তর-বিষয়ক; **পেট্রিফ্যাক্‌শন** (petrifaction) অর্থ প্রস্তরীভূত, বা জীবাশ্মীভূত হওয়ার পদ্ধতি।

পেনাম্ব্রা (penumbra) — প্রচ্ছায়া; আঁধা-অন্ধকার ছায়া। কোন অস্বচ্ছ বস্তুর বাধা পেলে আলোক-রশ্মি প্রতিহত হয়ে বাধার পশ্চাতে গাঢ়

চন্দ্রগ্রহণের সময়ে আম্ব্রা ও পেনাম্ব্রার সৃষ্টি
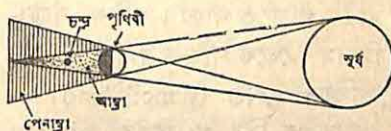
অন্ধকার ছায়া (আম্ব্রা ↑) ফেলে, তার দু'দিকে (গোলাকার বস্তু হলে চারদিকে) যে অর্ধালোকিত ছায়া পড়ে তাকে বলে পেনাম্ব্রা; যেমন, চন্দ্রগ্রহণের (ইক্লিপ্‌স ↑) সময়ে চাঁদের গায়ে পৃথিবীর ছায়ার চারদিকে যে অর্ধালোকিত প্রচ্ছায়া পড়ে।

পেণ্টা- (penta-) — পাঁচ সংখ্যক, বা পাঁচ গুণ বুঝাতে বিভিন্ন শব্দের পূর্বে ব্যবহৃত হয়, যেমন — পেণ্টাগন ↑, পেন্টেন ↑, পেণ্টক্সাইড, ইত্যাদি।

পেন্টোজ (pentose)—সুমিষ্ট ফলের রস থেকে প্রস্তুত যে-শর্করার (ফ্রুট সুগার ↑) অণুতে পাঁচটি অক্সিজেন পরমাণু থাকে। এর প্রধান বিশেষত্ব হলো এ-শ্রেণীর শর্করা জলীয় দ্রবে সহজে গেঁজে যায় না।

পেন্টোথ্যাল (pentothal) — ঘুমের ঘোরে অচৈতন্য করবার একটা ঔষধের ব্যবহারিক নাম। এটা বার্বিটুরেট ↑ জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ। শস্ত্র-চিকিৎসার (সার্জারি ↑) সময়ে শিরার রক্তে ইঞ্জেক্‌সন করে দিয়ে রোগীকে অসাড় অচৈতন্য করতে ব্যবহৃত হয়। এর রাসায়নিক নাম হলো 'থায়োপেন্টেন'।

পেন্টেন (pentane) — প্যারাফিন শ্রেণীর একটা তরল হাইড্রোকার্বন, C_5H_{12} ; এর তিন রকম আইসোমার ↑ থাকতে পারে। খনিজ পেট্রোলিয়াম ↑ থেকে পাওয়া যায়।

পেন্সিল লেড (pencil lead) — পেন্সিলের সিস্‌ গ্র্যাফাইটে ↑ তৈরী। যদিও একে 'লেড পেন্সিল' বলে, কিন্তু এতে লেড ↑, অর্থাৎ সীসা কিছুমাত্র থাকে না। গ্রাফাইটের সঙ্গে বিভিন্ন অনুপাতে এক প্রকার নরম মাটি মিশিয়ে বিভিন্ন ধরনের শক্ত, বা নরম পেন্সিল তৈরি করা হয়ে থাকে। গ্রাফাইটের এই মিশ্রণকেই বলা হয় 'পেন্সিল লেড' ↑

পেণ্ডুলাম (pendulum) — দোলক যন্ত্র। কোন ভারী ধাতু-খণ্ড সূতা, বা তারে ঝুলিয়ে দোলক তৈরি করা হয়। দুলিয়ে দিলে ওই ধাতব খণ্ড এদিক-ওদিক দুলতে থাকে। এরূপ দোল খাওয়ার সময়ে সূতা, বা তারের স্থির প্রান্তে যদি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কোণ উৎপন্ন হয়, আর ওই সূতা, বা তারে সংলগ্ন ওজন যদি অতি সামান্য হয়, তাহলে একটা পূর্ণদোল খেতে ওই দোলক, বা পেণ্ডুলামের যে সময় লাগে তা সর্বদা এই সূত্রানুসারে নির্দিষ্ট থাকে : $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$; এখানে T হলো সময়, l সূতার, বা তারের দৈর্ঘ্য, g মাধ্যাকর্ষণ-জনিত ত্বরণ (অ্যাক্সিলারেশন ডিউ-টু-গ্র্যাভিটি ↑), আর গাণিতিক সংকেত-চিহ্ন π (পাই ↑) = 22/7 ; পেণ্ডুলামের এই দোলন-কাল সর্বদা এরূপ নিয়মিত ও সুনির্দিষ্ট থাকে বলে দেয়াল-ঘড়িতে উহা ব্যবহৃত হয়।
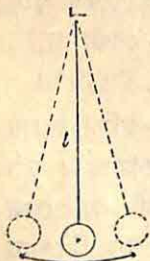
l

পেণ্ডুলাম

পেনি ওয়েট (penny weight) — ট্রয় ↑ ওজনের একটা পরিমাপ, = 24 গ্রেণ। এক ট্রয়-আউন্স ওজনের কুড়ি ভাগের এক ভাগ।

পেনিসিলিন (penicillin) — 'পেনিসিলিয়াম নোটেটাম' নামক এক প্রকার ছত্রাক (ফাঙ্গাস ↑) থেকে যে একটি জটিল জৈব রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে। একটা শক্তিশালী অ্যান্টিবায়োটিক ↑ ঔষধ ; এর প্রয়োগে জীবদেহে বিশেষ কতকগুলো রোগ-জীবাণুর বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে রোগ প্রশমিত হয়। বিখ্যাত বিজ্ঞানী আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং ↑ আবিষ্কার করেন।

পেপ্‌সিন (pepsin) — পাকস্থলীর জারক-রসে সঞ্জাত এক রকম এন্‌জাইম ↑ পদার্থ। খাদ্যের প্রোটিন ↑ উপাদান এর রাসায়নিক ক্রিয়ায় পেপ্টোন ↑ নামক একটি জৈব পদার্থে

রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই পেপ্টোন দেহের মাংসপেশী গঠনে সাহায্য করে। পাকস্থলীর অম্লরসের মাধ্যমে বিশেষ জটিল প্রক্রিয়ায় এই সব রূপান্তরের কাজ চলে। (মেটাবলিজ্ম ↑)

পেপ্টোনাইজ্ড ফুড (peptonised food) — রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত পেপ্সিন ↑ ও তৎসহ প্যান্‌ক্রিয়াটিন ↑ (প্যান্‌ক্রিয়াস গ্ল্যাণ্ড ↑) দ্বারা অর্ধ-জারিতখাদ্য। এভাবেখাওয়ার আগেই অনেকটা জারিত ও সহজ-পাচ্য করে অনেক সময় রোগীকে এরূপ লঘু খাদ্য দেওয়া হয়, যাতে হজমের সুবিধা হয়।

পেরিগায়েনাস (perigynous) — যে-সব ফুলের বৃন্তের শীর্ষভাগ বাটির আকারে গঠিত হয়ে দলপত্র, বা পাপড়ি গুলি তার ভিতরে চারধার ঘিরে জন্মায়। এই শ্রেণীর ফুলের বীজাধার, বা ওভারি ↑ থাকে ওই বাটির মধ্যস্থলে ; যেমন — চেরি ফুল, করবী ফুল ইত্যাদি।
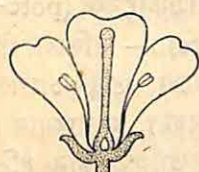
পেরিগায়েনাস ফুল
(অর্ধাংশে কাটা)

পেরিনিয়্যাল প্ল্যাণ্ট (perennial-plant) — বহু বর্ষ-জীবী উদ্ভিদ ; যে-সব উদ্ভিদ বহু বছর বাঁচে ও ফুল-ফল দেয়। যে-গুলির ফুল-ফল হয়, আর এক বছরেই মরে যায় তাদের বলে **অ্যানুয়্যাল** প্ল্যাণ্ট, অর্থাৎ 'বর্ষ জীবী উদ্ভিদ'।

পেরিমিটার (perimeter)—চতুর্দিকস্থ সীমারেখার দৈর্ঘ্য ; কোন ত্রিভুজের পেরিমিটার হলো তার বাহু তিনটির দৈর্ঘ্যের সমষ্টি। বৃত্তের (সার্কেল ↑) পেরিমিটারকে বাংলায় বলা হয় পরিধি (সারকাম্‌ফারেন্স ↑)।

পেরিনিয়াম (perineum) — দেহ-কাণ্ডের নিম্নস্থ জননেন্দ্রিয় ও মলদ্বারের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ অংশ ; সন্তান প্রসব-কালে অনেক ক্ষেত্রে প্রসূতির বিশেষতঃ এই স্থান ছিঁড়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং সংযোজনের প্রয়োজন হয়।

পেরিস্কোপ (periscope) — যে যন্ত্রের সাহায্যে সম্মুখস্থ দেয়াল, অথবা অপর কোন বাধার অপর দিকের অদৃশ্য বস্তুর প্রতিচ্ছবি দর্শকের চোখে দৃষ্টিগোচর হয়ে ওঠে। চিত্রে সাধারণ এক রকম পেরিস্কোপ যন্ত্রের গঠন দেখানো হয়েছে,—একটা টিনের, বা কাঠের চোঙের মধ্যে উপর-নিচে দু'খানা ছোট আয়না এমন বিপরীত-মুখী সমান্তরাল কৌণিক অবস্থানে লাগানো থাকে যে, উঁচু করে ধরলে বাধার অপর দিকের অদৃশ্য বস্তু থেকে আগত আলোক-রশ্মি উপরদিকের আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে চোঙের নিচের দিকে গিয়ে নিচের আয়নায় পুনরায় প্রতিফলিত হয়। এই প্রতিফলিত রশ্মি সমকোণে বেরিয়ে এসে চোঙের নিচের একটা ছিদ্রপথে দর্শকের চোখে পড়ে ; আর এভাবে অদৃশ্য বস্তুটার প্রতিবিম্ব তার দৃষ্টিগোচর হয়ে ওঠে।
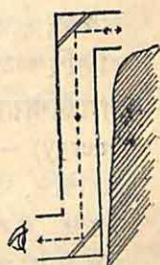
পেরিস্কোপ

আয়নার বদলে এতে ত্রিকোণ-কাঁচও (প্রিজ্‌ম ↑) বসানো যেতে পারে। জলের নিচে 'সাবমেরিন জাহাজ' থেকে উপরের দৃশ্যাবলী দেখবার জন্যে এরূপ পেরিস্কোপ যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। এরূপ পেরিস্কোপ যন্ত্রের সঙ্গে বিশেষ ব্যবস্থায় আবার একটা দূরবীক্ষণ (টেলিস্কোপ ↑) যন্ত্রও ব্যবহার করা যায়, যাতে জলের উপরের অনেক দূরবর্তী বস্তুও যন্ত্রের মধ্যে সাবমেরিন-স্থিত দর্শকের দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে।

পেল্‌ভিস (pelvis) — শ্রোণি চক্র; মেরুদণ্ডের নিম্নাংশে সংলগ্ন (দেহের পশ্চাদ্দেশের) চক্রাকার অস্থি-কাঠামো, যার সঙ্গে পদদ্বয়ের হাড় যুক্ত থাকে।

চক্রটি দেহ-কাণ্ডের নিম্ন-পশ্চাদ্দেশস্থ অনেকটা গোলাকার একক অস্থি-সংস্থান; একে মানব-দেহের শ্রোণীচক্র, বা বস্থি-কাঠামোও বলা হয়।

পোটেন্সিয়্যাল এনার্জি (potential energy) — স্থিতি-শক্তি; বিশেষ অবস্থিতি, বা সংস্থানের ফলে কোন বস্তুতে যে শক্তি সঞ্জাত হয়। কোন উচ্চ স্থানে সঞ্চিত জল পোটেন্সিয়্যাল এনার্জি, অর্থাৎ স্থৈতিক শক্তি লাভ করে। ওই জল নীচে প্রবাহিত করলে ওর সেই উচ্চ অবস্থান-জনিত স্থিতি-শক্তি, বা পোটেন্সিয়্যাল এনার্জি স্বভাবতঃই 'কাইনেটিক এনার্জি', বা গতি-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। জলের এই গতি-শক্তিকে কাজে লাগিয়ে টারবাইন ↑, হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিক জেনারেটর ↑ প্রভৃতি যন্ত্র চালানো হয়। আবার, একটা জড়ানো তারের স্প্রিং-এ তার ঐরূপ অবস্থিতির ফলে পোটেন্সিয়্যাল এনার্জি জন্মায়। টেনে সোজা করতে গেলে জোর লাগে,—ছেড়ে দিলে সবেগে পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। অস্বাভাবিক অবস্থা, বা অবস্থান থেকে কোন পদার্থকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনতে যে পরিমাণ কাজ পাওয়া যায়, তা থেকে পোটেন্সিয়্যাল এনার্জির পরিমাণ নির্ধারিত হয়। স্বাভাবিক অবস্থানে, বা অবস্থায় স্বভাবতঃ পদার্থের কোন পোটেন্সিয়্যাল এনার্জি থাকে না।

পোটেন্সিয়্যাল ডিফারেন্স (potential difference) — তড়িতাবিষ্ট দু'টি স্থানের মধ্যে তড়িৎ-চাপের (ভোল্টেজ ↑) বৈষম্য, বা ব্যবধান। এরূপ দু'টি তড়িতাহিত স্থান যদি কোন তড়িৎ-পরিবাহী তারের (কণ্ডাক্টর ↑, যেমন—তামার তার) দ্বারা যুক্ত করা যায়, তাহলে তার মাধ্যমে তড়িৎ-শক্তি প্রবাহিত হয়। এই তড়িৎ-স্রোত উচ্চ চাপবিশিষ্ট স্থান থেকে নিম্ন-চাপের দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। তড়িৎ-চাপের এই বৈষম্য (পোটেন্সিয়্যাল ডিফারেন্স) না থাকলে তড়িৎ-প্রবাহ ঘটতে পারে না। তড়িৎ-চাপের এই বৈষম্য (P.D.) ভোল্ট ↑ এককে পরিমাপ করা হয়ে থাকে।

পোটোমিটার (potometer) —

উদ্ভিদেরা মূলের মাধ্যমে মাটি থেকে যে-জল শোষণ করে তার পরিমাণ, বা শোষণের হার মাপার যন্ত্র বিশেষ।

পোল (pole) — (1) ম্যাগ্নেটিক পোল, বা চৌম্বক মেরু। কোন চুম্বক-দণ্ডের দুই প্রান্তীয় অংশে চুম্বকীয় শক্তি প্রবল থাকে ; লোহার টুকরা ওই দুই
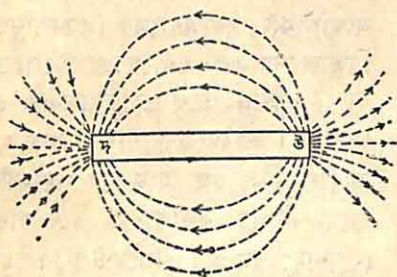
ম্যাগ্নেটিক পোল ও লাইন্‌স অব ফোর্স

প্রান্তে অধিক আকৃষ্ট হয়। এর এক প্রান্তকে বলে চুম্বকটির 'নর্থ পোল', বা উত্তর-মেরু ; অপর প্রান্তকে বলে 'সাউথ পোল', অর্থাৎ দক্ষিণ-মেরু। চৌম্বক শক্তি উত্তর মেরু থেকে বেরিয়ে রেখার আকারে (ম্যাগ্নেটিক লাইনস্ অব ফোর্স) দক্ষিণ মেরুতে যায়। চুম্বক দণ্ডটা সুতায় ঝুলিয়ে দিলে, বা সহজে ঘুরতে পারে এমন অবস্থানে রাখলে, ওর উত্তর-মেরু প্রান্ত সর্বদা পৃথিবীর মোটামুটি উত্তর দিকে এবং দক্ষিণ-মেরু প্রান্ত সর্বদা মোটামুটি দক্ষিণ দিকে মুখ করে থাকে। চুম্বকের এই ধর্মের উপর ভিত্তি করেই কম্পাস ↑, বা 'দিগ্‌দর্শন যন্ত্র' তৈরি হয়েছে। কোন চুম্বকের মেরু-প্রান্তীয় চুম্বকীয় আকর্ষণ-শক্তি **'ম্যাগ্নেটিক পোল ষ্ট্রেংথ'** এককে প্রকাশ করা হয়। (2) পৃথিবীর উত্তর-মেরু ও দক্ষিণ-মেরুকে 'নর্থ পোল' ও 'সাউথ পোল' বলে ; যাকে বলা হয় **'টেরেস্ট্রিয়াল পোল'**, অর্থাৎ ভূ-গোলকীয় মেরু। (3) পোল আবার দৈর্ঘ্যেরও একটা ইংলণ্ডীয় মাপ ; = $5\frac{1}{2}$ গজ।

পোলারয়েড (p o l a r o i d) — আলোক - রশ্মি পো লা রা ই জ ড্ (পোলারিজেশন ↑) করবার জন্যে ব্যবহৃত এক রকম পাত্‌লা স্বচ্ছ ফিল্মের ↑ ব্যবহারিক নাম। সেলুলোজ-নাইট্রেটের (নাইট্রোসেলুলোজ ↑) তৈরী এই ফিল্মের উপরে কুইনিন ও আয়োডিনের ↑ একটা বিশেষ যৌগিক পদার্থের অতি সূক্ষ্ম (আলট্রা-মাইক্রোস্কোপিক ↑) চূর্ণ মাখিয়ে সাধারণতঃ পোলারয়েড তৈরি করা হয়। এর মাধ্যমে আলোক-রশ্মি পোলারাইজ্‌ড হয়, অর্থাৎ বিশেষ একমুখী তরঙ্গগুলোই ওটা ভেদ করে যেতে পারে ; অন্যান্য তরঙ্গ আটকে বাদ পড়ে যায়।

পোলারিজেশন (polarization) — (1) ইলেক্‌ট্রিক সেলে ↑ ও ইলেক্‌ট্রোলিসিস ↑ প্রক্রিয়ায় ইলেক্‌ট্রোডের ↑ গায়ে গ্যাসীয় পদার্থ জমে গিয়ে তড়িৎ-উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যে বাধার সৃষ্টি হয় (ডিপোলারাইজার ↑)। (2) তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ-প্রবাহের ফলে আলোকের উদ্ভব হয়ে থাকে। এই আলোক-তরঙ্গ তার গতিপথের লম্ব-ভাবে (ট্রান্সভার্স ↑) সঞ্চালিত হয়। সাধারণ আলোক এরূপ তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের অসংখ্য বিভিন্নমুখী ধারা-প্রবাহের, বা রশ্মির বিচ্ছুরণে সৃষ্টি হয়ে থাকে। বিশেষ কৌশলে এ-সব

বিভিন্নমুখী তরঙ্গ থেকে একমুখী তরঙ্গ পৃথক করা যেতে পারে। এই ব্যবস্থাকে বলা হয় 'পোলারিজেশন অব লাইট'। নিকল প্রিজ্‌ম ↑, পোলারয়েড ↑ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সাধারণ আলোক-রশ্মি বিশেষ কৌশলে পরিচালিত করলে এক-মুখী তরঙ্গবিশিষ্ট আলোক, অর্থাৎ 'পোলারাইজড্‌ লাইট' পাওয়া যায়।

পোলারিমিটার (polarimeter) — যে যন্ত্রের সাহায্যে পোলারাইজড্‌ ↑ আলোক-তরঙ্গের স্পন্দনগুলোর গতি-পথ পরিবর্তনের পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়। সাধারণ আলোক-তরঙ্গ তার গতিপথের লম্বভাবে স্পন্দিত হয়; এই সব তরঙ্গ-স্পন্দন যতটা কোণে ঘুরিয়ে, বা বেঁকিয়ে পোলারিজেশন ↑ ঘটানো হয়, তা এই যন্ত্রে মাপা সম্ভব হয়ে থাকে।

পোলারিস্কোপ (polariscope) — যে যন্ত্রের সাহায্যে আলোক-রশ্মির বিভিন্নমুখী তরঙ্গ বিশ্লিষ্ট করে বিশেষ একমুখী তরঙ্গ-মালায় (পোলারাইজড্‌ লাইট-ওয়েভ) পৃথক করা সম্ভব হয়। 'নিকল প্রিজ্‌ম' ↑ ,বা পোলারয়েড ↑ ব্যবহার করে এরূপ যন্ত্র তৈরি হয়ে থাকে। আবার অতি সূক্ষ্ম লম্বা ছিদ্রপথে আলোক-রশ্মি পরিচালিত করে কিছু দূরত্বে অনুরূপ অপর ছিদ্রপথে বার করেও আলোক-তরঙ্গের পোলারিজেশন ঘটানো সম্ভব হয়।

পোলিওমাইলিটিস (poliomyelitis) — শিশু-পক্ষাঘাত রোগ ; ভাইরাস ↑ -ঘটিত একটা সংক্রামক ও দুরারোগ্য ব্যাধি। এতে সাধারণতঃ শিশুদের মেরুদণ্ডের শিরা-রজ্জুর প্রদাহ ও বিকৃতি ঘটে ও শিশুরা অপুষ্ট ও বিকৃতাঙ্গ হয়ে পড়ে।

পোলোনিয়াম (polonium) — একটি তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ ; পারমাণবিক ওজন 210, পারমাণবিক সংখ্যা 48 ; রেডিয়ামের ↑ তেজস্ক্রিয় বিভাজনের এক পর্যায়ে এর উৎপত্তি হয়। এজন্যে একে 'রেডিয়াম-এফ'ও বলা হয়। এর থেকে আবার আল্‌ফা ↑ কণিকা বিচ্ছুরিত হয়ে-হয়ে পদার্থটি ক্রমে সীসায় রূপান্তরিত হয়ে যায় (ট্রান্সমুটেশন অব এলিমেণ্ট ↑)।

প্রণ্টোসিল (prontosil) —সাল্‌ফোনেমাইড ↑ শ্রেণীর কঠিন একটি লাল্‌চে রাসায়নিক পদার্থ, (SO_2NH_2)। জীবের দেহাভ্যন্তরে এটা রোগ-জীবাণু (ব্যাক্টেরিয়া ↑) ধ্বংস করে ; কিন্তু দেহের বাইরে জীবাণুদের উপরে এর কোন ক্রিয়া লক্ষিত হয় না।

প্রস্টেট গ্ল্যাণ্ড (prostate gland) — যৌন গ্রন্থি ; পুরুষের মূত্রাধারের ঠিক নিচে সংলগ্ন একটি গ্রন্থি বিশেষ ; এই গ্ল্যাণ্ড থেকেই যৌন উত্তেজনা-কালে শুক্র-রস নির্গত হয়ে থাকে। বয়স্ক লোকের কখন-কখন এই গ্ল্যাণ্ডটির কার্যকারিতা কমে যায় এবং আয়তনে বেড়ে গিয়ে মূত্র-নালিতে
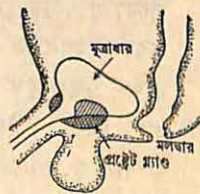
প্রস্টেট গ্ল্যাণ্ড

চাপ পড়ে, যার ফলে মূত্রকৃচ্ছতা রোগ দেখা দেয়।

প্রস্থেসিস (prosthesis) — চোখ, হাত, পা প্রভৃতি কোন অঙ্গহানি হলে তৎস্থানে কৃত্রিম অঙ্গ সংস্থাপনের প্রযুক্তি-বিদ্যা ; বিশেষতঃ কৃত্রিম চক্ষু সংস্থাপন। **প্রস্থেটিক সার্জারি** — এতদ্বিষয়ক শস্ত্র-চিকিৎসা।

প্রাইম নাম্বার (prime number) —মৌলিক, বা অভিভাজ্য সংখ্যা; যে সংখ্যা এক, বা সেই সংখ্যা ব্যতীত অপর কোন সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য নয়; যেমন — 17, 19, 53 প্রভৃতি।

প্রাইম মেরিডিয়ান (prime meridian) — মূল-দ্রাঘিমা রেখা ; যে দ্রাঘিমা, বা দেশান্তর-রেখা (লঙ্গিচিউড ↑) ইংলণ্ডের গ্রীনউইচ সহরের উপর দিয়ে গেছে বলে মানচিত্রে অঙ্কিত করা হয়। এই দ্রাঘিমা-রেখাকে মূল, অর্থাৎ 0° ধরা হয় এবং ম্যাপে তার পূর্ব ও পশ্চিমে ডিগ্রি এককে পৃথিবীর মেরুদ্বয়ের সংযোজক 'দেশান্তর-রেখা' সমূহ অঙ্কিত হয়ে থাকে।

প্রাইমারি অ্যামাইন্স (primary amines) —প্রাথমিক **অ্যামাইন** ↑ (amine) যৌগ সমূহ। অ্যামোনিয়া ↑ হলো NH_3 ; যদি তার একটি H-পরমাণু হাইড্রোকার্বন শ্রেণীর কোন জৈব রাসায়নিক জোট যেমন — মিথাইল methyl-, CH_3-) দ্বারা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় প্রতিস্থাপিত হওয়ার ফলে কোন যৌগ গঠিত হয় তাহলে তাকে বলে প্রাইমারি অ্যামাইন ; এক্ষেত্রে গঠিত যৌগটি হলো মিথাইল্যামাইন, $CH_3.NH_2$; যা অন্যতম একটি প্রাইমারি অ্যামাইন।

$CH_3.NH_2$
প্রাইমারি অ্যামাইন

প্রাইমারি কয়েল (primary coil) — ইণ্ডাক্সন কয়েল ↑, ট্রান্সফর্মার ↑ প্রভৃতি বৈদ্যুতিক যন্ত্রে যে তার-কুণ্ডলীর মধ্যে বাইরে থেকে তড়িৎ-প্রবাহ দেওয়া হয়। অন্তর্বর্তী এই তার কুণ্ডলীর মধ্যে প্রবাহিত বৈদ্যুতিক শক্তির প্রভাবে ইণ্ডাক্সনের ↑ ফলে বহিস্থ দ্বিতীয় তার-কুণ্ডলীর (সেকেণ্ডারি কয়েল ↑) মধ্যেও তড়িৎ-শক্তি সঞ্চারিত হয়ে থাকে।

প্রাইমারি সেল (primary cell)—বিভিন্ন পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়ার সাহায্যে তড়িৎ উৎপাদনের যন্ত্র ; সাধারণ 'ভোল্টেইক সেল' ↑ ; যেমন —ডেনিয়েল সেল, লেক্ল্যান্স সেল ↑ প্রভৃতি। বিভিন্ন পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে এ-সব সেলের মধ্যে ইলেক্ট্রোমোটিভ ফোর্স ↑ সৃষ্টি হয়ে থাকে। তড়িৎ-পরিবাহী তারের দ্বারা এ-সব সেলের তড়িদ্দ্বার (ইলেক্ট্রোড ↑) দু'টি যুক্ত করলে সেলের অভ্যন্তরে উৎপন্ন তড়িৎ প্রবাহিত করে নিয়ে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। আবার, স্টোরেজ ব্যাটারি ↑ ,বা অ্যাকুমুলেটরকে ↑ বলে 'সেকেণ্ডারি সেল', যাদের মধ্যে কোন প্রাইমারি সেল, অথবা জেনারেটর ↑ থেকে তড়িৎ নিয়ে পরে ব্যবহারের জন্যে সঞ্চিত করে রাখা হয়।

প্রাইমারি কালার (primary

colour) — প্রাথমিক তিনটি রং : লাল, হল্‌দে ও নীল। এই তিনটি রং উপযুক্ত অনুপাতে মিশিয়ে অন্যান্য বিভিন্ন রং তৈরি করা যায়। আবার, রঙিন সিনেমা-ফিল্মে ↑ ও সাধারণ ফটোগ্রাফিতেও লাল, সবুজ ও নীলাভ-বেগুনী রং তিনটি প্রাথমিক রং হিসেবে কাজ করে। এই তিনটি বর্ণের আলোক-রশ্মির যথাযথ সংমিশ্রণে অন্যান্য বর্ণের রঙিন ছবি ফিল্মে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে।

প্রিজ্‌ম (prism) — ত্রিকোণ কাঁচ-খণ্ড ; যার ধারগুলো সমান ত্রিকোণাকৃতি হয়ে থাকে। আবার ছয় কোণ-বিশিষ্ট প্রিজ্‌মও হয়। কাঁচ প্রভৃতি স্বচ্ছ কোন পদার্থে তৈরী এরূপ প্রিজ্‌ম আলোক সম্পর্কীয় নানা রকম পরীক্ষায় ও যন্ত্রাদিতে ব্যবহৃত হয়। কোয়ার্জে ↑ তৈরী প্রিজ্‌ম দিয়ে অদৃশ্য অতি-বেগুনী (আলট্রা-ভায়োলেট ↑) রশ্মির পরীক্ষাও সম্ভব হয়ে থাকে।
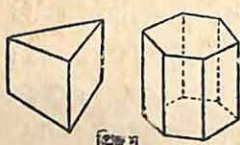
প্রিজ্‌ম

প্রিজ্‌মেটিক কম্পাস (prismatic compass) — ভূমি জরিপের কাজে ব্যবহৃত এক রকম যন্ত্র। গোলাকার যন্ত্রের সঙ্গে এক খানা প্রিজ্‌ম ↑ এমনভাবে সংলগ্ন করা থাকে, যাতে দূরবর্তী জিনিসের কৌণিক ব্যবধান যন্ত্রের ডিগ্রি-চিহ্নিত গোলাকার স্কেলের গায়ে (থিয়োডোলাইট ↑) সঙ্গে-সঙ্গে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। ওই গোলাকার কম্পাস-যন্ত্রে 1° থেকে 360° ডিগ্রি পর্যন্ত চিহ্নিত স্কেলের দাগ কাটা থাকে।

প্রিস্টলি (Priestley), জোসেফ — বৃটিশ রাসায়নিক ; ইয়র্কশায়ারে জন্ম 1733 খৃস্টাব্দ, মৃত্যু 1804 খৃস্টাব্দ। রসায়ন বিজ্ঞানের বহু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ; হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ↑, সাল্‌ফার ডাইঅক্সাইড, নাইট্রিক অ্যাসিড ↑ প্রভৃতি আবিষ্কার। বস্তুতঃ অক্সিজেন গ্যাস আবিষ্কারেই (1774 খৃঃ) সমধিক খ্যাতি ; কিন্তু ফ্লোজিস্টন ↑ মতবাদে বিশ্বাসী থাকায় অক্সিজেনের প্রকৃত স্বরূপ নির্ধারণে অসমর্থ হন (ল্যাঁভয়সিয়ার ↑)। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে শেষ জীবন যাপন ও মৃত্যু।

প্রুফ স্পিরিট (proof spirit) — ইথাইল অ্যালকোহলের ↑ জলীয় দ্রব ; যার মধ্যে মোটামুটি মাত্র 50% অ্যালকোহলের ভাগ থাকে। এই স্বল্প পরিমাণ অ্যালকোহলের জলীয় দ্রবও অগ্নি সংযোগে জলে ওঠে। পূর্বে গান-পাউডারে ↑ বিস্ফোরণ ঘটাতে এটা ব্যবহৃত হোত ; সামান্য কিছু প্রুফ স্পিরিট রেখে জেলে দিলে তার উত্তাপে নিকটস্থ গান-পাউডার ↑ জলে উঠে বিস্ফোরণ ঘটায়।

প্রুসিয়ান ব্লু (prussian blue) — গাঢ় নীলবর্ণের একটা রাসায়নিক পদার্থ। এর রাসায়নিক নাম ফেরিক ফেরোসায়েনাইড, $Fe_4[Fe(CN)_6]_3$; যা পটাসিয়াম ফেরোসায়েনাইডের সঙ্গে কোন ফেরিক ↑ সল্টের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয়। জিনিসটা

রঞ্জক পদার্থ হিসেবেই সচরাচর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। (ব্লু-প্রিণ্ট ↑)

প্রোটন (proton)—মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াসের সংগঠক ধন-তড়িৎ বিশিষ্ট আদি কণিকা। এর ভর (মাস ↑) ইলেক্‌ট্রন-কণিকার চেয়ে প্রায় 1840 গুণ অধিক। পক্ষান্তরে, এর তড়িৎ-শক্তির পরিমাণ ইলেক্‌ট্রনের ↑ তড়িৎ-শক্তির সমান, কিন্তু বিপরীত-ধর্মী। (অ্যাটমিক স্ট্রাক্‌চার ↑)

প্রোকেইন (procain) — কোকেনের ↑ সম-ক্রিয়াবিশিষ্ট নোভোকেইনের ↑ অনুরূপ একটি সংশ্লেষিত ঔষধের ব্যবহারিক নাম। নড়া দাঁত তোলবার সময়ে দন্তমূল অসাড় ও বেদনাহীন করতে ব্যবহৃত হয়।

প্রোটারগল (protargol) — রৌপ্য ও প্রোটিন ↑ ঘটিত একটি রাসায়নিক পদার্থের (সিল্‌ভার প্রোটিনেট্‌) ব্যবহারিক নাম। এর মধ্যে সিল্‌ভার ও প্রোটিনের অতি সূক্ষ্ম কণিকা অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে থাকে; পদার্থটা জলে দিলে একটা কোলয়ড্যাল ↑ সল্যুসন পাওয়া যায়। জীবাণু-প্রতিরোধক বিশেষ কার্যকরী একটি ঔষধ হিসেবে চোখ ও মূত্র-নালীর ক্ষতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

প্রোটিন (protein) — জীবের দেহ-কোষ প্রধানতঃ যে রাসায়নিক পদার্থে গঠিত। জটিল সব জৈব রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে জীবদেহে প্রোটিন পদার্থের সৃষ্টি হয়। প্রোটিন আবার নানা রকম আছে, কিন্তু সব প্রোটিনেই বিভিন্ন অনুপাতে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন থাকে; এ-সব ছাড়া আবার কখন কখন থাকে সাল্‌ফার (গন্ধক) ও ফস্‌ফরাস ↑। বিভিন্ন অ্যামিনো-অ্যাসিডের ↑ নানারূপ জটিল প্রক্রিয়ায় জীবের দেহাভ্যন্তরে প্রোটিনের সৃষ্টি হয়ে থাকে। দেহের পুষ্টি ও গঠনের জন্যে খাদ্যাদিতে প্রোটিনের ভাগ প্রয়োজনারূপ থাকা দরকার। মাছ, মাংস, ডিম, মাখন, পনীর প্রভৃতি বিভিন্ন খাদ্য হলো প্রোটিন-বহুল।

প্রোটোজোয়া (protozoa)—এক-কোষী আণুবীক্ষণিক জীবাণু; আদ্য-প্রাণী। জীব-জগতের ক্ষুদ্রতম এক বিশেষ শ্রেণীর জীবাণুর সাধারণ নাম। অ্যামিবা ↑, প্যারামোসিয়াম, ম্যালেরিয়া-প্যারাসাইট্‌ ↑ প্রভৃতি বিভিন্ন সব জীবাণু এরূপ এককোষী প্রোটোজোয়া শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

প্রোটোপ্লাজ্‌ম (protoplasm) — জীব-পঙ্ক, আদ্যপ্রাণ-বস্তু; জেলির ↑ মত যে পদার্থে জীবকোষ গঠিত। প্রোটিন জাতীয় অতি জটিল গঠনের এক রকম কোয়লড্যাল ↑ অর্ধ-তরল সজীব পদার্থ; জীব-কোষ মাত্রই এ-দিয়ে গঠিত।

প্রোডিউসার গ্যাস (producer gas) —অত্যুত্তপ্ত কয়লার (কোক ↑) মধ্যে বায়ু ও উত্তপ্ত জলীয় বাষ্পের প্রবাহ চালালে একটা গ্যাসীয় সংমিশ্রণ উৎপন্ন হয়। এর মধ্যে প্রায় 25% কার্বন-মনঅক্সাইড (CO), 5% কার্বন-ডাইঅক্সাইড (CO_2), 12% হাইড্রোজেন (H_2) ও প্রায় 58%

নাইট্রোজেন(N_2) মিশ্রিত থাকে। এই গ্যাসীয় সংমিশ্রণ সস্তা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে (কোল গ্যাস ↑, ওয়াটার গ্যাস ↑)।

প্রোফিল্যাক্‌টিক (prophylactic) — রোগের আক্রমণাশঙ্কা দূর করবার জন্যে পূর্বেই (সুস্থাবস্থায়) যে-সব চিকিৎসা-পদ্ধতি অবলম্বিত হয়ে থাকে। আরোগ্যকারী নয়, রোগের প্রতিরোধক ঔষধের ব্যবহার; যেমন, ম্যালেরিয়া না হতে পারে তার জন্যে সুস্থাবস্থায় কুইনিন, বা অনুরূপ যে-সব ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

প্রোবেব্‌ল এরর (probable error)—সম্ভাব্য ভুল; একই রাশির (দৈর্ঘ্য, ওজন প্রভৃতি) একাধিক বার মাপ নিলে সম্ভাব্য ভুলের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিমাপ-সংখ্যার কিছু কম-বেশী হয়েই থাকে। এই ভুল সংশোধনের জন্য যে সম্ভাব্য গড় ভুল উল্লেখ করা প্রয়োজন হয়ে থাকে; যেমন — 12·0 ± 0·1 সেন্টিমিটার, অর্থাৎ সম্ভাব্য ভুল 0·1 সে. মি. কম, বা বেশী। 12·0 ± 0 সে. মি. লিখলে সঠিক 12·0 সে. মি. বুঝায়।

-প্লাজ্‌ম (-plasm) — যে জটিল জৈব রসে জীব-কোষগুলি গঠিত। **প্রোটোপ্লাজ্‌ম** ↑ হলো জীব-দেহের সংগঠক কোষগুলির মূল উপাদান; আর **সাইটোপ্লাজ্‌ম** হলো জীব-কোষের কেন্দ্রীণ-বস্তু (নিউক্লিয়াস ↑) ব্যতীত কোষের অভ্যন্তর ভাগ যে অর্ধ-তরল পদার্থে গঠিত। জীব-কোষের কেন্দ্রীণ হলো **নিউক্লিও প্লাজ্‌ম** ↑ নামক আর এক প্রকার বিশেষ জটিল জৈব রসে গঠিত।

প্লাজ্‌মা (plasma) — রক্ত-রস; রক্তের বর্ণহীন ঘন-তরল অংশ, যার মধ্যে রক্ত-কোষগুলি মিশে ভাসমান রয়েছে। দেহের সংগঠক বিভিন্ন জীব-কোষ এবং প্রজনন-কোষের অভ্যন্তরস্থ তরল পদার্থকেও প্লাজ্‌মা বলা হয়।

প্লাজ্‌মোকুইন (plasmoquine) — ম্যালেরিয়া জ্বরের জীবাণুনাশক বিশেষ একটি ঔষধের ব্যবহারিক নাম; একে অনেক সময় **পামাকুইন** (pamaquin)ও বলা হয়।

প্লাজ্‌মোডিয়া (plasmodia) — অতি সরল গঠনের বিশেষ এক শ্রেণীর এক-কোষী জীবাণু; যেমন—ম্যালেরিয়া-উৎপাদক পরজীবী (প্যারাসাইট ↑) জীবাণু; যারা মশকের দেহ থেকে মানুষের রক্তে প্রবেশ করে ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টি করে।

প্লাম্বাগো (plumbago) — গ্র্যাফাইট; কার্বনের একটা স্বাভাবিক অ্যালোট্রোপ ↑; একে আবার 'ব্ল্যাক-লেড'ও বলে। লেড, বা সীসাকে বলে **প্লাম্বাম**, যা থেকে সীসার সাংকেতিক চিহ্ন Pb হয়েছে; কিন্তু প্লাম্বাগো সীসা নয়, সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ।

প্ল্যাটিনাম (platinum) — একটি মূল্যবান মৌলিক ধাতু; সাংকেতিক চিহ্ন Pt, পারমাণবিক ওজন 195·23 পারমাণবিক সংখ্যা 78; রৌপ্যের মত সাদা কঠিন ধাতব পদার্থ, অত্যন্ত ভারী। একক কোন অ্যাসিডে ধাতুটা দ্রবীভূত হয় না (নোব্‌ল

মেটাল ↑); অত্যধিক তাপ-সহ। ধাতব পদার্থের মধ্যে সব চেয়ে মূল্যবান। অস্‌মিয়াম ↑, ইরিডিয়াম ↑ প্রভৃতি ধাতুর সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় কোন-কোন খনিজ আকরিকে সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়। ক্যাটালিস্ট ↑ হিসেবে ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নির্মাণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মূল্যবান ধাতু হিসেবে অলঙ্কারাদিতেও এর কিছু কিছু ব্যবহার আছে।

প্ল্যাটিনয়েড (platinoid) — তামা, দস্তা, নিকেল ও উল্‌ফ্রাম ↑ ধাতুর সংমিশ্রণে গঠিত সংকর-ধাতু। এতে সাধারণতঃ 60% তামা, 24% দস্তা, 14% নিকেল ও 2% উলফ্রাম ↑, অর্থাৎ টাংস্টেন ↑ থাকে। নামে সাদৃশ্য থাকলেও এতে প্ল্যাটিনাম ধাতু কিছুমাত্র থাকে না।

প্ল্যাঙ্ক (Planck), ম্যাক্স — জার্মান পদার্থ-বিজ্ঞানী; কিয়েলে জন্ম 1858 খৃঃ, মৃত্যু 1947 খৃঃ। বিভিন্ন শক্তির বিকিরণ সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক তথ্য আবিষ্কার; 'কোয়াণ্টাম-বাদ' ↑ উদ্ভাবনেই সবিশেষ প্রসিদ্ধি (1900 খৃস্টাব্দ)। এই কোয়াণ্টাম ↑ সূত্রের সাহায্যে পারমাণবিক শক্তি, সৌর-শক্তি, বিভিন্ন বর্ণালীর আলোক-শক্তি, প্রভৃতির পরিমাণ নির্ধারণ ও তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা সম্ভবপর হয়েছে। এই যুগান্তকারী সূত্র উদ্ভাবনের স্বীকৃতি স্বরূপ 1918 খৃস্টাব্দে পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ।

প্ল্যানেট (planet) — গ্রহ; সৌর পরিবারের বিভিন্ন জ্যোতিষ্ক, যেগুলি নিজ-নিজ কক্ষপথে সূর্যকে প্রতিনিয়ত প্রদক্ষিণ করছে; যেমন — (সূর্য থেকে দূরত্বের পর্যায়ক্রমে) বুধ গ্রহ (মার্কারি ↑), শুক্র গ্রহ (ভেনাস ↑), পৃথিবী (আর্থ ↑), মঙ্গল (মার্‌স ↑), বৃহস্পতি গ্রহ (জুপিটর ↑), শনি গ্রহ (স্যাটার্ন ↑), ইউরেনাস ↑, নেপ-চুন ↑, প্লুটো ↑। এই গ্রহগুলির মধ্যে বৃহস্পতি গ্রহই আয়তনে সর্ব-বৃহৎ; আর, বুধ গ্রহ সব চেয়ে ক্ষুদ্র।

প্লাস্টার অব প্যারিস (plaster of paris) — ক্যালসিয়াম সালফেটের ($CaSO_4.H_2O$) চূর্ণ। পদার্থটার মধ্যে জল দিলে আঠালো হয়ে দ্রুত শক্ত হয়ে এঁটে যায়। এ-জন্যে হাত-পা ভাঙলে হাসপাতালে এ-দিয়ে এঁটে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়, যাকে সাধারণতঃ বলে 'প্লাস্টার করা'।

প্ল্যাস্টিক (plastic) — যে সব পদার্থ উত্তাপে গলিয়ে ছাঁচে ঢেলে বিভিন্ন আকার দেওয়া যায়। উচ্চ চাপ ও তাপে প্ল্যাস্টিক পদার্থ নরম হয়ে পড়ে, কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় তার কাঠিন্য আবার ফিরে আসে। প্ল্যাস্টিক মাত্রই পলিমার ↑ শ্রেণীর জৈব পদার্থ; বিশেষ এক জটিল পলিমারিজেশন ↑ প্রক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক গঠনের নানারকম প্ল্যাস্টিক পদার্থ তৈরি হয়েছে। সেলু-লয়েড ↑, ব্যাকালাইট ↑, নাইলন ↑ প্রভৃতি সবই এরূপ বিভিন্ন শ্রেণীর প্ল্যাস্টিক পদার্থ। (থার্মোপ্ল্যাস্টিক ↑)

প্লাস্টিক সার্জারি (plastic surgery) — যে বিশেষ ধরনের

শস্ত্র-চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচারের সাহায্যে দেহের কোন অস্বাভাবিক, বা বিকৃত অঙ্গ স্বাভাবিক ও সুগঠিত করা হয়। এর জন্য কোন প্ল্যাস্টিক ↑ পদার্থ সংযোগ করা হয় না; বিশেষ প্রক্রিয়ায় দেহের অপর কোন অংশের সুস্থ ও সজীব মাংসপেশী ও চামড়া নিয়ে সংযোজিত হয়ে থাকে।

প্লাস্টিড্‌স (plastids)—সবুজ উদ্ভিদ-কোষের সাইটোপ্লাজমের ↑ মধ্যে ভাসমান অতি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র সবুজ জৈব কণিকা সমূহ; এগুলি উদ্ভিদদেহের কোন-কোন রাসায়নিক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে এবং বিশেষতঃ সালোকসংশ্লেষ (ফোটোসিন্থেসিস ↑) প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে থাকে; যেমন, উদ্ভিদের ক্লোরোপ্ল্যাস্ট ↑ ও ক্লোরোফিল ↑ নামক বিভিন্ন সবুজ-কণা।

প্লাসেণ্টা (placenta) — গর্ভফুল; জননীর গর্ভাধারের অভ্যন্তরে স্পঞ্জের মত সছিদ্র জৈব পদার্থে গঠিত যে জিনিসটা শিশুকে প্রসূতির সঙ্গে যুক্ত রাখে ও খাদ্য সরবরাহে সাহায্য করে। এই বিশেষ জৈব পদার্থের মাধ্যমে শিশুর রক্তে মাতার দেহ থেকে খাদ্য - রস শুষে গিয়ে মেশে; কিন্তু উভয়ের রক্তের আদান - প্রদান হয় না। উদ্ভিদের প্লাসেণ্টা হলো বীজাধারের (ওভারি ↑) অংশ বিশেষ, যার সঙ্গে নিষিক্ত পরাগ-রেণু গিয়ে এঁটে যায় ও ক্রমে ভ্রূণের সৃষ্টি হয়।

প্লাসেণ্টা

প্লুটো (Pluto) — একটি সাম্প্রতিক আবিষ্কৃত গ্রহ; মাত্র 1930 খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়েছে। নেপচুন ↑ গ্রহেরও দূরবর্তী একটা কক্ষপথে এটা সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। সূর্য থেকে এর দূরত্ব মোটামুটি 367 কোটি মাইল। এর আয়তন প্রায় পৃথিবীর সমান। আপন কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে আমাদের হিসেবে এর লাগে মোটামুটি 248·4 বছর।

প্লুটোনিয়াম (plutonium) — মৌলিক ধাতু; সাংকেতিক চিহ্ন Pu, পারমাণবিক সংখ্যা 94; অন্যতম ট্রান্সইউরেনিক ↑ এলিমেণ্ট। প্রাকৃতিক কোন খনিজ পদার্থে অদ্যাপি পাওয়া যায় নি; ইউরেনিয়াম ↑ থেকে বিশেষ নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্সনের ↑ ফলে পাওয়া গেছে। 'ইউরেনিয়াম-238'-এর সঙ্গে একটা নিউট্রন ↑ যুক্ত হয়ে ইউরেনিয়াম-239 (আইসোটোপ ↑) সৃষ্টি হয়; আবার একটা ইলেক্ট্রন কমিয়ে দিলে তা থেকে পাওয়া যায় নেপচুনিয়াম ↑। আবার তার থেকে আর একটা ইলেক্ট্রন কমালে সৃষ্টি হয় এই প্লুটোনিয়াম। অ্যাটমিক পাইলে ↑ এর $_{94}Pu^{239}$ আইসোটোপ সৃষ্টি হয়ে থাকে। ধীরগতি নিউট্রন-কণিকার সংঘাতে এর নিউক্লিয়ার ফিসন ↑ ঘটিয়ে বিশেষ ধরনের অ্যাটম বম্‌ ↑ তৈরি হয়ে থাকে।

ফ

ফনা (fauna)—আঞ্চলিক প্রাণী-জগৎ;

নির্দিষ্ট কোন দেশের, বা অঞ্চলের প্রাণি-বৈচিত্র্য ; যেমন — ভারতের 'ফনা' বললে এ-দেশের বিভিন্ন প্রাণি-কুলের পরিচয় বুঝায়। কোন দেশের উদ্ভিদ - বৈচিত্র্যকে বলে সে-দেশের **ফ্লোরা** ↑ (flora)। কোন দেশের 'ফনা' ও 'ফ্লোরা' বিচার - বিশ্লেষণ করে তত্রত্য বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক তথ্যাদি জানা যায়।

ফর্ম্যালিন (formalin) — ফর্ম্যাল্ডি-হাইডের ↑ জলীয় দ্রব ; এর মধ্যে সাধারণতঃ 40% ফর্ম্যাল্ডিহাইড থাকে। জীবাণু-প্রতিরোধক ও জীবাণু-নাশক পদার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ফর্ম্যাল্ডিহাইড (formaldehyde) — গ্যাসীয় পদার্থ, HCHO ; শ্বাস-রোধকারী তীব্র গন্ধযুক্ত, জলে বিশেষ দ্রবণীয়। মিথাইল অ্যালকোহল ↑ থেকে অক্সিডেশন ↑ প্রক্রিয়ায় গ্যাসটা উৎপন্ন হয়ে থাকে। জীবাণুপ্রতিরোধক পদাথ। বিশেষতঃ প্লাস্টিক ও রঞ্জক পদার্থের উৎপাদন-শিল্পে যথেষ্ট দরকার হয়ে থাকে ; ঔষধ হিসেবেও এর কিছু ব্যবহার আছে।

ফর্মিক অ্যাসিড (formic acid) — অম্ল গন্ধযুক্ত বর্ণহীন একটি তরল অ্যাসিড, HCOOH ; উদ্বায়ী বলে এ-থেকে ধূম নির্গত হয়, যা কোন কিছুতে লাগলে ক্ষয়ে যায়। কোন-কোন উদ্ভিদ ও বিশেষ এক শ্রেণীর পিঁপড়ের দেহে স্বভাবতঃ ফর্মিক অ্যাসিড থাকে। সোডিয়াম ফর্মেট ↑ নামক যৌগ থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অ্যাসিডটা উৎপাদিত হয়ে থাকে। চর্ম-শিল্পে (ট্যানিং ↑) ও রঞ্জন-শিল্পে (ডাইং ↑) যথেষ্ট প্রয়োজন হয়; আবার, বিশেষ ইলেক্‌ট্রো-প্লেটিং ↑ প্রক্রিয়ায়ও কোন-কোন ক্ষেত্রে এর ব্যবহার আছে।

ফল্‌স রিব্‌স (false ribs) — বক্ষ-পঞ্জরের নিচের দু'দিকের যে-দু'টি ছোট পঞ্জরাস্থি মেরুদণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকে, কিন্তু সামনে বক্ষাস্থির সঙ্গে যুক্ত না হয়ে পার্শ্ববর্তী অন্য পাঁজরের গায়ে লেগে রয়েছে। (ফ্লোটিং রিবস ↑)।

ফস্‌জিন (phosgene) — বর্ণহীন বিষাক্ত গ্যাসীয় যৌগিক পদার্থ, $COCl_2$; পদার্থটার অপর নাম কার্বোনিল-ক্লোরাইড। শ্বাসরোধকারী তীব্র গন্ধবিশিষ্ট। আগেকার দিনে বিষাক্ত গ্যাস হিসেবে যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যব-হৃত হোত। আজকাল রাসায়নিক রঞ্জন-শিল্পে এর কিছু ব্যবহার আছে।

ফস্‌ফরাস (phosphorus)—মৌলিক পদার্থ ; সাংকেতিক চিহ্ন P ; পার-মাণবিক ওজন 30·98, পারমাণবিক সংখ্যা 15 ; সাধারণতঃ এর দু'-রকম অ্যালোট্রোপ ↑ দেখা যায়, — রেড-ফস্‌ফরাস ও হোয়াইট - ফস্‌ফরাস। হোয়াইট ফস্‌ফরাস সাদা (ঈষৎ হল্‌দে) কঠিন পদার্থ; অত্যন্ত বিষাক্ত ও দাহ্য ; সাধারণ তাপেই (30° সেন্টি-গ্রেড) জ্বলে ওঠে। রেড-ফস্‌ফরাস গাঢ় লাল বর্ণের; এটা তেমন বিষাক্ত, বা দাহ্য নয়। ফস্‌ফরাস সহজ-দাহ্য বলে স্বাভাবিক মৌলিক অবস্থায় পাওয়া যায় না ; বিভিন্ন ফস্‌ফেট, বিশেষতঃ ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট, $Ca_3(PO_4)_2$,

খনিজের আকারে পাওয়া যায়। জীবদেহের পক্ষে ফস্‌ফরাস একটা অত্যাবশ্যক উপাদান; জীবদেহের হাড়ের প্রধান উপাদানই হলো ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট। ফস্‌ফরাস-ঘটিত পদার্থ (বিভিন্ন ফস্‌ফেট ↑, সুপার-ফস্‌ফেট ↑ প্রভৃতি) জমির সাররূপে ব্যবহৃত হয়। দেশলাই-শিল্পে দাহ্য পদার্থ হিসেবে রেড-ফস্‌ফরাস ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ফস্‌ফর ব্রোঞ্জ (phosphor bronze) — তামা ও টিনের সঙ্গে (ব্রোঞ্জ ↑) কিছু ফস্‌ফরাসের সংযোগে গঠিত সংকর-ধাতু; অত্যন্ত কঠিন, সহজে ক্ষয় হয় না। মোটরের বেয়ারিং ↑, গিয়ার ↑ প্রভৃতি এ-দিয়ে তৈরি হয়। সমুদ্রজলের ক্ষয়কারী প্রভাব থেকে রক্ষা করবার জন্যে জাহাজের তলদেশ তৈরি করতেও সাধারণতঃ এর পাত ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ফস্‌ফাইট (phosphite) — ধাতব পদার্থের সঙ্গে ফস্‌ফোরাস-অ্যাসিডের (H_3PO_3) রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন সল্ট; যেমন — ক্যালসিয়াম ফস্‌ফাইট (Ca_2PO_3)। ফস্‌ফরাস-ট্রাইক্সাইড (P_2O_3) ও জলের রাসায়নিক ক্রিয়ায় ফস্‌ফোরাস-অ্যাসিড উৎপন্ন হয়ে থাকে।

ফস্‌ফাইড (phosphide) — ধাতব পদার্থের সঙ্গে ফস্‌ফরাসের সরাসরি মিলনে যে সকল দ্বি-মৌল যৌগ (বাইনারি কম্পাউণ্ড ↑) উৎপন্ন হয়; যেমন — অ্যালুমিনিয়াম ফস্‌ফাইড, AlP, ক্যালসিয়াম ফস্‌ফাইড, Ca_3P_2, যা জলের সংস্পর্শে জলে ওঠে।

ফস্‌ফেট (phosphate) — ফস্‌ফোরিক ↑ অ্যাসিডের (H_3PO_4) বিভিন্ন সল্ট। উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্যে সামান্য ফস্‌ফরাস দরকার; এ-জন্যে বিভিন্ন ফস্‌ফেট সল্ট জমির সাররূপে ব্যবহৃত হয়। জমিতে ফস্‌ফরাসের অভাব পূরণের জন্যে সার হিসেবে বিশেষতঃ ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম প্রভৃতি ধাতুর ফস্‌ফেট সল্ট ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ফস্‌ফোরিক অ্যাসিড (phosphoric acid) — স্ফটিকাকার কঠিন পদার্থ, H_3PO_4; জলে বিশেষভাবে দ্রবণীয়। বাতাসের জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শেই গলে যায়; এ-জন্যে সাধারণতঃ সিরাপের মত ঘন তরল অবস্থায়ই থাকে। ফস্‌ফোরিক অ্যাসিডের বিভিন্ন সল্টকে বলে 'ফস্‌ফেট'।

ফস্‌ফিন (phosphine) — ফস্‌ফিউরেটেড হাইড্রোজেনের (PH_3) বিশেষ নাম; বর্ণহীন, বিষাক্ত গ্যাসীয় পদার্থ। অত্যন্ত দাহ্য গ্যাস; বায়ুর সংস্পর্শে সাধারণ তাপেই জলে ওঠে। এক রকম বিশেষ দুর্গন্ধযুক্ত।

ফস্‌ফোরেসেন্স (phosphorescence) — আলোক বিকিরণের বিশেষ ধর্ম। কোন-কোন পদার্থ কিছুক্ষণ আলোকে রাখার পরে অন্ধকারেও এক রকম দীপ্তি বিকিরণ করে; এদের বলে **ফস্‌ফোরেসেণ্ট** পদার্থ। কোন-কোন খনিজ পদার্থ ও সামুদ্রিক জীবের দেহে অন্ধকারে এরূপ আলোকচ্ছটা দেখা যায়।

রাত্রিকালে জোনাকির আলোও এক রকম ফস্‌ফোরেসেন্স।

…**ফাইট** (phyte) — উদ্ভিদকুল; যেমন — **জিওফাইট** (geophyte) হলো যে-সব উদ্ভিদ ভূ-সমান্তরাল শিকড় থেকে নূতন নূতন অঙ্কুরোদ্‌গমের ফলে সংখ্যায় বেড়ে যায় ও ছড়িয়ে পড়ে। **হিলিওফাইট** (heliophyte) হলো যে-সব উদ্ভিদ সারাদিনের প্রখর সৌরতাপ সহ্য করেও পরিপুষ্ট ও তাজা থাকে।

ফাইব্রিনোজেন (fibrinogen) — রক্ত-রসের একটি অতি-সূক্ষ্ম তরল উপাদান; দেহের কোন স্থান কেটে গেলে ক্ষতমুখের এই উপাদানটি **ফাইব্রিন** (fibrin) নামক এক বিশেষ জৈব তন্তুতে পরিণত হয়। এরূপ তন্তু-জালে রক্তের জলীয় অংশ ঘনীভূত হয়ে চাপ বাঁধে, আর তার ফলে কাটা স্থান থেকে রক্তপাত বন্ধ হয়ে যায়।

ফাইলারিয়েসিস (filariasis) — রোগ বিশেষ; যাতে বিশেষ এক শ্রেণীর পরজীবী জীবাণুর (প্যারাসাইট ↑) আক্রমণে অঙ্গ-বিশেষের মাংসপেশীর অভ্যন্তরস্থ রক্তবহা কৈশিক নালীগুলোর মধ্যে রক্ত-লসিকা (লিম্‌প ↑) জমে গিয়ে রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়। এর ফলে মাংসপেশীতে জল জমে ও পেশী-তন্তুগুলো অত্যধিক ফুলে দূষিত হয়। সাধারণতঃ পায়ে এ রোগ হলে বলা হয় 'গোদ'; ইংরেজিতে বলে **এলিফেন্টিয়াসিস** (elephantiasis)।

ফাইলোট্যাক্সিস (phyllotaxis) — উদ্ভিদের কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখার গায়ে পত্রসজ্জা, বা পর্বে-পর্বে পত্রোদ্‌গমের বিন্যাস। **ফাইলো** (phyllo) মানে উদ্ভিদ-পত্র।

ফাইলোজেনেসিস (phylogenesis) — বংশগতি, বা বংশধারার বিকাশ; একে **ফাইলোজেনি** (phylogeny) ও বলে। **ফাইলন** (phylon) মানে পুরুষানুক্রম, বংশ-লতিকা। **ফাইলাম** (phylum) হলো জীব-জগতের মুখ্য শ্রেণী-বিভাগ; যেমন, অর্থোপোডা ↑, কর্ডাটা ↑ প্রভৃতি প্রাণী-গোষ্ঠি।

ফাউলারস্ সল্যুসন (Fowler's solution) — 'পটাসিয়াম আর্সেনাইট' নামক একটা রাসায়নিক পদার্থের জলীয় দ্রবের বিশেষ নাম; ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ফাঙ্গাস (fungus) — ছত্রাক; এক বিশেষ শ্রেণীর অতি ক্ষুদ্র উদ্ভিদ; এদের দেহে ক্লোরোফিল ↑, বা পত্র-হরিৎ থাকে না। কাজেই সাধারণ উদ্ভিদের মত পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্যে এরা ফোটোসিন্থেসিস ↑ প্রক্রিয়ায় শর্করা, বা শ্বেতসার খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে না। সাধারণতঃ কোন মৃত উদ্ভিদ, বা জীব-জন্তুর বিকৃত দেহাংশ আশ্রয় করে তা থেকে এরা পুষ্টি-রস সংগ্রহ করে বেঁচে থাকে। বহুবচনে **ফাঙ্গি** (fungi)।

ফাঙ্গিসাইড (fungicide) — ছত্রাক-ধ্বংসী বিষাক্ত পদার্থ; যে সব রাসায়নিক পদার্থ বিভিন্ন অনিষ্টকর ফ্যাঙ্গাস ↑ ধ্বংস করতে ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় জীবদেহের বিভিন্ন স্থানে

নানারকম অনিষ্টকর সূক্ষ্ম ফাঙ্গাস জন্মে দুরারোগ্য ক্ষত সৃষ্টি করে। 'ফাঙ্গিসাইড' জাতীয় বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ এদের বিনষ্ট করে।

ফার্ণ (fern) — শৈবাল শ্রেণীর এক জাতীয় অপুষ্পক উদ্ভিদ (ক্রিপ্টোগ্যাম ↑)। পুষ্পহীন উদ্ভিদ বলে এদের কোন বীজ উৎপত্তি ঘটে না ; এ-জাতীয় উদ্ভিদের স্বকীয় দেহাভ্যন্তরস্থ পুং-কোষ ও স্ত্রী-কোষ স্বতঃ-নিষিক্ত হয়ে নূতন উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

'ফার্ণ' জাতীয় উদ্ভিদ

ফার্মেণ্টেশন (fermentation) — গাঁজন ক্রিয়া ; বিভিন্ন জৈব পদার্থে ঈস্ট ↑ , ব্যাক্টেরিয়া ↑ প্রভৃতি থেকে নিঃসৃত বিশেষ-বিশেষ এঞ্জাইম ↑ পদার্থের প্রভাবে যে বিশেষ রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। যে সকল এঞ্জাইম ↑ পদার্থ এই গাঁজন, বা ফার্মেণ্টেশন ক্রিয়া ঘটায় তাদের বলা হয় **ফার্মেণ্ট**। বিভিন্ন শর্করা জাতীয় পদার্থের জলীয় দ্রবে 'জাইম্‌স' ↑ নামক বিশেষ এক রকম এঞ্জাইমের (ঈষ্ট ↑) প্রভাবে এরূপ রাসায়নিক রূপান্তর (ফার্মেণ্টশন) ঘটে থাকে। বিভিন্ন এঞ্জাইম বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় মূলতঃ ক্যাটালিস্টের ↑ কাজ করে। এই প্রক্রিয়ায় চিনির জলীয় দ্রব গাঁজিয়ে অ্যালকোহল ↑ প্রস্তুত করা হয় এবং কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস বেরোয় : $C_6H_{12}O_6$ (চিনি)= $2C_2H_5OH$ (অ্যালকোহল ↑)+ $2\ CO_2$ (কার্বন-ডাইঅক্সাইড)।

ফার্মি (Fermi), এন্‌রিকো — ইটালীয় পদার্থ-বিজ্ঞানী ; জন্ম 1901 খৃস্টাব্দ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ফ্যাসিস্ট ইটালী ত্যাগ ও আমেরিকায় বসতি স্থাপন। ভারীজল (হেভি ওয়াটার ↑) সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক গবেষণা। ধীরগতি নিউট্রন ↑ কণিকার সংঘাতে ইউরেনিয়ামধাতুর আইসোটোপের ↑ পরমাণু-বিভাজনে যে বিপুল শক্তির উদ্ভব হয়, তদ্বিষয়ক তত্ত্ব আবিষ্কারেই প্রসিদ্ধি। এই তত্ত্বের ভিত্তিতেই প্রথম 'অ্যাটম বম্‌ব' ↑ উদ্ভাবিত হয়। 1938 খৃস্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভ।

ফারেন্‌হিট (Fahrenheit)— জার্মান পদার্থ-বিজ্ঞানী ; জন্ম 1696 খৃঃ, মৃত্যু 1736 খৃঃ। উষ্ণতার মাত্রা নির্ধারণের উপযোগী এক নূতন পদ্ধতিতে তাপমান যন্ত্র উদ্ভাবন ; যা তাঁর নামানুসারে 'ফারেনহিট থার্মোমিটার ↑ ' নামে পরিচিত ; যাতে হিমাংক 32° ডিগ্রি ও স্ফুটনাংক 212° ডিগ্রিতে চিহ্নিত থাকে, মধ্যবর্তী ব্যবধান 180 সমভাগে (ডিগ্রিতে) বিভক্ত। এরূপ তাপমাত্রা অবশ্য নিউটনের ↑ পরিকল্পিত ; কিন্তু ফারেন্‌হিট কর্তৃক এর কার্যতঃ প্রয়োগ ও যন্ত্র নির্মাণ।

ফারেনহিট ডিগ্রি (Fahrenheit degree) — উষ্ণতা পরিমাপের একটি একক বিশেষ। কোন পদার্থের উষ্ণতা, বা তাপমাত্রা পরিমাপের জন্যে প্রধানতঃ তিন রকম একক ব্যবহৃত হয়, — ফারেনহিট, রুমার ↑ ও সেন্টিগ্রেড ↑ ডিগ্রি। বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক চাপে (760 মিলিমিটার,

ব্যারোমিটার ↑) জলের হিমাংক ও স্ফুটনাংক উষ্ণতায় পারদ-স্তম্ভের উচ্চতা বৃদ্ধির ব্যবধানের 180 ভাগের এক ভাগকে 'ফারেন্‌হিট' ডিগ্রি ধরা হয়। এই ফারেন্‌হিট স্কেলে জলের হিমাংক (সেন্টিগ্রেড ↑ স্কেলের মত) 0° শূন্য ডিগ্রি না ধরে ধরা হয় 32°F; সুতরাং এই স্কেলে স্ফুটনাংক হবে 32° + 180° = 212°F ; কাজেই ফারেন্‌হিট ডিগ্রিতে সেন্টিগ্রেড ↑ ডিগ্রির চেয়ে অনেকটা কম উষ্ণতা নির্দেশ করে ; এক ফারেনহিট ডিগ্রি = 5/6 সেন্টিগ্রেড ডিগ্রি।

ফারমাকোলজি (pharmacology) — জীবদেহের উপর বিভিন্ন রোগে বিভিন্ন ঔষধের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও তাদের ভেষজ গুণ সম্পর্কীয় তথ্যাদির বিজ্ঞান ; চিকিৎসা-বিজ্ঞান।

ফার্টিলাইজার (fertilizer) — কৃত্রিম রাসায়নিক সার ; উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও পুষ্টির পক্ষে প্রয়োজনীয় যে-সব পদার্থ জমিতে সার হিসাবে দেওয়া হয়। নাইট্রোজেন ↑, ফসফরাস ↑, পটাসিয়াম ↑ প্রভৃতি উদ্ভিদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় অজৈব উপাদান ; কিন্তু এ-সব পদার্থ মৌলিক আকারে উদ্ভিদেরা সরাসরি গ্রহণ করতে পারে না। এজন্যে বিভিন্ন নাইট্রেট ও অ্যামোনিয়াম ↑ সল্ট, নাইট্রো-লাইম ↑, বিভিন্ন ফসফেট ↑, সুপার-ফসফেট ↑ এবং নানা রকম খনিজ পটাসিয়াম সল্ট প্রভৃতি কৃষি-জমিতে কৃত্রিম রাসায়নিক সার হিসেবে প্রদত্ত হয়ে থাকে। আবার, বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ পদার্থ পচিয়ে তৈরী জৈব-সার, অর্থাৎ কম্পোস্ট ↑ উৎকৃষ্ট সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যেও উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধির পক্ষে আবশ্যকীয় উক্ত রাসায়নিক উপাদানগুলি থাকে।

ফাল্‌ক্রাম (fulcrum) — যে বিন্দুর দু'ধারে লিভারের ↑ দণ্ডটি উপর-নিচে ওঠা-নামা করে। যান্ত্রিক সুবিধা লাভ করবার জন্যে লিভার ↑ ব্যবস্থায় সূক্ষ্মাগ্র কঠিন পদার্থের যে শীর্ষবিন্দুর উপরে লিভার-দণ্ড স্থাপন করা হয়ে থাকে।
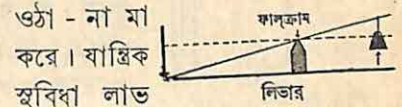
লিভারের ফাল্‌ক্র'ম

ফায়ার ড্যাম্প (fire damp) — কয়লার খনিতে যে-সব দাহ্য গ্যাসীয় পদার্থের সংমিশ্রণ বেরিয়ে অনেক সময় বায়ুর সংস্পর্শেও জলে ওঠে ও বিস্ফোরণ ঘটায়। এর মধ্যে প্রধানতঃ মিথেন (CH_4) ও অন্যান্য দাহ্য গ্যাসীয় হাইড্রোকার্বন ↑ থাকে। এ-গুলো বেরিয়ে খনি-গহ্বরের বায়ুর সঙ্গে মিশে যায় এবং সামান্য আগুনের সংস্পর্শ পেলে সহসা জলে উঠে বিস্ফোরণ ঘটায় ; আর সহসা সারা খনিতে সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে (ডেভি ল্যাম্প ↑)।

ফায়ার এক্‌ষ্টিঙ্গুইসার (fire extinguisher) — অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্র। বায়ুর অক্সিজেনের সংযোগেই আগুন জলে ; এ-জন্যে প্রজ্জলিত পদার্থকে বায়ু-সম্পর্কশূন্য করে অগ্নি-নির্বাপনের ব্যবস্থা করা হয়। একটা লম্বা ধাতব পাত্রের মধ্যে সোডিয়াম কার্বনেটের ↑

(Na_2CO_3) জলীয় দ্রব ভরতি থাকে এবং তার ভিতরে একটা ছোট কাচ-পাত্রে সালফিউরিক অ্যাসিড। (H_2SO_4) পৃথক ভাবে রক্ষিত হয়। প্রয়োজনের সময়ে কাচের পাত্রটার মুখে যান্ত্রিক ব্যবস্থায় চাপ দিলে ওই কাচ-পাত্র ভেঙ্গে সালফিউরিক অ্যাসিড বেরিয়ে এসে সোডিয়াম কার্বনেটের দ্রবের সঙ্গে মিশে যায়। উভয়ের রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে বদ্ধ পাত্রটার খোলের মধ্যে দ্রুত কার্বন-ডাইঅক্সাইড (CO_2) গ্যাস উৎপন্ন হতে থাকে। ভিতরের অত্যধিক চাপে ওই গ্যাস পাত্রের মুখের নল দিয়ে বেরিয়ে সবেগে প্রজ্জলিত পদার্থের গায়ে লাগে। কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস ভারী বলে জলন্ত জিনিসটার উপরিভাগ একটা গ্যাসীয় আবরণে আবৃত হয়ে পড়ে; যার ফলে বায়ুর সংস্রব-শূন্য হয়ে আগুন নিবে যায়। আর এক রকম ফায়ার-একৃষ্টিঙ্গুইসার যন্ত্রে কার্বন-টেট্রাক্লোরাইড (CCl_4) ব্যবহৃত হয়ে থাকে; পদার্থটাকে পাইরিন। ও বলা হয়।
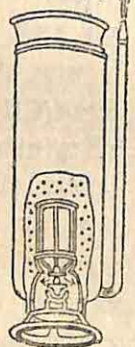
ফায়ার একৃষ্টিঙ্গুইসার

যন্ত্রটা যেভাবে কাজ করে

ফিউজ (fuse), (ইলেক্‌ট্রিক্যাল) — কোন তড়িৎ-চক্রের (সার্কিট।) মধ্যে নির্দিষ্ট বিভব অপেক্ষা উচ্চতর বিভবের তড়িৎ-প্রবাহের গতি রোধ করবার জন্যে ব্যবহৃত যান্ত্রিক কৌশল। এর জন্যে নিম্ন-গলনাংক বিশিষ্ট টিন, লেড প্রভৃতি ধাতু, বা কোন ফিউজিব্‌ল অ্যালয়ে। নির্মিত তার তড়িৎ-স্রোতের প্রবাহ-পথে স্থাপিত হয়। নির্দিষ্ট তড়িৎ-বিভব অপেক্ষা উচ্চতর বিভবের তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত হলেই উৎপন্ন তাপে উত্তপ্ত হয়ে ওই ধাতব তার গলে গিয়ে তড়িৎ-চক্র বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, সঙ্গে-সঙ্গে প্রবাহও বন্ধ হয়। এই কৌশলে বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রে, অথবা বাস-গৃহের বৈদ্যুতিক তারে আগুন লেগে যাওয়ার বিপদ নিবারিত হয়ে থাকে।
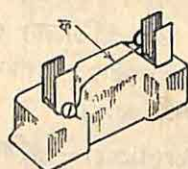
ইলেক্‌ট্রিক ফিউজ

ফিউজিব্‌ল অ্যালয় (fusible alloy) — অল্পতাপে গলনক্ষম সংকর-ধাতু; যে-সব সংকর-ধাতু অল্প তাপেই গলে যায়। বিস্‌মাথ, লেড, টিন, ক্যাড্‌মিয়াম প্রভৃতি নিম্ন-গলনাংকের ধাতুর বিভিন্নরূপ সংমিশ্রণে বিভিন্ন সংকর-ধাতু তৈরী হয়ে থাকে। এরূপ সংকর-ধাতুর বিশেষ নাম **উড্‌স**

মেটাল ↑ ; সাধারণতঃ 50% বিস্‌মাথ, 25% লেড, 12·5% টিন ও 12·5% ক্যাড্‌মিয়াম ধাতুর সংমিশ্রণে এটা তৈরী হয়। ইলেক্‌ট্রিক্যাল ফিউজে ↑ ও অগ্নি-নিরোধক যন্ত্রাদিতে বিশেষ ব্যবস্থায় এরূপ ধাতু-সংকরের তার ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ফিউমিগ্যাণ্ট (fumigant) — যে সকল পদার্থ জ্বালালে প্রচুর ধূম (ফিউম, fume) উৎপন্ন হয় এবং পোকা-মাকড় ধ্বংস করতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। **ফিউমিং অ্যাসিড** (fuming acid), ধূমায়িত অ্যাসিড ; যে-সকল গাঢ় অ্যাসিড থেকে ধূম উত্থিত হয়, তাদেরও ফিউমিগ্যাণ্ট বলা যায়।

ফিকস্‌ড অ্যাল্‌কালি (fixed alkali)—অনুদ্বায়ী (স্থির) ক্ষার পদার্থ ; পূর্বে সোডিয়াম কার্বনেট (Na_2CO_3) ও পটাসিয়াম কার্বনেট (K_2CO_3) নামক অ্যালকালি ↑ দু'টা এই নামে পরিচিত ছিল। পক্ষান্তরে অ্যামোনিয়াম কার্বনেট উদ্বায়ী বলে তাকে বলা হয় **ভোলাটাইল** ↑ অ্যালকালি।

ফিক্‌সড এয়ার (fixed air)—কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস, CO_2 ; বায়ুর মত অদৃশ্য, কিন্তু বায়ু অপেক্ষা ভারী গ্যাস বলে নিম্নস্থানে, বা গিরি-গহ্বরে আবদ্ধ হয়ে থাকে, এ-জন্যে কখন-কখন গ্যাসটা এই নামে অভিহিত হয়।

ফিক্সড স্টার (fixed star) — স্থির নক্ষত্র ; সেলেশ্চিয়াল স্ফিয়ারে ↑ যে-সব তারকার আপেক্ষিক অবস্থানের কোন পরিবর্তন হয় না বলে প্রতীয়মান হয় ; প্রকৃত-পক্ষে অবশ্য অসীম দূরত্বের জন্যেই তাদের পারস্পরিক অবস্থানের তারতম্য লক্ষিত হয় না। ধ্রুব-নক্ষত্র পৃথিবীর তুলনায় এরূপ একটি স্থির তারকার পর্যায়-ভুক্ত।

ফিক্সেসন অব নাইট্রোজেন (fixation of nitrogen) — বায়ুর নাইট্রোজেন-সংবন্ধন। বিভিন্ন পদার্থের সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনের রাসায়নিক সংযোগ ঘটিয়ে বিভিন্ন যৌগিক পদার্থে গ্যাসটি সংবদ্ধ হতে পারে। বায়ুর নাইট্রোজেনকে এভাবে ব্যবহারোপযোগী যৌগিকের মধ্যে আবদ্ধ করার প্রক্রিয়াকে বলে 'ফিক্সেসন অব নাইট্রোজেন'। খাদ্যের প্রোটিন ↑ উপাদান প্রস্তুতির জন্যে জীব-জগতের পক্ষে নানাভাবে নাইট্রোজেনের একান্ত দরকার, অথচ বায়ুমণ্ডল থেকে কোন জীবই সরাসরি নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে পারে না ; কাজেই নাইট্রোজেন গ্যাসকে যৌগে সংবদ্ধ করবার জন্যে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সাহায্য নিতে হয়। হাইড্রোজেনের সঙ্গে নাইট্রোজেনের মিলনে উৎপন্ন হয় অ্যামোনিয়া, NH_3 ; মেঘের তড়িৎ-স্ফুরণে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের রাসায়নিক মিলনে তৈরি হয় নাইট্রিক অক্সাইড, NO ; এ থেকে তৈরী হয় বিভিন্ন নাইট্রেট ও অ্যামোনিয়াম সল্ট ; যে-সব যৌগ জমির সাররূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কোন-কোন জীবাণুও আবার বায়ুর নাইট্রোজেন শোষণ করে জমির মাটিতে নাইট্রোজেন-ঘটিত বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি করে। এই সব

বিভিন্ন প্রক্রিয়ার ফলে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন গ্যাস যৌগিকের মধ্যে সংবদ্ধ হয় ; উদ্ভিদ ও প্রাণীর মাধ্যমে তা আবার ক্রমে বিমুক্ত হয়ে বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায় (নাইট্রোজেন সাইক্‌ল ↑)।

ফিজিওলজি (physiology)—শারীরবৃত্ত; শারীর-বিজ্ঞান। জীবদেহের আভ্যন্তরীণ গঠন, জৈবিক ক্রিয়াকাণ্ড ও যান্ত্রিক ব্যবস্থাদি সম্বন্ধীয় পরীক্ষামূলক তাত্ত্বিক বিজ্ঞান।

ফিজিওথেরাপি (physiotherapy)—জীবদেহের উপরে আলোক, উত্তাপ, তড়িৎ প্রভৃতি এক, বা একাধিক শক্তির প্রয়োগে কোন-কোন বিশেষ রোগের চিকিৎসা-পদ্ধতি।

ফিটাস (foetus)—মাতৃগর্ভস্থ পূর্ণাবয়ব শিশু; ভ্রূণের পূর্ণ পরিণত অবস্থা।

ফিটাস

ফিনল (phenol) — কার্বলিক অ্যাসিডের (C_6H_5OH) বিশেষ নাম; বর্ণহীন স্ফটিকাকার কঠিন পদার্থ, বিশেষ এক রকম তীব্র গন্ধযুক্ত। জলে দ্রবণীয়, অত্যন্ত বিষাক্ত, তীব্র অ্যাসিডশক্তি-সম্পন্ন; যাতে লাগে তা জ্বলে-ক্ষয়ে যায়। এর নিস্তেজ মৃদু জলীয় দ্রব জীবাণুনাশক ও জীবাণু-প্রতিরোধক পদার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে; এরূপ জলীয় দ্রবকে সাধারণতঃ 'কার্বলিক লোশন' বলে। কোন-কোন রঞ্জক পদার্থ ও প্ল্যাস্টিক ↑ তৈরির কাজে ফিনল একটি অপরিহার্য রাসায়নিক উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ফিনলপ্‌থেলিন (phenolhthalein) — সাদা ক্ষুদ্র স্ফটিকাকার রাসায়নিক পদার্থ, $C_{20}H_{14}O_4$; অত্যন্ত হালকা, অ্যালকোহলে ↑ দ্রবণীয়। রঞ্জন-শিল্পে দরকার হয় ; আবার ঔষধ হিসেবে জোলাপ রূপেও এর ব্যবহার আছে। অ্যাল্‌কালির ↑ সংস্পর্শে এর দ্রব লাল হয়ে যায় ; কিন্তু অ্যাসিডের সংস্পর্শে বর্ণহীন থাকে। এ-জন্যে কোন পদার্থ অ্যাল্‌কালি, না অ্যাসিড ধর্মী তা পরীক্ষা করবার জন্যে 'ইণ্ডিকেটর' হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ফিনাইল (phenyl) — (i) হাইড্রোকার্বন ↑ র‍্যাডিক্যাল C_6H_5 - এর রাসায়নিক নাম। বেঞ্জিনের ↑ (C_6H_6) একটি হাইড্রোজেন-পরমাণুর বিচ্যুতি ঘটিয়ে এই 'ফিনাইল' র‍্যাডিক্যাল পাওয়া যায়। এর সংযোগেই তৈরি হয় ফিনাইল্যামাইন, $C_6H_5NH_2$, যা অ্যানিলিন ↑ নামে পরিচিত। (ii) দুর্গন্ধনাশক ও বীজ-বারক পদার্থ হিসেবে আমরা বাজারের যে 'ফিনাইল' ব্যবহার করি, তা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস; রজন ও তেল ফুটিয়ে এক রকম তরল সাবান তৈরি করে তার মধ্যে ক্রিয়োজেট ↑ অয়েল মিশিয়ে সাধারণতঃ এই নিত্য ব্যবহার্য ফিনাইল তৈরি করা হয়ে থাকে।

ফিনোলজি (phenology) — উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর দৈহিক গঠন ও জীবন-

ধারার উপরে স্থানীয় প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জলবায়ুর প্রভাব সম্বন্ধীয় তাত্ত্বিক বিজ্ঞান।

ফিমোরাল (femoral) — জঙ্ঘাস্থি (ফিমার ↑) সম্বন্ধীয়; **ফিমার** (femur) হলো জঙ্ঘাস্থি, হাটুর উপরিভাগের দীর্ঘ পদাস্থি-খণ্ড।

ফিল্‌ট্রেশন (filtration) — তরল পদার্থের সঙ্গে মিশ্রিত সূক্ষ্ম কঠিন পদার্থাদি পৃথকীকরণের পদ্ধতি; যাকে বাংলায় বলে পরিস্রাবণ, বা 'ছেঁকে ফেলা'। ফিল্টার পেপার, বা কোন সূক্ষ্ম ছিদ্রবহুল পদার্থের মধ্য দিয়ে ছেঁকে তরল ও কঠিন অদ্রাব্য পদার্থের এরূপ পৃথকীকরণ সম্ভব হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় ফিল্‌ট্রেশন, বা পরিস্রাবণ; পরিস্রুত যে তরল পদার্থ পাওয়া যায়, তাকে বলে **ফিলট্রেট,** বা পরিস্রুৎ ↑; আর যে জিনিসের মধ্য দিয়ে ছাঁকা হয়, তাকে সাধারণতঃ বলা হয় 'ফিল্টার', বা পরিস্রাবক।
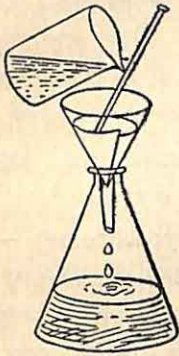
'ফিল্‌ট্রেশন' পদ্ধতি

ফিলামেণ্ট (filament)—সূক্ষ্ম তার। ইলেক্‌ট্রিক ল্যাম্প, রেডিও - ভাল্‌ব প্রভৃতির মধ্যে টাংস্টেন ↑ প্রভৃতি উচ্চ তাপসহ কোন ধাতুর তৈরী যে সরু তার থাকে। ওর মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহের ফলে ধাতব তারটা অত্যুত্তপ্ত ভাস্বর হয়ে আলোক ও উত্তাপ সৃষ্টি করে। পূর্বে কার্বনের ↑ তৈরী ফিলামেণ্ট ব্যবহৃত হোত, আজকাল সাধারণতঃ এরূপ ধাতব তার-ই ব্যবহৃত হয়।

ফিস্‌চুলা (fistula)— ভগন্দর রোগ; এ-রোগে মলদ্বারে ক্ষত হয়ে তার নালি-পথে মল-মূত্র নিঃসৃত হয়; বিশেষ যন্ত্রণাদায়ক দুরারোগ্য ব্যাধি।

ফিসন (fission) — বিভক্তিকরণ, বা বিভাজন প্রক্রিয়া। এককোষী অ্যামিবা ↑ প্রভৃতি কোন-কোন অতি ক্ষুদ্র প্রোটোজোয়া ↑ জীবের একক কোষটি ক্রমাগত দ্বিধা বিভক্ত হয়ে-হয়ে যে প্রক্রিয়ায় তারা বংশ বৃদ্ধি করে। আবার, তারকাদি জ্যোতিষ্কের দেহ-পিণ্ডও বিভিন্ন নৈসর্গিক কারণে কখন-কখন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়; এরূপ প্রক্রিয়াকেও 'ফিসন' বলা হয়। নিউ-ক্লিয়ার রিঅ্যাকশনের ↑ ফলে তেজ-স্ক্রিয় পদার্থের নিউক্লিয়াস যে-পদ্ধতিতে ভেঙ্গে পারমাণবিক শক্তি বিমুক্ত করা সম্ভব হয়ে থাকে (অ্যাটম বম্‌ব ↑); বিশেষতঃ সেই প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'নিউক্লিয়ার ফিসন' ↑।

ফিসার, হান্‌স (Fischer, Hans) — জার্মান রসায়ন- বিজ্ঞানী ; জন্ম 1881 খৃঃ, মৃত্যু 1945 খৃঃ। রক্তের রাসায়-নিক গঠন ও ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে মূল্যবান গবেষণা। রক্তের লোহিত কণিকার রঞ্জক-পদার্থ হিমোগ্লোবিন ↑ আবিষ্কারের কৃতিত্বের জন্য 1930 খৃস্টাব্দে 'নোবেল পুরস্কার' লাভ।

ফিসিপেড (fissiped) — পৃথক-পৃথক পদাঙ্গুলীবিশিষ্ট প্রাণী ; যেমন মানুষ, কুকুর, বিড়াল, পাখী প্রভৃতি। ঘোড়া, গোরুর মত সবগুলি অঙ্গুলী খুরের

আকারে একসঙ্গে-যুক্ত প্রাণীদের বলে **ইউনিপেড** (uniped)।

ফেব্রিফিউজ (febrifuge) — জ্বরের ঔষধ; যে-সব ঔষধ জ্বরের তাপ কমায়। **ফেব্রাইল** মানে 'জ্বর সম্বন্ধীয়'।

ফেরাইট (ferrite) — ইস্পাত (স্টিল ↑), বা ঢালাই লোহার (কাস্ট আয়রন ↑) মধ্যে বিন্যস্ত সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ লৌহ-কণিকা; যেগুলি অনেকটা নরম ও প্রসার্য্য। ইস্পাতের গঠনে কার্বনের ভাগ যত বাড়ে স্বভাবতঃই এই ফেরাইটের ভাগ তত কমে যায়।

ফেরাস (ferrous) — লৌহ-ঘটিত এক শ্রেণীর সল্ট; যার মধ্যে লোহার পরমাণু বাইভ্যালেন্ট ↑ রূপে কাজ করে, অর্থাৎ এরূপ সল্টে লোহার প্রত্যেকটি পরমাণুর সঙ্গে দু'টি করে' মনোভ্যালেন্ট ↑ অ্যাসিড-র‍্যাডিক্যাল ↑ মিলিত হয়ে যৌগ গঠিত হয়, অর্থাৎ লৌহ-পরমাণু হয় বাইভ্যালেন্ট; যেমন—ফেরাস ক্লোরাইড, $FeCl_2$, ফেরাস সালফেট, $FeSO_4.7H_2O$, (SO_4 র‍্যাডিক্যালটি বাইভ্যালেন্ট), যাকে বলে 'গ্রিন ভিট্রিয়ল' ↑, বাংলায় 'হিরাকস' বলা হয়। ফেরাস সল্টগুলো সাধারণতঃ হাল্কা সবুজ বর্ণের হয়ে থাকে।

ফেরিক (ferric) — লৌহ-ঘটিত যে-সকল সল্টের, মধ্যে লোহার পরমাণুগুলো ট্রাইভ্যালেন্ট-রূপে কাজ করে, অর্থাৎ লোহার এক-একটি পরমাণু তিনটি করে' মনোভ্যালেন্ট অ্যাসিড-র‍্যাডিক্যালের সঙ্গে মিলিত হয়; যেমন — ফেরিক ক্লোরাইড, $FeCl_3$, $6H_2O$ (জলের ছয়টি অণু নিয়ে এর স্ফটিক গঠিত হয়)। ফেরিক সল্টগুলো সাধারণতঃ হলদে, বা পাট্‌কিলে বর্ণের স্ফটিকাকার হয়ে থাকে।

ফেরিক অ্যালাম (ferric alum) — লৌহ-ঘটিত ফিটকিরি (অ্যালাম ↑); অর্থাৎ ফেরিক পটাসিয়াম - সালফেট, $Fe_2(SO_4)_3.\ K_2SO_4.\ 24H_2O$; লোহার সালফেট ও পটাসিয়ামের সালফেট সল্ট দুটি মিলিতভাবে 24-অণু কেলাস-জল (ওয়াটার অব ক্রস্ট্যালিজেশন ↑) নিয়ে পদার্থটির স্ফটিক গঠিত হয়ে থাকে। স্ফটিকাকার সাধারণ অ্যালামের ↑ প্রায় অনুরূপ; কিন্তু এটা বেগুনী রঙের পদার্থ। একে 'আয়রন-অ্যালাম'-ও বলে।

ফেরোক্রোম (ferrochrome) — লোহা ও ক্রোমিয়ামের ↑ সংকর-ধাতু; এর মধ্যে 30% থেকে 40% লোহা থাকে। ক্রোমাইট ↑ নামক লৌহ-আকরিকের সঙ্গে প্রয়োজনানুরূপ কার্বন মিশিয়ে ইলেক্‌ট্রিক ফার্নেসে উত্তপ্ত করে তৈরি হয়।

ফেরো-কংক্রিট (ferro-concrete) — লোহার রডের সঙ্গে সিমেণ্ট ↑ জমিয়ে বাড়ী তৈরির এক রকম পদ্ধতি। বড় বড় অট্টালিকা সুদৃঢ় করবার জন্যে যে ব্যবস্থায় লোহার কাঠামোর সঙ্গে সিমেণ্ট জমানো হয়; যাতে উভয়ের এক রকম রাসায়নিক সংযোগ ঘটে গাঁথুনির দৃঢ়তা বাড়ে।

ফেরোম্যাগ্নেটিক (ferromagnetic) — লোহার মত অন্যান্য যে-সব ধাতব পদার্থকে সহজে চুম্বকে (ম্যাগনেট ↑) পরিণত করা যায়; যেমন — নিকেল, কোবাল্ট ↑ ও কতকগুলি ধাতুসংকর

(অ্যালয় ↑)। চৌম্বক ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিলে, বা চুম্বকায়ন প্রক্রিয়া বন্ধ করলে এ-গুলির চৌম্বক-শক্তি কিছু হ্রাস পায়, অনেকটা থেকে যায়; কিন্তু বিশেষ একটা তাপ-মাত্রায় (কুরি টেম্পারেচার ↑) এ-সব ধাতু চৌম্বকত্ব সম্পূর্ণ হারায়। এরূপ চৌম্বক-বৈশিষ্ট্য এই শ্রেণীর ধাতুগুলির পারমাণবিক গঠন ও সংকর-ধাতুর ক্ষেত্রে আণবিক সংস্থানের পরিবর্তনশীলতার ফল।

ফেরোম্যাঙ্গানিজ (ferro-manganese) — লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজ ধাতু-দ্বয়ের বিশেষ আনুপাতিক (30%+70%) সংযোগে গঠিত এক বিশেষ ধরনের ধাতু-সংকর।

ফেলস্পার (felspar) — এক রকম প্রস্তর বিশেষ; এটা প্রধানতঃ সোডিয়াম, বা পটাসিয়ামের অ্যালুমিনো-সিলিকেটে ↑ গঠিত। একে কখন-কখন **ফেল্‌ডস্পার**-ও বলা হয়। প্রাকৃতিক গ্রানাইট ↑ প্রভৃতি সুকঠিন প্রস্তরের মূল ও মুখ্য উপাদান।

ফেল্ট (felt) — পশমের তৈরী মোটা বস্ত্র বিশেষ; এটা বোনা হয় না, যন্ত্র-সাহায্যে পশম চেপে তৈরি হয়।

ফোকাস (focus)—কোন লেন্সের ↑ ভিতর দিয়ে প্রতিসরিত, অথবা দর্পণে
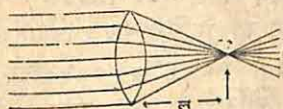
লেন্সের 'ফোকাস' বিন্দু

প্রতিফলিত হয়ে দূরাগত সমান্তরাল আলোক-রশ্মিসমূহ যে বিন্দুতে এসে সংহত হয়, অথবা সংহত হচ্ছে বলে মনে হয়। সূর্য-রশ্মির দিকে মুখ করে একখানা উত্তল (কন্‌ভেক্স ↑) লেন্স ধরলে কিছু দূরে একটা তীব্র আলোক-বিন্দু সৃষ্টি হয়, এটা হলো ওই লেন্সের ফোকাস। লেন্স, বা দর্পণের কেন্দ্র থেকে এই ফোকাস-বিন্দুর দূরত্বকে বলে **ফোক্যাল লেংথ**। কেবল আলোক-রশ্মিই নয়, উপযুক্ত কৌশলে এক্স-রশ্মি, গামা-রশ্মি ↑ প্রভৃতি সব রকম রশ্মিকেই এভাবে একটি বিন্দুতে সংহত, বা কেন্দ্রীভূত করে 'ফোকাস' সৃষ্টি করা যেতে পারে।

ফোটন (photon) — ফোটো-ইলেক্‌ট্রিক এফেক্ট ↑ প্রভৃতির ব্যাখ্যায় আলোককে তরঙ্গ-ধর্মী বলে মনে করা যায় না, আলোক তখন কণিকা-ধর্মী (corpuscular) বলে প্রতিভাত হয়। এরূপ অবস্থায় আলোকের সংগঠক ওই কণিকাগুলোকে 'ফোটন' নাম দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, আলোক-রশ্মির প্রত্যেকটি ফোটন-কণিকায় অতি সামান্য, অথচ সুনির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি নিহিত থাকে; —এই শক্তিকে বলা হয় আলোকের 'র‍্যাডিয়েন্ট এনার্জি ↑। তরঙ্গ-ধর্মের বিচারে আবার বিভিন্ন আলোক-তরঙ্গের বিভিন্ন স্পন্দন-সংখ্যার উপরে তার এই বিকিরণ-শক্তির পরিমাণ নির্ভর করে।

ফোটো-ইলেক্‌ট্রিক সেল (photo-electric cell) — আলোক-রশ্মির প্রভাবে তড়িৎ উৎপাদন করবার এক রকম বিশেষ সেল ↑; যার ক্যাথোডের ↑ গায়ে সিজিয়াম ↑, ক্যাড্‌মিয়াম ↑

প্রভৃতি আলোক-সংবেদী কোন একটি পদার্থের যে-কোন সল্ট মাখানো থাকে। আলোক-রশ্মি পড়লে ওই ক্যাথোড ↑ থেকে ইলেক্ট্রনের সূক্ষ্ম ধারাপ্রবাহ
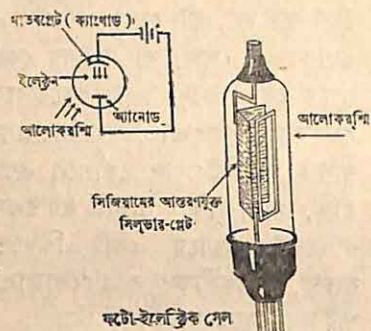
ফটো-ইলেক্ট্রিক সেল

অ্যানোডের ↑ দিকে চলতে থাকে; যার ফলে সেলের মধ্যে তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত হতে থাকে। আলোক-পাতের সঙ্গে-সঙ্গে এই তড়িৎ-প্রবাহ সুরু হয়, আর আলোক-পাত বন্ধ করলেই তড়িৎ-প্রবাহও বন্ধ হয়ে যায়। এক রকম বিশেষ ধরনের বায়ুশূন্য কাঁচ-নলের মধ্যে এরূপ সেল তৈরি হয়ে থাকে। সবাক্ আলোক-চিত্রে (টকি ফিল্ম) এরূপ ফোটো-ইলেক্ট্রিক সেল বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। আবার, বিশেষ এক ধরনের ফোটোগ্রাফি ↑, ফায়ার এলার্ম ↑ প্রভৃতির যান্ত্রিক ব্যব-স্থায় প্রয়োজনীয় আলোকের পরিমাণ নির্ধারণের জন্তেও এরূপ সেল অনেক সময় ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ফোটোগ্রাফি (photography) — ক্যামেরা ↑ যন্ত্রে বিশেষ ধরনের প্লেট, বা ফিল্মের ↑ উপরে কোন বস্তু থেকে প্রতিফলিত আলোক-রশ্মির রাসায়-নিক প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে প্রতিবিম্ব ফুটিয়ে তুলে তার হুবহু ছবি তোল-বার কৌশল। ক্যামেরার অ্যাপার-চারে ↑ সংলগ্ন লেন্সের মধ্য দিয়ে কোন বস্তু থেকে প্রতিফলিত আলোক-রশ্মি যন্ত্রের অন্ধকার অভ্যন্তরে রক্ষিত প্লেট, বা ফিল্মের উপর পড়ে। কাঁচ, সেলুলয়েড ↑, বা অপর কোন স্বচ্ছ পদার্থে এই ফোটোগ্রাফিক প্লেট, বা ফিল্ম তৈরি; যার উপরে সিলভার-ব্রোমাইড ($AgBr$), বা সিলভার-ক্লোরাইডের ($AgCl$) আস্তরণ দেওয়া থাকে। বস্তুর প্রতিফলিত আলোক-রশ্মি এসে এর উপর পড়লে রাসায়-নিক বিক্রিয়ার ফলে প্লেটের ওই আস্তরণের সিলভার ক্লোরাইড, অথবা ব্রোমাইডের কণিকাগুলো আলোর তীব্রতা অনুযায়ী কম-বেশী কালো হয়ে যায়। এভাবে, যে বস্তুর ছবি তোলা হবে তা থেকে প্রতিফলিত আলোক-রশ্মির আলো-ছায়ার তার-তম্য অনুসারে প্লেটের উপরে বস্তুটার একটা আব্ছা উল্টো প্রতিচ্ছবি (নেগেটিভ ইমেজ ↑) প্রায় অদৃশ্যভাবে মুদ্রিত হয়ে পড়ে। **ডেভেলপিং**-এর প্রক্রিয়ায় ওই ছবি পরিস্ফুট করে তোলা হয়। পরে অন্ধকার স্থানে নিয়ে প্লেটটাকে সোডিয়াম হাইপো-সালফেট (সোডিয়াম থায়োসাল্ফেট, $Na_2S_2O_3$; সাধারণতঃ যে-সল্টটা **'হাইপো'** ↑ নামে পরিচিত) নামক একটা রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে স্থায়ী করা হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় **ফিক্সিং**। এর পরে প্লেটটাকে জলে ধুয়ে অতিরিক্ত 'হাইপো' দূর করা হয়। এখন এই পরিষ্কৃত প্লেটটা শুকিয়ে নিয়ে সিলভার সল্ট-মাখানো

বিশেষ এক রকম কাগজের উপর চেপে আলোতে কিছুক্ষণ রেখে দেওয়া হয়। এর ফলে প্লেটের উল্টো প্রতিচ্ছবিটা পুনরায় উল্টে গিয়ে কাগজের উপরে বস্তুটার প্রকৃত প্রতিচ্ছবিটা ফুটে উঠে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় **ফোটোপ্রিন্টিং**। মোটামুটি এই হলো সাধারণ ফোটোগ্রাফির কৌশল।

ফোটোমিটার (photometer) — বিভিন্ন সব আলোক-রশ্মির ঔজ্জ্বল্য তুলনামূলকভাবে স্থির করবার জন্যে যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। এতে অবশ্য উজ্জ্বল্যের পরিমাণ স্থির করা যায় না; বিভিন্ন আলোক-উৎসের ঔজ্জ্বল্য এ-যন্ত্রে ক্যাণ্ডেলা ↑ এককের পরিমাপে তুলনা করা যায় মাত্র।

ফোটোসিন্থেসিস (photo-synthesis) — সালোকসংশ্লেষ। উদ্ভিদের সবুজ পাতায় ক্লোরোফিল ↑ (পত্র-হরিৎ) নামক সবুজ বর্ণের এক রকম সূক্ষ্ম কণিকা থাকে। এই ক্লোরোফিল সূর্য-কিরণের প্রভাবে বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন-ডাইঅক্সাইড ও জলীয় বাষ্প টেনে নিয়ে যে প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদেরা পত্রাভ্যন্তরে কার্বোহাইড্রেট ↑ খাদ্য প্রস্তুত করে, তাকেই বলে ফোটোসিন্থেসিস। এভাবে উৎপন্ন কার্বোহাইড্রেট, বা শর্করা আত্মসাৎ করেই উদ্ভিদ-দেহ পরিপুষ্ট ও বর্ধিত হয়। ফোটো-সিন্থেসিসের মূল রাসায়নিক বিক্রিয়াটি নিম্নলিখিত সমীকরণ অনুসারে সংঘটিত হয়: $6CO_2 + 6H_2O = C_6H_{12}O_6 + 6O_2$। এভাবে উৎপন্ন কার্বোহাইড্রেট, অর্থাৎ শর্করার ($C_6H_{12}O_6$), জলীয় দ্রবণ উদ্ভিদ-দেহের প্রতিটি কোষে প্রবাহিত হয়ে যায় এবং তাহার কার্বনাংশ আত্মসাৎ করে উদ্ভিদের-দেহ পুষ্ট হয়, আর উদ্বৃত্ত অক্সিজেন আবার বায়ুমণ্ডলে মিশে যায়। উদ্ভিদের ক্লোরোফিল (পত্র-হরিৎ) এই জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বস্তুতঃ ক্যাটালিস্টের ↑ কাজ করে মাত্র।

ফোটোফোবিয়া (photophobia) — আলোক-বিমুখতা, রোগ বিশেষ। চোখের যে অবস্থায় আলোক সহ্য হয় না, রোগী আতঙ্কে চোখ বোজে, বা আলোক থেকে চোখ ফিরিয়ে আনে। চক্ষু-গোলকের প্রদাহ ও হাম (মিজ্‌ল্‌স ↑, measles) প্রভৃতি রোগের ফলে অনেক সময় এরূপ হয়ে থাকে।

ফোটোস্ফিয়ার (photosphere) — সূর্য-গোলক একটা জলন্ত গ্যাস-পিণ্ড বলে প্রতিভাত হয়। এই গ্যাস-পিণ্ডের বহিস্থ অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিঃমণ্ডল, যা আমরা দেখতে পাই, তাকে বলা হয় ফোটোস্ফিয়ার। সৌর দেহের উপরি-ভাগের বিভিন্ন হাল্‌কা গ্যাসের প্রদীপ্ত ও অত্যুজ্জ্বল পরিমণ্ডলটাই হলো সূর্যের ফোটোস্ফিয়ার; এর উত্তাপ প্রায় ছ'হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।

ফোর্টিনস্ ব্যারোমিটার (Fortin's barometer) — বিশেষ এক প্রকার বায়ু-চাপমান যন্ত্র (ব্যারোমিটার ↑)। এরূপ ব্যারোমিটারের স্কেল স্থির থাকে, তলদেশে সংলগ্ন একটা স্ক্রু ঘুরিয়ে ভিতরের পারা-স্তম্ভ ওই স্কেলের শূন্য-বিন্দুতে আনা হয়। এই

ব্যবস্থায় বায়ুমণ্ডলের চাপ নির্ণয়ের জন্যে এক রকম সংশোধন-তালিকা থাকে ; যা থেকে হিসাব করে এই যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন সময়ে বায়ুমণ্ডলীয় চাপের পরিবর্তন সঠিকভাবে নিরূপণ করা যেতে পারে।

…**ফোবিয়া** (phobia) — ভীতি, আতঙ্ক; যেমন **ফোটোফোবিয়া** ↑। **হাইড্রোফোবিয়া** ↑ হলো 'জলাতঙ্ক' নামক রোগ বিশেষ ; ক্ষিপ্ত কুকুরের দংশনের ফলে যে-রোগ হয়।

…**ফোরেসিস** (…phoresis) — তড়িৎ-প্রভাবে কোলয়ড্যাল ↑ দ্রবণের মধ্যে ভাসমান অতি সূক্ষ্ম পদার্থ-কণিকাসমূহের সঞ্চলন-শীলতা; যেমন, **ক্যাটাফোরেসিস** হলো ইলেকট্রোলিসিস ↑ প্রক্রিয়ায় ধন-তড়িতাবিষ্ট পদার্থ - কণিকাগুলোর ঋণ - তড়িৎ প্রান্তের (ক্যাথোড ↑) দিকে গতিশীলতা ; অনুরূপ আবার, **অ্যানাফোরেসিস** হলো ঋণ - তড়িতাবিষ্ট কণিকার ধন-তড়িৎ প্রান্তের, অর্থাৎ অ্যানোডের ↑ অভিমুখী ধারা-প্রবাহ।

ফোলিক অ্যাসিড (folic acid) — কোন - কোন উদ্ভিদের সবুজ-পত্রে, এবং প্রাণীর যকৃতে ও ঈস্টে ↑ যে অ্যাসিডটি অতি সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায় ; একটি বিশেষ জৈব অম্ল পদার্থ। সাধারণতঃ এটা 'ভিটামিন বি' নামে পরিচিত। অবশ্য অনুরূপ অনেকগুলি জৈব অ্যাসিড-যৌগও এই নামে আখ্যাত। পদার্থটি জীবদেহের রক্ত ও মাংসের কোষ-সংখ্যা বৃদ্ধি (কোষ-বিভাজন) করতে ও দেহে জীবাণুর (ব্যাক্টিরিয়া ↑) সংখ্যাবৃদ্ধি রোধ করতে সহায়তা করে। ভিটামিন ↑, বা 'খাদ্য-প্রাণ' হিসেবে এটা সাধারণ স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় ; রক্তশূন্যতা (অ্যানিমিয়া ↑) রোগে ঔষধ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।

ফোসিল (fossil)—জীবাশ্ম ; অতীত যুগের উদ্ভিদ, বা প্রাণিদেহের (বা তাদের অংশ বিশেষের) প্রস্তরীভূত অবশেষ, অথবা পর্বতগাত্রে তাদের কঙ্কালের ছাপ। এ-সবের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রাচীন যুগের প্রাণী ও জীব-জগতের বহু অজ্ঞাত তথ্য জানা যায়।

ফুকোজ পেণ্ডুলাম (Foucault's pendulum) — প্রকাণ্ড এক রকম দোলক-যন্ত্র, বা পেণ্ডুলাম ↑ ; যাতে ভারী একটা ধাতব গোলক খুব লম্বা ও সরু তারে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, আর সেটা দুলিয়ে দিলে গোলকটা এ-দিকে - ওদিকে দুলতে থাকে। পক্ষান্তরে আবার পৃথিবীর আহ্নিক গতির ফলে ভূ-পৃষ্ঠ নিয়ত ঘুরে যাচ্ছে ; যার ফলে এরূপ পেণ্ডুলাম দুলিয়ে দেওয়ার কিছু সময় পরেই দেখা যায়, গোলকটার দোলন-পথের দিক ক্রমে পরিবর্তিত হচ্ছে। গোলক-পিণ্ডটার নিচে একটা লম্বা কাঁটা সংলগ্ন করে নিয়ে এবং তলদেশে বালি ছড়িয়ে
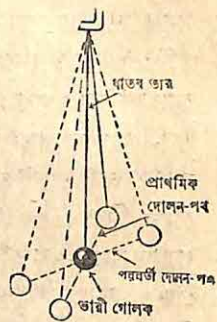
ফুকোজ পেণ্ডুলাম

(যার উপরে ওই কাঁটাটা দাগ কাটতে পারে, এমনভাবে) গোলকটা ছুলিয়ে দিলে, বালির উপরে কাঁটাটার দাগ অঙ্কিত হতে থাকে। এই দাগ দেখে গোলকটার দোলন-পথের পরিবর্তন স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। ভূ-পৃষ্ঠ ক্রমে ঘুরে যাচ্ছে বলে ওই দাগ ক্রমাগত সরে বেঁকে যায়, এক থাকে না। সুদীর্ঘ তারে বাঁধা-দোলকটার ভূ-লম্ব মোটামুটি একই থাকে, কিন্তু তল-দেশের ভূ-পৃষ্ঠ ঘুরে যায়; এর ফলে গোলকটার দোলন-পথ এরূপ দৃশ্যতঃ বদলে যায়। এ-থেকে পৃথিবী যে ঘুরছে তা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। এরূপ দোলকের দোলন-রজ্জু অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ বলে তার ভূ-লম্ব মোটামুটি স্থির থাকে। এর কার্যকারিতা কতকটা জাইরোস্কোপের ↑ সঙ্গে তুলনীয়।

ফুট-পাউণ্ড (foot-pound) — কার্য, বা শক্তির একক বিশেষ। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির (ফোর্স অব গ্র্যাভিটি ↑) বিরুদ্ধে এক পাউণ্ড ভরের কোন বস্তু এক ফুট উঁচুতে তুলতে যে পরিমাণ শক্তি ব্যয়িত হয়। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিরুদ্ধে এরূপ বল-শক্তি (ফোর্স ↑) প্রয়োগের ফলে নিষ্পন্ন যে-কোন কার্য (ওয়ার্ক ↑) পরিমাপের ইংলণ্ডীয় একক হলো 'ফুট-পাউণ্ড'।

ফুট-পাউণ্ড্যাল (foot-poundal) — ফুট, পাউণ্ড, সেকেণ্ডের এককে কার্য, বা শক্তির একটা একক পরিমাণ। এক পাউণ্ড্যাল ↑ বল-শক্তির (ফোর্স) প্রভাবে কোন বস্তুকে এক ফুট দূরত্বে স্থানান্তরিত করতে যে পরিমাণ কার্য (ওয়ার্ক ↑) সম্পন্ন হয়। সি. জি. এস. এককের হিসেবে এরূপ শক্তির একক হলো আর্গ ↑; পরিমাণের হিসেবে এক জুল ↑ $= 10^7$ আর্গ।

ফুল্‌মিনেট অব মার্কারি (fulminate of mercury) — মারকিউরিক আইসো-সায়েনেটের $Hg(OCN)_2$, বিশেষ নাম; পার- ও হাইড্রো-সায়েনিক ↑ অ্যাসিডদ্বয়ের রাসায়নিক মিলনের ফলে উৎপন্ন এক রকম সল্ট। বিস্ফোরক পদার্থ; মৃদু আঘাতেই এটা সশব্দে অতি দ্রুত বিস্ফোরিত হয়। সাধারণতঃ এর সাহায্যে গান পাউডার ↑ প্রভৃতি বিস্ফোরক পদার্থের বিস্ফোরণ ঘটানো হয়ে থাকে।

ফুলার্স আর্থ (Fuller's earth) — মৃত্তিকা-সদৃশ এক শ্রেণীর খনিজ পদার্থ; তৈল ও চর্বি জাতীয় জিনিস শুষে নেবার এর বিশেষ ক্ষমতা আছে। এ-জন্যে বস্ত্র শিল্পে, এবং তৈল ও চর্বি শোধনের কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পদার্থটা প্রধানতঃ ম্যাগ্নেসিয়াম ↑, ক্যালসিয়াম ↑, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতুর সিলিকেট ↑ যৌগের মিশ্রণ।

ফ্যাক্‌টর (factor) — গুণনীয়ক; কোন সংখ্যার বিভাজক রাশিগুলি, অথবা যে-সব সংখ্যা গুণ করলে সেই রাশিটি হয়; যেমন — $3 \times 7 = 21$, এখানে 7 ও 3 হলো 21-এর ফ্যাক্‌টর, বা গুণনীয়ক রাশি।

ফ্যাক্‌টিস (factice)—উদ্ভিজ্জ তেলের সঙ্গে রাবারের ↑ সংমিশ্রণে গঠিত বিশেষ একটা আঠালো পদার্থ; বর্ষাতির কাপড় জল-রোধক করতে যে পদার্থ সচরাচর ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ফ্যাগোসাইট (phagocyte) — রক্তের শ্বেতকণিকা ; রক্তের সংগঠক যে-সব কোষ বহিরাগত রোগ-জীবাণুদের (ব্যাক্টেরিয়া ↑ প্রভৃতি) ধ্বংস করে ; **'ফ্যাগো'** (phago) মানে ভক্ষণ, বা ধ্বংসকারী। আবার এই অর্থে **'ফাজ'** (phage) শব্দও ব্যবহৃত হয়ে থাকে ; যেমন, **ব্যাক্‌ট্রিয়োফাজ** (bacteriophage) হলো ব্যাক্‌টেরিয়া - ধ্বংসকারী জীবকণা ; যেমন, কোন-কোন ভাইরাস ↑।

ফ্যাট (fat) — জান্তব চর্বি ; বিভিন্ন ফ্যাটি অ্যাসিডের ↑ বিভিন্ন শ্রেণীর গ্লিসারাইড ↑ যৌগিকে গঠিত অর্ধ-কঠিন তৈলাক্ত জৈব পদার্থ। বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ তৈল অবশ্য বিভিন্ন ফ্যাটি অ্যাসিডের গ্লিসারাইড যৌগ হলেও এ-গুলো সাধারণতঃ তরল অবস্থায়ই থাকে ; এদের বলে 'অয়েল', ফ্যাট নয়। যদিও রাসায়নিক হিসেবে উভয়েই সম পর্যায়ভুক্ত। পক্ষান্তরে, পেট্রল ↑, কেরোসিন ↑ প্রভৃতি খনিজ তেলগুলো সব স্বভাবজাত অজৈব তরল হাইড্রোকার্বন ↑ মাত্র, জৈব গ্লিসারাইড যৌগ নয়।

ফ্যাটি অ্যাসিড (fatty acid) — এক শ্রেণীর জৈব অ্যাসিড ; যেমন, স্টিয়ারিক ↑, অলেয়িক ও পামেটিক ↑ অ্যাসিড। এদের বিভিন্ন প্রকার স্বভাবজাত গ্লিসারাইড ↑ যৌগই হলো জান্তব চর্বি ও উদ্ভিজ্জ তৈল। ফ্যাটি অ্যাসিডের সাধারণ ফর্মুলা হলো R.COOH ; এর মধ্যে 'R' হলো কোন জটিল হাইড্রোকার্বনের, বা কেবলমাত্র হাইড্রোজেনের বিভিন্ন সংখ্যক অণু, আর COOH হলো এর স্থায়ী অ্যাসিড র‍্যাডিক্যাল ↑ ; যেমন, — স্টিয়ারিক অ্যাসিড, $CH_3(CH_2)_{16}COOH$; একটা ফ্যাটি অ্যাসিড। এর আবার তিনটা অণুর সঙ্গে গ্লিসারিন ↑ অণুর মিলনে গঠিত গ্লিসারাইড ↑ যৌগই হলো প্রাণি-দেহের চর্বি। বিভিন্ন চর্বি ও তেলের উপাদান হিসেবে গ্লিসারাইডের আকারে বিভিন্ন শ্রেণীর স্বভাবজাত ফ্যাটি অ্যাসিডগুলো পাওয়া যায়।

ফ্যাদম (fathom)—সমুদ্রজলের গভীরতা মাপবার জন্যে ব্যবহৃত দৈর্ঘ্যের একক বিশেষ ; 6 ফুট = এক ফ্যাদম।

ফ্যাদোমিটার (fathometer)—যে যন্ত্রের সাহায্যে সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় করা যায়। জলের উপরিভাগে সৃষ্ট কোন শব্দ জলরাশি ভেদ করে গিয়ে সমুদ্রের তলদেশ থেকে প্রতি-ধ্বনিত হয়ে ফিরে আসতে যে সময় লাগে, তা এই যন্ত্রে নির্ণীত হয়। জলের মাধ্যমে শব্দ-তরঙ্গের গতি জানলে এই সময় পরিমাণ থেকে হিসাব করে জলের গভীরতা সহজেই জানা যেতে পারে।

ফ্যারাড (farad) — কণ্ডেন্সারের ↑ তড়িৎ-শক্তির ধারণ-ক্ষমতা পরিমাপের একক বিশেষ। এক 'ফ্যারাড' তড়িৎ-ধারণক্ষম কণ্ডেন্সারে এক কুলম্ব ↑ তড়িৎ-শক্তি সঞ্চিত হয়ে থাকে, যদি সেই কণ্ডেন্সারের প্লেট দু'টির মধ্যে তড়িৎ-চাপ হয় মাত্র এক ভোল্ট ↑।

ফ্যারাডে (Faraday), মাইকেল — বৃটিশ রাসায়নিক ও তড়িৎ-বিজ্ঞানী ; জন্ম 1791 খৃস্টাব্দ, মৃত্যু 1867 খৃঃ। রয়্যাল ইনষ্টিটিউটে স্যার হামফ্রে ডেভির ↑ ছাত্র ও গবেষণাগারের সহকারী। গ্যাস তরলীকরণ ও কাচ-শিল্পের রাসায়নিক পদ্ধতির উন্নতি বিধান, পারদের বাষ্পীকরণ, প্রভৃতি বহু মূল্যবান অবদান। অবশ্য তড়িৎ-বিজ্ঞানে বিভিন্ন মৌলিক তথ্য আবিষ্কারেই সমধিক খ্যাতি ; বিশেষতঃ তড়িৎ-চুম্বকীয় শক্তি (electro-magnetic force) ও তড়িৎ-সংক্রমণের তথ্যাদি আবিষ্কার এবং তড়িৎ উৎপাদনের ডায়নামো ↑ ও জেনারেটার ↑ যন্ত্র উদ্ভাবন। তড়িৎ-বিজ্ঞানের 'জনক' বলে খ্যাত।

ফ্যারিংস (pharynx) — গল-নালির পশ্চাদ্বর্তী নিম্নাংশ ; আমাদের খাদ্য-নালি - সংলগ্ন টন্‌সিল ↑ থেকে শ্বাস-নালির মুখ পর্যন্ত নলাংশ ; এর স্ফীতি ও প্রদাহ- জনিত

গল-নালির 'ফ্যারিংস' রোগকে বলা হয় 'ফ্যারেঞ্জাইটিস'। এর উপরের অংশকে বলা হয় **ন্যাসোফ্যারিংস,** নাসিকার পশ্চাদ্ভাগ পর্যন্ত।

ফ্রনহোফার, (Fraunhofer) যোসেফ, ভন — জার্মান পদার্থ - বিজ্ঞানী ; জন্ম 1787 খৃস্টাব্দ, মৃত্যু 1826 খৃস্টাব্দ। সৌরগোলকের বহিরাবরণের (ক্রোমোস্ফিয়ার ↑) বিভিন্ন গ্যাসীয় উপাদানের অস্তিত্ব নির্দেশক 'ফ্রন্‌হোফার লাইন্‌স' আবিষ্কারে প্রসিদ্ধি। সূর্য - রশ্মির ধারা-বর্ণালিতে (ব্যাণ্ড স্পেক্‌ট্রাম ↑) যে-সব সঞ্চরমান কৃষ্ণরেখা দৃষ্ট হয় সে-গুলিই **'ফ্রন্‌হোফার লাইনস'** নামে পরিচিত। এ-সব রেখার সঙ্গে বিভিন্ন পরিচিত গ্যাসের বিশেষ প্রদীপ্তাবস্থার রেখা-বর্ণালিতে (লাইন স্পেক্‌ট্রাম ↑) পরিদৃষ্ট রেখার পারস্পর্যের সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্য লক্ষ্য করে সূর্যের ক্রোমোস্ফিয়ারের বিভিন্ন গ্যাসীয় উপাদান আবিষ্কার করেন। এভাবে তৎকালে অজ্ঞাত হিলিয়াম ↑ গ্যাস ফ্রন্‌হোফার কর্তৃক প্রথমে সূর্যে আবিষ্কৃত হয় এবং পরে পৃথিবীতে পাওয়া যায়।

ফ্রয়েড, সিগ্‌মণ্ড (Freud, Sigmond) — অষ্ট্রিয়াবাসী মনোবিজ্ঞানী ; জন্ম মোরেভিয়ার ইহুদি বংশে 1856 খৃঃ, মৃত্যু 1939 খৃস্টাব্দ। প্রথম জীবনে চিকিৎসক, পরে ফলিত মনোবিজ্ঞানের চর্চায় আত্মনিয়োগ। বিভিন্ন মানসিক রোগের প্রতিকারে ম নঃ স মী ক্ষা পদ্ধতির উদ্ভাবক ; অবচেতন মনের ক্রিয়াদি বিশ্লেষণ। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের বিবিধ ব্যাপারে বহু পরীক্ষা -নিরীক্ষা এবং কার্যকরী প্রয়োগ-বিধির প্রবর্তনে স্মরণীয় কীর্তি অর্জন।

ফ্রাক্‌সন্যাল ডিস্টিলেশন (fractional distillation) — আংশিক পাতন-ক্রিয়া। বিভিন্ন স্ফুটনাংকের নানা প্রকার তরল পদার্থের সংমিশ্রণ থেকে ওই সব তরল পদার্থ যে বিশেষ ডিষ্টিলেশন ↑ প্রক্রিয়ার সাহায্যে একে-

একে পৃথক করা যায়। বিভিন্ন তরল পদার্থ বিভিন্ন তাপমাত্রায় বাষ্পীভূত হয়ে থাকে; এ-জন্যে কোন মিশ্র তরল পদার্থকে কোন নির্দিষ্ট উষ্ণতায় স্থির-ভাবে উত্তপ্ত করলে ওই উষ্ণতা অনু-যায়ী নির্দিষ্ট তরল পদার্থটাই কেবল বাষ্পীভূত হয় এবং সেই বাষ্প ঠাণ্ডা করে তরল পদার্থটা পৃথকভাবে পাওয়া যেতে পারে। এভাবে বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট উষ্ণতায় উত্তপ্ত করে মিশ্র তরল পদার্থ থেকে বিভিন্ন স্ফুটনাংকের তরলপদার্থগুলি একে-একে পৃথক করা যেতে পারে। জটিল যান্ত্রিক ব্যবস্থায় এভাবে বিভিন্ন স্ফুটনাংকের তরল পদার্থ 'ফ্রাক্‌সনেটিং কলাম', বা অংশী-করণ-স্তম্ভের বিভিন্ন পাত্রে একে-একে পৃথক হয়ে সঞ্চিত হয়।

ফ্রাক্টোস (fructose)—পাকা ফলের মিষ্ট রস ও ফুলের মধু থেকে যে বিশেষ শ্রেণীর শর্করা পাওয়া যায়; **ফ্রাক্‌ট**··· (fruct···) মানে ফল। একে 'ফ্রুট সুগার', বা **লেভুলোস**-ও ↑ বলা হয়। অবশ্য এর আণবিক গঠন সাধারণ চিনির মত $C_6H_{12}O_6$; কিন্তু পারমাণবিক গঠনের বিভিন্নতা ও বৈশিষ্ট্য থাকে। স্ফটিকাকার সুমিষ্ট পদার্থ; জলে বিশেষভাবে দ্রবণীয়।

ফ্রিক্‌শ্যাল ইলেক্‌ট্রিসিটি (frictional electricity) — ঘর্ষ-তড়িৎ; বিভিন্ন পদার্থের ঘর্ষণে উৎপন্ন তড়িৎ-শক্তি। গালা, বা কাঁচের কোন জিনিসকে রেশম, বা পশম (উল) দিয়ে ঘসলে তড়িৎ-শক্তি জন্মায়; সাধারণ সুতার কাপড় দিয়ে ঘসলেও কিছু কাজ হয়। ছোট ছোট কাগজের টুকরা নিয়ে এভাবে উৎপন্ন তড়িতের অস্তিত্ব পরীক্ষা করা যায়। কিছুক্ষণ ঘসার পরে তড়িতাবিষ্ট হলে ওই কাঁচ, বা গালার জিনিসটাকে কাগজের টুকরা-গুলোর কাছে ধরলে উৎপন্ন তড়িতের আকর্ষণে টুকরাগুলো আকৃষ্ট হয়ে এসে তার গায়ে লেগে যায়।

ফ্রিজিং পয়েণ্ট (freezing point)—সাধারণ বায়ু-মণ্ডলীয় চাপে (760 মিলিমিটার; ব্যারোমিটার ↑) যে নির্দিষ্ট নিম্ন-তাপমাত্রায় কোন তরল পদার্থ ঠাণ্ডা হয়ে জমতে সুরু করে, অর্থাৎ তরল অবস্থা থেকে কঠিন অবস্থায় রূপান্তরিত হতেথাকে, তা-ই হলো ওই তরল পদার্থের 'ফ্রিজিং পয়েণ্ট'; বাংলায় বলা হয় হিমাংক। জলের ক্ষেত্রে এই উষ্ণতা, বা ফ্রিজিং-পয়েণ্ট হলো 0° সেন্টিগ্রেড।

ফ্রিজিং মিক্‌শ্চার (freezing-mixture)— হিমায়ক মিশ্রণ। কোন কোন রাসায়নিক পদার্থ (সল্ট ↑) জলে দ্রবীভূত করলে ও তাতে বরফ মেশালে সেই দ্রবণ, বা সংমিশ্রণের তাপমাত্রা অত্যধিক হ্রাস পায়; এত ঠাণ্ডা হয় যে, তার সংস্পর্শে জল জমে যায়। এরূপ মিশ্রণকে বলা হয় 'ফ্রিজিং মিকশ্চার'। দ্রবীভূত হওয়ার প্রক্রিয়ায় এই সব সল্ট যে পরিমাণ তাপ শুষে নেয় (হিট্ অব সল্যুসন্ ↑) তার উপরই ঠাণ্ডা হওয়ার মাত্রা নির্ভর করে। অল্প জলে এক টুকরা বরফ রেখে তার উপর কিছু সাধারণ খাদ্য-লবণ (সোডিয়াম

ক্লোরাইড ↑) ছড়িয়ে দিলে বরফের 'লেটেণ্ট হিট্ অব ফিউসন'-এর ↑ প্রভাবে তার উষ্ণতা অত্যধিক হ্রাস পায়, আর তার ফলে সংলগ্ন জল জমে বরফে পরিণত হয়। কাজেই বরফ ও খাদ্য-লবণের মিশ্রণ হলো একটা 'ফ্রিজিং মিক্‌শ্চার', বা হিমায়ক মিশ্রণ। (পরিশিষ্টে তালিকা ↑)

ফ্রেন্স পোলিশ (french polish)—অ্যালকোহল, বা স্পিরিটে সেল্যাক ↑ (বিশুদ্ধ ল্যাক ↑, বা গালা) গলিয়ে যে কাঠের-পালিশ তৈরী হয়। এই দ্রবণ দিয়ে কাঠের উপরে চক্‌চকে ও মসৃণ পালিশ করা যায়। ফরাসী দেশে এর প্রথম প্রচলন হয়েছিল বলে পদ্ধতিটির এই নাম দেওয়া হয়েছে।

ফ্লাই হুইল (fly-wheel) — ইঞ্জিন-সংলগ্ন ঘূর্ণায়মান মূল ভারী চাকা ; যেটা সরাসরি ইঞ্জিনের শক্তিতে ঘোরে এবং কৌশলে তৎসংলগ্ন অন্যান্য সূক্ষ্ম যন্ত্রাংশের বিভিন্ন চাকা ঘোরায়। এই ভারী চাকার প্রভাবে ইঞ্জিনের গতি নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় এবং সহসা বন্ধ করলেও ইঞ্জিনের সূক্ষ্ম যন্ত্রাংশগুলিতে তেমন কোন গুরুতর ধাক্কা লাগে না।

ফ্লাওয়ার অব সাল্‌ফার (flower-of sulphur)—বিশুদ্ধ গন্ধকের অতি সূক্ষ্ম হালকা চূর্ণ। সালফার ↑, বা গন্ধক উদ্বায়ী পদার্থ; কাজেই অবিশুদ্ধ গন্ধক উত্তপ্ত করলে যে ধূম উত্থিত হয়, সাব্লিমেশন ↑ প্রক্রিয়ায় তাকে ঠাণ্ডা করলে এরূপ বিশুদ্ধ সালফারের হাল্‌কা গুঁড়া পাওয়া যায়।

ফ্লাজেলা (flagella) — সূক্ষ্ম সূত্রবৎ দীর্ঘ কর্ষিকা-বিশিষ্ট জীবাণু ; যাদের বলে **ব্যাচিলাস** (bacillus ↑)। এরা প্রাণিদেহে প্রবিষ্ট হলে এই কর্ষিকা-গুলির সাহায্যে রক্ত-স্রোতে সাঁতার কেটে বেড়ায় ও দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে' রোগ সৃষ্টি করে।

ব্যচিলাস টাইফোসাস

ফ্লাজেল (flagel) মানে দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম কর্ষিকা। টাইফয়েড ↑ রোগের 'ফ্লাজেলা' শ্রেণীর বিশেষ একটি ব্যাসিলাসের চিত্র দেওয়া হলো।

ফ্লাস্ (flush) — মল-মূত্রাগারের নালি-পথ জল-বিধৌত করবার যন্ত্র বিশেষ। শিকল ধরে টানলে জল-ভরতি একটা বড় পাত্র, বা ট্যাঙ্কের অভ্যন্তরে শিকল-সংলগ্ন লিভারের ↑ অপর প্রান্তে সংলগ্ন একটা নিম্নমুখী পাত্র উপরে উঠে যায় ; আর বায়ুমণ্ডলীয় চাপের প্রভাবে তার বাইরে সঞ্চিত জল ওই আবদ্ধ পাত্রের মধ্যে দ্রুত ঢুকে গিয়ে একটা বক্র-নলের বাঁকের উপর পর্যন্ত উঠে পড়ে ; আর সঙ্গে-সঙ্গে ওই উপরে-ওঠা অতিরিক্ত জল সাইফন ↑ পদ্ধতিতে বক্র-নলটির ভিতর দিয়ে সবেগে নীচে নেমে নালি-মুখ ধৌত করে বেরিয়ে যায়।
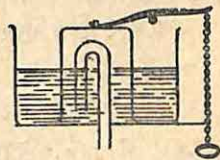
শৌচাগারের 'ফ্লাস' যন্ত্র

ফ্লিণ্ট (flint) — (1) কাচের মত স্বচ্ছ ও অত্যন্ত কঠিন এক প্রকার

প্রস্তর বিশেষ ; রাসায়নিক গঠনে সিলিকা ↑ মাত্র, SiO_2। (2) সিরিয়াম ধাতুর সঙ্গে লৌহ-চূর্ণ মিশিয়ে তৈরী বিশেষ একটা ধাতু-সংকরকেও বলে 'ফ্লিন্ট', যার ছোট টুকরা 'সিগারেট লাইটার' যন্ত্রে ব্যবহৃত হয় ; যান্ত্রিক ব্যবস্থায় লোহার চাকার সঙ্গে যার ঘর্ষণের ফলে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বেরোয়।

ফ্লিন্ট গ্লাস (flint glass) — অত্যন্ত স্বচ্ছ এক প্রকার সিলিকেট ↑ কাচ (গ্লাস ↑)। এর গঠনে একটা বিশেষ উপাদান হলো লেড-সিলিকেট। লেন্স, প্রিজ্‌ম ↑ প্রভৃতি এ-দিয়ে তৈরি হয়। পূর্বে বিশেষ কাজে ব্যবহারের জন্যে ফ্লিন্ট ↑ প্রস্তর কেটে তৈরি হোত বলে এ-জাতীয় কাচের এই বিশেষ নাম দেওয়া হয়েছে।

ফ্লেমিং (Fleming), স্যার আলেকজাণ্ডার—বৃটিশ জীবাণু-বিজ্ঞানী ; জন্ম আয়ারশায়ারে 1881 খৃস্টাব্দ। বিভিন্ন জীবাণু-ঘটিত রোগের সুপ্রসিদ্ধ ঔষধ পেনিসিলিন ↑ আবিষ্কার (1929 খৃঃ)। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার এডওয়ার্ড ফ্লোরি ও আর্নেস্ট চেন-এর সঙ্গে যুগ্মভাবে চিকিৎসা - বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ (1945 খৃঃ)। পেনিসিলিনের আবিষ্কারক হিসেবেই বিশ্বব্যাপী খ্যাতি।

ফ্লোজিস্টন থিওরি (flogiston theory) — পদার্থের জলন সম্পর্কিত প্রাচীন মতবাদ। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এরূপ একটি ভ্রান্ত মতবাদ প্রচলিত ছিল যে, প্রত্যেক পদার্থেই **ফ্লোজিস্টন** নামক এক রকম দাহ কণা, বা জলন-কণিকা থাকে; পদার্থটা পোড়ালে এই ফ্লোজিস্টন, বা জলন-কণিকাসমূহ বেরিয়ে যায়, আর ফ্লোজিস্টনহীন ভস্ম পড়ে থাকে। বিজ্ঞানী প্রিস্টলি ↑ এই মতবাদ ভুল প্রমাণিত করেন। তিনি প্রথম অক্সিজেন গ্যাস আবিষ্কার করে দহনের মূল রহস্যের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন। অবশ্য তাঁর এই আবিষ্কারের ভিত্তিতে ল্যাঁভসিয়ার ↑ পদার্থের দহন, বা জলনের প্রকৃত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। তিনি দেখালেন, কোন পদার্থ পোড়ালে ফ্লোজিস্টন, বা অন্য কোন-কিছু চলে যায় না ; বরং বায়ুর অক্সিজেন গ্যাস ওই পদার্থের সঙ্গে যুক্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে পদার্থটা পরোক্ষভাবে ওজনে বেড়ে যায়। এভাবে প্রমাণিত হয় যে, জলন হলো দাহ্য পদার্থের সঙ্গে বায়ুর অক্সিজেন গ্যাস সংযোগের একটা রাসায়নিক ক্রিয়া মাত্র ; যাকে বলা হয় পদার্থের জারণ, বা অক্সিডেশন (oxidation) ↑।

ফ্লোটিং রিব্স (floating ribs) — বক্ষ-পঞ্জরের একাদশ ও দ্বাদশ পঞ্জরাস্থি (রিব্) দু'খানা ; এরা পশ্চাতে মেরুদণ্ডের সঙ্গে দু'দিকে অবশ্য যুক্ত থাকে, কিন্তু সামনে বক্ষাস্থি, অথবা অন্য কোন পঞ্জরাস্থির সঙ্গে যুক্ত থাকে না ; সামনের দিকে ওই দু'খানা ছোট পঞ্জরাস্থি বক্ষ-পঞ্জরের নিচের
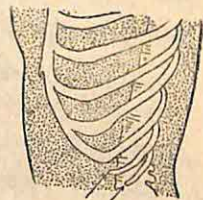
ফ্লোটিং রিব্স

দিকে অবলম্বন-শূন্যভাবে ঝুলে থাকে (ফল্‌স রিব্‌স ↑)।

ফ্লোরস্পার (fluorspar) — খনিজ অবিশুদ্ধ ক্যালসিয়াম ফ্লোরাইড, CaF_2, আকরিক। বিশুদ্ধ ক্যালসিয়াম ফ্লোরাইড স্ফটিকাকার বর্ণহীন পদার্থ ; কিন্তু অবিশুদ্ধ খনিজ অবস্থায় সাধারণতঃ লাল্‌চে দেখায়। সাধারণতঃ এই আকরিকটি থেকেই ফ্লোরিন ↑ নিষ্কাশিত হয়ে থাকে।

ফ্লোরা (flora)—কোন দেশের আঞ্চলিক উদ্ভিদ-বৈচিত্র্য। (ফনা ↑)।

ফ্লোরিন (fluorine) — মৌলিক গ্যাসীয় পদার্থ ; সাংকেতিক চিহ্ন F, পারমাণবিক ওজন 19, পারমাণবিক সংখ্যা 9। ক্লোরিনের ↑ সমপর্যায়ের হল্‌দে গ্যাস ; কিন্তু এর রাসায়নিক সংযোগ-শক্তি সমধিক। ফ্লোরস্পার ↑, ক্রায়োলাইট ↑ প্রভৃতি বিভিন্ন ফ্লোরাইড খনিজ থেকে ফ্লোরিন নিষ্কাশিত হয়। এই গ্যাসীয় ফ্লোরিন জলে দ্রবীভূত করলে পাওয়া যায় হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড ; যার রাসায়নিক ক্রিয়ায় কাচ ক্ষয়ে যায়।

ফ্লোরেসেন্স (fluorescence) — বিশেষ-বিশেষ অবস্থায় কোন-কোন পদার্থ থেকে বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোক-রশ্মি বিকিরিত হওয়ার ধর্ম। কুইনিন সাল্‌ফেটের দ্রব, প্যারাফিন্‌ অয়েল প্রভৃতি কতকগুলো পদার্থ বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের (বিশেষ-বিশেষ বর্ণের) আলোক-রশ্মি শোষণ করে এবং তার পরিবর্তে অপর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের, অর্থাৎ অপর বর্ণের রশ্মি বিকিরিত করে। এদের এই ধর্মকে বলে 'ফ্লোরেসেন্স' ; আর ওই সব পদার্থকে বলে **ফ্লোরেসেণ্ট** পদার্থ। এ-সব পদার্থের উপর আলোক-রশ্মি যতক্ষণ পড়ে ততক্ষণই এই ফ্লোরেসেন্স ধর্ম লক্ষিত হয়ে থাকে ; নিয়ন বাতির অভ্যন্তরে স্বল্প-চাপের নিয়ন গ্যাসের এরূপ 'ফ্লোরেসেন্স' ধর্মের জন্যেই বিশেষ উজ্জ্বল বর্ণ-বিশিষ্ট আলোকের উদ্ভব হয়ে থাকে। পদার্থের **'ফস্‌ফোরেসেন্স'** ↑ (phosphorescence) ধর্ম আবার অন্যরূপ ; মূল আলোক-রশ্মি সরিয়ে নিলে অন্ধকারেও কোন-কোন পদার্থের এক রকম আলোক, বা দীপ্তি বিকিরণ করবার ধর্মকে বলে 'ফস্‌ফোরেসেন্স,' বা স্বয়ম্প্রভা।

ফ্লোয়েম (phloem) — উদ্ভিদ-দেহের যে কলা-স্তরে রসবাহী সূক্ষ্ম নালিকা গুচ্ছ থাকে ; উদ্ভিদ-কাণ্ডের ফ্লোয়েম-কলার (জাইলেম ↑) এই অতি সূক্ষ্ম নালিকা-পথেই উদ্ভিদেরা মাটি থেকে খাদ্য-রস টেনে নিয়ে সারা দেহে সরবরাহ করে এবং উদ্ভিদ সতেজ ও পরিপুষ্ট থাকে। (চিত্রে উদ্ভিদ-কাণ্ডের 'ফ্লোয়েম' সহ বিভিন্ন কলা-স্তর দেখানো হয়েছে।)

কাণ্ডের বিভিন্ন কলা-স্তর

ব

বক্সাইট (b a u x i t e)— আকরিক অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড, Al_2O_3 ;

এই খনিজ পদার্থ থেকেই সাধারণতঃ অ্যালুমিনিয়াম ↑ ধাতু নিষ্কাশিত হয়ে থাকে। কাদা-মাটির মত দেখতে এই খনিজ পদার্থটা হাইড্রেটেড ↑ (জল সংযুক্ত) অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড যৌগিকে গঠিত। ভারতের নানা-স্থানে প্রচুর পরিমাণে বক্সাইট আকরিক পাওয়া যায়।

বক্সাইট সিমেণ্ট (bauxite cement) বিশেষ এক শ্রেণীর সিমেণ্ট ↑; সাধারণতঃ যার প্রধান উপাদান হলো ক্যালসিয়াম অ্যালুমিনেট ↑। 'ইলেক্‌ট্রিক ফার্নেস' চুল্লীতে বক্সাইট ও লাইম (ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড ↑) এক সঙ্গে উত্তপ্ত করে পদার্থটা তৈরি করা হয়ে থাকে। এ-শ্রেণীর সিমেণ্ট অতি দ্রুত শক্ত হয়ে পড়ে।

বল-কক্‌ (ball cock) — দণ্ডযুক্ত ফাঁপা ধাতব গোলক; যা জলের ট্যাঙ্কে অতিরিক্ত জল-প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করবার জন্যে ব্যবহৃত হয়। ট্যাঙ্ক ভরতি হলে ফাঁপা বলটা জলের প্রবেশ-মুখের সমসূত্রে ভেসে উঠে দণ্ডের অপর প্রান্তীয় ছিপি নলমুখে চেপে
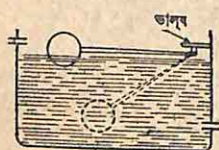
বল-কক্‌

এঁটে যায়। এর ফলে ট্যাঙ্কে জল-প্রবেশ বন্ধ হয়; জল আর ট্যাঙ্ক ছাপিয়ে উপ্‌চে পড়তে পারে না।

বল-সকেট জয়েণ্ট (ball-socket joint) — প্রাণিদেহের বিশেষ এক রকম অস্থি-সংযোগ, যাতে একখানা হাড়ের গোলাকার প্রান্ত অপর হাড়ের প্রান্তীয় গহ্বরে প্রবিষ্ট থাকে। ওই গহ্বরটা চর্বি, বা কাটিলেজ ↑ জাতীয় পদার্থে তৈলাক্ত ও মসৃণ থাকায় সংযোগের যদৃচ্ছ সঞ্চালন সহজসাধ্য হয়। কল-কারখানার লৌহ-নির্মিত যন্ত্রেও ক্ষেত্র বিশেষে এরূপ সংযোগের ব্যবস্থা থাকে।

বল-বেয়ারিং (ball-bearing) — গাড়ীর চাকা, অথবা যন্ত্রাদির কোন ঘূর্ণায়মান অংশ কেন্দ্র-সংলগ্ন যে দণ্ডের গায়ে আঁটা থাকে, তাকে বলে 'অ্যা ক্সে ল'। এই অ্যাক্সেল, বা অক্ষ-দণ্ডটা যাতে সহজে দ্রুত বেগে ঘুরতে পারে

বল-বেয়ারিং

তার জন্যে 'বল-বেয়ারিং'-এর ব্যবস্থা করা হয়। গোলাকার একটা ধাতব খাঁজের মধ্যে সুকঠিন কোন ধাতু-নির্মিত কতকগুলো 'বল' পাশাপাশি বসিয়ে বল-বেয়ারিং তৈরি করা হয়। আক্সেলটার দুই প্রান্ত এরূপ দু'টা বল-বেয়ারিং-এর মধ্যে প্রবিষ্ট থাকে। এর ফলে অ্যাক্সেলটা সহজে ও অতি দ্রুত বেগে ঘুরতে পারে।

বয়েন্সি (buoyancy) — পদার্থের প্লবতা ধর্ম; বস্তুতঃ এটা নিমজ্জিত বস্তুর উপরে তরল, অথবা গ্যাসীয় পদার্থের উর্ধ্বচাপ। সাধারণতঃ তরল পদার্থের ক্ষেত্রে এই প্লবতা সমধিক লক্ষিত হয়। নিমজ্জিত বস্তু যতটা তরল পদার্থ অপসারিত করে তারই ওজন-পরিমাণের সমান হলো এই উর্ধ্ব-চাপ, অর্থাৎ প্লবতার পরিমাণ (আর্কিমিডিস প্রিন্সিপ্‌ল ↑)। এজন্যে

তরল পদার্থে নিমজ্জিত অবস্থায় বস্তুর ওজন কম মনে হয়; অপসারিত তরল পদার্থের ওজন ওই বস্তুর প্রকৃত ওজন থেকে কমে যায়। বায়ুরও প্লবতা আছে; এজন্যে কোন বস্তুর প্রকৃত ওজন জানতে হলে বায়ুর প্লবতা-জনিত ওজন-হ্রাস সংশোধন করা দরকার। অবশ্য এই পার্থক্য এত সামান্য যে, সাধারণতঃ বস্তুর বায়ু-মধ্যস্থ হ্রাস-প্রাপ্ত ওজনকেই তার প্রকৃত ওজন বলে ধরা হয়।

বয়েলিং পয়েন্ট (boiling point) — স্ফুটনাংক; যে তাপমাত্রায় কোন তরল পদার্থ ফুটতে থাকে। প্রত্যেক তরল পদার্থই তার একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতা, বা তাপমাত্রায় ফোটে; ফোটে, যখন ওই উত্তপ্ত তরল পদার্থের সর্বোচ্চ বাষ্পীয় চাপ বহিস্থ বায়ুমণ্ডলীয় চাপের অধিক হয়। এই স্ফুটনাংকে এলে তরল পদার্থের বাষ্প উত্থিত হতে থাকে। আবার, বহিস্থ বায়বীয় চাপের অল্পাধিক তারতম্যে স্ফুটনাংকেরও তারতম্য ঘটে থাকে; পর্বতশিখরে বায়ুর চাপ কম বলে জল অপেক্ষাকৃত অল্প তাপেই ফোটে; নিম্নভূমিতে অধিকতর তাপপ্রয়োগের প্রয়োজন হয়। কোন তরল পদার্থ স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডলীয় চাপে (760 মিলিমিটার উচ্চ পারদ-স্তম্ভের ওজন; ব্যারোমিটার ↑) যে উষ্ণতায় ফুটতে আরম্ভ করে তাকেই সাধারণভাবে তার 'স্ফুটনাংক উষ্ণতা' বলা হয়।

বয়েল, রবার্ট (Boyle, Robert) — আয়ারল্যাণ্ডবাসী খ্যাতনামা বিজ্ঞানী, জন্ম 1627 খৃস্টাব্দ, মৃত্যু 1691 খৃস্টাব্দ। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং লণ্ডনে রয়্যাল সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। বিভিন্ন গ্যাসের আয়তন ও চাপ সম্বন্ধীয় সাধারণ সূত্র (বয়েল্স-ল ↑) আবিষ্কারেই সমধিক প্রসিদ্ধি।

বয়েল্স-ল (Boyle's law) — কোন নির্দিষ্ট উষ্ণতায় নির্দিষ্ট পরিমাণ কোন গ্যাসীয় পদার্থের আয়তন তার উপরে প্রদত্ত চাপের বিপরীত আনুপাতিক হয়, অর্থাৎ চাপ বাড়লে আয়তন তদনুপাতে কমে, চাপ কমলে আয়তন আবার তদনুপাতে বাড়ে। সুতরাং নির্দিষ্ট পরিমাণ কোন গ্যাসের চাপ ও আয়তনের গুণফল সর্বদা সমান হবে। বিজ্ঞানী বয়েলের ↑ এই গ্যাসীয় আয়তন-সূত্র সাধারণতঃ কোন গ্যাসের পক্ষেই সম্পূর্ণরূপে খাটে না। কোন গ্যাস এই নিয়ম সম্পূর্ণরূপে মেনে চললে তাকে 'পারফেক্ট গ্যাস' ↑ বলা হয়।

বসু, আচার্য জগদীশচন্দ্র (Basu J. C) — ভারতীয় (বাঙ্গালী) পদার্থবিদ্ ও উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী; জন্ম 1858 খৃঃ, মৃত্যু 1937 খৃষ্টাব্দ। আদি নিবাস—রাড়িখাল, বিক্রমপুর, ঢাকা। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এস-সি, লণ্ডনের ডি. এস-সি। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা। পদার্থ-বিজ্ঞানে বেতার-তরঙ্গ বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবিষ্কার। উদ্ভিদেরাও যে প্রাণিদেহের মত আঘাত-উত্তেজনায় সাড়া দেয়, তদ্বিষয়ক মৌলিক তথ্যাদি আবিষ্কারে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি; দেশ-বিদেশে বিপুল সম্মান লাভ। ভারতে

মৌলিক গবেষণার প্রসারের জন্য কলিকাতায় 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' প্রতিষ্ঠায় অক্ষয় কীর্তি।

বসু, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ (Basu S. N.)—প্রখ্যাত ভারতীয় (বাঙ্গালী) গণিতজ্ঞ ও পদার্থ-বিজ্ঞানী; কলিকাতায় জন্ম 1894 খৃঃ, মৃত্যু 1974 খৃস্টাব্দ। 1915 খৃঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এস-সি; শীর্ষ স্থান অধিকার। ঢাকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা; বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য; ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি (1944 খৃঃ)। ভারত সরকারের 'পদ্ম-বিভূষণ' উপাধি লাভ; রয়্যাল সোসাইটির ফেলো (এফ্-আর-এস)। ভারত সরকার কর্তৃক 'জাতীয় অধ্যাপক' মনোনীত। তেজঃকণিকা সম্পর্কিত মতবাদের পরিসংখ্যান-সূত্র উদ্ভাবন; এই সূত্র আইনস্টাইন ↑ কর্তৃক বস্তুকণিকার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বলে সমর্থিত এবং তা 'বসু-আইনস্টাইন সংখ্যাতত্ত্ব' (স্ট্যাটিস্টিক্স) নামে খ্যাত। বিশ্ববিশ্রুত খ্যাতি ও সম্মান।

বাইকার্বনেট (bi-carbonate) — কার্বনিক অ্যাসিডের (H_2CO_3) বিভিন্ন 'অ্যাসিড সল্ট' ↑; অ্যাসিডটির একটি হাইড্রোজেন-আয়ন ↑ যদি কোন ধাতব বেস্-এর ↑ সঙ্গে রাসায়নিক ক্রিয়ায় বিচ্যুত হয়ে যায়, তাহলে তার অবশিষ্ট 'হাইড্রোজেন' আয়নটি নিয়ে যে অসম্পূর্ণ কার্বনেট সল্ট উৎপন্ন হয়, তাকে বলে বাইকার্বনেট; যেমন, সোডিয়াম বাইকার্বনেট $NaHCO_3$, পটাসিয়াম বাইকার্বনেট $KHCO_3$, (অ্যাসিড সল্ট ↑)।

বাইকাস্পিড টুথ (bicuspid tooth)—চর্বণ-দন্ত; মানুষের প্রতি মাড়ির দুই পার্শ্বস্থ চতুর্থ দাঁত দু'টি। এদের প্রত্যেকটিরই দু'টি করে' অগ্রভাগ, অর্থাৎ খাঁজ-কাটা থাকে।

বাইক্রোমেট অব পটাস (bichromate of potash) — পটাসিয়াম বাইক্রোমেট (অথবা, ডাইক্রোমেট) সল্ট, $K_2C_2O_7$। লাল স্ফটিকাকার পদার্থ, জলে দ্রবণীয়। বিভিন্ন রঞ্জক পদার্থে ও অক্সিডাইজিং এজেণ্ট ↑ হিসেবে সল্টটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বাইনোকুলার (binocular) — সাধারণ এক রকম দূরবীণ, বা দূরবীক্ষণ যন্ত্র বিশেষ; এর দুই অংশের মুখে একই প্রকার দুই খানা উত্তল লেন্স দু'দিকে এঁটে লাগানো থাকে। এক সঙ্গে দুই চোখ লাগিয়ে এর সংলগ্ন ওই লেন্সের মধ্য দিয়ে দূরের জিনিসের প্রতিচ্ছায়া কিছু বর্ধিতাকারে স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। সাধারণ বাইনোকুলার, বা 'ফিল্ড গ্লাসের' একটা চিত্র দেওয়া হলো।
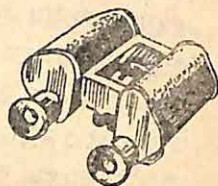
বাইনোকুলার

বাইনারি কম্পাউণ্ড (binary compound) — দ্বি-মৌল যৌগ; দুটো মৌলিক পদার্থের সরাসরি রাসায়নিক সংযোগে যে যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়ে থাকে; যেমন, ক্যালসিয়াম

কার্বাইড ↑ CaC_2, হাইড্রোজেন সালফাইড H_2S, ইত্যাদি যৌগ।

বাইনারি অ্যালয় (binary alloy) —কেবল মাত্র দুইটি ধাতুর সংযোগে যে সংকর-ধাতুর সৃষ্টি হয়; যেমন—পিতল (ব্রাস ↑) হলো একটা বাইনারি অ্যালয়; কারণ, এটা কেবল তামা ও দস্তার মিলনে গঠিত।

বাই-প্রোডাক্ট (by-product) — উপজাত পদার্থ; কোন রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় আনুষঙ্গিক হিসেবে অন্য যে-সব পদার্থ পাওয়া যায়। অনেক সময় এই আনুষঙ্গিক পদার্থ উদ্দিষ্ট পদার্থ অপেক্ষাও প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান হয়ে থাকে; যেমন—কোল গ্যাস ↑ তৈরির সময়ে বাইপ্রোডাক্ট হিসেবে পাওয়া যায় অ্যামোনিয়া, কোক, কোল-টার ↑; প্রভৃতি। এই কোল-টার, বা আলকাত্‌রা থেকে আবার পাওয়া যায় বিভিন্ন অ্যানিলিন ↑ রং, বিভিন্ন ঔষধ, সুগন্ধ দ্রব্য; স্যাকারিন ↑ প্রভৃতি নানা প্রয়োজনীয় পদার্থ।

বাইল (bile) — পিত্ত-রস; মানুষের যকৃতে উৎপন্ন সবুজাভ-হল্‌দে জৈব রস, যা অন্ত্রে গিয়ে খাদ্যের চর্বি জাতীয় (ফ্যাট ↑) উপাদানকে ভেঙ্গে সূক্ষ্ম কণিকায় পরিণত করে' তাকে জীর্ণ হতে সাহায্য করে। কোন জৈবিক ক্রিয়ার গোলযোগে এই পিত্ত-রস রক্তে মিশলে জণ্ডিস ↑, অর্থাৎ কামলা রোগ হয়ে থাকে।

বাইয়েনিয়াল প্লাণ্ট (biennial plant)—দ্বি-বর্ষজীবী উদ্ভিদ; দ্বিতীয় বর্ষে এদের শস্য-বীজ উৎপন্ন হয় এবং তারপরে শুকিয়ে মরে যায়।

বাক্‌নার ফানেল (Buchner funnel) — পরিস্রাবণ (ফিল্‌ট্রেশন ↑) প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত পোর্সিলেনের তৈরি বিশেষ ধরনের এক প্রকার ফানেল, অর্থাৎ পরিস্রাবণ-কুপী; যার মধ্যে সূক্ষ্ম সছিদ্র তাকের উপরে ফিল্‌টার কাগজখানা স্থাপন করা হয় (চিত্র ↑)। এই ব্যবস্থায় পরিস্রাবণ প্রক্রিয়া সুবিধাজনক ও দ্রুততর হয়ে থাকে।
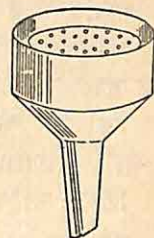
বাক্‌নার ফানেল

বাকাল ক্যাভিটি (buccal cavity) — মুখ-গহ্বর; দুই গালের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান। **বাক্** (bucc) মানে গাল, গণ্ডদেশ।

বাটার অব অ্যাণ্টিমনি (butter of) antimony)—অ্যাণ্টিমনি ট্রাইক্লোরাইড, $SbCl_3$, নামক একটি সাদা সূক্ষ্ম স্ফটিকাকার রাসায়নিক পদার্থের বিশেষ নাম। অ্যাণ্টিমনি ট্রাইসাল্‌ফাইড (স্টিব্‌নাইট ↑, Sb_2S_3) ও কন্‌সেণ্ট্রেটেড হাইড্রোক্লোরিক ↑ অ্যাসিডের রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে যৌগটি উৎপন্ন হয়ে থাকে।

বাফোটক্সিন (bufotoxin)—ব্যাঙের মুখের বিষাক্ত লালা-রস; **'বাফো'** মানে ব্যাঙ। (টক্সিন ↑)

বার্জিলিয়াস (Burzelius), জন্‌স জেকব — সুইডেনবাসী রসায়ন-

বিজ্ঞানী ; জন্ম 1769 খৃঃ, মৃত্যু 1848 খৃস্টাব্দ। কয়েকটি তৎকালীন অজ্ঞাত মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার ; বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের আণবিক ও পারমাণবিক ওজন নির্ধারণ। মৌলিক পদার্থের সূচক-সংকেত ('H' হাইড্রোজেন,'Fe' আয়রন, লৌহ ইত্যাদি) উদ্ভাবনের জন্যেই সবিশেষ প্রসিদ্ধি।

বার্নিং (burning) — দহন, বা জ্বলন ক্রিয়া ; বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে দাহ্য পদার্থের রাসায়নিক সংযোগ-ক্রিয়া। বস্তুতঃ কোন পদার্থের 'বার্নিং', বা দহন-ক্রিয়া হলো বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে তার রাসায়নিক সংযোগ-ক্রিয়া মাত্র ; যার দ্রুততা ও তীব্রতার তারতম্যের ফলে বিভিন্ন অবস্থায় উত্তাপ, আলোক ও অগ্নিশিখার সৃষ্টি হয়ে থাকে। (অক্সিডেশন ↑)

বার্ন্ট অ্যালাম (burnt alum) — ফিটকিরি, বা অ্যালাম ↑ উত্তপ্ত করলে যে সাদা গুঁড়া পাওয়া যায় ; পদার্থটা হলো পটাসিয়াম ও অ্যালুমিনিয়ামের যুগ্ম সালফেট, $K_2SO_4, Al_2(SO_4)_3$, যৌগ। উত্তাপের ফলে সাধারণ অ্যালামের 'ওয়াটার অব ক্রস্টালিজেশন ↑ উবে গিয়ে এই জল-শূন্য চূর্ণে পরিণত হয়, স্ফটিকাকৃতি নষ্ট হয়ে যায়।

বায়োকেমিস্ট্রি (bio-chemistry)— সর্ব জীবের, বিশেষতঃ মানব-দেহের রাসায়নিক গঠন, জীবনের মূল তথ্য ও জৈবিক ক্রিয়া-বিক্রিয়াদি সম্পর্কীয় বিজ্ঞান ; এক কথায় বলা যায় 'জীবন-রসায়ন' শাস্ত্র।

বায়োলজি (biology)—জীববিদ্যা। বিজ্ঞানের যে শাখায় বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্পর্কে যাবতীয় বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি পর্যালোচিত হয়ে থাকে। বোটানি (উদ্ভিদ-বিজ্ঞান), জুওলজি (প্রাণী-বিজ্ঞান), ব্যাক্‌ট্রিয়োলজি ↑ প্রভৃতি বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত।

বায়োটিক (biotic) — শব্দার্থ হলো জীবন, বা দৈহিক সুস্থতা সম্বন্ধীয় ; যেমন —**অ্যাণ্টিবায়োটিক্‌স** হলো যে-সব জৈব পদার্থ (পেনিসিলিন ↑ ইত্যাদি) জীবের দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট রোগ-জীবাণুদের ধ্বংস করে রোগ নিরাময় ও দৈহিক সুস্থতা রক্ষা করে। রোগ-জীবাণু (ব্যাক্‌টেরিয়া ↑) ধ্বংসকারী জৈব ঔষধ সম্বন্ধীয়।

বায়োটিন (biotin) — একটি জৈব রাসায়নিক পদার্থ ; যা 'ভিটামিন-এইচ্' নামে পরিচিত। দেহাভ্যন্তরে ঈস্ট ↑ ও কোন-কোন হিতকারী জীবাণুর ক্রিয়া এর প্রভাবে ত্বরান্বিত ও সবিশেষ কার্যকরী হয়ে থাকে। সাধারণ স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় ; দৈনন্দিন খাদ্যে এর অভাবে বিশেষতঃ চর্মরোগ হয়।

বার (bar) —বায়ুর ওজন (চাপ) ; 'ব্যারো' মানে বায়ুর ওজন, বা চাপ সম্বন্ধীয় ; যেমন — ব্যারোমিটার ↑, বায়ুর ওজন, বা বায়ুমণ্ডলীয় চাপ পরিমাপক যন্ত্র। বায়ুমণ্ডলীয় চাপের একক হলো **বার** (bar) ; **মিলিবার,** (millibar ↑)।

বার্বিচুরেট (barbiturate) — বার্বিচুরিক অ্যাসিডের [$CO(NH.CO)_2CH_2$] বিভিন্ন সল্ট; এই শ্রেণীর নানা রকম রাসায়নিক যৌগ তৈরী হয়েছে। জীব-দেহের স্নায়ুমণ্ডলীর উপরে এদের

শক্তিশালী (অনেক সময় মারাত্মক) প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। ভেরোন্যাল, লুমিন্যাল ↑ প্রভৃতি এ-জাতীয় ঔষধে দেহ অসাড় হয়ে আসে, ঘুম পায়। এগুলোকে সাধারণতঃ 'নার্কোটিক ড্রাগ' ↑ বলা হয়ে থাকে। এ-সব ঔষধ কিছু দিন ব্যবহারে মানুষ নেশার মত অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

বিটা পার্টিকল্ (beta particle) — রেডিও - অ্যাক্‌টিভ (তেজস্ক্রিয়) পদার্থ থেকে যে-সব তেজঃকণিকা নির্গত হয়, তাদের মধ্যে অতি দ্রুত-গামী ইলেক্‌ট্রন ↑ (β^-) ও পজিট্রন ↑ (β^+) কণিকাগুলোকে এই নামে অভিহিত করা হয়। এই সকল বিটা-কণিকার গতি আলোক-তরঙ্গের গতির (পরিশিষ্ট ↑) প্রায় সমান।

বিটা-রে (beta-ray) — রেডিও-অ্যাক্‌টিভ ↑ পদার্থসমূহের পরমাণু-বিভাজনের স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ায় বিচ্ছু-রিত বিটা-পার্টিকলগুলো ↑ ধারার আকারে প্রবাহিত হয়ে থাকে। এই কণিকা-ধারার গতি ও ধর্ম আলোক-

বিটাট্রন
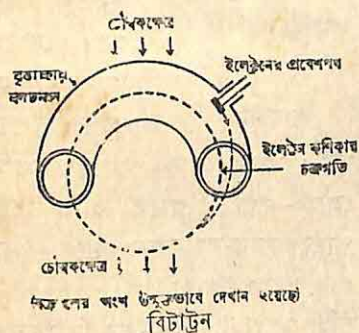
রশ্মির প্রায় অনুরূপ ; এ-জন্যে এদের সচরাচর বলা হয় বিটা-রশ্মি, বা 'বিটা-রে' (রেডিও-অ্যাক্‌টিভিটি ↑)।

বিটাট্রন (betatron) — পদার্থের পরমাণু বি ভা জ নে র (ফিসন ↑) সাহায্যে প্রাপ্ত ইলেক্‌ট্রন কণিকা-গুলোকে অত্যধিক দ্রুত গতি-সম্পন্ন করবার জন্যে উদ্ভাবিত যন্ত্র বিশেষ। একটা তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রে স্থাপিত বৃত্তাকার বায়ুশূন্য কাঁচ-নলের ভিতরে বিশেষ ব্যবস্থায় ইলেক্‌ট্রন-কণিকা গুলোকে চক্রাকারে অতি দ্রুত ক্রমা-গত পরিভ্রমণ করানো হয়। এর ফলে নলের বহিস্থ তড়িৎ-চুম্বকীয় শক্তির প্রভাবে কণিকাগুলো ক্রমশঃ অতি উচ্চ গতিসম্পন্ন হয়ে ওঠে।

বিটুমেন (bitumen)—বিভিন্ন ভারী হাইড্রোকার্বনের ↑ সংমিশ্রণে গঠিত, দেখতে আলকাত্‌রার মত কালো এক রকম কঠিন পদার্থ। একে সাধারণ কথায় বলে পিচ্, যা দিয়ে রাস্তা তৈরি হয়। ফ্রাক্‌শ্যাল ডিস্টিলেশন ↑ প্রক্রিয়ায় খনিজ পেট্রোলিয়াম ↑ থেকে হাল্‌কা হাইড্রোকার্বনগুলো বার করে নিলে এই পদার্থ পড়ে থাকে। অনু-রূপ পদার্থ আবার 'অন্তর্ধূম-পাতন' প্রক্রিয়ায় কয়লা থেকেও পাওয়া যায়।

বিব্-কক্ (bib-cock) — সহরাঞ্চলে ব্যবহৃত জলের কলের পাইপের মুখে লাগানো, নিচের দিকে বাঁকানো সাধারণ কল-মুখ (ট্যাপ)।

বুটাডিন (butadiene) — বর্ণহীন একটি গ্যাসীয় হাইড্রোকার্বন ; যার গঠনে চারটি কার্বন-পরমাণু সারিবদ্ধ-ভাবে যুক্ত থাকে। এক শ্রেণীর কৃত্রিম রাবার ↑ তৈরি করতে পদার্থটা ব্যব-হৃত হয়, যাকে বলে **'বুনা রাবার'**।

বুটেন (butane)—প্যারাফিন শ্রেণীর একটা দাহ্য হাইড্রোকার্বন, C_4H_{10} ; তৈল-খনি থেকে পেট্রোলিয়ামের ↑ সঙ্গে নির্গত হয়। সাধারণ বায়ুমণ্ডলীয় উষ্ণতায় এটা গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে। বিশেষ দাহ্য পদার্থ ; মোটর-স্পিরিটের সঙ্গে অনেক সময় মিশ্রিত করা হয়। বিশেষ ব্যবস্থায় গ্যাসটা জ্বালিয়ে আলোক-শিখা সৃষ্টি করাও যায়।

বুন্‌সেন (Bunsen), রবার্ট উইল্‌হেল্‌ম — জার্মান রাসায়নিক ; জন্ম 1811 খৃঃ, মৃত্যু 1899 খৃঃ। পদার্থের বর্ণালি-বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া ও নূতন এক রকম ব্যাটারি ↑ (বুন্‌সেন ব্যাটারি) উদ্ভাবন। গবেষণাগারে ব্যবহৃত বায়ু-মিশ্রিত কোল-গ্যাসের ↑ দহনে অগ্নিশিখা উৎপাদনের উপযোগী 'বুন্‌সেন বার্ণার' ↑ নামক এক প্রকার বাতি উদ্ভাবনে চিরস্মরণীয়।

বুন্‌সেন বার্ণার (Bunsen burner) — এক রকম গ্যাসের বাতি ; দাহ্য গ্যাস জেলে অগ্নিশিখা উৎপাদনের এক রকম যন্ত্র। রসায়নাগারে সাধারণতঃ এইরূপ বার্ণারে বায়ুর সঙ্গে মিশ্রিত কোল গ্যাস ↑ জ্বেলে রাসায়নিক দ্রব্যাদি উত্তপ্ত করা হয়ে থাকে। এর ধাতব নলের নিম্নাংশের একটা ছিদ্রপথ বাড়িয়ে, বা কমিয়ে প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণে বায়ু প্রবেশ করানো হয়। এভাবে কোল-গ্যাসের সঙ্গে বায়ু মিশ্রিত হয়ে ওই নলের মুখে বেরোয়; আর এই বায়ুমিশ্রিত গ্যাসটা জ্বালালে নলের অগ্রভাগে অগ্নিশিখার সৃষ্টি হয়।
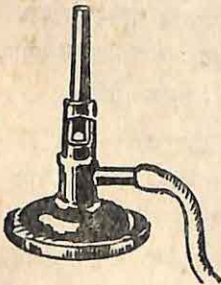
বুন্‌সেন বার্ণার

বুফো (bufo) — কোলা ব্যাঙ জাতীয় উভচর প্রাণী (অ্যাম্ফিবিয়া, amphibia ↑), বা টোড (toad)। **বুফো-টক্সিন** (bufo-toxin ব্যাঙের লালা-নিঃসৃত বিষাক্ত রস।

বুমেরাং (boomerang) — অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের ব্যবহৃত কাষ্ঠ-নির্মিত এক প্রকার শীকার-যন্ত্র, বা অস্ত্র। এ-গুলির অগ্রভাগ চ্যাপ্‌টা ও পশ্চাদ্ভাগ এমন ভাবে বাঁকানো থাকে যে, নিক্ষেপের পরে শীকার বিদ্ধ না হলে এ-গুলি চক্রগতিতে ঘুরে আবার শীকারীর কাছে ফিরে আসে।

বুলডজার (bulldozer) — মোটর-চালিত ভারি এক প্রকার যন্ত্র বিশেষ ; যার সাহায্যে উঁচু-নিচু জায়গা সমতল করা হয়। দেখতে অনেকটা যেন যুদ্ধের ট্যাঙ্কের মত। সামনে থাকে প্রকাণ্ড একখানা লৌহ-প্লেট ; যাতে ক'রে মাটি-পাথরের বড়-বড় চাঙ্গর ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়, চলার পথ সমতল।

বুলডজার

বিলিয়ন (billion)—এক মিলিয়ন ↑ গুণ মিলিয়ন সংখ্যা, বাংলায় এক লক্ষ কোটি ; অর্থাৎ 1,000,000,000,000 ; সূচক রাশিতে 10^{12}।

বিস্‌মাথ (bismuth) — মৌলিক ধাতব পদার্থ ; সাংকেতিক চিহ্ন Bi ; পারমাণবিক ওজন 209, পারমাণবিক সংখ্যা 83 ; লাল্‌চে আভাযুক্ত সাদা স্ফটিকাকার ভঙ্গুর ধাতু। উত্তাপ ও তড়িৎ পরিবহনের ক্ষমতা এর অত্যন্ত কম। উত্তাপে গলিয়ে পরে ঠাণ্ডা করলে ধাতুটা জমে আয়তনের কিছু বেড়ে যায়, এজন্যে 'টাইপ-মেটালে' ↑ অনেক সময় ব্যবহৃত হয়। নিম্ন-গলনাংকের বিভিন্ন সংকর-ধাতু (উড্‌ মেটাল ↑) এ দিয়ে তৈরি হয়ে থাকে। এর কোন-কোন সল্ট ঔষধ হিসেবেও কখন-কখন ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বেক্‌ম্যান থার্মোমিটার (Bechman thermometer) — এক প্রকার তাপমান যন্ত্র ; যার সাহায্যে উষ্ণতার অতি সামান্য পরিবর্তনও মাপা যায়। এ-রকম থার্মোমিটারে ↑ পারদ-নলের নিম্নস্থ গোলকের পারদ প্রয়োজন মত উপরের দিকে সংলগ্ন আর একটা কাঁচ-গোলকে স্থানান্তরিত করবার ব্যবস্থা থাকে। এভাবে গোলকের অভ্যন্তরস্থ পারদের পরিমাণ সহজেই কমানো-বাড়ানো চলে। এর ফলে বিভিন্ন উষ্ণতায় পারদের আয়তনের সামান্য হ্রাস-বৃদ্ধি ও মাপা সম্ভব হয়। এ-থার্মোমিটারের গায়ে মাত্র 6, বা 7 ডিগ্রি পরিমিত স্কেলের দাগ কাটা থাকে, আর তার প্রত্যেক ডিগ্রিকে এক শত ভাগে ভাগ করা থাকে। এ-জন্যে ডিগ্রির শতাংশও এ-দিয়ে মাপা সম্ভব হয়ে থাকে।

বেকারেল, (Becquerel) অ্যাণ্টোইন হেনরি — ফরাসী পদার্থ - বিজ্ঞানী ; জন্ম 1852 খৃষ্টাব্দ, মৃত্যু 1908 খৃষ্টাব্দ। ইউরেনিয়াম ↑ ধাতু সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ; বিভিন্ন তেজঃ-কণিকার ধারা-রশ্মি (রেডিও এনার্জি-রে ↑) আবিষ্কারে সবিশেষ খ্যাতি অর্জন। 1903 খৃষ্টাব্দে কুরি-দম্পতির সঙ্গে যুগ্মভাবে পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ।

বেকিং পাউডার (baking powder) সোডিয়াম বাইকার্বনেটের ($NaHCO_3$) সঙ্গে টার্টারিক অ্যাসিড ↑ বা 'ক্রিম্‌ অব টার্টার' ↑ মিশিয়ে বেকিং পাউডার তৈরি হয়। জলে দিলে, বা সামান্য উত্তপ্ত করলে এ-থেকে কার্বন-ডাইঅক্সাইড (CO_2) গ্যাস নির্গত হতে থাকে। পাউরুটি তৈরির জন্যে ময়দার জল-মিশ্রিত নরম পিণ্ডের মধ্যে এই পাউডার মেশাবার ফলে কার্বন - ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয় ; আর সেই গ্যাসের অসংখ্য বুদ্‌বুদ উঠে ময়দার নরম পিণ্ডটা ছিদ্র-বহুল হয়ে ফেঁপে-ফুলে ওঠে।

বেকিং সোডা (baking soda) — 'বেকিং পাউডার' ↑ তৈরি করবার জন্যেই প্রধানতঃ প্রয়োজন হয়ে থাকে বলে 'সোডিয়াম বাইকার্বনেট' ↑ সল্টকে ($NaHCO_3$) 'বেকিং সোডা' বলা হয়। সোডিয়াম কার্বনেট হলো 'ওয়াসিং সোডা' ↑ ।

বেঞ্জল (benzol) — অপরিশুদ্ধ বেঞ্জিনের ↑ ব্যবহারিক নাম। সস্তা সাধারণ 'মোটর স্পিরিট' ↑ হিসেবে

কখন-কখন ব্যবহৃত হয়। একে অনেক সময় বেঞ্জোল-ও বলে।

বেঞ্জাইল (benzyl) —প্যারাফিন ↑ শ্রেণীর বিভিন্ন হাইড্রোকার্বনের ↑ সংমিশ্রণ; উদ্বায়ী তরল পদার্থ। খনিজ পেট্রোলিয়াম ↑ থেকে পাওয়া যায়। তৈল ও চর্বি জাতীয় পদার্থ এতে সবিশেষ দ্রবীভূত হয় বলে এ দিয়ে গরম কাপড়-চোপড় পরিষ্কার (ড্রাই-ওয়াস ↑) করা হয়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দ্রাবক পদার্থ হিসেবেও অনেক সময় ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বেঞ্জিন (benzene) — বর্ণহীন তরল একটা হাইড্রোকার্বন, C_6H_6; কয়লার 'ডেস্ট্রাক্টিভ ডিষ্টিলেশন' ↑ প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত আলকাত্‌রা, বা কোল-টার ↑ থেকে পাওয়া যায়। অত্যন্ত দাহ্য ও উদ্বায়ী পদার্থ; সহজেই বাষ্পাকারে উবে যায়। অপরিশুদ্ধ অবস্থায় পদার্থটাকে **বেঞ্জল**-ও বলা হয়। তৈল ও চর্বি জাতীয় পদার্থ বেঞ্জাইলের ↑ মত বেঞ্জিনেও অতি দ্রুত দ্রবীভূত হয়। সাধারণভাবে অতি উৎকৃষ্ট একটা দ্রাবক পদার্থ। মোটরগাড়ীর জ্বালানি তেল হিসেবেও বেঞ্জিনের ব্যবহার আছে।

বেঞ্জিড্রিন (benzedrine)—মস্তিষ্কের স্নায়ু-কেন্দ্রগুলির উত্তেজক একটি তরল ঔষধের ব্যবহারিক নাম। এই তরল পদার্থটি নাসারন্ধ্রে টেনে নিলে নাকের রক্তবহা নালিকাগুলি সংকুচিত হয়ে 'নাসা-রোগ' উপশম হয়। কখন কখন সর্দিতেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বেঞ্জোইক অ্যাসিড (benzoic acid) — একটা তরল ফ্যাটি ↑ অ্যাসিড; যার রাসায়নিক ফর্মুলা, C_6H_5COOH। এই তরল বর্ণহীন পদার্থটা মাখিয়ে পাকা ফল সংরক্ষণের কাজে অনেক সময় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ঔষধ হিসেবেও এর কিছু কিছু ব্যবহার আছে।

বেঞ্জোইন (benzoin) —এক প্রকার রজন (রেজিন, resin ↑); যাতে যথেষ্ট বেঞ্জোইক অ্যাসিড ↑ থাকে। এর সঙ্গে 'টিন্‌চার আয়োডিন' ↑ মিশ্রিত করে কাটা-ছেঁড়ায় 'টিন্‌চার বেঞ্জোইন' নামে প্লাস্টারের মত ঔষধ হিসেবে লাগানো হয়। একে কখন-কখন **ফ্রায়ার্স ব্যালসাম** (Friar's balsam)-ও বলা হয়।

বেণ্টোনাইট (bentonite) — এক প্রকার মৃত্তিকা, দেখতে সাদা। এর মধ্যে জল দিলে ফুলে ওঠে এবং জেলির ↑ মত হয়ে পড়ে। পদার্থটা কাগজ-শিল্পে ও রং (পেইণ্ট) তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পদার্থটা পেট্রল ↑ বিশুদ্ধিকরণেও লাগে।

বেরাইল (beryl) — বেরিলিয়াম-অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট, $3BeO.Al_2O_3.6SiO_2$, যৌগটির বিশেষ নাম; মূল্যবান এক প্রকার খনিজ প্রস্তর বিশেষ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই খনিজ থেকেই সাধারণতঃ বেরি-লিয়াম ↑ ধাতু নিষ্কাশিত হয়ে থাকে।

বেরিয়াম (barium) — মৌলিক ধাতব পদার্থ; সাংকেতিক চিহ্ন Ba; পারমাণবিক ওজন 137·36, পার-মাণবিক সংখ্যা 56; রৌপ্যের মত সাদা, কিন্তু বিশেষ নরম ধাতু। বায়ুর

সংস্পর্শে অক্সাইডে পরিণত হয়ে এর উপরে একটা আস্তরণ পড়ে যায়। খনিজ বেরিয়াম-সালফেট (ব্যারাইটিস্ ↑), $BaSO_4$, এবং কার্বনেট, $BaCO_3$, থেকে ধাতুটা নিষ্কাশিত হয়। এর সল্টগুলো দেখতে ক্যালসিয়াম সল্টের অনুরূপ; কিন্তু বিষাক্ত। বিভিন্ন বেরিয়াম-সল্ট ভার্নিস ↑ রং তৈরি, কাঁচ-শিল্প ও আতস-বাজী তৈরির জন্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বেরিয়াম মিল (barium meal) — পাকস্থলী ও অন্ত্রের আভ্যন্তরীণ 'এক্স-রে' আলোকচিত্র তোলবার আগে অনেক সময় রোগীকে এ-জিনিসটা খাওয়ানো হয়। সামান্য বিশুদ্ধ বেরিয়াম সাল্‌ফেট (ব্যারাইটিস ↑) যথেষ্ট জলে মিশিয়ে জিনিসটা তৈরি করা হয়। পাকস্থলী ও অন্ত্রে এর উপস্থিতির ফলে এক্সরশ্মির প্রতিফলন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বেরিলিয়াম (beryllium) — একটি মৌলিক ধাতু ; সাংকেতিক চিহ্ন Be ; পারমাণবিক ওজন 9·013, পারমাণবিক সংখ্যা 4 ; সাদা সুকঠিন ধাতব পদার্থ। পদার্থটা **'গ্লুসিনিয়াম'** নামেও পরিচিত। বেরাইল ↑ নামক খনিজ পদার্থ থেকে সাধারণতঃ ইলেক্‌ট্রোলিসিস ↑ প্রক্রিয়ায় পাওয়া যায়। অ্যালুমিনিয়ামের চেয়েও হালকা শক্ত ধাতু। তামা, লোহা প্রভৃতির সঙ্গে বিভিন্ন অনুপাতে মিশিয়ে বিভিন্ন সংকর-ধাতু তৈরি হয়ে থাকে। ইস্পাত ও বেরিলিয়ামের সংকর-ধাতু দিয়ে ঘড়ির হেয়ার-স্প্রিং তৈরি করা হয়। 'অ্যাটমিক পাইল' ↑ যন্ত্রে 'নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন' ↑ প্রক্রিয়া মন্দীভূত করবার জন্যেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বেল, গ্রাহাম (Bell, Graham) — বিখ্যাত যন্ত্র-বিজ্ঞানী; টেলিফোন ↑ যন্ত্রের আবিষ্কর্তা। জন্ম 1847 খৃষ্টাব্দ, স্কটল্যাণ্ডের এডেনবরায়; আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস, মৃত্যু 1922 খৃষ্টাব্দ।

বেল (ইলেক্‌ট্রিক) (bell, electric) — বৈদ্যুতিক ঘণ্টা ; মূলতঃ তড়িৎ-চুম্বকীয় শক্তির প্রভাবে ঘণ্টা-ধ্বনি সৃষ্টি করবার এক রকম যন্ত্র বিশেষ। সুইচ টিপলে একটা ছোট ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগ্নেটের ↑ তড়িৎ-চক্র সম্পূর্ণ হয় ; সঙ্গে-সঙ্গে তড়িৎ-প্রবাহের ফলে ওই ইলেক্‌ট্রো - ম্যাগ্নেটের তার - কুণ্ডলী, অথবা তার অভ্যন্তরস্থ লৌহ দণ্ডটি চৌম্বকশক্তি-বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। এই চৌম্বকশক্তির আকর্ষণে নিকটস্থ কাঁচা লোহারএকটা পাত্ আকৃষ্ট হলেই তড়িৎ - চক্রটা বিচ্ছিন্ন হয়ে তড়িৎপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় ; আর সঙ্গে-সঙ্গে ওই চৌম্বক-শক্তিও লোপ পায়। চুম্বকীয় আকর্ষণের অভাবে লোহার পাত্‌খানা যথাস্থানে এসে তড়িৎচক্র আবার সম্পূর্ণ করে। কাজেই তড়িৎ-প্রবাহের ফলে আবার চুম্বকীয় শক্তি জন্মায় ও লোহার পাত্‌খানা আকৃষ্ট হয়।
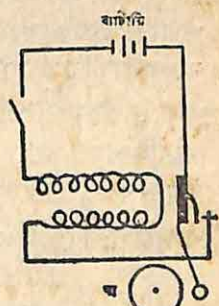
ইলেকট্রিক বেল

এভাবে পাত্‌খানা মুহুর্মুহু এদিকে-ওদিকে নড়তে থাকে। এর ফলে পাত্‌খানার গায়ে সংলগ্ন ছোট একটা হাতুড়ি সঙ্গে-সঙ্গে একটা ধাতব পাত্রের (ঘণ্টার) গায়ে পর্য্যায়ক্রমে আঘাত করে শব্দ সৃষ্টি করতে থাকে। যতক্ষণ সুইচ টিপে তড়িৎ-প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখা যায় ততক্ষণ ওই ঘণ্টা-ধ্বনি চলতে থাকে।

বেল মেটাল (bell metal) — তামা ও টিনের বিশেষ একটা সংকর-ধাতু ; এর মধ্যে তামার ভাগ 60% থেকে 85% পর্যন্ত থাকতে পারে। সামান্য আঘাতে অধিকতর স্পন্দিত হয়ে উচ্চ-গ্রামের শব্দ উৎপাদন করে বলে সাধারণতঃ এ-দিয়েই ঘণ্টা ও বাসন-পত্রাদি তৈরি হয়। বাংলায় এই সংকর-ধাতুটা 'কাঁসা' নামে পরিচিত।

বেল্‌ভেডিয়ার (belvedere)—কোন অট্টালিকার শীর্ষে নির্মিত চতুর্দিক উন্মুক্ত কক্ষ ; কেবলমাত্র ছাদ থাকে।

বেলাডোনা (belladonna)—আলু-বর্গীয় বিশেষ এক-প্রকার ভেষজ উদ্ভিদ ; যার বীজ ও ডাল-পালার নিষ্কাশিত রস থেকে অ্যা ট্রো পি ন (atropine) ↑ নামক অ্যাল্‌কালয়েড (alkaloid) ↑ পাওয়া যায় ; যা চোখের ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

বেলাডোনা

বোলোমিটার (bolometer)—অতি সামান্য উষ্ণতা পরিমাপের জন্যে ব্যবহৃত এক বিশেষ বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ার থার্মোমিটার ↑ যন্ত্র। উষ্ণতার অতি সূক্ষ্ম হ্রাস-বৃদ্ধিতে এই যন্ত্রের বৈদ্যুতিক তারে প্রবাহিত তড়িৎ-স্রোতের গতি-পথে যে সূক্ষ্ম বাধার (রেজিস্টেন্স ↑) সৃষ্টি হয় তার পরিমাণ এতে নিরূপণ করা যায় এবং তা থেকে হিসাব করে উষ্ণতার পরিমাণ জানা যায়। এ-যন্ত্র বস্তুতঃ তাপ-রশ্মির (রেডিয়্যাণ্ট রে ↑) শক্তি পরিমাপের জন্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বেস্ (base) — ক্ষারক পদার্থ ; সাধারণতঃ যে-সব ধাতব যৌগিকের সঙ্গে অ্যাসিডের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন সল্ট ও জল উৎপন্ন হয় তাদের বলে 'বেস', যেমন, CuO (কপার অক্সাইড)+H_2SO_4 (সালফিউরিক অ্যাসিড)=$CuSO_4$ (কপার সালফেট, সল্ট)+H_2O (জল)। অতএব, এখানে কপার-অক্সাইড হলো ক্ষারক, বা 'বেস'। সাধারণতঃ বিভিন্ন ধাতব অক্সাইড ও হাইড্রক্সাইড-গুলোই ক্ষারক বলে পরিচিত।

বেস্ মেটাল (base metal) — নিকৃষ্ট ধাতু। লোহা, তামা, সীসা, দস্তা প্রভৃতি ধাতু সাধারণ অ্যাসিডে গলে, মরচে, বা ময়লা ধরে কালো হয়ে যায় ; এ-জন্যে এ-গুলোকে বলে নিকৃষ্ট ধাতু, অর্থাৎ 'বেস্ মেটাল'। সোনা, রূপা, প্ল্যাটিনাম প্রভৃতি ধাতু সাধারণ কোন একক অ্যাসিডে গলে না, মরচেও ধরে না, সচরাচর সর্বদাই উজ্জ্বল থাকে। এজন্যে এ-সব ধাতুকে বলা হয় 'নোব্‌ল মেটাল' ↑, বা সম্ভ্রান্ত ধাতু। (অ্যাকোয়া রিজিয়া ↑)

বেসিক ডাই (basic dye) — যে-সব জৈব রাসায়নিক ক্ষারধর্মী পদার্থের জলীয় দ্রবে ডুবিয়ে বস্ত্রাদি (কোন মরড্যাণ্ট ↑ ব্যতিরেকেই) সরাসরি রঞ্জিত করা যায়। মৃদু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাহায্যে বিভিন্ন অ্যালকালিধর্মী ↑ জৈব রঞ্জক পদার্থের জলীয় দ্রবে ডুবিয়ে সূতা, উল প্রভৃতিতে 'পাকা' রং করা যেতে পারে। এ দিয়ে কাপড় ছাপাও হয়।

বেসিক সল্ট (basic salt) — যে-সব সল্টের মধ্যে বেসিক র‍্যাডিক্যাল ↑ আংশিকভাবে মিলিত অবস্থায় থেকে যায়। এ-গুলো অ্যাসিড-সল্টের ↑ মত অসম্পূর্ণ সল্টের পর্যায়ভুক্ত। বেসিক (বেস্ ↑) পদার্থের সঙ্গে অ্যাসিডের রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পূর্ণ না হয়ে অর্ধ-শমিত অবস্থায় উৎপন্ন সল্টের সঙ্গে (অক্সাইড, বা হাইড্রক্সাইড ↑) বেস্-টির কতকাংশ যদি যুক্তাবস্থায় থেকে যায়, তাহলে সেই অশমিত সল্টকে 'বেসিক সল্ট' বলা হয়; যেমন— 'বেসিক লেড কার্বনেট' সল্ট, $2PbCO_3.Pb(OH)$; যাকে সাধারণতঃ বলে 'হোয়াইট লেড' ↑।

বেসিক শ্ল্যাগ (basic slag)—খনিজ লৌহ আকরিক থেকে ইস্পাত তৈরির বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় গলিত তরল লোহার উপরে নানা রকম লৌহেতর পদার্থের যে-সব গাঁদ (শ্ল্যাগ, slag) ভেসে ওঠে। পদার্থটা মোটামুটি হলো লাইম ↑, ফসফরাস, সিলিকা ↑ প্রভৃতির বিভিন্ন অবিশুদ্ধ যৌগের সংমিশ্রণ। সাধারণতঃ এর মধ্যে টেট্রাক্যালসিয়াম ফস্ফেট ($Ca_4P_2O_9$), ক্যালসিয়াম সিলিকেট ($CaSiO_3$), লাইম (CaO), ফেরিক অক্সাইড (Fe_2O_3) প্রভৃতি বিভিন্ন অনুপাতে মিশ্রিত থাকে। ফস্ফরাস ও ক্যালসিয়াম থাকায় এরূপ বেসিক শ্ল্যাগের চূর্ণ উৎকৃষ্ট অজৈব সার হিসেবে কৃষি-জমিতে দেওয়া হয়।

বেসিমার প্রোসেস (Bessemer process) — অবিশুদ্ধ ঢালাই লোহা (কাস্ট আয়রন ↑) থেকে ইস্পাত তৈরি করবার একটা পদ্ধতি। প্রথমতঃ ব্লাস্ট ফার্নেসে ↑ লোহা গলানো হয়; পরে ওই গলিত লোহা 'বেসিমার কন্ভার্টার' নামক একটা বিশেষ আকারের বদ্ধ আধারে স্থানান্তরিত করা হয়। এই বেসিমার কনভার্টার হলো একটা ডিম্বাকার প্রকাণ্ড পাত্র, যার তলদেশে ছিদ্রপথ থাকে। এই ছিদ্রপথে অভ্যন্তরস্থ তরল লোহার মধ্যে সজোরে বায়ু প্রবেশ করানো হয়ে থাকে।

বেসিমার কন্ভার্টার

আর এর ফলে ওই লোহার সঙ্গে মিশ্রিত ময়লা সব অক্সিডাইজড ↑ হয়ে উপরে গাঁদ ভেসে ওঠে। এর পরে নিচের ওই বিশুদ্ধ গলিত লোহার মধ্যে স্পিজেল ↑ (লোহা, ম্যাঙ্গানিজ ও কার্বনের একটা বিশেষ সংকর-ধাতু) পরিমাণ অনুযায়ী মিশিয়ে প্রয়োজনীয় শ্রেণীর ইস্পাত তৈরি করা হয়। বস্তুতঃ লোহার সঙ্গে মিশ্রিত কার্বনের পরি-

মাণের উপরই ইস্পাতের বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ নির্ভর করে (স্টিল ↑)।

বোন্ অয়েল (bone oil) — জীব-জন্তুর হাড় থেকে 'ডেস্ট্রাক্‌টিভ ডিস্টি-লেশন' ↑ প্রক্রিয়ায় যে তৈলাক্ত মিশ্র পদার্থ নিষ্কাশিত হয়ে থাকে। অত্যন্ত কালো ও ঘন তরল পদার্থ, বিশেষ দুর্গন্ধযুক্ত। এ থেকেই পাইরিডিন ↑ পাওয়া যায়। এই বোন-অয়েলকে আবার **'ডিপেল্‌স্ অয়েল'**-ও বলে।

বোন্ ব্ল্যাক (bone-black) —জীব-জন্তুর হাড় অন্তর্ধূম-পাতন (ডেস্ট্রাক্‌-টিভ ডিস্টিলেশন ↑) প্রক্রিয়ায় পুড়িয়ে যে বিশেষ সছিদ্র ও বিশুদ্ধ কয়লা (কার্বন ↑) পাওয়া যায়। বস্তুতঃ একে 'অ্যানিম্যাল চার-কোল' ↑ ; আবার অনেক সময় 'বোন্-চার'-ও বলা হয়।

বোর, নিল্‌স (Bohr, Niels)—ডেন-মার্কের পদার্থ-বিজ্ঞানী ; জন্ম 1885 খৃষ্টাব্দ, মৃত্যু 1962 খৃঃ। পরমাণুর আভ্যন্তরীণ গঠন-বিন্যাস নিরূপণের গবেষণায় 'কোয়ান্টাম' বাদের ↑ সফল প্রয়োগ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে জার্মানীতে পারমাণবিক শক্তির গবে-ষণায় অংশ গ্রহণ এবং গোপন তথ্যাদি সংগ্রহ করে আমেরিকায় পলায়ন। আমেরিকার বিজ্ঞানীদের সহযোগি-তায় প্রথম পরমাণু-বোমা (অ্যাটম বম্ব ↑) তৈরি (1945 খৃস্টাব্দ)। আমেরিকায় পরমাণু-শক্তি উৎপাদন প্রচেষ্টার ভিত্তি পত্তন।

বোরন (boron) — মৌলিক ধাতব পদার্থ, সাংকেতিক চিহ্ন **B** ; পারমাণ-বিক ওজন 10·82, পারমাণবিক সংখ্যা 5 ; ধাতুটা পাংশুটে রংয়ের চূর্ণ, বা হল্‌দে স্ফটিকাকার কঠিন পদার্থ রূপে পাওয়া যায়। বোর‍্যাক্স ↑ ও বোরিক অ্যাসিড ↑ বোরনের যৌগিক পদার্থ। কাঠিন্য বৃদ্ধির জন্যে বিশেষ শ্রেণীর ইস্পাতের সঙ্গে কখন-কখন সামান্য পরিমাণে বোরন মিশ্রিত করা হয়।

বোরিক অ্যাসিড (boric acid) — সাদা ও সূক্ষ্ম ক্ষুদ্র স্ফটিকাকার অ্যাসিড, H_3BO_3 ; জলে দ্রবণীয়। একে আবার **বোর‍্যাসিক অ্যাসিড** (boracic acid)-ও বলা হয়। আগ্নেয়-গিরি অঞ্চলে স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায়। সাধারণতঃ খনিজ বোর‍্যাক্স ↑ থেকেই প্রচুর পরিমাণে বোরিক অ্যাসিড তৈরী হয়ে থাকে। মৃদু অ্যান্টিসেপ্টিক ↑ পদার্থ হিসেবে এর যথেষ্ট ব্যবহার আছে ; সাধারণতঃ বলা হয় 'বোরিক পাউডার।'

বোর‍্যাক্স (borax) — সোডিয়াম পাইরো-বোরেট. $Na_2B_4O_7, 10H_2O$; সাদা স্ফটিকাকার খনিজ পদার্থ। পৃথিবীর নানা স্থানে স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায়। বাংলায় একে বলে 'সোহাগা'। উত্তাপে এর জলীয় অংশ চলে গিয়ে কাঁচের মত স্বচ্ছ কঠিন পদার্থে পরিণত হয়। কাঁচ-শিল্পে, অগ্নি-নিরোধক পদার্থ তৈরি করতে ও সোল্ডারিং-এর ↑ কাজে ব্যবহৃত হয়। মৃদু অ্যান্টিসেপ্টিক ↑ পদার্থ হিসেবেও এর ব্যবহার আছে।

বোর‍্যাসিক অ্যাসিড (boracic acid) — বোরিক অ্যাসিড ↑ ।

ব্যাক্টেরিয়া (bacteria) — বিশেষ

এক শ্রেণীর আণুবীক্ষণিক জীবাণু; অতিসূক্ষ্ম এক-কোষী প্রোটোপ্লাজ্‌ম ↑ কণিকা বিশেষ। মাইক্রোব ↑, জার্ম, ব্যাসিলি ↑ প্রভৃতি সবই সাধারণভাবে ব্যাক্টেরিয়া নামে অভিহিত হয়। কোষ-বিভাজন (ফিসন ↑) প্রক্রিয়ায় এরা দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে; কোন-কোন ব্যাক্টেরিয়া থেকে 24 ঘণ্টায় এভাবে দেড় কোটি পর্যন্ত ব্যাক্টেরিয়া সৃষ্টি হতে পারে বলে অনুমিত হয়েছে। বিভিন্ন আকারের ব্যাক্টেরিয়া আবার বিভিন্ন নামে পরিচিত : গোলাকার চ্যাপ্টা-গুলো **কক্কাই,** কাঠির মত লম্বাগুলো **ব্যাসিলি** ↑ ইত্যাদি। বিভিন্ন প্রকার ব্যাক্টেরিয়ার জৈব প্রভাবে জীব-দেহে বিভিন্ন সংক্রামক রোগের সৃষ্টি হয়। অবশ্য সব জীবাণুই রোগ সৃষ্টি করে না; অনেক উপকারী ব্যাক্টেরিয়াও আছে। মাটির মধ্যে নানা রকম ব্যাক্টেরিয়া থাকে, যাদের প্রভাবে উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী বিভিন্ন ধাতব নাইট্রেট ↑ সল্ট উৎপন্ন হয় (নাইট্রোজেন সাইক্‌ল ↑)। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে পৃথিবীর সর্বত্রই আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে বিভিন্ন রকম ব্যাক্টেরিয়া রয়েছে। ব্যাক্‌টেরিয়া সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানকে বলে **ব্যাক্‌টেরিওলজি** (bacteriology)।

ব্যাক্‌ট্রোসাইড (bactrocide) — যে-সব রাসায়নিক পদার্থ বিভিন্ন রোগ-জীবাণু (ব্যাক্টেরিয়া ↑) ধ্বংস করে। জীবাণু-ঘটিত রোগে জীবাণুদের ধ্বংস, বা তাদের বংশবৃদ্ধি রোধ করবার জন্যে যে-সব ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

ব্যাক্‌ট্রিয়োফাজ (bacteriophage) — রোগ-জীবাণু (ব্যাক্‌টিরিয়া ↑) ধ্বংসকারী বিশেষ ভাইরাস ↑ ; অতি সূক্ষ্ম আণুবীক্ষণিক জৈব পদার্থ বিশেষ (ফাজ ↑)।

ব্যাকেলাইট (Bakelite) — বিশেষ এক শ্রেণীর প্ল্যাষ্টিক ↑ জাতীয় পদার্থের ব্যবহারিক নাম। এর আবিষ্কারক বিজ্ঞানী বেক্‌ল্যাণ্ডের ↑ নামানুসারে পদার্থটার এই নাম দেওয়া হয়েছে। ফিনল ↑ ও ফর্ম্যাল্ডিহাইডের ↑ মিলনে উৎপন্ন এক রকম রাসায়নিক যৌগের একটা পলিমার ↑ পদার্থ। বিশেষ এক শ্রেণীর থার্মোসেটিং প্ল্যাস্টিক ↑ ।

ব্যাচিলাস (bacillus) — কাঠির মত লম্বা আকৃতি-বিশিষ্ট অতি সূক্ষ্ম এক শ্রেণীর ব্যাক্টেরিয়ার ↑ বিশেষ নাম। এদের অতি-সূক্ষ্ম লম্বা দেহ কোন বিশেষ জীবাণুর ক্ষেত্রে বক্রও হতে পারে ; কোন-কোন গুলির পেছনে থাকে চুলের মত কয়েকটি শোঁয়া, বা লেজ্‌। কলেরার ব্যাসিলাসগুলো 'কমার' মত বাঁকানো থাকে। শব্দটার বহুবচনে হয় 'ব্যাচিলি' (bacilli)

ব্যাচিলাস্‌
(বহুগুণবর্ধিতাকার)

ব্যাট (bat)—(1) বাদুড় ; অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার, অথচ বৃহৎ পক্ষ-বিশিষ্ট নিশাচর স্তন্যপায়ী পক্ষী বিশেষ ; (2) ক্রিকেট (criket) খেলার ব্যাট ; (3) ইটের খণ্ড, বা খোয়া ইট ; যেমন—ব্রিক-ব্যাট (brickbats)।

ব্যাটারি (battery) — বৈদ্যুতিক

শক্তি-উৎপাদক ক্ষুদ্রাকার যন্ত্র বিশেষ। একাধিক প্রাইমারি ↑, বা সেকেণ্ডারি সেল ↑ শ্রেণীবদ্ধভাবে, বা সমান্তরাল করে সাজিয়ে ব্যাটারি তৈরি হয়। সেলগুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে (অর্থাৎ পর-পর সিরিজে সংলগ্ন) রাখলে ইলেক্ট্রোমোটিভ ফোর্স ↑ যথেষ্ট বেড়ে যায় ; আর, সমান্তরালভাবে (অর্থাৎ প্যারালাল কানেক্সনে) সাজানো সেলের ব্যাটারি থেকে বেশি সময়ের জন্যে তড়িৎ-প্রবাহ পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ড্রাই-ব্যাটারি ↑ গুলো একক-ভাবে লেক্‌ল্যান্স ↑ সেলের পদ্ধতিতে তৈরি হয়ে থাকে।

ব্যাথোস্ফিয়ার (bathosphere) — যে সুদৃঢ় লৌহ-আধারে করে ডুবুরীরা সমুদ্রের গভীরে নামে ; জলের গভীরতা-জনিত প্রচণ্ড চাপ সহ্য করতে পারে ধাতুনির্মিত এমন আবদ্ধ, কিন্তু বায়ু চলাচলের নল-সমন্বিত আধার। একে **ব্যাথিস্ফিয়ার** (bathysphere)-ও বলা হয়। **'ব্যাথো', বা 'ব্যাথি'** মানে গভীরতা সম্বন্ধীয়।

ব্যাণ্টিং, (Banting) স্যার ফ্রেডারিক গ্র্যাণ্ট — ক্যানাডা রাজ্যের রাসায়নিক ও জীব-বিজ্ঞানী; জন্ম 1868 খৃঃ, মৃত্যু 1941 খৃষ্টাব্দ। ডায়বিটিস ↑, বা বহুমূত্র রোগের সুবিখ্যাত ঔষধ ইন্সুলিন ↑ আবিষ্কারে প্রসিদ্ধি ; 1923 খৃষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভ।

ব্যারাইটা (barytta) — খনিজ বেরিয়াম অক্সাইড, BaO ; পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সাদা চূর্ণের আকারে খনিজরূপে পাওয়া যায়।

ব্যারাইটিস (barytes) — খনিজ অবিশুদ্ধ বেরিয়াম সালফেট, $BaSO_4$; ভারী, সাদা, স্ফটিকাকার পদার্থ। সাধারণতঃ সীসার সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। জলে দ্রবণীয় নয় ; তেলে মিশিয়ে এর চূর্ণ দিয়ে সাদা পেইণ্ট ↑ তৈরি হয়। সাধারণতঃ এই খনিজ থেকেই বেরিয়াম ↑ ধাতু নিষ্কাশিত হয়ে থাকে। জিনিসটা কখন-কখন **হেভিস্পার** (heavy-spar) নামেও পরিচিত।

ব্যারোগ্রাফ (barograph) — আবহাওয়া সম্বন্ধীয় পরীক্ষাদিতে ব্যবহৃত এক রকম বিশেষ চাপমান-যন্ত্র। এর

অ্যানিরয়েড ব্যারোমিটার

সাহায্যে বিভিন্ন সময়ে বায়ুমণ্ডলীয় চাপের পরিবর্তন স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক ব্যবস্থায় কাগজের উপরে রেখাপাতের সাহায্যে সঠিক নির্ধারিত হয়ে থাকে। প্রধানতঃ একটা 'অ্যানিরয়েড ব্যারোমিটার' ↑ নিয়েই যন্ত্রটা গঠিত হয় ; বাইরের বায়বীয় চাপের তারতম্যানুসারে এর গাত্র-সংলগ্ন একটা কাঁটা উঁচু-নীচু হয়ে কাগজের উপরে বিভিন্ন সময়ে বায়ুর পরিবর্তিত চাপ-নির্দেশক রেখাপাত করতে থাকে।

ব্যারোমিটার (barometer)— বায়ু-চাপমান যন্ত্র। সাধারণ চাপমান-যন্ত্রে থাকে একমুখ বন্ধ একটা কাঁচ-নল, মোটামুটি 36″ ইঞ্চি লম্বা। পারদ

(মার্কারি ↑) ভরতি করে নিয়ে এর খোলা মুখটা উল্‌টে অন্য একটা পারদ-ভর্তি পাত্রের মধ্যে ডুবিয়ে লম্বভাবে দণ্ডায়মান রাখা হয়। মোটামুটি এ-রকম ব্যারোমিটারকে বলা হয় 'মার্কারি ব্যারোমিটার'। এই কাঁচ-নলের মধ্যস্থ পারদ-স্তম্ভ কিছু নেমে গিয়ে বায়ুর চাপ অনুযায়ী এক স্থানে স্থির হয়ে যায়। উপরে যে বায়ুশূন্য স্থানের সৃষ্টি হয়ে থাকে তাকে বলা হয় **টরিসেলিয়ান ভ্যাকুয়াম** (Torricellian vacuum) ↑। কাঁচ-নলের মধ্যস্থিত পারদ-স্তম্ভের উচ্চতা মেপে বায়ুমণ্ডলীয় চাপ নির্ধারিত হয়। এর মূল তথ্য হলো, এই পারদ-স্তম্ভের ওজনের সমান হবে স্থানীয় বায়ুমণ্ডলীয় চাপ; যেহেতু নিচের খোলা পাত্রের পারদের উপরে বায়ুর যে চাপ পড়ে নলের পারদ-স্তম্ভের ওজন স্বভাবতঃই তার সমান হবে। পারদ-ভর্তি এরূপ লম্বা নল অন্য পাত্রের পারদের মধ্যে উল্‌টে না ধরে একটা বাঁকানো নলে পারদ নিলেও বস্তুতঃ একই কাজ হয়। সাধারণ আবহাওয়ায় বায়ুর চাপ প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে 76 সেন্টিমিটার দীর্ঘ পারদ-স্তম্ভের ওজনের সমান হয়ে থাকে। এক বর্গ ইঞ্চি স্থানের উপর বায়ুর চাপ সাধারণতঃ হয় প্রায় 15 পাউণ্ড, অর্থাৎ প্রায় 7·5 সের। ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন উচ্চতায় বায়ুমণ্ডলের এই চাপের তারতম্য ঘটে (বয়েলিং পয়েণ্ট ↑)। এ ছাড়া বায়ুর চাপ নির্ধারণের জন্যে অ্যানিরয়েড ↑ প্রভৃতি নানা ধরনের ব্যারোমিটারও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ব্যারোমিটার

ব্যারিস্ফিয়ার (barysphere) — ভূ-গোলকের কেন্দ্রে সর্বাধিক ভারী যে গলিত ধাতব পদার্থ-পিণ্ড রয়েছে বলে অনুমান করা হয়। পৃথিবীর আদি গলিত অবস্থায় গলিত শিলার চেয়ে ধাতু অপেক্ষাকৃত ভারী ছিল বলে এই তরল ধাতু-পিণ্ড সর্বনিম্নে রয়েছে এবং তার উপরে ক্রমে অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা কঠিন শিলা-স্তরের আবরণ (লিথোস্ফিয়ার ↑) গঠিত হয়েছে।

ব্যাল্‌সাম (balsam) — রজন (রেজিন ↑) জাতীয় বিশেষ শ্রেণীর উদ্ভিজ্জ আঠালো পদার্থ। সাধারণতঃ উদ্বায়ী সর্বপ্রকার ঘন ও আঠালো উদ্ভিজ্জ রসকেই ব্যাল্‌সাম বলা হয়। (ক্যানাডা ব্যালসাম ↑)।

ব্যালান্স (balance) — পরিমাপক যন্ত্র; সাধারণ ওজন পরিমাপের জন্যে বাট্‌কারা হাত-পাল্লা, স্প্রিং-ব্যালান্স ↑ প্রভৃতি নানাপ্রকার পরিমাপক যন্ত্র আছে। রসায়নাগারে ব্যবহৃত অতি সূক্ষ্ম পরিমাপ-যন্ত্রকে বলে 'কেমিক্যাল ব্যালান্স'। এক গ্র্যামের ↑ হাজার ভাগের এক ভাগ ওজন পর্যন্ত এতে মাপা চলে; কোন-কোন ব্যালান্সে আরও সূক্ষ্ম মাপ সম্ভব হয়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে এরূপ বিভিন্ন ধরনের ব্যালান্স ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যন্ত্রটা একটা কাঁচের বাক্সের মধ্যে রক্ষিত

থাকে, যাতে বাইরের বায়ু প্রবাহে ওজনের কোন ব্যাঘাত না ঘটে। অতি সূক্ষ্ম ও নিখুঁত ওজনের জন্যে এতে নানা রকম যান্ত্রিক ব্যবস্থাদি থাকে। এর লিভার ↑ দণ্ড-টার ঠিক মধ্য-স্থলে সংলগ্ন থাকে কঠিন অ্যাগেট ↑ প্রস্তরে নির্মিত একটা ত্রিকোণ ফাল-ক্রাম ↑; সেটা আবার অ্যাগেট-নির্মিত একটা স্থির সমতলের উপরে বসানো থাকে। সাধারণ কেমিক্যাল ব্যালেন্সের একটা মোটামুটি চিত্র দেওয়া হলো।
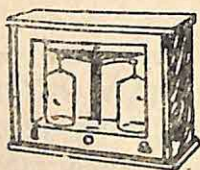
কেমিক্যাল ব্যালান্স

ব্যাল্‌নিওথেরাপি (balneotherapy) — রোগীকে উষ্ণ, বা ঠাণ্ডা জলে নানাভাবে স্নান করিয়ে, বা নিমজ্জিত রেখে কোন কোন বিশেষ রোগের এক রকম চিকিৎসা-পদ্ধতি (হাইড্রোপ্যাথি ↑)। **ব্যাল্‌নিও** মানে 'স্নান', বা স্নান সম্বন্ধীয়।

ব্যালাস্ট (ballast) — খালি, বা অল্প বোঝাই জাহাজকে সমুদ্র-তরঙ্গের আন্দোলনে স্থির রাখবার জন্যে প্রস্তরাদি অথবা যে-সব ভারী জিনিস বোঝাই করা হয়। রেলপথের পাথর-কুচির আস্তরণকেও 'ব্যালাস্ট' বলে।

ব্যালিস্টিক্‌স (ballistics) — বন্দুক, কামান প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্রের কার্য-কারিতা (ভিতরে গ্যাসীয় চাপ কতটা হবে, গোলাগোলি কত জোরে, কত দূরে নিক্ষিপ্ত হবে ইত্যাদি) সম্পর্কীয় বিজ্ঞান। পরীক্ষামূলকভাবে নিক্ষিপ্ত গোলার শক্তি পরীক্ষার জন্যে যে ঝুলানো কাষ্ঠখণ্ড, বা বালির বস্তার উপরে গোলা-গোলি ছোড়া হয় তাকে বলে **ব্যালিস্টিক পেণ্ডুলাম** (ballistic pendulum)।

ব্রঙ্কাই (bronchi) — আমাদের শ্বাস-নলের যে শাখাদু'টি দুই ফুসফুসে প্রবেশ করেছে। এদের স্ফীতি ও প্রদাহ জনিত রোগকে বলে **ব্রঙ্কাইটিস** (bronchitis)। ব্রঙ্কাই থেকে যে সব সরু নল দুই ফুস্‌ফুসের ভিতরে সূক্ষ্ম শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে গেছে তাদের সাধারণভাবে বলা হয় **ব্রঙ্কিওল্‌স**।
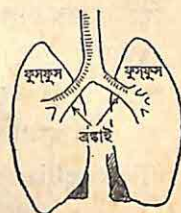
'ব্রঙ্কাই' নলদ্বয়

ব্রাইট্‌স ডিজিজ (Bright's disease) — মূত্রাধার, বা কিড্‌নির ↑ প্রদাহ-জনিত রোগের বিশেষ নাম।

ব্রাইয়োফাইটা (Bryophyta) — মস্ ↑ জাতীয় উদ্ভিদ শ্রেণী; বিভিন্ন শৈবাল জাতীয় যে-সব উদ্ভিদ স্পোর ↑ পদ্ধতিতে বংশবৃদ্ধি করে তাদের সাধারণ নাম। **ব্রাইয়োলজি** (Bryology) — শৈবাল-বিজ্ঞান; উদ্ভিদ-বিদ্যার অন্যতম শাখা।

ব্রাস (brass) — পিতল; প্রধানতঃ তামা ও দস্তার সংমিশ্রণে প্রস্তুত সংকর-ধাতু। অনুপাত ও উপাদানের তারতম্যে বিভিন্ন শ্রেণীর 'ব্রাস', বা পিতল তৈরি হয়ে থাকে।

ব্রুয়িং (brewing) — জৈব পদার্থের বিশেষ ধরনের পচন, বা 'গাঁজন ক্রিয়া'।

এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে বিয়ার (মদ্য) প্রস্তুত হয়। বার্লি, চাল প্রভৃতি শ্বেতসার জাতীয় পদার্থের চূর্ণ (মণ্ট↑) জল-মিশ্রিত করে রাখলে কয়েক দিনের মধ্যেই গেঁজে গিয়ে তার শ্বেতসার মল্টোসে↑ রূপান্তরিত হয়। মিষ্ট স্বাদযুক্ত ওই তরল পদার্থ ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে ছেঁকে নিলে যে পরিস্রুত তরল পদার্থ পাওয়া যায়, তাতে ঈস্ট↑ দিয়ে পুনরায় গাঁজিয়ে নিলে 'বিয়ার' তৈরি হয়। মোটামুটি এই প্রক্রিয়াকে 'ব্রুয়িং' বলা হয়।

ব্রোমিন (bromine) — মৌলিক পদার্থ; সাংকেতিক চিহ্ন Br; পারমাণবিক ওজন 79·916, পারমাণবিক সংখ্যা 35; গাঢ় লাল উদ্বায়ী তরল পদার্থ, শ্বাসরোধকারী তীব্র গন্ধবিশিষ্ট। হ্যালোজেন↑ শ্রেণীর অন্যতম মৌলিক পদার্থ। হাইড্রোজেনের সঙ্গে এর রাসায়নিক মিলনে হাইড্রোব্রোমিক↑ অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। এর বিভিন্ন সল্টকে ব্রোমাইড↑ বলে। ঔষধ হিসেবে ও ফটোগ্রাফির↑ কাজে যথেষ্ট দরকার হয়। খনিজ ম্যাগ্নেসিয়াম ব্রোমাইড ও বিভিন্ন সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও জীবদেহ থেকে বিভিন্ন উপায়ে ব্রোমিন পাওয়া যায়। সাধারণ তাপ ও চাপে একমাত্র অ-ধাতব তরল মৌল।

ব্রোমাইড (bromide) — হাইড্রোব্রোমিক অ্যাসিড (HBr) একটা বাইনারি↑ কম্পাউণ্ড, যা হাইড্রোজেন ও ব্রোমিনের রাসায়নিক মিলনে গঠিত একটি অ্যাসিড। এই হাইড্রোব্রোমিক অ্যাসিডের বিভিন্ন সল্ট হলো ব্রোমাইড; যেমন — পটাসিয়াম ব্রোমাইড, KBr, ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়; সিলভার ব্রোমাইড, AgBr, একটি আলোক-সুবেদী রাসায়নিক পদার্থ; যা ফটোগ্রাফির↑ কাজে একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান।

ব্রোমাইড পেপার (bromide paper) — সিলভার ব্রোমাইড, AgBr, সল্ট মাখানো এক ধরনের বিশেষ কাগজ; যার উপরে ফটোগ্রাফির↑ ছবি তোলা হয়।

ব্রোঞ্জ (bronze) — টিন ও তামার সংমিশ্রণে উৎপন্ন সংকর-ধাতু। অবশ্য, টিন না থাকলেও কোন-কোন সংকর ধাতুকে ব্রোঞ্জ বলা হয়; যেমন, তামা ও অ্যালুমিনিয়ামের সংকর-ধাতুকে বলে 'অ্যালুমিনিয়াম ব্রোঞ্জ'।

ব্রোঞ্জ এজ (bronze age) — প্রাগৈতিহাসিক যে যুগে মানুষ ব্রোঞ্জের উৎপাদন ও ব্যবহার আয়ত্ব করেছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়; অনেকটা সভ্য যুগ; — আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব 2000 বছর পূর্বের যুগ।

ব্র্যাগ (Bragg), স্যার উইলিয়াম — বৃটিশ পদার্থ-বিজ্ঞানী; জন্ম 1862 খৃষ্টাব্দ, মৃত্যু 1942 খৃষ্টাব্দ। পুত্র উইলিয়াম **লরেন্স ব্র্যাগ**-ও খ্যাতনামা পদার্থ-বিজ্ঞানী। পুত্রের সহযোগিতায় এক্স-রে↑, রেডিও অ্যাক্টিভিটি↑, ক্রিস্ট্যালোলজি↑ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদির আবিষ্কার। পিতাপুত্র মিলিতভাবে 1915 খৃষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভ।

ব্রাহি, টাইকো (Brahe, Tycho)— ডেনমার্কবাসী জ্যোতির্বিজ্ঞানী; জন্ম 1546 খৃষ্টাব্দ, মৃত্যু 1601 খৃষ্টাব্দ।

'কেসিওপিয়া' নামক নূতন নক্ষত্র আবিষ্কার। সে-যুগে উপযুক্ত যন্ত্রাদির অভাবেও গগন-পর্যবেক্ষণে অপূর্ব দক্ষতা ও নির্ভুল গণনা; যে-সব তথ্যের ভিত্তিতে পরবর্তীকালে গ্যালিলিও ↑ ও কেপ্‌লারের ↑ পক্ষে বিশ্ব-রহস্যের বহু জটিল তথ্যাদির আবিষ্কার সম্ভবপর হয়েছে।

ব্রুটেনিয়া মেটাল (Britania metal)—বিভিন্ন গঠনের বিশেষ এক শ্রেণীর সংকর-ধাতু। এর মধ্যে প্রধানতঃ থাকে 80% থেকে 90% টিন ↑, সামান্য কিছু অ্যান্টিমনি ↑ ও কপার (তামা); কখন-কখন সামান্য দস্তা এবং সীসাও মেশানো হয়। রূপোর মত সাদা এই শ্রেণীর সংকর-ধাতু ↑ দিয়ে বিশেষতঃ চামচ, চায়ের পাত্রাদি তৈরি করা হয়ে থাকে।

ব্রিটিশ থার্ম্যাল ইউনিট (British thermal unit)—উচ্চ তাপের একটি একক বিশেষ; যে পরিমাণ তাপশক্তির (হিট ↑) প্রয়োগে এক পাউণ্ড জলের উষ্ণতা এক ডিগ্রি ফারেনহাইট ↑ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। ক্যালোরির ↑ হিসেবে এই তাপ-শক্তির পরিমাণ হলো 252 ক্যালোরি (থার্ম ↑)।

ব্ল্যাক অ্যাশ (black ash)—লে ব্ল্যাঙ্ক ↑ প্রণালীতে যে অবিশুদ্ধ ও অপরিষ্কৃত ওয়াশিং সোডা, Na_2CO_3, (সোডিয়াম কার্বনেট ↑) উৎপাদিত হয়ে থাকে, তার বিশেষ নাম।

ব্ল্যাক লেড (black lead)—গ্র্যাফাইট ↑; একে 'প্লাম্বাগো'-ও ↑ বলা হয়। খনিজ স্ফটিকাকার পিচ্ছিল পদার্থ। রাসায়নিক হিসেবে পদার্থটা কার্বনের একটা অ্যালোট্রোপ ↑; নরম ও কালো কঠিন পদার্থ, যা দিয়ে সাধারণতঃ পেন্সিলের শিস্‌ তৈরি হয়ে থাকে (পেন্সিল লেড ↑)। যন্ত্রাদিতে ব্যবহারের জন্যে এক রকম পিচ্ছিল তৈলাক্ত পদার্থ (লুব্রিক্যান্ট ↑) তৈরি করবার জন্যেও পদার্থটা বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ব্ল্যাস্ট ফার্ণেস (blast furnace)—অবিশুদ্ধ খনিজ লৌহ থেকে মোটামুটি বিশুদ্ধ লৌহ নিষ্কাশনের জন্যে ব্যবহৃত এক রকম চুল্লি বিশেষ। 'ফায়ার-ব্রিক' ও ইস্পাতের চাদর দিয়ে এরূপ চুল্লি তৈরি করা হয়। 'কন্‌ভার্টার' নামক পাত্রে লাইম ষ্টোন ↑ ($CaCO_3$) ও কয়লার সঙ্গে খনিজ লৌহ মিশিয়ে এই চুল্লিতে প্রচণ্ডতাপে উত্তপ্ত করা হয়। নিচের ছিদ্র পথে ওর মধ্যে পাম্প করে বায়ু-প্রবাহ প্রবেশ করানো হয়। এর ফলে কয়লা আংশিক ভাবে পুড়ে কার্বন-মনোক্সাইড, CO, গ্যাস উৎপন্ন হয়। ওই কার্বন-মনোক্সাইড গ্যাস লৌহ-খনিজের আয়রন-অক্সাইডকে বিজারিত, অর্থাৎ রিডিউস ↑ করে বিশুদ্ধ লোহায় রূপান্তরিত করে। উত্তাপের ফলে আবার চুল্লীর লাইম-ষ্টোন বিশ্লিষ্ট হয়ে লাইম (CaO) ও কার্বন
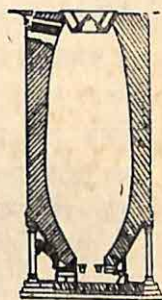
'কন্‌ভার্টার'

ডাইঅক্সাইড (CO_2) গ্যাস জন্মায়। এই লাইম ↑ লৌহ-খনিজের সঙ্গে মিশ্রিত বালি ও বিভিন্ন ময়লা নিয়ে তরল লৌহের উপরে গাঁদের (বেসিক স্ল্যাগ ↑) আকারে পৃথক হয়ে ভেসে ওঠে। ফার্ণেসের তলদেশের ছিদ্রপথে তরল লোহা বার করে নেওয়া হয়। এই লোহাকেই 'পিগ্-আয়রন', বা 'কাস্ট আয়রন' ↑ বলে।

ব্লিচিং পাউডার (bleaching powder)—'ক্লোরাইড অব লাইম' ; এক রকম সাদা চূর্ণ পদার্থ। প্রধানতঃ এর মধ্যে সক্রিয় রাসায়নিক যৌগ হিসেবে থাকে ক্যালসিয়াম অক্সি-ক্লোরাইড, $CaOCl_2$। বিশেষরাসায়-নিক প্রক্রিয়ায় স্লেক্‌ড লাইম ↑, অর্থাৎ ক্যালসিয়াম-হাইড্রক্সাইডের [$Ca(OH)_2$] মধ্যে ক্লোরিন ↑ গ্যাস অন্তঃ-প্রবিষ্ট করে পদার্থটা তৈরি করা হয়। দুর্গন্ধ ও জীবাণু নাশক ডিসিন্-ফ্যাক্ট্যাণ্ট ↑ হিসেবে 'ব্লিচিং পাউডার' যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। বস্ত্রাদি বর্ণহীন সাদা ধব্ধবে করবার জন্যেও এর বিশেষ ব্যবহার আছে। রঙীন জিনিসের জৈব রঞ্জক পদার্থ এর রাসা-য়নিক ক্রিয়ার ফলে বর্ণহীন হয়ে যায়। মূলতঃ অবশ্য এটা একটা শক্তিশালী অক্সিডাইজিং এজেণ্টের ↑ কাজ করে থাকে। বস্ত্র, কাগজ প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্পে এই প্রক্রিয়াকে বলে 'ব্লিচিং', বা বর্ণহীন করা।

ব্লু-ভিট্রিয়ল (blue vitriol) — কপার সালফেট সল্টের ($CuSO_4.5H_2O$) বিশেষ নাম। স্ফটিকাকার নীল বর্ণের রাসায়নিক পদার্থ। একে 'ব্লু-স্টোন'-ও বলা হয় ; বাংলায় বলে 'তুঁতে'। পোকা-মাকড়ের উৎপাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে এর জলীয় দ্রব গাছ-পালায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

ব্লু-প্রিণ্ট (blue-print) — নীলবর্ণের এক রকম কাগজের উপরে বিশেষ কৌশলে সাদা রেখায় অঙ্কিত নক্সাদি। এক রকম আলোক-সুগ্রাহী কাগজের উপরে মোটামুটি ফটোগ্রাফির ↑ প্রক্রিয়ায় এ-রকম নক্সা ফুটিয়ে তোলা হয়। সাধারণ কাগজের উপরে পটাসিয়াম ফেরিসায়েনাইড, $K_3Fe(CN)_6$, ও কোন জৈব অ্যাসিডের ফেরিক সল্ট মাখিয়ে কাগজটাকে এরূপ আলোক-সুগ্রাহী করা হয়ে থাকে। সাধারণ কালি দিয়ে অঙ্কিত নক্সার কাগজটা উল্লিখিত কাগজের উপর চেপে কিছু সময় রোদে রাখা হয়। সূর্যালোকের প্রভাবে কাগজটায় মাখানো ওই ফেরিক সল্ট ↑ ফেরাস সল্টে রূপান্তরিত হয়ে পটাসিয়াম ফেরিসায়েনাইডের সঙ্গে রাসায়নিক সংযোগে প্রুসিয়ান-ব্লু ↑ উৎপন্ন হয়ে ওই কাগজের গায়ে এঁটে লেগে যায়। সূর্যালোকের অভাবে কালির দাগ-গুলির নিচে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে না, কাজেই দাগগুলির নিচেটা অবিকৃত থাকে। পরে ওই কাগজ জলে ধুয়ে নিলে পরিষ্কার ব্লু-প্রিণ্ট পাওয়া যায়। দাগের নিচের অবিকৃত ফেরিক সল্ট ও পটাসিয়াম ফেরিসায়ে-নাইড ধুয়ে গিয়ে নক্সার দাগগুলো ফটোগ্রাফির মত ওই নীল রঙের

উপরে সাদা রেখায় ফুটে ওঠে। এরূপ ব্লু-প্রিণ্টের জন্যে ব্যবহৃত ওইরূপ আলোক-সুগ্রাহী কাগজকে **ফেরো-প্রুসিয়েট পেপার** (ferro-prusiate paper) বলা হয়।
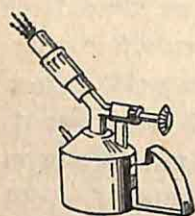
ব্লো-ল্যাম্প (blowlamp) — এক প্রকার যান্ত্রিক বাতি, যার সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে কোন জ্বালানী তেলের বাষ্প (বা গ্যাস) চাপ-প্রভাবে সজোরে বায়ু-মধ্যে নির্গত হতে থাকে এবং তা জ্বালালে অত্যুত্তপ্ত আলোক-শিখার সৃষ্টি করে।

ব্লো-ল্যাম্প

ব্লো-পাইপ (blow pipe)—সূক্ষ্মাগ্র ধাতব নল; দীপ-শিখায় (বুনসেন বার্ণার↑)যার অগ্রভাগ প্রবেশ করিয়ে অপর প্রান্তে ফুঁ দিয়ে অত্যুত্তপ্ত শিখা সৃষ্টি করা হয়। বিশেষতঃ রসায়নাগারেই এটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ভ

ভলাণ্টারি (voluntary) — ঐচ্ছিক, ইচ্ছানুসারে পরিচালিত; যেমন — **ভলাণ্টারি মাস্‌ল** হলো জীবদেহের যে-সব মাংসপেশী (মাস্‌ল↑) ঐচ্ছিক স্নায়ুর (ভলাণ্টারি নার্ভ↑) ক্রিয়ায় ইচ্ছানুযায়ী সঞ্চালন করা যায়; যেমন—হাত, পা, বুক, পেট প্রভৃতির মাংস-পেশীগুলি। কিন্তু ফুস্‌ফুস্, বা হৃৎপিণ্ডের (হার্ট↑) মাস্‌ল স্বতঃই চলে, জীবের ইচ্ছাধীন নয়; এদের বলে **ইন্‌ভলাণ্টারি মাস্‌ল** (involuntary muscle)।

ভলিউম (volume) — আয়তন; ঘন পরিমাণ। কোন বস্তু তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ নিয়ে যতটা স্থান অধিকার করে থাকে, তার পরিমাণকে বস্তুটার ভলিউম, বা আয়তন বলে; এবং তা 'ঘন' বা 'কিউবিক' এককে পরিমিত হয়ে থাকে; যেমন — 'ঘন ফুট,' 'কিউবিক সেন্টিমিটার' ইত্যাদি।

ভলিউম মেজার (volume measure) — বস্তুর আয়তন, বা ঘন পরিমাণের বিভিন্ন একক-কে বলে 'কিউবিক,' বা 'ভলিউম মেজার'। যেমন — কঠিন পদার্থের বেলায় বৃটিশ পদ্ধতিতে :

1728 ঘন ইঞ্চি = 1 ঘন ফুট
27 ঘন ফুট = 1 ঘন ইয়ার্ড
(এক ঘন ইঞ্চি = 16·387 ঘন সেন্টিমিটার↑)

আবার, তরল পদার্থের বেলায় :

4 জিল = 1 পাঁইট, বা ·5682 লিটার↑
2 পাঁইট = 1 কোয়ার্ট
4 কোয়ার্ট = 1 গ্যালন↑ = 4·546 লিটার

(মেট্রিক এককে)

1000 কিউবিক মিলিমিটার = 1 কিউবিক সেন্টিমিটার (সি. সি.)
1000 কিউবিক সেন্টিমিটার = লিটার (প্রায়)

ভলিউমেট্রিক অ্যানালিসিস (volumetric analysis) — আয়তনিক বিশ্লেষণ; কোন পদার্থের সংগঠক উপাদানগুলির আয়তনের

শতাংশিক পরিমাপ নির্ধারণের জন্যে যে পদ্ধতিতে তাকে বিশ্লেষণ করা হয়। পদার্থটার দ্রবণের সঙ্গে অপর কোন পদার্থের জানা-শক্তিবিশিষ্ট দ্রবণের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে উভয়ের আয়তনিক পরিমাণ স্থির করা যায় ; এবং তার থেকে অজানা পদার্থটার আয়তনের হিসেবে মূল পদার্থটার উপাদানিক গঠন জানা যেতে পারে ; এর জন্যে সাধারণতঃ কোন ক্ষারীয় (অ্যাল্‌কালি ↑) দ্রবণের সঙ্গে বিশেষ কোন অ্যাসিডের পরিমাণগত বিক্রিয়া ঘটানো (টাইট্রেশন ↑) হয়ে থাকে।

ভাইরাস (virus) — সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রোগ-জীবাণু, অথবা রোগ-সৃষ্টিকারী জীবকণা। এরা আকারে ক্ষুদ্রতম ব্যাক্টেরিয়া ↑ থেকেও ক্ষুদ্র ; এত ক্ষুদ্র যে, অণুবীক্ষণেও সাধারণতঃ এদের দেখা যায় না। অবশ্য 'ইলেক্‌ট্রন মাইক্রোস্কোপে' ↑ আজকাল কোন-কোন ভাইরাস বহু গুণ বর্ধিতাকারে দেখা সম্ভব হয়েছে। ভাইরাস নানা শ্রেণীর আছে ; বিভিন্ন ভাইরাসের আক্রমণে জলাতঙ্ক, বসন্ত, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হয়। ব্যাক্টেরিয়া শ্রেণীর বিভিন্ন জীবাণুরা অপর কোন জৈব পদার্থ আশ্রয় না করেও বেঁচে থাকতে ও সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে ; কিন্তু ভাইরাসগুলো সজীব দেহ আশ্রয় না করে বাঁচে না, বংশ-বৃদ্ধিও করতে পারে না। বিভিন্ন পরীক্ষার ফলে মনে হয়, এ-গুলো অতি জটিল গঠনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এক প্রকার সজীব পদার্থ মাত্র ; হয়তো বিশেষ এক রকম জীব-ধর্মী প্রোটিন ↑ কণিকা হতে পারে। ভাইরাসের গঠন-সম্পর্কিত সঠিক তথ্যাদি অদ্যাপি সম্যক জানা যায় নি।

ভার্চুয়াল ইমেজ (virtual image) —সাধারণ সমতল দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে কোন বস্তুর যেরূপ প্রতিচ্ছায়া, বা প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়। এ-রকম প্রতিফলনের ফলে বস্তু থেকে আগত
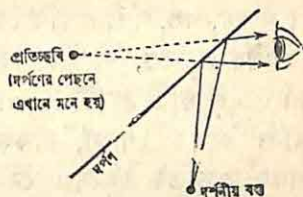
ভার্চুয়াল ইমেজ

আলোক-রশ্মি দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে দর্শকের চোখে পড়ে সত্য ; কিন্তু যেখানে প্রতিচ্ছায়াটা দেখা যায়, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু বস্তুটা থেকে কোন আলোক-রশ্মি সেখানে যায় না, বা সেখান থেকে কোন আলোক - রশ্মি দর্শকের চোখে আসেও না। এ-রকম 'ইমেজ' ↑, বা প্রতিবিম্ব আলোক-রশ্মির প্রত্যক্ষ প্রতিফলন নয় ; কাজেই তা পর্দায় ফেলা সম্ভব হয় না। এরূপ অপ্রকৃত, বা অবাস্তব প্রতিচ্ছায়া, বা প্রতিবিম্বকে 'ভার্চুয়াল ইমেজ' বলা হয়।

ভার্টিকাল (vertical) — লম্ব, অর্থাৎ সমকোণে দণ্ডায়মান অবস্থা ; যেমন, **ভার্টিকাল বয়লার**, স্টিম-ইঞ্জিনের যে বাষ্পাধার দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকে। অবশ্য রেল-ইঞ্জিনের বয়লার থাকে ভূ-সমান্তরাল, অর্থাৎ শোয়ানো,

(হোরাইজণ্টাল) অবস্থায়। **ভার্টিকাল** অ্যাঙ্গেল (vertical angle) — বিপরীত, অথবা বিপ্রতিক কোণ (জ্যামিতিক)।

ভার্টিগো (vertigo) — মাথা-ঘোরা রোগ ; যার ফলে রোগীর চারদিকের সব জিনিস যেন ঘুরছে-দুলছে বলে মনে হয়।

ভার্টিব্রেট (vertebrate)—মেরুদণ্ডী প্রাণী ; মানুষ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি যে-সকল প্রাণীর মেরুদণ্ড, বা শিরদাঁড়া আছে। এদের **ভার্টিব্রাটা** (vertibrata)-ও বলে। পোকা, মাকড়, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতির মেরুদণ্ড নেই বলে এই শ্রেণীর জীবকে বলে 'ইন্‌ভার্টিব্রেট', বা অ-মেরুদণ্ডী প্রাণী।

ভার্টেক্স (vertex) — শীর্ষ-ভাগ, কোন কিছুর সর্বোচ্চ অংশ ; যেমন—মাথার উপরিভাগ, ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু।

ভার্ডিগ্রিস (verdigris)—অব্যবহারে জল-হাওয়ার প্রভাবে বিশুদ্ধ তামার জিনিসের উপরে সবুজ বর্ণের যে পদার্থ সৃষ্টি হয়। রাসায়নিক হিসেবে পদার্থটা হলো কপার-কার্বনেট, অথবা বেসিক কপার অ্যাসিটেট ↑ ; বায়ুতে মিশ্রিত বিভিন্ন পদার্থের সঙ্গে তামার রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে এরূপ এক প্রকার যৌগিক স্বভাবতঃ সৃষ্টি হয়ে থাকে। বিশেষ বিষাক্ত পদার্থ।

ভার্ণাল ইকুইনক্স (vernal equinox) — বসন্তকালের যে-দিনে পৃথিবীর সর্বত্র দিন-রাত্রি সমান হয় ; এই দিনে পৃথিবী সূর্য-পরিক্রমার পথে যে অবস্থানে আসে। এ-দিনে সূর্য দ্বিপ্রহরে ঠিক মাথার উপরে নিরক্ষরেখার বরাবর থাকে, দিন-রাত্রি সমান হয়। প্রতি বছর 21শে মার্চ তারিখ হলো পৃথিবীর এই 'ভার্ণাল ইকুইনক্স' অবস্থা। পৃথিবীর বার্ষিক গতির ফলে এই দিনে সূর্য ও পৃথিবী মহাশূন্যে এরূপ এক বিশেষ অবস্থানে আসে (ইকুইনক্স ↑ 'অটামন্যাল')।

ভার্নিয়ার, পিরি (Vernier, Pierre) —ফরাসী গণিতজ্ঞ পণ্ডিত; জন্ম 1580 খৃস্টাব্দ, মৃত্যু 1637 খৃস্টাব্দ। সূক্ষ্ম পরিমাপের জন্যে বিখ্যাত 'ভার্নিয়ার স্কেল' ↑ নামক দৈর্ঘ-পরিমাপক যন্ত্র উদ্ভাবনে চিরস্মরণীয়।

ভার্নিয়ার স্কেল (vernier scale) — দৈর্ঘ্যের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ পর্যন্ত পরিমাপের উপযোগী এক বিশেষ ধরনের স্কেল। সাধারণ স্কেলে সচরাচর ইঞ্চির দশমাংশের দাগ কাটা থাকে। এই ভার্নিয়ার স্কেল-যন্ত্রের সাহায্যে ওই দশমাংশ ইঞ্চিরও অনেক সূক্ষ্মতর মাপ পাওয়া সম্ভব হয়ে থাকে। যে-কোন এককের এরূপ ভার্নিয়ার স্কেলে সাধারণ স্কেলের গায়ে সূক্ষ্মতর অংশাঙ্কিত আর একটি চলমান স্কেল লাগানো থাকে ; যেটা সরিয়ে সরিয়ে হিসাব করে ইঞ্চির শতাংশও এর সাহায্যে সহজে
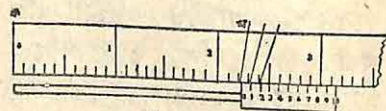
ভার্নিয়ার স্কেল

নির্ণয় করা যেতে পারে। সাধারণতঃ ভার্নিয়ার স্কেলের চলমান অংশে 9/10 বা 0·9 ইঞ্চিকে সমান দশ ভাগে

ভাগ করা থাকে; কাজেই এর প্রত্যেক ভাগ হবে ·09 ইঞ্চি। প্রকৃত স্কেলের দশমাংশ অপেক্ষা ভার্নিয়ার স্কেলের দশমাংশ কাজেই ·01 ইঞ্চি কম; এই ·01 হলো **ভার্নিয়ার কনষ্ট্যাণ্ট**। এখন, যেন (চিত্র ↑) ক থেকে খ বিন্দুর দূরত্ব মাপতে হবে। প্রকৃত স্কেলের 0 বিন্দু ক'এর উপরে রাখা হলো; দেখা গেল, খ' বিন্দু 2·2 ইঞ্চির সামান্য দূরে রয়েছে। এখন ভার্নিয়ার স্কেলের 0 বিন্দু সরিয়ে সরিয়ে খ' বিন্দুর বরাবর রাখলে ওর পরবর্তী কোন্ দাগ প্রকৃত স্কেলের কোন্ দাগের সঙ্গে একেবারে মিলে যায়, তা লক্ষ্য করতে হবে। এখানে দেখা গেল, 3 দাগে এরূপ হয়েছে। সুতরাং সাধারণ স্কেলের মাপ 2·2-এর সঙ্গে ·01×3 যোগ দিয়ে 'ক-খ'-এর সঠিক দৈর্ঘ্য হবে 2·2+·03, অর্থাৎ 2·23 ইঞ্চি হবে। অনুরূপভাবে **সেণ্টিমিটার** স্কেলেও এই ভার্নিয়ার-পদ্ধতি প্রয়োগ করা চলে।

ভার্মিসাইড (vermicide)—পোকা-মাকড় বিনষ্টকারী যে-কোন বিষাক্ত পদার্থ। যে সব রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে বিভিন্ন পোকা-মাকড় ও কীট-পতঙ্গ ধ্বংস হয়। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গকে বলে **ভার্মি-**, বা **ভার্মিন** (vermi-, vermin)।

ভার্মিফিউজ (vermifuge) — যে-সব ভেষজ, বা রাসায়নিক পদার্থ উদরস্থ করলে অন্ত্রে উৎপন্ন ক্রিমি-কীটাদি বিনষ্ট হয়; যেমন, স্যাণ্টোনিন ↑ হলো এরূপ একটা শক্তিশালী 'ভার্মিফিউজ'।

ভার্মিলিয়ন (vermilion) — সিন্দুর; রাসায়নিক হিসেবে মারকিউরিক সালফাইড, HgS; পারদ ও গন্ধকের রাসায়নিক মিলনে গঠিত লাল চূর্ণ পদার্থ। মহিলারা সীমন্তে পরেন; সাধারণ লাল রং (পেইণ্ট) হিসেবেও এর ব্যবহার আছে।

ভাল্‌ব (valve) — (1) কোন ছিদ্র, বা নল-মুখে যান্ত্রিক কৌশলে যে সঞ্চলনশীল চাক্‌তি বা, ছিপি এমন ভাবে বসানো থাকে যাতে তরল, বা গ্যাসীয় পদার্থ কেবল এক দিকে যেতে পারে, কিন্তু বিপরীত দিকে বেরুতে পারে না। (2) বেতার যন্ত্রাদিতে ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌বের মত কাঁচের যে টিউব থাকে, তাকেও সাধারণতঃ ভাল্‌ব বলে; কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে একে বলা উচিত **'থার্মো-আয়োনিক ↑ ভাল্‌ব'**। এর জটিল যান্ত্রিক ব্যবস্থায় দূরাগত ক্ষীণ কম্পনের তড়িত্তরঙ্গকে পরিশোধিত ও পরিবর্ধিত করা সম্ভব হয়।

ভাবা (Bhaba), ডাঃ হোমি জাহাঙ্গীর — বিশিষ্ট ভারতীয় পদার্থ-বিজ্ঞানী; বোম্বাইয়ে জন্ম 1909 খৃস্টাব্দ, মৃত্যু 1966 খৃঃ। শিক্ষা বোম্বাই ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়;—গণিতে 'ট্রাইপস' ও 'রাফেল-বল' বৃত্তি লাভ; এফ.আর.এস। রোমে অধ্যাপক ই. ফ্রেমির অধীনে একাদিক্রমে তিন বার 'অ্যাই-জ্যাক বৃত্তি' লাভ। 'কস্‌মিক-রে' ↑ ও 'নিউক্লিয়ার ফিজিক্স' সম্পর্কিত গবে-ষণায় বিপুল খ্যাতি। বোম্বাইয়ে টাটা রিসার্চ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ; ভারত

সরকারের পরমাণু-শক্তি কমিশনের সভাপতি। 'পদ্ম-বিভূষণ' উপাধি।

ভিটা-গ্লাস (vita-glass) — এক বিশেষ রাসায়নিক গঠনের কাচের ব্যবহারিক নাম। বিশেষ গুণ ও ধর্মে সাধারণ কাচের থেকে এ-কাচের কিছু প্রভেদ আছে। বিশেষতঃ এর স্বচ্ছতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, এর ভিতর দিয়ে সূর্যালোকের আল্‌ট্রাভায়োলেট † রশ্মি অবাধে চলাচল করে।

ভিটামিন (vitamin) — খাদ্য-প্রাণ ; বিভিন্ন খাদ্য বস্তুতে কার্বন-ঘটিত যে-সব অতি সূক্ষ্ম জৈব রাসায়নিক পদার্থ জীব মাত্রেরই পুষ্টি ও বৃদ্ধির পক্ষে অত্যাবশ্যক বলে প্রমাণিত হয়েছে। বিভিন্ন খাদ্যে এই শ্রেণীর বিভিন্ন পদার্থ অতি সূক্ষ্ম পরিমাণে থাকে ; কিন্তু যাদের অভাবে নানা রকম রোগ দেখা দেয়, জীবদেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। খাদ্যের প্রাণ-স্বরূপ এই শ্রেণীর অত্যাবশ্যক পদার্থগুলোকে বলা হয় ভিটামিন ; বাংলায় বলে 'খাদ্য-প্রাণ'। পূর্বে বিভিন্ন খাদ্য-উপাদানে এদের বিভিন্ন গুণাগুণ মাত্র বিচার করে ভিটামিন-এ, ভিটামিন-বি, সি, ডি প্রভৃতি নাম দেওয়া হয়েছিল। সাম্প্রতিক গবেষণায় বিভিন্ন ভিটামিনের রাসায়নিক স্বরূপ ও গঠনও অনেক ক্ষেত্রে জানা গেছে।

ভিটামিন-এ (vitamin-A)—রাসায়নিক হিসেবে এই জৈব পদার্থটা হলো $C_{20}H_{22}OH$; দুধ, মাখন, তাজা শাকসব্জি, মাছের তেল, চর্বি প্রভৃতিতে থাকে। খাদ্যে ক্রমাগত দীর্ঘ দিন এর অভাব ঘটলে 'রাত-কানা' রোগ হয়, দৃষ্টিশক্তি কমে যায়, গাত্রচর্ম তৈলহীন খস্‌খসে হয়ে ওঠে।

ভিটামিন-বি (vitamin-B) — সম-পর্যায়ের অনেকগুলো রাসায়নিক পদার্থ বুঝায় ; এদের একসঙ্গে বলা হয় 'ভিটামিন-বি-কমপ্লেক্স'। ভিটামিন-বি$_1$ (অ্যানিউরিন, বা থায়ামিন) গম, চাউল প্রভৃতি খাদ্যশস্যের বহিরাবরণে থাকে ; অভাবে শক্তিহীনতা, অগ্নিমান্দ্য ও বেরিবেরি রোগ জন্মায়। ভিটামিন-বি$_2$ (ল্যাক্টোফ্লেবিন, বা রিবোফ্লেবিন †) দুধ, ডিম প্রভৃতিতে থাকে ; অভাবে চর্মরোগ হয়, শিশুরা উপযুক্তরূপে বাড়ে না। ভিটামিন-বি$_{12}$ (ফোলিক অ্যাসিড) একটি লালচে ক্ষুদ্র স্ফটিকাকার রাসায়নিক পদার্থ ; কোন-কোন তাজা শাকসব্জি, জীবজন্তুর লিভার ও ঈস্ট † প্রভৃতি থেকে পাওয়া যায়। খাদ্যে এ-জাতীয় ভিটামিনের অভাবে বিশেষতঃ রক্তহীনতা রোগ দেখা দেয়।

ভিটামিন-সি (vitamin-C), (অ্যাস্কর্বিক অ্যাসিড) — টাট্‌কা শাকসব্জি ও ফলের রসে যথেষ্ট থাকে। অভাবে স্কার্ভি † রোগ হয়।

ভিটামিন-ডি (vitamin-D), (ক্যাল্‌সিফেরল) — বিভিন্ন মাছের যকৃতের তেলে পদার্থটা থাকে। সূর্য-কিরণের প্রভাবে মানুষের দেহে এটা স্বভাবতঃই কিছু জন্মায়। এর রাসায়নিক প্রভাবে খাদ্যের ক্যালসিয়াম উপাদান দেহের হাড় গঠনে সাহায্য করে। কাজেই পদার্থটার অভাবে দেহের

হাড় শক্ত হয় না ; বিশেষতঃ শিশুদের রিকেট ↑ রোগ দেখা দেয়।

ভিটামিন-ই (vitamin-E)—বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ তেল ও তাজা শাকসব্জিতে থাকে। খাদ্যে ক্রমাগত এর অভাবে স্ত্রীলোকেরা বন্ধ্যা হয়, প্রজনন-শক্তি লোপ পায়।

ভিটামিন-এইচ (vitamin-H) — পদার্থটার রাসায়নিক নাম বায়োটিন ↑ ; জীবজন্তুর লিভারে ও ঈষ্টে ↑ থাকে। অনেক ক্ষেত্রে কাঁচা ডিমের শ্বেতাংশ খেলে (টক্স্যামিন ↑) এর জৈব ক্রিয়া নষ্ট হয়ে যায়। অভাবে বিভিন্ন দুরারোগ্য চর্মরোগ জন্মায়।

ভিটামিন-কে (vitamin-K)—স্বভাবতঃই মানুষের দেহাভ্যন্তরে সৃষ্টি হয়ে থাকে। টাট্‌কা মাখনে ও উদ্ভিদের সবুজ পাতায় পদার্থটা থাকে। অভাবে রক্তের জমাট বাঁধার ক্ষমতা লোপ পায়, তার ফলে কেটে-কুটে গেলে অজস্র রক্তপাত হতে থাকে।

এ-গুলো ছাড়া বিভিন্ন প্রকার খাদ্যে আরও নানা রকম ভিটামিনের সন্ধান পাওয়া গেছে। বিভিন্ন খাদ্যবস্তুর গুণাগুণ বিচার ও বিশেষ রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে নানা রকম নতুন-নতুন ভিটামিন ক্রমে আবিষ্কৃত হচ্ছে।

ভিট্রিয়ল (vitriol) — কন্সেণ্ট্রেটেড সালফিউরিক অ্যাসিডকে (H_2SO_4) 'অয়েল অব ভিট্রিয়ল' ↑ বলা হয়। এ-জন্যে বিভিন্ন সালফেট সল্ট ↑ তাঁদের বর্ণানুসারে বিভিন্ন 'ভিট্রিয়ল' নামে পরিচিত হয়েছে; যেমন—**ব্লু ভিট্রিয়ল** হলো কপার সালফেট, $CuSO_4$, $5H_2O$; **গ্রিন-ভিট্রিয়ল** হলো ফেরাস সালফেট, $FeSO_4$. $7H_2O$; আর **হোয়াইট ভিট্রিয়ল** বলতে মুখ্যতঃ বুঝায় জিঙ্ক সালফেট, $ZnSO_4$, $7H_2O$। এরূপ ভিট্রিয়ল সল্টগুলো সবই হয় স্ফটিকাকার ; —আর এদের প্রত্যেকটারই গঠনে 'ওয়াটার অব ক্রিস্টালিজেশন' ↑ থাকে।

ভিট্রিয়াস (vitreous) — কাচ-সদৃশ, কাচের মত (স্বচ্ছ) ; যেমন, **ভিট্রিয়াস হিউমার** হলো চক্ষু-গোলকের অভ্যন্তরে স্বচ্ছ (কাচের মত) জেলিবৎ যে জৈব পদার্থ থাকে।

ভিন্‌কুলাম (vinculum) — বন্ধনী, বা ব্রাকেটের পরিবর্তে বিভিন্ন গাণিতিক রাশির সমাহার, বা এক-রাশিত্ব বুঝাতে বন্ধনীর পরিবর্তে তাদের উপরে যে রেখা ব্যবহৃত হয় ; যেমন, $3x+\overline{y-1}$.

ভিনিগার (vinegar) — বিশেষ শ্রেণীর এন্‌জাইমের ↑ প্রভাবে বিয়ার, ওয়াইন প্রভৃতির ইথাইল অ্যালকোহল ↑ উপাদান অক্সিডাইজ্‌ড হয়ে গেঁজে গিয়ে যে তরল পদার্থের সৃষ্টি হয়। সাধারণতঃ এর মধ্যে 3% থেকে 6% অ্যাসিটিক অ্যাসিড ↑ জন্মায়। পাশ্চাত্য দেশে জিনিসটা খাদ্যদ্রব্যে মেশানো হয়ে থাকে।

ভিনো, (Veno) অধ্যাপক ভিন্‌সেণ্ট দ্য — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রসায়ন-বিজ্ঞানী ; শিকাগোয় জন্ম 1910 খৃস্টাব্দ। ইনি প্রথম জীবনে বায়োকেমিষ্ট্রির ↑ অধ্যাপক ; পরে 1938 খৃঃ থেকে নিউ ইয়র্কের কর্নেল বিশ্ব-

বিদ্যালয়ে 'জৈব রসায়ন' বিভাগের অধ্যক্ষ। জৈব রাসায়নিক গবেষণায় বহু মূল্যবান তথ্য আবিষ্কারে প্রভূত খ্যাতি অর্জন। মানুষের মূত্র-গ্রন্থির ক্রিয়া-নিয়ন্ত্রক ও সন্তান প্রজননের সহায়ক হর্মোন ↑ দু'টির রাসায়নিক বিশ্লেষণ ও গঠন সম্পর্কীয় ঐতিহাসিক অবদানের জন্য 1955 খৃস্টাব্দে রসায়ন বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ।

ভিব্রিও (vibrio)— বক্রাকার রোগ-জীবাণু; এদের দেহ সূক্ষ্ম কাঠির মত লম্বা, কিন্তু বক্রাকার হয়; কাজেই এই রকম ব্যাক্টেরিয়াকে সাধারণভাবে বলে ব্যাসিলাস ↑।
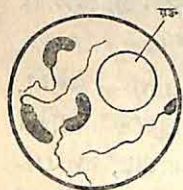
ভিব্রিয়ো
১০০০ গুণ বর্ধিত

বিভিন্ন প্রকার ব্যাসিলাসের মধ্যে আবার বক্রাকারগুলোর বিশেষ নাম হলো 'ভিব্রিও'। সাঁতার কাটার সুবিধার জন্যে এদের দেহের পশ্চাতে সূক্ষ্ম একটা লেজের মত অঙ্গ থাকে; কলেরার 'কমা-ব্যাসিলাস'ও বিশেষ এক শ্রেণীর ভিব্রিও।

ভিসারা (viscera) — প্রাণীদের দেহাভ্যন্তরস্থ প্রধান অঙ্গসমূহ; যেমন — হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস, যকৃৎ, বৃক্ক, অন্ত্র প্রভৃতি। **ভিসারোপ্টসিস** (visceroptosis) — দেহের কাণ্ডীয় গহ্বরের সম্মুখস্থ পেশী-প্রাচীর সমূহ দুর্বল ও শিথিল হয়ে পাকস্থলী, অন্ত্র ও পরিপাক যন্ত্রাদি নীচের দিকে ঝুলে পড়ে স্বাভাবিক অবস্থানচ্যুত হওয়ার অবস্থা; রোগ বিশেষ।

ভিস্কোস (viscose) — সেলুলোজ ↑, বা উদ্ভিদের কাষ্ঠল তন্তু থেকে প্রস্তুত এক প্রকার বিশেষ রাসায়নিক গঠনের যৌগের (সেলুলোজ - সোডিয়াম-জ্যান্থেট) ব্যবহারিক নাম; এ থেকে এক শ্রেণীর কৃত্রিম রেশম-তন্তু (আর্টিফিসিয়াল সিল্ক ↑) প্রস্তুত করা হয়।

ভিস্কোসিটি (viscocity) — ঘন অর্ধ-তরল পদার্থের আঠালো-ভাব। বস্তুতঃ যে ধর্মের জন্যে অর্ধ-তরল পদার্থের বিভিন্ন স্তর পরস্পরের সঙ্গে এঁটে থাকতে চায়, সহজে প্রবাহিত হয় না। বিভিন্ন স্তরের মধ্যে আণবিক আকর্ষণ-বৃদ্ধির ফলেই এরূপ তরল পদার্থে প্রবহনের গতি ক্রমে মন্দীভূত হয়ে পড়ে। গাঢ় তেল, জিলেটিন ↑, গঁদের আঠা প্রভৃতির মধ্যে এই ভিস্কোসিটি ধর্ম বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়; এ-রকম সব পদার্থকে বলে **ভিস্কাস** (viscous) পদার্থ। অবশ্য সব তরল পদার্থেরই কিছু-না-কিছু ভিস্কোসিটি থাকে। যে যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন পদার্থের ভিস্কোসিটি, অর্থাৎ তাদের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ তুলনামূলকভাবে মাপা সম্ভব হয়ে থাকে, তাকে বলে **ভিস্কোমিটার** (viscometer)।

ভেক্টর (vector) — বিভিন্ন ভাব-বোধক যে-সব গাণিতিক রাশিকে রেখার সাহায্যে প্রকাশ করা যায়। রাশিটির পরিমাণকে রেখার দৈর্ঘ্যে, এবং তার স্বরূপ, বা দিক রেখাটার কৌণিক অবস্থান দ্বারা প্রকাশিত হয়ে থাকে। কোন লোক কোন-এক দিকে

ঘণ্টায় 5 মাইল বেগে ছুটছে; এখানে '5 মাইল' এই রাশিটাকে ভেক্টর রাশি বলা হবে; যেহেতু, 5 ইঞ্চি একটা রেখা টেনে (এক ইঞ্চি=এক মাইল ধরে') এর পরিমাণ প্রকাশ করা যায়; আবার ওই অঙ্কিত সরল রেখার দিক, বা কৌণিক অবস্থান দেখে লোকটির গতিপথের দিক নির্দিষ্ট হতে পারে। এভাবে ছ'টি ভেক্টর রাশি যদি কোন ত্রিভূজের সন্নিহিত ছ'টি বাহুর দ্বারা প্রকাশিত হয়, তবে সাধারণতঃ ওদের সমষ্টিগত ভেক্টর রাশি প্রকাশিত হবে ওই ত্রিভূজের তৃতীয় বাহুর দ্বারা।

ভেক্টর (vector) — রোগ-জীবাণুর বাহক। মশা, মাছি, ইঁদুর প্রভৃতিকে বিশেষ অর্থে 'ভেক্টর' বলা হয়; কারণ, এরা রোগীর দেহ, বা দেহ-নিঃসৃত মল-মূত্রাদি থেকে রোগ-জীবাণু বহন করে নিয়ে সুস্থ লোকের দেহে রোগ সংক্রামিত করে।

ভেনম্‌ (venom) — জান্তব বিষ; বিশেষতঃ বিষধর সাপের বিষ-দাঁত থেকে নিঃসৃত বিষাক্ত লালা। বোল্‌তা ভীমরুল, বিছা প্রভৃতি কীট-পতঙ্গের হুলের বিষকেও 'ভেনম্‌' বলা হয়।

ভেনাক্যাভা (venacava) — হৃৎপিণ্ডের ডানদিকের যে-ছুটি মহাশিরার পথে দেহের রক্ত হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে। এদের মধ্যে উপর দিকের শিরাটাকে বলে 'সুপিরিয়র ভেনাক্যাভা' ও নীচেরটাকে বলা হয় 'ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা'।

ভেনারাল ডিজিজ (venereal disease) — 'গনোকক্কাই'↑ প্রভৃতি জীবাণু-সংক্রমণের ফলে রক্ত-দুষ্টিসহ রোগীর যৌন-অঙ্গের ক্ষত ও প্রদাহ-জনিত বিভিন্ন ব্যাধি; যেমন— সিফিলিস↑, গনোরিয়া↑ ইত্যাদি।

ভেনাস (venus)—শুক্র গ্রহ। গ্রহটা পৃথিবী ও বুধ গ্রহের কক্ষদ্বয়ের মধ্যবর্তী নিজস্ব একটা নির্দিষ্ট কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। সূর্য থেকে এর দূরত্ব প্রায় 6 কোটি 70 লক্ষ মাইল। পৃথিবীর হিসেবে 225 দিনে শুক্রগ্রহের বছর হয়, অর্থাৎ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে এর লাগে আমাদের 225 দিন। পৃথিবীর চেয়ে এর উপরিভাগের উত্তাপ সম্ভবতঃ অনেক বেশি। এর চারিদিকে কোন বায়ুমণ্ডল আছে বলে মনে হয় না; সম্ভবতঃ মেঘের মত কোনরূপ বাষ্পীয় আবরণে পরিবেষ্টিত রয়েছে।

ভেনাস ফ্লাইট্র্যাপ (venus fly-trap)—এক প্রকার প্রাণিভূক্‌ উদ্ভিদ। এর সাদা ফুল ফোটে, আর পাতাগুলো আঠালো ও কলসাকার। ফুলের আকর্ষণে পাতার উপর কীট-পতঙ্গ এসে পড়লে আঠায় জড়িয়ে ফাঁদের মত আবদ্ধ হয়ে মারা যায়; আর উদ্ভিদটা ধীরে ধীরে সেটাকে জীর্ণ করে আত্মসাৎ করে ফেলে। বাংলায় সাধারণতঃ বলে 'কলম-পত্রী' উদ্ভিদ।

ভেণ্ট্রিক্‌ল (ventricle) — দেহাভ্যন্তরস্থ কোন প্রত্যঙ্গের বিশেষ-বিশেষ শূন্য-গহ্বর; যেমন, — (i) হৃৎপিণ্ডের নিম্নাংশে ছ'দিকে ছ'টি নিলয়, বা 'ভেণ্ট্রিক্‌ল' প্রকোষ্ঠ আছে; ডান-

দিকেরটা থেকে রক্ত ফুস্‌ফুসে (লাংস ↑) যায় ; আর বাঁ-দিকের গহ্বরটা থেকে রক্ত সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে। (ii) মস্তিষ্কের কোন-কোন অংশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শূন্য-গহ্বরকেও সাধারণতঃ 'ভেন্ট্রিকল' বলা হয়।

ভেনিসেক্‌সন (venesection) — দেহের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শিরা (ভেইন, vein) চিরে রক্ত বার করে দেওয়া, বা নল প্রবেশ করানোর বিশেষ প্রক্রিয়া ; 'রক্ত-দান', বা 'ইণ্টার-ভেনাস ইঞ্জেক্‌শনের' সময়ে রোগীর দেহে যেমন করা হয়।

ভেপার (vapour)—পদার্থের বাষ্পীয় অবস্থা; যে অবস্থায় তাপ অক্ষুণ্ণ রেখে কেবলমাত্র তার চাপ বৃদ্ধি করেই পদার্থটাকে তরল অবস্থায় রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়। এরূপ বাষ্পীয় অবস্থায় পদার্থের তাপ তার নির্দিষ্ট 'ক্রিটি-ক্যাল' টেম্পারেচারের ↑ কম থাকে ; এই অবস্থায় পদার্থকে বলে 'ভেপার' ; কারণ, তখন কেবল মাত্র চাপ বৃদ্ধি করেই পদার্থটাকে তরল অবস্থায় পরিবর্তিত করা চলে ; যেমন — পেট্রলের বাষ্প, জলীয় বাষ্প ইত্যাদি।

ভেপার প্রেসার (vapour pressure) — উপযুক্ত উত্তাপে সাধারণতঃ সব তরল পদার্থই বাষ্পীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। পদার্থের এরূপ বাষ্পীয় অবস্থায় তার অণু-গুলো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আয়তনে বাড়ে, পরস্পরের মধ্যে আণবিক আকর্ষণ হ্রাস পায়। কোন আবদ্ধ পাত্রে এই বাষ্প ক্রমাগত জমলে স্বভাবতঃই তার চাপ বৃদ্ধি পায় এবং পাত্রের গায়ে চাপ দিতে থাকে ; একেই বলে 'ভেপার-প্রেসার', বা বাষ্পীয় চাপ। এই বাষ্পীয় চাপ ক্রমে শেষে চরমে পৌঁছায়। এই সর্বোচ্চ চাপ নির্ভর করে পদার্থের গঠন ও তাপমাত্রার উপর। পাত্রের অভ্যন্তর ভাগে ওই বাষ্প সম্পৃক্ত (স্যাচুরেটেড ↑) হয়ে উঠলে আরও বাষ্প যদি প্রবেশ করানো যায় তবে আর তা বাষ্পীয় আকারে পাত্রের অভ্যন্তরে জমতে পারে না, অতিরিক্ত বাষ্প সঙ্গে-সঙ্গে তরল হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় বাষ্পের ওই সর্বোচ্চ চাপকে বলে 'সম্পৃক্ত বাষ্পীয় চাপ', অথবা 'স্যাচুরেটেড ভেপার-প্রেসার'।

ভেলোসিটি (velocity)—গতিবেগ, অর্থাৎ গতির হার ; গতিশীল কোন বস্তু কোন একক সময়ে একই দিকে যতটা দূরত্ব অতিক্রম করে। একটা ট্রেন কোন নির্দিষ্ট দিকে প্রতি ঘণ্টায় 30 মাইল বেগে সমভাবে ছুটছে ; এখানে 'ঘণ্টায় 30 মাইল' এই হলো ট্রেনটার ভেলোসিটি, বা গতিবেগ।

ভেলোসিটি (রিলেটিভ), (velocity, relative) — তুলনামূলক, অর্থাৎ আপেক্ষিক গতিবেগ ; কোন বস্তুর গতিবেগ অপর কোন বস্তুর গতি, বা স্থিতির তুলনায় যেরূপ অনুমিত হয়। মনে করা যাক্‌, 'ক' ও 'খ' দু'টা ট্রেন পাশাপাশি একই দিকে ছুটছে— 'ক' ঘণ্টায় 20 মাইল ও 'খ' ঘণ্টায় 15 মাইল ভেলোসিটি নিয়ে চলছে। ক'-এর গতি খ'এর তুলনায় ('খ' থেকে

দেখলে) মনে হবে যেন ঘণ্টায় 5 মাইল ; এই হলো ক'এর 'রিলেটিভ ভেলোসিটি'। দু'টা বস্তুর গতিবেগ যদি কোন ত্রিভুজের দু'টা সন্নিহিত বাহুর দ্বারা প্রকাশিত হয় (ভেক্টর রাশি ↑) তবে বস্তু দু'টার পরস্পরের 'রিলেটিভ ভেলোসিটি', অর্থাৎ আপেক্ষিক গতি ওই ত্রিভুজের তৃতীয় বাহুর দ্বারা প্রকাশিত হবে।

ভেসেলিন (vaseline) — 'পেট্রোলিয়াম জেলি', বা পেট্রোলেটাম ↑ ।

ভোলাটাইল (volatile) — উদ্বায়ী ; বায়ুমণ্ডলের সাধারণ তাপ ও চাপেই যে-সব কঠিন, বা তরল পদার্থ স্বতঃই দ্রুত বাষ্পীভূত হয়ে উবে যায়। উদ্বায়ী পদার্থের 'ভেপার প্রেসার' ↑ স্বভাবতঃই হয় বায়ুমণ্ডলীয় চাপের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি ; কাজেই তার এরূপ বাষ্পীভবন সম্ভব হয়ে থাকে। পেট্রল ↑, অ্যালকোহল ↑, কর্পূর প্রভৃতি এরূপ 'ভোলাটাইল', বা উদ্বায়ী পদার্থ ; কিন্তু সাধারণ তেল, জল, পারদ প্রভৃতি স্বাভাবিক তাপ ও চাপে তেমন কিছু লক্ষ্যণীয়ভাবে বাষ্পীভূত হয় না ; 'নন্‌ভোলাটাইল' অর্থাৎ অনুদ্বায়ী পদার্থ।

ভোল্ট (volt) — বৈদ্যুতিক চাপ পরিমাপের একটা একক বিশেষ। তড়িৎ-পরিবাহী তারের দুই প্রান্ত, অথবা তার যে-কোন দুই বিন্দুর মধ্যে তড়িৎ-বিভবের পার্থক্য এক ভোল্ট হবে, যদি ওদের মধ্যে এক কুলম্ব ↑ তড়িৎ-প্রবাহের ফলে এক জুল ↑ পরিমাণ শক্তি, অর্থাৎ এনার্জি ↑ প্রকাশ পায়। সাধারণ ষ্টোরেজ ব্যাটারির ↑ দুই তড়িৎ-দ্বারের মধ্যে তড়িৎ-বিভবের পার্থক্য হয় প্রায় 2 ভোল্ট ; সাধারণ টর্চ-লাইটের ড্রাই সেলের ↑ হয় প্রায় 1·25 ভোল্ট। কলকাতা শহরে বাড়ী-বাড়ী যে তড়িৎ সরবরাহ হয় তার ভোল্টেজ 220 থাকে। এই তড়িৎ-চাপ, বা ভোল্টেজ ↑ দ্বারা ইলেক্‌ট্রোমোটিভ ফোর্স ↑ এবং পোটেন্সিয়্যাল ডিফারেন্স ↑ (P. D.) উভয়ই সচরাচর পরিমিত হয়ে থাকে।

ভোল্টমিটার (voltmeter) — বৈদ্যুতিক চাপ পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত একটি যন্ত্র বিশেষ। এর সাহায্যে তড়িতাবিষ্ট দুই স্থান, বা বস্তুর মধ্যে তড়িৎ-বিভবের প্রভেদ, অর্থাৎ পোটেন্সিয়্যাল ডিফারেন্স ↑ মাপা হয়। ইটালীয় বিজ্ঞানী ভোল্‌টা এই যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। মোটামুটি এটা হলো একটা অ্যাম্‌মিটার ↑ যন্ত্রের অনুরূপ ; কেবল এর মধ্যে একটা প্রয়োজনারূপ উচ্চ তড়িৎ-প্রতিবন্ধক (রেজিষ্টেন্স ↑) সন্নিবিষ্ট থাকে এবং যন্ত্রের স্কেলে ভোল্ট ↑ এককের সংখ্যা-নির্দেশক দাগ কাটা থাকে।

ভোল্‌টা, (Volta), কাউন্ট অ্যাল্‌সাণ্ড্রো — ইতালীয় বিখ্যাত পদার্থ-বিজ্ঞানী ; জন্ম 1745 খৃঃ, মৃত্যু 1827 খৃষ্টাব্দ। তড়িৎ-বিজ্ঞানে অসামান্য অবদান। নূতন পদ্ধতির ইলেক্‌ট্রোস্কোপ ↑ ও ব্যাটারি ↑ (ভোল্টেইক ব্যাটারি) উদ্ভাবন। তড়িৎ-বিভবের পার্থক্য থেকে তড়িৎ-শক্তির

পরিমাণ মাপবার উপায় উদ্ভাবনেই সমধিক প্রসিদ্ধি; যার 'একক' উদ্ভাবকের নামানুসারে 'ভোল্ট' ↑ বলে আন্তর্জাতিক ভাবে খ্যাত।

ভোল্টামিটার (voltameter) — কোন প্রবাহ-পথে তড়িৎ-শক্তির পরিমাণ স্থির করবার এক রকম যন্ত্র। মূলতঃ যন্ত্রটা হলো একটা ইলেক্‌ট্রোলিটিক সেল ↑ মাত্র। এর কপার, বা সিল্‌ভার সল্টের দ্রবের মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহের ফলে ইলেক্‌ট্রোলিসিস ↑ প্রক্রিয়ায় ওই সল্টের ধাতব আয়ন ↑ কণিকাগুলো বিমুক্ত হয়ে-হয়ে গিয়ে ক্যাথোডের ↑ গায়ে সঞ্চিত হতে থাকে। এভাবে ক্যাথোডের ওজন বৃদ্ধির পরিমাণ থেকে বিমুক্ত ধাতুর পরিমাণ সহজেই স্থির করা যায়। এভাবে বিমুক্ত ধাতুর পরিমাণ থেকে আবার বিমুক্তকারী তড়িৎ-প্রবাহের শক্তি, বা পরিমাণ সহজেই হিসাব করে নির্ধারণ করা যেতে পারে।

ভ্যাক্‌সিন (vaccine) — বিশেষ বিশেষ রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্যে সেই সব রোগাক্রান্ত জীবের দেহ থেকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সেই রোগের নিস্তেজীকৃত যে জীবাণু-রস নিয়ে সুস্থ লোকের দেহে প্রবেশ করানো হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলে **'ভ্যাক্‌সিনেশন'** (vaccination), বা 'টিকা দেওয়া'। গো-বসন্তের টিকা দেওয়ার ব্যবস্থাই সর্বপ্রথম প্রচলিত হয়েছিল; তাই 'ভ্যাক্‌সিন' কথাটার উদ্ভব হয়েছে। ডাঃ জেনার ↑ প্রথমে এভাবে গো-বসন্তের টিকা আবিষ্কার করেন; পরে বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর ↑ বিভিন্ন রোগ-জীবাণুর টিকা বিজ্ঞান-সম্মতভাবে প্রবর্তন করেছেন। প্রথম দিকে কেবল জীবিত রোগ-জীবাণু নিয়ে টিকা দেওয়া হোত; আজকাল দেখা গেছে, মৃত, বা নিস্তেজীকৃত জীবাণু ব্যবহার করলেও উদ্দেশ্য অনুরূপভাবে সিদ্ধ হয়ে থাকে।

ভ্যাকুয়াম (vacuum) — সম্পূর্ণ শূন্য স্থান; যে স্থানে বায়ু, গ্যাস, বা অপর কোন পদার্থের কোন অণু-পরমাণু কিছুমাত্র নেই। বাস্তব ক্ষেত্রে অবশ্য এরূপ শূন্যস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না। এ-জন্যে মোটামুটি সম্ভাব্যরূপে বায়ু, বা কোন গ্যাস-শূন্য স্থানকেই সাধারণতঃ 'ভ্যাকুয়াম' বলা হয়। বায়ু-নিষ্কাশক পাম্প ↑ যন্ত্রের সাহায্যে আবদ্ধ পাত্র থেকে বায়ু, বা গ্যাস নিষ্কাশিত করে এরূপ ভ্যাকুয়ামের সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে গ্যাসীয় চাপ অতি সামান্যই অবশিষ্ট থাকে। 'রেডিও ভাল্‌ব' ↑, 'ক্যাথোড-রে টিউব' ↑ প্রভৃতি বিভিন্ন যন্ত্রের অভ্যন্তর ভাগ বিশেষ প্রক্রিয়ায় এরূপ যথাসম্ভব ভ্যাকুয়াম, অর্থাৎ প্রায় বায়ুশূন্য করে নিতে হয়।

ভ্যাকুয়োল(vacuol)—জীব-কোষের (কোষ, সেল ↑) অভ্যন্তরস্থ ছোট-ছোট শূন্য স্থান; যেমন, এককোষী অ্যামিবা ↑ থেকে বহুকোষী যে-কোন জীব-দেহের সংগঠক কোষের অভ্যন্তরে এক, বা একাধিক শূন্য-গহ্বর দেখা যায়। এ-গুলির মধ্যে কোষের বর্জ্য পদার্থাদি জমে এবং বিশেষ জৈবিক প্রক্রিয়ায় শেষে নিঃসৃত হয়ে যায়।

ভ্যাগাস নার্ভ (vagus nerve) — মস্তিষ্কের নিম্নভাগ থেকে যে স্নায়ুটি (নার্ভ↑, nerve) নীচের দিকে প্রসারিত হয়ে গলা, ফুস্ফুস, হৃৎপিণ্ড ও পাকস্থলীর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। বস্তুতঃ এর কার্যকারিতায়ই শ্বাসক্রিয়া, হৃৎ-স্পন্দন প্রভৃতির গতি আধা-স্বয়ং-ক্রিয়ভাবে (প্যারাসিম্প্যাথিটিক↑, parasympathetic) নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভবপর হয়ে থাকে।

ভ্যাট্-ডাই (vat-dye)—যে-সব রঞ্জক পদার্থে বস্ত্রাদি রঙ্গীন করবার জন্যে কোন মরড্যাণ্টের↑ প্রয়োজন হয় না। রং ধরাবার জন্যে সাধারণতঃ বস্ত্রাদি আগে বিশেষ কোন রাসায়নিক দ্রবে (মরড্যাণ্ট↑) ভিজিয়ে নিতে হয়; কিন্তু 'ভ্যাট্-ডাই' জাতীয় রঞ্জক পদার্থে সেরূপ করা দরকার হয় না। নীল প্রভৃতি বিভিন্ন কৃত্রিম রং এই শ্রেণীর রঞ্জক পদার্থ। যে পাত্রে বস্ত্রাদি ডুবানো হয় তাকে বলে 'ভ্যাট'।

ভ্যানাডিয়াম (vanadium) — মৌলিক ধাতব পদার্থ; পারমাণবিক ওজন 50·95, পারমাণবিক সংখ্যা 23; অত্যন্ত কঠিন, সাদা ও মূল্যবান ধাতু। কোন-কোন দুষ্প্রাপ্য খনিজ পদার্থের সঙ্গে সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়। সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4) তৈরি করবার প্রক্রিয়ায় ধাতুটার অক্সাইড ক্যাটালিস্ট↑ হিসেবে কখন-কখন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিশেষ এক শ্রেণীর কঠিন ইস্পাত (ভ্যানাডিয়াম স্টিল) তৈরি করতেও সামান্য ভ্যানাডিয়াম ধাতু মিশ্রিত করা হয়।

ভ্যানিসিয়ান হোয়াইট (venetian white) — সম-পরিমাণ 'হোয়াইট লেড'↑, [$2PbCO_3 . Pb(OH)_2$], এবং বেরিয়াম সালফেটের ($BaSO_4$) সংমিশ্রণ। এই সংমিশ্রিত চূর্ণ পদার্থ তেলে মিশিয়ে নিলে উৎকৃষ্ট সাদা রং (পেইণ্ট) তৈরি হয়ে থাকে।

ভ্যাল্ক্যানাইজ্ড রাবার (vulcanized rubber) — রাবারের সঙ্গে গন্ধক, বা গন্ধক-ঘটিত কোন যৌগিক পদার্থ মিশিয়ে উত্তাপে দ্রবীভূত করলে যে মিশ্র কঠিন পদার্থ উৎপন্ন হয়। এভাবে উৎপন্ন পদার্থ স্বভাবজাত রাবারের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম স্থিতি-স্থাপক হয়ে যায় এবং অনেকটা শক্ত হয়ে ওঠে। একে ছাঁচে ঢেলে যে-কোন আকার দেওয়া যায়। মোটর গাড়ীর টায়ার প্রভৃতি এরূপ ভ্যাল্-ক্যানাইজ্ড রাবারে তৈরি হয়ে থাকে। রাবারের সঙ্গে গন্ধক মিশ্রণের এই প্রক্রিয়াকে বলে **ভ্যাল্ক্যানাইজিং** (vulcanizing)।

ভ্যাল্কানাইট (vulcanite)—অতি কঠিন এক শ্রেণীর ভ্যাল্ক্যানাইজড রাবারের↑ বিশেষ নাম। রাবারের সঙ্গে গন্ধকের বিশেষ এক রকম রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে জিনিসটা তৈরী হয়ে থাকে। এর তড়িৎ-পরিবহনের ক্ষমতা একেবারে থাকে না বলে বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদিতে এটা তড়িৎ-রোধক (ইন্সুলেটর↑) পদার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ভ্যালেন্সি (valency) — যৌগিকের গঠনে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের

পরমাণুর পারস্পরিক সংযোগশক্তি-বোধক সংখ্যা। বিশেষ কোন মৌলিক পদার্থের একটা পরমাণু অপর কোন মৌলিক পদার্থের যতগুলো পরমাণুর সঙ্গে মিলিত হয়ে রাসায়নিক সংযোগ ঘটায় এবং তাদের পারস্পরিক মিলনে যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি হয়, সেই সংখ্যাটি হলো ওই পদার্থ-বিশেষের ভ্যালেন্সি। হাইড্রোজেন গ্যাসের এই সংযোগ-শক্তিকে একক ধরা হয়েছে, অর্থাৎ এর ভ্যালেন্সি যেন 'এক'। কাজেই হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে তুলনা-মূলকভাবে বিভিন্ন মৌলের এই ভ্যালেন্সি-সংখ্যা নির্ণীত হয়ে থাকে। কোন মৌলের একটি পরমাণু যে কয়েকটি হাইড্রোজেন-পরমাণুর সঙ্গে মিলিত হতে পারে, অথবা যে-কয়টি হাইড্রোজেন-পরমাণু বিচ্যুত করে' তাদের স্থান অধিকার করতে পারে, সেই সংখ্যাকে বলে ওই মৌলিক পদার্থের 'ভ্যালেন্সি'। এভাবে যে মৌলিক পদার্থের একটি পরমাণু একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে কোন যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি করে, তাকে বলে **মনোভ্যাল্যাণ্ট** এলিমেণ্ট ↑; ছুইটির সঙ্গে যুক্ত হলে বলা হয় **বাই-**, বা **ডাইভ্যাল্যাণ্ট**; (bi-, divalent); এরূপ ট্রাইভ্যাল্যাণ্ট, টেট্রাভ্যাল্যাণ্ট ইত্যাদি। রাসায়নিক ক্রিয়ায় বুঝা যায়, একটা হাইড্রোজেন-পরমাণুর সঙ্গে একটা ক্লোরিন-পরমাণু যুক্ত হয়ে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, HCl, সৃষ্টি হয়, — কাজেই ক্লোরিন মনোভ্যাল্যাণ্ট। একটা অক্সিজেন-পরমাণুর সঙ্গে ছু'টা হাইড্রোজেন-পরমাণুর রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন হয় জল, H_2O; কাজেই অক্সিজেন ডাইভ্যাল্যাণ্ট। এভাবে অ্যামোনিয়া ↑, NH_3, থেকে বুঝা যায়, নাইট্রোজেন হলো **ট্রাইভ্যাল্যাণ্ট**। মিথেন গ্যাস হলো CH_4; কাজেই কার্বন **টেট্রাভ্যাল্যাণ্ট**, ইত্যাদি।

আবার, সব মৌলিক পদার্থই যে হাইড্রোজেনের সঙ্গে মিলিত হবে, এমন কোন কথা নেই। সেরূপ ক্ষেত্রে আবার তুলনামূলকভাবে ভ্যালেন্সি সংখ্যা নির্ণীত হয়। ক্লোরিন মনোভ্যাল্যাণ্ট; এর একটা পরমাণুর সঙ্গে সোডিয়ামের একটা পরমাণুর মিলনে হয় 'সোডিয়াম ক্লোরাইড', NaCl (লবণ); সুতরাং সোডিয়াম ধাতুও মনোভ্যাল্যাণ্ট। প্রত্যেক মৌলিক পদার্থের পরমাণুর ভ্যালেন্সি নির্দিষ্ট; তবে কোন-কোন ক্ষেত্রে একটি মৌলিকের ছু'রকম ভ্যালেন্সিও হতে পারে; যেমন, আয়রন তার ফেরাস ↑ সল্টে ($FeCl_2$) হয় ডাইভ্যাল্যাণ্ট; এবং ফেরিক ↑ সল্টে ($FeCl_3$) হয় ট্রাইভ্যাল্যাণ্ট।

মৌলিক পদার্থের পরমাণুর এই সংযোগ-শক্তি, অর্থাৎ ভ্যালেন্সিকে হাতের মত কল্পনা করা যায়; যেন পরমাণুগুলো হাতে-হাতে মিলিয়ে পরস্পর যুক্ত হয়ে যৌগিক পদার্থ গঠন করে। কাজেই যে পরমাণুর যত ভ্যালেন্সি তার যেন ততটা হাত; একেই বিজ্ঞানের সাধু ভাষায় বলে **'ভ্যালেন্সি বণ্ড'** (valency bond)।

ম

মডারেটর (moderator) — মন্দক পদার্থ; বিশেষতঃ অ্যাটমিক পাইল ↑ যন্ত্রে 'নিউক্লিয়ার ফিসন' ↑ প্রক্রিয়ায় নিউট্রন ↑ কণিকার গতি মন্দীভূত করতে যে-সব পদার্থ ব্যবহৃত হয়; যেমন—গ্রাফাইট ↑, বেরিলিয়াম ↑, হেভি ওয়াটার ↑ ইত্যাদি।

মন- (mon-) — শব্দার্থ 'এক'; যেমন- **মন্যাণ্ড্রাস** (monandrous) হলো যে-সব উদ্ভিদের পুষ্পে একটি মাত্র পুং-কেশর (stamen) থাকে। **'মন' = মনো** (mono) ↑ ।

মন্যাড (monad) — যে মৌলিক পদার্থের ভ্যালেন্সি ↑ এক, অর্থাৎ **মনোভ্যাল্যাণ্ট** ↑, বা ইউনি-ভ্যাল্যাণ্ট এলিমেণ্ট ↑ (univalent element)। (ভ্যালেন্সি ↑)

মণ্ড্ গ্যাস (mond gas) — প্রায় 650° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে উত্তপ্ত কয়লার উপর বায়ু ও জলীয় বাষ্পের প্রবাহ চালিয়ে যে দাহ্য গ্যাসীয় সংমিশ্রণ পাওয়া যায়। এর মধ্যে কার্বন-মনোক্সাইড (CO), কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2), হাইড্রোজেন এবং নাইট্রোজেন গ্যাস মিশ্রিত থাকে। একে কখন-কখন 'ওয়াটারগ্যাস' ↑ ও বলা হয়। (প্রোডিউসার গ্যাস ↑)

মনেল মেটাল (monel metal) — বিশেষ একটি অতি-কঠিন ধাতু-সংকর (অ্যালয় ↑)। বিভিন্ন অনুপাতে নিকেল ↑, তামা, লোহা, ম্যাঙ্গানিজ ↑, সিলিকন ↑ এবং কার্বনের সংমিশ্রণে তৈরী। ঘর্ষণ, বা রাসায়নিক ক্রিয়ায় ক্ষয় হয় না; জাহাজের ইঞ্জিন, রসায়ন-শিল্পের কলকব্জা প্রভৃতি এই সুকঠিন ধাতু-সংকর দিয়েই সচরাচর তৈরি হয়ে থাকে।

মনোকটিলিডন — এক-বীজপত্রী উদ্ভিদ। **মনো** (mono) মানে এক, এককার্থে কথার পূর্বে ব্যবহৃত। ধান, গম প্রভৃতি শস্যের একটি মাত্র বীজপত্র থাকে, অর্থাৎ শস্য-বীজটা ভাঙ্গতে গেলে তেঁতুল-বীজের (ডাইকটিলিডন) মত দু-ভাগ হয়ে যায় না, একক থাকে। কাজেই এ-সব উদ্ভিদকে বলা হয় মনোকটিলিডন।

মনোক্রোমেটিক লাইট (mono-chromatic light) — এক-বর্ণী আলোক; যে আলোক-রশ্মি একই স্পন্দন ও দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তরঙ্গ-প্রবাহের (ইলেক্ট্রোম্যাগ্নেটিক ↑ ওয়েভ) ফলে উদ্ভূত হয়। সূর্যালোক, প্রদীপের শিখা প্রভৃতির সাদা আলোক মনোক্রোমেটিক নয়; কারণ, বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের (সপ্তবর্ণী) তরঙ্গ-স্পন্দনের সংমিশ্রিত প্রবাহের ফলে এরূপ সাদা আলোর সৃষ্টি হয়ে থাকে। এজন্যে প্রিজ্‌মের ↑ ভিতর দিয়ে প্রতিসরণের ফলে সাধারণ আলোক-রশ্মি বিশ্লিষ্ট হয়ে বর্ণালির (স্পেক্ট্রাম ↑) সপ্তবর্ণ দেখা যায়। লাল, নীল, সবুজ প্রভৃতি এক-বর্ণী সব আলোক-রশ্মি হলো মনোক্রোমেটিক।

মনোটাইপ (monotype) — এক বিশেষ পদ্ধতির মুদ্রণ-যন্ত্র; যাতে ছাপার অক্ষরগুলোর আলাদা-আলাদা টাইপ বিশেষ জটিল যান্ত্রিক কৌশলে

স্বতঃই প্রস্তুত হয়ে এককভাবে লাইনে সাজিয়ে ছাপা হয়। শব্দের অক্ষর-গুলো প্রথমে কাগজের লম্বা ফালির মধ্যে যান্ত্রিকপদ্ধতিতে কেটে খোদিত হয়ে যায়। ওই কাগজ যন্ত্রের মধ্যে গিয়ে সেই কাটা অক্ষরগুলোর টাইপ শ্রেণীবদ্ধভাবে ঢালাই হয়ে বেরিয়ে আসে। সেগুলো পরে আবার এক-এক লাইনে সাজিয়ে এসে মুদ্রণের কাজ সম্পন্ন হয়। এই মুদ্রণ-যন্ত্রে প্রতিবারেই নূতন টাইপে সুন্দর নিখুঁত ছাপা সম্ভবপর হয়ে থাকে।

মনোবেসিক অ্যাসিড (m o n o-basic acid) — যে অ্যাসিডে একটি মাত্র অপসারণ-যোগ্য হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে, যেটি রাসায়নিক ক্রিয়ায় ধাতব পরমাণুর দ্বারা অপসারিত হয়ে ধাতুটার সম্পূর্ণ শমিত সল্ট↑ উৎপন্ন হয়ে থাকে; যেমন—নাইট্রিক অ্যাসিড, HNO_3; পক্ষান্তরে, সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড H_2SO_4 ম নো বে সি ক নয়; কারণ, এর মধ্যে অপসারণ-যোগ্য দু'টি হাইড্রোজেন-পরমাণু থাকায় একে বলা হয় **ডাইবেসিক** অ্যাসিড।

মনোভ্যালাণ্ট (monovalant) — এক ভ্যালেন্সি-বিশিষ্ট পদার্থ। যে-সব মৌলিক পদার্থের পরমাণু সমূহের ভ্যালেন্সি↑ এক। একে কখন-কখন আবার **ইউনিভ্যাল্যাণ্ট** এলিমেণ্ট, বা মন্যাড-ও↑ বলা হয়।

মনোমার (monomar) — যে সব রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ তাদের মূল প্রাথমিক অণুর অবিমিশ্র একক সমবায়ে গঠিত। এরূপ স্বাভাবিক 'মনোমার' রাসায়নিক পদার্থের একাধিক অণু আবার বিশেষ রাসায়-নিক সংযোগে পরস্পর সংবদ্ধ হয়েই পলিমার ↑ পদার্থের সম্মিলিত ও বৃহত্তর অণুর সৃষ্টি করে; যেমন — অ্যাসিট্যাল্ডিহাইড যৌগ, CH_3-CHO, একটা মনোমার পদার্থ; কিন্তু প্যারাল্ডিহাইডের [$(CH_3CHO)_3$] প্রত্যেকটি অণু ম নো মা র অ্যাসি-ট্যাল্ডিহাইডের তিনটা অণুর একক সংযোগে গঠিত হয়; কাজেই এটাকে বলা হয় পলিমার (পলিম্যারিজে-শন↑)। বস্তুতঃ সাধারণ রাসায়নিক যৌগিক মাত্রই হয় মনোমার।

মনোলিথ (monolith) — পাথর, বা সিমেণ্টের যে-সব প্রকাণ্ড নিরেট ব্লক দিয়ে অট্টালিকার থাম, বা ভিত্তি তৈরি হয়; একক প্রস্তর-নির্মিত।

মন্যাটমিক এলিমেণ্ট (monatomic element) — যে-সব মৌলিক পদার্থের প্রত্যেকটি অণু একটি মাত্র পরমাণু নিয়ে গঠিত; যেমন — হিলিয়াম↑ গ্যাস।

মর্টার (morter)— (1) রসায়নাগারে বিভিন্ন পদার্থ চূর্ণ করবার জন্যে কঠিন পাথরের তৈরী যে পাত্র ব্যবহৃত হয়। ওর পেষণ-দণ্ড-টাকে বলে **পেস্‌ল** (pestle)। বাংলায় সাধারণতঃ একে বলে 'খল'। (2) বাড়ী তৈরী করতে চূণ, সিমেণ্ট ↑

মর্টার পেস্‌ল

ও বালির যে জলীয় সংমিশ্রণ দিয়ে ইট গাঁথা হয়। এ-সব উপাদান বিভিন্ন অনুপাতে মিশিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর মর্টার তৈরি হয়ে থাকে।

মরড্যাণ্ট (mordant) — বস্ত্রাদি রঞ্জিত করবার জন্যে প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসেবে যে-সব পদার্থের দ্রবে সেগুলো আগে ভিজিয়ে নেওয়া হয়। রঞ্জক পদার্থটা অ্যাসিড-ধর্মী হলে মরড্যাণ্টটা হয় সাধারণতঃ বেসিক ↑-ধর্মী (ধাতব হাইড্রক্সাইড) পদার্থ। আবার রঞ্জক পদার্থটা বেসিক-ভাবাপন্ন হলে মরড্যাণ্টটা অ্যাসিড জাতীয় হয়ে থাকে। বস্ত্রাদি মরড্যাণ্টের দ্রবে ভিজালে ওর সূক্ষ্ম কণিকাগুলো বস্ত্রের তন্তুর মধ্যে ঢুকে যায়; তারপরে তার সঙ্গে রঞ্জক পদার্থের রাসায়নিক মিলনের ফলে অদ্রাব্য রঙীন পদার্থ সৃষ্টি হয়। ওই অদ্রাব্য বর্ণ-কণিকাগুলো বস্ত্রে এঁটে গিয়ে রং পাকা, বা স্থায়ী হয়ে থাকে।

মর্ফিন (morphine) — একটা অ্যাল্‌কালয়েড ↑, অর্থাৎ উপক্ষার জাতীয় যৌগিক, $C_{17}H_{19}O_3N$; মূলতঃ একটা উদ্ভিজ্জ পদার্থ, আফিম থেকে পাওয়া যায়; একে মর্ফিয়া-ও বলে। সাদা, কঠিন ও বিষাক্ত পদার্থ; কিন্তু উপযুক্ত মাত্রায় দেহের যন্ত্রণা উপশমের জন্যে ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সেবনে (বা ইন্‌জেকশনে) গভীর নিদ্রা ও অচৈতন্য ভাব দেখা দেয়। কিছুদিন ব্যবহারে নেশার মত মারাত্মক অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়।

মর্ফিয়া (morphia) — মর্ফিন ↑।

মর্ফোলজি (morphology) — জীবজগতের বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর গঠন ও আকৃতিগত ক্রমবিকাশ সম্পর্কীয় বিজ্ঞান। কোন বিশেষ জীবের পরিণত অবয়ব ধারণ করবার জৈব প্রক্রিয়াকে বলে **'মর্ফোসিস'**।

মল্ট (malt) — বার্লি, চাউল, গম প্রভৃতি শ্বেতসার জাতীয় পদার্থের চূর্ণ জলে ভিজিয়ে রাখলে বিশেষ এক রকম এন্‌জাইনের ↑ প্রভাবে তা গেঁজে যায়; একে উত্তপ্ত করে শুকিয়ে নিলে মল্ট তৈরি হয় (ব্রুয়িং ↑)।

মল্টেস্‌ (maltase)—ঈস্ট ↑ ও বিভিন্ন জীবাণু থেকে প্রাপ্ত জৈব পদার্থ, বা বিশেষ এক রকম 'এন্‌জাইম' ↑। এর প্রভাবে মল্টের জলীয় মিশ্রণের মধ্যস্থ মল্টোজ ↑, বা মল্ট-সুগার নামক শর্করা হাইড্রোলিসিস ↑ প্রক্রিয়ায় ধীরে ধীরে গ্লুকোজে ↑ রূপান্তরিত হয়ে যায়।

মল্টোজ (maltose) — এক রকম শর্করা, যাকে 'মল্ট-সুগার'ও বলা হয়। রাসায়নিক হিসেবে অবশ্য এটা সাধারণ শর্করা $C_{12}H_{22}O_{11}$; কিন্তু বিভিন্ন ভৌত ধর্মে কিছু-কিছু প্রভেদ আছে। কঠিন স্ফটিকাকার পদার্থ, জলে দ্রবণীয়। সাধারণ ইক্ষু-চিনি অপেক্ষা এর মিষ্টত্ব কিছু কম। ডায়েস্টেস ↑ নামক এন্‌জাইমের রাসায়নিক ক্রিয়ায় মল্টের ↑ শ্বেতসার এরূপ মল্টোজে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

মলিব্‌ডিমাম (molibdinum) — একটি মৌলিক ধাতু; পারমাণবিক ওজন 95·95; সুকঠিন সাদা ধাতব

পদার্থ, রাসায়নিক ধর্মে অনেকটা লৌহেরমত। বিশেষ ধরনের ইস্পাত (স্টিল ↑) ও অন্যান্য ধাতু-সংকর তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়।

মলিকিউল (molecule) — অণু ; পদার্থের এক, বা একাধিক পরমাণু পরস্পরের সঙ্গে সংবদ্ধ (ভ্যালেন্সি ↑) হয়ে অণুর সৃষ্টি হয়। মৌলিক পদার্থের সম্ভাব্য ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য (সাধারণ হিসেবে) কণাকে বলে পরমাণু, বা অ্যাটম ; এরূপ বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর সমবায়ে গঠিত অণু, বা মলিকিউল হলো যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণিকা। অবশ্য মৌলিক পদার্থেরও অণু থাকে ; যেমন— H_2 হলো হাইড্রোজেনের একটা অণু, যা দু'টা হাইড্রোজেন-পরমাণুর সমবায়ে গঠিত। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর রাসায়নিক সংযোগে গঠিত হয় যৌগিক পদার্থের অণু; যেমন—H_2O হলো জলের একটা অণু, NH_3 অ্যামোনিয়ার ↑ একটা অণু, বা মলিকিউল।

মলিকিউলার ওয়েট (molecular weight) — আণবিক ওজন ; কোন যৌগিক, বা মৌলিক পদার্থের অণুর সংগঠক পরমাণুগুলোর ওজনের (অ্যাটমিক ওয়েট ↑) সংখ্যাগত যোগফল। অক্সিজেন পরমাণুর ওজন 16 ধরে নিয়ে কোন যৌগিক পদার্থের প্রত্যেকটি অণুর ওজন আনুপাতিক হিসাবে যে সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

মহলানবিশ (Mahalanobis), অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র — বাঙ্গালী পরিসংখ্যানবিদ ও পদার্থ-বিজ্ঞানী ; কলিকাতায় জন্ম 1893 খৃঃ, মৃত্যু 1972 খৃস্টাব্দ। শিক্ষা কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ; এম. এস-সি 1918 খৃঃ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ-বিদ্যার অধ্যাপক ও সংখ্যা-বিজ্ঞানের প্রবর্তক। পরিসংখ্যান-বিদ্যাকে সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। রয়্যাল সোসাইটির সদস্য, (এফ. আর. এস)। কলিকাতায় ভারতীয় পরিসংখ্যান সংসদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। পরিসংখ্যান বিজ্ঞানে অসামান্য দান ; আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন।

মাইকা (mica)—অভ্র, আঁভ ; কাচের মত স্বচ্ছ এক রকম কঠিন খনিজ পদার্থ ; পাত্‌লা স্বচ্ছ স্তরে গঠিত। জিনিসটার গঠন এরূপ যে, স্তরে-স্তরে খুলে ফেলা যায়। বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রে উৎকৃষ্ট তড়িৎ-রোধক পদার্থ (ইন্সুলেটর ↑) হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

মাইকোলজি (mycology)—ছত্রাক (ফাঙ্গাস ↑) সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। আবার, ছত্রাক-ঘটিত রোগকে বলা হয় **মাইকোসিস** (mycosis)।

মাইকেলসন (Michelson), এলবার্ট আব্রাহাম—মার্কিন পদার্থ-বিজ্ঞানী ; জন্ম 1851 খৃঃ, মৃত্যু 1931 খৃস্টাব্দ। বি খ্যা ত 'মোরেল - মাইকেলসন' পরীক্ষার জন্য স্মরণীয় ; ইথারের ↑ বিশ্ব পরিব্যাপ্তির কল্পনা অসার প্রতিপাদন 1887 খৃষ্টাব্দ। তথাকথিত ইথারের কল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে পৃথিবীর গতি নির্ধারণের চেষ্টা ; —বিফ-

লতায় আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা-বাদের ভিত্তি রচিত।

মাইক্রন (micron)—একমিটারের ↑ দশলক্ষ ভাগের এক ভাগ; একমিলি-মিটারের সহস্রাংশ দৈর্ঘিক পরিমাপ।

মাইক্রো- (micro-) — অতি ক্ষুদ্র; বিভিন্ন শব্দের পূর্বে কথাটা ব্যবহার করে ক্ষুদ্রত্ব প্রকাশ করা হয়; যেমন, মাইক্রোস্কোপ ↑, মাইক্রোমিটার ↑ ইত্যাদি। **মাইক্রো-ফ্যারাড** বলতে এক ফ্যারাড ↑ তড়িতের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ বুঝায়।

মাইক্রোফোন (microphone) — যে যন্ত্রের সাহায্যে মৃদু শব্দ-তরঙ্গকে বৈদ্যুতিক স্পন্দনে রূপান্তরিত করে' তীব্রতর শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি করে' শ্রুতিগোচর করা হয়। টেলিফোন ↑, প্রভৃতির প্রেরক-যন্ত্রে এর সাহায্যে উৎপন্ন তড়িৎ-স্পন্দন ধাতব তারের মাধ্যমে, অথবা বেতার - তরঙ্গরূপে প্রবাহিত হয়ে গ্রাহক-যন্ত্রে পৌঁছায়। ওই তড়িৎ-স্পন্দনকে পুনরায় শব্দ-তরঙ্গে পরিবর্তিত করে কথাবার্তা শ্রুতিগোচর হয়। সাধারণ মাই-ক্রোফোনে আল্‌গাভাবে কার্বনের গুঁড়াভর্তি একটা পাত্রের মুখে একটা ডায়াফ্রাম ↑ সংলগ্ন থাকে। শব্দ-তরঙ্গের প্রভাবে ওই ডায়াফ্রামটা আন্দোলিত হলে কার্বনের গুঁড়াগুলোও তদনুযায়ী কম্পিত হতে থাকে। এই কম্পনের তারতম্যের ফলে ওই কার্বন-গুঁড়ার মাধ্যমে প্রবাহিত তড়িৎ-স্রোতের পথে প্রতিবন্ধকতার তারতম্য ঘটে। এই তারতম্য অনুযায়ী প্রেরক-যন্ত্রের ডায়াফ্রামটা কম্পিত হতে থাকে; এর ফলে, প্রেরক-যন্ত্রের শব্দ-তরঙ্গের অনুরূপ শব্দ-তরঙ্গ আবার গ্রাহক-যন্ত্রেও সৃষ্টি হয়। অবশ্য আজকাল আরও নানারকম জটিল ব্যবস্থায় বিভিন্ন আধুনিক গঠনের মাইক্রোফোন ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

মাইক্রোকস্‌মিক সল্ট (microcosmic salt) — 'সোডিয়াম - অ্যামো-নিয়াম-হাইড্রোজেন ফস্‌ফেট' নামক ($NaNH_4HPO_4.4H_2O$) সূক্ষ্ম স্ফটিকাকার সল্টের বিশেষ নাম; দেখতে সাদা, জলে বিশেষ দ্রবণীয়। উত্তাপে বোর‍্যাক্সের ↑ মত এরও স্বচ্ছ কঠিন দানা তৈরি হয়।

মাইক্রোমিটার (micrometer) — এক রকম যন্ত্র, যার সাহায্যে অতি ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্য, বা সূক্ষ্মতম কোণের পরিমাপও সংলগ্ন মাইক্রোস্কোপের ↑ সাহায্যে নির্ণীত হয়ে থাকে। সাধারণ **মাইক্রোমিটার গেজ** হলো এক রকম যন্ত্র, যা দিয়ে সূক্ষ্ম দৈর্ঘ্যের মাপ সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়। এর বাঁকানো অংশের একপ্রান্ত যে দণ্ডের সঙ্গে স্ক্রু-র প্যাঁচে সংবদ্ধ থাকে, তার গায়ে ওই স্ক্রু-র প্যাঁচ সংখ্যার হিসেবে স্কেলের দাগ কাটা থাকে। স্ক্রু ঘুরিয়ে এ-দিয়ে ছোট-ছোট জিনি-

মাইক্রোমিটার গেজ
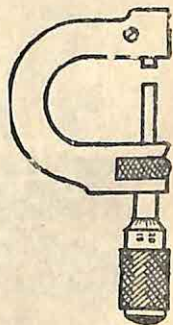
সের দৈর্ঘ্যের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ পর্যন্ত মাপা সম্ভব হয়ে থাকে।

মাইক্রোস্কোপ (microscope) — অণুবীক্ষণ যন্ত্র ; যে যন্ত্রের সাহায্যে অতি ক্ষুদ্র (সাধারণ দৃষ্টিতে অদৃশ্য) বস্তুও বর্ধিতাকারে দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। 'ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস'-ও এক রকম সাধারণ মাইক্রোস্কোপ পর্যায়-ভুক্ত ; কারণ, এর উত্তল (কন্‌ভেক্স) লেন্সের ↑ মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্র পদার্থ বর্ধিতাকারে দেখা যায়। কিন্তু প্রকৃত অণুবীক্ষণ যন্ত্র হলো 'কম্পাউণ্ড' মাইক্রোস্কোপ; যে যন্ত্রের মধ্যে আই-পিস ↑ এবং অব্জেক্‌টিভ ↑ নামক সাধারণতঃ তু'খানা উত্তল লেন্স সন্নিবিষ্ট থাকে। দ্রষ্টব্য বস্তু থেকে আলোক-রশ্মি 'অব্জেক্‌টিভ' ↑ লেন্সের মধ্য দিয়ে গিয়ে তার একটা হুবহু উল্‌টা প্রতিচ্ছায়া বর্ধিতাকারে যন্ত্রের অভ্যন্তরে গিয়ে পতিত হয়। (অবশ্য অতি সূক্ষ্ম কোন পাত্‌লা জিনিস দেখতে হলে তার ভিতর দিয়ে সোজা-সুজি ভাবে আলোকরশ্মি ফেলতে হয়।) 'আইপিস' লেন্স খানার ফোক্যাল লেংথের ↑ মধ্যে এসে পড়লে ওই প্রতিচ্ছায়াটা উল্‌টা অবস্থায়ই আই-

আধুনিক মাইক্রোস্কোপ

পিসের ভিতর দিয়ে আরও বর্ধিতা-কারে দর্শকের দৃষ্টিগোচর হয়ে ওঠে। অবশ্য বিভিন্ন লেন্সের সাহায্যে
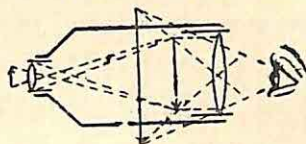
মাইক্রোস্কোপে কিভাবে ছোট জিনিস বড় দেখায়

আরও নানারকম সব বিধি-ব্যবস্থা সমন্বিত জটিল গঠনের বিভিন্ন শ্রেণীর মাইক্রোস্কোপ যন্ত্র আছে।

মাইল (mile) — দূরত্ব পরিমাপের একটি ইংলণ্ডীয় একক, 1760 গজ। আবার, নটিক্যাল মাইল ↑ হলো ভৌগোলিক মাইল ; ভূ-পৃষ্ঠের এক অক্ষাংশের (ল্যাটিচিউড ↑) মোটামুটি ষাট ভাগের (মিনিটের) এক ভাগ, অর্থাৎ গড়ে প্রায় 6076·8 ফুট। মেট্রিক ↑ পদ্ধতির হিসেবে এক মাইল = 1·6093 কিলোমিটার ↑।

মাইলোনাইট (mylonite) — রঙীন রেখাযুক্ত অতিকঠিন এক প্রকার প্রস্তর ; যেমন উচ্চ পর্বতের তলদেশে দেখা যায়। প্রচণ্ড চাপ ও রোদ-বৃষ্টিতে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে এর সৃষ্টি হয়, সাধারণ প্রস্তরের ধর্ম আর থাকে না।

মাইল্ড স্টিল (mild steel) — অপেক্ষাকৃত নরম ইস্পাত। এর মধ্যে কাঁচা লোহার সঙ্গে কার্বন ও বিভিন্ন ধাতব উপাদান (স্টিল ↑) অতি সামান্য পরিমাণে মিশ্রিত হয়। গৃহাদির কাঠামো তৈরি করবার কাজে মাইল্ড স্টিল ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

এ-দিয়ে অস্ত্র-শস্ত্র, বা যন্ত্রাদি তৈরি করলে সহজেই ক্ষয়ে যায়, তীক্ষ্ণ-ধারও হয় না; এ-সব কাজে 'হার্ড ষ্টিল' ↑ ব্যবহার করা দরকার।

মাইয়োপিয়া (myopia) — চোখের স্বল্প দূরত্বের দৃষ্টি-দোষ (সর্ট সাইট ↑)। চক্ষু-গোলকের এরূপ ত্রুটির ফলে নিকটের জিনিস দেখা যায়, কিন্তু কিছু দূরবর্তী পদার্থ পরিষ্কাররূপে দেখা যায় না। অবতল (কন্‌কেভ) লেন্সের ↑ চশমা ব্যবহারে চোখের এই দোষ সংশোধিত হয়।

মাইয়োসিন (myosin) — দেহের পেশী-তন্তুর প্রোটিন ↑ জাতীয় প্রধান উপাদান। পদার্থটা জলে দ্রবণীয় নয়, কিন্তু ভুক্ত বস্তুর অ্যাল্‌কালি ↑ উপাদানের জলীয় দ্রবে গলে গিয়ে পেশীর মধ্যে এক রকম জেলির ↑ মত জিনিসের সৃষ্টি করে। এর জন্যেই দেহের মাংস-পেশীগুলো সহজেই সংকুচিত ও প্রসারিত হতে পারে।

মাইয়োসিস (myosis) — চোখের মণির (পিউপিল ↑) অস্বাভাবিক সং-কোচন; রোগ বিশেষ। আবার চক্ষু পরীক্ষার জন্যে যে-সব ঔষধ প্রয়োগে চোখের মণির এরূপ সংকোচন ঘটে তাদের বলে **মাইয়োটিক্‌স**।

মাইয়োকার্ডাইটিস (myocarditis) — হৃৎপিণ্ডের বহিরাবরক মাংসপেশীর স্ফীতি ও প্রদাহজনিত এক প্রকার রোগ বিশেষ। **মাইয়ো-** (myo-) মানে 'মাস্‌ল' ↑, অর্থাৎ মাংসপেশী সম্বন্ধীয়। (মাইয়োসিন ↑)

-মাইসিটিন (-mycetine) — বিভিন্ন ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদের দেহ-নিঃসৃত জৈব রাসায়নিক পদার্থ, যার প্রভাবে জীবদেহে বিশেষ বিশেষ রোগ-জীবাণুর বংশ বৃদ্ধি ও রোগা-ক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়ে থাকে। এ-রকম পদার্থকে **মাইসিন** (mycin)-ও বলা হয়। টাইফয়েড, টাইফাস প্রভৃতি রোগের ঔষধ ক্লোরোমাইসিটিন; ডিপ্‌থিরিয়া, যক্ষ্মা প্রভৃতির ঔষধ স্ট্রেপ্টোমাইসিন; বিভিন্ন ভাইরাস ↑-ঘটিত রোগে 'অরিয়োমাইসিন'। এগুলো সবই বিভিন্ন ছত্রাক থেকে প্রাপ্ত অনুরূপ পর্যায়ের জৈব রাসায়নিক পদার্থ।

মান্‌জ মেটাল (muntz metal) — তামা ও দস্তার (জিঙ্কের ↑) এক বিশেষ সংকর-ধাতু; সমুদ্র-জলের রাসায়নিক ক্রিয়ায় ক্ষয় হয় না বলে জাহাজের তলদেশ সাধারণতঃ এ-দিয়ে তৈরি হয়ে থাকে।

মার্কনি (Marconi), গাগ্লিয়েমো — ইটালীয় পদার্থ-বিজ্ঞানী ও প্রখ্যাত যন্ত্রবিদ; জন্ম 1874 খৃঃ, মৃত্যু 1937 খৃষ্টাব্দ। ইনি তাঁর আবিষ্কৃত বেতার যন্ত্রের (রেডিও ↑) পরীক্ষায় ইটালী সরকারের সাহায্য লাভে বঞ্চিত; শেষে ইংলণ্ডের ডাক ও নৌ-বিভাগের আনুকূল্যে প্রথম বেতার সংবাদ প্রেরণ, 1897 খৃঃ। শব্দবিজ্ঞানের এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য পদার্থ-বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ, 1909 খৃঃ। বেতার যন্ত্রের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের গবেষণায় জীবনপাত।

মার্কারি (Mercury)—বুধ গ্রহ; সৌর

পরিবারের গ্রহগুলোর মধ্যে এই গ্রহটা সূর্যের নিকটতম কক্ষে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। সূর্য থেকে এর দূরত্ব গড়ে মাত্র 3 কোটি 60 লক্ষ মাইল; আয়তন পৃথিবীর আয়তনের প্রায় উনত্রিশ ভাগের এক ভাগ মাত্র। সম্ভবতঃ গ্রহটার উপরিভাগ প্রচণ্ড উত্তপ্ত এবং এর কোন বায়ুমণ্ডল নেই। পৃথিবীর 88 দিনে বুধ গ্রহের বছর হয়, অর্থাৎ সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে এর লাগে আমাদের 88 দিন।

মার্কারি (mercury)—পারা, পারদ। মৌলিক তরল ধাতব পদার্থ; সাংকেতিক চিহ্ন Hg, পারমাণবিক ওজন 200·61; পারমাণবিক সংখ্যা 80; রৌপ্যের মত সাদা ভারী পদার্থ। স্বাভাবিক তাপ ও চাপে পারদই একমাত্র তরল ধাতু। সিনাবার↑ নামক মার্কারি-সালফাইড, HgS, খনিজ আবদ্ধ পাত্রে উত্তপ্ত করে ও তার মধ্যে বায়ু-প্রবাহ চালিয়ে বিশুদ্ধ পারদ নিষ্কাশিত করা হয়। থার্মোমিটার↑, ব্যারোমিটার↑, ম্যানোমিটার↑ প্রভৃতি বিভিন্ন যন্ত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর বিভিন্ন সংকর-ধাতু (অ্যামাল্‌গাম↑) বিভিন্ন কাজে প্রয়োজন হয়। পারদের যৌগিক পদার্থগুলো সাধারণতঃ বিষাক্ত; কিন্তু স্বল্প মাত্রায় ক্যালোমেল (মার্কিউরিয়াস ক্লোরাইড, Hg_2Cl_2,) প্রভৃতি কতকগুলো যৌগিক আবার ঔষধরূপেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

মার্কারি কম্পাউণ্ড (mercury compound)—পারদের সঙ্গে বিভিন্ন পদার্থের রাসায়নিক মিলনে বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন যৌগিক পদার্থে মার্কারি কখন মনোভ্যাল্যাণ্ট↑ এবং কখন বাইভ্যাল্যাণ্ট↑ দু'রকমেই মিলিত হতে পারে। মনোভ্যাল্যাণ্ট মার্কারি সল্টকে **মার্কিউরাস** (mercurous) এবং বাইভ্যাল্যাণ্ট শ্রেণীর মার্কারি যৌগিককে **মার্কিউরিক** (mercuric) সল্ট বলে; যেমন — মার্কিউরাস ক্লোরাইড, Hg_2Cl_2, (সাধারণতঃ যাকে বলে ক্যালোমেল) বিরেচক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আবার মার্কিউরিক ক্লোরাইড, $HgCl_2$, (সাধারণতঃ যা 'করোসিভ সাব্লিমেট' নামে পরিচিত) কীটপতঙ্গ নাশক বিষাক্ত পদার্থ। ভার্মিলিয়ন↑, অর্থাৎ সিন্দুর হলো মার্কিউরিক সালফাইড, HgS; আয়ুর্বেদীয় বিশিষ্ট ঔষধ মকরধ্বজ, বা স্বর্ণ-সিন্দুর হলো গন্ধক ও পারার রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন বিশেষ এক প্রকার সালফাইড যৌগিক। নামে স্বর্ণ-সিন্দুর হলেও এর মধ্যে কিন্তু সোনা থাকে না, এর প্রস্তুতিতে সোনা মাত্র ক্যাটালিস্ট↑ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

মার্কারি ভেপার ল্যাম্প (mercury vapour lamp) — পারদ-বাষ্পের মধ্যে তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত করলে নীলাভ তীব্র আলোক-রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়। এ-জন্যে ইলেক্‌ট্রিক বাল্ব, বা টিউবের মধ্যে পারদের বাষ্প ভর্তি করে যে এক রকম ল্যাম্প তৈরি হয়ে থাকে। এর আলোকে প্রচুর অতি-

বেগুনী (আল্ট্রা-ভায়োলেট ↑) রশ্মির উদ্ভব হয়। এ-জন্যে বিশেষ রেডিও-থেরাপি ↑ চিকিৎসায় অনেক সময় এরূপ আলোক-রশ্মি ব্যবহৃত হয়।

মার্গেরিন (margarine)—উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজাত তৈল ও চর্বির সংমিশ্রণে তৈরী মাখম-সদৃশ এক রকম খাদ্য বস্তু। এর মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণে দুধ মেশানো হয়; বিশেষ জীবাণুর প্রভাবে ওই দুধ বিকৃত হয়ে মাখমের মত গন্ধ বেরোয়। এর পরে ওর মধ্যে বিভিন্ন ভিটামিন ↑ ও উপযুক্ত রং মিশিয়ে ব্যবহারোপযোগী মার্গেরিন খাদ্য প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।

মার্কেসাইট (marcasite)—আয়রন ডাইসাল্‌ফাইড (আয়রন পাইরাইট্স ↑) শ্রেণীর এক প্রকার সাদা স্ফটিকাকার খনিজ পদার্থ। এর বিভিন্ন আকারের পালিশ-করা টুক্‌রা চক্‌চকে সাদা পাথরের মত সস্তা অলঙ্কারাদিতে ব্যবহৃত হয়।

মার্‌স (Mars) — মঙ্গল গ্রহ। পৃথিবী ও বৃহস্পতি (জুপিটার ↑) গ্রহদ্বয়ের মধ্যবর্তী একটা কক্ষপথে গ্রহটা সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। সূর্য থেকে এর দূরত্ব গড়ে প্রায় 14 কোটি 15 লক্ষ মাইল। আয়তনে পৃথিবীর প্রায় নয় ভাগের এক ভাগ মাত্র। পৃথিবীর চাঁদের মত দু'টা উপগ্রহ নিজ-নিজ কক্ষ-পথে মঙ্গল গ্রহকে প্রদক্ষিণ করছে। গ্রহটার বছর আমাদের 687 দিনে হয়; অর্থাৎ পৃথিবীর 687 দিনে মঙ্গল গ্রহ সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে। গ্রহটার উপরিভাগ অত্যন্ত ঠাণ্ডা, প্রায় শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হবে। মঙ্গল গ্রহের এক রকম বায়ুমণ্ডল আছে বলে মনে হয়; কিন্তু কোন জীবের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ অদ্যাপি পাওয়া যায় নি।

মার্স গ্যাস (marsh gas)—মিথেন গ্যাস, CH_4; একে আবার 'ফায়ার ড্যাম্প' ↑ -ও বলে। এটা প্যারাফিন ↑ শ্রেণীর প্রথম হাইড্রোকার্বন ↑; বর্ণহীন, গন্ধহীন অদৃশ্য দাহ্য গ্যাস। বায়ুর সংস্পর্শে এতে সামান্য অগ্নিসংযোগ ঘটলেই সহসা জলে ওঠে। সাধারণতঃ বিভিন্ন জৈব পদার্থাদি পচে এই গ্যাসের সৃষ্টি হয়ে থাকে; জলাভূমি, বিশেষতঃ কয়লার খনির অভ্যন্তরে অনেক সময় মার্স গ্যাস উদ্ভূত হয়ে বিস্ফোরণ ঘটায়।

মাল্টি··· (multi···) — অনেক, বহু-সংখ্যক অর্থে ব্যবহৃত শব্দ; যেমন — **মাল্টিসেলুলার**, বহুকোষী; যে-জীবের গঠনে বহুসংখ্যক কোষ, বা সেল ↑ রয়েছে। **মাল্টিপ্যারাস** মানে হলো বহুসন্তানবতী (নারী)।

মাল্টিপ্‌ল (multiple) — গুণিতক রাশি; যে সংখ্যা অপর একাধিক সংখ্যা দ্বারা পূর্ণ বিভাজ্য; যেমন—21 হলো 7-এর একটা মাল্টিপ্‌ল।

মাস্ (mass) — পদার্থের ভর, অর্থাৎ মোট বস্তু-পরিমাণ। কোন বস্তুর উপরে শক্তি প্রয়োগ করলে প্রকৃতপক্ষে তার ভরের অনুপাতেই বস্তুটার গতিবেগের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। আবার, কোন বস্তুর ওজন তার ভরের সমানুপাতিক হয়ে থাকে। এ-জন্যে কোন

বস্তুর ভর সাধারণতঃ তার ওজনের পরিমাপের দ্বারাই নির্ণীত হয়; যেমন, এক পাউণ্ড 'মাস্', বা ভর বললে বুঝতে হবে বস্তুটার ওজন এক পাউণ্ড; যদিও বস্তুর ভর ও ওজন সূক্ষ্ম বিচারে এক নহে।

মাস্ স্পেক্টোগ্রাফ (mass spectograph) — এক রকম যন্ত্র, যার সাহায্যে বিভিন্ন ভরের ধন-তড়িতাবিষ্ট আয়ন ↑ -কণিকাগুলোকে তাদের ভরের ক্রমানুসারে পৃথক করা সম্ভব হয়। যেমন, ইউরেনিয়াম ↑ ধাতু 234, 235 এবং 238 ভর-বিশিষ্ট বিভিন্ন আইসোটোপ ↑ পরমাণুর সমবায়ে গঠিত; 'মাস্ স্পেক্টোগ্রাফ' যন্ত্রের সাহায্যে এদের পৃথক করা যায়। কোন পদার্থের পারমাণবিক ওজন, বা বিভিন্ন আইসোটোপের ↑ সঠিক ভর-ও এই যন্ত্রের সাহায্যে নির্ণয় করা যেতে পারে। যন্ত্রটার এই বিশেষ প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'পজিটিভ-রে অ্যানালিসিস'।

মাস্ স্পেকট্রাম (mass spectrum) — মাস্ স্পেক্টোগ্রাফ ↑ যন্ত্রের সাহায্যে ধন-তড়িতাহিত আয়ন-কণিকার ধারা সম্পাতে এক রকম বিশেষ বর্ণালি (স্পেকট্রাম ↑) সৃষ্টি করা যায়; এই বিশেষ বর্ণালিকে বলা হয় মাস্-স্পেকট্রাম। এর মূল তথ্য প্রদত্ত চিত্র থেকে মোটামুটি বুঝা যাবে। পদার্থের তড়িতাবিষ্ট আয়ন-কণিকার ধারা 'আ'-চিহ্নিত বৈদ্যুতিক প্লেট দু'টার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে নিম্ন দিকে কিছু বেঁকে যায়; তখন এই ধারা-পথের লম্বভাবে 'ম'-চিহ্নিত চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করলে ওই ধারা উর্ধমুখে
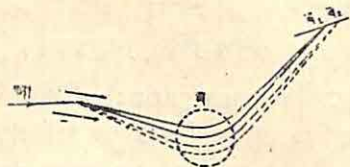
'মাস্-স্পেকট্রাম'
উৎপাদনের পদ্ধতি

বেঁকে গিয়ে পর্দায় ব$_1$ব$_2$ বর্ণালির সৃষ্টি করে। এভাবে বিভিন্ন ভরের কণিকাগুলো ফটোগ্রাফিক প্লেট, বা পর্দায় বিভিন্ন দূরত্বে বর্ণালির রেখাপাত করে থাকে। মাস্ স্পেকট্রামের এই বর্ণালি-রেখার সংস্থান দেখে বিভিন্ন ভরের কণিকার অস্তিত্ব পৃথকভাবে নিরূপণ করা যায়। এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে বিচিত্র কৌশলে মহাশূন্যে বহু দূরবর্তী জ্যোতিষ্কগুলোর উপাদানসমূহের স্বরূপ পর্যন্ত নির্ণীত হয়েছে।

মাস্কোভাইট (muscovite) — বিশেষ এক প্রকার সাদা অভ্র (মাইকা ↑); সাধারণতঃ যার পাত্ বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদিতে ইন্সুলেটর ↑ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

মাস্ট- / মাস্টি- (mast- / masti-)— বক্ষদেশ, বুক; যেমন—**মাস্টাইটিস** (mastitis) বক্ষ-পেশীর প্রদাহ ও স্ফীতি-জনিত রোগ বিশেষ।

মাস্টিক (mastic)—(i) ভার্নিস রং তৈরীতে ব্যবহৃত রজন (রেজিন, resin ↑)জাতীয়পদার্থ; (ii) বর্ষাতির কাপড় জল-নিরোধক করবার জন্যে

ব্যবহৃত নরম ও আঠালো নিম্ন-গলনাংক বিশিষ্ট বিটুমেন↑-ঘটিত পদার্থ বিশেষ।

মিউকাস মেম্ব্রেন (mucous membrane) —গলা, নাক প্রভৃতির অভ্যন্তরে যে পাত্‌লা পর্দার আবরণ থাকে। এই পর্দার গায়ে থাকে অনেকগুলি **মিউকাস গ্ল্যাণ্ড**, অর্থাৎ শ্লেষ্মা-গ্রন্থি, যেগুলি থেকে জেলির মত তরল পদার্থ (শ্লেষ্মা) নিঃসৃত হয়, যাকে বলে **মিউকাস**। ঐ পর্দাকে **মিউকোসা**-ও বলা হয়।

মিউরিয়্যাটিক অ্যাসিড (muriatic acid)— হাইড্রোক্লোরিক↑ অ্যাসিড, HCl, পূর্বে এই নামে পরিচিত ছিল।

মিউটেশন (mutation)— আকস্মিক কোন কারণে জীবের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে পিতামাতার গুণাবলী থেকে অন্যরূপ নূতন গুণাবলীর বিকাশ; পরিব্যক্তি। সন্তানে অর্জিত এই সব নূতন গুণ, ধর্ম ও স্বভাব তার পরবর্তী বংশাবলীতেও সঞ্চারিত হতে পারে। এক্স-রশ্মির↑ প্রভাবে কখন-কখন জীবের স্বকীয় প্রকৃতির এরূপ পরিবর্তন ঘটে থাকে; কস্‌মিক↑ রশ্মির প্রভাবেও এরূপ হওয়া সম্ভব। [সাদা ফুলের গাছে কখন-কখন দু'-একটা এমন বীজ জন্মে যার গাছে লাল ফুল ফোটে। এই লাল ফুলের গাছে যদি বংশ-পরম্পরায় আবার ধারাবাহিক ভাবে লাল ফুলই ফোটে তবে তাকে **মিউট্যাণ্ট** (mutant), অর্থাৎ পরিব্যক্ত প্রজন্ম বলা হয়।]

মিটার (meter) — (1) পরিমাপক যন্ত্র; যে যন্ত্রের সাহায্যে কোন কিছুর পরিমাণ স্থির করা সম্ভব হয়; যেমন, থার্মোমিটার↑, ভোল্টমিটার↑ ব্যারোমিটার↑ প্রভৃতি। (2) মেট্রিক পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের একটা একক; =প্রায় 39·37 ইঞ্চি।

মিটিয়র (meteor) — উল্কাপিণ্ড; মহাশূন্য থেকে যে সব পদার্থ-পিণ্ড মাঝে মাঝে প্রচণ্ড বেগে ভূ-পৃষ্ঠে নিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। একে **মিটিওরাইট** (meteorite)-ও বলে। দুরন্ত বেগে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করবার সময়ে এই নৈসর্গিক পদার্থ-পিণ্ডগুলো বায়ুর সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে জ্বলতে থাকে। লোকে সাধারণতঃ একে বলে উল্কাপাত। অনেক সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিণ্ডগুলো বায়ুমণ্ডলেই পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়, কখন কখন আবার পৃথিবীতে এসে পড়ে। এর মধ্যে থাকে বিভিন্ন খনিজ পদার্থ, বিশেষতঃ লৌহই বেশীর ভাগ থাকে।

মিটিয়রোলজি (meteorology) — আবহাওয়া বিজ্ঞান; বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন অবস্থা, যেমন—বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানীয় বায়ুর চাপ, তাপ, আর্দ্রতা, গতি, গ্যাসীয় গঠন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের পর্যবেক্ষণ ও তথ্যানুসন্ধান সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। আবহাওয়ার এ-সব তথ্যাদি থেকে ঝড়, বৃষ্টি, বন্যা প্রভৃতির পূর্বাভাষ বিভিন্ন যুক্তি ও হিসাবের সাহায্যে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে অনেকটা সঠিকভাবে জানা যায়।

মিডিয়ান (median) — কোন ত্রিভু-

জের যে-কোন বাহুর মধ্যবিন্দু থেকে বিপরীত কৌণিক বিন্দুর সংযোজক সরল রেখা। কাজেই জ্যামিতিক প্রত্যেকটি ত্রিভুজের তিনটি মিডিয়ান থাকে।
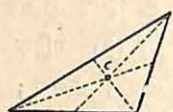
মিডিয়ান

এভাবে অঙ্কিত তিনটি মিডিয়ান যে বিন্দুতে পরস্পর ছেদ করে তাকে বলা হয় ত্রিভুজের **সেণ্ট্রয়েড** (centroid) ; বাংলায় বলে কেন্দ্রীণ, বা মধ্য-বিন্দু।

মিডিয়াম (medium)— মাধ্যম ; যে পদার্থের ভিতরে অন্য কোন পদার্থ স্থিত, বা পরিচালিত হয় ; যেমন—'পেইণ্ট' তৈরি করতে রঙীন পদার্থের চূর্ণ সাধারণতঃ তিসির তেলে গুলে নেওয়া হয় ; এখানে ওই তেল হলো রং-এর মিডিয়াম। শব্দ-তরঙ্গ বায়ুর ভিতর দিয়ে পরিচালিত হয়ে এসে কানে শ্রুতিগোচর হয়ে থাকে ; কাজেই বায়ু হলো শব্দ-তরঙ্গের একটা মিডিয়াম, বা মাধ্যম।

মিথাইল অ্যালকোহল (methyl-alcohol) — পদার্থটা সাধারণতঃ 'উড্ স্পিরিট ↑, CH_3OH, নামে বিশেষ পরিচিত। 'ডেস্ট্রাক্টিভ ডিষ্টি-লেশন' ↑ প্রক্রিয়ায় কাঠ চোলাই করে এই বর্ণহীন বিষাক্ত তরল পদার্থটা পাওয়া যায়। একে আবার কখন-কখন 'উড্ন্যাপ্থা' ↑ -ও বলা হয়। দ্রাবক পদার্থ হিসেবে এবং 'মেথিলেটেড স্পিরিট' ↑ তৈরি করতে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিভিন্ন শিল্প-কাজেও এর নানা রকম ব্যবহার আছে।

মিথাইল অরেঞ্জ (methyl orange) — একটি জটিল জৈব রাসায়নিক রঙীন পদার্থ বিশেষ ; এর জলীয় দ্রবণ অ্যাসিডের সংস্পর্শে লাল ও অ্যালকালির ↑ সংস্পর্শে হল্দে হয়ে যায়। (ইণ্ডিকেটর, indicator ↑)।

মিথিলিন (methylene) — একটি হাইড্রোকার্বন (CH_2) র‍্যাডিক্যাল। ইথিলিন ↑, C_2H_4, প্রভৃতি বিভিন্ন হাইড্রোকার্বনের মত মিথিলিনের কিন্তু পৃথক অস্তিত্ব নেই। অন্যান্য র‍্যাডিকেলের সঙ্গে এটা রাসায়নিক সংযোগে মিলিত হয়ে বিভিন্ন জৈব যৌগিকের সৃষ্টি করে থাকে ; যেমন, CH_2Cl_2 যৌগটি হলো মিথিলিন ক্লোরাইড। কাজেই এটা মিথিলিন বা 'মিথাইল' গ্রুপ নামে পরিচিত একটা জৈব রাসায়নিক র‍্যাডিক্যাল ↑ মাত্র।

মিথিলিন-ব্লু (methylene blue) — গাঢ় নীলবর্ণের এক প্রকার জটিল জৈব রাসায়নিক পদার্থের ($C_{66}H_{18}N_3 \cdot SCl$) বিশেষ নাম ; জলে দ্রবণীয়। রঞ্জক পদার্থ হিসেবে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কোন-কোন ঔষধের উপাদান হিসেবে ও জীববিদ্যার পরীক্ষাদিতে এর কিছু কিছু ব্যবহার আছে। একে 'মিথাইল-ব্লু' ও বলে।

মিথিলেটেড স্পিরিট (methylated spirit) — ইথাইল অ্যালকোহলের ↑ সঙ্গে সাধারণতঃ 5% 'মিথাইল অ্যালকোহল' (উড্ স্পিরিট ↑) মিশিয়ে যে তরল জ্বালানি পদার্থ তৈরি হয়। স্পিরিট ল্যাম্প, স্টোভ

প্রভৃতিতে জ্বালানো হয়; দ্রাবক পদার্থ হিসেবে নানা রকম রং, ভার্নিস ↑ প্রভৃতি তৈরি করতেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মদ্য জাতীয় ইথাইল অ্যালকোহলকে অপেয় ও বিষাক্ত করবার জন্যেই এর মধ্যে মিথাইল অ্যালকোহল মেশানো হয়। কখন কখন আবার মিথিলেটেড স্পিরিটে পাইরিডিন ↑, পেট্রোলিয়াম ↑ প্রভৃতিও সামান্য পরিমাণে মিশ্রিত করা হয়ে থাকে।

মিথেন (methane) — মার্স গ্যাস ↑, CH_4; ফায়ার ড্যাম্প ↑।

মিনারেল (mineral) — খনিজ পদার্থ; সাধারণতঃ যে-সব অজৈব, বা ধাতব পদার্থ স্বাভাবিক, বা মিশ্র অবস্থায় ভূগর্ভে পাওয়া যায়; যেমন—লোহা, দস্তা, তামা প্রভৃতির আকরিক প্রস্তর। কয়লা একটা জৈব খনিজ পদার্থ। খনিজ তৈলগুলো প্রধানতঃ হলো জৈব হাইড্রোকার্বন ↑ শ্রেণীর। এ-গুলোও অবশ্য খনিজ পর্যায়ভুক্ত; তবে এদের সাধারণতঃ বলা হয় 'মিনারেল অয়েল', অথবা 'প্যারাফিন ↑ অয়েল'।

মিনারোলজি (minerology) — বিভিন্ন খনিজ পদার্থের গঠন, উপাদান, পরিশোধন, বিশ্লেষণ প্রভৃতির বিভিন্ন তথ্যাদি সম্পর্কীয় বিজ্ঞান।

মিনিম (minim) — তরল পদার্থের একক বিশেষ; 60 মিনিম = 1 ফ্লুইড আউন্স ↑, এক মিনিম = 0·06 ঘন সেন্টিমিটার (c.c.)।

মিনিয়াম (minium) — মেটেসিন্দুর; রেড লেড ↑ Pb_3O_4, বা লেড অক্সাইড যৌগের বিশেষ নাম।

মিরিয়াপড (myriapod) — কেন্নো, বিছা প্রভৃতি যে-সব প্রাণীর বহুসংখ্যক পা থাকে, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ওই সব পায়ের সাহায্যে যারা বুকে হেঁটে আস্তে চলা ফেরা করে। এই শ্রেণীর প্রাণীদের কোন কোনগুলি আবার তাদের পায়ের সংখ্যানুযায়ী **মিলিপেড** (সহস্র-পদী), **সেন্টিপেড** (শত-পদী) প্রভৃতি বিভিন্ন নামেও পরিচিত হয়ে থাকে।
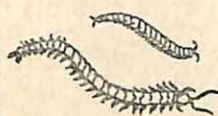
মিরিয়াপড

মিরেজ (mirage) — মরীচিকা; মরুভূমিতে উত্তপ্ত ও হাল্‌কা বায়ুর বিভিন্ন স্তরে প্রতিফলিত হয়ে দূরবর্তী বস্তুর যে প্রতিচ্ছায়া দেখে তাকে নিকটবর্তী বলে ভ্রম হয়। এ রকম ছায়া উল্‌টা হয়ে পড়ে, যেন বৃক্ষাদি আকাশ থেকে মাটির দিকে ঝুলছে, যেমন জলাশয়ের তীরবর্তী বৃক্ষাদির ছায়া জলে প্রতিফলিত হয়। এভাবে অনেক দূরবর্তী তরঙ্গায়িত বালুকারাশির উপরে পতিত এরূপ উল্‌টা ছায়া নিকটেই জলাশয়ের মত পরিদৃষ্ট হয়ে মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত পথিকদের বিভ্রান্ত করে।

মিলি (milli) — হাজার ভাগের এক ভাগ। এক সহস্রাংশ ভাগ প্রকাশ করতে বিভিন্ন মাপের পূর্বে ব্যবহৃত হয়; যেমন — মিলিগ্রাম, এক গ্র্যামের 1/1000 ভাগ, প্রায় ·0154

গ্রেণ। এরূপ মিলিলিটার ↑, মিলি-মিটার ↑ ইত্যাদি।

মিলি-অ্যাম্‌মিটার (milliammeter) — অতি সূক্ষ্ম মাপের অ্যাম্‌মিটার ↑ যন্ত্র; যাতে মিলি-অ্যাম্পিয়ার ↑, অর্থাৎ এক অ্যাম্পিয়ারের হাজার ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত তড়িৎ-প্রবাহ মাপা সম্ভব হয়ে থাকে।

মিলি-বার (millibar) — বায়ুমণ্ডলীয় চাপ পরিমাপের একক বিশেষ; আবহাওয়া বিজ্ঞানে কথাটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে (বার, bar ↑)। 60° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ↑ উষ্ণতায় 45° অক্ষাংশের (ল্যাটিচিউড ↑) বায়ুমণ্ডলীয় চাপকে এক **'বার'** বলা হয়; এই চাপ ব্যারোমিটারে ↑ প্রায় 75 সেন্টিমিটার পারদ-স্তম্ভের ওজনের সমান। মিলি-বার হলো এই চাপের হাজার ভাগের এক ভাগ।

মিল্কিওয়ে (milkyway) — গ্যালাক্সি ↑; বাংলায় বলে ছায়াপথ। মহাশূন্যে অনেকটা স্থান জুড়ে যে সাদা আলোকপুঞ্জ দেখা যায়। কয়েক হাজার আলোক-বর্ষ (লাইট ইয়ার ↑) দূরে পরস্পর অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্র ও গ্যাসীয় পিণ্ডের সমবায়ে এই ছায়াপথ গঠিত। বহু দূরবর্তী বলে ওই ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র জোতিষ্কগুলো দৃষ্টিগোচর হয় না, আলোকপুঞ্জ মাত্র দেখা যায়।

মিলিয়ন (million) — সংখ্যাবাচক, এক হাজার হাজার, অর্থাৎ দশ লক্ষ, 1,000,000; সূচক রাশিতে 10^6।

মিলিয়ার্ড (milliard) = 1000 মিলিয়ন।

মেগা- (mega-)—দশ লক্ষ গুণ বুঝাতে কথাটা ব্যবহৃত হয়; যেমন, **মেগা-সাইকল** মানে কোন অল্টার্নেটিং কারেন্টের ↑ প্রতি সেকেণ্ডে দশ লক্ষ বার বিবর্তন (পর্যায়ক্রমে পজিটিভ থেকে নেগেটিভ ও নেগেটিভ থেকে পজিটিভ)। সাধারণভাবে কোন কিছুর অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, বা বৃহদায়তন বুঝাতেও কথাটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে; যেমন—**মেগাকোলন** বললে অন্ত্রের কোলন ↑ অংশের অত্যধিক বৃদ্ধি, বা স্ফীতি বুঝায়; রোগ বিশেষ।

মেগোম (megohm) — দশ লক্ষ ওম্ ↑। তড়িৎ-বিজ্ঞানে ব্যবহৃত অতি উচ্চ একটি একক।

মেটাজোয়া (metazoa) — যে-সব জীবের দেহ দুই, বা ততোধিক কোষ-স্তরে গঠিত; বহুকোষী জীব। বস্তুতঃ এককোষী প্রোটোজোয়া ↑ ও স্পঞ্জ জাতীয় জীব ব্যতীত প্রায় সব প্রাণীই মেটাজোয়া শ্রেণীর।

মেটাটার্সাল (metatarsal)—পায়ের পাতার অভ্যন্তরস্থ খণ্ডে-খণ্ডে সংযুক্ত হাড়গুলি। পদতলাস্থির গঠন ও সংস্থানের এরূপ বৈশিষ্ট্যের জন্যে এদের 'মেটা মার্সাল বোন' বলে। হাতের পাতার এরূপ পরস্পর সংযুক্ত খণ্ডাস্থিগুলিকে বলা হয় **মেটাকার্পাল** বোন্‌স।

মেটাটার্সাল

মেটাল (metal) — ধাতব পদার্থ।

সোনা, রূপা, লোহা প্রভৃতি যে-সব মৌলিক পদার্থের বিশেষ এক প্রকার ধাতব ঔজ্জ্বল্য আছে, পিটিয়ে-পুড়িয়ে যাকে সূক্ষ্ম তার ও পাতে পরিণত করা যায়, এবং সাধারণতঃ যার উত্তাপ ও তড়িৎ পরিবহনের ক্ষমতা থাকে। ধাতব পদার্থ মাত্রই অক্সিজেনের সঙ্গে রাসায়নিক মিলনে অক্সাইড ↑ যৌগ গঠন করে। সাধারণতঃ সকল ধাতুই মোটামুটি ইলেক্ট্রোপজিটিভ ↑ ধর্ম-বিশিষ্ট হয়ে থাকে।

মেটালয়েড (metalloid)—ধাতুকল্প; যে-সব মৌলিক পদার্থের গুণ ও ধর্ম অনেকাংশে ধাতব পদার্থের মত। কোন-কোন রাসায়নিক ক্রিয়ায় এদের ধাতুর ন্যায় মনে হয়; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ধাতব পদার্থের সকল গুণ ও ধর্ম এদের থাকে না। এ-জন্যে আর্সেনিক ↑, অ্যান্টিমনি ↑ প্রভৃতি কয়েকটি মৌলিক পদার্থকে বলে মেটালয়েড।

মেটালোগ্রাফি (metallography) — বিভিন্ন ধাতু ও ধাতু-সংকর সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান; তাদের শিল্প-উৎপাদন, গঠন, বিশুদ্ধতা, ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ক প্রযুক্তি-বিদ্যা। পক্ষান্তরে, **মেটালার্জি** (metallurgy) হলো খনিজ থেকে বিশুদ্ধ ধাতু নিষ্কাশন, ধাতু-সংকর প্রস্তুতি, খনিজের ধাতব রাসায়নিক গঠন নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয়ক ব্যবহারিক বিজ্ঞান।

মেটাবলিজ্‌ম (metabolism) — বিপাক; জীবের দেহাভ্যন্তরে যে-সব রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন ভুক্ত পদার্থ বিশ্লিষ্ট হয়ে নূতন নূতন পদার্থের উৎপত্তি ঘটে, এবং তার ফলে জীব-দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি সাধিত হয়ে থাকে। এইরূপ বিভিন্ন সব '**মেটাবলিক**', বা বিপাকীয় ক্রিয়ায় দেহাভ্যন্তরে যে-সব পদার্থের সৃষ্টি হয় তাদের বলে **মেটাবোলাইট** (metabolite)।

মেটাল্ডিহাইড (metaldehyde) — অ্যাসিট্যাল্ডিহাইডের ↑ (CH_3CHO) পলিম্যারিজেসন ↑ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন একটি কঠিন যৌগিক পদার্থ; জিনিসটা সাদা, বিষাক্ত ও দাহ্য; যা '**মেটাফুয়েল**' নামে বিক্রয় হয়। জ্বালানি হিসেবে ও কীট-পতঙ্গ নাশক পদার্থরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

মেটাবোলাইট (metabolite) — মেটাবলিজ্‌ম ↑।

মেটামর্ফোসিস (metamorphosis) — জৈব রূপান্তর; অল্প সময়ে কোন প্রাণীর আকার-আকৃতির বিশেষ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া; জীবন-চক্র; যেমন, কোন পতঙ্গের লার্ভা ↑ অবস্থা থেকে পূর্ণাবয়ব, অর্থাৎ উড়ন্ত অবস্থায় বিবর্তনের পদ্ধতি।

মেটামেরিজ্‌ম্ (metamerism) — রাসায়নিক হিসেবে সমগোত্রীয় বিভিন্ন যৌগিক পদার্থের এক প্রকার আইসোমেরিজ্‌ম ↑ প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় গঠিত যৌগিকগুলো বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের সমান ও নির্দিষ্ট সংখ্যক পরমাণুগুলোর বিভিন্ন রূপ সংস্থানিক সংযোজনের ফলে বিভিন্ন গুণ ও ধর্মবিশিষ্ট পদার্থের উৎপত্তি ঘটে; উদাহরণ স্বরূপ, ডাই-ইথাইল

ইথার, $C_2H_5.O.C_2H_5$, এবং প্রোপাইল ইথার, $CH_3.O.C_3H_7$ পরস্পর হলো **মেটামেরিক** পদার্থ ; কারণ,এই সমগোত্রীয় পদার্থ ছু'টার মধ্যে সমান সংখ্যক কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণু রয়েছে, কিন্তু তাদের পারস্পরিক সংযোজনের বিভিন্নতার জন্যে পদার্থ ছু'টার গুণ ও ধর্মের পার্থক্য ঘটেছে। সমগোত্রীয় পদার্থ না হয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে এরূপ ঘটলে পদার্থগুলোকে পরস্পর **আইসোমেরিক**, বা আইসোমার ↑ বলা হয়।

মেটেনসেফালন (metencephalon) — সেরিবেলাম (cerebellum) ↑, অর্থাৎ নিম্ন, বা ক্ষুদ্রমস্তিষ্ক।

মেট্রাইটিস (metritis) — প্রসূতির গর্ভাশয়ের (ইউটেরাস ↑) স্ফীতি ও প্রদাহজনিত এক প্রকার বিশেষ স্ত্রীরোগ। গর্ভাশয়ের অভ্যন্তরস্থ প্রাচীরপর্দাকে বলা হয় **এণ্ডোমেট্রিয়াম** (endo-metrium)।

মেট্রিক সিষ্টেম (metric system)— পরিমাপের দশমিক পদ্ধতি। মিটার ↑, লিটার ↑, গ্র্যাম ↑ প্রভৃতি এককের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক গণনাদিতে দশের গুণিতক,বা দশমাংশের হিসাবে বিভিন্ন পরিমাপের দশমিক প্রণালী; যেমন— **মিটার** হলো দৈর্ঘ্য পরিমাপের একক =প্রায় 39·37 ইঞ্চি। তার আবার পর্যায়ক্রমিক দশ গুণ ডেকামিটার, হেক্‌টোমিটার, কিলোমিটার ; অথবা দশ ভাগের ভাগ ডেসিমিটার, সেন্টিমিটার, মিলিমিটার প্রভৃতি। ওজনের একক গ্র্যাম ↑ ; কিলোগ্র্যাম, মিলিগ্র্যাম প্রভৃতি। **মেট্রিক টন**= 1,000 কিলোগ্র্যাম ↑।

মেট্রোলজি (metrology)— বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদিতে প্রযোজ্য অতি সূক্ষ্ম পরিমাপ সম্পর্কিত তথ্য-বিজ্ঞান।

মেডুলা অব্‌লঙ্গাটা (medulla-oblongata)—সুষুম্নাশীর্ষক; মস্তিষ্কের নিম্নভাগের (সেরিবেলাম ↑) সঙ্গে সুষুম্না-কাণ্ডের সংযোগস্থল। মস্তিষ্কেরএই অংশ শ্বাস-প্রশ্বাস,রক্ত-চলাচল ও দেহের আরও অনেক প্রয়োজনীয় জৈবিক ক্রিয়া - কলাপ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। চিত্রে তীর-চিহ্নিত অংশ।

মেডুলা অব্‌লঙ্গাটা

মেডুলা (medula) — জীবদেহের কোন-কোন অংশবিশেষের অভ্যন্তরস্থ পদার্থ ; যেমন, প্রাণিদেহের হাড়ের মধ্যে থাকে মজ্জা, কোন - কোন উদ্ভিদের শাখা ও কাণ্ডের অভ্যন্তরে থাকে এক রকম নরম শাঁস, বা পিথ্‌ (pith)। এ-গুলোকে বলে মেডুলা।

মেণ্ডেল, গ্রিগর (Mendel, Gregor) — অস্ট্রিয়াবাসী ধর্মযাজক ও প্রকৃতি-বিজ্ঞানী ; জন্ম 1822 খৃঃ, মৃত্যু 1884 খৃঃ। অবসর সময়ে উদ্ভিদের বংশগতি সম্বন্ধে নিভৃতে সুদীর্ঘ গবেষণা ; 1866 খৃষ্টাব্দে জীবের বংশানুক্রম বিষয়ে যুগান্তকারী তথ্য প্রচার, যার উপরে আধুনিক প্রজনন-বিদ্যার (জেনেটিক্স ↑)ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। জীবিতকালে অখ্যাত; কিন্তু মৃত্যুর

পরে বিশ্বের বিজ্ঞানী-সমাজের অবিস্মরণীয় স্বীকৃতি লাভ।

মেণ্ডেলিফ (Mendeleef)—রাশিয়াবাসী রসায়ন-বিজ্ঞানী, জন্ম 1834 খৃঃ, মৃত্যু 1907 খৃস্টাব্দ। মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক সংখ্যা অনুসারে পর্যায়ক্রমিক তালিকা(পিরিয়ডিক টেব্‌ল ↑) প্রণয়ন এবং পদার্থের গুণ ও ধর্মের পৌনঃপৌনিক ক্রমপর্যায়ের সূত্র (পিরিয়ডিক-ল ↑) আবিষ্কারেই অবিস্মরণীয় কীর্তি। তৎকালীন অজ্ঞাত বিভিন্ন মৌলের গুণাগুণ ও অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্‌বাণী; যার ফলে তদবধি অজ্ঞাত নূতন মৌলের আবিষ্কার পরবর্তীকালে সহজসাধ্য হয়েছে।

মেণ্ডেলিফ টেব্‌ল (Mendeleef table)—বিজ্ঞানী মেণ্ডেলিফ মৌলিক পদার্থগুলোর গুণ ও ধর্ম অনুসারে যে পর্যায়ক্রমিক তালিকা প্রণয়ন করে গেছেন; যাকে সাধারণতঃ বলা হয় মৌলিক পদার্থের পর্যায়-সারণী, বা 'পিরিয়ডিক টেব্‌ল'। (পিরিয়ডিক ল ↑)।

মেন্‌থল (menthol) — জৈব রাসায়নিক পদার্থ, $C_{10}H_{20}O$; সাদা, স্ফটিকাকার, তীব্র ঝাঁজ ও গন্ধবিশিষ্ট পদার্থ। একে সাধারণতঃ বলা হয় 'পিপারমেণ্ট'; অনেক সময় সর্দি-কাসির ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

মেরিডিয়ান (meridian) — (1) দ্রাঘিমা বৃত্ত; ভৌগোলিক দূরত্ব হিসেবের জন্যে যে-সব বৃত্তরেখা উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর মধ্য দিয়ে পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে বলে কল্পনা করা হয়েছে। বস্তুতঃ এ-গুলোকে 'লাইন্‌স অব লঙ্গিটিউড' ↑, অথবা 'টেরেষ্ট্রিয়াল মেরিডিয়ান' বলে। (2) জ্যোতির্বিদ্যার তথ্যাদি নির্ধারণের জন্যে যে-সব মহাবৃত্ত রেখা সেলেশ্চিয়াল স্ফিয়ারের' ↑ জেনিথ ↑ ও নাদির ↑ বিন্দুদ্বয়ের মধ্য দিয়ে গগন-মণ্ডল বেষ্টন করে আছে বলে কল্পনা করা হয়ে থাকে। এদের বলা হয় 'সেলেশ্চিয়াল মেরিডিয়ান'।

মেরিডিয়ান লাইন্‌স
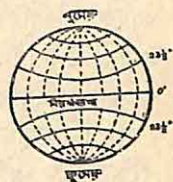
মেল্টিং পয়েণ্ট (melting point) — গলনাংক উষ্ণতা; যত ডিগ্রি উষ্ণতায় কোন কঠিন পদার্থ তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। বিভিন্ন পদার্থের গলনাংক বিভিন্ন, এবং তা বায়ুমণ্ডলীয় চাপের উপর নির্ভরশীল (বয়েলিং পয়েণ্ট ↑)। এ-জন্যে কোন পদার্থের গলনাংক বললে সাধারণতঃ বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক চাপে (760 মিলিমিটার) পদার্থটা ওই উষ্ণতায় দ্রবীভূত হয়, বুঝতে হবে; যেমন, সালফার, অর্থাৎ গন্ধকের গলনাংক 112·8° সেন্টিগ্রেড; এর অর্থ গন্ধক সাধারণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে 112·8° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় তরলীভূত হয়।

মেসন (meson) — কস্‌মিক ↑ রশ্মিতে প্রাপ্ত এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম কণিকা। বিভিন্ন পরীক্ষার সাহায্যে এর অস্তিত্ব ও গুণাগুণ নিরূপিত হয়েছে। এর ভর ইলেক্ট্রন ↑ এবং প্রোটন ↑ কণিকার ভরের মাঝামাঝি; মেসন কণিকা ধন-তড়িৎবিশিষ্ট ও ঋণ-

তড়িৎবিশিষ্ট দু'রকমেরই আছে; এমন কি, সম্ভবতঃ তড়িৎবিহীন মেসন কণিকাও কস্‌মিক রশ্মিতে বিদ্যমান। এ-সব নৈসর্গিক কণিকার তড়িৎ-শক্তির পরিমাণ ইলেক্ট্রন কণিকার সমান। কস্‌মিক, বা মহাজাগতিক রশ্মির সঙ্গে এই মেসন কণিকা মহা-শূন্য থেকে অজস্র ধারায় অহরহ ভূ-পৃষ্ঠে বর্ষিত হয়ে থাকে।

মেসোজোইক (mesozoic) — ভূতাত্ত্বিক গবেষণা মতে পৃথিবীর মধ্যযুগ; প্রায় 25 কোটি থেকে 7 কোটি বছরের মধ্যবর্তী অতীত যুগ। 25 কোটি বছরের আগে ছিল পৃথিবীর **প্যালিওজোইক**, বা প্রাচীন যুগ। আর 7 কোটি বছর অতীত থেকে চলছে বর্তমান **নিউজোইক,** অর্থাৎ নবযুগ। ভূ-স্তরের শিলার গঠন ও সংস্থান এবং বিভিন্ন স্তরের জীবাশ্ম (ফোসিল↑) পরীক্ষা করে এই যুগ-বিভাগ করা হয়েছে। পৃথিবীর মেসোজোইক যুগে বিরাটাকার আদিম সরীসৃপ ও পক্ষিকুল বিচরণ করতো, অধুনা তারা বিলুপ্ত।

মেসোফাইট (mesophyte) — বিশেষ এক উদ্ভিদ শ্রেণী; যারা নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায়ই জন্মায় ও বেঁচে থাকে। এদের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির জন্যে মাঝামাঝি আর্দ্রতা ও উষ্ণতা থাকা চাই। **মেসো** (meso-) মানে মধ্যবর্তী, বা মাঝামাঝি; যেমন, **মেসোফিল** (mesophyll) হলো উদ্ভিদপত্রের দু'দিকের বহিস্ত্বকের মধ্যবর্তী কোমল অংশ; আবার,

মেসেন্‌সেফালন (mesencephalon) হলো মানুষের মধ্য-মস্তিষ্ক (মিড্‌ল ব্রেন)।

মোজেইক (mosaic) — (1) সিমেন্টের মধ্যে রঙ্গীন প্রস্তরাদি বসিয়ে নানা চিত্র-বিচিত্র যে-সব নক্সা তৈরি করা হয়। সুদৃশ্য করবার জন্যে ঘরের মেজেতে এ-ভাবে 'মোজেইক' করা হয়ে থাকে। (2) ভাইরাস↑ জীবাণুর প্রভাবে অনেক সময়ে কোন-কোন উদ্ভিদের পাতার স্থানে-স্থানে বিবর্ণ হয়ে গিয়ে অনেকটা মোজেইক চিত্রের মত দেখায়। উদ্ভিদের এই রোগকে **'মোজেইক ডিজিজ'** বলে। (3) টিন, পারা, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ও গন্ধকের এক রকম সংমিশ্রণ উত্তপ্ত করে যে রঙীন পদার্থ পাওয়া যায়; জিনিসটা দেখতে অনেকটা স্বর্ণ-রেণুর মত দেখায়; একে বলা হয় **মোজেইক গোল্ড** (mosaic gold)।

মোজেইক

মোটর নার্ভ (motor nerve) — চেষ্টীয় স্নায়ু; দেহের যে স্নায়ু-মণ্ডলী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কর্মশক্তি জোগায়। আমরা কাজকর্ম করি, হাটি, চলি, এই মোটর নার্ভের কার্যকারিতার ফলে। **সেন্সরী নার্ভ**, বা 'সংবেদী স্নায়ু' নামে দেহে আর এক রকম স্নায়ুমণ্ডলী আছে, যা দেহে ব্যথা-বেদনা প্রভৃতির অনুভূতি জাগায়।

মোনাজাইট (monazite) — এক

রকম খনিজ পদার্থ ; যার মধ্যে সিরিয়াম, থোরিয়াম ↑ এবং বিভিন্ন রেয়ার আর্থ ↑ ধাতু মিশ্রিত থাকে। এর মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে সামান্য পরিমাণে হিলিয়াম গ্যাসও সংবদ্ধ অবস্থায় থাকে। দক্ষিণ ভারতের সমুদ্রতীরে 'মোনাজাইট' খনিজ যথেষ্ট পাওয়া যায়।

মোমেণ্ট (অব ফোর্স) (moment) — বল প্রয়োগে কোন বস্তু ঘোরালে ওই বস্তুতে যে চক্রাকার গতিশীলতা জন্মায় তার পরিমাণকে বলে ওই প্রযুক্ত বলের (ফোর্সের) মোমেণ্ট। এভাবে ঘূর্ণনের স্থির বিন্দু (বল-কেন্দ্র) থেকে গতিপথের উপর অঙ্কিত লম্ব-রেখার দৈর্ঘ্যকে প্রযুক্ত শক্তির পরিমাণ দিয়ে গুণ করে মোমেণ্টের পরিমাণ স্থির করা হয়। সুতা বেঁধে 'খ' বস্তুকে 'ক' বিন্দু থেকে ঘোরালে প্রযুক্ত বল যদি 'প' (পাউণ্ড) হয়, তবে ওই বল, বা ফোর্সের মোমেণ্ট হবে প × কখ। যন্ত্রাদির বেয়ারিং, দরজা-জানালার কব্জা প্রভৃতিতে যে শক্তি প্রযুক্ত হয়, তার মোমেণ্ট এভাবে স্থির করা হয়। বাংলা পরিভাষায় একে বলে হয় 'ভ্রামক'।

মোমেণ্টাম (momentum) — ভর-বেগ ; কোন গতিশীল বস্তুর ভর (মাস ↑) এবং গতিবেগের (ভেলো-সিটি ↑) গুণফল। যদি 150 গ্রাম ↑ ওজনের (ভরবিশিষ্ট) একটা বল প্রতি সেকেণ্ডে 100 সেন্টিমিটার গতিতে ছোটে তাহলে বলটার মোমেণ্টাম হবে $150 \times 100 = 15{,}000$ সেন্টিমিটার-গ্রাম-সেকেণ্ড একক। সাধারণভাবে, কোন বস্তুর ভর m এবং গতিবেগ v হলে তার মোমেণ্টাম, বা ভর-বেগ M হবে mv।

মোল (mole) — গ্রাম এককে কোন পদার্থের আণবিক ওজন ; অর্থাৎ কোন পদার্থের এক-একটি অণুর সংগঠক বিভিন্ন পরমাণুর পারমাণবিক ওজনের (অ্যাটমিক ওয়েট ↑) মোট সমষ্টি গ্রাম ↑ এককে প্রকাশ করলে তাকেই বলে পদার্থটার 'মোল', অথবা **গ্র্যাম মলিকিউল** ↑ (gram-molecule)। আবার, এক লিটার জলে এক মোল পরিমাণ পদার্থ দ্রবীভূত করলে সেই দ্রবকে বলা হয় **মোলার সল্যুসন** (molar solution)।

মোল্ড (mould) — (1) ঢালাইয়ের ছাঁচ ; গলিত ধাতু যে-সব নির্দিষ্ট আকারের ছাঁচে ঢেলে বিভিন্ন গঠনের ঢালাই জিনিস তৈরি করা হয়। (2) বিশেষ এক শ্রেণীর ছত্রাক (ফাঙ্গাস ↑) ; বাসি রুটির উপরে এই শ্রেণীর সবুজ বর্ণের ছত্রাক জন্মায়।

ম্যাক্রো- (macro-) — 'বৃহৎ' অর্থে শব্দটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে ; যেমন, কোন লোকের মাথা অস্বাভাবিক বড় হলে তাকে বলা হয় **'ম্যাক্রোসে-ফ্যা লি ক'** (macrocephalic)। কোন পলিমার ↑ পদার্থের সম্মিলিত বৃহদাকার অণুকে বলে 'ম্যাক্রো-মলিকিউল'। এই 'ম্যাক্রো' কথাটা হলো ক্ষুদ্রার্থবোধক **মাইক্রো** ↑ (micro-) শব্দের বিপরীত অর্থ-বোধক ; যেমন, মাইক্রোওয়েভ ↑।

ম্যাক্রোস্কোপিক (macroscopic) — সুবৃহৎ, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে খালি চোখেই যে-সব পদার্থ দেখা যায়। **মাইক্রোস্কোপিক** (আণুবীক্ষণিক) ↑ শব্দের বিপরীত, অর্থাৎ অতিবৃহৎ অর্থ-বোধক।

ম্যাক্সওয়েল (Maxwell)—স্কটল্যাণ্ড-বাসী পদার্থ-বিজ্ঞানী ; জন্ম 1831 খৃঃ, মৃত্যু 1879 খৃষ্টাব্দ। গ্যাসীয় সংমিশ্রণে বিভিন্ন গ্যাসের অণুদের পারস্পরিক গতি ও অনুপ্রবেশ বিষয়ক সূত্র নির্ধারণ। তড়িৎ-চুম্বকীয় (ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগ্নেটিক ↑) তরঙ্গের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীর (হার্জ ↑) জন্য প্রসিদ্ধি।

ম্যাগ্‌মা (m a g m a) — পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগের বিভিন্ন গলিত পদার্থাদি ; প্রাকৃতিক নিয়মে কাল-ক্রমে যা থেকে গ্র্যানাইট ↑ প্রভৃতি বিভিন্ন কঠিন প্রস্তর সৃষ্টি হয়েছে বলে ভূ-তাত্ত্বিক গবেষণায় ইদানিং নিঃ-সন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে।

ম্যাগ্‌নেট (magnet) — চুম্বক ; যে বিশেষ লৌহখণ্ড সাধারণ লোহাকে আকর্ষণ করে। বিভিন্ন কৌশলে
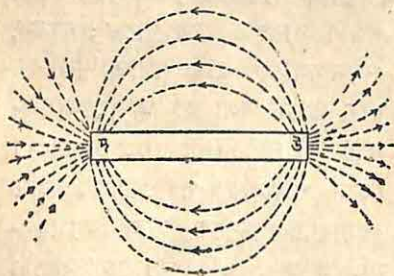
ম্যাগ্নেটিক লাইন্‌স অব ফোর্স

লোহা, নিকেল, কোবল্ট প্রভৃতি ফেরোম্যাগ্নেটিক ↑ মৌল ধাতুতে এরূপ চৌম্বক ধর্ম সৃষ্টি করা যায়। স্থায়ী চুম্বকের চারিদিকে চৌম্বক শক্তির ক্ষেত্র, অর্থাৎ চুম্বকীয় বল-রেখার (ম্যাগ্নেটিক লাইনস অব ফোর্স) সমাবেশ সৃষ্টি হয়। অবশ্য চুম্বক-দণ্ডের দুই প্রান্তদেশে (ম্যাগ্নেটিক পোল ↑) চৌম্বক শক্তি প্রবল থাকে। **ম্যাগ্নে-টিজ্‌ম** (magnetism) মানে চুম্বক-শক্তি, বা চুম্বক-বিজ্ঞান। একটা চুম্বক-দণ্ড সূতায় ঝুলিয়ে দিলে ওর এক প্রান্ত সর্বদা পৃথিবীর মোটামুটি উত্তর দিকে ও অপর প্রান্ত দক্ষিণ দিকে মুখ করে স্থির থাকে। এজন্যে চুম্বক-দণ্ডের এই দুই প্রান্তকে যথাক্রমে ম্যাগ্নেটের দক্ষিণ মেরু 'সাউথ পোল' ও উত্তর মেরু 'নর্থ পোল' বলা হয়।

ম্যাগ্নেটিজ্‌ম (magnetism), (টেরে-স্ট্রিয়াল) — ভূ-গোলকের এক রকম স্বাভাবিক চৌম্বক শক্তি লক্ষিত হয় ; পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে প্রায় উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত যেন একটা বিরাট চুম্বক রয়েছে, এবং তারই প্রভাবে যেন ভূ-পৃষ্ঠে একটা শক্তিশালী 'ম্যাগ্নেটিক ফিল্ড' সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীর এই স্বাভাবিক চৌম্বক শক্তিকে বলে টেরেস্ট্রিয়াল (পার্থিব) ম্যাগ্নেটিজম্। একটা চুম্বক-দণ্ড সূতায় ঝুলিয়ে দিয়ে তার দক্ষিণ ও উত্তর মেরু ঐ পার্থিব চৌম্বকশক্তির প্রভাবে সর্বদা পৃথিবীর চৌম্বক মেরুর বরাবর উত্তর ও দক্ষিণে মুখ করে স্থির থাকে। চুম্বকের এই ধর্মের ব্যবহারিক প্রয়োগেই কম্পাস, বা সামুদ্রিক 'দিগ্‌নির্ণয় যন্ত্র' তৈরি হয়েছে। পৃথিবীর চৌম্বক মেরু

ভৌগোলিক মেরু থেকে পূর্ব-পশ্চিমে কিছু সরে আছে ; অবশ্য মোটামুটি-ভাবে এদের একই ধরা হয়।

ম্যাগ্নেটিক অ্যাক্সিস (magnetic axis) — চৌম্বক অক্ষ ; কোন চুম্বক-দণ্ডের দুই প্রান্তীয় কেন্দ্রের সংযোজক রেখা। বস্তুতঃ কোন চুম্বকের ঐ দুই প্রান্তীয় বিন্দুতেই উহার চৌম্বক মেরু (ম্যাগ্নেটিক পোল) অবস্থিত এবং বিপরীত চৌম্বক শক্তি কেন্দ্রীভূত থাকে।

ম্যাগ্নেটিক ইকোয়েটর (magnetic equator) — পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ চৌম্বক মেরুর সমদূরবর্তী কাল্পনিক বৃত্ত-রেখাকে বলে ম্যাগ্নেটিক ইকোয়েটর (চুম্বকীয় নিরক্ষরেখা)। এই বৃত্ত-রেখায় অবস্থিত পৃথিবীর কোন স্থানেই ম্যাগ্নেটিক ডিপ। থাকে না। পৃথিবীর ম্যাগ্নেটিক ইকোয়েটর ও ভৌগোলিক ইকোয়েটর। এক না হলেও কিছু কৌণিক ব্যবধানে প্রায় কাছাকাছি রয়েছে।

ম্যাগ্নেটিক ডিপ (magnetic dip)— ভৌগোলিক চৌম্বক ক্ষেত্র ও ভূ-পৃষ্ঠের সমান্তরাল ক্ষেত্রের মধ্যবর্তী কৌণিক ব্যবধান। ম্যাগ্নেটিক মেরিডিয়ানে। ভূ-পৃষ্ঠের লম্ব-ক্ষেত্রে একটা চুম্বক-শলাকা ভূ-পৃষ্ঠের সমান্তরাল ক্ষেত্রের সঙ্গে যে কোণ সৃষ্টি করে তার ডিগ্রি পরিমাণকে বলে **ডিপ্ অ্যাঙ্গেল**, বা 'ম্যাগ্নেটিক ডিপ্'। 'ডিপ্ সার্কেল' নামে একটি যন্ত্রের সাহায্যে ম্যাগ্নেটিক 'ডিপ্ অ্যাঙ্গেল', বা কৌণিক ব্যবধান সহজেই নির্ণয় করা যেতে পারে।
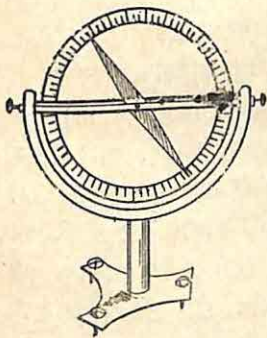
ম্যাগ্নেটিক ডিপ্ সার্কেল

ম্যাগ্নেটিক ডেক্লিনেশন (magnetic declination) — পৃথিবীর ভৌগোলিক মেরিডিয়ান। ও চুম্বকীয় মেরিডিয়ানের মধ্যবর্তী কৌণিক ব্যবধান; অর্থাৎ পৃথিবীর ভৌগোলিক উত্তর মেরু ও চুম্বকীয় উত্তর মেরুর মধ্যবর্তী কোণ। কম্পাস, বা দিগ্‌দর্শন (mariners' compass) যন্ত্রের চুম্বক-শলাকার অবস্থান লক্ষ্য করে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানের এই 'ডেক্লিনেশন' কোণ নিরূপণ করা হয়। এরূপ কোণকে **ম্যাগ্নেটিক ডিভিয়েশন** (magnetic deviation)-ও বলা হয়।

ম্যাগ্নেটিক ডেক্লিনেশন
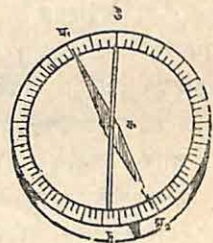
ম্যাগ্নেটিক স্টর্ম (magnetic storm) চুম্বক-ঝটিকা ; বিভিন্ন নৈসর্গিক কারণে পার্থিব চৌম্বক-শক্তির ক্ষেত্রে অনেক সময়ে বিশৃঙ্খলা ঘটে ; যার ফলে কম্পাস যন্ত্রের চৌম্বক শলাকা আকস্মিকভাবে দিক্ পরিবর্তন করে। একেই বলে 'ম্যাগ্নেটিক স্টর্ম'। সৌর কলঙ্কের আধিক্য ও অরোরা-বোরিয়েলিসের। আকস্মিক ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি

প্রভৃতির সময়ে সাধারণতঃ এরূপ হতে দেখা যায়।

ম্যাগ্নেটাইট (magnetite) —চৌম্বক শক্তিবিশিষ্ট এক প্রকার খনিজ লৌহ; অত্যন্ত কঠিন ও কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ। লোহার এক রকম স্বভাবজাত অক্সাইডে, Fe_3O_4, খনিজটা গঠিত।

ম্যাগ্নেটো (magneto) — তড়িৎ-উৎপাদক এক রকম ক্ষুদ্র যন্ত্র বিশেষ। যান্ত্রিক ব্যবস্থায় মূলতঃ চৌম্বক শক্তির প্রভাবে এর অভ্যন্তরস্থ তার-কুণ্ডলীতে তড়িৎ শক্তি উৎপাদিত হয়ে থাকে। এই তড়িৎ-প্রবাহের পথে সন্নিকটবর্তী দুই তড়িদ্দ্বারের সামান্য ব্যবধানের (স্পার্ক-গ্যাপের) মধ্যে তড়িৎ-স্ফুরণ ঘটে। ইণ্টারন্যাল কম্বাস্‌শন ইঞ্জিনে । পেট্রলের বাষ্প এইরূপ স্পার্ক, অর্থাৎ বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গের সংস্পর্শেই জ্বলে ওঠে। সাধারণতঃ মোটরগাড়ীর ইঞ্জিনেই এরূপ ক্ষুদ্র ম্যাগ্নেটো যন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

ম্যাগ্নেটোমিটার (magnetometer) —চৌম্বক শক্তি পরিমাপক এক রকম যন্ত্র; যার সাহায্যে বিভিন্ন চুম্বকের চৌম্বক শক্তির পরিমাণ, বা বিভিন্ন চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তির তীব্রতা পরিমিত হয়ে থাকে। সাধারণ ম্যাগ্নেটোমিটারে প্রধানতঃ একটা ক্ষুদ্র চুম্বক-দণ্ড ও একটা লম্বা ধাতব শলাকা পরস্পরের লম্বভাবে যন্ত্রটির কেন্দ্রস্থলে সংবদ্ধ থাকে। শলাকাটি একটা গোলাকার স্কেলের উপরে আবর্তিত হয়ে ওর সঙ্গে সংবদ্ধ চুম্বক-দণ্ডটার আবর্তনের পরিমাণ নির্ধারণ করে। বাইরের কোন চৌম্বক শক্তির প্রভাবে যন্ত্রের ওই চুম্বক-দণ্ডটার যেরূপ আবর্তন ও অবস্থান এভাবে লক্ষিত হয়, তা থেকে চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তির পরিমাণ সহজেই স্থির করা যেতে পারে। এরূপ যন্ত্রকে বলে **ডিফ্লেক্শন** ম্যাগ্নেটোমিটার; আবার, আর এক রকমের **ভাইব্রেশন** ম্যাগ্নেটোমিটার যন্ত্রও আছে।

ম্যাগ্নেলিয়াম (magnelium) — অ্যালুমিনিয়াম ও ম্যাগ্নেসিয়ামের একটা সংকর-ধাতু; অত্যন্ত হাল্‌কা কিন্তু সুকঠিন। অ্যালুমিনিয়ামের চেয়েও সহজে এই ধাতু-সংকর দিয়ে বিভিন্ন আকারের হাল্‌কা জিনিস তৈরি করা যায়। কখন-কখন এর মধ্যে কিছু তামাও মেশানো হয়ে থাকে। বিমান-পোতের খোল সাধারণতঃ এই সংকর-ধাতু দিয়েই তৈরি হয়।

ম্যাগ্নেলিয়া মেটাল (magnelia metal) — লোহা, টিন, অ্যাণ্টিমনি ও লেড (সীসা) ধাতুর সংমিশ্রণে উৎপন্ন একটা সংকর-ধাতু। এ-দিয়ে সাধারণতঃ যন্ত্রাদির বেয়ারিং তৈরি হয়। এর মধ্যে সীসার ভাগই থাকে বেশি; নামে 'ম্যাগ্নেলিয়া মেটাল' হলেও এতে ম্যাগ্নেসিয়াম থাকে না।

ম্যাগ্নেসিয়াম (magnesium) — মৌলিক ধাতব পদার্থ, সাংকেতিক চিহ্ন Mg; পারমাণবিক ওজন 24·32, পারমাণবিক সংখ্যা 12; বিশেষ হাল্‌কা ও রুপোর মত সাদা ধাতু। বায়ুর সংস্পর্শে এর ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয়ে যায়, ম্যাগ্নেসিয়াম-অক্সাইডের আবরণ পড়ে। জ্বালালে উজ্জ্বল আলো

ছড়িয়ে জলতে থাকে, ম্যাগ্নেসিয়াম অক্সাইড, MgO, জন্মায়। এই তীব্র আলোর সাহায্যে রাত্রিকালে ফটোগ্রাফির ↑ কাজ হয়ে থাকে। ম্যাগ্নেসাইট ($MgCO_3$,), ডোলোমাইট ($MgCO_3 . CaCO_3$), কার্ণালাইট ($KCl. MgCl_2 . 6H_2O$) প্রভৃতি বিভিন্ন খনিজ থেকে ম্যাগ্নেসিয়াম ধাতু নিষ্কাশিত করা হয়। ম্যাগ্নেলিয়াম ↑ প্রভৃতি হাল্‌কা সংকর-ধাতু, আগুনে-বোমা প্রভৃতি তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। এর কোন-কোন যৌগিক পদার্থ কখন কখন ঔষধরূপেও (ম্যাগ্-সাল্‌ফ ↑) ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ম্যাগ্নেসিয়াম সাল্‌ফেট (magnesium sulphate) — সংক্ষেপে যাকে বলে ম্যাগ-সাল্‌ফ (mag-sulph), $MgSO_4$; বিরেচক পদার্থ, ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যৌগিকটা 'ইপ্‌সম সল্ট' ↑ নামেও পরিচিত।

ম্যাগ্নেসিয়া (magnesia) — ম্যাগ্নেসিয়াম অক্সাইড, MgO, যৌগ; ঔষধ হিসেবে যে 'ম্যাগ্নেসিয়া-অ্যাল্‌বা' ব্যবহৃত হয়, তা হলো 'বেসিক ম্যাগ্নেসিয়াম কার্বনেট' সল্ট ; যাকে সংক্ষেপে বলে 'ম্যাগ্-কার্ব'। আর ম্যাগ্নেসিয়াম বাইকার্বনেটের জলীয় দ্রবকে সাধারণতঃ বলা হয় 'ফ্লুইড ম্যাগ্নেসিয়া'।

ম্যাগ্নেসাইট (magnesite) —খনিজ অবিশুদ্ধ ম্যা গ্নে সি য়া ম কার্বনেট, $MgCO_3$; এই খনিজ থেকেই সাধারণতঃ ম্যাগ্নেসিয়াম ধাতু নিষ্কাশিত হয়ে থাকে। বিশুদ্ধ ম্যাগ্নেসিয়াম কার্বনেট, বা **ম্যাগ্ কার্ব** (mag-carb) অত্যন্ত হাল্‌কা সাদা চূর্ণ পদার্থ; যা টুথ-পাউডার তৈরি করতে ও কোন-কোন ঔষধাদিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ম্যাট্রিক্স (m a t r i x) — ঢালাইয়ের ছাঁচের মত যে-স্থানে, বা যে-জিনিসের উপরে চেপে, অথবা ঢেলে দিয়ে নির্দিষ্ট আকারের বহুসংখ্যক অনুকল্প জিনিস তৈরি করা যায়, যেমন — ছাপার টাইপের, বা ব্লকের 'ম্যাট্রিক্স' ছাঁচে ঢেলে সহজে বহু সংখ্যক অনুরূপ টাইপ, বা ব্লক করা হয়। কথাটার বহুবচনে **ম্যাট্রিসেস** (matrices)।

ম্যানোমিটার (manometer) — যে বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে গ্যাসীয় পদার্থের চাপ নির্ধারণ করা যায়। আবদ্ধ স্থানে স্বল্প পরিমাণ গ্যাসের অবস্থিতি-জনিত নিম্ন-চাপ মাপবার জন্যেই সাধারণতঃ এরূপ যন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উচ্চ চাপ পরিমাপের জন্যে ব্যবহৃত যন্ত্রকে বলে **প্রেসার গেজ** (pressure-gauze)। প্রদত্ত চিত্র থেকে ম্যানোমিটারের মোটামুটি গঠন ও কার্যকারিতা সহজেই বুঝা যাবে।
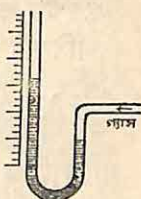
ম্যানোমিটার

ম্যাঙ্গানিজ (manganese)—মৌলিক ধাতব পদার্থ। সাংকেতিক চিহ্ন Mn ; ধাতুটার পারমাণবিক ওজন 54·93 ; পারমাণবিক সংখ্যা 25 ; লাল্‌চে সাদা সুকঠিন ধাতু, কিন্তু ভঙ্গুর।

পাইরোলুসাইট ↑ নামক একটা খনিজ (ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড MnO_2) থেকে নিষ্কাশিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন সংকর-ধাতু, বিশেষতঃ ইস্পাত তৈরি করতে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। প্রায় 13% ম্যাঙ্গানিজ মিশ্রিত ইস্পাত (ম্যাঙ্গানিজ-স্টিল ↑) অত্যন্ত কঠিন হয়, এবং তা সহজে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। বিভিন্ন অনুপাতে কপার, জিঙ্ক ও ম্যাঙ্গানিজ মিশিয়ে 'ম্যাঙ্গানিজ ব্রোঞ্জ' ↑ নামক বিশেষ একটা সংকর-ধাতু তৈরি হয়ে থাকে।

ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড (manganese dioxide)—ভারী কৃষ্ণবর্ণ চূর্ণ পদার্থ, MnO_2 ; একে ম্যাঙ্গানিজ পারঅক্সাইড-ও বলা হয়। বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়ায় 'অক্সিডাইজিং এজেণ্ট' ও ক্যাটালিস্ট ↑ হিসেবে যৌগিকটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কাঁচ-শিল্পে, লেক্‌ল্যান্স সেল ↑ প্রভৃতিতে এর প্রচুর ব্যবহার আছে।

ম্যাঙ্গানিজ - স্টিল (manganese steel) — বিশেষ এক শ্রেণীর সুকঠিন স্টিল ↑ ; এই স্টিলের শিল্পোৎপাদনে লোহার সঙ্গে অনধিক 13% ম্যাঙ্গানিজ মেশানো হয়ে থাকে।

ম্যাঙ্গানিন (manganin) — ম্যাঙ্গানিজ-সংযুক্ত এক প্রকার সংকর-ধাতু। এতে সাধারণতঃ থাকে 83% তামা, 13% ম্যাঙ্গানিজ, 4% নিকেল। এর তড়িৎ - পরিবহনের ক্ষমতা উত্তাপে বিশেষ পরিবর্তিত হয় না ; এ-জন্যে বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদির বিশেষ-বিশেষ তার-কুণ্ডলী এ-দিয়ে প্রস্তুত করা হয়।

ম্যাঙ্গানেট (manganate)—ম্যাঙ্গানিক অ্যাসিডের (H_2MnO_4) সল্ট ↑ ; যেমন — সোডিয়াম ম্যাঙ্গানেট, Na_2MnO_4 ; সবুজ বর্ণের রাসায়নিক পদার্থ, জীবাণুনাশক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আবার পারম্যাঙ্গানিক অ্যাসিডের ($HMnO_4$) সব সল্টকে বলা হয় **পারম্যাঙ্গানেট** (permanganate) ; যেমন, পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ↑ $KMnO_4$; গাঢ় লাল স্ফটিকাকার পদার্থ, জলে দ্রবণীয় ; পদার্থটা সচরাচর জীবাণু নাশক ও প্রতিরোধক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ম্যামিলা (mamilla) — বক্ষ-স্তনের বোঁটা। **ম্যামেলিয়া**, বা **ম্যামাল** (mammalia, or mammal) মানে স্তন্যপায়ী প্রাণী ; সাধারণতঃ উষ্ণ-রক্ত ও রোমশ প্রাণীরা স্তন্যদায়ী এবং স্তন্যপায়ী হয়ে থাকে।

ম্যালাকাইট (malachite) — উজ্জ্বল সবুজ বর্ণের খনিজ প্রস্তর বিশেষ ; রাসায়নিক হিসেবে পদার্থটা হলো 'বেসিক কপার কার্বনেট', $CuCO_3$, $Cu(OH)_2$; এই খনিজ প্রস্তর থেকেই সাধারণতঃ তামা নিষ্কাশিত হয়ে থাকে। রঙীন পাথর হিসেবে সস্তা অলঙ্কারাদিতেও এর ব্যবহার আছে।

ম্যালিক অ্যাসিড (maleic acid) — এক প্রকার জৈব অ্যাসিড ; সাদা স্ফটিকাকার কঠিন পদার্থ। রাসায়নিক হিসেবে এটা হলো হাইড্রক্সিসাক্‌সিনিক অ্যাসিড, $COOH.CH_2.CH(OH).COOH$; সাধারণতঃ

কাঁচা আপেল ও অন্যান্য ফল থেকে অ্যাসিডটা পাওয়া যায়।

···ম্যালেসিয়া (···malacia) — কোমলায়ন; 'নরম হওয়া' অর্থে কথাটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে; যেমন, **অষ্টিয়োম্যালেসিয়া** (osteomalacia) মানে অস্থির নমনীয়তা, বা হাড়ের অস্বাভাবিক কোমলতা-জনিত অপুষ্টি-রোগ বিশেষ। শৈশবে উপযুক্ত পরিমাণে ভিটামিন ↑ ও সূর্যকিরণের অভাবে হাড়ে যথোপযুক্তভাবে ক্যালসিয়ামের ↑ অভাব ঘটলে এ-রোগ হয়ে থাকে।

ম্যাসার (maser) — ল্যাসার ↑ রশ্মির অনুরূপ, কিন্তু আলোক-তরঙ্গের পরিবর্তে মাইক্রোওয়েভ ↑, বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অদৃশ্য তরঙ্গের সুসংহত এক বিশেষ ধরনের বিকিরণ-রশ্মি উৎপাদক যন্ত্র বিশেষ; আর এরূপ অদৃশ্য রশ্মিকে বলা হয় ম্যাসার-রশ্মি। ল্যাসার ও ম্যাসার উভয় প্রকার রশ্মি উৎপাদনের মূল পদ্ধতি ও তত্ত্বাদি মোটামুটি একই; প্রকৃতপক্ষে ল্যাসার হলো আলোক-তরঙ্গের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ম্যাসারেরই একটি উচ্চতর পরিণতি। ল্যাসার ও ম্যাসারের মূলগত প্রভেদ হলো এই যে, প্রথমটির ক্ষেত্রে উহার বিকিরণ-রশ্মির উৎস-বস্তুকে উদ্দীপিত (stimulated) করতে ব্যবহার করা হয় আলোকের তরঙ্গ-রশ্মি; আর ম্যাসারের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় অদৃশ্য মাইক্রো-তরঙ্গ। ল্যাসারের মত ম্যাসার কথাটিও 'Mirco-wave Amplification by Stimulated Emission of Radiation' শব্দগুলির আদ্যক্ষর সমূহ নিয়ে গঠিত হয়েছে। আমেরিকার বিশিষ্ট পদার্থ বিজ্ঞানী ডঃ টাউন্স ও ডঃ স্যালো যুগ্মভাবে 1958 খৃষ্টাব্দে ম্যাসার-রশ্মি আবিষ্কার করেন এবং আরও শক্তিশালী রশ্মি উৎপাদনের সম্ভাবনা সম্পর্কিত তত্ত্ব ও তথ্যাদির আভাস দেন। তারই ভিত্তিতে 1960 খৃষ্টাব্দে ডঃ মেইম্যান ল্যাসার রশ্মি আবিষ্কার করতে সক্ষম হন।

ম্যাসোনাইট (masonite)—কাঠের গুঁড়া, খড় প্রভৃতি বিশেষ রাসায়নিক পদ্ধতিতে গলিত ও মিশ্রিত করে যান্ত্রিক চাপে ইদানিং যে এক প্রকার সুদৃশ্য ও সুকঠিন কাষ্ঠল পাত্ (sheet) প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রকৃত কাঠের তক্তার বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ম্যাস্টিক (mastic) — (1) বার্নিশ তৈরি করতে যে বিশেষ এক শ্রেণীর রজন (রেজিন ↑) ব্যবহৃত হয়। (2) জল চোঁয়ানো রোধ করবার জন্যে বাড়ীর ছাদ, বা জলাধারের সংযোগে যে-সব নরম পদার্থ লাগানো হয়; যেমন — বিটুমেন ↑ জাতীয় পদার্থ; অথবা ইটের গুঁড়া, লেড অক্সাইড ও তিসির তেলের (লিন্‌সিড অয়েল) আঠালো মিশ্রণ।

র

রক ক্রিষ্ট্যাল (rock crystal) — অতি বিশুদ্ধ স্ফটিকাকার সিলিকা ↑, অর্থাৎ সিলিকন ডাই-অক্সাইড, SiO_2; স্বভাবজাত এক প্রকার স্ফটিকাকার বালুকা বিশেষ।

রক সল্ট (rock salt) — স্ফটিকাকার খাদ্য - লবণ; খনিজ সোডিয়াম ক্লোরাইড, NaCl; যাকে বাংলায় বলা হয় 'সৈন্ধব লবণ'।

রকেট (rocket) — রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত গ্যাসের নিম্নমুখী চাপের প্রভাবে যে-যান, বা আধার দুরন্ত বেগে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়ে শেষে মহা-শূন্যে বহুদূরে নিক্ষিপ্ত হতেও পারে; যান্ত্রিক বিচারে 'হাউই' জাতীয় জিনিস। বিভিন্ন গঠন ও আকৃতিবিশিষ্ট বিভিন্ন শ্রেণীর রকেট ইদানিং তৈরী হয়েছে। অস্ত্র হিসেবে গত মহাযুদ্ধে প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল। **'ভি-2 রকেট'** হলো অ্যালুমিনিয়ামের তৈরী একটা লম্বা খোল; খোলটার অভ্যন্তরে পৃথক-পৃথক আধারে তরল অক্সিজেন ↑, অ্যালকোহল ↑ ও অন্যান্য হাল্‌কা জ্বালানি পদার্থ ভরতি করা হয়। ওই সব পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত ধূম ও গ্যাস রকেটের খোলের পশ্চাদ্ভাগ থেকে ছিদ্রপথে সবেগে নিষ্ক্রান্ত হয়; আর এই প্রচণ্ড পশ্চাৎ-চাপের ফলে রকেটটা সম্মুখ - গতি লাভ করে এবং সবেগে উপরে উঠে উপযুক্ত ব্যবস্থায় বহু দূরে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। বিশেষ ভি$_2$ শ্রেণীর রকেট প্রায় 70 মাইল উপরে উঠে মোটামুটি 200 মাইল দূরে পর্যন্ত নিক্ষিপ্ত হতে পারে। আজকাল বহু উন্নত ধরনের দুরন্ত শক্তিশালী রকেট সব উদ্ভাবিত হয়েছে (স্পুটনিক ↑)। রকেটের গতি অনেকটা জেট ↑ বিমানের অনুরূপ; কিন্তু জেটের অভ্যন্তরস্থ জ্বালানী তেলের রাসায়নিক ক্রিয়ার জন্যে খোলের সামনের ছিদ্র-পথে বাইরের বায়ু ভিতরে প্রবেশের ব্যবস্থা থাকে; কিন্তু রকেটের সেরূপ দরকার হয় না। রকেটের জ্বালানীর দহন ও যান্ত্রিক ব্যবস্থা স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে' তা বায়ুশূন্য ঊর্ধ্বাকাশেও উঠতে পারে; কিন্তু গঠন-বৈশিষ্ট্যের জন্যে জেট-প্লেন বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না।

সাধারণ রকেটের গঠন (নক্সা)

রঙ্গ্যালাইট (rongalite) — সোডিয়াম সাল্‌ফোক্সেলেট ও ফর্ম্যাল্ডিহাইডের ↑ সংযোগে গঠিত একটি রাসায়নিক যৌগিক, $NaHSO_2 . HCHO$; বিশেষতঃ রঞ্জন - শিল্পে বিজারক পদার্থ (রিডিউসিং এজেন্ট ↑) হিসেবে পদার্থটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

রন্টগেন (Rontgen), উইলহেল্‌ম কোন্‌র্যাড — জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী, জন্ম 1845 খৃঃ, মৃত্যু 1923 খৃস্টাব্দ। এক্স-রশ্মি ↑ অর্থাৎ 'রন্টগেন-রে ↑ আবিষ্কারে (1895 খৃস্টাব্দ) প্রসিদ্ধি। বহু সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনাপূর্ণ এই অভাবনীয় আবিষ্কারের জন্যে চিরস্মরণীয়, এবং 1901 খৃস্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভ।

রনট্‌গেন-রে (Rontgen-ray) — এক্স-রে ↑; যাকে বাংলায় বলে **'রঞ্জন-রশ্মি'**। এই অদৃশ্য আলোক-রশ্মি মাংসপেশী ভেদ করে গিয়ে ফটোগ্রাফিক প্লেটে দেহাভ্যন্তরের

যন্ত্রাদি ও অস্থি-পঞ্জরের ছায়াপাত করে থাকে। আভ্যন্তরীণ রোগ নির্ণয়ে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে এই শক্তিশালী অদৃশ্য এক্স-রশ্মির অবদান অপরিসীম। আবিষ্কারক জার্মান বিজ্ঞানী রনট্‌গেনের নামানুসারে রশ্মিটা সবিশেষ খ্যাত।

রমন (Raman), স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট—ভারতীয় (মাদ্রাজী) পদার্থ-বিজ্ঞানী ; জন্ম 1888 খৃঃ, মৃত্যু 1970 খৃঃ। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ.। কয়েক বছর সরকারী চাকুরীর পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ-বিজ্ঞানের 'পালিত অধ্যাপক' পদে বৃত ; বিশেষতঃ আলোক-বিজ্ঞানে ও শব্দ-বিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণা। কলিকাতার 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্‌টিভেশন অব সায়েন্স' প্রতিষ্ঠানের গবেষণাগারে আলোক-বিজ্ঞানে 'রমন এফেক্ট' ↑ নামে এক মৌলিক তথ্য আবিষ্কার। এফ. আর. এস. সম্মান, 1914 খৃস্টাব্দ ; 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত 1929 খৃঃ। 'রমন এফেক্ট' আবিষ্কারের স্বীকৃতি স্বরূপ 1930 খৃঃ নোবেল পুরস্কার লাভ। অতঃপর ব্যাঙ্গালোর ইনষ্টিটিউটে উচ্চতর গবেষণা। ভারত সরকারের 'জাতীয় অধ্যাপক' সম্মান লাভ। অতঃপর স্বপ্রতিষ্ঠিত 'রমন ইনষ্টিটিউট' নামক প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন মৌলিক গবেষণায় আমরণ নিরত ছিলেন।

রমন এফেক্ট (Raman effect) — কোন মনোক্রোমেটিক ↑ (একবর্ণী) আলোক-রশ্মি কোন স্বচ্ছ পদার্থের (তরল, বা গ্যাসীয়) মাধ্যমে পরিচালিত করলে ওই আলোক-রশ্মির কতকাংশ আলোকের গতিপথের লম্ব-দিকে বিচ্ছুরিত হয়। এই বিচ্ছুরিত আলোকের বর্ণালি (স্পেক্ট্রাম ↑) পরীক্ষা করলে মূল আলোক-রশ্মির বর্ণ-রেখার পার্শ্বে অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল কয়েকটা বর্ণ-রেখা দেখা যায়। এই নবাবিষ্কৃত রেখাগুলোর নামকরণ হয়েছে **রমন-লাইন্‌স**। মাধ্যমের তরল, বা গ্যাসীয় অণুগুলোর গায়ে প্রতিহত হয়ে ওই আলোক-তরঙ্গের কতকাংশ পাশের দিকে বিচ্ছুরিত হয় এবং এর ফলেই ওই নূতন রেখা-গুলোর উদ্ভব ঘটে। একবর্ণী আলোকের এই ধর্মকে বলে 'রমন এফেক্ট'। এই তথ্য আবিষ্কারের মৌলিক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এই প্রথম একজন ভারতীয় বিজ্ঞানী 1930 খৃষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এই তথ্যের সাহায্যে বিভিন্ন পদার্থের আণবিক কম্পন-শক্তি নির্ধারণ করা সম্ভবপর হয়েছে।

রম্বাস (rhombus)— যে জ্যামিতিক সামন্তরিক চতুর্ভূজের বাহুগুলো সব পরস্পর সমান, কিন্তু কোন কোণই সমকোণ নয় ; অর্থাৎ বিষমকোণী-সমবাহু সামন্তরিক চতুর্ভুজ। এরূপ চতুর্ভূজের বাহুগুলোও অসমান হলে তাকে বলে **রম্বয়েড** (rhomboid), বিষম-সামন্তরিক ক্ষেত্র।

রস (Ross), স্যার রোনাল্ড — বৃটিশ চিকিৎসা - বিজ্ঞানী, জন্ম 1857 খৃঃ, মৃত্যু 1932 খৃঃ। কর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষ ;

ম্যালেরিয়া সংক্রমণের কারণ অনুসন্ধানে সুদীর্ঘ গবেষণা। কলিকাতার প্রেসিডেন্সী (বর্তমানে কার্ণানি) হাসপাতালের পরীক্ষাগারে ম্যালেরিয়ার বাহক অ্যানোফিলিস † মশকের অন্ত্রে প্লাস্মোডিয়াম † নামক একটি বিশেষ জীবাণু আবিষ্কার। এভাবে ম্যালেরিয়া সংক্রমণের বৈজ্ঞানিক তথ্য নির্ধারণ; এই তথ্যাবিষ্কারের স্বীকৃতিস্বরূপ চিকিৎসা বিজ্ঞানে 1902 খৃঃ নোবেল পুরস্কার লাভ।

রাদারফোর্ড (Rutherford), লর্ড— বৃটিশ পদার্থ-বিজ্ঞানী; নিউজিল্যাণ্ডে জন্ম 1871 খৃষ্টাব্দ, মৃত্যু 1937 খৃষ্টাব্দ। ইংলণ্ডের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাভেণ্ডিস † গবেষণাগারের অধ্যক্ষ। পরমাণুর সংগঠনে নিউট্রন † কণিকার অস্তিত্ব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী—পদার্থ ও শক্তির অভিন্নতা এবং পরমাণুর বিভাজন (ফিসন †) সম্পর্কীয় গবেষণার ভিত্তি স্থাপন। পদার্থের মৌলিক গঠন সম্পর্কীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদির আবিষ্কারে বিপুল খ্যাতি; 1908 খৃঃ নোবেল পুরস্কার লাভ।

রাবার (rubber)—এক রকম স্থিতিস্থাপক (ইল্যাস্টিক †) কঠিন জৈব পদার্থ; বিশেষ বিশেষ উদ্ভিদের সাদা রস (ল্যাটেক্স †) ঘনীভূত হয়ে উৎপন্ন হয়। রাসায়নিক হিসেবে কাঁচা রাবার হলো হাইড্রোকার্বনের † এক রকম পলিমার † পদার্থ; যাকে **পলি-আইসোপ্রিন** (poly-isoprene) বলা হয়। কাঁচা রাবারের সঙ্গে বিভিন্ন পদার্থ মিশিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর রাবার তৈরি হয়ে থাকে। বিশেষতঃ বিশুদ্ধ রাবারের সঙ্গে বিভিন্ন অনুপাতে গন্ধক মিশিয়ে উত্তপ্ত করে বিভিন্ন গুণ ও ধর্মবিশিষ্ট রাবার (ভ্যাল্‌ক্যানাইজ্‌ড রাবার †) তৈরি হয়ে থাকে। রাসায়নিক পদ্ধতিতে এক রকম কৃত্রিম রাবার তৈরি করাও সম্ভব হয়েছে।

রামানুজ (Ramanuj) — স্বাভাবিক প্রতিভাবান ভারতীয় গণিতজ্ঞ। মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ; জন্ম 1887 খৃঃ, মৃত্যু 1920 খৃঃ। উচ্চশিক্ষা ব্যতিরেকেই বিশ্ববিশ্রুত গণিতজ্ঞ হিসাবে খ্যাতি অর্জন। মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে ইংলণ্ডের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো, (এফ. আর. এস.)। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার জন্য আহুত হয়ে যোগদান; অসুস্থ অবস্থায় স্বদেশে প্রত্যাবর্তন এবং মাত্র 33 বছর বয়সে অকালে পরলোক গমন।

রাস্ট (rust) — মরিচা; লোহার এক রকম সোদক অক্সাইড ($Fe_2O_3 \cdot H_2O$); খোলা জল-হাওয়ায় বায়ুর অক্সিজেন ও জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে লোহার উপরে এই অক্সাইড, বা মরিচা সৃষ্টি হইয়া থাকে।

রাস্ট ফাঙ্গি (rust fungi) — এক শ্রেণীর পরগাছা ছত্রাক (ফাঙ্গাস †) বিশেষ; গম, মটর প্রভৃতি উদ্ভিদের পাতায় এদের আক্রমণে (লোহার মরিচার মত) লাল দাগ ধরে।

রায়, (Ray) আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র — খ্যাতনামা বাঙ্গালী রসায়নবিদ্; জন্ম 1861 খৃঃ, মৃত্যু 1944 খৃঃ। কলিকাতা মেট্রোপলিটন কলেজ থেকে (রসায়ন-

সহ) বি.এ.; গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি লাভ এবং বিলাত গমন। রসায়নে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি.এস-সি। কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা ও মৌলিক গবেষণা। রসায়নের বহু গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক তথ্য আবিষ্কার; আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন। প্রাচীন হিন্দু-রসায়নের ইতিহাস প্রণয়ন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ স্থাপনে (1916 খৃঃ) প্রধান উদ্যোক্তা এবং এদেশে রাসায়নিক গবেষণার ভিত্তিস্থাপন। ভারতে মৌলিক রসায়নশিল্পের সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠান 'বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কস' স্থাপন 1893 খৃঃ। অকৃতদার, ঋষিকল্প, দেশহিতব্রতী, বিজ্ঞান-সাধক। দেশকল্যাণ ও শিক্ষাবিস্তারে বিপুল অর্থ দান।

রিঅ্যাক্শন (কেমিক্যাল) (reaction)—রাসায়নিক বিক্রিয়া। বিশেষ নির্দিষ্ট অনুপাতে বিভিন্ন পদার্থের পারস্পরিক সংযোগে যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে এবং তার ফলে যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়; যেমন—এক ভাগ অক্সিজেন ↑ ও দুই ভাগ হাইড্রোজেন ↑ গ্যাসের কেমিক্যাল রিঅ্যাক্শনের (রাসায়নিক বিক্রিয়ার) ফলে যৌগিক পদার্থ, জল (H_2O) উৎপন্ন হয়।

রি-ইন্‌ফোর্স্‌ড কংক্রিট (re-inforced concrete)— ভিতরে লোহার রড, বা জালি দিয়ে অধিকতর সুদৃঢ়ভাবে জমানো সিমেন্টের ↑ গাঁথুনি। **রি-ইন্‌ফোর্স্‌ড** মানে অধিকতর কঠিন, বা সুদৃঢ়ীকৃত। (ফেরো-কংক্রিট ↑ ferroconcrete)

রিকেট (ricket) — দেহের হাড় নরম ও অপুষ্ট থাকার রোগ বিশেষ। খাদ্যে ভিটামিন-ডি ↑ উপযুক্ত পরিমাণে না পেলে শিশুদেরই সাধারণতঃ এ-রোগ হয়ে থাকে; অনেক ক্ষেত্রে দেহের হাড় বেঁকে যায় ও বিকলাঙ্গ হয়। দুধ, মাখন, মাছের তেল প্রভৃতিতে ভিটামিন-ডি ↑ থাকে। আবার সূর্য-কিরণের প্রভাবেও দেহে আপনা থেকেই এই ভিটামিন ↑ জন্মায়। ভিটামিন-ডি ব্যতিরেকে দেহযন্ত্র ভুক্ত-খাদ্যের ক্যালসিয়াম ↑ উপাদান আত্মসাৎ করতে পারে না; যার ফলে হাড় নরম ও অপুষ্ট থেকে যায়।

রিকেট্‌সিয়া (rickettsia) — বিশেষ এক প্রকার আণুবীক্ষণিক জীবাণু; আকারে এ-গুলো ব্যাক্টেরিয়ার ↑ চেয়েও ছোট; কিন্তু ভাইরাসের ↑ চেয়ে কিছু বড়। এদের আক্রমণে টাইফাস প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি হয়।

রিগর মর্টিস (rigor mortis) — মৃত্যুর পরে প্রাণিদেহের কঠিনাবস্থা। **'রিগর'** মানে কাঠিন্য; সহজে বাঁকানো-নোয়ানো যায় না এমন অবস্থা। মৃতদেহের কাঠিন্য।

রিজোন্যান্স (resonance) — বিভিন্ন শক্তি-তরঙ্গের প্রভাবন-ধর্ম; যেমন, কোন শব্দ-তরঙ্গ যদি কোন বস্তুর উপরে পড়ে, আর যদি সেই শব্দ-তরঙ্গের ফ্রিকোয়েন্সি এবং বস্তুটাতে উদ্ভূত কম্পনের ফ্রিকোয়েন্সি ↑ যদি

একই হয়, তাহলে ঐ তরঙ্গের প্রভাবে বস্তুটা থেকে অনুরূপ শব্দ উত্থিত হয়। সম-সুরে বাঁধা দুটা সেতারের একটা বাজালে নিকটবর্তী অপরটা থেকেও অনুরূপ শব্দ ঝংকৃত হয়ে ওঠে; একে বলে শব্দ-তরঙ্গের 'রিসোন্যান্স', বাংলায় বলা যায় শব্দের অনুরণন। আলোক ও তড়িৎ-তরঙ্গেরও অনুরূপ প্রভাবন - ধর্ম (ইণ্ডাক্সন↑, ফ্লোরেসেন্স↑) আছে।

রিডাক্সন (reduction) — বিজারণ পদ্ধতি; কোন রাসায়নিক পদার্থ থেকে সাধারণতঃ অক্সিজেন দূরীকরণ, বা তাতে হাইড্রোজেন সংযুক্তিকরণের প্রক্রিয়া; যেমন — টিন-অক্সাইডের সঙ্গে কার্বন মিশিয়ে উত্তপ্ত করলে ধাতব টিন পাওয়া যায়; এখানে কার্বন টিন-অক্সাইডকে 'রিডিউসড্', অর্থাৎ বিজারিত করে, এবং নিজে জারিত, অর্থাৎ অক্সিডাইজ্ড↑ হয়ে কার্বন-মনো-অক্সাইড সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে কার্বন হলো 'রিডিউসিং এজেণ্ট'↑ অর্থাৎ বিজারক পদার্থ। এভাবে দেখা যায়, রিডাক্শনের সঙ্গে সঙ্গে অক্সিডেশন↑ প্রক্রিয়াও ঘটে থাকে। প্রকৃতপক্ষে রিডাক্শন প্রক্রিয়া হলো অক্সিডেশন প্রক্রিয়ার বিপরীত। আবার, যৌগিক পদার্থের সংগঠক-ধাতুর ভ্যালান্সি↑ হ্রাস করেও কোন-কোন ক্ষেত্রে 'রিডাক্শন' ঘটানো যায়, যেমন — ফেরিক ক্লোরাইড ($FeCl_3$) রিডিউস্‌ড হয়ে ফেরাস ক্লোরাইড ($FeCl_2$) উৎপন্ন হয়ে থাকে।

রিডিউসিং এজেণ্ট (reducing agent) — বিজারক পদার্থ; যে-সব পদার্থ অপর কোন পদার্থের রিডাক্শন↑ ঘটায় তাদের বলে 'রিডিউসিং এজেণ্ট', বা বিজারক; যেমন, হাইড্রোজেনের মধ্যে কপার অক্সাইড, CuO, উত্তপ্ত করলে রিডাক্শনের ফলে ধাতব কপার (তামা) পাওয়া যায়। এখানে হাইড্রোজেন হলো কপার-অক্সাইডের 'রিডিউসিং এজেণ্ট'।

রিফ (reef) — সমুদ্রের জলে নিমজ্জিত পর্বতশ্রেণী। খনিগর্ভে বিভিন্ন খনিজ পদার্থের স্তরগুলিকেও 'রিফ' বলে।

রিফ্র্যাক্শন (refraction) (অব লাইট) — আলোক-রশ্মির প্রতিসরণ; এক মাধ্যম থেকে আলোক রশ্মি অপর কোন মাধ্যমের ভিতর পরিচালিত হলে তার গতিপথ কিছু বেঁকে যায়। গতিপথের এরূপ পরিবর্তনকে বলে আলোক-রশ্মির প্রতিসরণ, বা রিফ্রাক্শন; যেমন— বায়ুথেকে কোন আলোক-রশ্মি জলের মধ্যে (বা, জলথেকে বাইরের বায়ুতে) প্রবেশ করলে ওই রশ্মির গতিপথ একটি নির্দিষ্ট কোণে বেঁকে যায়। বিভিন্ন মাধ্যমের সাধারণ তলের যে বিন্দুতে আলোক-রশ্মি আপতিত হয় সেই বিন্দুতে ওই তলের উপরে অঙ্কিত লম্বরেখাকে বলে **নর্ম্যাল**; এই নর্ম্যালের সঙ্গে
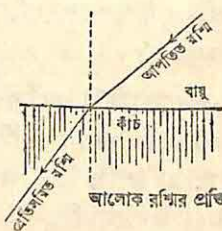
আলোক রশ্মির প্রতিসরণ

আপতিত রশ্মি যে কোণ উৎপন্ন করে তাকে বলে **অ্যাঙ্গেল-অব-ইন্সিডেন্স,** বা 'আপতন কোণ' ; আর প্রতিসরিত রশ্মি (রিফ্রাক্টেড রে) ওই লম্বের পার্শ্বে অপর মাধ্যমে যে কোণ উৎপন্ন করে, তাকে বলে **অ্যাঙ্গেল-অব-রিফ্রাক্‌শন,** অথবা 'প্রতিসরণ কোণ'। আলোক - রশ্মি বায়ু, অথবা অপর কোন হাল্‌কা মাধ্যমের ভিতর দিয়ে জল, কাঁচ প্রভৃতি ঘনতর স্বচ্ছ মাধ্যমের ভিতরে প্রবেশ করলে তার অ্যাঙ্গেল-অব-ইন্সিডেন্স অপেক্ষা অ্যাঙ্গেল অব-রিফ্রাক্‌সন ক্ষুদ্রতর হয়ে থাকে, অর্থাৎ প্রতিসরিত রশ্মি নর্ম্যালের দিকে বেঁকে যায়। পক্ষান্তরে, কোন রশ্মি ঘন মাধ্যম থেকে হাল্‌কা মাধ্যমে প্রবেশ করলে এর বিপরীত অবস্থা ঘটে। কোন্ মাধ্যমে এরূপ প্রতিসরিত রশ্মি কতটা বেঁকবে তা ওই মাধ্যমের ঘনত্ব-জনিত প্রতিসরণ-ক্ষমতা, বা **'রিফ্রাক্‌টিভ ইণ্ডেক্স'**-এর উপর সর্বদা নির্ভর করে। আলোক-রশ্মির এরূপ প্রতিসরণের ফলে জলের তলায় কোন জিনিস অপেক্ষাকৃত উপরে দেখায়, অর্থাৎ জলের গভীরতা কম বলে মনে হয়।

রিফ্লেক্স অ্যাঙ্গেল (reflex angle) — দুই সমকোণের (180°) চেয়ে বৃহত্তর, কিন্তু চার সমকোণের (360°) চেয়ে ক্ষুদ্রতর জ্যামিতিক কোণ। বাংলায় বলে 'প্রবৃদ্ধ কোণ'।

রিফ্লেক্‌শন (reflection) — (অব লাইট)—আলোক-রশ্মির প্রতিফলন; কোন অনচ্ছ মসৃণ জিনিসের উপরিভাগে আলোক-রশ্মি পড়লে ওই রশ্মি ভিন্ন পথে ফিরে আসে, অর্থাৎ প্রতিফলিত হয়; একে বলা হয় আলোকের নিয়মিত প্রতিফলন, বা রিফ্লেক্‌শন। প্রতিফলিত আলোক - রশ্মির গতিপথের এরূপ পরিবর্তন সর্বদা একটি নির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী ঘটে থাকে। প্রতিফলক তলের যে বিন্দুতে আলোক-রশ্মি আপতিত হয়, সেই বিন্দু থেকে ওই তলের উপরে অঙ্কিত লম্ব-রেখাকে **নর্ম্যাল** (normal) বলা হয়। আপতিত রশ্মি ও প্রতিফলিত রশ্মি ওই নর্ম্যালের সঙ্গে একই সমতলে উভয় দিকে সমান কোণ উৎপন্ন করে ; অর্থাৎ আলোক-রশ্মি যতটা বেঁকে প্রতিফলক-তলের উপরে পড়ে, ততটা বেঁকেই আবার প্রতিফলিত হয়। অন্য কথায় বলা যায়, আলোক-রশ্মির 'আপতন-কোণ' সর্বদা 'প্রতিফলন-কোণের' সমান হয়ে থাকে। আপতিত রশ্মি ও নর্ম্যালের মধ্যস্থ কোণকে বলে **অ্যাঙ্গেল অব ইন্সিডেন্স** (আপতন-কোণ) এবং প্রতিফলিত রশ্মি ও নর্ম্যালের মধ্যস্থ কোণকে বলা হয় **অ্যাঙ্গেল অব রিফ্লেক্‌শন** (প্রতিফলন-কোণ)।
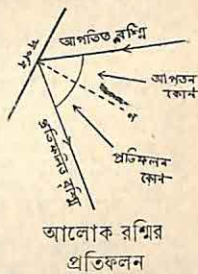
আলোক রশ্মির প্রতিফলন

রিফ্লেক্স ক্যামেরা (reflex camera) — বিশেষ এক রকম ফটোগ্রাফিক যন্ত্র বিশেষ, বা ক্যামেরা। এরূপ

ক্যামেরায় যে ছবি তুলতে হবে যন্ত্র-চালক যান্ত্রিক কৌশলে তা পূর্বাহ্ণেই যন্ত্রের মধ্যে দেখে নিতে পারে। এর অ্যাপারচারের সংলগ্ন লেন্সের। মধ্য দিয়ে আলোক-রশ্মি এসে যন্ত্রের অভ্যন্তরস্থ একখানা দর্পণে প্রতিফলিত হয়। উদ্দিষ্ট বস্তু থেকে আগত রশ্মি এভাবে প্রতিফলিত হয়ে একখানা কাঁচের উপর বস্তুটার প্রতিচ্ছায়া ফেলে। যন্ত্রচালক বস্তুটার ওই প্রতিচ্ছায়া পূর্বাহ্ণে যন্ত্র-মধ্যে দেখে নিয়ে উপযুক্ত সময়ে যান্ত্রিক ব্যবস্থায় দর্পণখানা উপরে তুলে দিতে পারে; আর, সঙ্গে-সঙ্গেই বস্তুটা থেকে আগত আলোক-রশ্মি সোজা গিয়ে ফিল্ম, বা ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপর পড়ে তার প্রতিচ্ছবি উঠে যায়।

রিফ্রিজারেটর (refrigerator) — হিমায়ক যন্ত্র; যে-যন্ত্রের অভ্যন্তর ভাগের তাপ সবিশেষ হ্রাস করে প্রয়োজনীয় নিম্ন-উষ্ণতায় মোটামুটি স্থির রাখা যায়। একে যান্ত্রিক 'শীতল-কক্ষ' বলা যেতে পারে। সাধারণ বায়ুমণ্ডলীয় উষ্ণতায় নষ্ট হয়ে যায় এমন, বিশেষতঃ পচনশীল খাদ্যদ্রব্য, ঔষধাদি এর শীতল-কক্ষে রেখে দীর্ঘ দিন অবিকৃত রাখা সম্ভব হয়ে থাকে। এর যান্ত্রিক কৌশল ও বৈজ্ঞানিক তথ্য হলো মোটামুটি এরূপ : কোন তরল পদার্থ বাষ্পীভবনের ফলে সন্নিহিত মাধ্যমের তাপ শোষণ করে; যেমন, গায়ের ঘাম হাওয়ায় বাষ্পীভূত হতে থাকলে বেশ ঠাণ্ডা বোধ হয়। রিফ্রি-জারেটর যন্ত্রে এরূপ বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ার সাহায্যে অভ্যন্তরস্থ তাপ বিশেষ কৌশলে হ্রাস করবার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। শীতলীকরণের এই পদ্ধতিকে বলা হয় **রিফ্রিজারেশন** (refrigeration)। সাধারণতঃ এরূপ যন্ত্রের মধ্যে অত্যধিক চাপ প্রয়োগে কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2), সাল্‌ফার ডাই-অক্সাইড (SO_2), অ্যামোনিয়া (NH_3) প্রভৃতি গ্যাস জমিয়ে তরল রাখা হয়; কৌশলে বায়ুপ্রবাহ চালিয়ে ওই তরল গ্যাসকে ঠাণ্ডা রাখবার ব্যবস্থা থাকে। তারপর চাপ কমিয়ে দিলে ওই তরল পদার্থ ধীরে ধীরে গ্যাসীভূত হতে থাকে; ফলে, যন্ত্রের অভ্যন্তর ভাগের উষ্ণতাও ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকে। এই গ্যাস যান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বতঃই আবার চাপ প্রয়োগে তরল হয়; আবার তা গ্যাসীভূত হয়। এরূপ প্রক্রিয়া পর্যায়-ক্রমে চলতে থাকে; এর ফলে যন্ত্রের অভ্যন্তরস্থ বায়ু ক্রমে অত্যধিক ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে। অবশ্য আরও নানারকম ব্যবস্থার রিফ্রিজারেটর যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে। থার্মোস্টাট্। প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে এরূপ শীতল-কক্ষের উষ্ণতা প্রয়োজনীয় নিম্ন-তাপমাত্রায় স্থির রাখবার ব্যবস্থাও করা যায়।

রিভার্বারেশন (reverberation) — শব্দের মূর্চ্ছনা; বড় হল-ঘরে শব্দ করলে সেই শব্দ-তরঙ্গ কিছুক্ষণ ইত-স্ততঃ প্রতিফলিত হয়; শব্দের রেশ থাকে, সঙ্গে সঙ্গে থেমে যায় না। এই হলো শব্দ-তরঙ্গের রি.ন.। প্রকৃতপক্ষে এটা শব্দের পর্যায়ক্রমিক ধ্বনি-প্রতি-ধ্বনির ফল মাত্র।

রিভার্বারেটরি ফার্ণেস (reverberatory furnace) — বিশেষ ধরনের এক রকম ফার্ণেস, বা চুল্লী; যার অগ্নিশিখা উত্তপ্ত পদার্থের গায়ে সরাসরি লাগে না। আবদ্ধ কক্ষের পার্শ্ববর্তী চুল্লীর তাপ-প্রবাহের ফলে
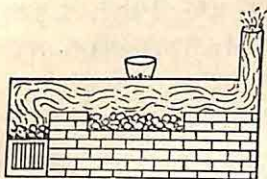
রিভার্বারেটরি ফার্ণেস (নক্সা)

অভ্যন্তরস্থ পৃথক কোন পাত্রের মধ্যে রক্ষিত পদার্থ দ্রবীভূত হয়ে যায়। বিভিন্ন খনিজ থেকে ধাতু নিষ্কাশনের কাজে সচরাচর এরূপ ফার্ণেস ব্যবহৃত হয়ে থাকে; বিশেষতঃ যে স্থলে খনিজের সঙ্গে জ্বালানি পদার্থের সংমিশ্রণ, বা রাসায়নিক সংযোগ ঘটা নিষ্কাশিত ধাতুটার বিশুদ্ধতার দিক থেকে বাঞ্ছনীয় হয় না।

রিয়েলগার (realgar) — আর্সেনিক ডাইসালফাইড (As_2S_2) নামক রাসায়নিক পদার্থের বিশেষ নাম। লাল রং-এর খনিজ পদার্থ বিশেষ। বাংলায় সচরাচর একে বলে মনঃশিলা, বা মোমছাল।

রিলে (relay), (ইলেক্‌ট্রিক্যাল) — এক রকম বৈদ্যুতিক পরিচলন-ব্যবস্থা। এর কৌশলটা হলো: এক সার্কিটে ↑ প্রবাহিত তড়িৎ-স্রোত অপর কোন সার্কিটের তড়িৎ-প্রবাহকে প্রয়োজনানুরূপ নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। প্রথম সার্কিটের স্বল্প বৈদ্যুতিক শক্তির প্রভাবে দ্বিতীয় সার্কিটে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী বিদ্যুৎ-প্রবাহ প্রয়োজনানুযায়ী প্রবিষ্ট ও নিবৃত্ত করা সম্ভব হয়ে থাকে। দূরাগত স্তিমিত রেডিও ↑ (বেতার)-তরঙ্গের (ইলেক্ট্রোম্যাগ্নেটিক ওয়েভ ↑) তড়িৎ-প্রবহনকে এরূপ প্রক্রিয়ার সাহায্যে অধিকতর শক্তিশালী করে গ্রহণ, বা দূরবর্তী স্থানে প্রেরণ করা সম্ভব হয়ে থাকে।

রিলেটিভিটি (relativity) (থিয়োরি অব) — আপেক্ষিকতা-বাদ। পদার্থবিজ্ঞানে 'আপেক্ষিকতা' সম্পর্কীয় আইন্‌স্টাইনের ↑ প্রবর্তিত মতবাদ। এই মতবাদ মূলতঃ দুটি সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত; প্রথমতঃ, কোন বস্তুর গতি কখন অন্য-নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব নয়; দ্বিতীয়তঃ, স্থান ও কাল পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত, অর্থাৎ আপেক্ষিক; ওর একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির অস্তিত্ব সম্ভব নয়। কোন বস্তুর গতি অপর কোন স্থির বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতেই নির্ধারিত হতে পারে মাত্র। কিন্তু বিশ্ব চরাচরে কোন বস্তুই স্থির নেই; — পৃথিবী, গ্রহ-নক্ষত্রাদি সবই মহাশূন্যে গতিশীল। সুতরাং পদার্থের অন্য-নিরপেক্ষ নিজস্ব গতি নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। কাজেই সব রকম গতিই আপেক্ষিক। এভাবে আবার স্থান এবং কালও পরস্পর আপেক্ষিক; যেহেতু মহাশূন্যে ভ্রাম্যমান বস্তু মাত্রেরই অবস্থান অনুযায়ী সময় এবং সময় অনুযায়ী অবস্থান হতে বাধ্য। এই মতবাদের বিস্তৃত যুক্তিতে

জ্যোতির্বিদ্যার বিভিন্ন অভিনব তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে; পদার্থের পারমাণবিক শক্তি সম্বন্ধীয় বিবিধ তথ্যও প্রমাণিত হয়েছে। এর ফলে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মূল গঠন-বৈচিত্র্য একই নিয়মে গ্রথিত হয়েছে। বহু জটিল যুক্তি ও গাণিতিক সমাধানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আইনস্টাইনের এই মতবাদ বাস্তব পরীক্ষাদিতেও সর্বক্ষেত্রে নির্ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

রিলেটিভ ভেলোসিটি (relative velocity) — আপেক্ষিক গতি; ভেলোসিটি (রিলেটিভ) ↑।

রুজ (rouge)—লোহার বিশুদ্ধ চূর্ণাকার মরিচা; বিশুদ্ধ আয়রন অক্সাইডের (Fe_2O_3) গুঁড়া। লাল রঙের এই সূক্ষ্ম ও সুকঠিন দানাযুক্ত চুর্ণ দিয়ে ঘসে অনেক সময় বিভিন্ন ধাতবপদার্থ পালিশ করা হয়।

রুট (root) — উদ্ভিদের মূল, বা শিকড়। আবার, গণিতে বর্গমূল, ঘনমূল প্রভৃতি; যেমন—'স্কোয়ার রুট' অব 16 হলো $\sqrt{16}=4$, অথবা -4; আবার 'কিউব রুট' হলো ঘনমূল; যেমন, $\sqrt[3]{27}=3$.

রুড (rood) — আয়তনের একটা ইংলণ্ডীয় পরিমাপ, $=\frac{1}{4}$. একর ↑; 1,210 বর্গ গজ।

রিয়েল ইমেজ (real image)—সদ্‌বিম্ব; প্রকৃত প্রতিচ্ছায়া। বক্রতল দর্পণ, বা লেন্সে ↑ প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব, যা নিয়ে কোন পর্দার উপরে ফেলা যায়, সিনেমা-ছবিতে যেমন হয়। সাধারণ দর্পণে আমরা দেখি বস্তুর **ভার্চুয়াল ইমেজ** ↑ (virtual image), অর্থাৎ অপ্রকৃত প্রতিচ্ছায়া, বা অসদ্‌বিম্ব; যাকে পর্দার উপরে প্রতিফলিত করা যায় না। (ইমেজ ↑)

রুথেনিয়াম (ruthenium)—মৌলিক ধাতু; সাংকেতিক চিহ্ন Ru, পারমাণবিক ওজন 101·7, পারমাণবিক সংখ্যা 44; অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু ভঙ্গুর ধাতব পদার্থ। ধাতুটা অত্যধিক তাপসহ; এর গলনাংক 2450° সেন্টিগ্রেড। কোন কোন খনিজ পদার্থে প্ল্যাটিনাম ↑ ধাতুর সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়।

রুবি (ruby) — উজ্জ্বল লাল রঙের এক প্রকার মূল্যবান প্রস্তর বিশেষ; অলঙ্কারাদিতে ব্যবহৃত হয়। রাসায়নিক হিসেবে এর প্রধান উপাদান হলো অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড, Al_2O_3, (কোরাণ্ডাম ↑)। স্বভাবতঃই এর সঙ্গে সামান্য ক্রোমিয়াম ↑ মিশ্রিত থাকায় পদার্থটা উজ্জ্বল লাল বর্ণের হয়ে থাকে।

রুবিডিয়াম (rubidium) — মৌলিক ধাতব পদার্থ; সাংকেতিক চিহ্ন Rb, পারমাণবিক ওজন 85·48; পারমাণবিক সংখ্যা 37; সোডিয়ামের ↑ মত সাদা ও নরম ধাতু। সোডিয়ামের মত এরও রাসায়নিক সংযোগের শক্তি যথেষ্ট প্রবল,—সহজেই অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে এর রাসায়নিক মিলনে বিভিন্ন যৌগ গঠিত হয়ে থাকে।

রুমার (Reaumur) রেনি. ডি — ফরাসী রসায়ন-বিজ্ঞানী, জন্ম 1683 খৃস্টাব্দ, মৃত্যু 1757 খৃস্টাব্দ। বিশেষ

ধরনের ডিগ্রি-একক নিয়ে এক প্রকার তাপমান-যন্ত্র উদ্ভাবন ; যাতে জলের হিমাংক 0° ডিগ্রি এবং স্ফুটনাংক 80° ডিগ্রি (80°R) ধরা হয়েছে। এরূপ পরিমাপের, বা স্কেলের তাপমান-যন্ত্র উদ্ভাবকের নামানুসারে সচরাচর **'রুমার থার্মোমিটার'** (Reaumur thermometer) নামে পরিচিত।

রুমেন (rumen) — গরু, ছাগল প্রভৃতি রোমন্থক প্রাণীর প্রথম পাকস্থলী ; যেখান থেকে এরা ভক্ষিত খাদ্য পুনরায় মুখে আনতে পারে। এদের পাকস্থলীর চারটি অংশ ; শেষ বা চতুর্থ অংশকে বলে **অ্যাবোমেসাম** (abomesum), যেখানে ভুক্ত-খাদ্যের প্রকৃত পরিপাক-ক্রিয়া চলে। রোমন্থনের সুবিধার জন্যে পাকস্থলীর এই 'রুমেন' অংশ আছে বলে এ-সব প্রাণীদের বলে **রুমিন্যাণ্ট** (ruminants)।

রুম্যাটিজ্‌ম (rheumatism) — গেঁটে-বাত রোগ ; যে রোগে অস্থি-সংযোগ ও মাংসপেশী ফুলে ব্যথা-বেদনা হয়। এ-রোগে সাধারণতঃ রোগীর হৃৎপিণ্ড দুর্বল হয়ে পড়ে। **রুম্যাটিক ফিভার** (rheumatic fever) হলো রুম্যাটিজ্‌ম, বা গেঁটে-বাতের গুরুতর অবস্থায় যে জ্বর হয়।

রেইন-গেজ (rain-gauze) — বৃষ্টি-পাতের পরিমাণ নির্ধারক যন্ত্র। এর সাহায্যে কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন স্থানে কত বৃষ্টিপাত হলো তার পরিমাণ জানা যায়। চিত্র থেকে বুঝা যাবে, একটা নির্দিষ্ট আয়তনের ফানেলের মুখে যতটা বৃষ্টির জল পড়ে' নিচের পাত্রে জমে থাকে, একটি পরিমাপক পাত্রে (মেজারিং গ্লাস) ঢেলে তার পরিমাণ স্থির করা হয়, এবং তা থেকে কোন স্থানে বৃষ্টি-পাতের হ্রাস-বৃদ্ধি সহজেই নিরূপণ করা যায়।
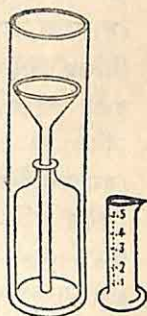
রেইন-গেজ.

রেক্‌ট্যাঙ্গেল (rectangle) — সম-কোণী চতুর্ভুজ ; যে চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের চারটি কোণই সমকোণ 90° (ডিগ্রি)। এর আবার বাহু চারটি সমান হ'লে বলা হয় **স্কোয়ার,** বাংলায় বর্গক্ষেত্র। **রেক্‌ট্যাঙ্গুলার ফিগার** হলো যে-কোন সমকোণী চতুর্ভুজ ক্ষেত্র।

রেক্‌টিলিনিয়ার (rectilinear) — সরলরৈখিক, অথবা সরল রেখাসম-ন্বিত। যেমন — **রেক্‌টিলিনিয়ার ফিগার**—সরলরৈখিক ক্ষেত্র। **রেক্‌টিলিনিয়ার লেন্স** (rectilinear lens) হলো যে-লেন্সের ভিতর দিয়ে বিভিন্ন প্রতিসরিত রশ্মি সরল রেখার আকারে আলোকচিত্রের মত সুস্পষ্ট ও ঋজু দেখায়।

রেজিন (resin) — পাইন প্রভৃতি উদ্ভিদের ঘনীভূত রস। এ-জাতীয় বৃক্ষের ছাল কেটে দিলে উদ্ভিজ্জ তেল ও রজন-মিশ্রিত ঘন রস নির্গত হয়। এর থেকে উদ্বায়ী তেল বাষ্পীভূত হয়ে উবে গেলে গাছের কাটামুখে

কঠিন রেজিন জমে থাকে। একে আবার অনেকসময় **রোজিন** (rosin)-ও বলা হয়, বাংলায় বলে রজন। কোপ্যাল, ক্যানাডা-ব্যাল্‌সাম প্রভৃতি বিভিন্ন উদ্ভিদ থেকে বিভিন্ন রকমের রজন পাওয়া যায়। রজনের রাসায়নিক গঠন অত্যন্ত জটিল ; পদার্থটা যেন এক রকম স্বভাবজাত প্ল্যাষ্টিক ↑ শ্রেণীর পলিমার ↑। রেজিনের সঙ্গে স্বভাবজাত উদ্ভিজ্জ তেল মিশ্রিত থাকলে সাধারণতঃ তাকে বলা হয় **ওলিয়োরেজিন** (oleoresin)।

রেটর্ট (retort)—বিশেষ গঠনের এক রকম পাত্র, বাংলায় বলে **বক-যন্ত্র**। সাধারণতঃ কাঁচের তৈরী এরূপ বিশেষ আকারের পাত্রে বিভিন্ন পদার্থ উত্তপ্ত করলে তা থেকে উৎপন্ন গ্যাস, বা বাষ্প সহজে সংগ্রহ করা যায়। ডিষ্টিলেশন ↑ ক্রিয়ায়ও এরূপ পাত্র ব্যবহৃত হয় ; কোন-কোন ক্ষেত্রে বাষ্পীয় ডিস্টিলেট-টা ↑ এর নলপথে নির্গমনের সময়ে তরল হয়ে বেরিয়ে আসে। কোল-গ্যাস ↑ তৈরির প্রক্রিয়ায় এরূপ বিরাটাকার ধাতুনির্মিত বক-যন্ত্রে কয়লা উত্তপ্ত করা হয়; অন্তর্ধূম-পাতন
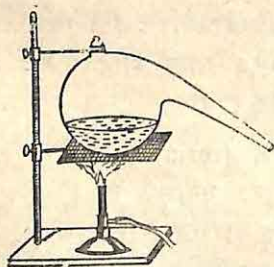
রেটর্ট, বা বক-যন্ত্র

প্রক্রিয়ায় ওর নলমুখে নির্গত গ্যাস প্রকাণ্ড সব গ্যাস-হোল্ডারের ↑ মধ্যে সঞ্চয় করে রাখা হয়।

রেটিনা (retina) — চক্ষুগোলকের পশ্চাদ্ভাগস্থ যে-পর্দার গায়ে চোখের বিভিন্ন স্নায়ু এসে মিলিত হয়েছে। মস্তিষ্ক থেকে এসে ওই স্নায়ুগুলোর প্রান্তভাগ রেটিনার সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। আলোক-সুগ্রাহী এই সব

সূক্ষ্ম স্নায়ুর রেটিনা-সংলগ্ন প্রান্তগুলো আলোকপাতে উত্তেজিত হয় ; সেই উত্তেজনার প্রবাহ স্নায়ুপথে মস্তিষ্কে বাহিত হয়ে বহু জটিল ও বিচিত্র ব্যবস্থায় আমাদের চোখে বিভিন্ন বর্ণ ও দৃশ্যের অনুভূতি জাগায়।

রেড লেড (red lead)—লেড অক্সাইড, Pb_3O_4 ; উজ্জ্বল লাল বর্ণের চূর্ণ। পদার্থটা আবার **মিনিয়াম** ↑ নামেও পরিচিত। পেইণ্ট এবং ভার্নিসের ↑ রং হিসেবে প্রচুর ব্যবহৃত হয় ; কাঁচ-শিল্পে ও অক্সিডাইজিং এজেণ্ট হিসেবে এর যথেষ্ট ব্যবহার আছে। বাংলায় বলে 'মেটে সিন্দুর'।

রেডিও (radio) — কথাটার শব্দার্থ হলো, 'রে', অর্থাৎ রশ্মি সম্বন্ধীয়, অথবা রশ্মির দ্বারা ; যেমন—রেডিওথেরাপি ↑ (radiotherapy), রেডিও-অ্যাক্টিভ ↑ এলিমেণ্ট ইত্যাদি। সাধারণতঃ আজকাল 'রেডিও' বললে বেতার-যন্ত্র (রেডিও টেলিফোনি ↑) বুঝায়।

রেডিওঅ্যাক্টিভিটি (radioacti-

vity) — বিশেষ বিশেষ মৌলিক পদার্থের স্বয়ংক্রিয় তেজস্ক্রিয়তা ; যেমন, অস্থায়িত্বের জন্যে ইউরেনিয়াম, রেডিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতি ভারী মৌলিক পদার্থগুলোর পরমাণু-কেন্দ্রীণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভেঙ্গে-ভেঙ্গে (ফিসন ↑) তা থেকে তড়িতাবিষ্ট তেজস্ক্রিয় কণিকা-ধারা নির্গত হতে থাকে। স্বতঃ বিকিরিত এই তেজঃ-রশ্মির সংগঠক আল্‌ফা ↑, বিটা ↑, গামা ↑, এই তিন রকম কণিকার ধারা, বা রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়। এদের মধ্যে আল্‌ফা-কণিকাগুলো ধন-তড়িৎযুক্ত, বিটা-কণিকা ঋণ-তড়িৎবিশিষ্ট এবং গামা-কণিকা হলো তড়িৎ-বিহীন। এই তেজস্ক্রিয় রশ্মির নিকটে একটা চুম্বক দণ্ড আনলে তার সংগঠক ওই তিন রকম রশ্মি বিভিন্ন পথে বেঁকে পৃথক হয়ে তিন দিকে বিভক্ত হয়ে যায় (চিত্র ↑)। এরূপ ক্রমাগত তেজঃ বিকিরণের ফলে তেজস্ক্রিয় পদার্থ-গুলোর পারমাণবিক গঠন বদলে গিয়ে তারা ক্রমে লঘুতর মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে যায় (ট্রান্স-মুটেশন ↑) ; যেমন, রেডিয়াম ধাতু তেজস্ক্রিয়তার ফলে ক্রমে ধাপে-ধাপে পরিবর্তিত হয়ে শেষে সীসায় (লেড) পরিণত হয়। কতকগুলো ভারী মৌলিক পদার্থের স্বতঃ-বিভাজনক্ষম বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ↑ স্বভাবতঃ পাওয়া যায় ; আবার অ্যাটমিক-পাইল ↑, সাইক্লোট্রোন ↑ প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে কৃত্রিম উপায়েও কতকগুলি ভারী মৌলিক পদার্থের এরূপ রেডিও-অ্যাক্‌টিভ আইসোটোপ তৈরি করা ইদানিং সম্ভব হয়েছে।

ত্রিবিধ তেজঃরশ্মি

রেডিওগ্রাফি (radiography)—যে যন্ত্রের সাহায্যে এক্স-রে ↑ গামা-রে ↑ প্রভৃতি অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট রশ্মি-পাতের সাহায্যে ফটোগ্রাফিক ↑ প্লেট, অথবা ফ্লোরেসেন্ট ↑ পর্দার উপরে কোন বস্তুর প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলা যায়। সাধারণতঃ দেহাভ্যন্তরস্থ যান্ত্রিক গোলযোগ নির্ণয়ের জন্যে 'এক্স-রে' ↑ যন্ত্রের সাহায্যে দেহের অস্থি-কাঠামো ও যন্ত্রাদির এক রকম আলোক-চিত্র তোলবার পদ্ধতিকেও বলা হয় রেডিওগ্রাফি।

রেডিও টেলিফোনি (radio telephony) — সাধারণ রেডিও, বা বেতার-যন্ত্রের কার্য-পদ্ধতি। বিশেষ যান্ত্রিক ব্যবস্থায় ইলেক্‌ট্রোম্যাগ্নেটিক ↑ তরঙ্গ-ধারার মাধ্যমে এতে কথাবার্তা, গান-বাজনা প্রভৃতির ধ্বনি দূর-দূরান্তরে প্রেরিত হয়। এর প্রেরক-যন্ত্র থেকে নির্দিষ্ট স্পন্দন-সংখ্যার এরূপ বেতার-তরঙ্গ অনবরত বায়ুমণ্ডলে বিক্ষিপ্ত হতে থাকে। মাইক্রোফোন ↑ যন্ত্রের সাহায্যে শব্দ-তরঙ্গকে তড়িৎ-স্পন্দনে রূপান্তরিত করে ওই ইলেক্‌ট্রোম্যাগ্নেটিক তড়িত্তরঙ্গ সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। এই বৈদ্যুতিক তরঙ্গ-স্পন্দন শূন্যপথে অতি দ্রুত ছড়িয়ে যায় ও দূরবর্তী রেডিও গ্রাহক-যন্ত্রে গিয়ে ধরা পড়ে। বিভিন্ন যান্ত্রিক কৌশলে এই ক্ষীণ

তড়িৎ - স্পন্দনগুলো 'অ্যাম্‌প্লিফায়ার' যন্ত্রের সাহায্যে বিশেষভাবে সংবর্ধিত হয়ে রিসিভার, বা গ্রাহক-যন্ত্রের লাউড - স্পিকারের পর্দায় প্রেরিত শব্দানুযায়ী কম্পন ঘটায়। এর ফলে পুনরায় সেই শব্দের অনুরূপ শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। এই শব্দই আমরা রেডিও যন্ত্রে শুনতে পাই। রেডিও সম্বন্ধে এ হলো অতি সাধারণ মোটা-মুটি বিবরণ। এই বেতার-তরঙ্গ গ্রহণ, সংশোধন এবং সংবর্ধনের জন্যে এর মধ্যে থার্মোআয়নিক ↑ ভাল্‌ব ↑ প্রভৃতি নানা রকম জটিল যান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকে।

রেডিও টেলিগ্রাফি (radiotelegraphy) — বেতার-যন্ত্রের সাহায্যে সংবাদ প্রেরণের কৌশল। সাধারণ টেলিগ্রাফ ↑ পদ্ধতির মোর্স-প্রবর্তিত সাংকেতিক ধ্বনি বেতার-তরঙ্গের মাধ্যমে দূরবর্তী স্থানে প্রেরণ করবার যান্ত্রিক ব্যবস্থা। এর যান্ত্রিক কৌশল মোটামুটি রেডিও - টেলিফোনির ↑ অনুরূপ ; সাধারণতঃ বলে 'টেলেক্স'।

রেডিওথেরাপি (radiotherapy)— বিভিন্ন রেডিও-অ্যাক্‌টিভ 'রে' ↑, বা সাধারণ তেজঃরশ্মি প্রয়োগে বিশেষ বিশেষ রোগের চিকিৎসা-প্রণালী। এরূপ বিশেষ চিকিৎসা-ব্যবস্থায় বিভিন্ন রোগে আলোক-রশ্মি, তাপ-রশ্মি, গামা - রশ্মি, এক্স - রশ্মি ↑ প্রভৃতি তেজঃরশ্মি বিভিন্ন কৌশলে রোগীর রোগাক্রান্ত স্থানে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। রেডিয়াম ↑ প্রভৃতি বিভিন্ন মূল তেজস্ক্রিয় (রেডিওঅ্যাক্‌টিভ ↑) পদার্থের তেজঃরশ্মি প্রয়োগ করেও ক্যান্সার প্রভৃতি অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় করা সম্ভব হয়ে থাকে।

রেডিও মাইক্রোমিটার (radio micrometer) — উত্তপ্ত পদার্থ থেকে বিকিরিত তাপ-শক্তি পরি-মাপের জন্যে উদ্ভাবিত যন্ত্র বিশেষ। এর সাহায্যে অতি ক্ষীণ তাপের পরিমাণও নির্ধারণ করা যায়। এরূপ যন্ত্রে প্রধানতঃ থাকে একটা থার্মো-কাপ্‌ল ↑ এবং একটা গ্যাল্‌ভ্যানো-মিটার ↑। এ-যন্ত্র দু'টা পরস্পরের সঙ্গে তামার তার দিয়ে যুক্ত করে তড়িৎ-চক্র সৃষ্টি করা হয়। বিকিরিত তাপশক্তি থার্মোকাপ্‌লের মধ্যে যে ক্ষীণ তড়িৎ-প্রবাহ সৃষ্টি করে গ্যাল্‌-ভ্যানোমিটারে তার পরিমাণ সহজেই নির্ধারিত হয়ে থাকে।

রেডিওমিটার (radiometer) — উত্তপ্ত পদার্থ থেকে বিকিরিত তাপ-রশ্মির পরিমাপক এক প্রকার সাধারণ যন্ত্র বিশেষ। যন্ত্রটা মোটামুটিভাবে বায়ুশূন্য একটা আধারে রক্ষিত ঘূর্ণায়মান একটা চক্রের মত। এর লম্বা দণ্ডগুলোর মাথায় সংলগ্ন ধাতব চাক্‌তিসমূহের এক দিক উজ্জ্বল চক্‌চকে ও অপর দিক কালো থাকে। কালো রঙের তাপ-শক্তি শোষণের বিশেষ ক্ষমতা আছে, কাজেই ওই চাক্‌তির প্রত্যেকটার
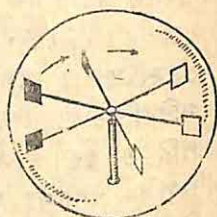
রেডিওমিটার

কালোদিকে উত্তপ্ত পদার্থ থেকে বিকিরিত তাপ-শক্তি দ্রুত শোষণ করে নেয় ; এর ফলে, আধারের অভ্যন্তরস্থ স্বল্পাবশিষ্ট বায়ুতে একটা একমুখী বায়ু-প্রবাহের সৃষ্টি হয়। প্রত্যেকটা চাকতির একই দিকের কালো অংশ থেকে উদ্ভূত এরূপ বায়ু-প্রবাহের ফলে চক্রটা ঘুরতে থাকে। চক্রটার এরূপ ঘূর্ণনের বেগ লক্ষ্য করে বিকিরিত তাপের মোটামুটি পরিমাণ নিরূপণ করা যেতে পারে।

রেডিয়াম (radium) — মৌলিক তেজস্ক্রিয় ধাতু। সাংকেতিক চিহ্ন Ra, পারমাণবিক ওজন 226·05, পারমাণবিক সংখ্যা 88 ; অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান ধাতু। মাদাম কুরি ↑ পিচ্ব্লেণ্ড ↑ থেকে নিষ্কাশিত করে রেডিয়াম ধাতু আবিষ্কার করেন। প্রধানতঃ ক্যান্সার রোগের বিশেষ চিকিৎসায় এর সুতীব্র তেজঃরশ্মি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। রাসায়নিক গঠনের হিসেবে ধাতুটা ক্যালসিয়াম ↑ ও বেরিয়ামের অনুরূপ। তেজঃবিকিরণের ফলে (রেডিও-অ্যাকৃটিভিটি ↑) রেডিয়াম ধাতু ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হয়ে শেষে সীসায় রূপান্তরিত হয়। (ট্রান্স-মুটেশন ↑)
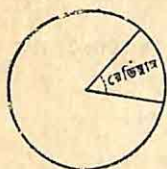
রেডিয়ান

রেডিয়ান(radian) —কোন জ্যামিতিক বৃত্তাংশ পরিমাপের একটা একক বিশেষ। কোন বৃত্তের ব্যাসার্ধের (রেডিয়াস ↑) সমান করে পরিধি থেকে একটা অংশ কেটে নিয়ে তার উভয় প্রান্তে দুটা ব্যাসার্ধ অঙ্কিত করলে কেন্দ্রে যে-কোণ উৎপন্ন হয় তাকে বলে এক রেডিয়ান। এক রেডিয়ান = 57·3° ডিগ্রি; এক ডিগ্রি 0·017 রেডিয়ান। একটা নিত্য রাশি।

রেডিয়াস (radius) — ব্যাসার্ধ (জ্যামিতিক) ; বৃত্তের কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত অঙ্কিত যে-কোন সংযোজক সরল রেখা। কেন্দ্র ভেদ করে উভয় দিকে পরিধি পর্যন্ত বিস্তৃত সরল রেখাকে বলা হয় বৃত্তের ব্যাস, বা **ডায়মেটার**।

রেডিয়াস (radius) — (শারীরবৃত্তে) মানুষের নিম্ন-বাহুর (কনুই ও কব্জির মধ্যবর্তী) ঈষৎ বক্র ও ক্ষুদ্রতর বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থি ; আল্না (ulna) ↑।

রেডিয়াস ভেক্টর (radius vector) — জ্যোতির্বিজ্ঞানের গণনাদিতে ব্যবহৃত রাশি। কোন জ্যোতিষ্ক যদি অপর কোন জ্যোতিষ্কের চারদিকে উপবৃত্ত (ইলিপ্টিক ↑) পথে প্রদক্ষিণ করে (যেমন, পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ডিম্বাকার কক্ষপথে ঘুরছে), তাহলে যে-কোন অবস্থানে ওই জ্যোতিষ্ক দু'টির সংযোগকারী সরল রেখাকে বলা হয় 'রেডিয়াস ভেক্টর'। তুলনামূলক ভাবে স্থির জ্যোতিষ্কটার অবস্থানকে অপর জ্যোতিষ্কটার ওই উপবৃত্ত কক্ষ-পথের **ফোকাস** বলে। রেডিয়াস ভেক্টরের দৈর্ঘ্য ও কৌণিক অবস্থানাদি

রেডিয়াস ভেক্টর

পর্যবেক্ষণ করে যে-কোন সময়ে ওই চলমান জ্যোতিষ্কের গতি, স্থিতি, দূরত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধীয় তথ্যাদি জানা যায়। গণিতশাস্ত্রেও কোন স্থির বিন্দুর তুলনায় অপর কোন গতিশীল বিন্দুর বিভিন্ন পরিমাপ এরূপ রেডিয়াস ভেক্টরের সাহায্যে নির্ধারিত হয়।

রেডিয়েটর (radiator) — যে যন্ত্রের সাহায্যে কোন উৎস থেকে নিয়মিত ভাবে তাপ-রশ্মি চারদিকের বায়ুতে বিকিরণ করা সম্ভব হয়। উত্তপ্ত জল, বা জলীয় বাষ্পে পূর্ণ এরূপ যন্ত্র থেকে বিশেষ কৌশলে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে বিকিরিত তাপ-রশ্মি চারিদিকের বায়ু উত্তপ্ত করে তোলে। শীতপ্রধান দেশে গৃহের অভ্যন্তরস্থ বায়ু উষ্ণ রাখবার জন্যে সাধারণতঃ এরূপ রেডিয়েটর যন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

রেডিয়েশন (radiation) — কোন উৎস থেকে রশ্মি, বা তরঙ্গ-প্রবাহের আকারে শক্তির বিকিরণ, বা বিচ্ছুরণ। তাপ, আলোক, তড়িৎ প্রভৃতি বিভিন্ন শক্তি বিভিন্ন রূপ অদৃশ্য রশ্মি, বা তরঙ্গের আকারে বিকিরিত হয়ে থাকে। আবার ইলেকট্রন ↑, নিউ-ট্রন ↑ প্রভৃতি কণিকার তরঙ্গাকার ধারা-প্রবাহের ফলেও একপ্রকার অদৃশ্য রশ্মির সৃষ্টি হয়। সাধারণতঃ ইলেক্-ট্রোম্যাগ্নেটিক ↑ তরঙ্গ - প্রবাহ, অথবা যে-কোন অদৃশ্য রশ্মির বিকিরণকেই রেডিয়েশন বলা হয়।

রেডিয়্যাণ্ট হিট (radiant heat)— উত্তপ্ত পদার্থ থেকে যে তাপশক্তি বিকিরিত হয়। আমরা সূর্যের যে তাপ পাই তা সূর্যের 'রেডিয়্যাণ্ট হিট', বা বিকিরিত তাপশক্তি। একটা উত্তপ্ত লৌহখণ্ড দেহের কাছে আনলে তার রেডিয়্যাণ্ট হিটের ফলে আমাদের তাপ বোধ হয়। কিন্তু উত্তপ্ত লোহা গায়ে লেগে গেলে যে উত্তাপ বোধ হয় তা আর 'রেডিয়্যাণ্ট হিট' নয়।

রেয়ন (rayon) — কৃত্রিম রেশম। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত সব রকম সেলুলোজ ↑ জাতীয় পদার্থের সূত্রকেই আজকাল রেয়ন বলে। সাধারণতঃ দু'রকম রেয়ন বিশেষ প্রচলিত,— 'সেলুলোজ অ্যাসিটেট রেয়ন' ও 'ভিস্‌কোস্ রেয়ন'। যন্ত্রের সাহায্যে চাপ দিলে সেলুলোজ অ্যাসিটেটের ↑ ঘন দ্রব সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে সূতার মত বেরিয়ে আসে। উত্তপ্ত বায়ু-প্রবাহের সাহায্যে এই সূতা থেকে দ্রাবক পদার্থ সম্যক বাষ্পীভূত হয়ে চলে যায়; এর ফলে সূতাগুলো বেশ শক্ত হয়ে পড়ে। সাধারণভাবে এই হলো **সেলুলোজ - অ্যাসিটেট রেয়ন** (cellulose - acetate rayon)। যন্ত্রের সাহায্যে ভিস্‌কোস ↑ নামক রাসায়নিক পদার্থের যে সূক্ষ্ম সূতা তৈরি হয়ে থাকে, তাকে বলে **ভিস্‌কোস রেয়ন** (viscose rayon। বিভিন্ন শ্রেণীর সেলুলোজের ↑ উপর সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের ↑ (NaOH) জলীয় দ্রব ও কার্বন বাই-সাল্‌ফাইডের ↑ (CS_2) রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে এক রকম স্বচ্ছ অর্ধ-তরল পদার্থ উৎপন্ন হয়, শিল্পক্ষেত্রে যাকে বলা হয় ভিস্‌কোস।

রেয়ার আর্থস্ (rare earths) — সমগোত্রীয় কতকগুলো দুষ্প্রাপ্য মৌলিক ধাতু। এদের 'রেয়ার আর্থ এলিমেণ্টস'ও বলা হয়। ধাতুগুলোর বিভিন্ন ধর্ম ও গুণ অনেকাংশে অ্যালুমিনিয়ামের মত। মোনাজাইট↑ নামক খনিজ বালুকা থেকে সাধারণতঃ পাওয়া যায়। সিরিয়াম↑ ধাতুসহ প্রায় 16-টা ধাতু এই 'রেয়ার আর্থ' শ্রেণীর অন্তর্গত; সমগোত্রীয় এই সকল ধাতুর এক-একটির পারমাণবিক ওজন 57 থেকে 71-এর মধ্যে। (পরিশিষ্টে তালিকা↑)।

রেয়ার গ্যাস (rare gas) — ইনার্ট গ্যাস↑, বা নোব্‌ল গ্যাস; হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন, ক্রিপ্টন, জেনন ও র‍্যাডন↑ নামক মৌলিক নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলো প্রকৃতিতে বিরল ও দুষ্প্রাপ্য বলে সাধারণতঃ এই নামে পরিচিত। এদের মধ্যে র‍্যাডন↑ ব্যতীত অন্য গ্যাসগুলো বায়ুমণ্ডলে অতি সামান্য পরিমাণে মিশে আছে। বায়ুমণ্ডলে আর্গন আছে অপেক্ষাকৃত বেশি; তার পরিমাণও মাত্র 0·93%-এর মত। (অ্যাট্‌মস্ফিয়ার↑)

রেসিপ্রোকাল (reciprocal) — বিপরীত রাশি; যেমন, 3-এর রে. ল. 1/3; 5-এর রে. ল. 1/5, ইত্যাদি।

রেসোর্সিন (resorcin) — একটা শক্তিশালী জীবাণু-প্রতিরোধক জৈব রাসায়নিক পদার্থ; একে **রেসর্সিনল** (resorcinol)-ও বলে। চর্মরোগে বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধরূপে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। রঞ্জন-শিল্পেও এর কিছু ব্যবহার আছে।

রোজেজ মেটাল (rosses metal) — একটি সংকর-ধাতুর বিশেষ নাম; বিস্‌মাথ 50%, লেড (সীসা) 25%, টিন 25% সংযোগে এই ধাতু-সংকর তৈরি হয়। গলনাংক 94° সেন্টিগ্রেড।

রোডোনাইট (rhodonite) — গোলাপী বর্ণের এক রকম প্রস্তর বিশেষ; সুদৃশ্য বলে সস্তা অলঙ্কারাদিতে ব্যবহৃত হয়। **রোডো**-(rhodo-) মানে গোলাপী বর্ণ।

রোডোফাইটা (rhodophyta) — এক শ্রেণীর লাল রঙের অ্যাল্‌জি↑, অর্থাৎ শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদ; প্রধানতঃ সমুদ্রেই এই শ্রেণীর শৈবাল জন্মায়।

রোসেল সল্ট (rochelle salt) — 'সোডিয়াম পটাসিয়াম টার্টারেট' নামক, [$COOK.(CH.OH)_2.COONa. 4H_2O$] রাসায়নিক পদার্থের বিশেষ নাম। সাদা স্ফটিকাকার পদার্থ, জলে সবিশেষ দ্রবণীয়। বেকিং পাউডার↑, সিড্‌লিজ পাউডার↑ প্রভৃতি তৈরি করতে পদার্থটা ব্যবহৃত হয়।

র‍্যাটুন (ratoon) — কোন-কোন উদ্ভিদ কেটে ফেললে মাটির নিচের গোড়া থেকে যে-সব নূতন চারা গজায়; যেমন, দূর্বা, কলা গাছ, আখ প্রভৃতির ক্ষেত্রে জন্মাতে দেখা যায়।
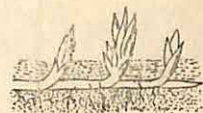
র‍্যাটুন

র‍্যাডন (radon) — রেডিয়াম↑

ধাতুর তেজস্ক্রিয়তার ফলে যে গ্যাসীয় পদার্থের উদ্ভব হয়। মৌলিক পদার্থ বিশেষ ; সাংকেতিক চিহ্ন Rn, পারমাণবিক ওজন 222, পারমাণবিক সংখ্যা 86 ; ক্রমাগত তেজস্ক্রিয়-রশ্মি বিকিরণের ফলে রেডিয়ামের পারমাণবিক গঠন ধীরে-ধীরে পরিবর্তিত হতে থাকে ; সঙ্গে-সঙ্গে ওই বিকিরিত তেজঃপ্রবাহের সঙ্গে এই র‍্যাডন গ্যাস নির্গত হয়ে থাকে। রাসায়নিক হিসেবে এটা একটা ইনার্ট , অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় গ্যাসের পর্যায়ভুক্ত।

র‍্যাডার (radar) — বহু দূরবর্তী অদৃশ্য বস্তুর (বিশেষতঃ বিমানপোতের) গতি, অবস্থান, দূরত্ব প্রভৃতি নির্ধারণের জন্যে উদ্ভাবিত এক প্রকার যন্ত্র বিশেষ। রেডিও-ডাইরেক্টিং-অ্যাণ্ড-রেঞ্জিং (Radio-Directing And Ranging) কথাটা সংক্ষেপ করে যন্ত্রটার নাম 'র‍্যাডার' দেওয়া হয়েছে। এরূপ যন্ত্রের মোটামুটি কৌশল হলো : রেডিও প্রেরক-যন্ত্র থেকে অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গ (ইলেক্ট্রোম্যাগ্নেটিক-ওয়েভ) ঊর্ধাকাশে প্রেরিত হয়। এরূপ তরঙ্গগুলো বহু দূরবর্তী অদৃশ্য এরোপ্লেনের গায়ে প্রতিহত ও প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে ; আর সেই প্রতিফলিত তরঙ্গমালা ফিরে এসে গ্রাহক-যন্ত্রে ধরা পড়ে। প্রতিফলিত হয়ে প্রত্যাগত এ-সব তরঙ্গ-প্রবাহের গতি-প্রকৃতি ও দিক লক্ষ্য করে প্রতিফলক এরোপ্লেনের অবস্থান নির্ধারণ করা যায়। প্রেরিত সেই বেতার-তরঙ্গের গতি-বেগ জানলে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসার সময় থেকে এরোপ্লেনের দূরত্ব হিসাব করে জানা যেতে পারে। আজকাল জাহাজেও অনেক সময় এই র‍্যাডার যন্ত্র ব্যবহৃত হয় ; মহাসমুদ্রে এর সাহায্যে বহু দূরবর্তী অদৃশ্য তীরদেশের দূরত্ব, দিক প্রভৃতি নির্ণীত হয়ে থাকে।
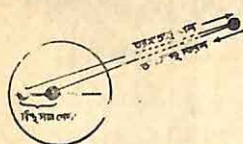
র‍্যাডারের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা

র‍্যাডিক্যাল (radical) — বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের একাধিক পরমাণু সম্মিলিতভাবে (পরমাণু-জোট) যদি কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় একক পরমাণুর মত কাজ করে, অর্থাৎ নিজে অপরিবর্তিত থেকে অপর পরমাণুর সঙ্গে মিলে যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে, তবে ওই পরমাণু-সমষ্টিকে 'র‍্যাডিক্যাল' বলা হয় ; যেমন — NO_3 হলো নাইট্রেট র‍্যাডিক্যাল ; সোডিয়াম নাইট্রেট $NaNO_3$, সিল্‌ভার নাইট্রেট $AgNO_3$, প্রভৃতির মধ্যে NO_3 র‍্যাডিক্যালটি যেন একক পরমাণুর মত বিভিন্ন ধাতুর পরমাণুর সঙ্গে মিলে বিভিন্ন সল্ট উৎপন্ন করে। কিন্তু এরূপ কোন র‍্যাডিক্যালের কোন পৃথক অস্তিত্ব থাকে না ; রাসায়নিক ক্রিয়ায় এরা মিলিতভাবে কাজ করে মাত্র। এরূপ বিভিন্ন হাইড্রোকার্বন র‍্যাডিক্যালের সঙ্গে OH র‍্যাডিক্যাল মিলিত হয়ে তৈরি হয় মিথাইল অ্যালকোহল (CH_3OH),

ইথাইলঅ্যালকোহল ↑ (C_2H_5OH) প্রভৃতি বিভিন্ন যৌগিক।

র‍্যামজে (Ramsay) স্যার উইলিয়াম —বৃটিশ পদার্থ-বিজ্ঞানী ; জন্ম 1851 খৃস্টাব্দ, মৃত্যু 1916 খৃঃ। বায়ুমণ্ডলের বিরল গ্যাস (রেয়ার গ্যাস ↑) ক্রিপ্টন, জেনন ও নিয়ন ↑ আবিষ্কারে প্রসিদ্ধি। লর্ড র‍্যালের সহযোগিতায় অন্যতম বিরল গ্যাস আর্গন ↑ আবিষ্কার। পৃথিবীর লঘুতম (হাইড্রোজেন ব্যতীত) মৌলিক গ্যাস হিলিয়াম ↑ আবিষ্কারে সবিশেষ খ্যাতি। সূর্যের অভ্যন্তরে এই হিলিয়ামের অস্তিত্ব অবশ্য বিজ্ঞানী নর্ম্যান লকার বহু পূর্বেই সূর্যের বর্ণ-মণ্ডলের বর্ণালি - বিশ্লেষণে আবিষ্কার করেছিলেন।

র‍্যালে, লর্ড (Rayleigh, Lord) — বৃটিশ পদার্থ-বিজ্ঞানী ; জন্ম 1842 খৃঃ, মৃত্যু 1919 খৃঃ। আলোক ও শব্দ বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা। র‍্যামজের সহযোগিতায় দুষ্প্রাপ্য আর্গন গ্যাস অবিষ্কার। তড়িৎ-চুম্বকীয় (ইলেক্‌ট্রোম্যাগ্নেটিক) তরঙ্গ সম্বন্ধীয় জটিল তথ্যাদি আবিষ্কারেই সবিশেষ খ্যাতি অর্জন।

র‍্যাসন্যাল নাম্বার (rational number) — যে-সব রাশির মান সুনির্দিষ্ট সংখ্যায়, বা ভগ্নাংশে প্রকাশ করা যায় ; যেমন, 3, $7\frac{1}{3}$ বা $\frac{22}{3}$, $\sqrt{16}$ ইত্যাদি। কিন্তু $\sqrt{3}$ নয় ; কারণ, এর মান অনির্দিষ্ট, কাজেই একে বলে ইর‍্যাসন্যাল নাম্বার'।

ল

লং ওয়েভ্‌স (long waves) — 1000মিটারের ↑ অধিক তরঙ্গ-দৈর্ঘের বেতার-তরঙ্গসমূহ ; (ইলেক্‌ট্রোম্যাগ্নেটিক ওয়েভ ↑)।

লং টন (long ton) — ভারী বস্তুর একটি ইংলণ্ডীয় ওজন - পরিমাপ ; 2240 পাউণ্ড ; (টন ↑)।

লং সাইট (long sight) — চক্ষুগোলকের এক প্রকার দৃষ্টিদোষ ; চিকিৎসা-বিজ্ঞানে বিশেষ নাম 'হাইপারমেট্রোপিয়া'। চোখের এরূপ ত্রুটির জন্যে নিকটবর্তী জিনিস পরিষ্কার দেখা যায় না ; বরং দূরের জিনিস ভাল দেখায়। কন্‌ভেক্স (উত্তল) লেন্সের চশমা ব্যবহারে চোখের এরূপ দৃষ্টি-দোষ সংশোধিত হয়ে থাকে।

লঙ্গিচিউড (longitude) — পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরু ভেদ করে যে বৃত্তরেখাগুলো ভূ-গোলককে বেষ্টন করে আছে বলে কল্পনা করা হয় ; তাদের বলে 'লাইন্‌স অব লঙ্গিচিউড', বাংলায় এদের বলে 'দ্রাঘিমা' রেখা। এ-গুলোকে কখন কখন আবার **মেরিডিয়ান** ↑ (meridian) লাইন্‌স-ও বলে। মানচিত্রে এরূপ বৃত্তরেখা অঙ্কিত করে ভূ-পৃষ্ঠে বিভিন্ন স্থানের পূর্ব-পশ্চিম অবস্থান-দূরত্ব নির্ণীত হয় থাকে। যে মেরিডিয়ান ↑, বা 'লঙ্গিচিউড লাইন' ইংলণ্ডের গ্রীনউইচ নামক স্থানের উপর দিয়ে গেছে বলে কল্পনা করা

লঙ্গিচিউড লাইন্‌স

হয়েছে, তাকে বলে মূল দ্রাঘিমা, **প্রাইম মেরিডিয়ান**, অর্থাৎ 0° ডিগ্রি লঙ্গিচিউড। এর পূর্বে-পশ্চিমে মোট 180° ডিগ্রির বিভিন্ন লঙ্গিচিউড লাইন কল্পিত হয়েছে। (ল্যাটি-চিউড ↑)।

লঙ্গিচিউডিন্যাল ওয়েভ (longitudinal wave) — অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ ; কোন শক্তির পরিবহনে মাধ্যম-পদার্থের কণিকাগুলোর পর্যায়ক্রমিক সংকোচন ও প্রসারণের ফলে প্রবাহ-পথের বরাবর যে-সব তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। শব্দ-তরঙ্গ এরূপ লঙ্গিচিউডিন্যাল তরঙ্গের আকারে অগ্রসর হয় ; বায়ু-কণাগুলো তরঙ্গ-প্রবাহের গতি-পথে পর্যায়ক্রমে একবার সঙ্কুচিত ও পর-মুহূর্তে সম্প্রসারিত হয়ে-হয়ে তরঙ্গ-ধারা এগিয়ে চলে। প্রকৃতপক্ষে এর জন্যে বায়ুর কোন অংশ ছুটে যায় না, কোন বস্তুর কম্পনের ফলে তার সংলগ্ন বায়ুর সংকোচন ও প্রসারণে বায়ু-সমুদ্রে উত্থিত তরঙ্গগুলো অনুদৈর্ঘ-ভাবে এগিয়ে যায় মাত্র (সাউণ্ড ↑)। আলোক, বেতার প্রভৃতির তরঙ্গ-গতি কিন্তু এরূপ লঙ্গিচিউডিন্যাল নয় ; সেগুলো হলো ট্রান্সভার্স ↑ ওয়েভ, বা তির্যক তরঙ্গ।

লগ-বুক (log-book) — কল-কার-খানা, জাহাজ প্রভৃতিতে দৈনিক কর্মবিবরণীর যে লিখিত পুস্তিকা রক্ষিত হয়।

লগারিদ্‌ম (logarithm)—গাণিতিক গুণ, ভাগ প্রভৃতির এক সহজ পদ্ধতি ; সাধারণ লগারিদ্‌মে সূচক সংখ্যায় (ইনডেক্স ↑) দশের গুণিতক প্রকাশিত হয় ; যেমন, $100 = 10^2$, সুতরাং লগ $100 = 2$; $1000 = 10^3$ কাজেই, লগ $1000 = 3$; সাধারণ-ভাবে বলা যায়, যদি $a = b^c$, তাহলে b-এর মূলে a-এর লগারিদ্‌ম হলো c ; সংক্ষেপে লেখা হয় c = লগ a ; এই পদ্ধতির বহু রকম কৌশল ও সূত্র আছে। এর বিভিন্ন মূল্যমানের তালিকা থাকে, তা থেকে সহজে অল্প সময়ে এরূপ হিসাবাদি পাওয়া যায়।

লড্যানাম (laudanum) — বিশেষ অনুপাতে অ্যালকোহল ↑ ও আফিম মিশ্রিত এক প্রকার জলীয় দ্রব ; আফিমের টিংচার ↑ ; বিষাক্ত পদার্থ।

লরেন্স (Laurence) ডাঃ আর্নেস্ট — মার্কিন পদার্থবিজ্ঞানী ; পরমাণুর গঠন সম্বন্ধীয় গবেষণায় অসামান্য কৃতিত্ব ; কৃত্রিম রেডিয়াম ↑ উৎপাদন। সাই-ক্লোট্রন ↑ যন্ত্র উদ্ভাবনের জন্যে 1939 খৃষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভ। 'অ্যাটম বম্‌' উৎপাদনের ব্যবহারিক প্রযুক্তি-বিদ্যার অন্যতম পুরোধা।

লাইজল (lysol) — এক প্রকার অ্যান্টিসেপ্টিক ↑ তরল পদার্থের ব্যব-হারিক নাম। মোটামুটি বলা যায়, পদার্থটা সাবান-জলের সঙ্গে বিশেষ অনুপাতে বিশুদ্ধ ক্রিজোল (ক্রিয়ো-জোট ↑) মিশিয়ে তৈরি হয়ে থাকে।

লাইট (light) — আলোক ; অতি-সূক্ষ্ম বিশেষ এক প্রকার তড়িৎচুম্বকীয় শক্তি - তরঙ্গের (ইলেক্ট্রোম্যাগ্নেটিক ওয়েভ ↑) প্রবাহের ফলে আলোকের সৃষ্টি হয়। এই তরঙ্গ-ধারাই হলো

আলোক-রশ্মি, যা কোন বস্তুর উপর থেকে প্রতিফলিত হয়ে বস্তুটার আকার-আকৃতি অনুযায়ী ওই প্রতিফলিত আলোক-রশ্মি এসে আমাদের চোখের লেন্সে পড়ে। এই রশ্মির প্রভাবে রেটিনা ↑ -সংলগ্ন স্নায়ুসমূহের প্রান্তদেশ উত্তেজিত হয়, এবং সেই উত্তেজনার স্পন্দন মস্তিষ্কে পরিবাহিত হয় এবং আমরা বস্তুটা দেখতে পাই। প্রকৃতপক্ষে আলোক অদৃশ্য ; প্রতিফলনের ফলে আলোকিত বস্তুই আমরা দেখি। আলোক - তরঙ্গের দৈর্ঘ্য 4×10^{-5} সেন্টিমিটার ↑ থেকে 8×10^{-5} সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। এর বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের রশ্মি চোখে বিভিন্ন বর্ণের অনুভূতি জাগায়। আলোক-তরঙ্গের ওই দৈর্ঘ্য-সীমার বেশি, বা কম দৈর্ঘ্যের (আলট্রাভায়োলেট ↑) তরঙ্গ-রশ্মি আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। মোটামুটি হিসাবে আলোক-তরঙ্গের গতি প্রতি সেকেণ্ডে 1,86,326 মাইল $=2\cdot9978\times10^{10}$ সেন্টিমিটার।

লাইট-ইয়ার (light-year) — আলোক-বর্ষ ; দূরত্বের একক বিশেষ। জ্যোতির্বিজ্ঞানে বহু কোটি - কোটি মাইল দূরবর্তী গ্রহ-নক্ষত্রাদির দূরত্ব প্রকাশের জন্যে এই একক ব্যবহৃত হয়। এক আলোক-বর্ষ দূরত্ব বললে এক বছরে আলোক-রশ্মি যতটা দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে তাই বুঝায়। আলোক প্রতি সেকেণ্ডে চলে 1,86,326 মাইল ; সুতরাং এক বছরে আলোক $186{,}326\times60\times60\times24\times365$ মাইল অতিক্রম করে ; কাজেই এক আলোক-বর্ষ = প্রায় 6×10^{12} মাইল।

লাইট্‌নিং (lightning) — মেঘের তড়িৎস্ফুরণ। নানা নৈসর্গিক কারণে উচ্চাকাশে বিভিন্ন মেঘপুঞ্জের মধ্যে তড়িৎশক্তি উৎপন্ন হয়ে থাকে। এভাবে উৎপন্ন বিভিন্ন তড়িৎ চাপ-বিশিষ্ট দু'টা মেঘখণ্ডের মধ্যে, অথবা মেঘ থেকে পৃথিবীতে তড়িৎশক্তি সঞ্চালিত হয়। এরূপ তড়িৎ সঞ্চরণের সময়ে স্ফুরিত তড়িতের দীপ্তি প্রকাশ পায়, বজ্রধ্বনি শুনা যায় ; একেই আমরা বলি বিদ্যুৎ চমকানো। মেঘ থেকে এই তড়িৎস্রোত পৃথিবীতে সঞ্চালিত হলে তাকে সাধারণ কথায় বলে বজ্রপাত।

লাইট্‌নিং কণ্ডাক্টর (lightning conductor) — লাইট্‌নিং ↑ , বা বজ্রপাতের ফলে অনেক সময় গৃহাদি বিদগ্ধ ও বিনষ্ট হয়ে থাকে। এই বিপদ নিবারণের জন্যে তড়িৎ-পরিবাহী মোটা কোন ধাতব তার, বা রড্ (সাধারণতঃ লোহার, বা তামার) বাড়ীর ছাদের সর্বোচ্চ স্থান থেকে মাটি পর্যন্ত সংযুক্ত করে রাখা হয় ; একে বলে 'লাইটনিং কণ্ডাক্টর'। এরূপ একাধিক সূক্ষ্মাগ্র 'কণ্ডাক্টর' বাড়ীর ছাদে থাকলে বাড়ীর যে অংশেই বজ্রপাত হোক না কেন, সঞ্চালিত তড়িৎস্রোত ওই ধাতব তার, বা রডের মাধ্যমে দ্রুত মাটির ভিতর পরিবাহিত হয়ে যায়, ফলে বাড়ীর কোন ক্ষতি হয় না।

লাইম (lime) — ক্যালসিয়াম অক্সাইড, CaO ; লাইম স্টোন ↑ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রস্তর ও ক্যালসিয়াম কার্বনেট-ঘটিত পদার্থ স্বল্প বায়ুতে বিশেষ ব্যবস্থায় পুড়িয়ে যে সাদা কঠিন পদার্থ পাওয়া যায়। একে বলে **কুইক্-লাইম** (quick lime) ; বাংলায় বলে 'পোড়া-চুন'। এই কুইক - লাইমের সঙ্গে জলের রাসায়নিক মিলনে হয় নরম জলীয় চূণ, যাকে বলে **শ্লেক্ড লাইম**, যার রাসায়নিক নাম ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড, $Ca(OH)_2$। এই হলো সাধারণ চূণ, যা আমরা গৃহাদির চুনকাম করতে ব্যবহার করি। কুইক-লাইমের সঙ্গে জলের রাসায়নিক মিলনে প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয়ে থাকে (এক্সোথার্মিক ↑ রিঅ্যাকশন)।

লাইম ওয়াটার (lime-water) — চূণের জল ; বস্তুতঃ পোড়া-চুনে জল দিয়ে থিতিয়ে নিলে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইডের [$Ca(OH)_2$] যে স্বচ্ছ জলীয় দ্রব পাওয়া যায়। এর সঙ্গে কার্বন-ডাইঅক্সাইড (CO_2) গ্যাসের মিলনে ক্যালসিয়াম কার্বনেট উৎপন্ন হয়। জলে অদ্রাব্য এই ক্যালসিয়াম্ কার্বনেটের উৎপত্তির ফলে পরিষ্কার 'লাইম ওয়াটার' সাদা ঘোলাটে হয়ে ওঠে। উন্মুক্ত স্থানে রাখলে বায়ুর সংস্পর্শে স্বচ্ছ 'চূণের জল' এভাবে ঘোলাটে হয়ে যায়। এ থেকে বায়ুর সঙ্গে মিশ্রিত কার্বন-ডাইঅক্সাইডের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

লাইম স্টোন (lime stone) — চুনাপাথর ; বিশেষ একপ্রকার প্রস্তর। স্বভাবজাত ক্যালসিয়াম কার্বনেট, $CaCO_3$; পৃথিবীর পাহাড়-পর্বতের মূল উপাদান প্রধানতঃ যাতে গঠিত।

লাফিং গ্যাস (laughing gas) — নাইট্রাস অক্সাইড, N_2O ; বর্ণহীন গ্যাসীয় পদার্থ, মিষ্ট গন্ধযুক্ত। গ্যাসটা নাকে গেলে হাসির উদ্রেক হয়ে থাকে ; এ-জন্যেই একে বলা হয় লাফিং গ্যাস। মৃদু অ্যানেস্থ্যাটিক ↑ শক্তির জন্যে দন্ত-চিকিৎসাদিতে কখন-কখন ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

লাম্বোগো (lumbago)—পৃষ্ঠের, বা মেরুদণ্ডের নিম্নাংশের পেশী-বেদনা ; কটি, বা কোমর-ব্যথা রোগ।

লাম্বার পাংচার (lumber puncture) — পেল্ভিসের ↑ উপরিভাগে যে পাঁচখানা হাড়ের সংযোগে মেরুদণ্ডের নিম্নভাগ গঠিত, তাদের বলে **লাম্বার** হাড় (lumber-bones, or vertebrae)। মেরুদণ্ডের ওই হাড়ের সংযোগস্থলে স্থঁচ ফুটিয়ে অভ্যন্তরস্থ রস বার করে নেওয়ার প্রক্রিয়াকে বলে 'লাম্বার পাংচার'। এই জৈব রস মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে মস্তিষ্কে চলাচল করে। ম্যানেঞ্জাইটিস্ প্রভৃতি নানা রোগের চিকিৎসায় এই মেরু-রস পরীক্ষা করে সঠিক রোগ নির্ণয় করা হয়।

লাম্বার হাড়

লাভা (lava) — আগ্নেয়গিরির (ভলক্যানো ↑) জ্বালামুখ থেকে নির্গত ধাতব পদার্থ-মিশ্রিত জলন্ত ও গলিত প্রস্তরাদি। এই গলিত পদার্থ কালক্রমে ঠাণ্ডা হয়ে জমে অনেক সময়

স্পঞ্জের মত সছিদ্র, কখন - কখন কাচের কত স্বচ্ছ স্তরে পরিণত হয়।
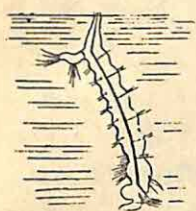
লার্ভা (larva) — মশা, মাছি, প্রজাপতি প্রভৃতি পতঙ্গের শৈশব অবস্থার দেহাবয়ব। ডিম ফুটে প্রথমে এরা যে শূক - কীটের আকার ধারণ করে। পতঙ্গের **লার্ভাল স্টেজ** (larval stage) মানে উহাদের শুক-কীট অবস্থা।

পতঙ্গের লার্ভা অবস্থা

লার্জ ক্যালোরি (large calorie) —তাপ-শক্তি (হিট ↑) পরিমাপের একক বিশেষ। এর পরিমাণ হলো এক কিলোগ্রাম - ক্যালোরি ↑, = 1000 ক্যালোরি। (ক্যালোরি ↑)।

লিউকোডোর্মা (leucoderma) — শ্বেতী, বা ধবল রোগ, যাতে গাত্রচর্ম স্থানে-স্থানে সাদা হয়ে যায়। অনেকে একে বলে শ্বেত-কুষ্ঠ; প্রকৃত পক্ষে এটা কুষ্ঠ রোগ নয়, ছোঁয়াচেও নয়।

লিউকোপিনিয়া (leucopenia) — জীবের রক্তে শ্বেত-কণিকার স্বল্পতাজনিত যে অবস্থায় মানুষ বিভিন্ন রোগের আক্রমণ প্রতিরোধের শক্তি হারায় ও সহজেই বিভিন্ন জীবাণু-রোগে আক্রান্ত হতে পারে। রক্তে শ্বেতকণিকার অতি-বৃদ্ধি রোগকে বলে **লিউকেমিয়া** (leucaemia)।

লিউকোসাইট (leucocyte) — রক্তের 'হোয়াইট কর্প্যাস্‌ল' ↑ বা শ্বেত-কণিকা; শ্বেত-রক্তকোষ; এগুলিই দেহে প্রবিষ্ট রোগ - বীজাণুদের (ব্যাক্টেরিয়া ↑) ধ্বংস করে' বিভিন্ন রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করে।

লিউয়েনহোক (Leeuwenhock), এ্যান্টনি ভ্যান—হল্যাণ্ডবাসী স্বভাব-বিজ্ঞানী; জন্ম 1632 খৃষ্টাব্দ, মৃত্যু 1723 খৃষ্টাব্দ। পুথিগত বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-বর্জিত, স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা। চশমার লেন্স ↑ দিয়ে প্রথম অণুবীক্ষণ যন্ত্র উদ্ভাবন এবং তার সাহায্যে অদৃশ্য জীবাণুজগতের আবিষ্কার। রক্তের লোহিত-কণিকা সম্পর্কীয় তথ্যাদি প্রকাশ। প্রকৃতপক্ষে জীবাণু-বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন (পাস্তুর ↑)।

লিকুইড এয়ার (liquid air)—তরল বায়ু। উপযুক্তরূপে চাপ বৃদ্ধি করে ও তাপ কমিয়ে বায়ুকে তরল অবস্থায় আনা যায়। তরল বায়ুর বর্ণ ঈষৎ নীলাভ। এর মধ্যে বায়ুর প্রধান উপাদান অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন গ্যাস দুটি একত্রে তরল অবস্থায় থাকে। অবশ্য সংগঠক অন্যান্য 'রেয়ার গ্যাস'গুলোও তরল অবস্থায় মিশ্রিত থাকে। তরল অক্সিজেনের স্ফুটনাংক − 182·9° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং তরল নাইট্রোজেনের স্ফুটনাংক −105·7° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। সুতরাং স্ফুটনাংকের এই পার্থক্যের জন্যে তরল বায়ু থেকে বিশুদ্ধ অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও রেয়ার গ্যাসগুলি ফ্রাক্‌স্যাল ডিষ্টিলেশন ↑ প্রক্রিয়ায় জটিল যান্ত্রিক ব্যবস্থায় সুকৌশলে একে - একে পৃথক করা সম্ভব হয়ে থাকে।

লিকুইফ্যাক্সন অব গ্যাসেস্ (liquifaction of gases) — গ্যাসীয় পদার্থের তরলীকরণ প্রক্রিয়া। প্রত্যেক গ্যাসেরই একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা (ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার ↑) থাকে, যার চেয়ে কম উষ্ণতায় গ্যাসটাকে কেবল মাত্র চাপ প্রয়োগেই তরল করা সম্ভব হয়। কোন গ্যাসের স্বাভাবিক উষ্ণতা এই ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচারের উপরে হলে গ্যাসটাকে প্রথমে উপযুক্ত কৌশলে ঠাণ্ডা করে ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচারের নিচে এনে তারপর চাপ বৃদ্ধি করে তাকে তরল করা যেতে পারে। গ্যাসের তাপ কমিয়ে প্রয়োজনানুযায়ী ঠাণ্ডা করবার নানা রকম যান্ত্রিক কৌশল ও প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত হয়েছে।

লিগ্‌নিয়াস (ligneous) — যে-সকল পদার্থের গঠন কাঠের মত উদ্ভিজ্জ তন্তুবিশিষ্ট। **লিগ্‌নিয়াস টিস্যু** উদ্ভিদ-কোষে গঠিত তন্তু।

লিগ্নাইট (lignite) — এক প্রকার কাল্‌চে ধূসর বর্ণের খনিজ কয়লা বিশেষ। সাধারণ খনিজ কয়লার (অ্যান্‌থ্রাসাইট্ ↑) চেয়ে এর মধ্যে হাইড্রোকার্বন ↑ উপাদানের ভাগ অনেক বেশি থাকে। সম্ভবতঃ প্রকৃত কয়লার স্তর সৃষ্টি হওয়ার অনেক কাল পরে ভূ-গর্ভে এই লিগ্নাইট কয়লার স্তর সৃষ্টি হয়েছে। লিগ্নাইট জ্বালিয়েও যথেষ্ট উত্তাপ পাওয়া যায়।

লিগামেন্ট (ligament) — সূক্ষ্ম জৈব তন্তুর গুচ্ছ, যা জীবদেহের বিভিন্ন অস্থি, পেশী প্রভৃতির সংযোগস্থল সংবদ্ধ করে রাখে; বিশেষতঃ বিভিন্ন খণ্ডাস্থির সংযোজী জৈব তন্তুর সন্ধি-বন্ধনী।
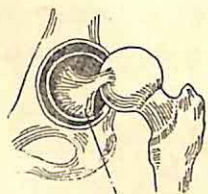
লিগামেন্ট

লিগ্নিন (lignin)—উদ্ভিদদেহের সেলুলোজ ↑ তন্তুর সংগঠক জটিল রাসায়নিক গঠনের এক প্রকার জৈব পদার্থ। সাধারণতঃ জিনিসটা সেলুলোজের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। উদ্ভিজ্জ সেলুলোজ ↑ থেকে কাগজ, রেয়ন ↑ প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্প-দ্রব্য প্রস্তুত করবার সময়ে বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে এই লিগ্নিন দূরীভূত করে সেলুলোজকে বিশুদ্ধ করে নেওয়া প্রয়োজন হয়।

লিট্‌মাস (litmus) — স্বভাবতঃ নীল রংয়ের এক প্রকার উদ্ভিজ্জ রঙ্গীন পদার্থ; জলে দ্রবণীয়। অ্যাসিডের ↑ সংস্পর্শে লিট্‌মাসের রং লাল হয়ে যায়, এবং অ্যালকালির ↑ সংস্পর্শে পুনরায় নীল হয়। এরূপ বর্ণ পরিবর্তনের জন্যে রসায়নাগারে পদার্থটা 'ইণ্ডিকেটর' হিসেবে ব্যবহৃত হয়। লিট্‌মাসের জলীয় দ্রবণে কাগজ ডুবিয়ে শুকিয়ে নিয়ে 'লিট্‌মাস-পেপার' তৈরি করা হয়; রসায়নাগারে সাধারণতঃ এই কাগজ ডুবিয়ে কোনদ্রবণের অ্যাসিড, বা অ্যালকালি ধর্ম সহজে পরীক্ষা করা হয়ে থাকে।

লিটার (litre) — মেট্রিক ↑ পদ্ধতিতে তরল পদার্থের আয়তন পরিমাপের একটা একক। 4° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায়

এবং 760 মিলিমিটার বায়ু-চাপে (ব্যারোমিটার ↑) এক কিলো-গ্রাম ↑ বিশুদ্ধ জলের আয়তনকে বলা হয় এক লিটার। সাধারণতঃ 1000 সি. সি. (ঘন-সেন্টিমিটার ↑) এক লিটারের সমান ধরা হয় ; বস্তুতঃ এক লিটার = 1000·027 সি. সি.। লিটারের 1000 ভাগের এক ভাগকে বলে 'মিলিলিটার'।

লিডেন জার (Leyden jar) — স্থির (স্ট্যাটিক ↑) তড়িৎ-শক্তির সঞ্চয় ও সংরক্ষণের জন্যে উদ্ভাবিত যন্ত্র বিশেষ। একে এক রকম কণ্ডেন্সার ↑ বলা যায়। যন্ত্রটা হলো মুখ্যতঃ একটা কাঁচ পাত্র, যার নিম্নাংশের ভিতর ও বহির্ভাগ পাত্‌লা সীসার পাতে মোড়া। পাত্রটার মুখে কোন তড়িৎ-প্রতিরোধক পদার্থে তৈরী ঢাকনার ছিদ্রপথে পিতলের একটা দণ্ড পাত্রের মধ্যে বিলম্বিত থাকে। ওই দণ্ডের নিম্নপ্রান্তে সংলগ্ন ধাতব শিকল ঝুলে ভিতরের সীসার পাতে লেগে যায়। ওই ধাতব দণ্ডের মাধ্যমে তড়িৎশক্তি প্রবাহিত করলে তা যন্ত্রের অভ্যন্তরে সঞ্চিত হয়ে থাকে। তড়িৎ-শক্তির বিভিন্ন প্রয়োজনের সময়ে ওই দণ্ড ও বহিস্থ সীসার পাত ধাতব তারের দ্বারা প্রায়-সংযুক্ত করলে ওই সংযোগ-মুখের স্বল্প ব্যবধানের মধ্যে সেই তড়িৎ-শক্তি আবার বিমুক্ত হয়। এরূপে সঞ্চিত স্থির-তড়িৎ তীব্র স্ফুরণের (স্পার্ক) আকারে নির্গত হয়ে থাকে।
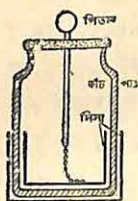
লিডেন জার

লিথ-, লিথো- (lith-, litho-) — প্রস্তর, বা প্রস্তর সম্পর্কীয় ; যেমন, **হাইড্রোলিথ** ↑, হলো হাইড্রোজেন-উৎপাদক প্রস্তরসদৃশ পদার্থ ; যেমন, ক্যালসিয়াম হাইড্রাইড, CaH_2, যাতে জল দিলে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়ে থাকে। **লিথোগ্রাফি** ↑, **লিথোস্ফিয়ার** ↑।

লিথার্জ (litharge) — লেড মনোক্সাইড, PbO, যৌগিকের বিশেষ নাম। লাল আভাযুক্ত হলদে স্ফটিকাকার পদার্থ। পেইন্ট, ভার্নিস প্রভৃতির রং তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে কাঁচ-শিল্পেও পদার্থটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

···**লিথিক** (···lithic)—প্রস্তর-সংশ্লিষ্ট; যেমন, '**প্যালিওলিথিক ↑ এজ**' (palaeolithic age) আদি প্রস্তরযুগ ; নিওলিথিক ↑, নব্য প্রস্তরযুগ।

লিথিয়াম (lithium)—মৌলিক ধাতু ; সাংকেতিক চিহ্ন Li ; পারমাণবিক ওজন 6·94, পারমাণবিক সংখ্যা 3 ; রূপোর মত সাদা ও অত্যন্ত হাল্‌কা ধাতু। সোডিয়ামের ↑ অনুরূপ রাসায়নিক ধর্ম-বিশিষ্ট। নানা রকম হাল্‌কা সংকর-ধাতু তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। মৌলিক ধাতুগুলোর মধ্যে লিথিয়াম সব চেয়ে হাল্‌কা। **লিথিয়া** হলো 'লিথিয়াম মনক্সাইড'।

লিথোপোন (lithopone) — জিঙ্ক সালফাইড (ZnS) ও বেরিয়াম সাল্‌ফেটের ($BaSO_4$) সংমিশ্রণে তৈরী

এক রকম সাদা পদার্থ। সাদা রং তৈরি করবার জন্যে হোয়াইট লেডের। পরিবর্তে পদার্থটা অনেক সময় ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

লিথোগ্রাফি (lithography)—প্রস্তর ফলকের উপরে অঙ্কিত চিত্র থেকে কাগজে চিত্র-মুদ্রণের এক প্রকার কৌশল। এজন্যে লাইম স্টোনে। তৈরী মসৃণ ফলকের উপরে তৈলাক্ত কালি দিয়ে ছবি, বা নক্সা আঁকা হয়, পরে বিশেষ এক কৌশলে মুদ্রণ-যন্ত্রের সাহায্যে কাগজের উপর ওই ছবির ছাপ তোলা হয়। এই ব্যবস্থায় একাধিক বর্ণের ছবিও মুদ্রিত হয়ে থাকে। এরূপ মুদ্রণকে **লিথোপ্রিন্টিং**-ও কখন-কখন বলা হয়।

লিথোস্ফিয়ার (lithosphere) — পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগের প্রস্তরময় স্তর। ভূ-গোলকের উপরিভাগের মৃত্তিকা-স্তরের নিচে বহু মাইল গভীর যে গোলাকার কঠিন শিলা-স্তর গঠিত হয়ে রয়েছে।

লিনিয়ার (linear) — দৈর্ঘিক, বা লম্বালম্বি ; যেমন, **লিনিয়ার এক্সপ্যান্সন**—দৈর্ঘিক বৃদ্ধি ; উত্তাপ, বা টানের ফলে পদার্থের লম্বায় বেড়ে-যাওয়া।

লিব্‌নিজ (Leibnitz), গট্‌ফ্রাইড উইলহেল্‌ম — জার্মান গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক ; জন্ম 1646 খৃঃ, মৃত্যু 1716 খৃস্টাব্দ। গণিতের ডিফারেন্সিয়্যাল ও ইন্টিগ্র্যাল ক্যাল্‌কুলাস পদ্ধতির আবিষ্কারক। দার্শনিক হিসাবে বিশ্ব-প্রকৃতির শৃঙ্খলা ব্যাখ্যা এবং সর্বাবস্থায় প্রাকৃতিক বিধিব্যবস্থা সবই কল্যাণকর বলে এক মতবাদ প্রচার।

লিবিগ্‌ কণ্ডেন্সার (Leibig condencer)—যে যন্ত্রের সাহায্যে ডিস্টিলেশন। প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন বাষ্পীয়
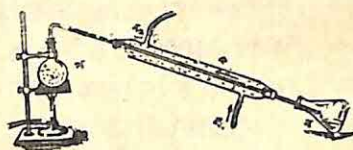
লিবিগ্‌ কণ্ডেন্সার

পদার্থকে সঙ্গে-সঙ্গে পুনরায় তরল পদার্থে রূপান্তরিত করা যায়। সাধারণ লিবিগ কণ্ডেন্সারে একটা সরু কাঁচ-নলের বহিরাবরণ-স্বরূপ আর একটা মোটা কাঁচনল সংযুক্ত থাকে। উত্তাপের ফলে আবদ্ধ পাত্রের মুখ থেকে বাষ্পীয় ডিস্টিলেট-পদার্থ বেরিয়ে ওই সরু কাঁচনলের ভিতর দিয়ে নির্গত হয়। নির্গমণের সময়ে বাইরের নলের মধ্যে প্রবাহিত ঠাণ্ডা জল-প্রবাহের শীতলতার সংস্পর্শে ওই বাষ্প পুনরায় তরল পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে নির্গম-নলের মুখে রক্ষিত পাত্রে সঞ্চিত হয়ে থাকে।

লিভার (lever) — এক রকম সরল যন্ত্র বিশেষ। কোন স্থির সূক্ষ্মাগ্র বস্তুর উপরে শয়ানভাবে একটা দণ্ড স্থাপন করলে দণ্ডটা ওই স্থির অবস্থানের দু'দিকে ঢেঁকি-কলের মত সহজে ওঠা-নামা করতে পারে। এরূপ দণ্ডকে বলে লিভার ; আর ওই স্থির সূক্ষ্মাগ্র অবস্থানকে বলে লিভারের **ফাল্‌ক্রাম**। ফাল্‌ক্রামের উপর দণ্ডটা উপযুক্ত স্থানে স্থাপন
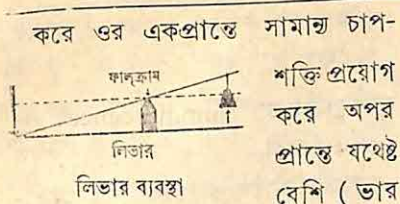
করে ওর একপ্রান্তে সামান্য চাপ-শক্তি প্রয়োগ করে অপর প্রান্তে যথেষ্ট বেশি (ভার উত্তোলন প্রভৃতি) কাজ পাওয়া যায়। একেই বলা হয় লিভারের **মেকানিক্যাল এড্‌ভান্টেজ**, বা যন্ত্রিক সুবিধা। লিভারের এই যান্ত্রিক সুবিধার পরিমাণ নির্ভর করে দু'দিকের বিপরীত শক্তির প্রয়োগ-রেখার উপরে ফাল্‌ক্রাম থেকে অঙ্কিত লম্বদ্বয়ের দৈর্ঘ্যের উপর। এরূপ লিভার ব্যবস্থার সাহায্যেই ক্রেন-যন্ত্রে ভারী মালপত্র সহজেউত্তোলনের 'যান্ত্রিক সুবিধা' পাওয়া যায়।

ফাল্‌ক্রাম
লিভার

লিভার ব্যবস্থা

লিভার (lever) —যকৃৎ, প্রাণিদেহের বৃহত্তম গ্রন্থি (গ্ল্যাণ্ড), যা দেহের ডান দিকে উদরের ঊর্ধভাগে থাকে এবং খাদ্যের পুষ্টি-রস সারা দেহে সরবরাহ ও বিপাকীয় ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

লিভার অব সাল্‌ফার (lever of sulplur) —' পটাসিয়াম কার্বনেট (K_2CO_3) ও গন্ধক মিশিয়ে উত্তপ্ত করলে যে রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন হয়। পদার্থটা প্রধানতঃ পটাসিয়াম-সাল্‌ফাইড ও বিক্রিয়ার পরে অবশিষ্ট গন্ধকের সংমিশ্রণ মাত্র। উদ্ভিদের পক্ষে অনিষ্টকর পোকা - মাকড় ও ছত্রাক প্রভৃতি বিনষ্ট করবার জন্যে অনেক সময় এটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

লিম্‌প (lymph) — লসিকা ; দেহস্থ বর্ণহীন ও স্বচ্ছ জৈব রস। এরূপ রসে রক্ত-কণিকা সমূহ ভাসমান থাকে। বিভিন্ন শ্রেণীর এরূপ জৈব রস-নিঃসারী গ্ল্যাণ্ড। দেহের নানাস্থানে আছে।

লিমোনাইট(limonite)—একপ্রকার লৌহ-ঘটিত খনিজ পদার্থ। হল্‌দে রং-এর (হাইড্রেটেড।) ফেরিক অক্সাইড, Fe_2O_3। ম্যাগ্নেটাইট। ও হ্যামেটাইট। নামক লৌহ-আকরিক পদার্থের রূপান্তরের ফলে এর সৃষ্টি হয়। সাধারণতঃ লৌহখনি অঞ্চলের জলমগ্ন স্থানে লিমোনাইট খনিজ প্রচুর পাওয়া যায়।

লিষ্টার, লর্ড (Lister, Lord) — বৃটিশ শস্ত্র-চিকিৎসক ; জন্ম 1827 খৃঃ, মৃত্যু 1912 খৃঃ। জীব-দেহের ক্ষত বিষাক্ত হওয়ার জীবাণুঘটিত কারণ আবিষ্কার। জীবাণু - প্রতিরোধক বিভিন্ন ঔষধ প্রয়োগ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দ্বারা ক্ষতে জীবাণুর সংক্রমণ রোধের উপায় উদ্ভাবন। সার্থক ও নিরাপদ শস্ত্র-চিকিৎসার প্রবর্তক। আধুনিক উন্নত ধরনের শস্ত্রচিকিৎসা-পদ্ধতির জনক বলে খ্যাত ও চিরস্মরণীয়।

লুটিন (lutein) — ডিমের মধ্যবর্তী 'কুসুম' অংশের হলুদবর্ণের জৈব রঞ্জক পদার্থ ; নিষিক্ত ডিমের এই হল্‌দে কুসুমাংশের কেন্দ্রীণে ডিম্বাণু (ওভা।, ova) থাকে, যা ভ্রূণে পরিণত হয়। **লুট** (lut) মানে হলুদ বর্ণ।

লুনার (lunar) — চন্দ্র সম্বন্ধীয় ; যেমন, **লুনার ইক্লিপ্‌স** হলো চন্দ্র-গ্রহণ। **লুনেট** (lunate) মানে চন্দ্রাকার, অর্থাৎ পূর্ণ চন্দ্রের মত গোলাকৃতি।

লুনার কস্টিক (lunar caustic) — সিল্‌ভার নাইট্রেটের। ($AgNO_3$) বিশেষ নাম; এক রকম সাদা স্ফটিকাকার কঠিন পদার্থ। আলোক-রশ্মি প্রবেশ করতে পারে না, এমন অন্ধকার আধারের মধ্যে দ্রবীভূত করে পদার্থটাকে সাধারণতঃ দণ্ডের আকারে ছাঁচে ঢালাই করা হয়। সামান্য আলোকের সংস্পর্শেও কালো হয়ে যায় বলে মোটা কালো কাগজে মুড়ে এই দণ্ডগুলো বাজারে বিক্রয় হয়। একটা উৎকৃষ্ট আলোক-সুগ্রাহী পদার্থ হিসাবে এটা সাধারণতঃ ফটো-গ্রাফির। প্লেট, বা কাগজ তৈরির কাজেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

লুনার ইক্লিপ্‌স (lunar eclipse)—ইক্লিপ্স, লুনার।।

লুমিনাস পেইণ্ট (luminous paint) — ক্যালসিয়াম-সালফাইড প্রভৃতি বিভিন্ন ফস্‌ফোরেসেণ্ট। পদার্থ মিশ্রিত এক শ্রেণীর রং। এরূপ পেইণ্ট-মাখানো বস্তু অন্ধকারে উজ্জ্বল দেখায়। দিনে সূর্যালোক শুষে নিয়ে ওই সব পেইণ্টে মিশ্রিত ফস্‌ফোরে-সেণ্ট।, বা অনুপ্রভ পদার্থই রাত্রির অন্ধকারে আবার সেই শোষিত আলোক বিকিরণ করে থাকে। মূল্য-বান ঘড়ির ডায়েল অনেক সময় এরূপ পদার্থের পেইণ্ট দিয়ে অঙ্কিত থাকে, যাতে অন্ধকারেও সময় দেখা যায়। (ফস্‌ফোরেসেন্স।)

লুমিনসিটি (luminosity) — আলোকের ঔজ্জ্বল্য; কোন আলো-কের উৎস থেকে বিকিরিত আলোক-রশ্মির এই ঔজ্জ্বল্য 'লুমেন'। এককে পরিমাপ করা হয়।

লুমিনেসেন্স (luminescence) — প্রতিপ্রভতা, বা প্রতিপ্রভা; কোন পদার্থের আলোক বিকিরণের স্বাভা-বিক ধর্ম। অতি উচ্চ তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে সব পদার্থ থেকেই অবশ্য আলোক ও উত্তাপ বিকিরিত হয়ে থাকে; কিন্তু উত্তাপ ব্যতিরেকেই স্বভাবতঃ কোন-কোন পদার্থে যে আলোক বিকিরণের ধর্ম লক্ষিত হয়ে থাকে। পদার্থের ফস্‌ফোরেসেন্স। ও ফ্লোরেসেন্স। ধর্ম-বিশিষ্ট পদার্থকেই সাধারণভাবে বলা হয় লুমিনেসেণ্ট, অর্থাৎ প্রতিপ্রভ পদার্থ।

লুমিন্যাল (luminal)—বার্বিটুরেট। শ্রেণীর একটি বিশেষ রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহারিক নাম; স্নায়ুর উত্তেজনা নিবারক ও নিদ্রাদায়ক এক প্রকার ঔষধ।

লুমেন (lumen) — কোন আলোক-উৎস থেকে বিকিরিত আলোক-রশ্মির ঔজ্জ্বল্য পরিমাপের একক। এক ক্যাণ্ডেলা। পরিমাণের আলোক-বিশিষ্ট উৎস থেকে এক সেণ্টিমিটার। দূরবর্তী এক বর্গ সেণ্টিমিটার আয়-তনের স্থানে এক সেকেণ্ডে যে পরিমাণ আলোকপাত হয়, তার ঔজ্জ্বল্যকে বলে এক 'লুমেন'। সাধারণতঃ এই এককে আলোকের ঔজ্জ্বল্য মেপেই আলোকপাতের মোট পরিমাণ স্থির করা হয়ে থাকে।

লুসাইট (lucite) — পারপ্লেক্স (par-plex)।।

লুসিফেরিন (luciferin) — জোনাকি প্রভৃতি কোন-কোন প্রাণীর দেহাভ্যন্তরস্থ যে জৈব পদার্থ আলোক বিকিরণ করে এবং অন্ধকারে জ্বলতে দেখা যায়। কোন-কোন সামুদ্রিক প্রাণীর দেহেও এরূপ জৈব পদার্থ থাকে। এদের বলে **'লুসিফেরাস'** জীব। **লুসিফ-** (lucif-) মানে আলোক-উৎপাদক।

লেংথ (length) — দৈর্ঘ্য। দৈর্ঘ্য, বা দূরত্ব পরিমাপের ইংলণ্ডীয় একক :

10 লাইন্‌স = 1 ইঞ্চি = 2·54 সেন্টিমিটার
12 ইঞ্চি = 1 ফুট
3 ফুট = 1 ইয়ার্ড, বা গজ
= ·9144 মিটার
22 ইয়ার্ড = 1 চেইন
10 চেইন = 1 ফার্লং
= 201·17 মিটার
8 ফার্লং = 1 মাইল
= 1609·3 মিটার

মেট্রিক সিস্টেমে দৈর্ঘ্যের কয়েকটি একক হলো :

10 মিলিমিটার = 1 সেন্টিমিটার
= ·3937 ইঞ্চি
100 সেন্টিমিটার = 1 মিটার
= 1·0936 গজ
1000 মিটার = 1 কিলোমিটার
= ·62137 মাইল

লেক্‌ল্যান্স সেল (Leclanche cell) —তড়িৎ-উৎপাদক একটি যন্ত্র বিশেষ; এক রকম বিশেষ গঠনের প্রাইমারি সেল ↑। এর মধ্যে কার্বনের ↑ একটা দণ্ডকে ধন-তড়িদ্বার (পজিটিভ ইলেক্ট্রোড ↑) করা হয়। ওই কার্বন-দণ্ডের চারিদিকে থাকে ম্যাঙ্গানিজ-ডাইঅক্সাইড ও কার্বন গুঁড়ার সংমিশ্রিত পদার্থ। এ-সব একটা সছিদ্র পোর্সিলেন ↑ পাত্রের মধ্যে রক্ষিত হয়। এই পাত্রটা জিঙ্কে ↑ তৈরি অপর একটা বৃহত্তর পাত্রের মধ্যে বসিয়ে দুই পাত্রের মাঝে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের ↑ (NH_4Cl) ঘন জলীয় দ্রব দেওয়া হয় ইলেক্‌ট্রোলাইট ↑ হিসেবে। জিঙ্কের পাত্রটা ঋণ-তড়িদ্বারের (নেগেটিভ ইলেক্‌ট্রোড) কাজ করে। তড়িৎ-পরিবাহী তার দিয়ে এখন ভিতরের কার্বন-দণ্ড ও বাইরের

ল্যাক্‌ল্যান্স ড্রাই সেল
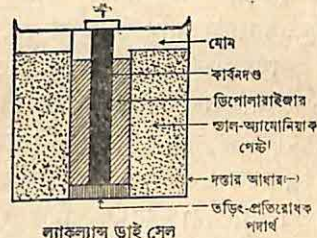
জিঙ্ক-পাত্র সংযোগ করে দিলে জিঙ্ক এবং অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন তড়িৎ-শক্তি ওই তারের মাধ্যমে প্রবাহিত হতে থাকে। ম্যাঙ্গানিজ-ডাইঅক্সাইড (MnO_2) ডি পো লা রা ই জা র ↑ হিসেবে কাজ করে। এভাবে উৎপন্ন তড়িৎ-শক্তি ধাতব তারের সার্কিটের ↑ মাধ্যমে প্রবাহিত করে নিয়ে বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়। আবার, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের জলীয় দ্রবের পরিবর্তে তার এক রকম আঠালো পেস্ট ব্যবহার করে ড্রাই-সেল ↑ তৈরি করা হয়। এরূপ ড্রাই

(লেক্ল্যান্স) সেল সাধারণ টর্চ বাতিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

লেগুমিনাস প্ল্যাণ্ট (leguminous plant) — শিম, মটর, চিনাবাদাম প্রভৃতি যে-সব উদ্ভিদের শিকড়ে ছোট-ছোট গুঁটি জন্মায়; যাদের মধ্যে 'রেডিসিকোলা' নামক আণুবীক্ষণিক জীবাণুরা বাসা বাঁধে ও মাটির রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট বায়ুর নাইট্রোজেনকে নাইট্রেট লবণে রূপান্তরিত করে জমি উর্বর করে তোলে। এ-সকল উদ্ভিদের বীজাধারকে (শস্য-খোলাকে) বলা হয় **লেগিউম** (legume)।

লেড (lead) — সীসা। মৌলিক ধাতু; ল্যাটিন নাম **প্লাম্বাম** থেকে এর সাংকেতিক চিহ্ন করা হয়েছে Pb। পারমাণবিক ওজন 207·21; পারমাণবিক সংখ্যা 82; নীলাভ-সাদা, নরম ও অপেক্ষাকৃত ভারী একটি ধাতু। গ্যালেনা ↑ নামক খনিজ লেড সালফাইড (PbS) রিভার্বেরেটরি ফার্নেসে ↑ উত্তপ্ত করে ধাতব সীসা নিষ্কাশিত করা হয়ে থাকে। সীসার যৌগিক পদার্থগুলো সবই বিষাক্ত; এর কোন-কোন যৌগ সাধারণতঃ পেইণ্ট তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয় (রেড লেড ↑)। প্রধানতঃ জলের পাইপ, ছাপার টাইপ প্রভৃতি তৈরী করতে সীসা যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

লেড অ্যাসিটেট (lead acetate) — সীসা ও অ্যাসিটিক অ্যাসিডের ↑ বিশেষ রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন $[(CH_3COO)_2Pb.3H_2O]$ সণ্ট; সাদা স্ফটিকাকার পদার্থ। জলে দ্রবণীয়, কিছু মিষ্ট স্বাদযুক্ত, কিন্তু বিষাক্ত। পদার্থটা সাধারণতঃ 'সুগার অব লেড' ↑ নামে পরিচিত।

লেড অ্যাকুমুলেটর (lead accumulator) — অ্যাকুমুলেটর ↑।

লেড চেম্বার প্রোসেস (lead chamber process) — সীসক-প্রকোষ্ঠ পদ্ধতি; ব্যবহারিক প্রয়োজনে প্রচুর পরিমাণে সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4) প্রস্তুত করবার একটা শিল্প-পদ্ধতি। সীসার তৈরী প্রকাণ্ড চেম্বারের (প্রকোষ্ঠ) মধ্যে এই প্রণালীতে অ্যাসিডটা তৈরি হয়। এর প্রস্তুত-প্রণালী হলো মোটামুটি এইরূপ ঃ সাল্‌ফার (গন্ধক) পুড়িয়ে উৎপন্ন সাল্‌ফার ডাই-অক্সাইডের (SO_2) ধূম ওই লেড চেম্বারের মধ্যে নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড (NO_2) গ্যাসের সঙ্গে মিশ্রিত করা হয়। উত্তাপের সাহায্যে কোন নাইট্রেট সণ্টকে 'ডিকম্পোজ' করিয়ে ওই 'নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড' গ্যাস উৎপাদিত হয়। রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে এ থেকে নাইট্রিক অক্সাইড (NO) ও সাল্‌ফার ট্রাইঅক্সাইড (SO_3) উৎপন্ন হয়ে থাকে। চেম্বারের অভ্যন্তরস্থ বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে মিলিত হয়ে এই নাইট্রিক অক্সাইড পুনরায় নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড গ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। এদিকে সাল্‌ফার ট্রাই-অক্সাইড (SO_3) গ্যাস প্রকোষ্ঠের তলদেশে রক্ষিত জলের সঙ্গে রাসায়-

নিক মিলনে সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। এই পদ্ধতিতে প্রস্তুত সালফিউরিক অ্যাসিডের (H_2SO_4) অবিশুদ্ধ জলীয় দ্রবকে বলা হয় **কমার্শিয়াল সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড**। অতঃপর বিভিন্ন উপায়ে একে বিশুদ্ধ ও প্রয়োজনানুরূপ নির্জল করে নেওয়া হয়।

লেড মনক্সাইড (lead monoxide) — লিথার্জ ↑।

লেড, হোয়াইট (lead, white) (অথবা, **রেড**)—'হোয়াইট লেড' ↑, 'রেড লেড' ↑।

লেড গ্লাস (lead glass) — যে কাচে (গ্লাস ↑) লেড অক্সাইড (লিথার্জ ↑) কিছু মিশ্রিত থাকে; রঙিন কাচ।

লেন্টিকল (lenticle) — মধ্যভাগ উপর-নীচে মোটা, অর্থাৎ উভ-উত্তল (bi-convex) লন্সের ↑ আকার-বিশিষ্ট বস্তু; বিশেষণে **লেন্টিকুলার** (lenticular)।

লেন্টিসেল (lenticel) — উদ্ভিদের মূল ও কচি কাণ্ডের বহিস্ত্বকে শ্বাস-ক্রিয়ার জন্য অতি সূক্ষ্ম যে-সব ছিদ্র থাকে; পত্রের **স্টোমা** (stoma) ↑ ছাড়াও এ-সব ছিদ্রপথে উদ্ভিদেরা শ্বসন-ক্রিয়া চালায়।

লেন্স (lens) — বিশেষ আকৃতি-বিশিষ্ট যে স্বচ্ছ পদার্থখণ্ডের মধ্য দিয়ে আলোক-রশ্মি পরিচালিত হলে রশ্মি-গুলো প্রতিসরিত হয়ে এক বিন্দুতে সংহত, অথবা তা থেকে বিক্ষিপ্ত হয়। লেন্স হয় সাধারণতঃ কাঁচের তৈরি; যার এক পৃষ্ঠ, অথবা উভয় পৃষ্ঠই বক্রতল-বিশিষ্ট হয়ে থাকে। যে লেন্সের মধ্যভাগ চার ধার অপেক্ষা মোটা, অর্থাৎ উপরিভাগ উত্তল, তাকে বলে **কন‌ভেক্স** (convex) ↑ লেন্স;

কন্‌ভেক্স লেন্স

আর, যে লেন্সের মধ্যভাগ পাত্‌লা, অর্থাৎ উপরটা অবতল তাকে বলে **কন্‌কেভ** (concave) ↑ লেন্স।

কন্‌কেভ্‌ লেন্স

আলোক-রশ্মি কন্‌ভেক্স লেন্সের ভিতর দিয়ে প্রতিসরিত হ'য়ে এক বিন্দুতে সংহত, অর্থাৎ মিলিত হয়; আর, কন্‌কেভ লেন্সের ভিতর দিয়ে প্রতি-সরিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। কন্‌ভেক্স লেন্সে প্রতিসরিত আলোক-রশ্মির ওই মিলন-বিন্দুকে লেন্সের **ফোকাস** (focus) ↑ বলে। লেন্সের মধ্যবিন্দু, অর্থাৎ কেন্দ্র থেকে ফোকাসের দূরত্বকে বলে **ফোক্যাল লেংথ**। টেলি-স্কোপ ↑ -মাইক্রোস্কোপ ↑, ক্যামেরা ↑ প্রভৃতি আলোক-রশ্মি সম্পর্কীয় বিভিন্ন যন্ত্রে এ-সব লেন্স ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

লেনিটিভ (lenitive) — বিশেষ উগ্র নয়, এমন অল্পক্রিয়াশীল ঔষধ; যেমন, জোলাপ জাতীয় ঔষধ হিসেবে অলিভ অয়েল হলো লেনিটিভ; কিন্তু ক্যাষ্টর অয়েল লেনিটিভ নয়।

লেপ্রোসি (leprosy) —কুষ্ঠ ব্যাধি। মাংসপেশী ও স্নায়ুর জীবাণু-ঘটিত রোগ; যাতে দেহের স্থানে স্থানে প্রথমে সাদা দাগ ধরে ও স্থানীয়ভাবে অনুভূতিহীন অসাড় হয়ে যায়; ক্রমে স্নায়ুর ক্রিয়া সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে সে-সব জায়গা পচে দুরারোগ্য ক্ষত হয়,

যাকে বলে গলিত কুষ্ঠ। আবার শুষ্ক কুষ্ঠে স্থানে-স্থানে চামড়া মোটা ও অসাড় হয়ে চাকা-চাকা হয়ে ওঠে। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলেই দুরারোগ্য কুষ্ঠ রোগের প্রকোপ বেশি।

লেব্ল্যাঙ্ক, নিকোলাস (Leblanche, Nicholas)—প্রখ্যাত ফরাসী রসায়নবিজ্ঞানী ; জন্ম 1742 খৃঃ, মৃত্যু 1806 খৃঃ। সাধারণ খাদ্য-লবণ থেকে সোডা তৈরির রাসায়নিক পদ্ধতি উদ্ভাবনেই সবিশেষ খ্যাতি। পরে অবশ্য এই 'লেব্ল্যাঙ্ক সোডা প্রোসেস' ↑ পরিত্যক্ত, এবং অধিকতর সুবিধাজনক 'সল্‌ভে প্রোসেস' ↑ প্রচলিত। ফরাসী বিপ্লবের সময়ে লেব্ল্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠিত সোডার কারখানা বাজেয়াপ্ত হয় ; এবং তিনি অভাব-অনটন ও হতাশায় আত্মহত্যা করেন।

লেব্ল্যাঙ্ক প্রোসেস (Leblanche process) — সোডিয়াম কার্বনেট, Na_2CO_3, প্রস্তুত করবার একটা পুরাতন প্রণালী। একে আবার 'সল্ট কেক্ প্রোসেস'ও বলা হয়। এই প্রণালীতে সাধারণ খাদ্য-লবণ (সোডিয়াম ক্লোরাইড, NaCl) ও সালফিউরিক অ্যাসিড একত্রে উত্তপ্ত করে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে সোডিয়াম সালফেট, (Na_2SO_4) তৈরি হয়। একে সাধারণতঃ বলে **সল্ট-কেক** (salt-cake)। পরে কয়লা ও লাইমস্টোনের ↑ সঙ্গে এই সল্ট-কেক্ উত্তপ্ত করে পাওয়া যায় অবিশুদ্ধ সোদক স্ফটিকাকার সোডিয়াম কার্বনেট, $Na_2CO_3 . 10H_2O$, যাকে বলে 'ওয়াসিং সোডা' ↑।

লেভেল (level) — অনুভূম, বা সমতল ; **স্পিরিট লেভেল** — কোন স্থানের অনুভূম সমতলতা পরীক্ষার

স্পিরিট লেভেল
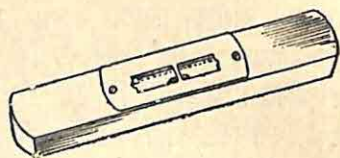
জন্যে ব্যবহৃত যন্ত্র বিশেষ। যন্ত্রের কাচনলে আবদ্ধ স্পিরিটের ↑ মধ্যে সামান্য বাতাসের একটা বুদ্‌বুদ্ রাখা হয়, সমতল স্থানে রাখলে বুদ্‌বুদ্‌টা নলের ঠিক কেন্দ্রস্থলে আসে, অন্যথায় এদিক-ওদিক হয়।

লেভুলোজ (levulose) — ফ্রুট সুগার ↑, ফল-শর্করা ; এর জলীয় দ্রবণে সমান্তরিত, অর্থাৎ একদেশী (পোলারাইজ্‌ড ↑) আলোক - রশ্মি বাঁ-দিকে বেঁকে যায় ; এ-জন্যে একে কখন - কখন **লিভোলোজ**-ও বলা হয়। **লিভোরোটেটরি** (levo - rotatory) কথাটার মানে 'বামে ঘূর্ণনক্ষম'।

লেসিথিন (lecithin) — এক শ্রেণীর জটিল জৈব রাসায়নিক পদার্থ। রাসায়নিক হিসেবে পদার্থটা হলো প্রায় জান্তব ফ্যাট্ ↑, বা চর্বির অনুরূপ। উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর দেহকোষে ও ডিমের হল্‌দে অংশে যথেষ্ট লেসিথিন থাকে ; জীবজন্তুর স্নায়ু ও মস্তিষ্ক থেকেও পাওয়া যায়। লেসিথিনের প্রধান উপাদান হলো নাইট্রোজেন ও ফস্‌ফরাস ↑ ; এর মধ্যে সামান্য পরিমাণে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনও থাকে। পুষ্টিকর উপাদান

হিসেবে বিভিন্ন টনিক ঔষধে লেসিথিন ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

লোকাস (locus) — কোন গতিশীল বস্তু, বা বিন্দুর সঞ্চরণ-পথ। কোন নির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী কোন বিন্দু সঞ্চালিত হলে ওই বিন্দুর বিভিন্ন অবস্থানের সংযোগকারী রেখাকে বলে ওই বিন্দুর লোকাস। বৃত্তের পরিধি হলো কেন্দ্রের সমদূরবর্তী বিন্দুর এরূপ গতি-পথ, অর্থাৎ লোকাস।

লো টেন্‌শন (low tension)—অত্যল্প তড়িৎ-চাপ, অর্থাৎ স্বল্প ভোল্ট ↑ -বিশিষ্ট তড়িৎ-প্রবাহ ; বেতার (রেডিও ↑) যন্ত্রের ভাল্‌বের ↑ ফিলামেণ্টে যেমন মাত্র 6-ভোল্টের তড়িৎ-চাপ থাকে।

লোড্‌স্টোন (lode-stone)—চৌম্বক-শক্তি-বিশিষ্ট প্রাকৃতিক লৌহ-খনিজ। ম্যাগ্নেটাইট ↑ প্রভৃতি স্বভাবজাত কতকগুলো অবিশুদ্ধ খনিজ আয়রন-অক্সাইডের (Fe_3O_4) মধ্যে স্বাভাবিক চৌম্বক - শক্তি লক্ষিত হয়, অর্থাৎ সেগুলি সাধারণ লোহাকে আকর্ষণ করে। চৌম্বক-শক্তির পরিচয় মানুষ এরূপ প্রাকৃতিক লোড্‌স্টোন থেকেই প্রথম পায়। এজন্যে এক সময়ে সব রকম চুম্বক, অর্থাৎ ম্যাগ্নেট ↑ -কেই লোড্‌স্টোন বলা হতো।

লোড-লাইন (load-line)—মিঠা, বা লোনা জলে ভাসমান জাহাজের খোলের গায়ে, যতটা মাল বোঝাই করলে জাহাজটি নিরাপদ থাকবে তার নিরাপত্তা-নির্দেশক জল-রেখা।

লোড (load)—পরিবহন-চক্রে তড়িৎ-শক্তির চাপ ; **লোড-সেডিং** (load-shedding), তড়িতের সঞ্চয়, বা উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় কম থাকলে সরবরাহ হ্রাস, বা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার ব্যবস্থা।

ল্যাক (lac) — লাক্ষা ; কক্কাস-লাক্কা জাতীয় স্ত্রী-লাক্ষাকীটের দেহনিঃসৃত আঠালো রস। এই কীট-অধ্যুষিত গাছের ডালে ওই রস শুকিয়ে লেগে থাকে, একে তখন বলা হয় স্টিক-ল্যাক। বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সাহায্যে এ থেকে চমৎকার লাল রং ও **সেল্যাক** (shellac) ↑ নামক রজন জাতীয় পদার্থ পাওয়া যায়। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে ও অন্যান্য শিল্পে এই সেল্যাক প্রচুর ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ল্যাকার (lacquer) — কাচের মত স্বচ্ছ তরল পদার্থ, যার অতি সূক্ষ্ম আস্তরণ লাগিয়ে বিভিন্ন জিনিসের ঔজ্জ্বল্য দীর্ঘস্থায়ী করা যায়। সোডিয়াম সিলিকেট ↑, স্যালুলয়েড ↑ প্রভৃতি স্বচ্ছ পদার্থের এরূপ ল্যাকার দিয়ে রঙীন পুতুল, পিতলের জিনিস-পত্র প্রভৃতি অনেক দিন চক্‌চকে উজ্জ্বল রাখবার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

ল্যাকাস্ট্রিন (lacustrine) — হ্রদ সম্বন্ধীয় ; যেমন — **ল্যাকাস্ট্রিন ডিপোজিট** মানে নদী-নালা দিয়ে বাহিত হয়ে এসে হ্রদে পতিত যে কর্দমাদি জমে তার তলদেশ কালক্রমে কঠিন প্রস্তরে পরিণত হয়েছে।

ল্যাক্‌টিক অ্যাসিড (lactic acid) —একটা জৈব অ্যাসিড, $CH_3CH(OH)COOH$; বর্ণহীন স্ফটিকাকার

পদার্থ। টকে যাওয়া দুধে অ্যাসিডটা পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর ব্যাক্‌টিরিয়ার ↑ প্রভাবে টকে-যাওয়ার সময়ে দুধের উপাদান ল্যাক্টোজ ↑ নামক শর্করা ল্যাক্‌টিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়ে যায়। ল্যাক্‌টিক অ্যাসিডের সাধারণতঃ দু' রকম 'স্টিরিয়ো আইসোমেরিক' ↑ রূপ হয়ে থাকে ; এদের রাসায়নিক গুণ ও ধর্মের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায়।

ল্যাক্টোজ (lactose)—জান্তব শর্করা ; সব রকম প্রাণীর দুগ্ধে পাওয়া যায়, এজন্যে একে **মিল্ক-সুগার**-ও বলে। সাধারণ উদ্ভিজ্জ শর্করা, বা চিনির মত এরও রাসায়নিক গঠন $C_{12}H_{22}O_{11}$; স্ফটিকাকার কঠিন পদার্থ, জলে দ্রবণীয়, মিষ্টত্ব অতি কম। হাইড্রোলিসিস ↑ প্রক্রিয়ায় এই 'ল্যাক্টোজ' শর্করা গ্লুকোজ ↑ ও গ্যাল্যাক্টোজ ↑ নামক বিশেষ শর্করায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। আবার, বিশেষ এক শ্রেণীর ব্যাক্‌টিরিয়ার ↑ প্রভাবে দুধের এই ল্যাক্টোজ শর্করা-উপাদান ল্যাক্‌টিক অ্যাসিডে ↑ রূপান্তরিত হয়ে থাকে।

ল্যাক্রিম্যাল গ্ল্যাণ্ড (lachrymal gland)—অশ্রু-গ্রন্থি ; চোখের বহিঃস্থ কোণের উপরদিকে অবস্থিত এই গ্রন্থি উত্তেজিত হলে লবণাক্ত জল নিঃসৃত হয়। হর্ষ, বা বিষাদ প্রভৃতি মানসিক উত্তেজনায় উৎপন্ন সেই জলই ভিতরের সূক্ষ্ম নলপথে অশ্রুরূপে চোখে আসে। অবশ্য স্বাভাবিক অবস্থাতেও এই গ্ল্যাণ্ড ↑, বা গ্রন্থিটি থেকে সর্বদাই অল্প-অল্প জল নিঃসৃত হয়ে চক্ষু-গোলক আর্দ্র রাখে।

ল্যাক্রিম্যাল গ্ল্যাণ্ড

ল্যাকোলাইট (laccolite) — ভূ-গর্ভে কোথাও গলিত প্রস্তরাদি সবেগে উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে তার উপরের কোন কঠিন শিলা-স্তরে বাধা পেলে সেই শিলা-স্তর বেঁকে ফুলে ওঠে। মাটির নীচে এভাবে উৎপন্ন উত্তল প্রস্তর-স্তরকে বলে ল্যাকোলাইট, বা **ল্যাকোলিথ**।

ল্যাকোলাইট স্তর

ল্যাক্ট্‌- (lact-) — দুধ। **ল্যাক্টেশন** হলো দুগ্ধের উৎপত্তি, বা দুগ্ধ নিঃসরিত হওয়া। **ল্যাক্‌টিল্‌স**—দুগ্ধবৎ লসিকা (লিম্প ↑) - নিঃসারী জৈব গ্রন্থিসমূহ ; স্ত্রী-প্রাণীদের দেহেই এই বিশেষ গ্রন্থিগুলি থাকে। অন্ত্রের সূক্ষ্ম প্রাচীর পর্দা (মেম্‌ব্রেন ↑) ভেদ করে স্নেহ-পদার্থের (ফ্যাট ↑) অতি সূক্ষ্ম কণিকাসমূহ গিয়ে থোর্যাক্স ↑ -স্থিত লসিকা-আধারের (স্তনের) নলগুচ্ছে সঞ্চিত হয়, আর এভাবেই স্তনে দুগ্ধের উৎপত্তি হয়ে থাকে। (ল্যাক্‌টিক অ্যাসিড ↑, ল্যাক্টোস ↑)

ল্যাক্টোমিটার (lactometer) — দুধের স্বাভাবিক প্রমাণ ঘনত্বের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে তার বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করবার জন্যে উদ্ভাবিত যন্ত্র বিশেষ। এ দিয়ে বস্তুতঃ দুধের স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি ↑ মাপা হয়; দুধে জল

মিশ্রিত থাকলে তার স্পেসিফিক গ্রাভিটি স্বাভাবিকের চেয়ে কমে যায় এবং তার তুলনা থেকে দুধের ভেজাল ধরা পড়ে।

ল্যাক্টোমিটার

ল্যাটিচিউড (লাইন্‌স অব) (latitude, lines of) — ভৌগোলিক অক্ষরেখা। সু-মেরু ও কু-মেরু থেকে সম-দূরবর্তীভাবে যে কাল্পনিক বৃত্তরেখা পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে বলে মনে করা হয়, তাকে বলে নিরক্ষরেখা, বা বিষুব-বৃত্ত (ইকোয়েটর ↑), অর্থাৎ O° ডিগ্রি অক্ষরেখা। এই নিরক্ষ-রেখার সমান্তরালভাবে উত্তর ও দক্ষিণে অঙ্কিত কাল্পনিক বৃত্তগুলোকে বলা হয় অক্ষরেখা, বা **প্যারালাল্‌স অব ল্যাটিচিউড** (parallels of latitude)। ভূ-পৃষ্ঠে বিভিন্ন স্থানের অবস্থান নির্দিষ্ট করবার জন্যে মানচিত্রে এরূপ ল্যাটিচিউড (এবং লঙ্গিচিউড ↑) রেখাসমূহ অঙ্কন করা হয়। ওই বিষুবরেখা, বা নিরক্ষ বৃত্তের উত্তরে ও দক্ষিণে এক থেকে 90 পর্যন্ত ডিগ্রি চিহ্নিত অক্ষরেখা কল্পিত হয়েছে। এই হিসেবে পৃথিবীর সু-মেরু প্রান্তকে সাধারণতঃ 90°-উত্তর এবং কু-মেরুকে 90°-দক্ষিণ অক্ষাংশ ধরা হয়ে থাকে।
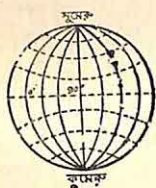
ল্যাটিচিউড লাইন্‌স

ল্যাটেণ্ট হিট (latent heat) — হিট্, ল্যাটেণ্ট ↑ ।

ল্যাটেণ্ট ইমেজ (latent image)— ফটোগ্রাফিতে ফিল্মের ↑ উপরে প্রথমে যে অদৃশ্য প্রতিচ্ছবি ওঠে, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ডেভেলপ ↑ করে পরিস্ফুট না করা পর্যন্ত যে প্রতিচ্ছবি অদৃশ্য অবস্থায় থাকে। **ল্যাটেণ্ট** মানে যা আপাত-অদৃশ্য, অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় আছে, এমন। (ল্যাটেণ্ট হিট ↑)।

ল্যাটেক্স (latex) — দুধের মত সাদা উদ্ভিজ্জ রস ; কোন - কোন উদ্ভিদ-কাণ্ডের ত্বক কাটলে, বা চিরে দিলে যে সাদা ও ঘন রস নির্গত হয়। এরূপ বিশেষ এক জাতীয় গাছের ঘনীভূত জৈব রস, বা ল্যাটেক্স হলো রাবার ↑ ।

ল্যান্থানাম্ (lanthanum)—মৌলিক ধাতব পদার্থ ; সাংকেতিক চিহ্ন La ; পারমাণবিক ওজন 138·92, পারমাণবিক সংখ্যা 57 ; অন্যতম একটি 'রেয়ার আর্থ' ↑ ধাতু।

ল্যানোলিন (lanolin) — বিভিন্ন জীব-জন্তুর বিশেষতঃ ভেড়ার লোম, বা পশম থেকে মোমের মত যে এক রকম চর্বিজাতীয় তৈলাক্ত পদার্থ পাওয়া যায়। পদার্থটা **উল্-ফ্যাট** ↑ নামেও পরিচিত। নানারকম জটিল গঠনের রাসায়নিক জৈব উপাদানে এই ল্যানোলিন গঠিত। মানুষের গাত্র-চর্মে পদার্থটা অতি দ্রুত শুষে যায় ; এজন্যে বিভিন্ন মলম ও প্রসাধন দ্রব্যে ল্যানোলিন ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ল্যাপারোটমি (laparotomy) — উদর; বা পেট চিরে আভ্যন্তরীণ যান্ত্রিক গোলযোগ সম্বন্ধীয় রোগের

প্রত্যক্ষ কারণ নিরূপণের জন্যে যে অস্ত্রোপচার, বা শস্ত্র-চিকিৎসা করা হয়।

ল্যাপ্লাস, পিরি সাইমন (Laplace, Pirre Simon)—ফরাসী গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ ; জন্ম 1749 খৃঃ, মৃত্যু 1827 খৃষ্টাব্দ। গণিতে অপূর্ব প্রতিভা; মাত্র 20 বছর বয়সে 'ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস' সম্বন্ধে উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধ প্রকাশ। ল্যাপ্লাস 'ডিফারেন্সিয়াল ইকোয়েশন' নামক বিশেষ এক গাণিতিক সমীকরণের আবিষ্কর্তা। জ্যোতির্বিজ্ঞানে বহু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের জন্যে বিশ্ব-বিশ্রুত খ্যাতি। নিহারিকা সম্বন্ধীয় মতবাদ প্রবর্তন, বৃহস্পতি ও শনি গ্রহের তথ্যাদি নির্ধারণ, চাঁদের বিভিন্ন গতি-প্রকৃতি এবং জোয়ার-ভাঁটা প্রভৃতির বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও কারণ নির্ণয়ে বিশেষ অবদান।

ল্যাবিরিন্থ (labyrinth)—আক্ষরিক অর্থে 'বহু শাখা-প্রশাখায় জড়ানো জটিল গঠন'। বিশেষতঃ বুঝায়, কানের অভ্যন্তরভাগে ভাঁজে-ভাঁজে জড়ানো বিভিন্ন নলপথে-গঠিত শ্রবণ-যন্ত্র। বায়ুর শব্দ - তরঙ্গের প্রভাবে

কানের অভ্যন্তরস্থ ল্যাবিরিন্থ

কানের পর্দা কম্পিত হয়, আর সেই কম্পনের বায়ু-তরঙ্গ কানের অভ্যন্তরস্থ এই ল্যাবিরিন্থ অংশের তিনটি অর্ধ-গোলাকার নল - পথে বাহিত হয়ে শব্দের উৎসের অবস্থান ও দিক নির্ধারণের অনুভূতি জাগায়; এর মধ্যবর্তী শঙ্খাকৃতি নলের মধ্যে থাকে মূল শ্রবণ-যন্ত্র, যার সঙ্গে সংলগ্ন বিশেষ-বিশেষ স্নায়ু-পথে তরঙ্গ - স্পন্দনের উত্তেজনা মস্তিষ্কে গিয়ে শ্রবণের বোধ জন্মায়।

ল্যাভয়সিয়ার(Lavoisier) অ্যান্টোইন লরেন্ট — ফরাসী রসায়নবিদ্ ; জন্ম 1743 খৃঃ, মৃত্যু 1794 খৃষ্টাব্দ। সরকারী চাকুরীর অবসর সময়ে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার গবেষণা। বায়ুর অক্সিজেন উপাদানের প্রকৃত স্বরূপ নির্ধারণ এবং ফ্লোজিস্টন ↑ মতবাদ মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দহন-ক্রিয়ার রাসায়নিক তথ্য আবিষ্কারে চিরস্মরণীয়। জলের রাসায়নিক গঠনের তথ্য বিশ্লেষণ, আবহ-তত্ত্ব ও কৃষি-বিজ্ঞান বিষয়ক বহু গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক গবেষণা। ফরাসী গণ-বিপ্লবের কালে বিপ্লবী সরকারের বিচারে অকারণে নিহত।

ল্যাম্প ব্ল্যাক (lamp-black) — ভূষা কালি ; তেলের বাতি জ্বালালে উপরের ঢাকনায় যে কালি জমে। তেলের অসম্পূর্ণ দহনের ফলে তার হাইড্রোকার্বন ↑ উপাদান বিশ্লিষ্ট হয়ে এর উৎপত্তি ঘটে। রাসায়নিক হিসেবে জিনিসটা হলো বিশুদ্ধ এক শ্রেণীর অ্যালোট্রোপিক ↑ কার্বন, বা কয়লা মাত্র।

ল্যাম্ব, (Lamb) ডাঃ ডব্লু, ই — মার্কিন পদার্থ-বিজ্ঞানী ; জন্ম 1913 খৃষ্টাব্দ। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ে

অধ্যাপনা ; পদার্থের পারমাণবিক গঠন সংক্রান্ত অতি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা। ডাঃ পলিকার্প কুশের ↑ সঙ্গে যুগ্মভাবে 1955 খৃস্টাব্দে পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ।

ল্যামার্কিজ্‌ম (Lamarckism) — জীবের অভিব্যক্তি-বাদে (ইভোলিউশন ↑) ফরাসী বিজ্ঞানী ল্যামার্কের প্রবর্তিত বংশগতি (হেরিডিটি ↑) সম্বন্ধীয় মতবাদ ; উদ্ভিদ, বা প্রাণীর দৈহিক বৈশিষ্ট্যগত বিবর্তন পুরুষানুক্রমিক ধারায় ক্রমিক পর্যায়ে অতি মন্থর জৈবিক রূপান্তরের ফল-সম্পর্কিত ল্যামার্কের মতবাদ।

ল্যাম্বার্ট (lambert) — আলোকের উজ্জ্বলতা পরিমাপের একক বিশেষ। যে-সব মসৃণ প্রতিফলক-তল থেকে আলোক-রশ্মি সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়, তার উজ্জ্বলতা, বা দীপ্তির পরিমাণ নির্ধারণ করবার জন্যেই বিশেষভাবে এই 'ল্যাম্বার্ট' একক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এরূপ কোন তলের ঔজ্জ্বল্য এক 'ল্যাম্বার্ট' হবে যদি এক ক্যাণ্ডেলা ↑ পরিমাণের আলোকপাতে সেই তলের এক বর্গ সেন্টিমিটার পরিমিত স্থান থেকে এক লুমেন ↑ আলোক প্রতিফলিত হয়।

ল্যামিনা (lamina) — উদ্ভিদের পত্র-ফলক ; কোন পদার্থের পাত্‌লা স্তর, বা পর্দা। 'ল্যামিনেটেড' অর্থে পাত্‌লা পর্দার মত সিটে পরিণত করা কোন পদার্থ বুঝায়, যেমন — 'ল্যামিনেটেড ষ্টিল' বললে ইস্পাতের বিশেষ পাত্‌লা সিট বুঝায় ; ল্যামিনেটেড প্ল্যাস্টিক ↑ মানে কাগজের মত পাত্‌লা প্ল্যাস্টিকের পাত্‌।

ল্যারিংস (larynx) — শ্বাস-নলের ঊর্ধ্বভাগের প্রায় দু'ইঞ্চি পরিমাণ অংশ ; এটা একটা হাড়ের খাঁচার মত, যার মধ্যে আমাদের বাক্‌-যন্ত্র অবস্থিত। হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগা, বা অন্য কোন কারণে শ্বাস-নলের এই ল্যারিংস অংশের স্ফীতি, বা প্রদাহ-জনিত রোগকে বলা হয় **ল্যারিঞ্জাইটিস**, (laryngitis), যাতে লোকের স্বরভঙ্গ হয়।
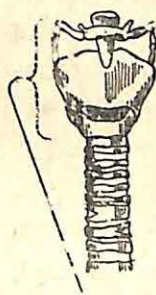
ল্যারিংস

ল্যাসার (Laser)—এক প্রকার প্রচণ্ড শক্তিশালী, সুসংহত (coherent) ও সমান্তরালে প্রক্ষিপ্ত আলোক-রশ্মিগুচ্ছ উৎপাদনে সক্ষম একটি সাম্প্রতিক আবিষ্কৃত যন্ত্র বিশেষ ; আর এরূপ রশ্মিকে বলা হয় ল্যাসার-রশ্মি (laser-ray)। ল্যাসার কথাটি ইংরেজী 'Light amplification by stimulated emission of radiation' শব্দগুলির আদ্যক্ষর নিয়ে গঠিত। ল্যাসার-রশ্মি উৎপাদনের জটিল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও যান্ত্রিক ব্যবস্থাদির সংক্ষেপে সামান্যতম ব্যাখ্যাও এখানে করা সম্ভব নয়। গত 1960 খৃষ্টাব্দে আমেরিকার প্রখ্যাত পদার্থ-বিজ্ঞানী ডঃ মেইম্যান (Dr. Meiman) কৃত্রিম চুনির (ruby, রুবি ; অ্যালুমিনিয়াম-ক্রোমিয়াম-অক্সাইড) তৈরী একটি

ক্ষুদ্র দণ্ডকে ফ্ল্যাশ-ল্যাম্পের (flash-lamp) সুতীব্র আলোক-রশ্মি সম্পাতে প্রদীপ্ত করে তার পারমাণবিক গঠনে বপর্যয় ঘটান এবং তা থেকে বিমুক্ত তেজঃবিকিরণকে যান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংহত ও সমান্তরালে প্রক্ষিপ্ত করে ল্যাসার-রশ্মি সৃষ্টি করেন। ল্যাসার-রশ্মির দ্বারা শত্রুর বিমান ধ্বংস, দূর-বর্তী ঘাঁটি বিধ্বস্ত করা, প্রভৃতি ধ্বংসাত্মক কাজও যেমন করা যায়, তেমনই ইদানিং রক্তপাতহীন সূক্ষ্ম অস্ত্রোপচার (bloodless surgery), ধাতু-বিগলন (ওয়েল্ডিং ↑) ও ছিদ্র-করণ, ক্যান্সার রোগ-দুষ্ট দেহ-কোষ-সমূহের বিনাশ সাধন প্রভৃতি বহুবিধ কল্যাণকর কাজও সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। ল্যাসার আধুনিক বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর অবদান।

ল্যাসারেশন (laceration)—দেহের কোন অংশের চামড়া ছড়ে গিয়ে যে এব্ড়ো-থেব্ড়ো ক্ষত হয়, পরিষ্কার কাটার ক্ষত নয়।

স

সডি, ফ্রেডারিক (Soddy, Frederic) — বৃটিশ পদার্থ-বিজ্ঞানী ; জন্ম 1877 খৃষ্টাব্দে। অধ্যাপক রাদার-ফোর্ডের ↑ অধীনে পরমাণু-বিজ্ঞানের বিশেষ গবেষণা ; পদার্থের তেজ-স্ক্রিয়তা (রেডিওঅ্যাক্টিভিটি ↑) ও আইসোটোপ ↑ সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্যাদি আবিষ্কার। 1921 খৃষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভ।

সফ্ট আয়রন (soft iron)—বিশুদ্ধ নরম কাঁচা লোহা ; যে লোহার মধ্যে কার্বন, বা অন্য কোন পদার্থ প্রায় থাকে না। উপযুক্ত পরিমাণে কার্বন মিশ্রিত করলে এরূপ লোহা কঠিন ষ্টিলে ↑ পরিণত হয়। এই সফ্ট আয়রন, বা কাঁচা লোহায় চৌম্বক শক্তি ষ্টিলের মত স্থায়ী হয় না ; চৌম্বক ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিলে এর মধ্যে পূর্ব-সঞ্জাত চৌম্বক ধর্ম প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে সম্পূর্ণ লোপ পায়। সফ্ট আয়রনে অস্ত্র-শস্ত্র, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি তৈরি হয় না ; হলেও তা তীক্ষ্ণধার হয় না এবং সহজেই ক্ষয়ে যায়। এ-লোহা তড়িচ্চুম্বক, আর্মেচার ↑ প্রভৃতি কোন-কোন বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশে ব্যবহৃত হয় মাত্র।

সফ্ট ওয়াটার (soft water)—মৃদু জল ; যে জলে সাবান গুললে সঙ্গে সঙ্গে ফেনা হয়, এবং অল্প সাবানেই বস্ত্রাদি ভাল পরিষ্কৃত হয়ে থাকে। জলে ক্যালসিয়াম ↑, ম্যাগ্নেসিয়াম ↑, আয়রন প্রভৃতি ধাতুর কোন সল্ট ↑ দ্রবীভূত থাকলে সেরূপ জলে সাবানের সঙ্গে ওই সব সল্টের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন অদ্রাব্য পদার্থ জন্মায় ; সাবানে ভাল ফেনা ওঠে না, যথেষ্ট সাবানেও কাপড়-চোপড় তেমন পরিষ্কার হয় না। এরূপ ধাতব সল্ট মিশ্রিত জলকে বলে **হার্ড-ওয়াটার** (hard water) ↑, বাংলায় বলে 'খর জল'। উল্লিখিত কোন রকম ধাতব সল্ট-বর্জিত মোটামুটি বিশুদ্ধ জলকে বলে 'সফ্ট ওয়াটার'।

সফ্ট সোপ (soft soap)—বিভিন্ন ফ্যাটি অ্যাসিডের ↑ পটাসিয়াম সল্টকে

বলে 'সফ্ট সোপ'। চর্বি ও উদ্ভিজ্জ তেলের সঙ্গে কস্টিক পটাসের ↑ রাসায়নিক মিলনে এ-জাতীয় নরম সাবান তৈরি হয়ে থাকে। ফ্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম সল্ট হলো সাধারণ শক্ত সোপ ↑, যে সাবান আমরা সাধারণতঃ ব্যবহার করি। (স্যাপোনিফিকেশন ↑)।

সর্ট সাইট (short sight)—চোখের বিশেষ এক প্রকার দৃষ্টি-দোষ রোগ ; মাইয়োপিয়া ↑।

সর্ট সার্কিট (short circuit) — তড়িৎ-চক্রের যে ত্রুটির ফলে প্রয়োজনানুরূপ পথে তড়িৎস্রোত প্রবাহিত না হয়ে হ্রস্বতম, অর্থাৎ, অপেক্ষাকৃত বাধামুক্ত পথে প্রবাহিত হয়ে যায়। প্রদত্ত চিত্রে তড়িৎ-উৎস যেন একটা ব্যাটারি ↑, বা জেনারেটর ↑। এর ইলেক্ট্রোড ↑ দু'টা তড়িৎ-পরিবাহী তারের দ্বারা সংযুক্ত করে একটা তড়িৎচক্রের (সার্কিট ↑) পূর্ণ - বর্তনী করা হয়েছে ; যার মাধ্যমে তড়িৎস্রোত প্রবাহিত হয়ে বাতি জ্বলছে। এখন ওই চক্রের পজিটিভ ও নেগেটিভ প্রান্তে ক ও প বিন্দুদ্বয় সহসা কোন কারণে যদি সংযুক্ত হয়ে পড়ে, (বা কোন তড়িৎ-পরিবাহী তারে যুক্ত হয়) তবে তড়িৎস্রোত হ্রস্বতম ক-প পথে প্রবাহিত হবে, পূর্বের চক্র-পথে আর যাবে না ; ফলে বাতিও আর জ্বলবে না। এরূপ অবস্থাকে বলে সর্ট সার্কিট ; তড়িৎ-স্রোত ক ও প বিন্দুতে 'সর্ট-সার্কিটেড', অথবা 'সর্টেড' হয়েছে, এরূপ বলা হয়।
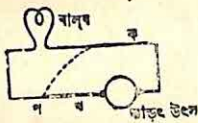
বাল্ব ক প খ তড়িৎ উৎস

সর্ট-সার্কিট

সল (sol) — যে-কোন কোলয়ড্যাল সল্যুসন ; (কোলয়েড ↑)।

সল্ট, (salt) (কেমিক্যাল)— রাসায়নিক লবণ ; অ্যাসিড ↑ ও বেসের ↑ রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন যে-কোন যৌগিক পদার্থ। কোন বেসের ধাতব পরমাণু (অথবা ধাতব প্রকৃতি-বিশিষ্ট কোন র‍্যাডিক্যাল ↑) কোন অ্যাসিডের হাইড্রোজেন - পরমাণুর বিচ্যুতি ঘটিয়ে তার স্থান অধিকার করার ফলে যে যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি হয় ; যেমন—সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4) ও সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড, (NaOH) মিলে উৎপন্ন হয় সোডিয়াম সালফেট (Na_2SO_4) সল্ট। এরূপ পটাসিয়াম ক্লোরাইড (KCl), ক্যালসিয়াম কার্বনেট ($CaCO_3$) ইত্যাদি এক-একটা কেমিক্যাল সল্ট।

সল্ট, কমন (salt, common) — সাধারণ খাদ্য-লবণকে বলে 'কমন সল্ট' ; যার রাসায়নিক নাম হলো সোডিয়াম - ক্লোরাইড (NaCl)। সোডিয়াম ও ক্লোরিনের রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন সল্ট ; যে লবণ আমরা খাই। (রক্-সল্ট ↑)

সল্ট কেক (salt-cake) — অবিশুদ্ধ পিণ্ডবৎ সোডিয়াম সাল্ফেট সল্ট, $Na_2SO_4.10\ H_2O$; সোডা ↑, বা সোডিয়াম কার্বনেট তৈরির বিশেষ এক পদ্ধতির প্রথম পর্যায়ে যে জমাট-বাঁধা স্ফটিকাকার পদার্থ পাওয়া যায়। (লেব্ল্যাঙ্ক প্রোসেস ↑)।

সল্ট পিটার (salt-petre) — যাকে সাধারণতঃ বলে নাইটার ↑ ; রাসায়নিক নাম পটাসিয়াম নাইট্রেট ↑, (KNO_3)। বাংলায় একে বলা হয় 'সোরা'। বিভিন্ন বাজি-বারুদ প্রভৃতি বিস্ফোরক পদার্থ তৈরি করবার জন্যে ব্যবহৃত হয়। আবার 'চিলি সল্ট-পিটার' ↑ হলো সোডিয়াম নাইট্রেট ($NaNO_3$) ; এটাও একটা তীব্র বিস্ফোরক পদার্থ।

সল্ট অব লেমন (salt of lemon) —পটাসিয়াম কোয়াড্রক্সালেট, $KH_3 C_4O_8.2H_2O$, নামক রাসায়নিক পদার্থের বিশেষ নাম। এক প্রকার সাদা স্ফটিকাকার বিষাক্ত পদার্থ, জলে বিশেষ দ্রবণীয়। বিরঞ্জক পদার্থ হিসেবে এর জলীয় দ্রব দিয়ে রাসায়নিক ক্রিয়ায় জামা-কাপড়ের কালির দাগ সহজে তোলা যেতে পারে।

সল্ডার (solder) — ধাতব পদার্থের বিভিন্ন অংশ পরস্পর জোড়া লাগাবার জন্যে ব্যবহৃত নিম্ন-গলনাংকবিশিষ্ট বিশেষ-বিশেষ সংকর-ধাতু ; যা অল্প তাপে সহজে গলে গিয়ে ধাতব জোড়ামুখে লেগে জুড়ে যায়। একে বাংলায় বলে 'রাং ঝাল'। সাধারণতঃ সীসা ও টিন বিভিন্ন অনুপাতে মিশিয়ে **'সফ্‌ট সল্ডার'** তৈরি হয়। আর এক রকম সল্ডার তামা ও দস্তা মিশিয়ে তৈরি হয়ে থাকে, যাকে বলে **'ব্রেজিং সল্ডার'**। ধাতব পদার্থ এভাবে জোড়া লাগাবার বিশেষ প্রক্রিয়াকে বলে **সল্ডারিং**।

সলিউট (solute) — দ্রাব্য পদার্থ। সাধারণতঃ যে তরল পদার্থের মধ্যে অপর কোন কঠিন, তরল, বা গ্যাসীয় পদার্থ দ্রবীভূত হয়ে সল্যুসনের ↑ সৃষ্টি করে তাকে বলে **সলভেন্ট,** অর্থাৎ দ্রাবক পদার্থ ; আর ওই দ্রবীভূত পদার্থকে বলে **সলিউট,** বাংলায় বলে দ্রাব্য পদার্থ, বা দ্রাব। চিনির রসে জল সল্‌ভেন্ট, বা দ্রাবক, চিনি সলিউট, অর্থাৎ দ্রাব, আর ওই রস হলো সল্যুসন, অর্থাৎ চিনির জলীয় দ্রব, বা দ্রবণ।

সলিউশন (solution) — (i) দ্রব, বা দ্রবণ ; কোন তরলে কোন গ্যাসীয়, বা কঠিন পদার্থ অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলিত হয়ে যে তরল মিশ্র পদার্থ উৎপন্ন হয় ; যেমন — নুন-জল। (সলিউট ↑)। (ii) সমাধান ; গাণিতিক কোন সমীকরণের (ইকোয়েশন ↑) অনির্দিষ্ট রাশির মান নির্ধারণ।

সলিড অ্যাঙ্গেল (solid angle) — সাধারণ জ্যামিতিক কোণ, অর্থাৎ অ্যাঙ্গেল হলো রৈখিক, বা সামতলিক কোণ ; যা ডিগ্রিতে পরিমিত হয়। পক্ষান্তরে, কলার মোচার আকৃতি-বিশিষ্ট কোন জিনিসের সূক্ষ্ম দিকটা কাটলে 'সলিড অ্যাঙ্গেল' অর্থাৎ 'নিরেট, বা আয়তনিক কোণ' সৃষ্টি হয়ে থাকে (চিত্র ↑)। এরূপ ক্ষেত্রে আয়তনিক কোণটির পরিমাপের একক হলো এমন একটা 'সলিড কোণ,' যার
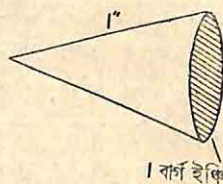
সলিড অ্যাঙ্গেল

কৌণিক ব্যাসার্ধ (রেডিয়াস ↑), অর্থাৎ কোণটির গভীরতা হবে এক ইঞ্চি এবং সমতলে কর্তিত বৃত্তাকার মুখের আয়তন হবে এক বর্গ-ইঞ্চি।

সলিড স্টেট (solid state)—পদার্থের কঠিন অবস্থা ; যে অবস্থায় পদার্থের সংগঠক অণুগুলো তাদের পারস্পরিক আকর্ষণের ফলে দৃঢ়-সংবদ্ধ হয়ে তার আকার - আয়তন নির্দিষ্ট রাখে। তাপ, চাপ প্রভৃতি বাইরের কোন শক্তির প্রয়োগ ব্যতীত কঠিন পদার্থের আকারের কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে না। যদিও তরল ও বায়বীয় অবস্থার মত কঠিন অবস্থায়ও পদার্থের অণু-গুলো নিয়ত স্পন্দিত হচ্ছে। তবে কঠিন পদার্থে এই আণবিক স্পন্দন স্থিরাবস্থার দু'দিকে অতি সামান্য সীমার মধ্যে নিবদ্ধ থেকে যথোপযুক্ত আন্তঃআণবিক আকর্ষণের (inter molecular attraction) ফলে অণু-গুলো পরস্পর পরস্পরকে ছেড়ে যেতে পারে না। এ-জন্যেই কঠিন পদার্থের নির্দিষ্ট আকার অপরিবর্তিত থাকে। কঠিন পদার্থের আণবিক গঠন সম্বন্ধে উল্লিখিত যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে (চেঞ্জ অব স্টেট ↑)।

সলিড সল্যুসন (solid solution)—বিভিন্ন কঠিন পদার্থের একীভূত সংমিশ্রণ। বিভিন্ন ধাতুর সংমিশ্রণে যে-সব সংকর-ধাতু (alloy) উৎপন্ন হয় তাদের বলা যায় ওই ধাতুগুলোর 'সলিড সল্যুসন'। অবশ্য, তরল পদার্থের মধ্যে কঠিন পদার্থের দ্রবণ, অর্থাৎ একীভূত সংমিশ্রণকেই সাধা-রণতঃ সল্যুসন ↑ বলা হয়।

সলিডিফাইং পয়েণ্ট (solidifying point) — স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডলীয় চাপে কোন তরল পদার্থ যে নির্দিষ্ট উষ্ণতায় (টেম্পারেচার ↑) জমে গিয়ে কঠিন অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। তরল পদার্থ সবটা জমে সম্পূর্ণরূপে কঠিনা-কার না হওয়া পর্যন্ত এর ওই উষ্ণ-তার, অর্থাৎ 'সলিডিফাইং পয়েণ্টের' কোন পরিবর্তন ঘটে না, একই থেকে যায়। একই বায়বীয় চাপে যে-কোন বিশুদ্ধ তরল পদার্থের এরূপ 'সলিডি-ফাইং পয়েণ্ট', অর্থাৎ 'কঠিনীভবন উষ্ণতা' সর্বদা সুনির্দিষ্ট থাকে (মেল্টিং পয়েণ্ট ↑)।

সলিনয়েড (solenoid) — কোন গোলাকার দণ্ডের গায়ে ধাতব তার জড়ালে যেরূপ দীর্ঘায়ত তারকুণ্ডলী তৈরি হয়। ওই তারের মাধ্যমে তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত করলে ওই তার-কুণ্ডলীটাকে বলা হয় সলিনয়েড। কুণ্ডলীটার অভ্যন্তরে ও বাহিরে লম্বা-লম্বিভাবে একটা চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এর ফলে কোন লৌহদণ্ড ওই তার-কুণ্ডলীর মধ্যে প্রবিষ্ট করে রাখলে সেটাও চৌম্বক-শক্তি সম্পন্ন হয়ে ওঠে এবং দণ্ডাকার একটি উৎকৃষ্ট তড়িচ্চুম্বকের (electromagnet) কাজ করে।
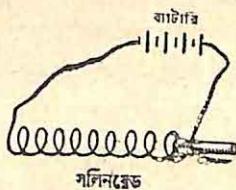
সলিস্টিস্ (solistice)—পৃথিবী সূর্যের চারদিকে একটা ডিম্বাকার কক্ষপথে প্রতি বছরে একবার পরিভ্রমণ করে ;

এর ফলে পৃথিবীতে ঋতু পরিবর্তন ঘটে। এভাবে সম্বৎসরে পৃথিবী সূর্য থেকে দু'বার সবচেয়ে দূরবর্তী হয়।
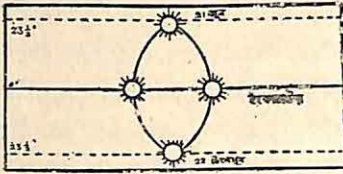
পৃথিবীর 'সলিষ্টিস' অবস্থান

পৃথিবীর এই দুই অবস্থানের দু'টি দিনকে বলা হয় সলিস্টিস্, বা 'অয়নান্ত দিন'; 21 জুনকে বলা হয় উত্তর অয়নান্ত দিন, অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে সূর্যের উত্তরায়ন পথের শেষ দিন (**সামার সলিস্টিস্** ↑); আর 22 ডিসেম্বর হলো 'দক্ষিণ অয়নান্ত দিন' (**উইণ্টার সলিস্টিস্** ↑)। উত্তর-অয়নান্ত দিনে মধ্যাহ্নকালে কর্কট-ক্রান্তিতে (ট্রপিক - অব - ক্যান্সার, অর্থাৎ 23½° উত্তর অক্ষ-রেখা) অবস্থিত পৃথিবীর সকল স্থানে সূর্য ঠিক মাথার উপরে থাকে; আবার দক্ষিণ অয় নান্ত দিনে মকর-ক্রান্তিতে (ট্রপিক-অব-ক্যাপ্রিকর্ণ, 23½° দক্ষিণ-অক্ষরেখা) অবস্থিত সকল দেশে মধ্যাহ্নকালে সূর্য ঠিক মাথার উপরে থাকে। (ইকুইনক্স ↑)।

সল্যুসন (solution) — যে তরল পদার্থের মধ্যে এক, বা একাধিক পদার্থ দ্রবীভূত অবস্থায় রয়েছে। সাধারণতঃ তরল পদার্থের মধ্যে কোন কঠিন পদার্থ গলে গিয়ে সর্বত্র সমভাবে পরিব্যাপ্ত থাকলে তাকেই বলা হয় সল্যুসন; বাংলায় বলে দ্রব, বা দ্রবণ। অবশ্য তরল পদার্থের মধ্যে গ্যাসীয় পদার্থের সল্যুসনও হতে পারে। আবার দুই, বা ততোধিক কঠিন পদার্থের মিশ্রণে যে সংকরধাতু (অ্যালয় ↑) উৎপন্ন হয়, অথবা কঠিন পদার্থের মধ্যে গ্যাসীয় পদার্থ পরিশোষিত হলে তাকেও এক রকম সল্যুসন বলা যেতে পারে (সলিড সল্যুসন ↑)।

সল্যুবিলিটি (solubility) — কোন নির্দিষ্ট উষ্ণতায় নির্দিষ্ট পরিমাণ সল্ভেন্টের ↑ মধ্যে যে সর্বোচ্চ পরিমাণ সলিউট ↑ দ্রবীভূত থাকতে পারে, তার অনুপাতকে ওই সলিউটের সল্যুবিলিটি, বা দ্রাব্যতা বলে। সাধারণতঃ স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডলীয় উষ্ণতায় 100 গ্র্যাম সল্ভেন্টের (যেমন, জলের) মধ্যে যত গ্র্যাম সলিউট (যেমন, চিনি, বা লবণ) দ্রবীভূত থাকতে পারে তাকেই ওই সলিউট পদার্থটার সল্যুবিলিটি অর্থাৎ, দ্রব্যতার পরিমাণ বলা হয়।

সাইক্লোট্রন (cyclotron) — উচ্চ শক্তিশালী বিভিন্ন তড়িৎ-কণিকা (যেমন — আল্‌ফা পার্টিক্‌ল, প্রোটন, নিউট্রন ↑ প্রভৃতি) উৎপাদনের জন্যে উদ্ভাবিত এক রকম জটিল যন্ত্র। যান্ত্রিক কৌশলে প্রচণ্ড গতি সঞ্চারণের ফলে এ-সব আয়নায়িত কণিকাগুলো লক্ষ-লক্ষ 'ইলেক্ট্রন ভোল্ট' ↑ শক্তি-সম্পন্ন হয়ে ওঠে। এরূপ শক্তিশালী ও দুরন্ত গতিশীল কণিকার আঘাতে পরমাণুর নিউক্লিয়াস ↑ (ষ্ট্রাক্‌চার অব অ্যাটম ↑) ভেঙ্গে ফেলা সম্ভব

হয়। এভাবে সোডিয়াম ↑ প্রভৃতি কোন - কোন পদার্থের নিউক্লিয়াস বিভাজনের (ফিসন ↑) ফলে পদার্থটা সঙ্গে-সঙ্গে তেজস্ক্রিয়,
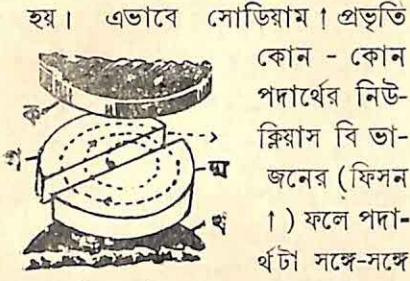
সাইক্লোট্রন

অর্থাৎ রেডিও অ্যাক্টিভ ↑ হয়ে ওঠে; আবার কোন-কোন ক্ষেত্রে এক পদার্থ থেকে অন্য পদার্থের সৃষ্টি হয় (ট্রান্সমুটেশন অব এলিমেণ্ট ↑)। সাইক্লোট্রন যন্ত্রের মূল ব্যবস্থা মোটামুটি এরূপ ঃ ইংরেজী D অক্ষরের অনুরূপ আকৃতি-বিশিষ্ট শূন্যগর্ভ দুটি অর্ধবৃত্তাকার ইলেক্ট্রোডের উপরে-নীচে দু'টা অতি শক্তিশালী তড়িচ্চুম্বক স্থাপিত হয়। ওই ইলেক্ট্রোড-দ্বয়ের অভ্যন্তরস্থ বায়ুশূন্য ঘূর্ণায়মান পথে প্রবিষ্ট তড়িৎ-কণিকাগুলো বহিঃস্থ ওই শক্তিশালী তড়িৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্রের প্রভাবে বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে। এই অর্ধ-বৃত্তাকার ইলেক্ট্রোডকে বলে 'ডি'; বৃহত্তর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বেতার-তরঙ্গের প্রভাবে এই দু'টা ডি-র অভ্যন্তরে বৃত্তাকারে ঘূর্ণনশীল ওই তড়িৎ - কণিকাগুলোর গতি ক্রমশঃ ত্বরান্বিত হতে থাকে। এরূপ সঞ্চরণের ফলে এগুলো ক্রমাগত দ্রুত গতিশীল হতে-হতে ক্রমে উচ্চ তড়িৎ-বিভব-বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। এভাবে উপযুক্ত-রূপে শক্তিশালী হলে শেষে এদের প্রচণ্ড সংঘাতে পদার্থের ফিসন ↑ ঘটানো সম্ভব হয়ে থাকে।

সাইক্লোন (cyclone)—ঘূর্ণীবাত্যা। বায়ুমণ্ডলে এক দিকে ঠাণ্ডা ও ভারী বায়ু-প্রবাহ এবং অপর দিকে উষ্ণ ও হাল্কা বায়ু-প্রবাহের মুখামুখী সংঘর্ষ ঘটলে স্থানীয় বায়ুর চাপ সহসা বেড়ে যায়, আর পরস্পরের বিপরীতমুখী চাপে বায়ুতে প্রচণ্ড ঘূর্ণন ও আলোড়ন দেখা দেয়। এই ঘূর্ণিত বায়ু-প্রবাহ প্রচণ্ড গতিতে সহসা একদিকে ছুটে চলে। ঘূর্ণীবাত্যার চলার পথে বিরাট ধ্বংসলীলা ঘটে। পৃথিবীর আবর্তনের সঙ্গে বায়ুর এই ঘূর্ণিপাকের বিশেষ সম্পর্ক আছে; উত্তর গোলার্ধে ঘূর্ণী-বাত্যায় বায়ুর ঘূর্ণন হয় বামাবর্তী (অ্যান্টিক্লক-ওয়াইজ) এবং দক্ষিণ গোলার্ধে হয় দক্ষিণাবর্তী। পৃথিবীর পূর্বাঞ্চলীয় সমুদ্র-তীরবর্তী দেশেই সাধারণতঃ ঘূর্ণীবাত্যার সংখ্যা ও প্রচণ্ডতা বেশি লক্ষিত হয়।

সাইটো- (cyto-) — জীবকোষ সম্বন্ধীয়; যেমন — **সাইটোলজি** (cytology), জীবদেহের সংগঠক কোষসমূহের গঠন, উপাদান প্রভৃতি সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান।

সাইটোপ্লাজ্‌ম (cytoplasm) — জীব-কোষের অন্তঃবর্তী বিশেষ একটি তরল জৈব উপাদান; যাকে প্রথম অবস্থায় বলে প্রোটোপ্লাজ্‌ম ↑, অথবা 'জীব-পঙ্ক'। ক্রমে আয়তন বৃদ্ধির পরে কোষের নিউক্লিয়াস, বা কেন্দ্রীণ-বস্তু এবং কোষ-প্রাচীরের মধ্যবর্তী অংশে যে তরল জৈব পদার্থ উৎপন্ন হয় তাকে বলে সাইটোপ্লাজ্‌ম। উদ্ভিদ-কোষের মধ্যে ভাসমানঅবস্থায়থাকে

উদ্ভিদের প্ল্যাষ্টিড ↑ কণিকাসমূহ, আর তাদের মাঝে মাঝে থাকে শূন্যস্থান, বা ভ্যাকুয়োল ↑।

সাইট্রিক অ্যাসিড (citric acid) — সাদা স্ফটিকাকার একটি জৈব অ্যাসিড, $C_6H_8O_7$; বিভিন্ন অম্ল-স্বাদযুক্ত ফলের, বিশেষতঃ লেবুর রস থেকে পাওয়া যায়। টক লেবুর রসে প্রায় 6% সাইট্রিক অ্যাসিড থাকে। নানা রকম অম্লস্বাদী স্বাস্থ্যকর পানীয় প্রস্তুত করতে সচরাচর অ্যাসিডটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সাইফন (siphon) — সাধারণ এক রকম যন্ত্র বিশেষ, যার সাহায্যে কোন পাত্রের তরল পদার্থ নিম্নতলে রক্ষিত অপর কোন পাত্রে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থানান্তরিত করা যায়। সাধারণ সাইফন কাচের, বা রাবারের একটা বক্রনল মাত্র ; ওই নলটা তরল পদার্থে সম্পূর্ণরূপে ভর্‌তি করে তার একমুখ উচ্চতর পাত্রের তরল পদার্থে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। পাত্রটার তরল পদার্থের উপরিভাগে যে স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডলীয় চাপ পড়ে, তারই প্রভাবে ওই তরল পদার্থ নলপথে উপরে উঠে যায় এবং ধীরে ধীরে নিম্নতল পাত্রের মধ্যে পড়তে থাকে। সাইফনের নল তরল পদার্থে ভরতি করে সম্পূর্ণ বায়ুশূন্য করা দরকার ; নলের মধ্যে সামান্য বায়ু থাকলেও সাইফন ক্রিয়াশীল হয় না। সচরাচর কাঁচ, বা রাবারের নল দিয়ে এরূপ সাইফন ব্যবস্থা করা হয়। এক পাত্রের তরল পদার্থ সাইফনের এই সহজ ব্যবস্থায় অনায়াসে অন্য পাত্রে স্থানান্তরিত করা সম্ভব হয়ে থাকে।

সাইফন

সাউণ্ড (sound) — শব্দ। আঘাতে, বা অন্য কোন কারণে কোন বস্তুর বিশেষ দ্রুত কম্পনের ফলে সংলগ্ন বায়ুতে পর্যায়ক্রমিক চাপ - বৈষম্য ঘটে ; ফলে সংলগ্ন বায়ুতে এক রকম তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। বায়ুর মাধ্যমে প্রবাহিত এই তরঙ্গমালা এসে কানের পর্দা স্পন্দিত করে' শব্দের অনুভূতি জাগায়। বায়ু-তরঙ্গের স্পন্দন-সংখ্যার উপরে শ্রোতার কানে শব্দের অনুভূতি জাগা-না-জাগা নির্ভর করে (অডিবিলিটি লিমিট ↑)। বায়ুর মাধ্যমে শব্দ-তরঙ্গ লঙ্গিচিউডিন্যাল ↑ গতিতে প্রবাহিত হয়ে শ্রোতার কাণে এসে পৌঁছায়। তরলপদার্থের মাধ্যমেও শব্দ-তরঙ্গ প্রবাহিত হয়ে থাকে, তবে তা অপেক্ষাকৃত তীব্র। শব্দের তীব্রতা ও গতি তার মাধ্যমের প্রকৃতি ও তাপমাত্রার উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। বাতাসে শব্দ-তরঙ্গের গতি (0° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায়) প্রতি সেকেণ্ডে 1120 ফুট, বা 332 মিটার; ঘণ্টায় প্রায় 760 মাইল।

সান (sun)—সূর্য; জ্যোতিষ্ক বিশেষ। অনন্ত মহাশূন্যে ভাসমান একটা সুবিশাল জলন্ত গ্যাসীয় পিণ্ড। সূর্যের চারদিকে আমাদের পৃথিবীসহ সব গ্রহগুলো (সোলার সিস্টেম ↑) আপন-আপন উপবৃত্ত কক্ষপথে ক্রমাগত ঘুরছে। পৃথিবী থেকে এর

দূরত্ব মোটামুটি 9 কোটি 30 লক্ষ মাইল। সৌরপিণ্ডের ব্যাস প্রায় 8 লক্ষ 60 হাজার মাইল; এর বস্তু-পরিমাণ (মাস ↑) 2×10^{27} টন বলে হিসাব করা হয়েছে। সূর্যের বিভিন্ন অংশের উষ্ণতা গড়ে প্রায় 5700° সেন্টিগ্রেড হবে। সূর্যের অভ্যন্তরে তার গ্যাসীয় উপাদানগুলোর মধ্যে প্রতিনিয়ত পারমাণবিক ভাঙ্গা-গড়া চলছে; বিশেষতঃ হাইড্রোজেন পরমাণুগুলোর ফিউসন ↑ প্রক্রিয়ায় হিলিয়াম ↑ গ্যাস সৃষ্টি হচ্ছে; তা আবার হাইড্রোজেনে রূপান্তরিত হচ্ছে। এ-সব প্রক্রিয়ার ফলে অহরহঃ প্রচণ্ড শক্তির উদ্ভব হওয়ায় সূর্যের উষ্ণতা বজায় রয়েছে, কোটি-কোটি বছর ধরে সূর্য এত প্রচণ্ড তাপ ছড়িয়ে চলেছে। সূর্য-রশ্মির **স্পেকট্রাম অ্যানালিসিস** ↑ (বর্ণালি-বিশ্লেষণ) প্রক্রিয়ায় জানা গেছে, পৃথিবীতে যে সব মৌলিক পদার্থ আছে তার অধিকাংশই সূর্যের অভ্যন্তরে গ্যাসীয় অবস্থায় রয়েছে।

সান-স্পট (sun-spot) — সৌর কলঙ্ক; বিশেষ যান্ত্রিক ব্যবস্থায় সূর্য-গোলকের উপরিভাগে যে-সব অনুজ্জ্বল স্থান লক্ষিত হয়। চারিদিকের ঔজ্জ্বল্যের তুলনায় ওই সব স্থান নিষ্প্রভ হওয়ায় কালো দাগের মত দেখায়। মনে হয়, সূর্যের নিজস্ব একটা আবর্তনের ফলে ওই সব সৌর-কলঙ্কের স্থান পরিবর্তন ঘটে থাকে, সংখ্যারও হ্রাস-বৃদ্ধি লক্ষিত হয়। মোটামুটি প্রতি 11 বছর পরে-পরে পৃথিবী থেকে সর্বাধিক সংখ্যক সৌর-কলঙ্ক দৃষ্ট হয়ে থাকে। নৈসর্গিক কারণে সৌর কলঙ্কের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে পৃথিবীতে ম্যাগ্নেটিক স্টর্মের ↑ তীব্রতা এবং অরোরা বোরিঅ্যালিসের ↑ ঔজ্জ্বল্য-বৃদ্ধি প্রভৃতি নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দেয়।

সাব্‌সয়েল (subsoil) — পৃথিবীর উপরিভাগের নরম মৃত্তিকা-স্তর ও নিম্নবর্তী কঠিন শিলা-স্তরের মাঝে বালুকা ও প্রস্তরাদি মিশ্রিত যে বিশেষ সছিদ্র মৃত্তিকা-স্তর রয়েছে। ভূ-গর্ভের এই স্তরেই ভূ-পৃষ্ঠের জল শোষিত ও পরিশোধিত হয়ে গিয়ে সঞ্চিত ও প্রবাহিত হয়ে থাকে (**সাব্‌সয়েল ওয়াটার**) এবং নলকূপের সাহায্যে ভূ-গর্ভস্থ এই পরিশুদ্ধ জলই উত্তোলিত করা হয়ে থাকে।

সাব্লিমেট (sublimate) — উদ্বায়ী (ভোলাটাইল ↑) পদার্থের কঠিনীভূত বাষ্প। কর্পূর, নিশাদল, (স্যাল্ অ্যামোনিয়াক ↑) প্রভৃতি উদ্বায়ী পদার্থ সামান্য উষ্ণতায়ই দ্রুত বাষ্পীভূত হয় এবং আবদ্ধ পাত্রের উপরিভাগের শীতল গাত্রে জমে পুনরায় কঠিন হয়, একেই বলে সাব্লিমেট। এই **সাব্লিমেশন** প্রক্রিয়ার সাহায্যে অবিশুদ্ধ উদ্বায়ী পদার্থ বিশুদ্ধ করা হয়ে থাকে।

সার্ক্‌ল (circle) — বৃত্ত; কোন স্থির বিন্দুর সমদূরবর্তীভাবে অপর কোন বিন্দুর সঞ্চরণ-পথের (লোকাস ↑) দ্বারা সীমাবদ্ধ গোলাকার ক্ষেত্র। ওই স্থির বিন্দুকে বলে বৃত্তের কেন্দ্র, বা

সেণ্টার ; আর ওই গোলাকার সঞ্চরণ-রেখাকে বলে বৃত্তের পরিধি, বা **সারকম্ফারেন্স**। কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত যে-কোন সরল রেখাকে বলে ব্যাসার্ধ, বা **রেডিয়াস** ; এই ব্যাসার্ধ-রেখা উভয় দিকে পরিধি পর্যন্ত বিস্তৃত হলে তাকে বলে বৃত্তের ব্যাস, বা **ডায়মেটার**। পরিধির যে-কোন দুটি বিন্দুর সংযোগকারী সরল রেখাকে বলে বৃত্তের জ্যা, বা **কর্ড**। কোন বৃত্তের পরিধি $= 2\pi r$ এবং ক্ষেত্রফল $= \pi r^2$; এখানে r হলো ব্যাসার্ধ, বা রেডিয়াস এবং π (পাই ↑) হলো একটি ধ্রুবক রাশি, $= 3{\cdot}14159\cdots$, = প্রায় 22/7।

সার্কিট, ইলেক্‌ট্রিক্যাল (circuit, electrical) — তড়িৎ-চক্র ; তড়িৎ-প্রবাহের পূর্ণ, বা আবদ্ধ বর্তনী। তড়িৎ-পরিবাহী ধাতব তারের অবিচ্ছিন্ন পূর্ণ চক্রাকার মাধ্যমে তড়িৎ-প্রবাহ সম্ভব হয়ে থাকে। যদি তড়িৎ-স্রোত কোন ব্যাটারি ↑ বা জেনারেটর থেকে বেরিয়ে তড়িৎ-পরিবাহী ধাতব তারের মাধ্যমে ঘুরে পুনরায় উৎসে
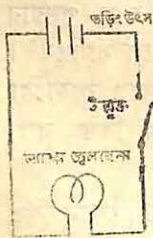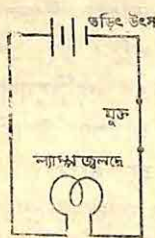
ওপেন্ সার্কিট্ ক্লোজ্‌ড সার্কিট্

ফিরে আসে, অর্থাৎ উৎসের পজিটিভ ও নেগেটিভ ইলেক্ট্রোডদ্বয় ↑ অবিচ্ছিন্নভাবে সংযুক্ত থাকে, তবেই একটি সম্পূর্ণ তড়িৎ-চক্র, বা সার্কিট রচিত হবে। তড়িৎ-প্রবাহ একই তারের মাধ্যমে উৎস থেকে বাল্বের ফিলামেণ্টের ↑ ভিতর দিয়ে আবার ব্যাটারিতে ফিরে এলেই সার্কিট সম্পূর্ণ হয়, ও বাতি জ্বলে। সার্কিটের এক স্থানে 'সুইচ' বসিয়ে প্রয়োজনানুসারে তারের সংযোগ উন্মুক্ত ও সংযুক্ত করে **'ওপেন সার্কিট'** ও **'ক্লোজ্‌ড সার্কিট'** করা হয়। এই ব্যবস্থায় তড়িৎ-প্রবাহ ইচ্ছানুযায়ী পরিচালিত, বা বন্ধ করা সম্ভব হয়ে থাকে।

সারকোমা (sarcoma) — দূষিত মাংস-পেশীর বৃদ্ধি - জনিত অবস্থা ; ক্যান্সার রোগে যেমন হয়ে থাকে।

সারকোডিনা (sarcodina)— অতি ক্ষুদ্র এক-কোষী (যেমন—অ্যামিবা amoeba ↑), প্রাণী; যারা দেহ-কোষটির আকার ক্ষণে-ক্ষণে পরিবর্তন, অর্থাৎ ক্ষণপদ বিস্তার করে চলাচল করে ; সিওপোডিয়াম (pseupodium) ↑ ।

সারপেণ্টাইন (serpentine) — স্তরে-স্তরে লাল দাগযুক্ত সবুজ বর্ণের এক প্রকার কেলাসিত প্রস্তর ; বিভিন্ন শ্রেণীর সিলিকেট ↑ প্রস্তরের রূপান্তরের ফলে এর সৃষ্টি হয়েছে। বস্তুতঃ পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ চাপ, তাপ প্রভৃতির প্রভাবে ভূ-গর্ভে সাধারণ প্রস্তরের এরূপ রূপান্তর ঘটে থাকে।

সার্ড (surd) — অনির্ণেয় বর্গমূল ; যেমন, $\sqrt{5}$, বা $\sqrt{7}$, অর্থাৎ 5-এর, বা 7-এর বর্গমূল ; যে রাশির মান সুনির্দিষ্টভাবে নির্ণয় করা যায় না।

সাল্‌ফাইড (sulphide) — বিভিন্ন ধাতব, বা অ-ধাতব মৌলিক পদার্থের সঙ্গে সাল্‌ফারের রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন দ্বি-মৌল (বাইনারি ↑) যৌগিকের সাধারণ নাম। সাধারণতঃ বিভিন্ন পদার্থের সঙ্গে অ্যাসিড-ধর্মী হাইড্রোজেন সাল্‌ফাইডের (H_2S) ↑ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সাল্‌ফাইড যৌগসমূহ উৎপন্ন হয়ে থাকে।

সাল্‌ফার (sulphur) — গন্ধক, মৌলিক অ-ধাতব পদার্থ; পারমাণবিক ওজন 32·06, পারমাণবিক সংখ্যা 16. (অ্যাটমিক নাম্বার ↑)। বিভিন্ন ধাতব পাইরাইট ↑ খনিজ থেকে গন্ধক নিষ্কাশিত হয়ে থাকে; যেমন—আয়রন পাইরাইট, FeS_2, কপার পাইরাইট, $CuFeS_2$, (যাকে বলে 'ফুল্‌স গোল্ড')। আবার কোন কোন দেশের ভূ-গর্ভে বিশুদ্ধ সাল্‌ফারের খনিজ স্তর রয়েছে; 'ফ্রাস' পদ্ধতিতে উত্তপ্ত জল পাম্প করে নলপথে প্রবেশ করিয়ে সাল্‌ফার-স্তর গলিয়ে উপরে তোলা হয়। পদার্থটা নীলাভ শিখায় জ্বলে, এবং অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সাল্‌ফার ডাইঅক্সাইড, SO_2, গ্যাস উৎপন্ন করে। উত্তাপে বিভিন্ন ধাতুর সঙ্গে এর সংযোগে বিভিন্ন ধাতব 'সাল্‌ফাইড' যৌগিক উৎপন্ন হয়ে থাকে। সাল্‌ফার বিভিন্ন আকারে (অ্যালোট্রপি ↑) থাকতে পারে; — স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে 'রম্বিক' ↑ গঠনের স্ফটিকাকারে, যাকে বলে **আল্‌ফা সাল্‌ফার**। সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড ↑, H_2SO_4, কার্বন-ডাইসাল্‌ফাইড ↑, CS_2, প্রভৃতি প্রয়োজনীয় পদার্থের এটা হলো মুখ্য উপাদান। রাবার ভ্যাল্‌ক্যানাইজিং ↑ এবং বিভিন্ন রঞ্জক ও রাসায়নিক পদার্থ তৈরি করতে, ঔষধে, (সাল্‌ফা-ড্রাগ ↑) পোকা-মাকড়-নাশক হিসেবে এর বহুল ব্যবহার আছে। ভুক্ত খাদ্যের মাধ্যমে জীবদেহের নানা আভ্যন্তরীণ জৈব ক্রিয়ায়ও এর প্রয়োজন অপরিহার্য।

সাল্‌ফার ট্রাইঅক্সাইড (sulphur trioxide) — সাধারণ অবস্থায় সাদা, স্ফটিকাকার কঠিন পদার্থ, SO_3; জলের সঙ্গে এর রাসায়নিক মিলনে সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড, H_2SO_4, উৎপন্ন হয়।

সাল্‌ফার ডাইঅক্সাইড (sulphur dioxide) — বর্ণহীন, শ্বাসরোধকারী তীব্র গন্ধবিশিষ্ট গ্যাস, SO_2; সাল্‌ফার জ্বালালে বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে রাসায়নিক সংযোগে এর উৎপত্তি হয়। গ্যাসটা পোকা-মাকড় ধ্বংস করে। তরলীকৃত অবস্থায় হিমায়ক যন্ত্রে (রিফ্রিজারেটর ↑) কোন-কোন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সাল্‌ফার ড্রাগ (sulphur drugs) — বিশেষ সাল্‌ফোনেমাইড, $SO_2.NH_2$, শ্রেণীর বিভিন্ন গঠনের জৈব রাসায়নিক যৌগিক। এ-গুলি বিভিন্ন সব জীবাণু (ব্যাক্‌টিরিয়া ↑) - ঘটিত রোগের চিকিৎসায় বিশেষ ফলপ্রদ। সাল্‌ফানিলেমাইড, প্রণ্টোসিল ↑, প্রভৃতি বিভিন্ন ঔষধ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এ-গুলি সাধারণভাবে **সাল্‌ফা ড্রাগ্‌স** নামে পরিচিত।

সাল্‌ফার পয়েণ্ট (sulphur point) — বায়ুশূন্য আবদ্ধ পাত্রে সাল্‌ফার, (গন্ধক) 112·8° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় দ্রবীভূত হয়; আর বাষ্পীভূত হয় 444·6° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায়। এই উক্ত মাত্রার উষ্ণতাকে বলে সাল্‌ফার পয়েণ্টস্‌। প্রামাণ্য চাপে (অর্থাৎ, স্ট্যাণ্ডার্ড অ্যাট্‌মস্ফিয়ারিক প্রেসার ↑) উক্ত দুই উষ্ণতায় (টেম্পারেচার ↑) যথাক্রমে পদার্থটার তরল ও গ্যাসীয় অবস্থার স্থিরতা (ইকুইলিব্রিয়াম ↑) রক্ষিত হয়।

সাল্‌ফিউরাস অ্যাসিড (sulphurous acid)— সালফার-ঘটিত একটি মৃদু অ্যাসিড, H_2SO_3; সাল্‌ফার ডাইঅক্সাইডের, SO_2, জলীয় দ্রবণ। পদার্থটা সামান্য অ্যাসিডধর্মী। ধাতব ক্ষারের সঙ্গে এই অ্যাসিডের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিভিন্ন ধাতুর **সাল্‌ফাইট** লবণ উৎপন্ন হয়।

সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড (sulphuric acid) — সাল্‌ফার-ঘটিত একটা তীব্র অ্যাসিড, H_2SO_4, যাকে অনেক সময় বলা হয় 'অয়েল অব ভিট্রিয়ল'। বর্ণহীন, তৈলবৎ তরল পদার্থ। অধিকাংশ রাসায়নিক শিল্পে সব চেয়ে প্রয়োজনীয় মুখ্য অ্যাসিড। অত্যন্ত জারক-ধর্মী; জৈব পদার্থ সব পুড়িয়ে দেয়। জলের সংযোগে প্রচণ্ড উত্তপ্ত হয়ে তীব্র বিক্রিয়া ঘটে। সাল্‌ফারের বিভিন্ন বিক্রিয়ায় 'লেড চেম্বার' ও 'কন্‌ট্যাক্ট' পদ্ধতিতে প্রচুর পরিমাণে তৈরি হয়। এটা একটা দ্বি-ক্ষারক (ডাইবেসিক ↑) অ্যাসিড, রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সাল্‌ফেট ↑ ও বাই-সাল্‌ফেট ↑ উভয় শ্রেণীর সল্ট উৎপন্ন করে। অন্যান্য অ্যাসিড প্রস্তুতিতে, বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্পে এবং অ্যাকুমুলেটর ↑ প্রভৃতি যন্ত্রে অত্যাবশ্যক। প্রায়-নির্জল বিশুদ্ধ সালফিউরিক অ্যাসিডকে বলা হয় **অলিয়াম** ↑।

সাল্‌ফিউরেটেড হাইড্রোজেন (sulphuretted hydrogen) — হাইড্রোজেন-সাল্‌ফাইড, H_2S নামক গ্যাসীয় পদার্থ; পচা ডিমের গন্ধযুক্ত। বর্ণহীন দাহ্য গ্যাস, সামান্য অ্যাসিড-ধর্মী। ধাতব ক্ষারের সঙ্গে এর রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সাল্‌ফাইড ↑ সল্ট উৎপন্ন হয়ে থাকে।

সাল্‌ফেট (sulphate)—সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন পূর্ণ-শমিত বিভিন্ন লবণের সাধারণ নাম; রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এর অর্ধ-শমিত লবণ হলো বাইসালফেট ↑ সল্ট। অ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেট, $(NH_4)_2SO_4$, নামক লবণটি কৃত্রিম রাসায়নিক সার হিসাবে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সয়েল (soil)—(i) মাটি, মৃত্তিকা। (ii) দেহ-নিঃসৃত মল, বা বিষ্ঠা; যেমন—**নাইট সয়েল** (night-soil) বিষ্ঠা, **সয়েল-পাইপ** (soil-pipe) হলো যে নল-পথে শৌচাগার থেকে মল-মূত্রাদি নর্দমায় যায়।

সায়্যাটিক নার্ভ (sciatic nerve)— পায়ের ঊর্ধাংশের (জংঘার) পশ্চাদ্ভাগে উপর থেকে নীচের দিকে যে স্নায়ুটি

নেমে গেছে। **সায়েটিকা** (sciatica) —সায়্যাটিক স্নায়ু-ঘটিত যন্ত্রণাদায়ক একপ্রকার বেদনা-রোগ।

সায়েনাইড (cyanides)—হাইড্রোসায়েনিক (HCN) অ্যাসিডের বিভিন্ন সল্ট ↑; যেমন, পটাসিয়াম সায়েনাইড, KCN। সায়েনাইড সল্ট মাত্রেই তীব্র বিষাক্ত পদার্থ। সাধারণতঃ সিল্‌ভার প্লেটিং ↑ প্রক্রিয়ায় এবং স্বর্ণঘটিত খনিজ প্রস্তর থেকে বিশুদ্ধ সোনা নিষ্কাশনের জন্যে সায়েনাইড সল্ট প্রয়োজন হয়ে থাকে।

সায়েনেট (cyanates) — সায়েনিক (HCNO) অ্যাসিডের বিভিন্ন সল্ট; যেমন— পটাসিয়াম সা য়ে নে ট, KCNO। সব সায়েনেট সল্টগুলোই সায়েনাইড সল্টের মত তীব্র বিষাক্ত পদার্থ।

সায়েনোজেন (cyanogen)— তীব্র বিষাক্ত বর্ণহীন গ্যাস, C_2N_2; এর রাসায়নিক ধর্ম হ্যালোজেনের ↑ অনুরূপ। হ্যালোজেন ↑ শ্রেণীর ক্লোরিন ↑ গ্যাস যেমন বিভিন্ন ক্লোরাইড সল্ট সৃষ্টি করে, সায়েনোজেন-ও তেমনই বিভিন্ন ধাতুর সায়েনাইড ↑ শ্রেণীর সল্ট উৎপন্ন করে।

সায়েনোটাইপ (cyanotype) — ব্লু-প্রিণ্ট ↑।

সায়েন্যামাইড (cyanamide) — একটা বর্ণহীন স্ফটিকাকার রাসায়নিক পদার্থ, NH_2CN; হাইড্রোসায়েনিক ↑ অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় অ্যামোনিয়া গ্যাসের রাসায়নিক মিলনে গঠিত অ্যামাইড ↑ শ্রেণীর সল্ট। অবশ্য কেবল সায়েন্যামাইড বললে সাধারণতঃ ক্যালসিয়াম সায়েন্যামাইড, $CaCN_2$, বুঝায়। পদার্থটা আবার **নাইট্রো-লাইম** ↑ নামেও পরিচিত, যা উদ্ভিদাদির পক্ষে একটা উৎকৃষ্ট রাসায়নিক সার।

সায়েনোসিস (cyanosis)— দেহের অংশ বিশেষের, বিশেষতঃ মুখমণ্ডলের নীলাভ বর্ণ ধারণ, রোগ বিশেষ; স্থান বিশেষে রক্ত-সংবহনের ত্রুটির জন্যে রক্তে অক্সিজেন-হীনতার লক্ষণ।

সাহা (Saha)ডাঃ মেঘনাদ —প্রখ্যাত ভারতীয় (বাঙ্গালী) পদার্থ-বিজ্ঞানী; জন্ম 1893 খৃঃ, মৃত্যু 1956 খৃঃ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এস-সি। লণ্ডন ও বার্লিনে গণিত ও পদার্থ-বিজ্ঞানে গবেষণা; 'কার্নেগি গবেষণা বৃত্তি' লাভ। কলিকাতা ও এলাহাবাদ বি শ্ব বি দ্যা ল য়ে অধ্যাপনা। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি 1934 খৃঃ। রয়্যাল সোসাইটির ফেলো (এফ. আর. এস); আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান সমিতির স দ স্য। জ্যোতির্বিজ্ঞানে অসামান্য দান এবং পদার্থ-বিজ্ঞানের বহু মৌলিক তথ্য আবিষ্কারে বিপুল খ্যাতি। অপূর্ব সংগঠন প্রতিভা; বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি। শেষ জীবনে ভারতীয় লোকসভার সক্রিয় সদস্য।

সাহানি (Sahani) অধ্যাপক বীরবল — ভারতীয় উদ্ভিদবিজ্ঞানী; পাঞ্জাবে জন্ম 1891 খৃষ্টাব্দ, মৃত্যু 1949 খৃস্টাব্দ। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের

(উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে) ডি. এস - সি। বেনারস ও পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা; লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের অধ্যক্ষ। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে বহু গুরুত্বপূর্ণ অবদান; উদ্ভিদের বিবর্তনবাদ সম্পর্কীয় গবেষণায় আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ। রয়্যাল সোসাইটির ফেলো (এফ. আর. এস)। শেষ জীবনে প্রাচীনকালের উদ্ভিদ-জগৎ সম্পর্কীয় গবেষণার জন্য 'প্যালিওবোটানি ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা ও সঞ্চিত যাবতীয় সম্পত্তি দান।

সি-ওয়াটার (sea-water) — সমুদ্র-জল। লবণাক্ত সমুদ্রজলে লবণ ব্যতীত আরও নানা রকম ধাতব রাসায়নিক পদার্থ দ্রবীভূত থাকে। মোটামুটি হিসেবে সমুদ্রজলে থাকে,— জল 96·4%, লবণ (কমন সল্ট ↑, NaCl, সোডিয়াম ক্লোরাইড) 2·8%, ম্যাগ্নেসিয়াম ক্লোরাইড ($MgCl_2$) 0·4%, ম্যাগ্নেসিয়াম সালফেট ($MgSO_4$) 0·5%, ক্যালসিয়াম সালফেট ($CaSO_4$) ও পটাসিয়াম ক্লোরাইড (KCl) প্রত্যেকটি 0·1%; এ-সব ছাড়া সামান্য পরিমাণে ব্রোমাইড ↑ এবং আয়োডাইড ↑ সল্ট-ও কোথাও কোথাও সমুদ্রজলে পাওয়া যায়। অবশ্য সর্বদা সব সমুদ্রের জলই যে উল্লিখিত অনুপাতে লবণাক্ত হবে এমন কোন কথা নেই, তবে মোটামুটি এরূপ হয়ে থাকে।

সিওপোডিয়াম (pseupodium) — ক্ষণপদ প্রাণী; অতিক্ষুদ্র যে-সকল এককোষী প্রাণী কোষটির আকার স্থানে-স্থানে পদের মত সাময়িকভাবে বিস্তৃত করে' চলাচল করে; এই বিস্তৃতিগুলিকে বলে **ক্ষণপদ** (pseupodia); যেমন, অ্যামিবা ↑।

সিকাম (caecum) — বৃহদন্ত্রের (ইণ্টেস্টাইন, intestine ↑) প্রথমাংশ; যেখানে ক্ষুদ্রান্ত্রের শেষ প্রান্ত (ইলিয়াম, ileum ↑) এসে যুক্ত হয়েছে এবং যার নিম্নাংশে অ্যাপেণ্ডিক্স ↑ সংলগ্ন রয়েছে।

সিক্যাণ্ট (secant) — (1) বৃত্তের ছেদক; অর্থাৎ যে সরলরেখা কোন বৃত্তের পরিধি ছেদ করে উভয় দিকে যুক্ত হয় এবং বৃত্তকে দুইটি সেগ্‌মেণ্ট ↑, বা অংশে বিভক্ত করে।

সিক্যাণ্ট
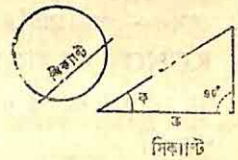
এই সিক্যাণ্ট, বা ছেদক দ্বারা বিভক্ত পরিধির দুই অংশকে বলে বৃত্তচাপ (আর্ক ↑)। (2) সমকোণী কোন ত্রিভুজের অতিভূজ (হাইপটেনিউজ) ÷ ভূমি (বেস্‌), অর্থাৎ H/B; এই অনুপাতকে বলে ভূমিসংলগ্ন (চিত্রে 'ক') কোণের সিক্যাণ্ট; যাকে সংক্ষেপে লেখা হয় 'Sec ক'।

সিড্‌লিজ পাউডার (seidlitz powder) — সোডিয়াম বাইকার্বনেট ↑, রোচেল সল্ট ↑ ও টার্টারিক অ্যাসিড ↑ মিশিয়ে এই চূর্ণ তৈরি হয়। জলে দিলে এ-থেকে কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস বেরোয়। অম্ল স্বাদযুক্ত এই জলীয় দ্রব পানীয় হিসেবে ব্যবহৃত

হয়ে থাকে ; আর, ঔষধ হিসেবে মৃদু জোলাপের কাজ করে।

সিডারাইট (siderite)—এক প্রকার লৌহ-খনিজ ; স্বভাবজাত অবিশুদ্ধ ফেরাস কার্বনেটের ($FeCO_3$) বিশেষ নাম। এই খনিজ প্রস্তর থেকে বিশুদ্ধ লৌহ নিষ্কাশিত হয়ে থাকে।

সিডারোস্টাট (siderostat) — যে যন্ত্রের সাহায্যে পৃথিবীর আবর্তন সত্ত্বেও কোন তারকার আলোক-রশ্মি প্রতিফলিত করে একমুখী (দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে) করা সম্ভব হয়।

সিক্রেটিন (secretin) — খাদ্য গ্রহণের পরে অন্ত্রের উর্ধাংশের গ্রন্থিগুলি থেকে যে মিশ্র জৈব রস নিঃসরিত হয়ে রক্তের সঙ্গে মিশে প্যানক্রিয়াসে ↑ যায় এবং সেখান থেকে পরিপূর্ণ জারক-রস অন্ত্রস্থ ভুক্ত খাদ্যের সঙ্গে মেশে। এই 'সিক্রেটিন' রস যকৃতে উৎপন্ন বাইল ↑ রসের নিঃসরণেও যথেষ্ট সাহায্য করে, যার রাসায়নিক ক্রিয়ায় ভুক্ত খাদ্যের স্নেহ-পদার্থ জীর্ণ হয়ে থাকে।

সিক্রিশন (secretion) — নিঃসরণ ; বিশেষতঃ দেহাভ্যন্তরস্থ কোন গ্রন্থি (gland ↑) থেকে জৈব রসের অন্তঃনিঃসরণ ; যেমন — লিভার ↑ (যকৃৎ) থেকে পিত্তরস (বাইল ↑) নিঃসৃত হয়। পক্ষান্তরে, **এক্সক্রিশন** (excretion) হলো দেহাভ্যন্তর থেকে বর্জ্য পদার্থ সমূহের বহির্নিঃসরণ, যেমন — মল, মূত্র, ঘর্ম প্রভৃতি (এক্সক্রিটা ↑ , excreta)।

সিডিরিয়্যাল ইয়ার (sidereal year) —আপন উপবৃত্ত (ডিম্বাকার) কক্ষপথে সূর্যকে এক বার প্রদক্ষিণ করতে পৃথিবীর যে সময় লাগে ; অর্থাৎ আমাদের সাধারণ বছর,= 365·2564 সৌর দিন। মহাশূন্যের কোন স্থির জ্যোতিষ্কের তুলনায় এই সময়কালে (বছরে) সূর্য যেন আবার আর একটা উপবৃত্ত কক্ষ-পথে জ্যোতিষ্কটাকে এক বার প্রদক্ষিণ করে বলে পৃথিবী থেকে আমাদের আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়। কোন গ্রহের 'সিডিরিয়্যাল ইয়ার' হলো তার আপন কক্ষপথে সূর্যকে এক বার প্রদক্ষিণ করতে গ্রহটার (পৃথিবীর হিসেবে) যত দিন লাগে ; যেমন, এই হিসেবে মঙ্গলগ্রহের 'সিডিরিয়্যাল ইয়ার' হলো আমাদের 687 দিন (মার্স ↑)।

সিডিরিয়্যাল ডে (sidereal day)— নাক্ষত্রিক দিন ; কোন আপাতদৃষ্ট স্থির জ্যোতিষ্কের তুলনায় আপন অক্ষের উপরে পৃথিবীর এক বার আবর্তিত হতে যে সময় লাগে। সূর্যের তুলনায় পৃথিবীর এই সময় হলো আমাদের সাধারণ সৌর দিন, মোটামুটি 24 ঘণ্টা।

সিন্‌ক্রোট্রন (synchrotron) — পরমাণু-বিজ্ঞানে ব্যবহৃত এক প্রকার জটিল যন্ত্র বিশেষ ; যার যান্ত্রিক ব্যবস্থায় ইলেক্‌ট্রন ↑ প্রভৃতি তড়িৎ-কণিকা সমূহকে অত্যধিক দ্রুত গতিশীল ও শক্তিশালী করা সম্ভব হয়ে থাকে। পরমাণুর বিভিন্ন আদি

কণিকা (fundamental particles)-কে প্রচণ্ড গতিশীল করবার পক্ষে এ-যন্ত্র বিটাট্রন↑ ও সাইক্লোট্রন↑ যন্ত্রের চেয়েও অধিকতর কার্যকরী। বস্তুতঃ শেষোক্ত যন্ত্র দু'টার সম্মিলিত কৌশলে সিন্‌ক্রোট্রন যন্ত্রের জটিল ব্যবস্থাদি পরিকল্পিত ও উদ্ভাবিত হয়েছে।

সিনাবার (cinnabar)—খনিজ মারকিউরিক সাল্‌ফাইড, HgS ; বিশেষ চক্‌চকে স্ফটিকাকার কঠিন পদার্থ। এই খনিজ থেকেই প্রধানতঃ মার্কারি↑, অর্থাৎ পারদ নিষ্কাশিত হয়ে থাকে। বাংলায় বলে হিঙ্গুল।

সিম্‌পোডিয়াম (sympodium) — যে-সব উদ্ভিদের কাণ্ডের গাঁটে-গাঁটে
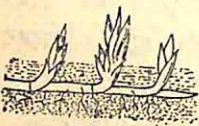
মুকুলোদ্‌গম হয়ে-হয়ে ক্রমাগত বেড়ে যায়, কিন্তু কাণ্ডের অগ্রভাগ মুকুলিত হয় না। সাধারণতঃ এ-জাতীয় উদ্ভিদ-কাণ্ড মাটির নিচে বেড়ে চলে, মুকুলগুলি মাটির উপরে গজিয়ে ওঠে।

সিম্‌ফাইসিস (symphysis) — দেহের মধ্যরেখা, অর্থাৎ মেরুদণ্ডের অস্থি-খণ্ডক (কশেরুকা) গুলির সংযোগ ব্যবস্থা ও তৎসম্বন্ধীয় বিকৃতি-রোগ।

সিমন্‌ডস ডিজিজ (simmonds' disease)—অকাল-বার্ধক্য ; মস্তিষ্কের পিটুইটারি↑ গ্রন্থির বিকলতায় বিশেষ একটি হর্মোন (hormone)↑ নিঃসরণের স্বল্পতার ফলে অল্প বয়সেই বার্ধক্যের সব লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার রোগ বিশেষ।

সিম্‌বল (symbol) — সংকেত, বা প্রতীক ; যেমন—রসায়নে H=এক পরমাণু হাইড্রোজেন বুঝায়। গণিতে +, −, ×, ÷, √ প্রভৃতি যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, বর্গমূল প্রভৃতির বিশেষ সংকেত-চিহ্ন বুঝায়।

সিম্‌বায়োসিস (symbiosis) — মিথোজীবিতা ; জৈব ক্রিয়ায় পারস্পরিক সহযোগিতা। বিভিন্ন দু'টা উদ্ভিদ, অথবা প্রাণী একসঙ্গে পরস্পরের কল্যাণকর সাহচর্যে ও সহযোগিতায় বেঁচে থাকার প্রক্রিয়া ; যেমন, বিশেষ-বিশেষ জীবাণুরা (ব্যাক্‌টিরিয়া↑) মটর, বিন প্রভৃতি উদ্ভিদের শিকড়ে বাসা বেঁধে পরস্পর পরস্পরকে পুষ্টি জোগায় ও বাঁচিয়ে রাখে। আবার, উইপোকার পেটে এক রকম বিশেষ জীবাণু থাকে যারা উইকে কাঠের উদ্ভিজ্জ তন্তু (সেলুলোজ↑) জীর্ণ করতে সাহায্য করে এবং নিজেরাও বেঁচে থাকে।

সিমেন (semen)—শুক্র, বা বীর্যরস ; পুং-জননাঙ্গে উৎপন্ন ও উত্তেজনা-কালে জননেন্দ্রিয় থেকে নিঃসৃত ঘন তরল পদার্থ। এর মধ্যে ভাসমান থাকে আণুবীক্ষণিক আকারের শুক্রকীট, বা **স্পার্মাটোজোয়া**↑ ; অর্থাৎ বংশানুক্রমের আদি জীব-কণা।
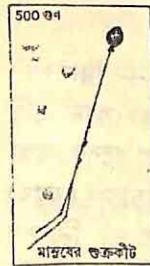
শুক্রকীট

সিমেণ্ট (cement) — ইমারতাদি তৈরির জন্যে যে চূর্ণ পদার্থে জল

মিশিয়ে লাগালে জমে অত্যন্ত কঠিন হয়ে এঁটে যায়। পদার্থটা রাসায়নিক হিসেবে মোটামুটি ক্যাল্সিয়াম ও অ্যালুমিনিয়ামের সিলিকেট ↑ জাতীয় পদার্থের মিলনে গঠিত। জল মেশালে জমে যাওয়ার সময়ে এর মধ্যে বিভিন্ন জটিল রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত হয়। বিশেষ এক রকম লাইম-স্টোন ↑ ও অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট-ঘটিত মাটি মিশিয়ে অত্যধিক তাপে গলিয়ে 'পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট' তৈরি হয়ে থাকে। এভাবে উৎপন্ন জমাট-বাঁধা পদার্থটাকে পরে 'গ্রাইণ্ডিং' যন্ত্রের সাহায্যে চূর্ণ করে সাধারণ সিমেণ্ট প্রস্তুত করা হয়।

সিমেণ্টাইট (cementite) — লোহা ও কার্বনের মিলনে উৎপন্ন একটা বাইনারি ↑ কম্পাউণ্ড। পদার্থটার রাসায়নিক নাম 'আয়রন কার্বাইড', Fe_3C ; অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু ভঙ্গুর পদার্থ। কাস্ট আয়রনে ↑ পদার্থটা যথেষ্ট পরিমাণে থাকে বলে তা এত ভঙ্গুর হয়। কিন্তু প্রয়োজনানুরূপ অল্প ও উপযুক্ত পরিমাণে মিশ্রিত থাকে স্টিল ↑, অর্থাৎ ইস্পাতে।

সিরাম (serum) — (1) রক্তের শ্বেত ও লোহিত কণিকাগুলো যে এক রকম হরিদ্রাভ রসে ভেসে থাকে। বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্যে ওই রক্তকোষ-গুলোকে পৃথক করে ফেললে এই সিরাম, বা রক্ত-রস পাওয়া যায়। একে সাধারণতঃ বলে লিম্‌প ↑। (2) বিশেষতঃ ঘোড়ার দেহে কোন রোগ-জীবাণু প্রবেশ করিয়ে তার রক্ত-কোষের তরল পদার্থে ওই রোগ-জীবাণুর প্রতিরোধক অ্যাণ্টি-বায়োটিক ↑ পদার্থ সৃষ্টি করা হয় ; বিশেষ অর্থে একেও বলে সিরাম। ঘোড়ার এরূপ সিরাম নিয়ে ওই বিশেষ জীবাণু-দুষ্ট রোগীর দেহে অনুপ্রবেশ করানো হয়, যাকে বলে 'সিরাম ইন্‌জেক্‌শন'। এই সিরামের অ্যাণ্টিবায়োটিক ↑ পদার্থ রোগীর দেহের রক্তে প্রবিষ্ট জীবাণুদের রোগা-ক্রমণ ও বংশবৃদ্ধি রোধ করে।

সিরিয়াম (cerium) — মৌলিক ধাতব পদার্থ ; সাংকেতিক চিহ্ন Ce, পারমাণবিক ওজন 140·13, পার-মাণবিক সংখ্যা 58 ; ইস্পাতের মত কতকটা ধূসর বর্ণের, কিন্তু নরম ধাতু। মোনাজাইট ↑ প্রভৃতি কতকগুলো দুষ্প্রাপ্য খনিজ থেকে পাওয়া যায়। গ্যাস-লাইটের শিখার ম্যাণ্টেল ↑ ও সিগারেট - লাইটারের তথাকথিত ফ্লিণ্ট ↑ নামক পাইরোফোরিক ↑ অ্যালয়ে সিরিয়াম ধাতু মেশানো হয়।

সিল্‌ভাইন (sylvine) — খনিজ পটাসিয়াম ক্লোরাইডের (KCl) বিশেষ নাম ; এ থেকেই সাধারণতঃ পটা-সিয়ামের নিষ্কাশন ও যৌগ গঠন করা হয়। খনিজটি **সিল্‌ভিনাইট** (sylvinite) নামেও পরিচিত।

সিল্‌ভার (silver) — রৌপ্য, মৌলিক ধাতু ; সাংকেতিক চিহ্ন Ag (আর্জে-ণ্টাইন), পারমাণবিক ওজন 107·85, পারমাণবিক সংখ্যা 47 ; বেশ সাদা ও অপেক্ষাকৃত নরম ধাতব পদার্থ। সহজেই এর তার ও পাত করা যায়।

এটা সব চেয়ে ভাল তড়িৎ-পরিবাহী ধাতু। কোন-কোন স্থানে বিশুদ্ধ অবস্থায় রৌপ্য পাওয়া যায়; কিন্তু অধিকাংশ রৌপ্যই সিল্‌ভার সালফাইড (Ag_2S), সিল্‌ভার ক্লোরাইড, ($AgCl$) প্রভৃতি খনিজ যৌগিক থেকে নিষ্কাশিত হয়। খনিজ সিলভার সাল্‌ফাইড সাধারণতঃ **আর্জেণ্টাইট**, বা **সিলভার-গ্ল্যান্স** নামে পরিচিত। 'সিল্‌ভার ক্লোরাইড' খনিজকে বলা হয় **হর্ণ-সিল্‌ভার** ↑। মুদ্রা ও অলঙ্কারাদি তৈরি করবার জন্যে রূপা যথেষ্ট প্রয়োজন হয়। এর বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ ফটোগ্রাফিতে ↑ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সিল্‌ভার নাইট্রেট (silver nitrate) — একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় 'সিলভার সল্ট', $AgNO_3$; পদার্থটা **লুনার কস্টিক** ↑ নামেও পরিচিত। সাদা স্ফটিকাকার পদার্থ, জলে দ্রবণীয়। বিশেষ-বিশেষ রাসায়নিক বিশ্লেষণের কাজে, ঔষধ হিসেবে ও ধোবার কাপড় চিহ্নিত করার কালি (মার্কিং ইঙ্ক) তৈরি করবার জন্যে সল্টটা যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়।

সিল্‌ভার প্লেটিং (silver plating) — রূপার ইলেক্‌ট্রোপ্লেটিং ↑; কোন সিল্‌ভার-সল্টের দ্রবণের মাধ্যমে ইলেক্‌ট্রোলিসিস ↑ প্রক্রিয়ার সাহায্যে বিভিন্ন ধাতব জিনিসের উপরে রূপার পাত্‌লা আস্তরণ দেওয়ার কৌশল।

সিলিকন (silicon)—মৌলিক পদার্থ; সাংকেতিক চিহ্ন Si, পারমাণবিক ওজন 28·06, পারমাণবিক সংখ্যা 14; রাসায়নিক হিসেবে কার্বনের ↑ অনুরূপ একটা মৌলিক পদার্থ। এর দু'রকম অ্যালোট্রোপ ↑ দেখা যায়— একটা পাট্‌কিলে রঙের চূর্ণ; অপরটা গাঢ় ধূসর বর্ণের স্ফটিকাকার। বিভিন্ন প্রকার স্বভাবজাত (বালি) সিলিকা ↑, সিলিকেট ↑ প্রভৃতি হলো এর বিভিন্ন যৌগিক পদার্থে গঠিত।

সিলিকা (silica) — সিলিকন ডাইঅক্সাইড, SiO_2; বিশুদ্ধ বালুকা। বর্ণহীন কঠিন অদ্রাব্য পদার্থ; অত্যধিক তাপ ব্যতীত গলে না। সাধারণ বালুকা, কোয়ার্টজ ↑, ফ্লিন্ট ↑, রক-ক্রস্টাল ↑ প্রভৃতি সবই মূলতঃ সিলিকা; বিভিন্ন আকারে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। কাঁচের প্রধান উপাদান হলো এই সিলিকা (গ্লাস ↑); বিভিন্ন ধাতব অক্সাইডের সঙ্গে এর রাসায়নিক মিলনে বিভিন্ন ধাতব সিলিকেট ↑ সল্ট উৎপন্ন হয়ে থাকে; যেমন, সোডিয়াম সিলিকেট, $Na_2O.\ SiO_2$, অর্থাৎ Na_2SiO_3; অনুরূপ পদার্থ ক্যালসিয়াম সিলিকেট, $CaSiO_3$; যা বিভিন্ন প্রস্তরের একটা প্রধান উপাদান।

সিলিকেট (silicate) — সিলিসিক অ্যাসিডের (H_2SiO_3) বিভিন্ন সল্ট। সাধারণতঃ ধাতব অক্সাইডের সঙ্গে সিলিকার ↑ রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন প্রস্তর, মাটি প্রভৃতি হলো ক্যালসিয়াম, ম্যাগ্নেসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতুর এরূপ সিলিকেট পদার্থে গঠিত। ধাতব সিলিকেট সবই সিলিকার ↑, অর্থাৎ বালির ধাতব যৌগিক রূপ।

সিলিকোন্‌স (silicones)—সিলিকন অক্সাইড (SiO) ও বিভিন্ন হাইড্রো-কার্বনের ↑ বিশেষ রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন প্ল্যাস্টিকের ↑ মত এক শ্রেণীর জৈব পলিমার ↑ পদার্থ। এরূপ পদার্থের রাসায়নিক গঠনের সাধারণ ফর্মুলা হলো (R_2SiO) n ; এর মধ্যে R হলো হাইড্রোকার্বন রেডিক্যাল ↑, n হলো সেই সংখ্যা, যত সংখ্যক অণু মিলিত হয়ে পলিমারিজেশন ↑ ঘটে। এই শ্রেণীর পদার্থগুলোর জল, তাপ ও তড়িৎ-শক্তি প্রতিরোধ করবার বিশেষ কার্যকারিতা আছে। জলের মধ্যে, বা অত্যন্ত উত্তপ্ত স্থানে ব্যবহার করবার জন্যে রেজিন ↑, ল্যাকার ↑ প্রভৃতি পদার্থের সঙ্গে সিলিকোন্‌স মিশ্রিত করা হয়।

সিলিকোসিস (silicosis) — এক প্রকার রোগ, যা সিলিকা-কণা (প্রস্তর-চূর্ণ, বালু-কণা প্রভৃতি) শ্বাস-বায়ুর সঙ্গে ভিতরে গেলে শ্বাস-নালী ও ফুস্‌ফুসের প্রদাহ-জনিত রোগের সৃষ্টি হয় ; যেমন— পাথর-ভাঙ্গা ও খনিজ প্রস্তরাদির কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের অনেক সময় হয়ে থাকে।

সিলিজ গ্রীণ — (Scheele's green) উজ্জ্বল সবুজ বর্ণের স্ফটিকাকার পদার্থ বিশেষ ; রাসায়নিক হিসেবে হলো অবিশুদ্ধ কিউপ্রিক আর্সেনাইট, $CuHAsO_3$; একটা বিষাক্ত পদার্থ। পোকা-মাকড় ধ্বংস করতে ও পেইন্ট, পিগ্‌মেণ্ট ↑ প্রভৃতি তৈরি করবার জন্যে ব্যবহৃত হয়।

সিস্‌মোগ্রাফ (seismograph) —ভূ-কম্পন নির্দেশক যন্ত্র ; ভূমিকম্পের সময়ে ভূ-পৃষ্ঠের অতি সামান্য কম্পনেও এরূপ যন্ত্রের বিশেষ সঞ্চলনক্ষম একটি শলাকা কম্পনের তীব্রতার হ্রাস-বৃদ্ধি অনুযায়ী আন্দোলিত হয়ে প্লেটের উপর তরঙ্গায়িত রেখাপাত করে।

সুটিং স্টার (shooting star) — যে মিটিওরাইট ↑ প্রচণ্ড বেগে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার ফলে বায়ুর সংঘর্ষে প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে ; আর তাকে জলন্ত একটা নক্ষত্র যেন আকা-শের এ-দিক থেকে ও-দিকে ছুটে যায় বলে মনে হয়। এ-জন্যে একে সাধা-রণতঃ বলা হয় 'সুটিং স্টার' ; বাংলায় বলে নক্ষত্রপাত। প্রকৃতপক্ষে এটা নক্ষত্র নয় ; অতি দ্রুত গতিশীল জলন্ত মিটিওরাইট, বা উল্কাপিণ্ড মাত্র।

সুপার-কুলিং (supercooling) — প্রত্যেক তরল পদার্থ-ই একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতায় (টেম্পারেচার) ঠাণ্ডা করলে তা জমে গিয়ে কঠিন অবস্থায় রূপান্ত-রিত হয় ; এই উষ্ণতাকে ওই তরল পদার্থের 'ফ্রিজিং পয়েণ্ট' ↑, বাংলায় হিমাংক বলে। বিশেষ অবস্থায় কোন তরল পদার্থকে আবার এই ফ্রিজিং পয়েণ্টের নিম্নতর উষ্ণতায়ও ঠাণ্ডা করা যেতে পারে ; কিন্তু তরল পদার্থটা জমে কঠিন হয় না। কোন তরলকে এরূপ অতি-শীতল করবার ব্যবস্থাকে বলে 'সুপার-কুলিং' ; আর তখন ওই তরল পদার্থের **মেটাস্টে-ব্‌ল** (metastable) অবস্থা বলা হয়। কোন কঠিন পদার্থের একটা ক্ষুদ্র দানা

ওর মধ্যে ফেলে দিলে, কখন-কখন বা সামান্য একটু নাড়া-চাড়া দিলেই ওই তরল পদার্থ জমে সম্যক কঠিন হয়ে পড়ে। তখন ওর উষ্ণতা বেড়ে গিয়ে আবার তার নির্দিষ্ট 'ফ্রিজিং পয়েন্ট' উষ্ণতায় উঠে যায়।

স্থগার অব লেড্ (sugar of lead) — লেড্ অ্যাসিটেট ; মিষ্ট স্বাদযুক্ত, কিন্তু অতি বিষাক্ত একটি অজৈব যৌগিক পদার্থ। যৌগটির একটি এটা বিশেষ নাম।

সুপার নোভা (super nova) — মহাশূন্যের স্তিমিত(নিস্তেজ, মৃতপ্রায়) তারকাকে বলে **নোভা,** এদের তাপ ও জ্যোতির উৎস (হাইড্রোজেনের ফিসন ↑) নিঃশেষিত হয়ে উপরিভাগ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে এবং ক্রমে সংকুচিত হচ্ছে। এই সংকোচনের ফলে এদের অভ্যন্তরস্থ জলন্ত অংশ বেরিয়ে এসে মাঝে-মাঝে সহসা অল্পকালের জন্যে এদের উজ্জ্বল দেখায়। কখন-কখন এরূপ স্তিমিত তারকা, বা নোভার অভ্যন্তরস্থ জলন্ত ও গলিত পদার্থের পারমাণবিক রূপান্তরের (ট্রান্সমুটেসন ↑) ফলে উত্তাপ অত্যধিক বেড়ে যায় এবং সহসা আবার বিশেষ উজ্জ্বল দেখায়। এই অবস্থায় একে বলে **'সুপার নোভা'।**

সুপার প্লানেট (super planet) — সৌর পরিবারের (সোলার সিষ্টেম ↑) যে-সব গ্রহের দূরত্ব (সূর্য থেকে) পৃথিবীর দূরত্বের চেয়ে বেশি, অর্থাৎ যে-সব গ্রহ পৃথিবীর কক্ষপথের বাইরে নিজ-নিজ নির্দিষ্ট কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে; যেমন—মঙ্গল (মারস্ ↑), বৃহস্পতি (জুপিটার ↑) প্রভৃতি গ্রহ; এদের **সুপিরিয়র প্লানেট**-ও বলে। আর, পৃথিবীর চেয়ে সূর্যের নিকটবর্তী বুধ (মার্কারি ↑) ও শুক্র (ভেনাস ↑) নামক গ্রহ দুটিকে বলা হয় **'ইন্‌ফিরিয়র'** প্লানেট।

সুপারফস্‌ফেট (superphosphate) — সাধারণতঃ 'সুপার ফস্‌ফেট অব লাইম' বুঝায়; এক রকম কৃত্রিম রাসায়নিক সার (ফার্টিলাইজার ↑)। এর রাসায়নিক গঠনে 'ক্যালসিয়াম-ডাইহাইড্রোজেন ফস্‌ফেট' নামক রাসায়নিক যৌগ থাকে। এভাবে যথেষ্ট ফস্‌ফরাস ↑ ও ক্যালসিয়াম থাকায় পদার্থটা কৃষি-জমিতে উৎকৃষ্ট সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সুপারসোনিক্স (supersonics)— শব্দ-তরঙ্গের শ্রুতিসীমা (অডিবিলিটি লিমিট ↑) অপেক্ষা অধিকতর দ্রুত স্পন্দনশীল (frequency) শব্দ-তরঙ্গ। বিশেষপ্রক্রিয়ায়কোয়ার্ট ↑ জক্রস্ট্যালের দ্রুত স্পন্দন ঘটিয়ে এরূপ অত্যধিক স্পন্দন-বিশিষ্ট তরঙ্গমালা উৎপন্ন করা যায়। একে **আলট্রাসোনিক্স** (ultrasonics)-ও বলে। শ্রুত শব্দ-তরঙ্গের গতি (সাউণ্ড ↑) প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় 1120 ফুট, ঘণ্টায় প্রায় 760 মাইল। এর চেয়ে অধিক গতিশীলতা (velocity) বুঝাতেও কখন - কখন সুপারসোনিক, বা আলট্রাসোনিক কথাটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে; যেমন, কোন এরোপ্লেনের 'সুপারসোনিক' গতি বললে বুঝতে

হবে, সেটা শব্দ-তরঙ্গের চেয়েও দ্রুত-গতিতে চলে।

সুপার স্যাচুরেশন (supersaturation)—অতি-সম্পৃক্ততা; সাধারণতঃ নির্দিষ্ট উষ্ণতায় নির্দিষ্ট পরিমাণ তরল পদার্থের মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণ কোন দ্রাব্য পদার্থ দ্রবীভূত থাকলে ওই দ্রবকে বলে 'স্যাচুরেটেড সল্যুসন' ↑। বিশেষ অবস্থায় কখন-কখন ওই দ্রবের মধ্যে আরও দ্রাব্য পদার্থ দ্রবীভূত থাকতে পারে। কোন তরল পদার্থের এরূপ অবস্থাকে বলা হয় 'সুপারস্যাচুরেশন'; আর ওই দ্রবের তখন **মেটাস্টেব্‌ল** অবস্থা বলা হয়। ওই দ্রাব্য পদার্থের একটা ক্ষুদ্র দানা ওর মধ্যে ফেলে দিলে দ্রবের এই অতিসম্পৃক্ত অবস্থা নষ্ট হয়ে যায়; এবং সঙ্গে-সঙ্গে তার থেকে অতিরিক্ত দ্রবিত পদার্থ স্ফটিকাকারে পৃথক হয়ে পড়ে। (ক্রস্টালিজেশন ↑)

সুপারহিটেড স্টিম (superheated steam) — যে জলীয় বাষ্প 100° সেন্টিগ্রেড অপেক্ষাও অধিকতর উত্তপ্ত। সাধারণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে জল 100° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় বাষ্পীভূত হয় এবং উৎপন্ন বাষ্পের উষ্ণতাও সেই 100° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হয়ে থাকে। কিন্তু বিশেষ ব্যবস্থায় আবদ্ধ পাত্রে (বায়ুমণ্ডলীয় চাপের অধিক চাপে) জল বাষ্পীভূত করলে এই 'সুপারহিটেড স্টিম', অর্থাৎ 100° সেন্টিগ্রেডের। অধিক উত্তপ্ত জলীয় বাষ্প পাওয়া যায়।

সেক্‌সন (section) — কর্তিত অংশ; উদ্ভিদ, অথবা প্রাণিদেহের যে সূক্ষ্ম অংশ কেটে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে তার জৈব গঠন পরীক্ষা করা হয়। আবার কাটা, বা কর্তন অর্থেও কথাটা কখন কখন ব্যবহৃত হয়ে থাকে; যেমন, **রিসেক্‌সন** (resection) মানে দেহের কোন দূষিত, বা রুগ্ন হাড় কেটে ফেলা। **ভিভিসেক্‌সন** (vivisection) হলো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্যে কোন জীবিত প্রাণীর অঙ্গচ্ছেদ করা। আবার, **বাইসেক্‌সন** (bisection) কথাটার মানে সমদ্বিখণ্ডে কাটা।

সেক্টর (sector) — কৌণিক বৃত্তাংশ। কোন বৃত্তের যে-কোন দুইটি ব্যাসার্ধ (কেন্দ্র ও পরিধির যে-কোন দু'টি বিন্দুর সংযোজক রেখা) দ্বারা কেন্দ্রস্থ কোণে সীমাবদ্ধ বৃত্তাংশ। (সার্কল ↑)

সেক্টর
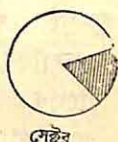
সেকেণ্ড (second) — (1) সময় পরিমাপের ইংলণ্ডীয় একক; যার কাল-পরিমাণ হলো এক 'সিডিরিয়াল ডে'র ↑ মোটামুটি 1/86,164·1 অংশ, অথবা এক 'মিন সোলার ডে'র ↑ 1/86,400 অংশ। (2) জ্যামিতিক কোণ পরিমাপের একক বিশেষ; = 1/3600 ডিগ্রি; 60 সেকেণ্ড = 1 মিনিট, 60 মিনিট = 1° ডিগ্রি।

সেকেণ্ডারি কয়েল (secondary coil) — ট্রান্সফর্মারের ↑ বহির্ভাগের বৃহত্তম তার-কুণ্ডলী। (প্রাইমারি কয়েল ↑)

সেকেণ্ডারি সেল (secondary cell) — যে সেলে ↑ সোজাসুজি

তড়িৎ উৎপাদিত হয় না; কোন প্রাইমারি সেল ↑, অর্থাৎ ব্যাটারি ↑, ডায়নামো ↑ প্রভৃতি তড়িৎ-উৎপাদক যন্ত্র থেকে তড়িৎ-শক্তি এর মধ্যে কৌশলে আহিত করে রাখা হয় মাত্র। তারপরে প্রয়োজনের সময় এ-থেকে আবার তড়িৎ-প্রবাহ পাওয়া যায়; যেমন — কোন স্টোরেজ ব্যাটারি ↑, অ্যাকুমুলেটর ↑ প্রভৃতি।
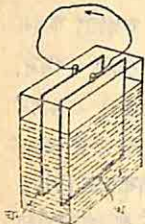
অ্যাকুমুলেটর

সেক্সট্যাণ্ট (sextant) — সাধারণতঃ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে গগনমণ্ডলে গ্রহ-নক্ষত্রাদির কৌণিক উচ্চতা পরিমাপের জন্যে ব্যবহৃত এক রকম যন্ত্র। এর সাহায্যে কোন জ্যোতিষ্ক পৃথিবীর দিঙমণ্ডলের কত ডিগ্রি ঊর্ধ্বে অবস্থিত, রাত্রে তার পরিমাণ যে-কোন সময়ে সহজে মাপা যায়। যন্ত্রে সংলগ্ন একখানা দর্পণ ঘুরিয়ে কোন নক্ষত্রের আলোক-রশ্মি প্রতিফলিত করে অপর এক খানা স্থির-সংবদ্ধ দর্প্ণে পুনরায় প্রতিফলিত করা হয়। এই প্রতিফলনের ফলে প্রতিবিম্বিত নক্ষত্রটা যন্ত্রের মধ্যে পৃথিবীর দিঙ্মণ্ডলে অবস্থিত বলে মনে হয়। ওই প্রথম দর্পণখানা যত ডিগ্রি ঘুরিয়ে স্থির-দর্পণে নক্ষত্রটার প্রতিফলিত রশ্মি দেখা যাবে, দিঙ্মণ্ডল থেকে নক্ষত্রটা তত ডিগ্রি কৌণিক উচ্চতায় অবস্থিত হবে। যন্ত্রের সঙ্গে সংলগ্ন বৃত্তাংশে - চিহ্নিত স্কেল থেকে ওই সব ডিগ্রির পরিমাণ সহজেই স্থির করা সম্ভব হয়ে থাকে।
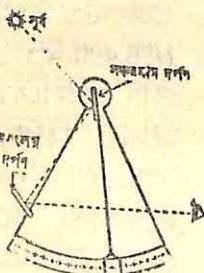
সেক্সট্যাণ্ট

সেগ্মেণ্ট (segment) — বৃত্তাংশ; কোন বৃত্তের যে-কোন একটি জ্যা (কর্ড, সার্কল ↑) বৃত্তটাকে যে দুই অংশে বিভক্ত করে। বৃত্তের ব্যাসও হলো তার একটা জ্যা, যেটা বৃত্তকে সমান দুই অংশে, অর্থাৎ দুই সেগ্মেণ্টে বিভক্ত করে। এরূপ সেগ্মেণ্টকে বলে অর্ধবৃত্ত, বা সেমি-সার্কল।
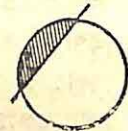
সেগ্মেণ্ট

সেডিমেণ্ট (sediment) — কঠিন পদার্থের যে-সব সূক্ষ্ম কণিকা তৎমিশ্রিত তরল পদার্থ থেকে থিতিয়ে তলায় পড়ে। **'সেডিমেণ্টারি রক'** মানে সমুদ্রের তলদেশে সমুদ্র-জল থেকে থিতিয়ে-পড়া কঠিন পদার্থাদি জমে যে পাহাড় সৃষ্টি হয়েছে।

সেডিমেণ্টেশন (sedimentation)— রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিভিন্ন পদার্থের দ্রবণের পারস্পরিক বিক্রিয়ায় উৎপন্ন কঠিন পদার্থের সূক্ষ্ম কণিকা অধঃক্ষিপ্ত হওয়ার পদ্ধতি; এক কথায়, অধঃক্ষেপন। অধঃক্ষিপ্ত পদার্থকে বলে অধঃক্ষেপ (sediment); কল্ক, বা গাদ।

সেণ্টিগ্রেড ডিগ্রি (centigrade degree) — থার্মোমিটারের ↑ সাহায্যে পদার্থের উষ্ণতা পরিমাপের একটা একক। সাধারণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে

(760 মিলিমিটার, ব্যারোমিটার ↑) জলের স্ফুটনাংক ও হিমাংক উষ্ণতার পার্থক্যের 100 ভাগের এক ভাগ উষ্ণতাকে এক ডিগ্রি (1°C) সেন্টিগ্রেড বলা হয়। সেন্টিগ্রেড স্কেলে জলের হিমাংক (যে উষ্ণতায় জল জমে বরফ হয়, বা বরফ গলতে স্বরু করে) 0° সেন্টিগ্রেড, এবং স্ফুটনাংক (যে উষ্ণতায় জল ফুটে বাষ্পীভূত হতে আরম্ভ করে) 100° সেন্টিগ্রেড ধরা হয়। বিভিন্ন থার্মোমিটারে পদার্থের উষ্ণতা পরিমাপের জন্যে **ফারেন্‌হিট** ↑ এবং **রুমার** ↑ নামে অন্য দু'রকম স্কেল, বা এককও ব্যবহৃত হয়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদিতে সচরাচর সেন্টিগ্রেড এককেই পদার্থের উষ্ণতা পরিমিত হয়ে থাকে।

সেন্‌ট্রিফিউজ (centrifuge)—কোন তরল পদার্থের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংমিশ্রিত কঠিন পদার্থের অতি সূক্ষ্ম কণিকাগুলোকে পৃথক করে ফেলবার জন্যে উদ্ভাবিত এক প্রকার যন্ত্র। দুটা নলাকার লম্বা পাত্রে ওই তরল পদার্থ রেখে যন্ত্রটার দু'দিকে সংবদ্ধ রাখা হয়। পরে ওই পাত্র - সমেত যন্ত্রটাকে অতি দ্রুত বেগে কিছুকাল ঘোরালে মিশ্রিত কণিকাগুলো পাত্রের তলায় (কণিকাগুলো বিশেষ হাল্‌কা হলে কোন-কোন ক্ষেত্রে উপরিভাগেও) একত্র সঞ্চিত হয়ে পড়ে; পরিষ্কার তরল পদার্থ পৃথক হয়ে যায়। পদার্থ-বিদ্যার যুক্তি অনুসারে ঘূর্ণ্যমান পদার্থে উদ্ভূত সেন্‌ট্রিফিউগ্যাল ↑ ফোর্সের প্রভাবে এরূপ সম্ভব হয়ে থাকে। এ-জন্যে এ-সব যন্ত্রকে 'সেন্‌ট্রিফিউগ্যাল মেসিন'ও বলা হয়।
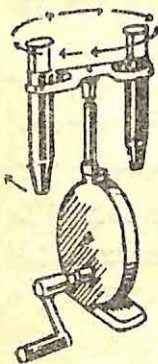
সেন্‌ট্রিফিউজ

সেন্ট্রিফিউগ্যাল ফোর্স (centrifugal force) — কেন্দ্রাতিগ বল; কোন কেন্দ্রীয় বিন্দুর চারদিকে চক্রাকারে কোন বস্তু দ্রুত বেগে ঘোরালে ওই বস্তুতে যে বহির্মুখী গতি-শক্তির সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে, যে বলের প্রভাবে ওই বস্তুটা ঘূর্ণ্যায়মান থাকে, অর্থাৎ তার কেন্দ্রাভিমুখী বল, বা টানকে বলা হয় **সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স**। সেন্ট্রিফিউগ্যাল ফোর্স ও সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স পরস্পর সমান, কিন্তু বিপরীতমুখী। সুতা বেঁধে এক টুক্‌রা পাথর চক্রাকারে ঘোরালে হাতের যে-শক্তি, বা বল সুতার মাধ্যমে ওটাকে কেন্দ্রের দিকে টেনে রাখে, তা-ই হলো সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স। আর, এরূপ ঘূর্ণনের ফলে প্রস্তর-খণ্ডে যে বল সৃষ্টি হয় তাকে বলে সেন্ট্রিফিউগ্যাল ফোর্স। সূতাটা যদি ছিঁড়ে যায় তবে ওই প্রস্তরখণ্ডটা তার মধ্যে উদ্ভূত সেন্ট্রিফিউগ্যাল ফোর্সের প্রভাবে সবেগে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়ে যায়।

সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স (centripetal force) — চক্রাকারে ঘূর্ণ্যমান বস্তুতে উদ্ভূত কেন্দ্রাভিমুখী বল; সেন্ট্রিফিউগ্যাল ফোর্স ↑।

সেন্টিমিটার (centimeter) — এক মিটারের ↑ শতাংশ ; = 0·494 ইঞ্চি।

সেপ্‌সিস (sepsis) — জীবাণুর বিষ-ক্রিয়ায় দেহের কোন অংশের মাংসপেশী দূষিত হয়ে যাওয়ার অবস্থা। **সেপ্‌টিক উন্‌ড** মানে জীবাণু-সংক্রমণের ফলে যে ক্ষত বিষাক্ত হয়েছে। **সেপ্টিসিমিয়া** — রক্ত-দুষ্টি, রক্তে বিষ-ক্রিয়া।

সেফ্‌টি ল্যাম্প (safety lamp) — ডেভি ল্যাম্প ↑।

সেণ্টার অব গ্র্যাভিটি (centre of gravity) — বস্তুর ভার-কেন্দ্র। ভূ-পৃষ্ঠের যে-কোন বস্তুর অভ্যন্তরস্থ যে বিন্দুতে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি (গ্র্যাভিটেশন ↑) কেন্দ্রীভূতভাবে বস্তুটাকে আকর্ষণ করে। কোন বস্তুর উপরে পৃথিবীর এই আকর্ষণ-শক্তির সমষ্টিগত পরিমাণই হলো বস্তুটার ওজন, বা ওয়েট ↑। বস্তুর আকার-আয়তন স্থির থাকলে যে অবস্থানেই সেটা রাখা যাক না কেন, তার 'সেণ্টার অব গ্র্যাভিটি', বা ভার-কেন্দ্র সর্বদাই স্থির থাকবে ; আর তার ফলে ওই নির্দিষ্ট বিন্দুতে সর্বদাই বস্তুটার ভারসাম্য রক্ষিত হবে।

সেরিব্রাম ও সেরিবেলাম

সেরিব্রাম (cerebrum) — মস্তিষ্কের প্রধান অংশ ; যাকে বাংলায় 'গুরুমস্তিষ্ক' বলে। এটা মস্তিষ্ক, বা মগজের উর্ধ্ব-ভাগের বৃহত্তর অংশ ; আর, এই সেরিব্রামের নিচের দিকে করোটির পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত মগজের যে পৃথক আর একটি ক্ষুদ্রতর ও অপেক্ষাকৃত কঠিনতর অংশ রয়েছে তাকে বলে **সেরিবেলাম** (cerebellum) ; বাংলায় যাকে বলা হয় লঘু-মস্তিষ্ক।

সেল (cell) — জীবকোষ ; যে-সকল অতিক্ষুদ্র সজীব কণার সমবায়ে জীব-দেহ গঠিত। উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহের সংগঠক জীবকণা, যে-গুলি বিশেষ প্রক্রিয়ায় (কোষ-বিভাজন, cell division) বিভাজিত ও বিগুণিত হয়ে-হয়ে সংখ্যায় বাড়ে এবং জীবের দেহ-বৃদ্ধি ঘটে ; (সোমা, soma ↑)। প্রতিটি জীবকোষ, বা সেল এক প্রকার সজীব অর্ধ-তরল জীবপঙ্ক, বা **প্রোটোপ্লাজ্‌ম** (protoplasm ↑), ও তন্মধ্যে ভাসমান কেন্দ্রীণ, বা **নিউক্লিয়াস** ↑ , **গল্‌গি অ্যাপারেটাস** (golgi apparatus ↑), **সেণ্ট্রোসোম** (centrosome ↑), একাধিক **ভ্যাকুয়োল** (vacuoles ↑) লইয়া গঠিত। প্রাণিকোষের একটি নক্‌সা-চিত্র দেওয়া হলো।

সেণ্ট্রোসোম
গল্‌গি অ্যাপারেটাস
ভ্যাকুয়োল
নিউক্লিয়াস

জীবকোষের গঠন

সেল (cell), বৈদ্যুতিক, — তড়িৎ-কোষ ; রাসায়নিক ক্রিয়ার সাহায্যে তড়িৎ উৎপাদনের যন্ত্র। এর মধ্যে বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে

তড়িৎশক্তি উৎপাদিত হয়, এবং সঙ্গে-সঙ্গে তড়িৎ-পরিবাহী ধাতব তারের মাধ্যমে তা প্রবাহিত করে

ল্যাক্ল্যান্স ড্রাই সেল
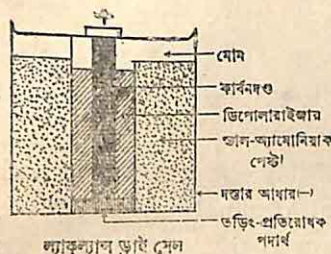
নিয়ে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যায়। তড়িৎ-কোষ প্রধানতঃ দু'রকম —**প্রাইমারি** সেল ↑ ও **সেকেণ্ডারি** সেল। সেকেণ্ডারি সেলে সোজাসুজি তড়িৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা থাকে না, (অ্যাকুমুলেটর ↑)। গঠন ও উপাদানের বিভিন্নতা অনুসারে প্রাইমারি সেল আবার নানা রকমের আছে, যেমন, লেক্ল্যান্স সেল ↑, ওয়েস্টটন সেল, ডেনিয়েল ↑ সেল প্রভৃতি। ইলেক্ট্রিক সেল, বা তড়িৎকোষে বিক্রিয়ক পদার্থগুলি কঠিন, বা শুষ্ক হলে তাকে বলে **ড্রাই সেল** (dry cell) ↑; আর তরল হলে বলা হয় **ওয়েট সেল** (wet cell)। একটি লেক্ল্যান্স ড্রাই সেলের চিত্র উপরে প্রদত্ত হলো।

সেলিনিয়াম (selenium) —মৌলিক পদার্থ; সাংকেতিক চিহ্ন Se; পারমাণবিক ওজন 78·96, পারমাণবিক সংখ্যা 34; পদার্থটা ধাতব নয়, রাসায়নিক ধর্ম অনেকটা গন্ধকের মত। বিভিন্ন ধাতব সাল্ফাইডের ↑ সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় নানা রকম ধাতব 'সেলিনাইড' সল্ট পাওয়া যায়। রাবার-শিল্পে ও রুবি-গ্লাস ↑ তৈরী করতে এর ব্যবহার আছে। এর ভৌত গঠনে নানা রকম অ্যালোট্রোপ ↑ দেখা যায়। আলোকের সংস্পর্শে এক রকম স্ফটিকাকার সেলিনিয়ামের তড়িৎ-পরিবহন ক্ষমতার তারতম্য লক্ষিত হয়; এ-জন্যে পদার্থটা ফোটো-ইলেক্ট্রিক সেলে ↑ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এরূপ বিশেষ ধরনের সেলকে **সেলিনিয়াম সেল** বলে।

সেলুলোজ (cellulose) — যে জৈব পদার্থে উদ্ভিদের দেহ-কোষ প্রধানতঃ গঠিত; অর্থাৎ বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ তন্তুর মূল রাসায়নিক উপাদান। এর রাসায়নিক গঠন মোটামুটি $(C_6H_{10}O_5)n$; এর 'n' হলো সেই সংখ্যা, যত সংখ্যক অণু সম্মিলিত হয়ে বিভিন্ন উদ্ভিদের বিভিন্ন শ্রেণীর সেলুলোজ গঠিত হয়, অর্থাৎ বিভিন্ন গঠনের পলিমার ↑ পদার্থে এর সৃষ্টি হয়ে থাকে। কাঠের মণ্ড, বা গুঁড়া, তুলা ও বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ আঁস এরূপ বিভিন্ন শ্রেণীর সেলুলোজ। কাগজ, প্লাস্টিক ↑, রেয়ন ↑, বিস্ফোরক পদার্থ (নাইট্রো-সেলুলোজ ↑) প্রভৃতি বিভিন্ন জিনিসের উৎপাদন-শিল্পে সেলুলোজ হলো মূল উপাদান।

সেলুলোজ অ্যাসিটেট (cellulose acetate) — তুলা, বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ তন্তু প্রভৃতি সেলুলোজ ↑ পদার্থের সঙ্গে বিশুদ্ধ (গ্ল্যাসিয়াল) অ্যাসিটিক ↑ অ্যাসিডের রাসায়নিক ক্রিয়ায় উৎপন্ন সল্ট, বা এস্টার ↑ জাতীয় সাদা কঠিন জৈব যৌগ। এ থেকেই রেয়ন ↑,

বিভিন্ন শ্রেণীর প্ল্যাস্টিক ↑ প্রভৃতি তৈরি হয়ে থাকে।

সেলুলোজ নাইট্রেট (cellulose nitrate) — নাইট্রোসেলুলোজ ↑; রাসায়নিক হিসেবে পদার্থটা হলো সেলুলোজের নাইট্রিক অ্যাসিড-এস্টার ↑। পদার্থটা একটা উগ্র বিস্ফোরক পদার্থ; এ থেকে আবার সেলুলয়েড ↑, কোন-কোন প্ল্যাস্টিক ↑ প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর পলিমার ↑ পদার্থও তৈরি হয়ে থাকে।

সেলুলয়েড (celluloid)—সেলুলোজ নাইট্রেট ↑ ও ক্যাম্ফরের (কর্পূর) রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন বিশেষ এক শ্রেণীর প্ল্যাস্টিক ↑ পদার্থ। ব্যাকেলাইট ↑ নামক পদার্থও এক শ্রেণীর সেলুলয়েড। বিভিন্ন কাজের জন্যে বিভিন্ন গঠনের সেলুলয়েড তৈরি হয়ে থাকে। বিশেষ পরিষ্কার ও স্বচ্ছ এক রকম সেলুলয়েডে চলচ্চিত্রের ফিল্ম তৈরি হয়। সব রকম সেলুলয়েডই বিশেষ দাহ্য পদার্থ।

সেলেস্টাইন (celestine) — ষ্ট্রন্‌সিয়াম ↑ সাল্‌ফেটের ($SrSO_4$) বিশেষ নাম; ষ্ট্রন্‌সিয়াম ↑ ধাতুর একটি প্রাকৃতিক আকরিক যৌগ।

সেলেস্চিয়াল ইকোয়েটর (celestial equator) — পৃথিবীর ভৌগোলিক ইকোয়েটর ↑, বা বিষুব-বৃত্তের সামতলিক ক্ষেত্রকে চারদিকে বর্ধিত করলে সুদূর মহাশূন্যে তা সেলেস্চিয়াল স্ফিয়ারকে ↑ যে কাল্পনিক বৃত্ত-রেখায় ছেদ করে। এক কথায় বলা যায়, নভোমণ্ডলীয় বিষুব-বৃত্ত; অর্থাৎ যে মহাবৃত্ত-রেখা জেনিথ ↑ ও নাদির ↑ থেকে সমদূরবর্তীভাবে সেলেস্চিয়াল স্ফিয়ারকে বেষ্টন করে আছে বলে কল্পনা করা হয়। জ্যোতির্বিদ্যার পর্যবেক্ষণ ও গণনাদিতে নভোমণ্ডলে এরূপ বৃত্ত-রেখার কল্পনা করা আবশ্যক হয়ে থাকে।

সেলেস্চিয়াল ডেক্লিনেশন (celestial declination) — নভোমণ্ডলে কোন জ্যোতিষ্ক সেলেস্চিয়াল ইকোয়েটর ↑ থেকে যত ডিগ্রি কৌণিক

ডেক্লিনেশন (∠BES)
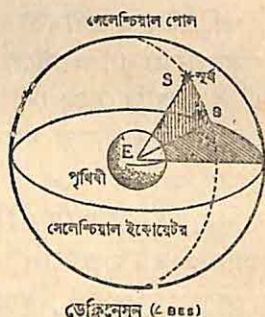
উচ্চতায় অবস্থিত তাকে বলা হয় ওই জ্যোতিষ্কের ডেক্লিনেশন। কোন গ্রহ-নক্ষত্রের ডেক্লিনেশন সাধারণতঃ ওই কোণের পরিমাপে নির্ধারিত হয়ে থাকে। প্রদত্ত চিত্রে S জ্যোতিষ্কের ডেক্লিনেশন হলো BES কোণ। বিশেষ যান্ত্রিক গঠনের দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই কোণ, বা ডেক্লিনেশন নিরূপিত হয়। (আবার কম্পাস ↑ যন্ত্রের সাহায্যে ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানের **ম্যাগ্নেটিক ডেক্লিনেশন** ↑ নিরূপিত হয়ে থাকে।)

সেলেস্চিয়াল স্ফিয়ার (celestial sphere) — নভোমণ্ডল; মহাশূন্যের সুদূরে যে এক গোলাকৃতি আবরণ, বা

চাঁদোয়ার গায়ে গ্রহ-নক্ষত্রাদি বিভিন্ন জ্যোতিষ্কগুলি অবস্থিত বলে আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয়। পৃথিবীর যে-কোন স্থানে দণ্ডায়মান দর্শক যেন ওই গোলাকার নভোতলের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে বলে ধরা হয়।

সেস্‌কুই- (sesqui-)—এক ও অর্ধাংশ, অর্থাৎ দেড় ভাগ। রসায়নে পূর্ণ-শমিত ও অর্ধ-শমিত লবণের মিশ্রণকে বলে 'সেস্‌কুই সল্ট'; যেমন, **সেস্‌কুই কার্বনেট** হলো (পূর্ণ-শমিত) কার্বনেট ও (অর্ধ-শমতি) বাইকার্বনেটের মিশ্র সল্ট; যেমন — সোডিয়াম সেস্‌কুই কার্বনেট ($Na_2CO_3.NaHCO_3.2H_2O$); একটা স্ফটিকাকার মিশ্র রাসায়নিক লবণ।

সোডা (soda)—সোডিয়ামের বিভিন্ন সল্ট। বিভিন্ন শ্রেণীর সোডা নামে পরিচিত; যেমন, ওয়াশিং সোডা ↑ হলো সোডিয়াম কার্বনেট, $Na_2CO_3.10H_2O$; বেকিং সোডা ↑ হলো সোডিয়াম বাইকার্বনেট, $NaHCO_3$; কস্টিক সোডা ↑ হলো সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড, NaOH।

সোডা ওয়াটার (soda-water) — চাপ প্রয়োগে যথেষ্ট পরিমাণ কার্বন-ডাইঅক্সাইড (CO_2) গ্যাস আবদ্ধ পাত্রের জলে দ্রবীভূত ও পরিপৃক্ত করে যে পানীয় তৈরি হয়। বোতলের মুখ খুলে প্রযুক্ত চাপ মুক্ত করলে দ্রবীভূত অতিরিক্ত গ্যাস সশব্দে বেরিয়ে যায়। সুস্বাদু করবার জন্যে বিভিন্ন সুগন্ধ নির্যাস, স্যাকারিন ↑ প্রভৃতি এই জলে মেশান হয়ে থাকে। একে বাংলায় বলে বাতান্বিত জল (aerated water)। লিমনেড, আইসক্রিম সোডা, প্রভৃতি সব রকমের 'ইরেটেড ওয়াটার', অর্থাৎ বাতান্বিত জলেই যথেষ্ট কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস দ্রবীভূত থাকে। নামে 'সোডা ওয়াটার' বললেও এতে সোডা কিন্তু সাধারণতঃ থাকে না।

সোডা লাইম (soda - lime) — সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড (কস্টিক সোডা ↑, NaOH) এবং ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইডের [স্লেক্‌ড লাইম ↑, $Ca(OH)_2$] সংমিশ্রণে উৎপন্ন কঠিন পদার্থ। কুইক - লাইমের ↑ সঙ্গে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের জলীয় দ্রব মিশিয়ে এক রকম নরম পদার্থ পাওয়া যায়; একে উত্তপ্ত করে শুকিয়ে ফেললেই এই 'সোডা লাইম' উৎপন্ন হয়। পদার্থটা কাঁচশিল্পে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস শুষে নেয় বলে জিনিসটা আবদ্ধ স্থানের ওই গ্যাস - মিশ্রিত দূষিত বায়ু শোধনের জন্যেও অনেক সময় পদার্থটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সোডিয়াম (sodium) — মৌলিক ধাতব পদার্থ; সাংকেতিক চিহ্ন Na (ন্যাট্রিয়াম), পারমাণবিক ওজন হলো 22·997, পারমাণবিক সংখ্যা 11; সাদা নরম ধাতু। বিশেষ রাসায়নিক শক্তিসম্পন্ন; জলের সংস্পর্শে এর দ্রুত রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত হয়ে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড (**কস্টিক সোডা** ↑, NaOH) উৎপন্ন হয়, এবং হাইড্রোজেন ↑ গ্যাস

বিমুক্ত হয়ে যায়। বায়ুর সংস্পর্শে এর অক্সাইড যৌগ সৃষ্টি হয়; ফলে সোডিয়াম অক্সাইডের একটা আবরণ উপরিভাগে জমে গিয়ে বিশুদ্ধ সাদা সোডিয়াম দ্রুত ধূসর হয়ে পড়ে। এরূপ অত্যধিক রাসায়নিক শক্তির জন্যে সোডিয়াম বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় না; কিন্তু বিভিন্ন রকম সোডিয়াম সল্ট প্রচুর পরিমাণে পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে; এদের মধ্যে সাধারণ খাদ্য-লবণ (সোডিয়াম ক্লোরাইড, NaCl,) জলে - স্থলে পৃথিবীর সর্বত্র, বিশেষতঃ সমুদ্র-জলে মিশ্রিত রয়েছে। ক্যালসিয়ামের মত এটাও একটা অত্যাবশ্যকীয় মৌল।

সোডিয়াম কার্বনেট (sodium carbonate) — ওয়াশিং সোডা ↑, $Na_2CO_3 . 10H_2O$; সাদা স্ফটিকাকার পদার্থ, জলে বিশেষ দ্রবণীয়; তীব্র ক্ষারধর্মী। সচরাচর বস্ত্রাদি পরিষ্কার করতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। (লেব্ল্যাঙ্ক প্রোসেস ↑)।

সোডিয়াম বাইকার্বনেট (sodium bi-carbonate) — বেকিং সোডা ↑, $NaHCO_3$; সাদা চূর্ণ পদার্থ, জলে দ্রবণীয়, একটা বেসিক ↑ সল্ট। বেকিং পাউডার ↑ তৈরি করবার জন্যে ব্যবহৃত হয়। একেই বলা হয় 'খাওয়ার সোডা', পেটের পীড়ায় লোকে যা অনেক সময় খায়।

সোডিয়াম পারক্সাইড (sodium peroxide) — Na_2O_2; সোডিয়াম খোলা বাতাসে পোড়ালে যে হলদে গুঁড়া পাওয়া যায়। জলের সঙ্গে এর রাসায়নিক মিলনের ফলে কস্টিক-সোডা, অর্থাৎ সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড ↑ (NaOH) উৎপন্ন হয় ও অতিরিক্ত অক্সিজেন ↑ গ্যাস বিমুক্ত হয়ে বেরিয়ে যায়।

সোডিয়াম সাল্‌ফেট (sodium sulphate) — সোডিয়াম ক্লোরাইড, (NaCl, 'কমন সল্ট' ↑) এবং সালফিউরিক অ্যাসিডের (H_2SO_4) রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন সল্ট। পদার্থটার বিশেষ নাম **গ্লোবার্স সল্ট**, $Na_2SO_4 . 10H_2O$; সাদা স্ফটিকাকার পদার্থ, জলে দ্রবণীয়। ঔষধ হিসাবে এর যথেষ্ট ব্যবহার আছে।

সোডিয়াম সিলিকেট (sodium silicate) — সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড ও সিলিকার ↑ (SiO_2) রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন স্বচ্ছ স্ফটিকাকার সল্ট, Na_2SiO_3। একে আবার **ওয়াটার গ্লাস**-ও ↑ বলে; জলে দ্রবণীয়। এর স্বচ্ছ জলীয় দ্রব মাখিয়ে ডিম সংরক্ষণ করা হয়। বস্ত্রাদি পরিষ্কার করবার জন্যেও ব্যবহার করা যেতে পারে; ওয়াশিং সোপে অনেক সময় জিনিসটা মেশানো হয়ে থাকে।

সোডিয়াম থায়োসাল্‌ফেট (sodium thiosulphate) — থায়ো ↑ অ্যাসিডের সোডিয়াম সল্ট; এর রাসায়নিক নাম হলো সোডিয়াম হাইপো-সালফাইট, $Na_2S_2O_3 . 5H_2O$; সাদা স্ফটিকাকার পদার্থ, জলে বিশেষভাবে দ্রবণীয়। পদার্থটা সাধারণতঃ **হাইপো** নামেই সমধিক

পরিচিত; ফটোগ্রাফির ↑ কাজে যা বিশেষ প্রয়োজনীয় (হাইপো ↑)।

সোডিয়াম নাইট্রেট (sodium nitrate) — চিলি সল্ট-পিটার ↑, $NaNO_3$; একে 'সোডা-নাইটার'-ও বলে। সাদা স্ফটিকাকার পদার্থ, জলে দ্রবণীয়। নাইট্রিক-অ্যাসিড ↑ তৈরি করবার জন্যে এবং জমির সার হিসেবে এর যথেষ্ট ব্যবহার আছে।

সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড (sodium hydroxide) — একে সচরাচর বলা হয় কস্টিক সোডা, NaOH ; সাদা কঠিন, নরম পদার্থ। খোলা রাখলে বাতাসের জলীয় বাষ্প টেনে নিয়ে গলে যায়। এর জলীয় দ্রব তীব্র ক্ষারধর্মী (অ্যাল্কালি ↑), যাতে লাগে তাই পুড়ে ক্ষয়ে যায়; বিশেষ রাসায়নিক শক্তিসম্পন্ন। এর রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন সোডিয়াম সল্ট উৎপন্ন হয়ে থাকে।

সোপ (soap) — সাবান। বিভিন্ন ফ্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম, বা পটাসিয়াম সল্টের সংমিশ্রণ; রাসায়নিক হিসেবে জিনিসটা হলো প্রধানতঃ স্টিয়ারিক ↑, পামিটিক ও অলিইক ↑ নামক তিন রকম জৈব ফ্যাটি অ্যাসিডের তিন রকম সোডিয়াম সল্টের সংমিশ্রণে গঠিত। এ-সব ফ্যাটি অ্যাসিডের পটাসিয়াম সল্টের সংমিশ্রণেও এক রকম নরম সাবান তৈরি হয়ে থাকে, যাকে বলে **সফ্‌ট সোপ** ↑। উত্তাপের সাহায্যে নানা রকম জান্তব চর্বি ও উদ্ভিজ্জ তেলের সঙ্গে কস্টিক সোডার (বা কস্টিক পটাসের) রাসায়নিক মিলন ঘটিয়ে সাবান তৈরি হয়। কস্টিক সোডা, বা পটাসের যে জলীয় দ্রব ব্যবহৃত হয় তাকে **কস্টিক-লাই** বলে। এই রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে বিশেষ এক রকম হাইড্রোলিসিস ↑ (**স্যাপোনিফিকেশন** ↑) প্রক্রিয়ায় সাবানের সঙ্গে উপজাত পদার্থ (বাই-প্রোডাক্ট ↑) হিসেবে গ্লিসারিন ↑ পাওয়া যায়। সাধারণ ব্যবহারের সাবানে কস্টিক সোডা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিভিন্ন ফ্যাটি অ্যাসিডের অন্যান্য ধাতব সল্টগুলোকেও অনেক সময় 'সোপ' বলা হয়; যদিও সেগুলো সোডিয়াম, বা পটাসিয়াম সল্টের মত সাবান জাতীয় পদার্থ নয়।

সোপ স্টোন (soap stone) — এক রকম নরম পাথর; প্রধানতঃ ম্যাগ্নেসিয়াম সিলিকেটে গঠিত। এরূপ পাথরকে সহজেই মসৃণ গুঁড়ায় পরিণত করা যায়, আর তা সাবানের মত বেশ তেল্‌তেলে লাগে; এ-জন্যে একে সোপস্টোন বলা হয়। এর অন্য নাম হলো **স্টিয়াটাইট** ↑। এর অতি-মসৃণ চূর্ণকে বলে 'ট্যাল্ক ↑ পাউডার'। এরূপ পাথরের তৈরী বিভিন্ন জিনিস উপযুক্তরূপে উত্তপ্ত করলে বেশ শক্ত ও ব্যবহারযোগ্য হয়ে থাকে।

সোলানিন (solanine) — বিশেষ শ্রেণীর উদ্ভিদ-দেহে প্রাপ্ত বিষাক্ত (অ্যাল্কালয়েড ↑) পদার্থসমূহ বুঝায়; যেমন—তামাক গাছের মূলে, কোন কোন আলুর পাতায়, বেলাডোনা ↑ উদ্ভিদে থাকে ও নিষ্কাশিত করা হয়।

সোলার ইক্লিপ্‌স (solar eclipse) —সূর্য-গ্রহণ। ইক্লিপ্‌স (সোলার)↑।

সোলার-ডে (solar day) — সাধারণতঃ সূর্যের উদয় ও অস্ত লক্ষ্য করে দিনের (দিন-রাত্রির) কাল পরিমাণ করা হয়; কিন্তু সূর্যের উদয়াস্তের সময় নির্দিষ্ট নয়, দিন-রাত্রি ছোট-বড় হয়। এজন্যে পর-পর দু'দিন সূর্যের মেরিডিয়ানে ↑ আসার সময়ের ব্যবধানকে সাধারণতঃ এক দিন ধরা যায়। সূর্যের অয়ন-গতির (সলিস্টিস্ ↑) জন্যে এই সময়ও বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে; সুতরাং সম্বৎসরে দিনের এরূপ পরিবর্তনশীল কাল পরিমাণের গড় নিয়ে প্রকৃত সৌর দিন, বা 'মিন সোলার-ডে' স্থির করা হয়েছে, অর্থাৎ মোটামুটি 24 ঘণ্টায় এক দিন ধরা হয়।

সোলার সিস্টেম (solar system) — সৌর পরিবার; সূর্য ও তার চার দিকে ভ্রাম্যমান নয়টি গ্রহ নিয়ে মোটামুটি এই সোলার সিস্টেম, বা 'সৌর পরিবার' গঠিত। সূর্য থেকে দূরত্বের ক্রম অনুসারে গ্রহগুলো ঃ বুধ (মার্কারি ↑), শুক্র (ভেনাস ↑), পৃথিবী (আর্থ ↑), মঙ্গল (মারস ↑), বৃহস্পতি (জুপিটার ↑), শনি (স্যাটার্ন ↑), ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো। এই ন'টা গ্রহ নিজ-নিজ নির্দিষ্ট উপবৃত্ত কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। এ-সব ছাড়া মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্বে একটা গ্রহপুঞ্জ (অ্যাস্টারয়েড্‌স ↑) সূর্যের চারদিকে ঘুরছে; একেও সৌর পরিবারের অন্তর্গত ধরা হয়। গ্রহগুলো মহাশূন্যে প্রায় একই সমতলে বিভিন্ন কক্ষে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে।

...সোম (...some) — জীব-কোষের বিশেষ উপাদান; কোষের (সেল ↑) সংগঠক কণিকা বিশেষ, যেমন— ক্রোমোসোম ↑। **সেণ্ট্রোসোম** হলো জৈব কোষের কেন্দ্রীণে (নিউক্লিয়াস ↑) অবস্থিত অতি ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক কণিকা; যাকে কোষের মধ্য-কণা বলা যায়। জীব-কোষের বিভাজন-প্রক্রিয়ায় (সেল ডিভিসন) বস্তুতঃ কোষের অভ্যন্তরস্থ এই মধ্যকণা, বা সেণ্ট্রোসোম ক্রমাগত দ্বিধা বিভক্ত হয়ে-হয়ে নূতন-নূতন কোষ গঠিত হয় এবং জীবের দেহবৃদ্ধি ঘটে।

সোমা (soma) — জীব-দেহ। **সোম্যাটিক** কথাটার মানে 'দেহ-সম্বন্ধীয়'; যেমন, **সোম্যাটিক সেল** — দেহ-কোষ, অর্থাৎ জীব-দেহের রক্ত-মাংস-হাড় প্রভৃতির সংগঠক জৈব কোষসমূহ; কিন্তু প্রজনন-কোষ নয়।

সোমাইট (somite) — অমেরুদণ্ডী পর্যায়ের (ইন্‌ভার্টিব্রেট ↑) নিম্নশ্রেণীর প্রাণিদেহের সংগঠক এক-একটি পর্ব, বা অংশ; যেমন—কেঁচো, কৃমি প্রভৃতির দেহ খণ্ডে-খণ্ডে সংযুক্ত হয়ে গঠিত হয়, তার এক-একটি খণ্ড, বা পর্বকে বলা হয় সোমাইট।

সোমারফিল্ড (Somerfield) — জার্মান পদার্থ-বিজ্ঞানী; জন্ম 1868 খৃষ্টাব্দে, মৃত্যু 1951 খৃষ্টাব্দে। রন্টগেন-রশ্মি, বা এক্স-রে ↑ আবিষ্কারক অধ্যাপক রন্টগেনের সুযোগ্য ছাত্র;

পরে পদার্থ-বিজ্ঞানের খ্যাতনামা অধ্যাপক ও গবেষক। বিভিন্ন বর্ণালির (স্পেক্‌ট্রাম ↑) গঠন, শক্তি-তরঙ্গের বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবিষ্কার।

সোলানিন (solanine)—উদ্ভিদজাত একটি বিষাক্ত উপক্ষার (অ্যাল্‌কালয়েড ↑)। তামাকের শিকড়, বেলেডোনার ↑ মূল প্রভৃতি 'সোলানাম' শ্রেণীর বিশেষ-বিশেষ উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশের রস থেকে পাওয়া যায়।

স্কেলারকোয়াণ্টিটি (scalar quantity) — যে-রাশির পরিমাণ স্কেলের একক সংখ্যায় প্রকাশ করা যায়; অর্থাৎ যার মাত্র সংখ্যাগত পরিমাণ আছে, কিন্তু গতি, বা দিগ্‌বাচক সংজ্ঞা নেই; যেমন, উষ্ণতা (টেম্পারেচার ↑), আর্দ্রতা (হিউমিডিটি ↑) প্রভৃতি হলো স্কেলার কোয়াণ্টিটি; কিন্তু বল (ফোর্স ↑), গতিবেগ (ভেলোসিটি ↑) প্রভৃতি নয়। এর কারণ, শক্তি, বা গতির পরিমাণ এবং প্রয়োগের দিক দুই-ই না জানলে এ-সব রাশির সম্যক ধারণা করা যায় না (ভেক্টর ↑)।

স্কেলিন ট্রায়েঙ্গল (scalene triangle)—যে জ্যামিতিক ত্রিভুজের সবগুলি বাহু ও কোণ পরস্পর অ-সমান।

স্কেলেরোস্কোপ (scleroscope)—কোন-কিছুর কাঠিন্য পরিমাপক যন্ত্র বিশেষ; অগ্রভাগে হীরক (diamond) খণ্ড-যুক্ত একটি নির্দিষ্ট ওজনের বস্তু নির্দিষ্ট উচ্চতা থেকে কঠিন জিনিসটির উপরে লম্বভাবে ফেলা হয় এবং প্রত্যাঘাতে কতটা উচ্চতায় উহা লাফিয়ে ওঠে তা মেপে তার কাঠিন্য পরিমিত হয়ে থাকে।

স্ক্রফুলা (scrofula) — গ্রীবাদেশস্থ গ্রন্থিগুলির (থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড ↑) এক প্রকার ক্ষয়রোগ বিশেষ। কঠিন মারাত্মক ব্যাধি।

স্কুনার (schooner)—পাশ্চাত্য দেশের এক প্রকার বিশেষ গঠনের পালের নৌকা; সাধারণতঃ এতে দুটা পৃথক পাল খাটানো হয়ে থাকে। আবার একটা মাত্র পাল-যুক্ত অনুরূপ আর এক শ্রেণীর নৌকাকে বলে **'স্লুপ'**। এ-গুলির পাল থাকে ত্রিকোণাকৃতি।
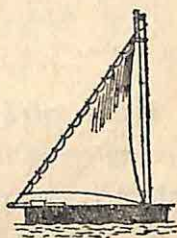
'স্লুপ' নৌকা

স্ক্রোটাম (scrotum) — অণ্ডকোষের চামড়ার আধার, বা আবরণসহ তদভ্যন্তরস্থ পুং-প্রজনন গ্রন্থি-কোষের অণ্ডদ্বয়কে (টেস্‌টিস) বলে স্ক্রোটাম।

স্ক্যাণ্ডিয়াম (scandium)—মৌলিক পদার্থ; সাংকেতিক চিহ্ন Sc, পারমাণবিক সংখ্যা 21; একটি দুষ্প্রাপ্য মৌলিক ধাতু।

স্ক্যাপুলা (scapula)—মানব-দেহের কণ্ঠাস্থির চওড়া পশ্চাদংশ; ঊর্ধ্ববাহুর প্রগণ্ডাস্থিটির সঙ্গে সংলগ্ন যে প্রশস্ত অস্থিটি কণ্ঠ থেকে পৃষ্ঠদেশে নিচের দিকে প্রলম্বিত রয়েছে।

স্ক্রুপল (scruple)—সোনারূপা, মণি-

মুক্তা প্রভৃতি মাপবার ইংলণ্ডীয় ওজন পরিমাণের একটা একক বিশেষ। এক আউন্সের 24 ভাগের এক ভাগ; =20 গ্রেণ। (ট্রয় ওয়েট ↑)।

স্টাইল (style)—স্ত্রী-পুষ্পের গর্ভদণ্ড; ফুলের অভ্যন্তরস্থ গর্ভাশয় (ওভ্যারি ↑) থেকে যে-সব সরু দণ্ড উপরে ওঠে ও যাদের মাথায় রেণুস্থলী, বা গর্ভমুণ্ড (ষ্টিগ্‌মা ↑) সংলগ্ন থাকে (পিষ্টিল ↑)।
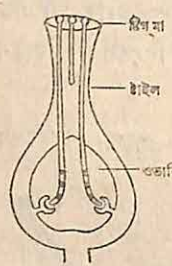
ষ্টাইল, বা গর্ভদণ্ড

স্টার্চ (starch) — উদ্ভিজ্জ শ্বেতসার পদার্থ; রাসায়নিক হিসেবে বিশেষ এক শ্রেণীর কার্বোহাইড্রেট ↑। চাউল, গম, যব প্রভৃতি বিভিন্ন শস্য-বীজে পদার্থটা স্বভাবতঃ সঞ্চিত থাকে। সাদা, স্বাদ-গন্ধহীন পদার্থ; জলে অদ্রাব্য। সামান্য কোন অ্যাসিড সংযোগে এর জলীয় মিশ্রণ ফুটালে বিশেষ এক প্রকার হাইড্রোলিসিস ↑ প্রক্রিয়ায় প্রথমে তা থেকে ডেক্‌স্ট্রিন ↑ উৎপন্ন হয়; ক্রমে তা আবার গ্লুকোজে ↑ রূপান্তরিত হয়ে যায়।

স্টার্চগাম (starch-gum) — শ্বেতসারের আঠা; ডেক্‌স্ট্রিন ↑। আটা, ময়দা প্রভৃতির আঠা।
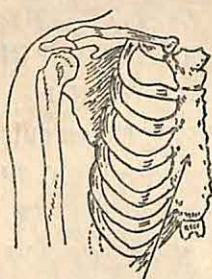
ষ্টার্নাম

স্টার্নাম (sternum) — বক্ষাস্থি, বক্ষদেশের লম্বভাবে যে চওড়া হাড়টির দুই পার্শ্বে বক্ষ-পঞ্জরের হাড়গুলি (রিবস্, ribs ↑) যুক্ত আছে।

স্টিপিউল (stipule) — উদ্ভিদের উপ-পত্র; গাছের ডালের, বা পত্র-কাণ্ডের মূলভাগে ক্ষুদ্র পত্রবৎ যে প্রত্যঙ্গ কোন-কোন উদ্ভিদে জন্মায়।

স্ট্রন্সিয়াম (strontium) — মৌলিক ধাতব পদার্থ। এর সাংকেতিক চিহ্ন Sr, পারমাণবিক ওজন 87·63, পারমাণবিক সংখ্যা 38; ধাতুটা ক্যালসিয়ামের অনুরূপ, দেখতে সাদা। বিভিন্ন খনিজ প্রস্তরে এর 'স্ট্রন্সিয়ানাইট' নামক স্বভাবজ স্ফটিকাকার কার্বনেট সল্ট পাওয়া যায়, যা থেকে ধাতুটা নিষ্কাশিত হয়ে থাকে। এর হাইড্রক্সাইড, $Sr(OH)_2$, যৌগিকটি শর্করা-শিল্পে চিনি পরিষ্কার করতে অনেক সময় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিভিন্ন স্ট্রন্সিয়াম-সল্ট লাল আলোক সৃষ্টি করবার জন্যে বাজির বারুদে মিশিয়ে জ্বালানো হয়। কোন-কোন সুকঠিন ধাতু-সংকর (অ্যালয় ↑) প্রস্তুতিতেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে

স্ট্রাটোস্ফিয়ার (stratosphere) — পৃথিবীর বায়ু-মণ্ডলের একটা বিশেষ স্তর। উত্তর ও দক্ষিণ মেরুপ্রদেশে এই স্তর ভূ-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় 6 মাইল এবং নিরক্ষীয় অঞ্চলে প্রায় $11\frac{1}{2}$ মাইল উচ্চে অবস্থিত। এই স্তরের উপর-নিচে বায়ুমণ্ডলীয় উষ্ণতা প্রায় স্থির থাকে, অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলের এই স্তরে উচ্চতার সঙ্গে-সঙ্গে উষ্ণতার তেমন

কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। এই বায়ুস্তরের উষ্ণতা নিরক্ষীয় অঞ্চলের উপরে প্রায় – 110° ফারেন্‌হাইট ↑, আর মেরু অঞ্চলের উপরে প্রায় – 40° ফারেন্‌হাইট (অর্থাৎ, অধিকতর উষ্ণ) হয়ে থাকে।

স্টিম (steam) — জলীয় বাষ্প; বাষ্পীভূত জল, (H_2O) মাত্র। জলের বয়েলিং পয়েন্ট ↑ 100° সেন্টিগ্রেড; এই তাপমাত্রা, বা এর অধিক উষ্ণতায় উত্তপ্ত করলে তরল জল এরূপ স্টিম, অর্থাৎ বাষ্পে রূপান্তরিত হয়ে যায়। জলীয় বাষ্প সম্পূর্ণ অদৃশ্য বায়বীয় পদার্থ। সাধারণতঃ মেঘের মত ধোঁয়াটে সাদা যে পদার্থকে সাধারণতঃ বাষ্প বলা হয়, তা প্রকৃতপক্ষে অতি সূক্ষ্ম জলকণা মাত্র, জলীয় বাষ্পের ঘনীভূত অবস্থা; তা প্রকৃত 'স্টিম', বা বাষ্প নয়।

স্টিম ইঞ্জিন (steam engine) — বাষ্পচালিত যন্ত্র, বা ইঞ্জিন; আবদ্ধ সুদৃঢ় আধারে (বয়েলার ↑) উৎপন্ন জলীয় বাষ্পের অত্যধিক চাপ নিয়ন্ত্রিত করে যে-যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন কৌশলে গতি সঞ্চারিত করা হয়। বাষ্পচালিত টার্বাইন ↑ যন্ত্রকেও স্টিম ইঞ্জিন বলা যেতে পারে। সাধারণতঃ যে যন্ত্রের প্রকাণ্ড ও সুদৃঢ় আধারে আবদ্ধ বাষ্পের প্রবল চাপের নিয়ন্ত্রিত শক্তিতে সংলগ্ন সিলিণ্ডারের মধ্যে পিস্টন চলাচল করে, এবং ওই পিস্টনের সঙ্গে সংলগ্ন অ্যাক্সেলের ↑ গতির প্রভাবে বিভিন্ন সব যান্ত্রিক ব্যবস্থায় ইঞ্জিনটা সামগ্রিকভাবে চলতে থাকে, অথবা বিশেষ ব্যবস্থায় অপর কোন যন্ত্র চালায়।

স্টিরিওক্যামিস্ট্রি (stereochemistry)—জৈব রসায়ন-বিদ্যার বিশেষ একটি শাখা, যাতে কোন জৈব যৌগের আণবিক গঠনে পরমাণুগুলি স্থানগতভাবে (অ-সমতলে) যে অবস্থানে বিন্যস্ত থাকে, তার বিচার - বিশ্লেষণ করা হয়; জৈব যৌগের আণবিক সংগঠনের তাত্ত্বিক রসায়ন।

স্টিব্‌নাইট (stibnite) — খনিজ অ্যান্টিমনি সাল্‌ফাইডের, Sb_3S_2, বিশেষ নাম। স্বভাবজাত এই সাল্‌ফাইড খনিজ থেকেই প্রধানতঃ বিশুদ্ধ অ্যান্টিমনি ↑ ধাতু নিষ্কাশিত হয়ে থাকে। ল্যাটিন **স্টিব্‌**- (stib-) মানে অ্যান্টিমনি (= **স্টিবিয়াম**, stibium) ধাতু সম্বন্ধীয়।

স্টিবাইন (stibine) — এক রকম বিষাক্ত গ্যাসীয় যৌগিক পদার্থ। রাসায়নিক হিসেবে পদার্থটা অ্যান্টিমনির গ্যাসীয় হাইড্রাইড ↑ (SbH_3) মাত্র; হাইড্রোজেন ও অ্যান্টিমনি ধাতুর একটা বাইনারি কম্পাউণ্ড ↑।

স্টিয়াটাইট (steatite) — সোপস্টোন ↑।

স্টিয়ারিক অ্যাসিড (stearic acid) — একটি জৈব অ্যাসিড [$CH_3(CH_2)_{18}.COOH$]; যা গ্লিসারিনের ↑ সঙ্গে রাসায়নিক সংযোগে যুক্ত হয়ে গ্লিসারাইড ↑ যৌগের আকারে জীবদেহের কঠিন চর্বি (ফ্যাট্, fat ↑) গঠন করে।

স্টিয়ারিন (stearin) — মোমের মত

সাদা ও নরম একটা জৈব রাসায়নিক পদার্থ ; এর মধ্যে প্রধানতঃ স্টিয়ারিক ↑ ও পামিটিক ↑ অ্যাসিড সম্মিলিতভাবে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। স্যাপোনিফিকেশন ↑ প্রক্রিয়ার সাহায্যে জীব-জন্তুর চর্বি থেকে পদার্থটা পাওয়া যায়।

স্টিয়াস্পিন (steaspin)—জীবদেহে অন্তঃনিঃসৃত একটি বিশেষ এঞ্জাইম (enzyme) ↑ পদার্থ ; যা ভুক্ত খাদ্যের ফ্যাট ↑ জাতীয় উপাদানের পরিপাকে সাহায্য করে।

স্টেইন্‌লেস স্টিল (stainless steel) — ক্রোমিয়াম ↑ -ঘটিত বিশেষ এক শ্রেণীর সুকঠিন ও সাদা চক্‌চকে ইস্পাত ; যাতে সহজে মরিচা ধরে না। এর মধ্যে সাধারণতঃ 70 থেকে 90% লোহা, 10 থেকে 30% ক্রোমিয়াম ↑ এবং মোটামুটি 0·1 থেকে 0·7% কার্বন থাকে। আজকাল বাসন-পত্র, বিশেষতঃ শস্ত্র-চিকিৎসার যন্ত্রাদি এরূপ ষ্টিলে তৈরি হয়ে থাকে।

স্টেলাইট (stellite) — মূল্যবান যন্ত্রাদি নির্মাণের উপযোগী অতি-কঠিন একটা ধাতু-সংকর; সাধারণতঃ টাংস্টেন, কোবাল্ট, ক্রোমিয়াম এবং মলিব্‌ডিনাম ↑ ধাতুর বিশেষ আনুপাতিক মিশ্রণে এটা তৈরি হয়।

স্টেলার (stallar) — নক্ষত্র (স্টার) সম্বন্ধীয়। **স্টেলেট** (stallet) মানে তারকাকৃতি ; নক্ষত্রের দৃশ্য আকার-বিশিষ্ট, 'অ্যাস্টারিক'।

স্টোমা (stoma) — উদ্ভিদের পাতায় যে-সব অতি-সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে। এই সব ছিদ্রপথে উদ্ভিদেরা খাদ্য প্রস্তুতির জন্যে বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) গ্যাস শোষণ করে এবং অক্সিজেন গ্যাস ত্যাগ করে (ফটোসিন্থেসিস ↑)। পাতার এই সব ছিদ্র, বা স্টোমাগুলো আবার উদ্ভিদের শ্বাস-ক্রিয়ায় নাসিকার কাজ করে। চিত্রে পাতার শিরা-জালের মধ্যে স্টোমার গঠন বহুগুণ বর্ধিতাকারে দেখানো হয়েছে। কথাটার বহুবচনে বলে **স্টোমাটা** (stomata)।
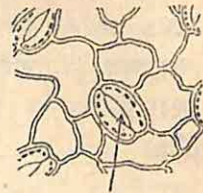
পাতার স্টোমা, বা শ্বাস-ছিদ্র

স্টোরেজ ব্যাটারি (storage battery) — যে-সব ব্যাটারিতে ↑ কোন জেনারেটর ↑, প্রাইমারি সেল ↑ প্রভৃতি তড়িৎ-উৎপাদক যন্ত্র থেকে তড়িৎ-শক্তি প্রবাহিত করে এনে আহিত ও সঞ্চিত করে রাখা হয়। এভাবে আহিত, বা সঞ্চিত তড়িৎ-শক্তি পরে আবার তা থেকে প্রবাহ-রূপে পাওয়া যায়। প্রয়োজনের সময়ে এরূপ ব্যাটারি থেকে তড়িৎ-প্রবাহ পাওয়া যায় বলে এগুলোকে সেকেণ্ডারি সেল-ও বলা হয়। এই শ্রেণীর সেল, অথবা ব্যাটারিতে সোজা-সুজি তড়িৎ-শক্তি উদ্ভূত, বা উৎপাদিত হয় না, সঞ্চিত রাখা হয়
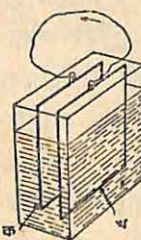
অ্যাকুমুলেটর

মাত্র। এই শ্রেণীর 'লেড অ্যাকুমুলেটর'↑, 'নিকেল আয়রণ সেল' প্রভৃতিকে তাই বলে স্টোরেজ সেল, বা ব্যাটারি। সাধারণতঃ মোটর গাড়ীতে সঙ্গে-সঙ্গে সহজে তড়িৎ-প্রবাহ পাওয়ার জন্যে এ-জাতীয় 'স্টোরেজ ব্যাটারি' সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

স্ট্রিক্‌নিন (strychnine) — 'নাক্স-ভোমিকা' নামক উদ্ভিদের বীজ থেকে প্রাপ্ত একটা অ্যাল্‌কালয়েড↑, $C_{21}H_{22}N_2O_2$; সাদা স্ফটিকাকার পদার্থ, জলে সামান্য দ্রবণীয়। পদার্থটা অত্যন্ত তিক্তস্বাদ যুক্ত এবং জীবের স্নায়ু-তন্ত্রের উপরে বিশেষ মারাত্মক বিষক্রিয়া-সম্পন্ন। অবশ্য বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে অতি সামান্য মাত্রায় বিভিন্ন রোগে ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

স্ট্রেপ্টোকক্কাস (streptococcus) —অতিসূক্ষ্ম গোলাকৃতি (কক্কাস↑ শ্রেণীর) অসংখ্য জীবাণু পরস্পর-সংবদ্ধভাবে শৃঙ্খলাকারে যে ব্যাক্টেরিয়া↑ সৃষ্টি হয়; যারা মানুষের রক্তে অনুপ্রবেশ করে নাসিকা ও গলায় রোগ সংক্রমণ করে; বিশেষতঃ গর্ভবতী নারীদের সন্তান-প্রসবকালে জর হয়ে দুরারোগ্য রোগের বিভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পায়।

স্ট্রেপ্টোমাইসিন (streptomycin) — পেনিসিলিনের↑ অনুরূপ একটা অ্যান্টিবায়োটিক↑ জৈব পদার্থ; 'অ্যাক্‌টিনোমাইসেস' নামক এক প্রকার তারকাকৃতি অতিসূক্ষ্ম ছত্রাক বিশেষ থেকে বিশেষ রাসায়নিক পদ্ধতিতে নিষ্কাশিত হয়েছে। কোন-কোন জীবাণু-ঘটিত রোগ প্রতিরোধের ব্যাপারে পদার্থটা পেনিসিলিনের চেয়েও শক্তিশালী; বিশেষতঃ যক্ষ্মা-রোগের জীবাণু (টিউবার্কল বেসিলাস↑) ধ্বংসের জন্যে এর প্রয়োগ বিশেষ কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে। ছত্রাক-ঘটিত এই বিশেষ রাসায়নিক পদার্থটা 1944 খৃষ্টাব্দে আমেরিকার বিজ্ঞানী ওয়াক্সম্যান কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়েছে।

স্ট্যাটিক (static) —স্থির; গতিশীল নয় এমন; যেমন স্ট্যাটিক ইলেক্‌ট্রিসিটি হলো স্থির-তড়িৎ, অর্থাৎ যে তড়িৎ-শক্তি কোন পদার্থে নিবদ্ধ থাকে, তা থেকে প্রবাহিত হয় না। বিশেষ ব্যবস্থায় এরূপ তড়িৎ সাধারণতঃ স্ফুরণের (স্পার্ক) আকারে পাওয়া যায়। রজন, অথবা কাচের একটা দণ্ড পশম, বা রেশমের কাপড় দিয়ে ঘসলে ওই দণ্ডে 'স্ট্যাটিক ইলেক্‌ট্রিসিটি' জন্মায়; আর ওই তড়িতাবিষ্ট দণ্ডের স্থির তড়িতের প্রভাবে হাল্‌কা কাগজের টুকরা আকৃষ্ট হয়ে থাকে।

স্ট্যাটিক্‌স (statics) —বিজ্ঞানের যে শাখায় বস্তুর স্থিরতা, অর্থাৎ 'স্থির অবস্থা' সম্পর্কীয় বিভিন্ন তথ্য আলোচিত ও নির্ধারিত হয়; যেমন, সেতু

নির্মাণের কাজে লোহার পাটির কতটা বক্রতায় সর্বাধিক ওজন বহন করেও সেটা স্থির থাকবে, অথবা জাহাজ নির্মাণের কাজে খোলটা কিরূপ হলে তার ভারসাম্য রক্ষিত হবে, এরূপ বিভিন্ন তথ্যের আলোচনা 'স্ট্যাটিক্‌স', বা স্থিতি-বিদ্যার অন্তর্গত।

স্ট্যাটিস্টিক্‌স (statistics) — পরিসংখ্যান-বিদ্যা, অথবা রাশি-বিজ্ঞান। একই জাতীয় বিভিন্ন নমুনার নির্দেশক রাশি, বা সূচক-সংখ্যার গড় নির্ণয় করে কোন বিষয়ের সাধারণ তথ্য নির্ধারণের এক বিশেষ বিজ্ঞান। এভাবে কোন দেশের শিক্ষা বিস্তার, শস্যোৎপাদন, জনসংখ্যা-বৃদ্ধি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের হার (rate), পরিমাণ প্রভৃতির মোটামুটি তথ্যাদি নির্ধারণ করাই রাশি-বিজ্ঞানের আলোচ্য।

স্ট্যানাম (stannum) — টিন। মৌলিক ধাতু টিনের ল্যাটিন নাম; এ-থেকেই রসায়নে টিনের সাংকেতিক চিহ্ন Sn করা হয়েছে। **স্ট্যানিক অক্সাইড** হলো SnO_2, স্ট্যানাস অক্সাইড SnO; যে যৌগিক পদার্থের মধ্যে টিন বাইভ্যালাণ্ট ↑ তাকে বলে 'স্ট্যানাস'; আর যার মধ্যে কোয়াড্রিভ্যাল্যাণ্ট (ভ্যালেন্সি ↑ চার) তাকে বলে 'স্ট্যানিক' সল্ট।

এপিগাইন্‌স

স্টিগ্‌মা (stigma)— উদ্ভিদের স্ত্রী-পুষ্পগুলোর গর্ভ-দণ্ডের অগ্রভাগ; যাকে গর্ভমুণ্ড বলা হয়। এর মধ্যে পুং-পুষ্পের পরাগ-রেণুর নিষেক ঘটলে তা স্ত্রী-পুষ্পের স্টাইল ↑, বা গর্ভদণ্ডের নল-পথে গিয়ে গর্ভাশয়ে প্রবিষ্ট হয়ে বীজের উৎপত্তি ঘটায়। স্টিগ্‌মা থেকে গর্ভ-দণ্ডের মধ্য দিয়ে ওই পরাগ-রেণু ফুলের গর্ভাশয়ের অভ্যন্তরস্থ ডিম্ব-কোষে পৌঁছায়, আর সেই ডিম্বকোষের মধ্যেই বীজ সৃষ্টি হয়ে থাকে। ফুলের স্টিগ্‌মা যেন গর্ভ কোষে পরাগ-রেণু প্রবেশের দ্বারস্বরূপ। কথাটার বহু-বচনে **স্টিগ্‌মাটা**। এভাবে বীজ-প্রসূ পুষ্প সমন্বিত উদ্ভিদ শ্রেণীকে বলা হয় এপিগাইন্‌স ↑।

স্ট্যাণ্ডার্ড (standard) —সুনির্দিষ্ট ও সর্বস্বীকৃত বিষয়; সর্বত্র সকলে স্বীকার করে নেবে কোন কিছুর এমন একক। যেমন, **স্ট্যাণ্ডার্ড মেজার**—বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত প্ল্যাটিনাম-নির্মিত একটা সুনির্দিষ্ট রডের দৈর্ঘ্যকে এক ফুট ধরা হয়েছে। **স্ট্যাণ্ডার্ড ফিল্ম** হলো সাধারণতঃ চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত 35 মিলিমিটার প্রস্থ-বিশিষ্ট ফিল্ম ↑। **স্ট্যাণ্ডার্ড গেজ** হলো রেলগাড়ীর দুই পাটি রেল-লাইনের মধ্যে 4 ফুট $8\frac{1}{2}$ ইঞ্চি ব্যবধান থাকলে সব দেশেই তাকে বলা হয় 'স্ট্যাণ্ডার্ড গেজ' লাইন। (স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম ↑)।

স্ট্যাণ্ডার্ড অ্যাট্‌মস্ফিয়ার (standard atmosphere) — বায়ুমণ্ডলীয় চাপের একক বিশেষ; 45° ল্যাটিচিউডে ↑ এবং সাগরপৃষ্ঠের সম-উচ্চে অবস্থিত কোন স্থানে 0° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় বায়ুর চাপ হয় 760 মিলিমিটার (29.92 ইঞ্চি) উচ্চ পারদ-স্তম্ভের ওজনের সমান; এই বায়ু-

মণ্ডলীয় চাপকে বলে এক 'নর্ম্যাল, বা স্ট্যাণ্ডার্ড অ্যাট্‌মস্ফিয়ার'। এক স্ট্যাণ্ডার্ড অ্যাট্‌মস্ফিয়ার = 1·0132 বার ↑, = প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে 14·72 পাউণ্ড পরিমিত চাপ। অবশ্য বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে বায়ুমণ্ডলের চাপ এই পরিমাণের উপরে, বা নিচে ওঠা - নামা করে থাকে। (বার, bar ↑)

স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম (standard time) — পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন স্থানে ঘড়ির সময়ের বিভিন্নতা লক্ষিত হয় ; কারণ, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত সর্বত্র এক সময়ে হয় না। পৃথিবীর যত পূর্বাভিমুখে যাওয়া যাবে তত আগে সূর্যোদয় হবে, সময় এগিয়ে যাবে। এভাবে এক দেশে যখন সকাল, তার পূর্বাঞ্চলে তখন অনেক বেলা হয়েছে, পশ্চিমাঞ্চলে অনেক রাত। এজন্যে পৃথিবীর সর্বত্র সময়ের একটা আন্তর্জাতিক স্থিরতা বিধানের জন্যে একটা নির্দিষ্ট স্থানের সময়কে 'স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম' ধরা হয়েছে। ইংলণ্ডের গ্রিন উইচ (0° মেরিডিয়ান ↑) নামক স্থানের সময়কে 'স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম,' বা নির্দিষ্ট সময়-কাল ধরা হয় ; একে **গ্রিনউইচ টাইম**-ও বলে। গ্রিনউইচের পশ্চিমে অবস্থিত কোন স্থানে প্রতি ডিগ্রি মেরিডিয়ান ↑ ব্যবধানে 4 মিনিট করে সময় স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম থেকে বাদ দিলে স্থানীয় সময় পাওয়া যায় ; আর পূর্বাঞ্চলে ওইরূপ প্রতি ডিগ্রি মেরিডিয়ানে 4 মিনিট করে সময় স্ট্যাণ্ডার্ড টাইমের সঙ্গে যোগ দিয়ে বিভিন্ন স্থানীয় ভৌগোলিক সময় স্থির করা হয়ে থাকে।

স্ট্যাণ্ডার্ড টেম্পারেচার অ্যাণ্ড প্রেসার — সংক্ষেপে বলে S.T.P. ; অথবা, 'নর্ম্যাল টেম্পারেচার অ্যাণ্ড প্রেসার' (N.T.P.)। এই সর্বসম্মত নির্দিষ্ট উষ্ণতা ও চাপে বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থের আয়তন মাপা, বা তুলনা করা হয়। এই নির্দিষ্ট চাপের পরিমাণ হলো 760 মিলিমিটার পারদ-স্তম্ভের ওজনের সমান (ব্যারোমিটার ↑) এবং উষ্ণতা (টেম্পারেচার ↑) হলো 0° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।

স্ট্যাণ্ডার্ড মিক্স (standard mix) —ইমারতাদির নির্মাণ-কার্যে সুকঠিন কন্‌ক্রিট জমাবার জন্যে যে অনুপাতে সিমেণ্ট ↑, বালি ও পাথরকুচি মেশানো হয়। এর সর্বসম্মত নির্দিষ্ট অনুপাত, অর্থাৎ 'স্ট্যাণ্ডার্ড মিক্স' হলো এক ভাগ সিমেণ্ট, দুই ভাগ বালি ও চার ভাগ পাথর-কুচি।

স্ট্যাণ্ডার্ড সেল (standard cell) —বিশেষ এক রকম প্রাইমারি সেল ↑ বা তড়িৎ-কোষ ; যেমন—ওয়েস্টন সেল, যাতে উৎপাদিত তড়িচ্চালক বল (ইলেক্‌ট্রোমোটিভ ফোর্স ↑) দীর্ঘ সময়ের জন্যে সুনির্দিষ্টভাবে স্থির থাকে। সাধারণ সেলে বিভিন্ন কারণে ইলেক্‌ট্রোমোটিভ ফোর্স, বা তড়িচ্চালক বলের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে ; কিন্তু স্ট্যাণ্ডার্ড সেলগুলিতে এই পার্থক্য তেমন লক্ষিত হয় না।

স্ট্যালাক্‌টাইট (stalactite) — প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য হিসাবে কোন-কোন

পার্বত্য গুহার ছাদ থেকে নিচের দিকে শূন্যে ঝুলন্ত যে-সকল স্তম্ভাকার, অথবা সরু কাঠির মত প্রস্তর দেখা যায়। গুহার তলদেশ থেকে দণ্ডায়মান এরূপ প্রস্তর-স্তম্ভগুলিকে বলা হয় **স্ট্যালাগ্‌মাইট** (stalagmite)।

স্ট্যাল্যালয় (stalloy)—সিলিকন ↑ ও আয়রনের ↑ এক প্রকার সংকর-ধাতুর ব্যবহারিক নাম; যা বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদির তড়িৎ-চুম্বকীয় অংশাদিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

স্ট্যাসিস (stasis) — অচল অবস্থা, বদ্ধতা; যেমন — **ইন্টেস্টাইন্যাল স্ট্যাসিস** (intestinal statis) হলো এক প্রকার রোগ বিশেষ, যাতে অন্ত্রীয় পেশীর দুর্বলতার ফলে ভুক্ত খাদ্যাবশেষ নলপথে স্বচ্ছন্দে নিম্নগামী হয় না; কোষ্ঠবদ্ধতা। রক্তের প্রবাহ সম্বন্ধেও কথাটা এরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

স্যাকারিন (saccharin) — সাদা স্ফটিকাকার পদার্থ, অত্যধিক মিষ্ট স্বাদযুক্ত। এর আণবিক সংকেত $C_6H_4SO_2CONH$; জলে অনেকটা দ্রবণীয়। **স্যাকার** (sacchar) — মানে সুমিষ্ট। চিনির চেয়ে প্রায় 550 গুণ অধিক মিষ্টি; কিন্তু এর কোন খাদ্যগুণ নেই, বেশি খেলে বরং অনিষ্টকর হতে পারে। পদার্থটা **স্যাক্‌সিন** (saxin) — নামেও পরিচিত। অবশ্য আজকাল লিনোনেড, আইসক্রিম প্রভৃতি পানীয়ে, এমন কি, বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যেও স্যাকারিন অতি সীমিত পরিমাণে ব্যবহার করা হচ্ছে; এর পরিমাণ বেশী হলে অত্যধিক মিষ্টত্বে তিক্ত স্বাদ আসে। একটা জৈব রাসায়নিক পদার্থ; কোলটার ↑ থেকে পাওয়া যায় টলুইন ↑; আবার বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে এই টলুইন থেকে পাওয়া যায় স্যাকারিন।

স্যাকারোমিটার (saccharometer) — শর্করা-দ্রবের ঘনত্ব পরিমাপক যন্ত্র বিশেষ। চিনির জলীয় দ্রবের মধ্যে দ্রবীভূত চিনির পরিমাণ নির্ধারণের জন্যে ব্যবহৃত এক রকম হাইড্রোমিটার ↑ যন্ত্র। দ্রবের মধ্যে শতকরা কত ভাগ চিনি আছে যন্ত্রের গায়ে তার নির্দেশক স্কেলের দাগ কাটা থাকে এবং তা থেকে দ্রবের ঘনত্ব জানা যায়।

স্যাকারোমিটার

স্যাকারিমিটার (saccharimeter) — শর্করা-দ্রবের ঘনত্ব পরিমাপের জন্যে ব্যবহৃত বিশেষ এক রকম যন্ত্র। এর যান্ত্রিক ব্যবস্থায় দ্রবের মধ্যে দিয়ে আলোক-রশ্মি পোলারাইজ্‌ড ↑ করা হয়। এই পোলারিজেশনের ↑ ফলে আপতিত রশ্মির যে কৌণিক বিবর্তন ঘটে তা থেকে দ্রবের ঘনত্ব নির্ণয় করা যেতে পারে। দ্রবীভূত শর্করার পরিমাণ নির্ধারণের এরূপ প্রক্রিয়াকে বলে **স্যাকারিমেট্রি**।

স্যাকারোজ (saccharose) — সুক্রোজ ↑।

স্যাকারোমাইসেস (saccharomyces) — যে-সব ঈষ্ট ↑ থেকে নিঃসৃত এন্‌জাইম ↑ চিনির জলীয়

দ্রবকে গাঁজিয়ে অ্যালকোহলে ↑ পরিণত করে। (ফার্মেণ্টেশন ↑)

স্যাচুরেটেড কম্পাউণ্ড (saturated compound)—যে-সব জৈব যৌগিক পদার্থের প্রত্যেকটি অণুর মধ্যে তার সংগঠক কার্বন পরমাণুগুলোর কোনটিরই অসংবদ্ধ কোন ভ্যালেন্সি ↑ থাকে না; অর্থাৎ প্রত্যেকটি ভ্যালেন্সিবণ্ড ↑ পরস্পরের সঙ্গে সংবদ্ধ হওয়ার ফলে গঠিত সুসম্পৃক্ত অণুর সমবায়ে যে-সব জৈব যৌগ সৃষ্টি হয়। এরূপ স্যাচুটেটেড কম্পাউণ্ড, অর্থাৎ সম্পৃক্ত যৌগের পরমাণুর সঙ্গে অন্য কোন পরমাণু, বা রেডিক্যাল ↑ যুক্ত করে আর কোন নূতন যৌগিক উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। যেমন—মিথেন ↑, CH_4, হলো একটি স্যাচুরেটেড কম্পাউণ্ড, বা সম্পৃক্ত যৌগিক; কিন্তু ইথিলিন ↑, C_2H_4, স্যাচুরেটেড নয়; এর সঙ্গে ক্লোরিন যুক্ত হয়ে 'ইথিলিন ডাইক্লোরাইড', $C_2H_4Cl_2$, (ডাচ্ ফ্লুইড ↑) তৈরি করা যায়।

স্যাচুরেটেড ভেপার (saturated vapour)—সর্বাধিক ঘনত্ব-বিশিষ্ট বাষ্প; কোন বদ্ধ আধারে কোন তরল পদার্থের যে-বাষ্পের ঘনত্ব এত অধিক যে, তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলেও অভ্যন্তরস্থ তরল আর বাষ্পীভূত হয় না।

স্যাচুরেটেড সল্যুসন (saturated solution)—সম্পৃক্ত দ্রবণ। নির্দিষ্ট উষ্ণতায় নির্দিষ্ট পরিমাণ তরল দ্রাবকে সর্বোচ্চ পরিমাণ দ্রাব্য পদার্থ দ্রবীভূত থাকলে ওই দ্রবণকে বলে সম্পৃক্ত দ্রব, বা স্যাচুরেটেড সল্যুসন ↑। এরূপ অবস্থায় সাধারণতঃ আরও দ্রাব্য পদার্থ (সলিউট ↑) ওই দ্রবে মেশালে আর তা দ্রবীভূত হয় না (সুপার-স্যাচুরেশন ↑)। অবশ্য উষ্ণতা কমালে সলিউট পৃথক হয়ে পড়ে; আর উষ্ণতা বাড়ালে আরও সলিউট দ্রবীভূত হয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রাবকের (সল্ভেণ্ট ↑) মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণ সলিউটের দ্রবীভূত থাকার অবস্থা, অর্থাৎ কোন 'সল্যুসনের স্যাচুরেশন', বা সম্পৃক্ততা প্রধানতঃ তার উষ্ণতার উপরই নির্ভর করে।

স্যাটেলাইট (satellite)—উপগ্রহ; যে-সব জ্যোতিষ্ক নিজ কক্ষপথে অপর কোন জ্যোতিষ্কের (গ্রহের) চারদিকে পরিভ্রমণ করে; যেমন — চন্দ্র পৃথিবীর স্যাটেলাইট, বা উপগ্রহ। জুপিটার ↑, মারস ↑ প্রভৃতি অধিকাংশ গ্রহেরই বিভিন্ন সংখ্যক স্যাটেলাইট লক্ষিত হয়ে থাকে। (স্যাটার্ন ↑)

স্যাণ্ড (sand) — বালি, বালুকা; রাসায়নিক গঠনের হিসেবে অবিশুদ্ধ সিলিকা ↑, SiO_2, অর্থাৎ 'সিলিকন ডাইঅক্সাইড'।

স্যাণ্ডস্টোন (sandstone) — পৃথিবীর প্রাথমিকযুগের অত্যধিক উত্তাপে গলিত বালুকা, বা স্যাণ্ড কালক্রমে জমে যে কঠিন প্রস্তরে পরিণত হয়েছে, বিশেষতঃ কোয়ার্টজ (quartz) ↑ শ্রেণীর প্রস্তর।

স্যান্টোনিন (santonin) — উদ্ভিদ বিশেষ থেকে নিষ্কাশিত একটা জৈব রাসায়নিক উপক্ষার (অ্যাল্কালয়েড ↑) পদার্থ; ঔষধ হিসেবে

সামান্য পরিমাণ ব্যবহারে অন্ত্রে উৎপন্ন বিভিন্ন প্রকার কৃমি-কীট বিনষ্ট হয়। সূত্রবৎ ও গোলাকার কৃমি সব এতে মরে ; কিন্তু চ্যাপ্টা ফিতে-কৃমি অবশ্য এতে ধ্বংস হয় না। এর মাত্রাধিক্যে বিষক্রিয়া ঘটতে পারে ; (ভার্মিফিউজ ↑)।

স্যাপোনিফিকেশন (saponification) — সাবান তৈরির রাসায়নিক-প্রক্রিয়া। অ্যালকালির ↑ বিক্রিয়ায় জান্তব চর্বি, বা উদ্ভিজ্জ তৈল থেকে উৎপন্ন হয় বিভিন্ন ফ্যাটি অ্যাসিডের এস্টার ↑ যৌগ। এই শ্রেণীর এস্টারগুলোর এক রকম হাইড্রোলিসিস ↑ প্রক্রিয়াকে বলে স্যাপোনিফিকেশন ; যার ফলে সাবান তৈরি হয়। সাধারণতঃ সোপ ↑, অর্থাৎ সাবানকে বিভিন্ন ফ্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম, বা পটাসিয়াম সল্টের সংমিশ্রণ বলা যেতে পারে। (সোপ ↑)

স্যাটার্ণ (saturn) — শনি গ্রহ। সূর্য থেকে এর দূরত্ব মোটামুটি 88 কোটি 60 লক্ষ মাইল ; বৃহস্পতি (জুপিটার ↑) ও ইউরেনাস ↑ গ্রহদ্বয়ের মধ্যবর্তী একটা কক্ষপথে এটা সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। এর সিডিরিয়াল ইয়ার ↑ পৃথিবীর হিসাবে প্রায় 29·46 বছর, অর্থাৎ সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে শনি গ্রহের পৃথিবীর হিসেবে লাগে 29·46 বছর। গ্রহটার ভর (মাস্ ↑) পৃথিবীর প্রায় 95 গুণ অধিক ; স্পেক্ট্রাম অ্যানালিসিস ↑ প্রক্রিয়ায় হিসেব করে জানা গেছে, এর উপরিভাগের উষ্ণতা প্রায় −150° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। শনিগ্রহের ন'টা ছোট-ছোট উপগ্রহ আছে ; গ্রহটাকে বেষ্টন করে একই সমতলে উহার আবার পর-পর তিনটা বলয়ও দেখা যায়। মনে হয়, এই বলয়গুলো এর কোন-কোন উপগ্রহের চুর্ণিত দেহাবশিষ্টে গঠিত হয়ে ওকে বেষ্টন করে ঘুরছে।

শনিগ্রহের বলয়

স্যাপ্রোফাইট (saprophyte) — মৃতজীবী উদ্ভিদ ; বিভিন্ন মৃত ও পচা জৈব পদার্থাদির উপরে ছত্রাক (ফাঙ্গাস ↑) জাতীয় যে-সব উদ্ভিদ জন্মায়। এক প্রকার ব্যাক্টেরিয়া-ও এরূপ স্যাপ্রোফাইট শ্রেণীর ফাঙ্গাস ↑ জাতীয় আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ-কণা বিশেষ ; এরা মৃত প্রাণী, বা উদ্ভিদ-দেহ বিশ্লিষ্ট করে পচিয়ে ফেলে।

স্যাপ্রোবায়োটিক্স (saprobiotics) — গলিত ধ্বংসোন্মুখ পদার্থে উৎপন্ন বিশেষ শ্রেণীর বিভিন্ন জীবাণু।

স্যাপ্রো (sapro-) মানে পচনশীল।

স্যাফায়ার (sapphire)—স্বভাবজাত এক রকম নীলবর্ণের স্বচ্ছ স্ফটিকাকার প্রস্তর বিশেষ। বাংলায় বলে নীলকান্ত মণি। রাসায়নিক হিসেবে পদার্থটা হলো কোরাণ্ডাম ↑, বা অ্যালুমিনা Al_2O_3 ; তার সঙ্গে সামান্য কিছু কোব্যাল্ট ↑ সংমিশ্রিত থাকায় প্রস্তরটা নীলবর্ণ দেখায়। উজ্জ্বল সুদৃশ্য ও মূল্যবান পাথর, অলঙ্কারাদিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

স্যামারিয়াম (samarium)—মৌলিক ধাতব পদার্থ; সাংকেতিক চিহ্ন Sm, পারমাণবিক ওজন 150·43, পারমাণবিক সংখ্যা 62; রেয়ার আর্থ ↑ ধাতু-গোষ্ঠির অন্যতম, অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। কোন-কোন স্থানে মোনাজাইটের ↑ সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় কখন-কখন অতি সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়।

স্যাল অ্যামোনিয়াক (sal-ammoriac — অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড NH_4Cl ; বাংলায় একে বলে নিশাদল। ড্রাই সেল ↑, অথবা ব্যাটারিতে ও অন্যান্য নানা কাজে ব্যবহৃত হয়।

স্যাল্‌ভোলাটাইল (salvolatile)—(i) অ্যামোনিয়াম বাইকার্বনেট (NH_4HCO_3), অ্যামোনিয়াম কার্বামেট, ($NH_4O.CO.NH_2$) এবং অ্যামোনিয়াম কার্বনেট, $(NH_4)_2$-CO_3, এই তিন রকম সল্টের সংমিশ্রণে উৎপন্ন পদার্থ। সাধারণতঃ একে এক কথায় 'অ্যামোনিয়াম কার্বনেট', বা 'অ্যামন-কার্ব' বলে। অবসাদ ও দুর্বলতায় একটা সাধারণ উত্তেজক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। উদ্বায়ী পদার্থ, তীব্র ঝাঁজ-বিশিষ্ট; সর্দি, মাথাধরা প্রভৃতির জন্যে লোকে এর গন্ধ সোঁকে, বা জলে দিয়ে পান করে। (ii) আবার, কেবল অ্যামোনিয়াম কার্বনেট, লেবুর রস ও অ্যালকোহল ↑ মিশিয়েও এরূপ বিশেষ এক প্রকার উত্তেজক পানীয় তৈরী করা যেতে পারে।

স্যাল্‌ভার্সান (salvarsan)—সিফিলিস (syphilis) নামক যৌনরোগের আর্সেনিক ↑-ঘটিত একটি ঔষধের ব্যবসায়িক নাম; একে আবার সাধারণতঃ '606' বলা হয়।

স্যাল্‌মোনেলা (salmonala)—এক শ্রেণীর বিশেষ ব্যাক্টেরিয়া ↑; এই শ্রেণীর রোগ-জীবাণুর সংক্রমণেই টাইফয়েড ↑ ও প্যারা-টাইফয়েড ↑ রোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

স্যালিনোমিটার (salinometer)—লবণাক্ত জলে দ্রবীভূত লবণের পরিমাণ নির্দেশক এক রকম হাইড্রোমিটার ↑ যন্ত্র। দ্রবের ঘনত্ব নিরূপণ করবার জন্যে যন্ত্রটির গায়ে লবণ ও জলের শতকরা হিসেবে স্কেলের দাগ কাটা থাকে। দ্রবে ডুবিয়ে এরূপ হাইড্রোমিটারের স্কেল থেকে সরাসরি সহজেই দ্রবীভূত লবণের শতাংশিক পরিমাণ জানা যায়।

স্যালিভা (saliva) — মুখের লালা; দাঁতের নিচের মাড়ির দুই প্রান্তে কানের নিম্নভাগে অবস্থিত 'প্যারোটিড গ্ল্যাণ্ড' ↑ থেকে যে তরল পদার্থ নির্গত হয়। খাদ্য গ্রহণের সময় এই লালারসের ক্ষরণ সমধিক বৃদ্ধি পায় এবং ভুক্ত খাদ্যকে সুপাচ্য করে তোলে।

স্ল্যাগ (slag) — ধাতু-মল; খনিজ ধাতব পদার্থ থেকে ধাতু নিষ্কাশনের প্রক্রিয়ায় ময়লা ও সংমিশ্রিত বিভিন্ন ধাতব পদার্থের যে গাদ বেরোয় (বেসিক-স্ল্যাগ ↑)। সাধারণতঃ গলিত বিশুদ্ধ ধাতুর উপরে এই গাদ, বা স্ল্যাগ ভেসে ওঠে।

স্লেক্‌ড লাইম (slacked lime) —

কলি-চুন ; রাসায়নিক নাম ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড ↑, $Ca(OH)_2$। পোড়া-চুন, বা কুইক্ লাইমের ↑ (CaO) সঙ্গে জলের রাসায়নিক ক্রিয়ায় উৎপন্ন পদার্থ ; এই বিক্রিয়ায় যথেষ্ট তাপ উৎপন্ন হয়ে থাকে (এক্সোথার্মিক ↑)। সাধারণ ব্যবহারের জলীয় চুন (লাইম ↑)।

স্লাইড রুল (slide-rule) — গাণিতিক গণনাদির জন্যে ব্যবহৃত এক রকম যন্ত্র বিশেষ। মোটামুটি এতে এক খানা স্কেল, বা রুলারের উপরে আর এক খানা রুলার এমনভাবে সংবদ্ধ থাকে যাতে উপরের রুলারখানা নিচের রুলারের উপরে ধীরে ধীরে সরিয়ে নেওয়া যায়। বিশেষ এক রকম (লগারিদ্ম ↑) হিসেবে উভয় রুলারে অনুরূপ দাগ কাটা থাকে। দুই স্কেলের দাগ-সংখ্যা যোগ-বিয়োগ করে বিশেষ নিয়মের হিসাব-তালিকা (লগারিদ্ম টেবল) অনুসারে গুণ ও ভাগের কাজ এর সাহায্যে অতি দ্রুত ও সহজে সম্পন্ন করা যেতে পারে।

স্পাইন (spine) — মেরুদণ্ড, বা শিরদাঁড়া ; একে (spinal column) -ও বলে। **স্পাইনাল কর্ড** (spinal chord) — মেরু রজ্জু, মেরুদণ্ডের কশেরুকা (vertebra) গুলির অন্তঃবর্তী স্নায়ু-রজ্জুগুচ্ছ। এর ভিতর দিয়েই দেহের যাবতীয় স্নায়ুজাল মস্তিষ্কে গেছে ; দেহের সব অনুভূতি, সাড়া ও স্বয়ংক্রিয় কর্মপ্রেরণা এর মাধ্যমেই কার্যকরী হয়। **স্পাইনাল অ্যানেস্থেসিয়া** — মেরুদণ্ডের পাশে বিশেষ শ্রেণীর ঔষধ ইন্‌জেক্‌শন করে দেহের নিম্নাংশ অবশ ও অনুভূতিহীন করে ফেলার অবস্থা।

স্পার্ক কয়েল (spirk coil) — ইণ্ডাক্‌সন কয়েল ↑।

স্পার্কিং প্লাগ (spirking-plug) — ইন্টারন্যাল কম্বাস্‌ন ইঞ্জিনে ↑ তড়িৎস্ফুরণের জন্যে যে যান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকে। ইঞ্জিনের সিলিণ্ডারের মধ্যে পেট্রলের ↑ বাষ্প ও বায়ুর সংমিশ্রণের ভিতরে এর সাহায্যে প্রয়োজনের সময়ে মুহূর্ত মধ্যে বৈদ্যুতিক স্ফুরণ ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়ে থাকে।

স্পার্মাসেটি (spermaceti) — মোমের মত এক রকম সাদা জৈব পদার্থ, যা তিমি মাছের চর্বি থেকে পাওয়া যায়। এর গলনাংক 40° থেকে 50° সেন্টিগ্রেড মাত্র। ক্রিম, পোমেড প্রভৃতি প্রসাধন-দ্রব্যে ও গায়ে-মাখা সাবান তৈরির কাজে জিনিসটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

স্পার্ম (sperm) — শুক্রকীট ; পুং-প্রজনন-কোষ। যৌন প্রজনন-ক্ষম বিভিন্ন জীবের অতি-সূক্ষ্ম এই স্পার্ম, বা পুং জীব-কোষগুলি বিভিন্ন গঠন ও আকার-আকৃতি বিশিষ্ট হয়ে থাকে। মাইক্রোস্কোপের ↑ ভিতর দিয়ে দেখলে এদের চেহারার
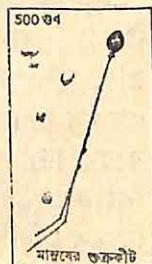
শুক্রকীট

পার্থক্য পরিষ্কার লক্ষ্য করা যায়। এদের আবার কথন-কখন **স্পার্মাটোজোয়া** (spermatozoa)-ও বলে। (সিমেন ↑)

স্পিজেল (spiegel) — লোহা, ম্যাঙ্গানিজ ও কার্বনের এক রকম সংকর-ধাতু। বিসিমার প্রোসেসে ↑ ইস্পাত (স্টিল ↑) তৈরি করবার প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় পরিমাণে এই স্পিজেল মেশানো হয়।

স্পিরিট অব সল্ট (spirit of salt) —হাইড্রোক্লোরিক (HCl) অ্যাসিডের ↑ বিশেষ নাম। সাধারণ খাদ্য-লবণ (NaCl) থেকে পাওয়া যায় বলে অ্যাসিডটা কখন-কখন এই নামে অভিহিত হয়।

স্পিরিট অব ওয়াইন (spirit of wine) — ইথাইল অ্যালকোহল ↑।

স্পিন্থারিস্কোপ (spinthariscope) — যে বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে জিঙ্ক-সাল্‌ফাইড মিশ্রিত রং-এর আস্তরণের উপরে অতি সূক্ষ্ম রেডিয়াম ↑ কণিকাগুলোকে অতি-ভাস্বর সমুজ্জ্বল বিন্দুবৎ সুস্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। (লুমিনাস পেইণ্ট ↑)।

স্পিরিট লেভেল (spirit-level) — একটা সাধারণ যন্ত্র, যার সাহায্যে কোন স্থানের অনুভূম সমতলতা পরীক্ষা করা হয়। একটা ছোট
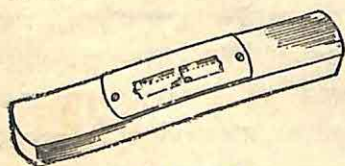
স্পিরিট লেভেল

বদ্ধমুখ কাঁচ-নলের মধ্যে কোন তরল পদার্থ, সাধারণতঃ স্পিরিট (অ্যালকোহল ↑) ভরতি করে তার মধ্যে সামান্য বাতাসের একটা ক্ষুদ্র বুদ্‌বুদ্‌ রাখা হয়। এটাকে সমতল একটা কাঠের ফ্রেমের মাঝখানে এঁটে স্পিরিট-লেভেল তৈরি হয়। কাঁচ-নলটার ঠিক মাঝখানে একটা দাগ কাটা থাকে। ফ্রেমটা সমতল স্থানে রাখলে কাঁচ-নলের বুদ্‌বুদ্‌টা ওই দাগের সঙ্গে মিলে যায় ; আর অসমতল হলে এক দিকে সরে গিয়ে স্থানের অসমতলতা নির্দেশ করে।

স্পেকুলাম মেটাল (speculum metal) — এক রকম সংকর-ধাতু ; দুই ভাগ তামা ও এক ভাগ টিন মিশিয়ে এটা তৈরি হয়। মাইক্রোস্কোপ ↑, এপিডায়াস্কোপ ↑ সিনেমা-যন্ত্র প্রভৃতিতে আলোক-রশ্মির যথাযথ প্রতিফলনের জন্যে নির্মিত প্রতিফলক দর্পণাদি সাধারণতঃ এ দিয়ে তৈরি হয়ে থাকে।

স্পুটনিক (sputnic) — পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহের রাশিয়ান নাম। মহাশূন্যের তথ্যাদি নিরূপণের জন্যে 1957 সালের 4 অক্টোবর, রাশিয়া প্রথম মনুষ্য-নির্মিত কৃত্রিম চাঁদ (প্রথম স্পুটনিক) রকেটের ↑ সাহায্যে মহাশূন্যে উৎক্ষেপণ করে। এটা ওজনে ছিল 184 পাউণ্ড ; প্রতি 90 মিনিটে এ-চাঁদ পৃথিবী পরিক্রমা করেছে। রাশিয়ার দ্বিতীয় স্পুট্‌নিক উৎক্ষিপ্ত হয় 1957 সালের 3, নভেম্বর ; এর ওজন ছিল 1120 পাউণ্ড। এর মধ্যে প্রথম শূন্যচারী জীব 'লাইকা' নামক

কুকুরটি ছিল ; এটা পৃথিবী পরিক্রমা করতে-করতে 14, এপ্রিল, 1958 তারিখ ধ্বংস হয়ে যায়। রেডিও↑ মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে মহাশূন্যের হাল-চাল সম্বন্ধে তথ্যাদি এ-সব স্পুটনিক থেকে পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছে। তার পরে রাশিয়া ও আমেরিকা উভয় দেশেই ক্রমাগত এর উন্নততর প্রচেষ্টা চলছে এবং এরূপ বহু কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষিপ্ত হয়েছে।

স্পুটাম (sputum) — থুথু, কাশি ও শ্লেষ্মা ; মুখ ও গলা থেকে যে অর্ধ-তরল পদার্থাদি নিঃসরিত হয়।

স্পেক্‌ট্রাম (spectrum) — বর্ণালি ; সাধারণআলোক-রশ্মি কোন প্রিজ্‌ম↑ বা ডিফ্র্যাক্সন-গ্রেটিং-এর↑ ভিতর দিয়ে প্রতিসরিত হয়ে যে বিভিন্ন বর্ণচ্ছটা ফুটিয়ে তোলে। বর্ণালির দৃশ্য-অংশের এক দিকে লাল ও অপর দিকে বেগুনী বর্ণের রশ্মি দেখা যায় ; মাঝে থাকে পর-পর মোটামুটি অন্য পাঁচটা নিয়ে মোট সপ্ত বর্ণের সমাবেশ। সাদা আলোক-রশ্মি এভাবে তার বিভিন্ন সংগঠক বর্ণের আলোক-রশ্মিতে বিভক্ত হয়ে স্পেক্‌ট্রাম, অর্থাৎ বর্ণালির সৃষ্টি করে। আলোক-রশ্মি মাত্রেই বিভিন্ন কম্পনাংকের (ফ্রিকোয়েন্সি↑, frequency) অতিসূক্ষ্ম তড়িৎ-চুম্বকীয়
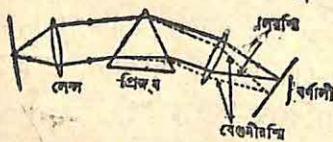
স্পেকট্রাম বা বর্ণালী

তরঙ্গ-প্রবাহের (ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগ্নেটিক ওয়েভস্↑) ফলে উদ্ভূত হয়ে থাকে (লাইট↑)। বর্ণহীন সাধারণ আলোকের তরঙ্গমালা বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ও কম্পনাংক-বিশিষ্ট তড়িৎচ্চুম্বকীয় বিভিন্ন তরঙ্গের (বর্ণের) সমবায়ে গঠিত ; প্রিজ্‌ম↑ অথবা 'ডিফ্র্যাক্সন গ্রেটিং'-এর↑ মধ্য দিয়ে প্রতিসরণের ফলে তার ওই সংগঠক তরঙ্গগুলো বিশ্লিষ্ট হয়ে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের তরঙ্গগুলো নির্দিষ্ট কোণে বেঁকে বর্ণালির পৃথক-পৃথক বিভিন্ন বর্ণ-রশ্মি প্রকাশ পায়।

মূল আলোক-রশ্মির তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন রকম বর্ণালির সৃষ্টি হয়ে থাকে। ইলেক্‌ট্রিক ল্যাম্পের প্রদীপ্ত ফিলামেণ্ট, বা এরূপ কোন অত্যুত্তপ্ত ভাস্বর পদার্থ থেকে বিকিরিত আলোক-রশ্মির বর্ণালিতে পর্যায়ক্রমিকভাবে মোটামুটি সাতটা বর্ণ (স্পেক্‌ট্রাম-কালার↑) ফুটে ওঠে; অবশ্য নানা রকম মিশ্র বর্ণাভা-ও তার মধ্যে দেখা যায়। এরূপ বর্ণালিকে বলা হয় **কণ্টিনিউয়াস স্পেক্‌ট্রাম,** যা 'ধারা-বর্ণালি'। কোন প্রদীপ্ত গ্যাস, বা বাষ্প থেকে যে বিশেষ আলোক-রশ্মি বেরোয় তার বর্ণালিতে সব বর্ণ থাকে না; কয়েকটা মাত্র বর্ণের রেখা সুস্পষ্ট দেখা যায়, মাঝে মাঝে থাকে বর্ণহীন ব্যবধান ; একে বলে **লাইন স্পেক্‌ট্রাম,** অথবা 'রেখা-বর্ণালি'। কোন-কোন গ্যাসের ক্ষেত্রে ওই বর্ণ-রেখাগুলোকে চওড়া ফিতার মত দেখায়, মাঝে-মাঝে থাকে বর্ণহীন ; একে বলে **ব্যাণ্ড স্পেক্‌ট্রাম,** অথবা 'ফিতে-বর্ণালি'।

এরূপ নানা রকম বর্ণালি সৃষ্টির মূল কারণ হলো এই যে, সাদা আলোক-রশ্মি বিভিন্ন গ্যাস, বা সল্যুসনের ↑ ভিতর দিয়ে অতিক্রম করবার সময়ে তার কোন-কোন সংগঠক তরঙ্গ (বর্ণ) ওই গ্যাস, বা সল্যুসনে শোষিত হয় এবং স্পেক্‌ট্রামে সেই বর্ণ, বা তরঙ্গের স্থানে বর্ণহীন ব্যবধানের সৃষ্টি করে। এজন্যে এ-সব বর্ণালিকে বলা হয় 'অ্যাব্জর্পশন স্পেক্‌ট্রাম,' বা 'শোষণ-বর্ণালি'।

স্পেক্‌ট্রোগ্রাফ (spectrograph) — যে যন্ত্রের সাহায্যে বর্ণালির আলোক-চিত্র, বা ফোটোগ্রাফ তোলা হয়। আবার, এভাবে গৃহীত আলোক-চিত্রকেও অনেক সময় স্পেক্‌ট্রোগ্রাফ বলা হয়ে থাকে।

স্পেক্‌ট্রাম অ্যানালিসিস (spectrum analysis) — বর্ণালি, বা স্পেক্‌ট্রামের বিভিন্ন বর্ণের অবস্থান, আয়তন, ঔজ্জ্বল্য প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করে বিভিন্ন পদার্থের রাসায়নিক গঠন ও উপাদান বিশ্লেষণ করবার প্রক্রিয়া। কোন বিশেষ পদার্থ থেকে বিকিরিত, বা কোন মাধ্যম পদার্থে পরিচালিত আলোক-রশ্মির বর্ণালিতে যে বিভিন্ন রূপ বর্ণরেখা উদ্ভাসিত হয় তার বিস্তৃতি ও গঠন সর্বদা সুনির্দ্দিষ্ট থাকে। এ-জন্যে বিভিন্ন ব্যবস্থায় স্পেক্‌ট্রোমিটার ↑ প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে বর্ণালির বিশ্লেষণ করে আলোক-উৎসের, বা মাধ্যম পদার্থের গঠন, উপাদান, ধর্ম প্রভৃতি কৌশলে স্থির করা যেতে পারে। (মাস্‌-স্পেক্‌ট্রাম ↑)।

স্পেক্‌ট্রাম কালার (spectrum colour) — বর্ণহীন, অর্থাৎ সাদা আলোক-রশ্মির ধারা-বর্ণালিতে (কন্টিনিউয়াস স্পেক্‌ট্রাম ↑) মোটামুটি যে সাতটা বর্ণ দেখা যায়। আলোক-রশ্মির বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের নিম্নক্রম অনুসারে ওই বর্ণগুলো সাধারণ বর্ণালিতে যথাক্রমে লাল, কমলা, হল্‌দে, সবুজ, নীল, গাঢ়নীল, বেগুনী, — এভাবে সজ্জিত থাকে; এই হলো স্পেক্‌ট্রামের দৃশ্য অংশ। প্রকৃতপক্ষে বর্ণ অসংখ্য; সুস্পষ্টভাবে ওই সাতটা বর্ণ মাত্র দেখা যায়। এ-গুলি ছাড়া বিভিন্ন বর্ণের সংমিশ্রণে বিভিন্ন বর্ণাভা সৃষ্টি হয়ে থাকে। লাল বর্ণের পরবর্তী দীর্ঘতর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের রশ্মিকে বলে **ইনফ্রা-রেড রে** ↑ (অবলোহিত রশ্মি); আর বেগুনী-রশ্মির চেয়ে ক্ষুদ্রতর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের রশ্মিকে বলে **আলট্রা-ভায়োলেট রে** ↑ (অতি-বেগুনী রশ্মি)। দৃশ্য বর্ণালির বহিস্থ এই দুই অংশই আমাদের চোখে অদৃশ্য থেকে যায়; কিন্তু এদের অস্তিত্বের প্রভাব নানাভাবে লক্ষ্য করা যায়।

স্পেক্‌ট্রোস্কোপ (spectroscope) — যে-যন্ত্রের সাহায্যে স্পেক্‌ট্রাম ↑, বা বর্ণালির বিভিন্ন দৃশ্য বর্ণ-রশ্মির পারস্পরিক অবস্থান, ঔজ্জ্বল্য প্রভৃতি সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ ও প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়ে থাকে।

স্পেক্‌ট্রোমিটার (spectrometer) — যে যন্ত্রের সাহায্যে স্পেক্‌ট্রামের ↑ বিভিন্ন বর্ণ-রেখার আকার, বিস্তৃতি,

ঔজ্জ্বল্য প্রভৃতি মেপে মূল আলোক-রশ্মির উৎপাদক তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের দৈর্ঘ্য, কম্পাংক প্রভৃতি ও মাধ্যম পদার্থের গঠন-বৈশিষ্ট্যাদি বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয় (স্পেক্‌ট্রাম-অ্যানালিসিস ↑)।

স্পেস (space) — মহাকাশ ; পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বহিস্থ মহাশূন্য।

স্পেস ট্রাভেল (space travel) — মহাকাশ অভিযান ; রকেটের ↑ সাহায্যে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিরুদ্ধে মহাবেগে উৎক্ষিপ্ত বিশেষ আধার, বা যানে চড়ে মানুষের মহাশূন্যে পরিভ্রমণ ও বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহে গমনাগমনের অভিযান। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় মানুষের চরম উৎকর্ষ ও সাফল্যের গৌরবময় অধ্যায়; মহাশূন্যে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন, চন্দ্রে মানুষের পদার্পণ ও যাতায়াত, সুদূর শুক্র ও বৃহস্পতি গ্রহের চতুর্দিক পরিক্রমণ ও পর্যবেক্ষণ। মহাকাশ অভিযানের কালানুক্রমিক তালিকা পরিশিষ্টে ↑।

স্পেসিফিক (specific) — নির্দিষ্ট কোন রোগ নিরাময়ের বিশেষ ঔষধ ; যেমন — কুইনিন ম্যালেরিয়ার 'স্পেসিফিক'। আবার, উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহের সংগঠক জীব-কোষগুলির মধ্যে বিশেষ কোন এক শ্রেণীর কোষ বর্ণ-রঞ্জিত করবার জন্যে যে-সব পদার্থ ব্যবহৃত হয় তাদেরও কখন-কখন স্পেসিফিক বলে; জীববিদ্যার পরীক্ষাদিতে এর দরকার হয়। শব্দার্থ হলো নির্দেশক, বা তুলনামূলক।

স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি (specific gravity) — আপেক্ষিক গুরুত্ব ; কোন পদার্থের গুরুত্ব, অর্থাৎ ওজন সম-আয়তন জলের ওজনের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে স্থির করে যে আনুপাতিক সংখ্যা পাওয়া যায়। সোনার স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি 19·3 ; এতে বুঝতে হবে, যে-কোন আয়তনের খানিকটা সোনা সমান আয়তনের জলের চেয়ে 19·3 গুণ বেশি ভারী। 4° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় জলের গুরুত্ব, বা ওজন হয় সব চেয়ে বেশি; এ-জন্যে সর্বদা 4° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতাবিশিষ্ট জলের তুলনায় পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব, বা স্পেসিফিক গ্রাভিটি স্থির করা হয়। মনে রাখতে হবে, আপেক্ষিক গুরুত্ব, অর্থাৎ 'স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি' কেবল একটা সূচক-সংখ্যা মাত্র। পক্ষান্তরে, কোন পদার্থের এক ঘন সেন্টিমিটার ↑ আয়তনের ওজন যত গ্র্যাম তাকে বলা হয় পদার্থটার ডেন্সিটি ↑।

স্পেসিফিক হিট (specific heat) —পদার্থে নিহিত তাপশক্তির তুলনামূলক বিশেষ সূচক-পরিমাণ। 'হিট, স্পেসিফিক' ↑।

স্পেল্টার (spelter) — অবিশুদ্ধ জিঙ্ক ↑, বা দস্তার ব্যবহারিক নাম ; যেরূপ দস্তা সাধারণতঃ বাজারে কিনতে পাওয়া যায় এবং গ্যাল্‌ভ্যানাইজিং (galvanizing)-এর ↑ কাজে সচরাচর ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে সীসা (লেড ↑) প্রভৃতি ধাতু কিছু-কিছু সামান্য পরিমাণে মিশ্রিত থাকে ; বিশুদ্ধ দস্তা থাকে প্রায় 97%।

স্পোর (spore) — কোন-কোন প্রোটাজোয়া ↑ জীবের প্রজনন-কণিকা। অ্যামিবা ↑, শৈবাল, ছত্রাক (ফার্ণ ↑) প্রভৃতি নিম্ন-পর্যায়ের কোন-কোন অতি ক্ষুদ্র ও সরল গঠনের প্রাণী ও উদ্ভিদ-দেহ থেকে স্বতঃ বিমুক্ত প্রজনন-কোষ বিশেষ। এ-গুলিই ক্রমে অনুরূপ পর্যায়ের নূতন উদ্ভিদ, বা প্রাণীতে পরিণত হয়। এদের 'স্পোর' সৃষ্টি হয় স্বয়ংক্রিয়ভাবে ; স্ত্রী-পুরুষের মিলনের প্রয়োজন হয় না এবং জীবের সাধারণ জনন-কোষের মত এদের কোন ভ্রূণও (এমব্রায়ো ↑) হয় না।

স্পোরোজেনিসিস (sporogenesis) — শৈবালাদি কোন-কোন নিম্ন-পর্যায়ের উদ্ভিদ, বা প্রাণিদেহে স্পোর ↑, অর্থাৎ প্রজনন-কণিকার উদ্ভব-প্রক্রিয়া। আর, **স্পোরোজোয়াইট্‌স** (sporozoites) হলো এক শ্রেণীর অতিসূক্ষ্ম সূত্রবৎ আণুবীক্ষণিক পরজীবী জীবাণু (প্যারাসাইট ↑); যেমন, মশার দংশনে মানুষের রক্তে ম্যালেরিয়ার জীবাণু প্রবেশ করে এবং তারা স্পোরের সাহায্যে অতি দ্রুত ক্রমাগত বংশ বৃদ্ধি করে চলে।

স্প্যাথিক আয়রন ওর (spathic iron ore) — খনিজ অবিশুদ্ধ ফেরাস কার্বনেট, ($FeCO_3$)।

স্প্যাস্টিক প্যারাপ্লেজিয়া (spastic paraplegia) — বিশেষ এক প্রকার পক্ষাঘাত (প্যারালিসিস ↑) রোগ ; মস্তিষ্কে আঘাত-জনিত বিকলতায় এ রোগ হতে পারে। এতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা লোপ পায় এবং মাংসপেশী সব শক্ত হয়ে পড়ে ; আর, মাঝে-মাঝে বিভিন্ন অঙ্গের কম্পন ও খিচুনী দেখা দেয়। **স্প্যাস্টিক** কথাটার মানে দেহের কোন অঙ্গের খিচুনী, বা স্প্যাজ্‌ম সম্পর্কীয়। অনিয়মিতভাবে মাংস-পেশীর সংকোচন-জনিত খিচুনিকে ইংরাজীতে বলে **স্প্যাজ্‌ম**।

স্প্লীন (spleen) — প্লীহা, দেহাভ্যন্তরস্থ একটা যন্ত্রাংশ ; এটা থাকে বক্ষের নিম্নাংশে ; নিচে কিড্‌নি ↑ ও উপরে লাংস ↑, এদের মাঝে অবস্থিত। হৃৎপিণ্ড থেকে এর মধ্যে রক্ত চলাচল করে এবং নূতন রক্ত-কোষ তৈরি হয়। ম্যালেরিয়া রোগে এর মধ্যে রক্তের চলাচল ব্যাহত হয়ে প্লীহায় রক্ত জমে এবং আকারে বর্ধিত হয়, আর দেহ রক্ত-হীন করে ফেলে।
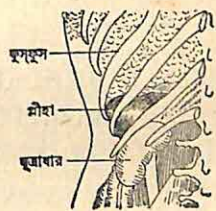
স্প্লীন

হ

হটেন্‌টট (Hottentot) — দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার এক আদিম মানব গোষ্ঠি। অধুনা এদের মধ্যে বান্টু, বুশম্যান, নামকোয়া প্রভৃতি বিভিন্ন উপজাতির সংমিশ্রণ ঘটেছে। পশু-পালনই এদের প্রধান উপজীবিকা।

হর্টিকাল্‌চার (horticulture) — উদ্ভিদপালন - বিদ্যা ; বিজ্ঞানসম্মত

বিভিন্ন উপায়ে উদ্ভিদাদির রোপন, সংরক্ষণ, পরিপোষণ প্রভৃতি বিষয়ক তথ্যাদির প্রযুক্তি-বিদ্যা। শাকসব্জি, ফল, ফুল উৎপাদনের সৌখিন কৃষি-বিদ্যা। বিভিন্ন উদ্ভিদের উপযোগী বিভিন্ন রাসায়নিক সার প্রয়োগ, আলোক ও উত্তাপ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি চাষ-আবাদের বিভিন্ন প্রক্রিয়া এর অন্তর্গত। জলের মধ্যে (হাইড্রোপোনিক্‌স ↑, জল-চাষ), মাটি-শূন্য বালির মধ্যে, এরূপ বিভিন্ন অবস্থায় ও বিভিন্ন কৌশলে উদ্ভিদাদি উৎপাদন ও পালনের বিভিন্ন প্রক্রিয়াও হর্টিকাল্‌চারের অন্তর্ভুক্ত।

হর্ন সিল্‌ভার (horn silver) — আকরিক সিল্‌ভার ক্লোরাইড, AgCl; এই খনিজ থেকেই অধিকাংশ রৌপ্য নিকাশিত হয়ে থাকে। ধাতুবিদ্যায় (metallurgy, মেটালার্জি ↑) একে কখন-কখন **ক্লোরার্জিরাইট**-ও বলা হয়।

হর্ন ব্লেণ্ড (horn blende) — এক রকম ধাতব খনিজ প্রস্তর বিশেষ; প্রধানতঃ ক্যালসিয়াম ↑, ম্যাগ্নেসিয়াম ↑ ও আয়রনের সিলিকেট ↑ যৌগিকের সংমিশ্রণে গঠিত। দেখতে কালো, বা সবুজ বর্ণের স্ফটিকাকার পদার্থ। অত্যধিক উত্তাপে বালি, চূণ ও ম্যাগ্নেসিয়ার ↑ (magnesia) রাসায়নিক মিলনের ফলে কৃত্রিম উপায়েও অনুরূপ পদার্থ উৎপাদন করা যায়।

হর্মোন (hormone) — জীব-দেহের অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন অন্তঃস্রাবী (এ্যাণ্ডোক্রাইন ↑) গ্ল্যাণ্ড থেকে নিঃসৃত বিভিন্ন জৈব রস; এ-গুলি সবই অতি জটিল গঠনের জৈব রাসায়নিক পদার্থ। দেহযন্ত্রের বিভিন্ন অত্যাবশ্যক জৈবিক ক্রিয়াদি সম্পাদন ও নিয়ন্ত্রণের জন্যে বিভিন্ন গ্ল্যাণ্ড ↑ থেকে এরূপ বিভিন্ন হর্মোন, বা জৈব রস নিঃসৃত হয়ে
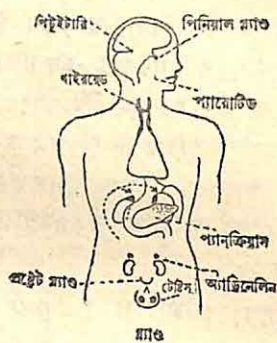
হর্মোন-নিঃসারী কয়েকটি গ্ল্যাণ্ড

থাকে। দেহের বিভিন্ন প্রয়োজনে এ-সব রস যথাসময়ে নিঃসৃত হয়ে রক্ত-প্রবাহে মিশে যায়। হঠাৎ কোনরূপ ভয় পেলে 'অ্যাড্রিন্যালিন' ↑ হর্মোন নিঃসরণের ফলে মুখ রক্তহীন ফ্যাকাসে হয়ে যায়, হৃৎস্পন্দন বাড়ে; পিটুইটারি ↑ হর্মোন দেহের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে; বিশেষ এক রকম 'সেক্স' হর্মোন নিঃসরণের ফলে পুরুষের দাঁড়ি-গোঁফ গজায়; আর ইন্‌সুলিন ↑ নামক হর্মোন রক্তে শর্করার পরিমাণ ঠিক রাখে। এভাবে দেহের পুষ্টি, বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ প্রভৃতি নানা গুরুত্বপূর্ণ জৈবিক ক্রিয়া সম্পাদনের জন্যে আরও নানা রকম হর্মোন দেহাভ্যন্তরে স্বতঃই নিঃসৃত হয়ে থাকে। এদের যে-কোন একটির অভাবে দেহের স্বাভাবিক

জৈবক্রিয়া, স্বাস্থ্য ও বিভিন্নরূপ স্বাভাবিকতা ব্যাহত হয়।

হর্স পাওয়ার (horse-power) — শক্তি পরিমাপের একটি একক বিশেষ; বাংলায় বলে অশ্ব-শক্তি। 550 পাউণ্ড ↑ ওজনের কোন বস্তু এক সেকেণ্ডে এক ফুট উচ্চে উত্তোলন করতে যে পরিমাণ শক্তি ব্যয়িত হয় তাকে বলে এক 'হর্স পাওয়ার'। এর পরিমাণ হলো 746 ওয়াট ↑, বা প্রায় 3/4 কিলোওয়াট ↑। ডায়নামো, ↑ মোটর প্রভৃতি যন্ত্রের কর্ম-শক্তি (ওয়ার্ক ↑) এই 'হর্স পাওয়ার' এককে করা প্রকাশ হয়ে থাকে।

হাইগ্রোস্কোপিক (hygroscopic) — জলাকর্ষী; যে-সব পদার্থ উন্মুক্ত থাকলে বায়ুর জলীয় বাষ্প টেনে নিয়ে আর্দ্র হয়ে ওঠে; যেমন, সোডিয়াম ক্লোরাইড ↑, বা খাদ্য-লবণ, NaCl, কতকটা এরূপ। পোড়া চুন, অর্থাৎ কুইক লাইম ↑, (CaO), ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ($CaCl_2$) প্রভৃতি নানা প্রকার বিশেষ জল-শোষক, বা হাইগ্রোস্কোপিক পদার্থ আছে।

হাইগ্রোস্কোপ (hygroscope) — যে-সব যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের তুলনামূলক, বা আনুপাতিক আর্দ্রতার (রিলেটিভ হিউমিডিটি ↑) পরিমাণ প্রত্যক্ষ করা যায়, অর্থাৎ কোন স্থানের বায়ুতে সংমিশ্রিত জলীয় বাষ্পের পরিমাণ এরূপ যন্ত্রের সাহায্যে জানা সম্ভব হয়ে থাকে; আর এর সাহায্যে বায়ুর আর্দ্রতার হ্রাস-বৃদ্ধিও নির্ধারণ করা যায়।

হাইগ্রোমিটার (hygrometer) — বায়ুমণ্ডলের হিউমিডিটি ↑, বা আর্দ্রতা পরিমাপক যন্ত্র; এরূপ যন্ত্রের সাহায্যে কোন স্থানের বায়ুতে কি পরিমাণ জলীয় বাষ্প মিশ্রিত রয়েছে তা স্থির করা যায়। সাধারণ হাইগ্রোমিটারে থাকে দু'টা থার্মোমিটার ↑; একটার পারদ-গোলক ভিজা কাপড়ে জড়ানো, অপরটার গোলক থাকে শুষ্ক (ওয়েট অ্যাণ্ড ড্রাই বাল্‌ব থার্মোমিটার)। বায়ুর আর্দ্রতা অনুযায়ী জল-সিক্ত কাপড় থেকে জল বাষ্পীভূত হয়ে ধীরে ধীরে উবে যায়; তার ফলে সংলগ্ন বায়ুর তাপ হ্রাস পায়; কাজেই ওই থার্মোমিটারে বায়ুর অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণতা জ্ঞাপন করে; অপরটায় স্বাভাবিক উষ্ণতাই ওঠে। এভাবে থার্মোমিটার দু'টাতে পরিলক্ষিত উষ্ণতাসূচক ডিগ্রি-স্কেলের পার্থক্য থেকে নির্দিষ্ট তালিকা (হিউমিডিটি চার্ট) দেখে স্থানীয় বায়ুতে জলীয় বাষ্পের (আর্দ্রতার) শতকরা পরিমাণ সহজেই নির্ধারণ করা যায়।
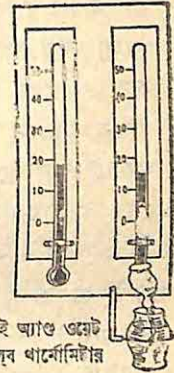
ড্রাই অ্যাণ্ড ওয়েট বাল্‌ব থার্মোমিটার

হাইড্রক্সাইড (hydroxide) — যে সব যৌগিক পদার্থ কোন ধাতব পরমাণুর সঙ্গে কোন হাইড্রক্সিল ↑ র‍্যাডিক্যালের মিলনে গঠিত হয়। সাধারণতঃ কোন ধাতব অক্সাইডের সঙ্গে জলের রাসায়নিক সংযোগের

ফলে হাইড্রক্সাইড যৌগিক উৎপন্ন হয়ে থাকে। জলের (H_2O) একটা হাইড্রোজেন-পরমাণু বিচ্যুত হলে যে হাইড্রক্সিল (OH) গ্রুপ জন্মায় তার সঙ্গে বিভিন্ন ধাতব পরমাণু, বা র‍্যাডিক্যালের রাসায়নিক সংযোগে এই শ্রেণীর যৌগিকের উৎপত্তি ঘটে; যেমন, $CaO+H_2O=Ca(OH)_2$, ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড, বা স্লেকড্ লাইম ↑, বা কলিচুন। হাইড্রক্সাইড গুলো সবই ক্ষারধর্মী। জলে দ্রবীভূত হলে এ-গুলো হাইড্রক্সিল আয়ন ↑ ও ধাতব আয়নে বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়; এ-জন্যেই অ্যাসিডের সঙ্গে হাইড্রক্সাইডের রাসায়নিক সংযোগে সহজেই বিভিন্ন সল্ট ↑ উৎপন্ন হয়ে থাকে।

হাইড্রক্সিল গ্রুপ (hydroxyle group) — একটা হাইড্রোজেন পরমাণু ও একটা অক্সিজেন-পরমাণুর মিলনে যে র‍্যাডিক্যাল ↑ গঠিত হয়। এই হাইড্রক্সিল গ্রুপ, বা র‍্যাডিক্যাল (OH) রাসায়নিক ক্রিয়াদির সহজ ব্যাখ্যার জন্যে কল্পিত হয় মাত্র; এর পৃথক কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই। সাধারণতঃ হাইড্রক্সাইড শ্রেণীর ধাতব যৌগিক পদার্থগুলো ধাতু-মূলকের সঙ্গে এর সংযোগেই উৎপন্ন হয় বলে মনে করা হয়; যেমন—NaOH, সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড, KOH কস্টিক পটাস, $Cu(OH)_2$ কপার হাইড্রক্সাইড ইত্যাদি।

হাইড্রল (hydrol) — জলের একটি অণু, H_2O; বিশেষ নাম।

হাইড্রলিক প্রেস (hydraulic press) — যে-যন্ত্রের সাহায্যে আবদ্ধ জলের চাপ বহুগুণ পরিবর্ধিত করে সেই পরিবর্ধিত চাপ-শক্তির প্রভাবে বিভিন্ন কাজ সহজে সম্পন্ন করা যায়। তরল পদার্থের স্বাভাবিক ধর্মানুসারে (প্যাস্ক্যাল-ল ↑) আবদ্ধ পাত্রে রক্ষিত জলের যে-কোন স্থানে চাপ প্রয়োগ করলে তা সর্বত্র সম-শক্তি নিয়ে বিস্তৃত হয়ে পড়ে, এবং সেই জলের উপরিভাগের আয়তন অনুসারে সে-শক্তি সমষ্টিগতভাবে বেড়ে যায়। এভাবে ক্ষুদ্র একটা পিস্টনের সাহায্যে অল্প জলে যে সামান্য শক্তি প্রয়োগ করা হয় সেই শক্তি সংযোগ-নলের জলের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে বৃহত্তর পাত্রের জলে প্রতি একক আয়তনে সমান শক্তিতে সঞ্চালিত হয়ে যায়। এর ফলে ওই বৃহত্তর পাত্রের অভ্যন্তরস্থ জলের উপরিভাগের আয়তনের বিস্তৃতি অনুসারে পরিবর্ধিত শক্তিতে বড় পিষ্টনের নিচে অধিকতর ঊর্ধ্ব-চাপ পড়ে। ছোট পিস্টনের এক বর্গ ইঞ্চিতে এক পাউণ্ড শক্তি প্রয়োগ করলে বড় পিস্টনের 50 বর্গ ইঞ্চিতে 50 পাউণ্ড শক্তি সঞ্চারিত হবে।
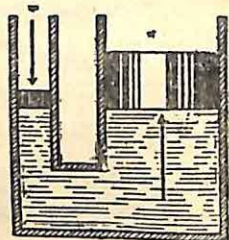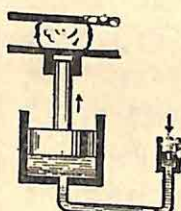
তরল পদার্থের চাপ

হাইড্রলিক প্রেস

হাইড্রলিক ↑ প্রেসের এই কৌশলে এক দিকে অল্প শক্তি প্রয়োগ করে অপর দিকে অধিক কাজ পাওয়া যায়। এর সাহায্যে ভারী মাল উত্তোলন, তুলা, পাট প্রভৃতির বড়-বড় গাঁট-বাঁধা প্রভৃতি নানা রকম কাজ সহজে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

হাড্রলিক সিমেণ্ট (hydraulic cement) — বালি ও সিমেণ্টের ↑ যে আনুপাতিক সংমিশ্রণ পর্যাপ্ত জলের সংযোগে অল্প সময়ে অত্যধিক শক্ত হয়ে পড়ে। বিশেষ অনুপাতে (স্ট্যাণ্ডার্ড মিক্স ↑) এরূপ সংমিশ্রণে জল মিশিয়ে ইটের গাঁথুনির কাজ করা হয়। একেই 'হাইড্রলিক সিমেণ্ট' বলে ; যা জলের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় শক্ত হয়ে পড়ে।

হাইড্রা (hydra) — ক্ষুদ্র নলাকৃতি সূক্ষ্ম জলজ প্রাণী। শোঁয়া নিয়ে এ-গুলো লম্বায় প্রায় আধ ইঞ্চি পর্যন্ত হতে পারে। মুখের কাছে এদের 6 থেকে 8-টা পর্যন্ত শোঁয়ার মত অঙ্গ থাকে ; ওই শোঁয়াগুলোর সাহায্যে ক্ষুদ্র কীটাদি টেনে নিয়ে এরা মুখে পোরে। হাইড্রার বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এদের দেহাংশের স্থানে-স্থানে উদ্ভূত গুঁটিকা বিচ্ছিন্ন হয়ে এদের বংশ-বৃদ্ধি ঘটে, অর্থাৎ দেহের বিভিন্ন অংশে উপজাত কুঁড়ির মত বর্ধিত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পিণ্ড বিচ্যুত হয়ে জলে ভেসে বেড়ায়, আর তা থেকে নূতন হাইড্রা জন্মায়। আবার কখন-কখন যৌন পদ্ধতিতে এদের স্ত্রী ও পুং জনন-কোষের মিলনেও শিশু-হাইড্রা জন্মাতে পারে। হাইড্রাজোয়া ↑ শ্রেণীর এ-সব ক্ষুদ্র প্রাণী সচরাচর মিঠা (লবণাক্ত নয় এমন) জলেই জন্মে ও বসবাস করে।
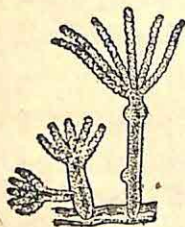
হাইড্রার বংশ-বৃদ্ধি

হাইড্রাইড (hydride) — হাইড্রোজেন-ঘটিত বাইনারি ↑ কম্পাউণ্ডের সাধারণ নাম। কোন-কোন মৌলিক পদার্থের সঙ্গে হাইড্রোজেন গ্যাসের রাসায়নিক মিলনে এরূপ যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়; যেমন—সোডিয়াম হাইড্রাইড, NaH, ক্যালসিয়াম হাইড্রাইড, CaH_2 ; এভাবে জলকে বলা যায় অক্সিজেন হাইড্রাইড, H_2O; হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যেন ক্লোরিনের হাইড্রাইড, HCl, ইত্যাদি।

হাইড্রাণ্ট (hydrant)—ভূ-গর্ভ নর্দমা, বা জলের পাইপের স্থানবিশেষে জল সঞ্চয়ের জন্য নির্মিত জলাধার, যার মুখে লৌহ-আবরণী থাকে। এইরূপ গহ্বর, বা জলাধার নর্দমার ময়লা সাফাই কাজে, বা জলের পাইপ থেকে অগ্নি-নির্বাপনের কাজে দমকল বাহিনীর পক্ষে এর মধ্যে সঞ্চিত জল পাম্প করে নিতে সুবিধা হয়।

হাইড্রেট (hydrate)— নির্দিষ্ট পরিমাণ জলের রাসায়নিক সংযোগে স্ফটিকাকারে গঠিত যৌগিক পদার্থ। প্রকৃতপক্ষে যে-সব সল্টের ↑ মধ্যে 'ওয়াটার অব ক্রিস্টালিজেশন' ↑ থাকে তাদেরই সাধারণতঃ হাইড্রেট বলে ;

একে আবার **হাইড্রেটেড সল্ট**-ও বলা হয়। যেমন—কপার সালফেট (ব্লু-ভিট্রিয়ল ↑) হলো $CuSO_4, 5H_2O$; নীলবর্ণ স্ফটিকাকার পদার্থ। উত্তপ্ত করলে এর জলীয় ভাগ উবে চলে যায়, সাদা চূর্ণাকার হয়ে পড়ে। একে বলে 'অ্যান্‌হাইড্রাস', বা 'নির্জল' কপার সালফেট, বা তুঁতে।

হাইড্রোকার্বন (hydrocarbon) — হাইড্রোজেন ↑ ও কার্বনের রাসায়নিক সংযোগে গঠিত বিভিন্ন যৌগিক পদার্থের সাধারণ নাম ; যেমন—মিথেন, CH_4, ইথেন, C_2H_6 প্রভৃতি। প্যারাফিন ↑ শ্রেণীর সকল পদার্থই বিভিন্ন হাইড্রোকার্বনে গঠিত। আর পেট্রল ↑, কেরোসিন ↑ প্রভৃতি খনিজ তৈলগুলো প্রধানতঃ বিভিন্ন খনিজ হাইড্রোকার্বন কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় সব রকমেরই আছে। (কার্বো-হাইড্রেট ↑)

হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (hydrochloric acid) — হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের রাসায়নিক মিলনে গঠিত অজৈব অ্যাসিড। একে 'ক্লোরিন হাইড্রাইড' ↑, অথবা 'হাইড্রোজেন ক্লোরাইড'-ও (HCl) বলা যেতে পারে। একে কখন-কখন আবার **মিউরিয়েটিক ↑ অ্যাসিড**, অথবা **'স্পিরিট অব সল্ট'**-ও বলা হয়। বর্ণহীন ধূমায়মান তরল পদার্থ; যাতে লাগে তা পুড়ে ক্ষয়ে যায়। অধিকাংশ ধাতুর সঙ্গে এর রাসায়নিক ক্রিয়ায় 'ধাতব ক্লোরাইড' সল্ট উৎপন্ন হয় এবং হাইড্রোজেন ↑ গ্যাস বিমুক্ত হয়ে যায়। সাধারণ খাদ্য-লবণ, বা সোডিয়াম ক্লোরাইডের (NaCl) সঙ্গে সাল্‌ফিউরিক ↑ (H_2SO_4) অ্যাসিডের রাসায়নিক ক্রিয়ায় অ্যাসিডটা উৎপন্ন হয়ে থাকে। হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন ↑ গ্যাসের সরাসরি মিলনেও এর উৎপত্তি ঘটে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক শিল্পে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

হাইড্রোগ্রাফি (hydrography)— সমুদ্রের তলদেশের মানচিত্র অঙ্কনের পদ্ধতি; বিভিন্ন স্থানে সমুদ্রের গভীরতা অনুযায়ী তলদেশের অ-সমতলতা নির্দেশক এরূপ মানচিত্র সমুদ্রে জাহাজ চলাচলের সময়ে বিশেষভাবে প্রয়োজন হয়ে থাকে।

হাইড্রোজেন (hydrogen) — মৌলিক গ্যাসীয় পদার্থ ; সাংকেতিক H; পারমাণবিক ওজন 1·008, পারমাণবিক সংখ্যা 1 ; বর্ণহীন, গন্ধহীন, দাহ্য গ্যাস। সবচেয়ে হাল্‌কা মৌলিক পদার্থ। হাইড্রোজেন গ্যাস জ্বালালে বায়ুর অক্সিজেনের ↑ সঙ্গে তার রাসায়নিক মিলনে সৃষ্টি হয় (H_2O) জল। এর প্রত্যেকটি অণু দুইটি পরমাণুর সংযোগে গঠিত; এজন্যে হাইড্রোজেন অণুকে H_2 লেখা হয়। এর প্রত্যেকটি পরমাণু আবার একটি প্রোটন ↑ ও একটি ইলেক্‌ট্রন ↑ কণিকার সমবায়ে গঠিত হয় (হেভি হাইড্রোজেন ↑)। অক্সিহাইড্রোজেন ফ্লেম ↑ উৎপাদনের জন্যে, রিডিউসিং এজেণ্ট ↑ হিসেবে, কৃত্রিম উপায়ে অ্যামোনিয়া ↑ তৈরি এবং উদ্ভিজ্জ ঘৃত (হাইড্রোজেনেটেড অয়েল ↑) উৎপাদন প্রভৃতি বিভিন্ন

রাসায়নিক শিল্পে হাইড্রোজেন গ্যাস সবিশেষ প্রয়োজন হয়ে থাকে।

হাইড্রোজেন আয়ন (hydrogen) ion) — হাইড্রোজেন পরমাণুর ধন-তড়িতাহিত আয়ন ↑ কণিকা, অর্থাৎ প্রোটন ↑। বিভিন্ন অ্যাসিডের জলীয় দ্রবের মধ্যে এরূপ তড়িতাহিত আদি-কণিকা, অর্থাৎ আয়নায়িত হাইড্রোজেন বিমুক্ত হয়ে রাসায়নিক ক্রিয়ায় ধাতুর আয়নের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন ধাতব সল্টের ↑ উৎপত্তি ঘটায়। অ্যাসিডের রাসায়নিক সংযোগের শক্তি তার সংগঠক হাইড্রোজেনের এরূপ (ধন-তড়িতাহিত) আয়নায়িত (আয়ন ↑) অবস্থার উপরেই নির্ভর করে। এ-জন্যে একে কখন-কখন **অ্যাসিডিক হাইড্রোজেন**-ও বলা হয়।

হাইড্রোজেন আয়ন কন্সেন্ট্রেশন (hydrogen-ion concentration) — রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কোন অ্যাসিড বিশ্লিষ্ট হলে তা থেকে হাইড্রোজেন-আয়ন ↑ বিমুক্ত হয়; আর তা ধন-তড়িতাহিত $(H)^+$ হয়ে থাকে। এই হাইড্রোজেন - আয়ন আবার অ্যালকালির ↑ যে 'OH' গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত হয়, তা হলো ঋণ-তড়িতাহিত $(OH)^-$ পরমাণু-জোট। এদের মিলনে উৎপন্ন হয় জল(H_2O); জলের তড়িতাধান ধন, বা ঋণ কিছুই নয়, অর্থাৎ তড়িদ্বিহীন। যে-কোন জলীয় দ্রবের মধ্যে তার অ্যাসিড ও অ্যালক্যালি ↑ উপাদানের অনুপাত পরীক্ষা করবার জন্যে তার মধ্যে এরূপ হাইড্রোজেন - আয়নের হ্রাস-বৃদ্ধি নিরূপণ করা প্রয়োজন হয়ে থাকে। দ্রবটা অ্যাসিড-ভাবাপন্ন হলে তার মধ্যে ধনাত্মক হাইড্রোজেন-আয়নের আধিক্য ঘটবে, আর অ্যালক্যালি-ধর্মী হলে বিপরীত হবে। সাধারণতঃ এক লিটার ↑ সল্ভেণ্টের ↑ মধ্যে এক গ্র্যাম-অ্যাটম ↑ সলিউট ↑ দ্রবীভূত করলে উৎপন্ন তরল পদার্থে যে পরিমাণ হাইড্রোজেন-আয়ন $(H)^+$ বিমুক্ত হয়, তাকেই বলে 'হাইড্রোজেন-আয়ন কন্সেন্ট্রেশন'; সংক্ষেপে একে pH বলে উল্লেখ করা হয়। pH 7 বললে স্বাভাবিক অবস্থা বুঝায়, অর্থাৎ বুঝতে হবে (H^+) ও (OH^-) সমপরিমাণ আছে, যেমন আছে জলে। তদপেক্ষা কম, বা বেশী হলে, অর্থাৎ pHI বললে বুঝতে হবে, দ্রবটা অত্যন্ত অ্যাসিড-ভাবাপন্ন, অর্থাৎ দ্রবে যথেষ্ট H^+ আয়ন বর্তমান। pH 13 বললে বুঝায় অত্যন্ত অ্যালক্যালি-ধর্মী, অর্থাৎ তার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে $(OH)^-$, অর্থাৎ হাইড্রক্সিল ↑ জোটক রয়েছে।

হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড (hydrogen peroxide) — হাইড্রোজেন ↑ ও অক্সিজেন ↑ গ্যাসের একটা বিশেষ যৌগিক, H_2O_2; ঘন তরল পদার্থ। সাধারণতঃ এর জলীয় দ্রবণই বাজারে বিক্রয় হয়। জীবাণুরোধক, বিরঞ্জক (ব্লিচিং ↑) ও জারক পদার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। জল হলো H_2O; এর সঙ্গে একটা অতিরিক্ত অক্সিজেন পর-

মাণুর মিলনেহয় H_2O_2, অর্থাৎ হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড। এই অতিরিক্ত অক্সিজেন পরমাণুটি অস্থায়ী; সুতরাং উন্মুক্ত রাখলে এ থেকে সহজেই অতিরিক্ত অক্সিজেন বিমুক্ত হয়ে গিয়ে জলে (H_2O) পরিণত হয়। যে-সব স্থানে শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে বায়ুতে অক্সিজেন গ্যাস সহজলভ্য হয় না, (যেমন—টর্পেডো, সাবমেরিন প্রভৃতিতে) সেখানে কখন-কখন অক্সিজেনের উৎস-স্বরূপ এটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। (হাইপারল ↑)

হাইড্রোজেন ফস্‌ফাইড (hydrogen phosphide) — ফস্‌ফরাস ↑ ও হাইড্রোজেনের একটা বাইনারি কম্পাউণ্ড। যৌগটিকে সাধারণতঃ ফসফিন ↑ (PH_3) বলা হয়।

হাইড্রোজেন বম্‌ (hydrogen bomb) — হাইড্রোজেন পরমাণুর নিউক্লিয়ার ফিউসন ↑ প্রক্রিয়ায় অতি প্রচণ্ড শক্তি উৎপাদক যে বোমা আবিষ্কৃত হয়েছে। একে এইচ্‌-বম্‌ও (H-bomb) বলা হয়। অ্যাটম-বোমায় ↑ তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম, বা প্লুটোনিয়াম ধাতুর কেন্দ্রীণ বিভাজনের (ফিসন ↑) ফলে শক্তির উদ্ভব হয়, বিস্ফোরণ ঘটে। আর হাইড্রোজেন বোমায় হাইড্রোজেনের কেন্দ্রীণ সংযোজনের (ফিউসন ↑) ফলে প্রচণ্ড শক্তি বিমুক্ত হয়, অধিকতর ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে। অবশ্য, সাধারণ হাইড্রোজেনের এরূপ ফিউসন ঘটানো সম্ভব হয় না; হাইড্রোজেনের আইসোটোপ ↑ 'ডয়টেরন' ↑ ও ট্রাইটিয়ামের (হেভি হাইড্রোজেন ↑) ফিউসন ঘটানো হয়েথাকে। অ্যাটম-বোমার (অ্যাটম বম্‌ ↑) বিস্ফোরণে উৎপন্ন প্রচণ্ড উত্তাপের সাহায্যে হাইড্রোজেনের ওই সব আইসোটোপের কেন্দ্রীণের সংযোজন ঘটালে তার বিস্ফোরণে এরূপ অসীম শক্তির উদ্ভব ঘটে। এর প্রচণ্ড বিস্ফোরণে হাইড্রোজেন গ্যাস হিলিয়াম ↑ গ্যাসে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

হাইড্রোজেল (hydrogel) — কোলয়ড্যাল ↑ পদার্থের ঘন জলীয় দ্রব, যা বিশেষ ঘনীভূত হয়ে জেলির মত কতকটা স্থিতিস্থাপক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অন্য কথায় বলা যায়, কোন হাইড্রোসল ↑ ঘনীভূত হয়ে জেলির মত অবস্থায় এলে তাকেই বলে হাইড্রোজেল।

হাইড্রোজেন সাল্‌ফাইড (hydrogen sulphide) — বর্ণহীন বিষাক্ত গ্যাসীয় পদার্থ; পঁচা ডিমের দুর্গন্ধযুক্ত। একে আবার **সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন**-ও (H_2S) বলা হয়। যে-কোন ধাতব সাল্‌ফাইডের ↑ সঙ্গে যে-কোন রকম মৃদু অ্যাসিডের রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে এই গ্যাসীয় যৌগটি উৎপন্ন হয়ে থাকে। রসায়নাগারে সাধারণতঃ কিপ্‌স অ্যাপারেটাস ↑
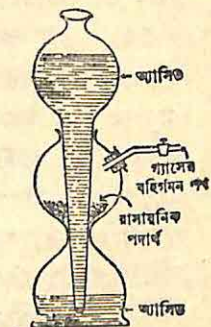
কিপ্‌স অ্যাপারেটাস

নামক যন্ত্রে সোডিয়াম সাল্‌ফাইড ও মৃদু সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় গ্যাসটা তৈরি হয়। রসায়নাগারে বিভিন্ন রাসায়নিক পরীক্ষার সহায়ক বিক্রিয়ক পদার্থ হিসেবে এর ব্যবহার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

হাইড্রোজেনেশন (hydrogenation) — বিশেষ-বিশেষ অনুঘটকের (ক্যাটালিস্ট ↑) প্রভাবে বিভিন্ন জৈব পদার্থের সঙ্গে হাইড্রোজেন-সংযোগের রাসায়নিক বিক্রিয়া।

হাইড্রোজেনেশন অব অয়েল (hydrogenation of oil) — হাইড্রোজেন গ্যাসের প্রতিক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন তরল উদ্ভিজ্জ তৈল ও জান্তব চর্বি (লিকুইড ফ্যাটস্ অ্যাণ্ড অয়েলস্) ঘনীভূত করবার প্রক্রিয়া। এই উপায়ে বিভিন্ন জৈব তরল তেল ও চর্বিকে ঘৃতের মত ঘনীভূত পদার্থে রূপান্তরিত করে 'বনস্পতি' শ্রেণীর কৃত্রিম ঘৃত প্রস্তুত হয়ে থাকে। উদ্ভিজ্জ তেল ও চর্বিতে প্রচুর পরিমাণে ট্রায়োলিন ↑ ($C_{57}H_{104}O_6$) নামক তরল জৈব যৌগ থাকে ; হাইড্রোজেনের সংযোগে ওই তরল ট্রায়োলিন ট্রাইষ্টিয়ারিন ($C_{57}H_{110}O_6$) নামক অর্ধ-তরল পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়ায় তরল তেল কেবল ঘনীভূতই হয় না, তার স্বাভাবিক গন্ধও বিনষ্ট হয়ে যায়। সাধারণতঃ তরল তেল, বা চর্বির মধ্যে নিকেল ↑ ধাতুর সূক্ষ্ম কণিকা মিশ্রিত করে উত্তপ্ত অবস্থায় তার মধ্যে হাইড্রোজেন গ্যাস চাপ-প্রয়োগে প্রবেশ করানো হয়, এর ফলেই তরল তেল ও চর্বির ওইরূপ সব পরিবর্তন ঘটে থাকে। নিকেল এই প্রক্রিয়ায় ক্যাটালিস্টের ↑ কাজ করে মাত্র।

হাইড্রোজেনেশন অব কোল (hydrogenation of coal) — হাইড্রোজেন গ্যাসের বিক্রিয়ার সাহায্যে কয়লা থেকে এক রকম কৃত্রিম খনিজ তৈল (তরল হাইড্রোকার্বন ↑) প্রস্তুত করবার পদ্ধতি। সাধারণতঃ প্রায় 500° সেন্টিগ্রেড ↑ উষ্ণতায় ও প্রায় 250 গুণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে (বার, ব্যারোমিটার ↑) হাইড্রোজেন গ্যাসের মধ্যে কয়লার গুঁড়া উত্তপ্ত করা হয়। এর ফলে কয়লার কার্বনের সঙ্গে হাইড্রোজেনের রাসায়নিক সংযোগ ঘটে এবং বিভিন্ন তরল হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ পাওয়া যায়। এই তরল হাইড্রোকার্বন প্রায় স্বাভাবিক খনিজ তৈলের অনুরূপ হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় আবার বিভিন্ন পদার্থ ক্যাটালিস্ট হিসাবেও ব্যবহার করা প্রয়োজন হয়। তরল হাইড্রোকার্বন প্রস্তুতির এই প্রক্রিয়া উদ্ভাবকের নামানুসারে **বার্জিলিয়াস প্রোসেস** নামে খ্যাত।

হাইড্রোজোয়া (Hydrozoa) — এক শ্রেণীর অতি ক্ষুদ্র জলজ আদ্যপ্রাণী, বা কীট ; সাধারণতঃ মিঠা
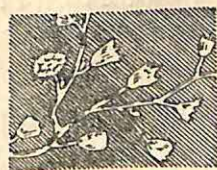
ওবেলিয়া

(লবণাক্ত নয়, এমন) জলেই এ-গুলো

জন্মায়। হাইড্রোজোয়া শ্রেণীর মধ্যে হাইড্রা ↑, ওবেলিয়া ↑ প্রভৃতি নানা আকার-আকৃতির বিভিন্ন রকম জলচর জীবাণু আছে। শোঁয়া, বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে লম্বায় এর কোনটাই সাধারণতঃ আধ ইঞ্চির বেশি হয় না। ওবেলিয়া জীবাণুর উদ্ভিদের মত শাখা-প্রশাখা-যুক্ত সমাবেশ চিত্রে বর্ধিতাকারে দেখানো হলো।

হাইড্রোপোনিক্‌স (hydroponics) — জল-চাষ ; বিভিন্ন উদ্ভিদের উপযোগী বিভিন্ন রাসায়নিক সার, বা লবণের জলীয় দ্রবণের মধ্যে উদ্ভিদ উৎপাদন সম্পর্কীয় বিজ্ঞান। মাটি নেই, শুধু জলেই গাছ জন্মায় ; আর তাতে ফল-ফুল হয়। আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া প্রভৃতি স্থানে বৃহদাকার জলাশয়ে এরূপ উদ্ভিদ উৎপাদনের অনেক প্রতিষ্ঠান আছে।

হাইড্রোপ্লেন (hydroplane) — যে বিমানপোত জলে অবতরণ করতে পারে, এবং জল থেকেই আবার আকাশে উঠে যেতে পারে। এরূপ বিশেষ গঠনের এরোপ্লেন জলে ভাসতে ও আকাশে উড়তে পারার উপযোগী করেই নির্মিত হয়ে থাকে।

হাইড্রোফোবিয়া (hydrophobia) — জলাতঙ্ক রোগ ; ইংরেজিতে এর অপর নাম 'র‍্যাবিস'। হাইড্রো মানে জল, 'ফোবিয়া' ভয় ; এ-রোগে রোগী জল দেখে ভয় পায়। এর অর্থ হলো, তৃষ্ণায় জল পান করতে গেলে অসহ্য যন্ত্রণা হয়, রোগী দূরে সরে যায়। পাগলা শেয়াল-কুকুরে কামড়ালে মানুষের এ-রোগ হয়ে থাকে ; ক্ষিপ্ত শেয়াল, বা কুকুরের মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডে ভাইরাস ↑ জাতীয় অতি সূক্ষ্ম জীবাণু জন্মে ; কামড়ালে তাদের মুখের লালার সঙ্গে ওই জীবাণু মানুষের দেহে প্রবেশ করে। এর ফলে মানুষ জলাতঙ্ক রোগে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, আর তার দেহের মাংসপেশী, বিশেষতঃ গলনালী সংকুচিত হয়ে যায়। এ-অবস্থায় জল পানের চেষ্টা করলে, বা তীব্র আলোক চোখে পড়লে রোগীর সর্বাঙ্গ কুঁক্‌ড়ে যায়। এক সময় এটা একটা দুরারোগ্য ব্যাধি ছিল। বিজ্ঞানী পাস্তর ↑ প্রবর্তিত ইঞ্জেক্‌সন প্রয়োগে অবশ্য আজকাল এ-রোগ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আরোগ্য হচ্ছে।

হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড (hydrofluoric acid) — হাইড্রোজেন ও ফ্লোরিন ↑ গ্যাসের রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন হয় হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড। এই গ্যাসীয় হাইড্রোজেন ফ্লোরাইডের (**HF**) জলীয় দ্রব হলো হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড। বর্ণহীন তরল পদার্থ ; ধাতব পদার্থাদি যাতে লাগে তা-ই ক্ষয়ে গলে যায়। সাধারণতঃ কোন অ্যাসিডেই কাঁচ আক্রান্ত হয় না ; কিন্তু হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিডে কাঁচ গলে যায়। এ-জন্যে কাঁচের উপর নক্সা তুলতে, বা লেখার দাগ কাটতে এটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ-জন্যে হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড কাঁচের বদলে সাধারণতঃ গাটাপার্চার ↑ তৈরী আধারে রাখা হয়।

হাইড্রোমিটার (hydrometer) —
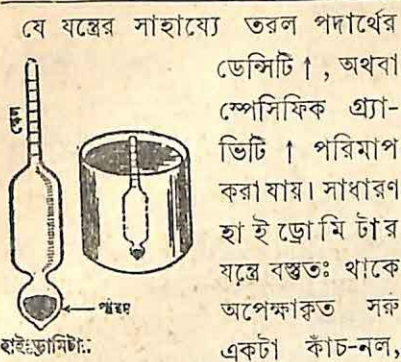
যে যন্ত্রের সাহায্যে তরল পদার্থের ডেন্সিটি ↑, অথবা স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি ↑ পরিমাপ করা যায়। সাধারণ হাইড্রোমিটার যন্ত্রে বস্তুতঃ থাকে অপেক্ষাকৃত সরু একটা কাঁচ-নল, যার ফোলানো তলদেশের নিচে সংলগ্ন থাকে একটা ছোট কাঁচ-গোলক। ওই গোলকটার মধ্যে সাধারণতঃ কিছু মার্কারি ↑ দিয়ে ভারী করা হয়। এর ফলে তরল পদার্থের মধ্যে যন্ত্রের নলটা উপরে খাড়াভাবে জেগে ভেসে থাকে। ওই কাঁচ-নলের গায়ে তরল পদার্থের ঘনত্ব-পরিমাপক স্কেলের দাগ কাটা থাকে। তরল পদার্থের ঘনত্ব যত বেশি হবে ওই নলটা স্বভাবতঃই তত বেশি উপরে ভেসে উঠবে (বয়েন্সি ↑)। স্কেলের দাগ দেখে এভাবে বিভিন্ন তরল পদার্থের ঘনত্ব, বা ডেন্সিটি সহজেই নিরূপণ করা যেতে পারে। **ল্যাক্টোমিটার** ↑, **স্যালিনোমিটার** ↑ প্রভৃতি হলো এরূপ বিভিন্ন তরলের ডেন্সিটির স্কেলযুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর হাইড্রোমিটার যন্ত্র মাত্র।

হাইড্রোমিটার

হাইড্রোলিথ (hydrolith) — ক্যালসিয়াম হাইড্রাইডের (CaH_2) বিশেষ নাম; কঠিন পদার্থ। এর সঙ্গে জলের রাসায়নিক ক্রিয়ায় সহজেই হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। এর রাসায়নিক ক্রিয়া এভাবে প্রকাশ করা যায়: $CaH_2+2H_2O = Ca(OH)_2$ (স্লেক্‌ড লাইম ↑) $+ 2H_2$ (হাইড্রোজেন)। প্রয়োজন অনুসারে দ্রুত হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপাদনের জন্যে পদার্থটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ছেলেদের উড়ন্ত খেলনা-বেলুনে যে হাইড্রোজেন গ্যাস ভরতি করা হয় তা সাধারণতঃ হাইড্রোলিথের সঙ্গে জলের বিক্রিয়ায় তৈরি হয়।

হাইড্রোলিসিস (hydrolysis) — জলের সংযোগে বিশেষ-বিশেষ যৌগিক পদার্থের রাসায়নিক বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া; অবশ্য তার সঙ্গে-সঙ্গে জলও বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। রাসায়নিক বিয়োজন ক্রিয়াটি ঘটে এরূপ: যৌগিক পদার্থটা যেন AB; এখন $AB+H_2O=AOH+BH$; মৃদু অ্যাসিড, বা বেসের ↑ বিভিন্ন সল্ট জলে দ্রবীভূত করলে এই প্রক্রিয়ায় তা আংশিক ভাবে বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে; আর তার ফলে উৎপন্ন ঋণ-তড়িতাবিষ্ট হাইড্রক্সিল র‍্যাডিক্যাল ↑ (OH^-) বেসের ধন-তড়িতান্বিত ধাতব র‍্যাডিক্যালের সঙ্গে যুক্ত হয়। এস্টার ↑ জাতীয় পদার্থের হাইড্রোলিসিসের ফলে অ্যালকোহল-ও ↑ অ্যাসিডে ↑ রূপান্তরিত হয়ে যায়। সাবান তৈরির স্যাপোনিফিকেশন ↑ প্রক্রিয়াও এক রকম হাইড্রোলিসিসের ব্যাপার।

হাইড্রোসল (hydrosol)—যে-কোন কোলয়ড্যাল সল্যুসন ↑; বিভিন্ন কোলয়ড্যাল ↑ পদার্থের জলীয় দ্রবণ; যা আবার জেলির মত ঘন হলে তাকে বলে **হাইড্রোজেল** ↑।

হাইড্রোস্ফিয়ার (hydrosphere) — পৃথিবীর জলীয় মণ্ডল। ভূ-পৃষ্ঠের সাগর, মহাসাগরের সুবিশাল জল-রাশির পরিমণ্ডল।

হাইড্রোসায়েনিক অ্যাসিড (hydrocyanic acid) — হাইড্রোজেন সায়েনাইড (HCN); বর্ণহীন ও মারাত্মক বিষাক্ত তরল পদার্থ। একে কখন-কখন **প্রুসিক অ্যাসিড**-ও বলা হয়। এর তীব্র বিষ-ক্রিয়ার ফলে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই মানুষের মৃত্যু ঘটতে পারে। বিভিন্ন ধাতব সল্টের সঙ্গে এর রাসায়নিক বিক্রিয়ায় 'সায়েনাইড' সল্ট উৎপন্ন হয়।

হাইড্রোস্ট্যাটিক্স (hydrostatics) — বিশেষ অবস্থানে তরল পদার্থের স্থির অবস্থিতির ফলে তাতে উদ্ভূত শক্তি, চাপ, কার্যকারিতা প্রভৃতি বিষয়ক বিভিন্ন তথ্যাদি সম্পর্কিত বিজ্ঞান। বাংলায় একে বলা যায় 'উদ্‌স্থিতি-বিদ্যা'।

হাইপটেনিউজ (hypotenuse) — সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণের (90°) বিপরীত বাহু; যা ত্রিভূজটির দীর্ঘতম বাহু হয়ে থাকে।

হাইপথেসিস (hypothesis) — অনুমান, প্রকল্প ; পরীক্ষালব্ধ প্রত্যক্ষ কোন ফলের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় যে-সব আনুমানিক, অথচ স্বয়ংসিদ্ধ যুক্তি উপস্থাপিত করা হয়।

হাইপার (hyper) — স্বাভাবিক অপেক্ষা অধিক বুঝাতে কথাটা ব্যবহৃত হয় ; যেমন—**হাইপারঅ্যাসিডিটি** (hyperacidity), পাকস্থলীর জারক রসে অম্ল (অ্যাসিড, HCl) ক্ষরণের আধিক্য ; **হাইপার‍্যামিয়া** (hyperaemia) — দেহের কোন অঙ্গ, বা অংশ বিশেষে অত্যধিক রক্ত বৃদ্ধি-জনিত রোগ।

হাইপারগ্লাইকিমিয়া (hyperglycemia) — দেহের রক্তে স্বাভাবিক অপেক্ষা অতিরিক্ত শর্করার ভাগ বৃদ্ধির অবস্থা ; যেমন ডায়েবিটিস ↑ রোগে হয়ে থাকে।

হাইপারটনিক (hypertonic) — অসমান ঘনত্বের যে-কোন দু'টি দ্রবণের (সল্যুসন) মধ্যে গাঢ়তর দ্রবণটিকে বলে 'হাইপারটনিক সল্যুসন'। আর অপরটিকে বলা হয় **হাইপোটনিক সল্যুসন**। অপেক্ষাকৃত মৃদু দ্রবণের (হাইপো ↑) অস্‌মোটিক প্রেসার (অস্‌মোসিস ↑) গাঢ়তর, অর্থাৎ হাইপারটনিক দ্রবণের চেয়ে বেশি হয়ে থাকে ; কাজেই কোন জৈব পদার্থের পাত্‌লা পর্দার দু'দিকে ঐরূপ দুটি দ্রবণ রাখলে মৃদু দ্রবণ থেকে দ্রাবক তরল পদার্থটি গাঢ় দ্রবণের দিকে মাঝের পর্দা চুঁইয়ে চলে যায়। জীবদেহের রক্ত স্বভাবতঃই এরূপ 'হাইপারটনিক' অবস্থায় থাকে।

হাইপারপ্লেসিয়া (hyperplesia) — দেহের কোন-অঙ্গের অস্বাভাবিক, বা অত্যধিক বৃদ্ধি ; যেমন, কাহারও হাত, বা পায়ে ছ'টা আঙ্গুল হয়, কোন-কোন লোকের মাথার খুলি, বা একখানা হাত বেমানান-ভাবে বেড়ে যায় ; এরূপ অবস্থাকে বলে ঐ-সব অঙ্গের 'হাইপারপ্লেসিয়া'।

আবার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হলে বলে হাইপোপ্লেসিয়া।

হাইপারটেন্‌সন (hypertension) — রক্তের উচ্চচাপ, রোগ বিশেষ; যাকে **হাইপারপিসিস** (hyperpiesis)-ও বলা হয়।

হাইপারমেট্রোপিয়া (hypermetropia) — চোখের এক রকম দৃষ্টিদোষ; 'লং সাইট' ↑।

হাইপারল (hyperol) — হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড ↑ (H_2O_2) ও ইউরিয়ার ↑ রাসায়নিক মিলনেউৎপন্ন একটা যৌগিক পদার্থের ব্যবহারিক নাম। স্ফটিকাকার এক রকম কঠিন পদার্থ $CO(NH_2)_2 . H_2O_2$। জলের সঙ্গে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে পদার্থটা সহজেই বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে; পুনরায় এ থেকে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড ফিরে পাওয়া যায়। এ-জন্যে অস্থায়ী হাইড্রোজেন-পারক্সাইড ↑ সংরক্ষণের জন্যে তাকে এরূপ যৌগের আকারে সংবদ্ধ করে রাখা হয়।

হাইপারবোলা (hyperbola) — কোন সলিড কোণকে ↑ তার শীর্ষবিন্দু ছাড়া অপর যে-কোন বিন্দুতে ভূমির লম্বভাবে কাটলে যে বক্র সীমারেখা পাওয়া যায়। ডিম্বাকারে বাঁকানো এরূপ জ্যামিতিক রেখাটি হলো এমন
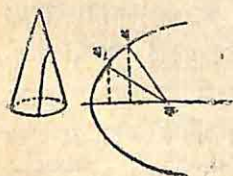
হাইপারবোলা

একটি বক্ররেখা যার অন্তবর্তী অক্ষরেখার একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে ঐ বক্ররেখা, অর্থাৎ হাইপারবোলার প্রত্যেকটি বিন্দুর দূরত্বের অনুপাত সর্বদা সমান থাকে এবং এই স্থিরানুপাত রাশিটির পরিমাণ হয় সর্বদা একের অধিক। হাইপারবোলার অক্ষস্থ ঐ নির্দিষ্ট বিন্দুকে বলে তার 'ফোকাস'; আর ঐ নির্দিষ্ট অক্ষরেখাটিকে বলা হয় তার 'ডাইরেক্‌ট্রিক্‌স'। এই আনুপাতিক রাশির 'হাইপারবোলিক ফাংসন' প্রভৃতি বিভিন্ন গাণিতিক পদ্ধতিতে জ্যোতির্বিদ্যার বহু জটিল তথ্যাদি নির্ণীত হয়ে থাকে।

হাইপারপাইরেক্সিয়া (hyperpyrexia) — দেহের অত্যধিক তাপবৃদ্ধি; যেমন, জর হলে দেহের তাপ বৃদ্ধি পায়। সাধারণতঃ 105° ফারেনহিটের ↑ উপরে দেহের তাপ উঠলে 'হাইপারপাইরেক্সিয়া' অবস্থা বলে।

হাইপারহাইড্রোসিস (hyperhydrosis) — রোগীর অত্যধিক স্বেদ, বা ঘর্ম নিঃসরণের অবস্থা; রোগ বিশেষ, যাতে রোগী অত্যধিক দুর্বল ও অবসন্ন হয়ে পড়ে।

হাইপো (hypo) — শব্দার্থ হলো নিচে, বা কম; যেমন—হাইপোডার্মিক ইঞ্জেক্‌শন ↑, সাধারণতঃ চামড়ার অব্যবহিত নিচে যে ইঞ্জেক্‌শন করা হয়।

হাইপো-অ্যাসিডিটি — পাকস্থলীর পাচক-রসে প্রয়োজনের চেয়ে কম অম্ল-রস, বা অ্যাসিড নিঃসরণের জন্যে যে অগ্নিমান্দ্য ও বদহজম রোগ হয়।

হাইপো-সল্ট (hypo-salt) — সোডিয়াম থায়োসালফেট, $Na_2 S_2$-

$O_3 . 5H_2O$; সল্টটা সংক্ষেপে 'হাই-পো' নামে পরিচিত। এর কারণ, পূর্বে এ-সল্টটাকে ভুলবশতঃ সোডিয়াম হাইপো-সালফাইট বলে মনে করা হতো। পরে জানা যায়, রাসায়নিক গঠন ও ধর্মানুসারে একে সোডিয়াম হাইপো-সালফেট বলা যেতে পারে। এর জলীয় দ্রব ফটোগ্রাফির ↑ ফিক্সিং প্রক্রিয়ায় একটি অপরিহার্য রাসায়নিক পদার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

হাইপোকণ্ড্রিয়া (hypochondria) — যে মানসিক অবস্থায় মানুষ অকারণে অযথা নিজেকে রোগগ্রস্ত বলে মনে করে ; মানসিক ব্যাধি।

হাইপোক্লোরাইট (hypochlorite) — হাইপোক্লোরাস অ্যাসিডের (HClO) বিভিন্ন সল্ট। সোডিয়াম, পটাসিয়াম ও ক্যাল-সিয়ামের হাইপোক্লোরাইট সল্টগুলো সবই বীজঘ্ন ও বীজবারক (antiseptic) পদার্থ হিসেবে ও ব্লিচিং-এর ↑ কাজে ব্যবহৃত হয়; যেহেতু এ-গুলোর অক্সিডাইজিং ↑, অর্থাৎ জারক শক্তি যথেষ্ট প্রবল।

হাইপোজিল প্ল্যাণ্ট (hypogeal plant) — সম্পূর্ণরূপে মাটির তলায় প্রোথিত অবস্থায় যে-সব উদ্ভিদের বীজ অঙ্কুরিত হয়। বীজপত্রদ্বয় (কটিলিডন্‌স ↑) মাটির ভিতরে থেকে যায় ; আর অঙ্কুরিত উদ্ভিদকাণ্ডটি মৃত্তিকা ভেদ করে উপরে ওঠে। আর, যে-সব উদ্ভিদের অঙ্কুরিত কাণ্ড তার অগ্রভাগে বীজপত্র নিয়ে উপরে উঠে যায় তাদের বলা হয় **এপিজিল ↑ প্ল্যাণ্ট**।

হাইপোডার্মিক ইঞ্জেক্‌শন (hypodermic injection)—'হাইপো' মানে নিচে, 'ডার্মিস' চামড়া ; সূঁচ বিদ্ধ করে গাত্রচর্মের অব্যবহিত নিচে তরল ঔষধ প্রয়োগ করবার প্রক্রিয়া। এ-জন্যে ব্যবহৃত সূঁচকে বলা হয় 'হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ'। রোগীর দেহের মাংসপেশীর মধ্যে যে ইঞ্জেক্‌শন দেওয়া হয় তাকে বলে **ইণ্টার-মাস্কুলার**, এবং শিরার মধ্যে তরল ঔষধ অনুপ্রবেশ করালে তাকে বলে **ইণ্টারভেনাস** ইঞ্জেক্‌শন।

হাইপোথ্যালামাস (hypothalamus)—মস্তিষ্কের মধ্যস্থলে লঘুমস্তিষ্ক, বা সেরিবেলামের ↑ উপরে ও গুরু-মস্তিষ্ক, বা সেরিব্রামের নিচে 'থার্ড ভেন্ট্রিকল', বা তৃতীয় নিলয়নামক যে গহ্বরটি রয়েছে তার নিম্ন তল-দেশকে বলে হাইপোথ্যালামাস। পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ড ↑ এরই একটা অংশ বিশেষ। এই হাইপোথ্যালামাস হলো মস্তিষ্কের অন্যতম একটি প্রধান স্নায়ু-কেন্দ্র। মনে হয়, মানুষের নিদ্রা ও জাগরণের স্নায়বিক ক্রিয়া এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এর কোন রকম বিকৃতি ঘটলে মানুষ গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে অচেতন হয়ে থাকে।

হাইপোথ্যালামাস

হাইপোপ্লাসিয়া (hypoplasia) —

দেহের কোন অংশের অস্বাভাবিক অপরিপুষ্টি রোগ; যার ফলে কোন জীবদেহের কোন অঙ্গ, বা অংশ-বিশেষের শীর্ণতা, বা বিকৃতি দেখা দেয়।

হাইব্রিড (hybrid) — বর্ণসংকর; উদ্ভিদ, বা প্রাণিজগতে বিভিন্ন বর্ণ, বা গোত্রের জনক-জননীর দ্বারা উদ্ভূত সন্তান; অসমগোত্রীয়, বা সংকর জীব।

হাইস্পিড স্টিল (highspeed steel) — এক বিশেষ শ্রেণীর অতি-কঠিন ইস্পাত। সাধারণ স্টিলের ↑ সঙ্গে 12% থেকে 22% পর্যন্ত টাংস্টেন ↑ ও অল্প পরিমাণ ক্রোমিয়াম ↑, ভ্যানা-ডিয়াম ↑ প্রভৃতি ধাতু মিশ্রিত করে এই হাইস্পিড স্টিল তৈরি হয়ে থাকে। এরূপ ইস্পাতে সাধারণতঃ বিভিন্ন যন্ত্রপাতি তৈরি হয়। অত্যন্ত তাপসহ; অত্যধিক উত্তাপে লাল হয়ে গেলেও এ-স্টিল নরম হয় না।

হার্জ, হেন্‌রিক রুডল্‌ফ (Hartz, Heinrich Rudolf) — জার্মান পদার্থ-বিজ্ঞানী; হামসবার্গে জন্ম 1857 খৃঃ, মৃত্যু 1894 খৃঃ। তড়িৎ-চুম্বকীয় (ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগ্নেটিক ↑) তরঙ্গ প্রবাহের অস্তিত্ব আবিষ্কারের জন্যে সবিশেষ প্রসিদ্ধি; এই হার্জীয় (Hertzian) তরঙ্গই বেতার-তরঙ্গ বলে খ্যাত। মূলতঃ এর সাহায্যেই রেডিও ↑, র‍্যাডার ↑ প্রভৃতি যন্ত্র উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছে। ম্যাক্সওয়েল ↑ অবশ্য পূর্বেই এরূপ তরঙ্গের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভবিষ্য-দ্বাণী করেছিলেন; কিন্তু এর বাস্তব পরীক্ষামূলক তথ্যাদি আবিষ্কার করেন হার্জ। তারপরে মার্কনি ↑ এই তরঙ্গের ব্যবহারিক প্রয়োগে আধুনিক রেডিও যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন।

হার্ড ওয়াটার (hard water) — খর জল; যে-জলে বিভিন্ন খনিজ পদার্থ দ্রবীভূত থাকায় সাবান গুল্‌লে ভাল ফেনা হয় না। সাধারণতঃ ক্যাল-সিয়াম, ম্যাগ্নেসিয়াম ও লৌহের বিভিন্ন সল্ট এরূপ জলে দ্রবীভূত থাকে। সাবানের সঙ্গে এই সল্টগুলোর রাসা-য়নিক ক্রিয়ায় ফ্যাটি-অ্যাসিডের অদ্রাব্য ধাতব সল্ট উৎপন্ন হয়ে সাবানের কার্যকারিতা নষ্ট করে ফেলে (সোপ ↑, সফ্‌ট ওয়াটার ↑)। হার্ড ওয়াটার দু'রকম; এক রকম হলো অস্থায়ী, যার মধ্যে বিভিন্ন বাইকার্ব-নেট ↑ সল্ট দ্রবীভূত থাকে। এরূপ খর জল উত্তাপে ফুটালেই বাইকার্বনেট সল্ট বিশ্লিষ্ট হয়ে কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস বেরিয়ে যায়, আর অদ্রাব্য কার্বনেট সল্ট জলের তলায় থিতিয়ে পড়ে। এভাবে প্রথমে ফুটিয়ে নিয়ে সহজেই এরূপ হার্ড ওয়াটারকে সফ্‌ট ওয়াটারে ↑ পরিণত করা যায়, সাবানে কাজ হয়। জলে ধাতব সালফেট সল্ট দ্রবীভূত থাকলে তাকে বলে পার-ম্যানেণ্ট, বা স্থায়ী খর-জল। এরূপ হার্ড ওয়াটারকে সফ্‌ট ওয়াটারে পরিণত করতে হলে প্রথমে ওয়াশিং সোডা ↑ মেশাতে হয়, যার রাসায়-নিক ক্রিয়ায় বিভিন্ন অদ্রাব্য ধাতব কার্বনেট সল্ট উৎপন্ন হয়ে পাত্রের তলায় পড়ে। সব রকম হার্ড ওয়া-টারকেই উপযুক্ত পরিমাণে জিও-লাইট ↑ মিশিয়ে উত্তপ্ত করে তার খরতা দূর করা যেতে পারে।

হার্ডেনিং অব ফ্যাট (hardening of fat) — বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ তৈল ও তরল জান্তব চর্বিকে হাইড্রোজেন গ্যাসের প্রভাবে গন্ধ-শূন্য ও ঘনীভূত করবার প্রক্রিয়া (হাইড্রোজেনেশন অব অয়েল ↑)।

হারভেস্ট মুন (harvest moon) — জল-বিষুব (অট্যাম্‌নাল ইকুইনক্স ↑) সময়-কালের পূর্ণ চন্দ্র; যে সময়ে দিবা-রাত্রি সমান থাকে।

হিউমাস (humus) — ব্যাক্টেরিয়া ↑ শ্রেণীর জীবাণুর প্রভাবে লতা, পাতা প্রভৃতি বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ পদার্থ মাটিতে পচে রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে যে মিশ্র জৈব মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়। পদার্থটা এক রকম স্বাভাবিক জৈব সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কৃষি-জমির মাটিতে এই হিউমাস মিশ্রিত থাকলে উদ্ভিদাদি ভাল জন্মায়।

হিউমিডিটি (humidity) — বায়ুর আর্দ্রতা; বায়ুমণ্ডলে মিশ্রিত জলীয় বাষ্পের আনুপাতিক পরিমাণগত অবস্থা। উষ্ণতার হ্রাস-বৃদ্ধির উপর বায়ু-মণ্ডলে মিশ্রিত জলীয় বাষ্পের পরিমাণ নির্ভর করে। কোন নির্দিষ্ট আঞ্চলিক বায়ুর সম্পৃক্ত অবস্থায় যতটা জলীয় বাষ্প তাতে মিশ্রিত থাকা সম্ভব (স্যাচুরেশন ↑) শতকরা হিসাবে তার যত ভাগ প্রকৃতপক্ষে থাকে তাকে বলে বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা, বা **রিলেটিভ হিউমিডিটি**।

হিট্ (heat) — তাপ শক্তি। রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে, বা উত্তাপে পদার্থের সংগঠক অণুগুলোর আন্তঃআণবিক চাঞ্চল্য বৃদ্ধিতে যে শক্তির উদ্ভব ঘটে। উত্তাপে স্বভাবতঃই পদার্থের আয়তন বাড়ে এবং উপযুক্ত উত্তাপ বৃদ্ধির ফলে ক্রমে তার অবস্থান্তর ঘটে থাকে: কঠিন পদার্থ তরল হয় (মেল্টিং পয়েন্ট ↑), আরও অধিক উষ্ণতায় ওই তরল পদার্থ বায়বীয় আকার ধারণ করে (বয়েলিং পয়েন্ট ↑)। কোন পদার্থের তাপ-শক্তি সংলগ্ন পদার্থের মধ্যে সঞ্চালিত, পরিবাহিত ও বিকিরিত হয়ে যেতে পারে। সাধারণতঃ ক্যালোরি ↑ এককে পদার্থে নিহিত মোট 'হিট্', অর্থাৎ তাপ-শক্তির পরিমাণ স্থির করা হয়। আর তাপশক্তির প্রকাশ ও হ্রাস-বৃদ্ধি অর্থাৎ পদার্থের উষ্ণতা নির্দেশের জন্যে টেম্পারেচারের ↑ বিভিন্ন একক (সেন্টিগ্রেড ↑, ফারেনহাইট ↑ ও রুমার ↑) ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

টেম্পারেচার ও হিট্ সমার্থক নয়; হিট্ হলো পদার্থে নিবদ্ধ তাপ-শক্তি, যার পরিমাণ ক্যালোরি ↑ এককে নির্ণীত হয়; আর টেম্পারেচার পদার্থে নিবদ্ধ ওই তাপশক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি, অর্থাৎ পদার্থটার উষ্ণতার পরিমাপ নির্দেশ করে। এক বালতি জলের হিট্, অর্থাৎ মোট তাপশক্তি এক গ্লাস অনুরূপ উষ্ণতাবিশিষ্ট জলের চেয়ে বেশি হবে; যদিও উভয় জলের টেম্পারেচার ↑ সমান।

হিট্, ল্যাটেন্ট (heat, latent) — উষ্ণতার কোনরূপ পরিবর্তন ব্যতীতই এক গ্র্যাম পদার্থের অবস্থান্তর (কঠিন থেকে তরল, অথবা তরল থেকে

গ্যাসীয়) ঘটাতে যে পরিমাণ তাপ-শক্তির প্রয়োজন হয়। তাপ হ্রাসের ফলে কোন তরল পদার্থ যখন জমে কঠিন হতে থাকে (সলিডিফাইং পয়েণ্ট ↑), অথবা তাপ বৃদ্ধির ফলে কোন কঠিন পদার্থ গলে তরল (মেল্টিং পয়েণ্ট ↑) হতে, বা ক্রমে বাষ্পীভূত হতে থাকে (বয়েলিং পয়েণ্ট ↑) তখন উত্তাপ প্রয়োগ করা সত্ত্বেও সম্যক পদার্থের অবস্থান্তর সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ওই পদার্থের উষ্ণতা (টেম্পারেচার ↑) বৃদ্ধি হয় না, একই উষ্ণতায় থাকে। পদার্থের এরূপ অবস্থান্তর ঘটাবার জন্যে প্রযুক্ত তাপশক্তি অবস্থান্তরিত পদার্থের মধ্যে সঞ্চিত হয়ে থাকে। এরূপ সঞ্চিত, বা পরিশোষিত তাপশক্তিকেই বলে তার 'লেটেণ্ট হিট্'। আবার বিপরীত প্রক্রিয়ায়, অর্থাৎ কঠিন পদার্থ যখন তরল হতে থাকে (লেটেণ্ট হিট অব ফিউসন), অথবা তরল পদার্থ বাষ্পে পরিণত হতে থাকে (ল্যাটেণ্ট হিট্ অব ভেপোরিজেশন ↑), তখন সেই অবস্থান্তরিত পদার্থের ওই 'ল্যাটেণ্ট', লুপ্ত, বা পরিশোষিত তাপ-শক্তি পুনরায় মুক্ত হয়ে প্রকাশ পায়।

হিট্, স্পেসিফিক (heat, specific) — এক গ্র্যাম কোন পদার্থের ও এক গ্র্যাম (4° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতাবিশিষ্ট) জলের উষ্ণতা পৃথকভাবে এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বর্ধিত করতে যতটা তাপ শক্তির (হিট্ ↑) প্রয়োজন হয়, এতদুভয়ের অনুপাতকে বলে ওই পদার্থের 'স্পেসিফিক হিট্'। এখন, এক গ্র্যাম জল এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উত্তপ্ত করতে মোটামুটি এক ক্যালোরি ↑ তাপশক্তির প্রয়োজন হয়ে থাকে। সুতরাং যে পরিমাণ, অর্থাৎ যত ক্যালোরি তাপশক্তির প্রয়োগে এক গ্র্যাম পদার্থের উষ্ণতা এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ↑ বর্ধিত হয়, সংখ্যাগত-ভাবে তাকেই ওই পদার্থের 'স্পেসি-ফিক হিট্', বা 'বিশেষ তাপ' বলে ধরা যেতে পারে। সাধারণতঃ ক্যালোরি ↑ এককে এই স্পেসিফিক হিট্ পরিমিত হয়ে থাকে। প্রত্যেক পদার্থের স্পেসিফিক হিটের পরিমাণ নির্দিষ্ট ও বিভিন্ন ; পদার্থের গঠন-বৈশিষ্ট্যের উপরেই তার এই নিজস্ব বিশেষ তাপের বিভিন্নতা নির্ভর করে।

হিট্ অব রেডিয়েশন — (heat of radiation) — বিকিরিত তাপশক্তি। উত্তপ্ত পদার্থ থেকে 'ইলেক্ট্রো-ম্যাগ্নেটিক ওয়েভ,' অর্থাৎ চুম্বকীয় তড়িত্তরঙ্গের আকারে তাপ-শক্তি বিকিরিত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে ; আর সেই উত্তপ্ত পদার্থের উষ্ণতা হ্রাস পেতে থাকে। উত্তপ্ত পদার্থে নিহিত তাপশক্তির পরিমাণ অনুসারে এরূপ বিকিরিত তাপ-তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য (ওয়েভ লেংথ ↑) সাধারণতঃ দৃশ্য লালবর্ণের আলোক-রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য থেকে অদৃশ্য ক্ষুদ্রতম বেতার-তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য পর্যন্ত বিভিন্ন আকারের হতে পারে।

হিট্ অব সল্যুশন (heat of solution) — দ্রবণজনিত তাপশক্তি ; এক গ্র্যাম - মলিকিউল ↑ পরিমাণ

পদার্থ জলে দ্রবীভূত করলে যতটা তাপ উদ্ভূত, বা বিলুপ্ত হয়। কোন পদার্থদ্রবীভূত হলে সেই সল্যুসনের ↑ তাপ-বৃদ্ধি ঘটে (এক্সোথার্মিক ↑); আবার কোন-কোন পদার্থের ক্ষেত্রে তাপ হ্রাস পায় (এণ্ডোথার্মিক ↑)। কোন পদার্থের দ্রবণের ফলে উদ্ভুত তাপ-শক্তির এরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি সাধারণতঃ ক্যালোরি ↑ এককে মাপা হয়।

হিট্‌ অব ফর্মেশন (heat of formation) — যৌগের সংগঠন-জনিত তাপ; বিভিন্ন মৌলিক উপাদানের রাসায়নিক মিলনে এক গ্র্যাম-মলিকিউল ↑ যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি-কালে যে পরিমাণ তাপ-শক্তি উদ্ভূত, বা বিলুপ্ত হয়। যৌগিক পদার্থের সংগঠন-প্রক্রিয়ায় স্বভাবতঃই তাপের এরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে থাকে। আবার, বিভিন্ন যৌগিক পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়ার (কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন ↑) ফলে এক গ্র্যাম-মলিকিউল পরিমাণ নূতন যৌগিকের সৃষ্টি হতে যতটা তাপ উদ্ভূত, বা বিলুপ্ত হয় তাকে বলে **হিট্‌ অব রিঅ্যাক্‌শন** (heat of reaction); একেই আবার কখন-কখন বলে 'থার্মাল ভ্যালু অব কেমিক্যাল রিঅ্যাক্‌শন'।

হিপ্‌সোমিটার (hypsometer) — সহজে তরল পদার্থের স্ফুটনাংক (বয়েলিং পয়েন্ট ↑) নিরূপণ করবার এক রকম যন্ত্র বিশেষ; সাগরপৃষ্ঠ থেকে কোন স্থানের উচ্চতা নিরূপণ করবার জন্যেই প্রধানতঃ এ-যন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তরল পদার্থের স্ফুটনাংক জানলে তা থেকে হিসাব করে স্থানীয় উচ্চতাও জানা যেতে পারে। এর মূল তথ্যটা হলো এই যে, তরল পদার্থের স্ফুটনাংক বায়ুমণ্ডলীয় চাপের উপর নির্ভরশীল (বয়েলিং পয়েন্ট ↑)। আবার বিভিন্ন উচ্চতায় বায়ুর চাপ পরিবর্তিত হয়ে থাকে; স্থানীয় উচ্চতা বাড়লে বায়ুর চাপ কমে যায়, ফলে তরল পদার্থের স্ফুটনাংকও হ্রাস পায়। এভাবে উচ্চতা অনুসারে বায়ুর চাপ যত কমে তরল পদার্থের স্ফুটনাংকও তদনুযায়ী কমতে থাকে। এরূপ হিসাব অনুসারে হিপ্‌সোমিটারে জলের স্ফুটনাংক দেখে কোন স্থানের উচ্চতা এতদ্বিষয়ক তালিকা (চার্ট) থেকে সহজেই নির্ধারণ করা যেতে পারে।

হিপোক্রেট্‌স (Hipocrates) — গ্রীক চিকিৎসা-বিজ্ঞানী; সুনির্দিষ্ট জীবনকাল অজ্ঞাত (আনুমানিক খৃঃ পূঃ 460 থেকে 357 খৃঃ পূঃ মধ্যে)। থ্রেস নগরীতে চিকিৎসা ব্যবসায়ে অসামান্য পারদর্শিতা। বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা-পদ্ধতি এবং অস্ত্রোপচার-বিদ্যাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। রোগের কারণ ও নিদান সম্পর্কে বহু তথ্যপূর্ণ অমূল্য গ্রন্থাদি রচনা। পাশ্চাত্যের ধন্বন্তরী ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের জনক বলে আখ্যাত।

হিম্‌- (haem-)/**হিমা-** (haema-) **হিমো-** (haemo-) — রক্ত, রক্ত সম্বন্ধীয়।

হিমাটোমা (haematoma)—কোন রূপ আঘাতে দেহের কোন অংশে রক্ত জমে যে স্ফীতির সঞ্চার হয়।

হিমোপ্‌টিসিস (haemoptysis)—থুথুর সঙ্গে রক্তক্ষরণ, রোগ বিশেষ।

হিমাটোসিস (haematosis) — প্রাণিদেহে যে-বিশেষ জৈবিক প্রক্রিয়ায় রক্ত গঠিত হয়, তৎসম্বন্ধীয় জৈব রাসায়নিক তত্ত্ব।

হিমাটেমিসিস (haematemesis)—রক্ত-বমন ; যে-রোগে রোগী রক্ত বমন করে।

হিমোগ্লোবিন (haemoglobin) — লোহিত কণিকা ও শ্বেত কণিকা নামক দু'রকম রক্ত-কণিকা রক্তরসে (সিরাম ↑) ভেসে থাকে। বিশেষ এক রকম জৈব রঙ্গীন পদার্থের জন্যে রক্তের ওই লোহিত কণিকাগুলো রক্তবর্ণ হয় ; তাই সামগ্রিকভাবে রক্ত লাল দেখায়। রক্তের এই রঙীন অংশটাই হলো হিমোগ্লোবিন ; যা এক রকম প্রোটিন ↑ জাতীয় পদার্থে গঠিত। রা সা য় নি ক হিসেবে জিনিসটা কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ও লৌহ ঘটিত একটা অতি জটিল গঠনের জৈব যৌগিক পদার্থ। শ্বাস-বায়ুর সঙ্গে মিশ্রিত যে অক্সিজেন দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে তা এই জৈব রঙ্গীন পদার্থ, অর্থাৎ হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে মিশে শিরা-উপশিরার পথে সারা দেহে ছড়িয়ে যায়। দেহাভ্যন্তরে হিমোগ্লোবিন নিজে অক্সিডাইজ্‌ড ↑ হয় না; অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে 'অক্সি-হিমোগ্লোবিন' নামক একটি অস্থায়ী যৌগিকের আকারে অক্সিজেন বয়ে নিয়ে সারা দেহের কোষে সরবরাহ করে ও দূষিত পদার্থ অক্সিডাইজ্‌ড হয়।

হিলিও (helio) — সূর্য সম্বন্ধীয় ; যেমন, **হিলিওগ্রাফ** (heliograph) হলো এক প্রকার যন্ত্র, যাতে বিশেষ দর্পণে সূর্যালোকের প্রতিফলনের সাহায্যে এক কালে সংবাদ-সংকেত দূরে প্রেরণ করা হতো।

হিলিওফাইট (heliophyte) — যে-সব সপুষ্পক উদ্ভিদের অগ্রভাগ, বিশেষতঃ ফুলগুলি সারাদিন সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে এবং সূর্য-রশ্মির তাপ সহ্য করেও সতেজ থাকে।

হিলিওমিটার (heliometer) — বিশেষ এক ধরনের দূরবীক্ষণ যন্ত্র (টেলিস্কোপ ↑), যার সাহায্যে সূর্যের (গ্রহ-নক্ষত্রেরও) ব্যাস মাপা যায়। 'হিলিও' মানে সূর্য।

হিলিওস্টাট(heliostat) — জ্যোতির্বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণাদিতে ব্যবহৃত যন্ত্র বিশেষ ; এতে সূর্যের আপাত-গতি অনুযায়ী একখানা দর্পণ প্রতিনিয়ত ঘুরে সর্বদাই সূর্যের প্রতিফলিত রশ্মি, অর্থাৎ তার প্রতিচ্ছবি সংলগ্ন কোন স্পেক্ট্রোস্কোপ ↑, বা টেলিস্কোপ ↑ যন্ত্রের মধ্যে ফেলে। রাত্রিকালে গ্রহ-নক্ষত্রের অনুরূপ পর্যবেক্ষণও এতে সম্ভব হয়।

হি লি য়া ম (helium) — একটি মৌলিক গ্যাস ; সাংকেতিক চিহ্ন He ; পারমাণবিক ওজন 4·003, পারমাণবিক সংখ্যা 2 ; অন্যতম

ইনার্ট ↑ গ্যাস। বায়ুমণ্ডলে অতি সামান্য পরিমাণে বর্তমান (প্রায় দুই লক্ষ ভাগে এক ভাগ মাত্র)। কোন কোন স্থানে ভূ-গর্ভোত্থিত গ্যাসে হিলিয়াম পাওয়া যায়। গ্যাসটা অদাহ্য ও বায়ু অপেক্ষা হাল্‌কা বলে বেলুন, এরোপ্লেন প্রভৃতিতে ব্যবহারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

হিস্টারেক্‌টমি (hysterectomy) — স্ত্রীলোকের গর্ভাধার (ইউটারাস ↑) ব্যবচ্ছেদ; গর্ভাধার (অর্থাৎ স্ত্রীলোকের উদরস্থ যে আধারে ভ্রূণ পরিপুষ্ট হয়ে হয়ে পূর্ণাঙ্গ শিশুতে পরিণত হয়) কেটে বাদ দিয়ে সন্তান-ধারণের ক্ষমতা নষ্ট করবার প্রক্রিয়া। '**হিস্টার**' মানে গর্ভাধার সম্বন্ধীয়।

হিস্টারিসিস (hysteresis) — কোন ভৌত পরিবর্তনের পরে কোন বস্তুর পূর্বাবস্থায় ফিরে আসায় বিলম্ব; যেমন, সুইচ তুলে দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ বন্ধ করলেও ইলেক্‌ট্রিক বাতির ফিলামেণ্ট ↑ কিছু সময় লাল থাকে, অপ্রদীপ্ত পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে কিছু বিলম্ব হয়। আবার, কোন ইলেক্‌ট্রিক কয়েলের ↑ অভ্যন্তরে রাখলে লৌহদণ্ড যে চৌম্বক ধর্ম প্রাপ্ত হয়, কয়েলে তড়িৎ-প্রবাহ বন্ধ করলেও সহসা সেই লৌহদণ্ডটি তার অর্জিত চৌম্বক ধর্ম সম্পূর্ণ হারায় না, কিছু সময় তার চৌম্বকত্ব থাকে। এই অবস্থাকে বলে হিস্টারিসিস; আর সাময়িক অর্জিত ধর্মের এই স্থিতিকালকে বলে **হিস্টাসিস পিরিয়ড**।

হিস্টোলজি (histology) — জীবদেহের পেশীতন্তু (টিস্যু ↑) সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। '**হিস্টো**' মানে জৈব তন্তু সম্বন্ধীয়। দেহের কোথাও সজীব পেশী-তন্তু আহত, বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার **হিস্টামিন** নামক একটি 'অ্যামিনো অ্যাসিড ↑ উপাদান **হিস্টিডিন** (histidine) নামক আর একটা জৈব পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে যায়; আর তার ফলে পেশীর সজীবতা ও কর্মক্ষমতা লোপ পায়।

হুইটস্টোন, স্যার চার্লস (Wheatstone, Sir Charls) — বৃটিশ পদার্থবিজ্ঞানী; গ্লসেস্টারে জন্ম 1802 খৃঃ, মৃত্যু 1875 খৃঃ। বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্র আবিষ্কারের জন্য প্রসিদ্ধি; বিশেষতঃ তড়িতের প্রতিরোধ-শক্তি (রেজিস্টেন্স ↑) পরিমাপের জন্যে উদ্ভাবিত 'হুইটস্টোন ব্রিজ' যন্ত্র আবিষ্কারে চিরস্মরণীয়। টেলিগ্রাফের ↑ বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা ও ডায়নোমো ↑ যন্ত্রের উন্নতি বিধানে অসামান্য দান।

হুগো, ডাঃ থিয়োরেল (Hugo, Dr. Theorel) — সুইডেনবাসী প্রখ্যাত জৈব রসায়ন-বিজ্ঞানী; স্টক-হোল্‌মে জন্ম 1903 খৃস্টাব্দ। চিকিৎসা বিজ্ঞান অধ্যয়ন; কিন্তু যৌবনেই পোলিও রোগে পদদ্বয় শীর্ণ হয়ে বিকলাঙ্গ। ফলে চিকিৎসা ব্যবসায় ত্যাগ ও জৈব রাসায়নিক গবেষণায় আত্মনিয়োগ। মাংসপেশীর রঙিন পদার্থ 'মাইয়োগ্লোবিন' সম্পর্কীয় গবেষণায় খ্যাতি অর্জন; জীবদেহে এন্‌জাইমের ↑ কার্যকারিতা সম্পর্কেও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যা-

বিষ্কার। জৈব কোষের জীবন-রসায়ন স্বরূপ অক্সিজেন-গ্রহণকারী নূতন এক এন্‌জাইম আবিষ্কারের জন্যে 1955 খৃষ্টাব্দে চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও শারীরবৃত্তের নোবেল পুরস্কার লাভ।

হেক্টার (hectare) — কৃষি-জমির বর্গায়তন পরিমাপের একটি একক বিশেষ; প্রায় 2·47 একর ↑।

হেক্টো, হেক্টা (hecto-, hecta-)— এক শত, বা এক শতগুণ বুঝাতে বিভিন্ন কথার পূর্বে ব্যবহৃত হয়; যেমন — হেক্টোমিটার (=100 মিটার ↑) হেক্টাহেড্রন ↑ ইত্যাদি।

হেগেল, (Hegel) জর্জ উইল্‌হেল্‌ম ফ্রেডারিক — জার্মান দার্শনিক, জন্ম 1770 খৃঃ, মৃত্যু 1831 খৃঃ। প্রচারিত দার্শনিক মতবাদে পরবর্তী কালে কার্ল মার্ক্স প্রভাবিত হন; মার্ক্সীয় (বস্তুতঃ হেগেলীয়) মতবাদে পাশ্চাত্য চিন্তা-ধারায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে।

হেটারোজেনাস (heterogeneous) —অসমসত্ব; যে পদার্থের বিভিন্ন অংশের রাসায়নিক ও ভৌত গঠন একরূপ নয়, বিভিন্ন গঠনের সংমিশ্রণ; হোমোজেনাস (homogeneous) ↑ শব্দের বিপরীত অর্থবোধক। 'হেটারো' শব্দের অর্থ 'বিভিন্ন'।

-হেড্রন (-hedron) — বিভিন্ন সংখ্যক বাহুবিশিষ্ট ক্ষেত্র, যেমন—**অক্টা-হেড্রন**, অষ্টবাহুবিশিষ্ট ক্ষেত্র, **হেক্টা-হেড্রন** (hectahedron), 100 বাহু-বিশিষ্ট ক্ষেত্র।

হেডনিজ্‌ম (hedonism) — দৈহিক সুখই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, এরূপ ধারণা, বা মতবাদ। **হেডন** (hedon) মানে দৈহিক সুখ, আনন্দ।

হেপ্টা (hepta-) — সপ্তগুণ, বা 'সাত সংখ্যক' বুঝাতে বিভিন্ন কথার পূর্বে ব্যবহৃত হয়; যেমন—হেপ্টাগন সপ্ত বাহুবিশিষ্ট ক্ষেত্র; হেপ্ট্যাঙ্গুলার সপ্ত-কৌণিক; ইত্যাদি। **হেপ্টেন** হলো পেট্রোলিয়াম ↑ থেকে প্রাপ্ত সাতটা কার্বন-পরমাণু বিশিষ্ট একটা বিশেষ গঠনের তরল হাইড্রোকার্বন ↑।

হেপাটিক (hepatic) — শব্দার্থ হলো 'যকৃৎ সম্বন্ধীয়'; যকৃতের নীলাভ-লাল বর্ণ বিশিষ্ট। 'হেপাটিক ফিভার' হলো যকৃতের দোষে যে জ্বর হয় এবং রোগীর দেহ নীলাভ হয়ে যায়।

হেপারিন (heparin) — সাধারণতঃ জীবের যকৃতে প্রাপ্ত এক রকম জৈব রাসায়নিক পদার্থ; যার আধিক্য ঘটলে রক্ত জমাট বাঁধতে পারে না।

হেভি ওয়াটার (heavy water) — হেভি হাইড্রোজেনকে ↑ বলে ডয়েটে-রিয়াম ↑; এই ডয়েটেরিয়ামের অক্সা-ইড (D_2O) হলো হেভি ওয়াটার। দৃশ্যতঃ সাধারণ জলের (হাইড্রোজেন অক্সাইড, H_2O) মত এটা একটা তরল পদার্থ। হেভি হাইড্রোজেনের কেন্দ্রীণকে বলে 'ডয়টেরন' ↑। এটা হাইড্রোজেনের একটা বিশেষ গঠনের আইসোটোপ ↑, যার অ্যাটমিক ওয়েট হলো দুই; পক্ষান্তরে সাধারণ হাইড্রোজেনের অ্যাটমিক ওয়েট ↑ এক। বিশেষ এক রকম জটিল ও ব্যয়বহুল প্রক্রিয়ার সাহায্যে সাধারণ জলকে হেভি হাইড্রোজেন-বিশিষ্ট

এরূপ ভারী জলে পরিণত করা যায়। অ্যাটমিক পাইল ↑ যন্ত্রে পদার্থের নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকসনের ↑ তীব্রতা মন্দীভূত করবার জন্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই 'হেভি ওয়াটার' মডারেটর ↑ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে (হাইড্রোজেন বম্ ↑)।

হেভি স্পার (heavy spar) — খনিজ বেরিয়াম সালফেট, $BaSO_4$; সাদা অদ্রাব্য কঠিন পদার্থ। একে সাধারণতঃ ব্যারাইটস্ ↑ বলা হয়।

হেভিসাইড কেনালি লেয়ার (heavyside kennaly layer) — পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের আয়নোস্ফিয়ার ↑ স্তরের একাংশ এই নামে পরিচিত। ভূ-পৃষ্ঠের প্রায় 70 মাইল উর্ধ্বে অবস্থিত এই স্তরে বেতার তরঙ্গ ক্রমাগত প্রতিফলিত হয়ে হয়ে ক্রমে ভূ - পৃষ্ঠের দিকে বেঁকে আসে, তাই বহু দূরবর্তী স্থানেও বেতার-তরঙ্গ পৌঁছান সম্ভব হয়। এরূপ না হলে তরঙ্গগুলো সর্বদা ঋজু পথে অগ্রসর হয়ে মহাশূন্যে চলে যেত, গোলাকার ভূ-পৃষ্ঠের দূরবর্তী স্থানে এদের পৌঁছান কখন সম্ভব হতো না। এই হেভিসাইড স্তরের বায়ু-কণিকা আয়নায়িত, বা তড়িতাবিষ্ট থাকার ফলেই বেতার-তরঙ্গের এরূপ ধারাবাহিক প্রতিফলন সম্ভব হয়ে থাকে এবং চলার পথে তা ক্রমাগত নিচের দিকে বেঁকে আসে, আর ভূ-পৃষ্ঠের দূরবর্তী স্থানে পৌঁছায়। বায়ুমণ্ডলে এই হেভিসাইড স্তরের অবস্থান অন্যান্য স্তরের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে চিত্রে দেখান হলো।
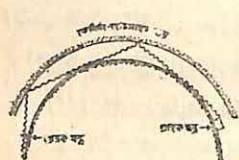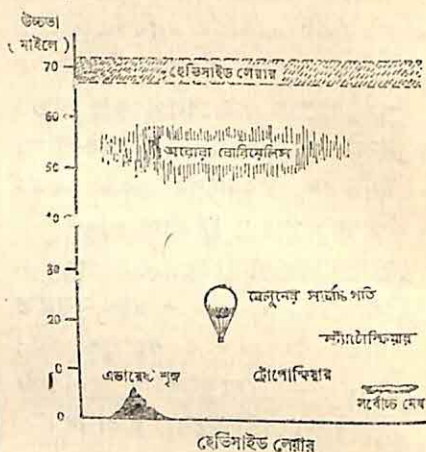
বেতার-তরঙ্গের প্রতিফলন

হেভিসাইড লেয়ার

হেভি হাইড্রোজেন (heavy hydrogen) — বিশেষ গঠনের ভারী হাইড্রোজেন গ্যাস ; হাইড্রোজেনের একটা আইসোটোপ ↑, যার বিশেষ নাম হলো 'ডয়টেরিয়াম'। সাধারণ হাইড্রোজেনের অ্যাটমিক ওয়েট এক ; কিন্তু এই **ডয়টেরিয়াম** ↑, বা হেভি হাইড্রোজেনের অ্যাটমিক ওয়েট দুই। এর নিউক্লিয়াস ↑ অর্থাৎ কেন্দ্রীণকে বলে **ডয়টেরন**; যা একটা প্রোটন ↑ কণিকা ও একটা নিউট্রন ↑ কণিকার সমবায়ে গঠিত হয়। সাধারণ হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াসে কিন্তু কোন নিউট্রন কণিকা থাকে না। সাইক্লোট্রন ↑ যন্ত্রের সাহায্যে এই ডয়টেরনকে সবিশেষ গতিযুক্ত করে অ্যাটম ভাঙ্গার (ফিসন ↑) জন্যে প্রয়োগ করা হয়। আবার **ট্রাইটিয়াম** ↑ নামক আর এক রকম

হেভি হাইড্রোজেনও পৃথক করা সম্ভব হয়েছে। এই ডয়টেরিয়াম ও **ট্রাই-টিয়াম** উভয়ই হেভি হাইড্রোজেন ; যা সাধারণ হাইড্রোজেনের বিভিন্ন আইসোটোপ ↑ মাত্র। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, মূলতঃ এই দু'রকম হেভি হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্‌সন (ফিউসন ↑) ঘটিয়েই হয়তো 'হাইড্রোজেন বম্‌' ↑ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে।

হেম্‌লক (hemlock) — বিষাক্ত রস-যুক্ত এক শ্রেণীর উদ্ভিদ। এগুলি চার পাঁচ ফুট উঁচু হয়, সাদা ফুল ফোটে। সারা ইউরোপে ও এশিয়ার কোন কোন স্থানে গ্রীষ্মকালে জন্মে।

হেলিওগ্রাফ (heliograph) — এক প্রকার যন্ত্র, যার সাহায্যে সূর্যরশ্মি একখানা দর্পণে প্রতিফলিত করে প্রাচীনকালে দূরবর্তী স্থানে সাংকে-তিক বার্তা প্রেরণ করা হতো।

হেলিওফাইট (heliophyte)—প্রখর সৌর তাপ সহ্য করেও যে-সকল উদ্ভিদ সতেজ থাকে, বিশীর্ণ হয় না। **হিলিও, হেলিও** (helio)=সূর্য, বা সূর্য সম্বন্ধীয় ; ফাইট (phyte)=উদ্ভিদ।

হেলিকপ্টার (helicopter)—বিশেষ এক শ্রেণীর বিমানপোত ; যা সোজা-সুজি উপরে উঠতে, বা নিচে নামতে পারে। এর পাখা উপরদিকে সংবদ্ধ থাকে, এবং ব্লেডগুলো খোলের সমান্তরালভাবে ঘোরে, উপরে-নিচে বাতাস কাটে। হেলিকপ্টার বিমান-পোত অল্প পরিসর স্থানে স্বচ্ছন্দে অব-তরণ করতে পারে, রান্‌-ওয়ের দর-কার হয় না বলে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এরূপ এরোপ্লেন যথেষ্ট সুবিধাজনক।

হেয়ারলিপ (hare lip) — জন্মাবধি উপরের ওষ্ঠটি দুই অংশে বিভক্ত (মানুষ) ; সাধারণ কথায় বলে ওষ্ঠ-কাটা, বা ঠোঁট-কাটা।

হেয়ার লিপ

হেয়ার সল্ট (hair salt) — খনিজ হাইড্রেটেড অ্যালুমিনিয়াম সালফেট সল্টের [$Al_2(SO_4)_3.18H_2O$] বিশেষ নাম। সাদা স্ফটিকাকার পদার্থ, জলে দ্রবণীয়।

হেয়ারস্প্রিং (hair spring)—হাত-ঘড়ির বিশেষ যন্ত্রাংশ ; যে সূক্ষ্ম স্প্রিং-টি ব্যালান্স-হুইল, বা সেকেণ্ডের কাল-পরিমাপক চক্রাংশটিকে সমতালে পর্যায়ক্রমে একবার এদিকে, আবার ওদিকে ঘুড়ায়।
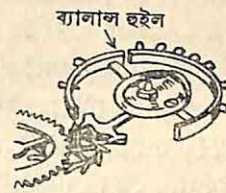
হেয়ার স্প্রিং

হোমোজেনাস (homogenous) — সমসত্ব ; যে পদার্থের গঠন সর্বাংশে সর্বত্র একই রূপ ; রাসায়নিক হিসেবে, বা গঠন-বৈশিষ্ট্যে যার মধ্যে কোথাও কোনরূপ বিভিন্নতা নেই। হোমো শব্দের অর্থ 'সমান', বা একই রূপ। (হেটারোজেনাস ↑)

হোমোলগ (homolog) — একই শ্রেণীর রাসায়নিক গঠন ও অনুরূপ ধর্মবিশিষ্ট বিভিন্ন জৈব যৌগের একটিকে অপরটির 'হোমোলগ', অর্থাৎ সমধর্মী, বা সমগোত্রীয় পদার্থ বলে ; যেমন, মিথেন ↑ (CH_4) ও ইথেন ↑ (C_2H_6) হলো পরস্পর পরস্পরের হোমোলগ কম্পাউণ্ড।

হোমোলগাস সিরিজ (homologous series) — এক, বা সমগোত্রীয় বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের শ্রেণী। যে-সব পদার্থের রাসায়নিক গঠন ও ধর্ম প্রায় একই রূপ, কেবল তাদের সংগঠক সমপর্যায়ের মৌলিক উপাদান-গুলোর পরমাণু-সংখ্যার বিভিন্নতার জন্যে বিভিন্ন যৌগ রূপ ধারণ করে। প্যারাফিন ↑ শ্রেণীর বিভিন্ন জৈব যৌগিকপদার্থ হলো এরূপ হোমোলগাস, যেমন—মিথেন ↑ CH_4, ইথেন ↑ CH_3 CH_3 প্রোপেন, $CH_3.CH_2.CH_3$. ইত্যাদি জৈব যৌগগুলো হলো হোমোলগাস শ্রেণীর।

হোয়াইটমেটাল (white metal)— এক প্রকার সংকর-ধাতু, যাতে টিন, অ্যান্টিমনি, লেড (কখন-কখন সামান্য দস্তা) মিশ্রিত করে প্রস্তুত করা হয়।

হোয়াইট লেড (white lead) — লেড কার্বনেট, $PbCO_3$, সীসার সাদা কার্বনেট যৌগ ; যা তিসির তেলে গুলে সাদা রঙ (পেইণ্ট ↑) প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।

হোল্‌মিয়াম (holmium) — বিশেষ দুষ্প্রাপ্য একটা মৌলিক ধাতু ; সাংকেতিক চিহ্ন Ho, পারমাণবিক ওজন 164, পারমাণবিক সংখ্যা 67 ; প্রকৃতপক্ষে ধাতুটা একক পরিচয়ে পৃথকভাবে পাওয়া যায় নি ; বর্ণালি-বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে 'রেয়ার আর্থ' ↑ শ্রেণীর খনিজ পদার্থে এর অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়েছে মাত্র। সুইডিস বিজ্ঞানী ক্লিভ 1879 খৃষ্টাব্দে এর অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন।

হ্যাবার প্রোসেস (Haber process)—বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন ↑ থেকে অ্যামোনিয়া ↑ উৎপাদন করবার বিশেষ একটা রাসায়নিক প্রণালী। জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্যে অ্যামোনিয়া-ঘটিত সার (ফার্টিলাইজার ↑) প্রস্তুত করবার জন্যে এই প্রণালীতে বায়ুর নাইট্রোজেনকে হাইড্রোজেনের সঙ্গে সংবদ্ধ করে অ্যামোনিয়া তৈরি করা সম্ভব হয়েছে (ফিক্সেসন অব নাইট্রোজেন ↑)। যান্ত্রিক কৌশলে অত্যধিক চাপে বায়ু (বায়ুতে মিশ্রিত নাইট্রোজেন) ও হাইড্রোজেন গ্যাসের উত্তপ্ত সংমিশ্রণকে প্রায় 500° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় উত্তপ্ত আয়রন, অ্যালুমিনিয়াম, সিলিকন প্রভৃতির অক্সাইডের সংমিশ্রণের উপর দিয়ে চালিত করা হয় ; এর ফলে ওই হাইড্রোজেন ও বায়ুর নাইট্রোজেনের সংযোগে অ্যামোনিয়া (NH_3) উৎপন্ন হয়। এভাবে উৎপন্ন অ্যামোনিয়া গ্যাস পরে জলে দ্রবীভূত করে 'অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড' আকারে পৃথক করে নিয়ে বিভিন্ন অ্যামোনিয়াম যৌগ উৎপাদনের কাজে লাগানো

হয়ে থাকে। বিজ্ঞানী হ্যাবার প্রবর্তিত এই পদ্ধতির হাইড্রোজেন পাওয়া যায় জল থেকে এবং নাইট্রোজেন বায়ু থেকে ; কাজেই এতে অ্যামোনিয়ার উৎপাদন-ব্যয় পড়ে অতি কম।

হ্যবিট্যাট (habitat) — জীবের স্বাভাবিক বাসস্থান ; কোন উদ্ভিদ, বা প্রাণী স্বভাবতঃ যেরূপ পরিবেশে বাস করতে অভ্যস্থ।

হ্যামাটাইট (haematite) — খনিজ ফেরিক ↑ অক্সাইড, Fe_2O_3 ; এই খনিজ থেকেই বেশির ভাগ ধাতব লৌহ নিষ্কাশিত হয়ে থাকে।

হ্যালাইড (halides)—হ্যালোজেন ↑ শ্রেণীর যে-কোন মৌলিক পদার্থের সঙ্গে ধাতব বেসের ↑ রাসায়নিক মিলনে যে-সব 'বাইনারি কম্পাউণ্ড' ↑ উৎপন্ন হয়ে থাকে ; অর্থাৎ যে-কোন হ্যালোজেন ↑ যুক্ত সল্টকেই হ্যালাইড বলা হয় ; যেমন—বিভিন্ন ধাতব পদার্থের ক্লোরাইড ↑ ব্রোমাইড ↑ আয়োডাইড ↑ প্রভৃতি সল্ট।

হ্যালুসিনেশন (halucination) — অপ্রাকৃত বোধ ; যা সত্য নয় সেই সকল জিনিস দেখা, বা শুনার বিভ্রান্ত ধারণা ; দিবাস্বপ্ন।

হ্যালিটোসিস (halitosis) — দুর্গন্ধ যুক্ত নিঃশ্বাস-বায়ু ত্যাগ; দেহাভ্যন্তরে জৈবিক বিক্রিয়ার বিকৃতির ফলে যার উৎপত্তি ঘটে, রোগ বিশেষ।

হ্যালো (halo) — সূর্য, অথবা যে কোনো জ্যোতিষ্কের চারদিকে যে চক্রাকার আলোক-প্রভা দেখা যায়। সময়-সময় কোন জ্যোতিষ্কের চারদিকে এরূপ একাধিক জ্যোতিঃ-চক্রও দৃষ্ট হয়ে থাকে। বায়ুমণ্ডলে ভাসমান জলীয় বাষ্প, বা তুষার কণিকার মধ্য দিয়ে জ্যোতিষ্কের বিকিরিত আলোক-রশ্মি প্রতিসরিত (রিফ্র্যাকসন্ ↑) হয়ে প্রতিসরণের সাধারণ নিয়মানুসারে তারা সমভাবে বেঁকে যায় ; আর সেই বিচ্ছুরিত আলোকের ওই-রূপ পরিমণ্ডল দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে।

হ্যালোজেন (halogen) — ফ্লোরিন, ক্লোরিন, ব্রোমিন ও আয়োডিন, এই চারটি সমগোত্রীয় মৌলিক পদার্থকে একসঙ্গে 'হ্যালোজেন' বলে। এগুলো বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ হলেও এদের রাসায়নিক গুণ ও ধর্মের একটা পর্যায়ক্রমিক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। এই হ্যালোজেন শ্রেণীর প্রত্যেকটি থেকে অনুরূপ ধর্মের বিভিন্ন হ্যালাইড ↑ সল্ট উৎপন্ন হয়ে থাকে।

হ্যালোজেনেটেড (halogenated) —যে-কোন একটা হ্যালোজেন ↑ মৌল সংযুক্ত পদার্থকে বলে 'হ্যালোজেনেটেড' পদার্থ ; যেমন, **হ্যালোজেনেটেড রাবার** ; যা রাবারের সঙ্গে ব্রোমিন, ক্লোরিন, বা আয়োডিনের রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন হ্যালোজেন-ঘটিত এরূপ রাবারের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যে-কোন হ্যালোজেনেটেড রাবারের উপরিভাগ বিশেষ কঠিন ও মসৃণ হয়ে থাকে। কোন ধাতব জিনিসের গায়ে রাবার এঁটে লাগাতে হলে সাধারণতঃ তাতে ব্রোমিন ↑ মিশিয়ে হ্যালোজেনেটেড করা হয়।

হ্যালোফাইট (halophyte) — যে উদ্ভিদ লবণাক্ত মাটিতে ভাল জন্মে।

কয়েকটি বৈজ্ঞানিক শব্দের সচরাচর ব্যবহৃত সংক্ষেপ ও তার পরিভাষা

A.C	অল্টার্নেটিং কারেণ্ট	পরিবর্তী-প্রবাহ
A°	অ্যাব্‌সোলিউট টেম্পারেচার	পরম উষ্ণতা
At. No.	অ্যাটমিক নাম্বার	পারমাণবিক সংখ্যা
A. W.	অ্যাটমিক ওয়েট	পারমাণবিক ওজন
b.p.	বয়েলিং পয়েণ্ট	স্ফুটনাংক
c.c.	(সি. সি.) কিউবিক সেণ্টিমিটার	ঘন সেণ্টিমিটার
C	সেণ্টিগ্রেড টেম্পারেচার	সেণ্টিগ্রেড উষ্ণতা
conc.	কন্সেণ্ট্রেটেড	গাঢ়, ঘন
c.g.s	সেণ্টিমিটার-গ্র্যাম-সেকেণ্ড	সেণ্টিমিটার/গ্র্যাম/সেকেণ্ড
cm	সেণ্টিমিটার	সেণ্টিমিটার
D.C	ডাইরেক্ট কারেণ্ট	একমুখী-প্রবাহ
EMF	ইলেক্ট্রোমোটিভ ফোর্স	তড়িচ্চালক বল
F	ফারেনহাইট টেম্পারেচার	ফারেনহাইট উষ্ণতা
ft	ফুট	ফুট
f.p.s	ফুট-পাউণ্ড-সেকেণ্ড	ফুট/পাউণ্ড/সেকেণ্ড
gm	গ্র্যাম	গ্র্যাম
°K	ডিগ্রি কেল্‌ভিন (স্কেল)	পরম উষ্ণতামান ডিগ্রি
lb.	পাউণ্ড	পাউণ্ড
lat.	ল্যাটিচিউড	অক্ষাংশ-রেখা
long.	লঙ্গিচিউড	দেশান্তর-রেখা, দ্রাঘিমা
m.m.	মিলিমিটার	মিলিমিটার
m.gm	মিলিগ্র্যাম	মিলিগ্র্যাম
mps	মাইলস পার সেকেণ্ড	মাইল প্রতি সেকেণ্ড
m. p.	মেল্টিং পয়েণ্ট	গলনাংক
S.G, sp. sg	স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি	আপেক্ষিক গুরুত্ব
Sq. m	স্কোয়ার মাইল	বর্গ মাইল
Sq. yd	স্কোয়ার ইয়ার্ড	বর্গ গজ
temp.	টেম্পারেচার	উষ্ণতা
wt	ওয়েট	ওজন

পরিশিষ্ট

মৌলিক পদার্থের তালিকা

[সাংকেতিক চিহ্ন, অ্যাটমিক নাম্বার ↑, অ্যাটমিক ওয়েট ↑]

নাম	সাংকেতিক চিহ্ন	অ্যাটমিক নাম্বার	অ্যাটমিক ওয়েট
অক্সিজেন	O	8	16·00
অস্‌মিয়াম	Os	76	190·20
অ্যাক্টিনিয়াম	Ae	89	227·00
অ্যান্টিমনি	Sb	51	121·76
অ্যামিরিসিয়াম	Am	95	241·00*
অ্যালুমিনিয়াম	Al	13	26·98
আর্সেনিক	As	33	74·91
আর্গন	A	18	39·94
অ্যাস্টেটাইন	At	85	210·00*
আর্বিয়াম	Er	68	167·20
আয়রন	Fe	26	55·85
আয়োডিন	I	53	126·91
ইউরোপিয়াম	Eu	63	152·00
ইটার্বিয়াম	Yb	70	173·04
ইট্রিয়াম	Y	39	88·92
ইউরেনিয়াম	U	92	238·07
ইণ্ডিয়াম	In	49	114·76
ইরিডিয়াম	Ir	77	193·10
উলফ্রাম (টাংস্টেন)	W	74	183·92
কপার	Cu	29	63·54
কার্বন	C	6	12·01
কোবল্ট	Co	27	58·94
ক্যাড্‌মিয়াম	Cd	48	112·41
ক্যালসিয়াম	Ca	20	40·08
ক্যালিফোর্নিয়াম	Cf	98	246·00*

নাম	সাংকেতিক চিহ্ন	অ্যাটমিক নাম্বার	অ্যাটমিক ওয়েট
কুরিয়াম	Cm	96	242·00*
ক্লোরিন	Cl	17	35·46
ক্রিপ্টন	Kr	36	83·80
ক্রোমিয়াম	Cr	24	52·01
গোল্ড	Au	79	197·20
গ্যালিয়াম	Ga	31	69·72
গ্যাডোলিয়াম	Gd	64	156·90
জার্মেনিয়াম	Ge	32	72·60
জিঙ্ক	Zn	30	65·38
জির্কোনিয়াম	Zr	40	91·22
জেনন	Xe	54	131·30
টার্বিয়াম	Tb	65	159·20
টিন	Sn	50	118·70
টিটানিয়াম	Ti	22	47·90
টেক্‌নেসিয়াম	Tc	43	99·00*
টেলুরিয়াম	Te	52	127·61
ট্যাণ্টেলাম	Ta	73	180·88
ডিস্প্রোসিয়াম	Dy	66	162·46
থলিয়াম	Tl	81	204·39
থুলিয়াম	Tm	69	169·40
থোরিয়াম	Th	90	232·12
নাইট্রোজেন	N	7	14·01
নাইয়োবিয়াম	Nb	41	92·91
নিকেল	Ni	28	58·69
নিয়ন	Ne	10	20·18
নিয়োডিমিয়াম	Nd	60	144·27
নেপ্‌চুনিয়াম	Np	93	237·00*
পটাসিয়াম	K	19	39·10
পোলোনিয়াম	Po	84	210·00

নাম	সাংকেতিক চিহ্ন	অ্যাটমিক নাম্বার	অ্যাটমিক ওয়েট
প্যালাডিয়াম	Pd	46	106·70
প্ল্যাটিনাম	Pt	78	195·23
প্লুটোনিয়াম	Pu	94	239·00*
প্রাসিওডিমিয়াম	Pr	59	140·92
প্রোটোঅ্যাক্টিনিয়াম	Pa	91	231·00
প্রোমেথিয়াম	Pm	61	145·00
ফস্‌ফরাস	P	15	30·98
ফ্রান্সিয়াম	Fr	87	223·00*
ফ্লোরিন	F	9	19·00
বার্কেলিয়াম	Bk	97	245·00*
বোরন	B	5	10·82
বিস্‌মাথ	Bi	83	209·00
বেরিলিয়াম	Be	4	9·01
ব্যারিয়াম	Ba	56	137·36
ব্রোমিন	Br	35	79·92
ভ্যানাডিয়াম	V	23	50·95
মার্কারি	Hg	80	200·61
মোলিব্‌ডেনাম	Mo	42	95·95
ম্যাঙ্গানিজ	Mn	25	54·93
ম্যাগ্নেসিয়াম	Mg	12	24·32
রেডিয়াম	Ra	88	226·05
রেনিয়াম	Re	75	186·31
রুথেনিয়াম	Ru	44	101·70
রুবিডিয়াম	Rb	37	85·48
রোডিয়াম	Rh	45	102·91
র‍্যাডন	Rn	86	222·00
লিথিয়াম	Li	3	6·94
লুটেসিয়াম	Lu	71	174·99
লেড	Pb	82	207·21

নাম	সাংকেতিক চিহ্ন	অ্যাটমিক নাম্বার	অ্যাটমিক ওয়েট
ল্যান্থেনাম	La	57	138·92
সাল্‌ফার	S	16	32·07
সিল্‌ভার	Ag	47	107·88
সিলিকন	Si	14	28·06
সেলেনিয়াম	Se	34	78·96
সোডিয়াম	Na	11	22·99
স্যামারিয়াম	Sm	62	150·43
স্ক্যাণ্ডিয়াম	Sc	21	45·10
স্ট্রন্সিয়াম	Sr	38	87·63
হাইড্রোজেন	H	1	1·008
হিলিয়াম	He	2	4·003
হোল্‌মিয়াম	Ho	67	164·94
হাফ্‌নিয়াম	Hf	72	178·60

উপরোক্ত তালিকায় * চিহ্নিত মৌলিক পদার্থগুলোর অ্যাটমিক ওয়েট সূচক সংখ্যায় মৌলগুলোর সবচেয়ে স্থায়ী আইসোটোপের ↑ মাস্‌-নাম্বার, বা আইসোটোপিক ওয়েট ↑ প্রকাশিত হয়েছে।

রেডিও-অ্যাক্‌টিভ এলিমেণ্ট

[নাম ও অ্যাটমিক নাম্বার]

সামান্য রেডিও-অ্যাক্‌টিভ ↑ এলিমেণ্ট, বা তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ হলো : পটাসিয়াম 19, রুবিডিয়াম 37, সিজিয়াম 55, বিস্‌মাথ 83 ; আর বিশেষভাবে রেডিও-অ্যাক্‌টিভ মৌল হলো : টেক্‌নেসিয়াম 43, পোলোনিয়াম 84, অ্যাস্টেটাইন 85, র‍্যাডন 86, ফ্রান্সিয়াম 87, রেডিয়াম 88, অ্যাক্‌টিনিয়াম 89, থোরিয়াম 90, প্রোটোঅ্যাক্‌টিনিয়াম 91, ইউরেনিয়াম 92, * নেপ্‌চুনিয়াম 93, প্লুটোনিয়াম 94, অ্যামিরিসিয়াম 95, কুরিয়াম 96, বার্কেলিয়াম 97, ক্যালিফোর্ণিয়াম 98.

* উপরোক্ত তালিকায় ইউরেনিয়ামের পরবর্তী এলিমেন্ট ছয়টিকে বলে ট্রান্সইউরেনিক ↑ এলিমেণ্ট।

রেয়ার-আর্থ এলিমেণ্ট

[নাম ও অ্যাটমিক নাম্বার]

স্ক্যাণ্ডিয়াম 21, ইট্রিয়াম 39, ল্যান্থেনাম 57, সিরিয়াম 58, প্রাসিওডিমিয়াম 59, নিওডিমিয়াম 60, প্রোমেথিয়াম 61, স্যামারিয়াম 62, ইউরোপিয়াম 63, গ্যাডোলিনিয়াম 64, টার্বিয়াম 65, ডিস্প্রোসিয়াম 66, হোল্‌মিয়াম 67, আর্বিয়াম 68, থুলিয়াম 69, ইটার্বিয়াম 70, লুটেসিয়াম 71.

বিশেষ কয়েকটি মৌলের ভ্যালেন্সি ও আইসোটোপ

ভ্যালেন্সি (valency) ↑	
মৌল	যোজ্যতা
আর্গন, হিলিয়াম, নিয়ন, ক্রিপ্টন ও জেনন (রেয়ার গ্যাস ↑)	0
অক্সিজেন (oxygen), O	2 বা 4
হাইড্রোজেন (hydrogen), H	1
কার্বন (carbon), C	4
ক্লোরিন (chlorine), Cl	1, 3, 5, বা 7
আয়রন (iron), Fe	2 বা 3
আয়োডিন (iodine), I	1, 3, 5, বা 7
ক্যালসিয়াম (calcium), Ca	2
কপার (copper), Cu	1 বা 2
সোডিয়াম (sodium), Na	1
নাইট্রোজেন (nitrogen), N	3 বা 5
গোল্ড (gold), Au	1 বা 3
সালফার (sulphur), S	2, 4 বা 6
মার্কারি (mercury) Hg	1 বা 2
জিঙ্ক (zinc), Zn	2

আইসোটোপ (isotope) ↑	
মৌল	আইসোটোপসমূহ
অক্সিজেন (O)	... ... $_8O^{16}$, $_8O^{17}$, $_8O^{18}$
হাইড্রোজেন(H)	স্বাভাবিক ... $_1H^1$
,,	ডয়েটেরিয়াম ↑ ... $_1H^2$
,,	ট্রাইটিয়াম ↑ ... $_1H^3$
কার্বন (C)	... ... $_6C^{12}$, $_6C^{13}$, $_6C^{14}$;
ক্লোরিন (Cl)	... ... $_{17}Cl^{35}$, $_{17}Cl^{37}$;
আয়রন (Fe)	...$_{26}Fe^{54}$, $_{26}Fe^{56}$, $_{26}Fe^{57}$;
আয়োডিন (I)	...$_{53}I^{127}$, $_{53}I^{129}$
কপার (Cu)	...$_{29}Cu^{63}$, $_{29}Cu^{65}$;
সোডিয়াম (Na)	...$_{11}Na^{23}$;
নাইট্রোজেন(N)	...$_7N^{14}$, $_7N^{15}$
সালফার (S)	...$_{16}S^{32}$, $_{16}S^{33}$, $_{16}S^{34}$, $_{16}S^{36}$;

মৌলিক পদার্থের পর্যায়-সরণী

(পারমাণবিক সংখ্যার ক্রম অনুসারে)

↓ পর্য্যায়	শ্রেণী → 0	1 a	1 b	2 a	2 b	3 a	3 b
প্রথম, হ্রস্ব	1 হাইড্রোজেন 2 হিলিয়াম	3 লিথিয়াম	...	...	4 বেরিলিয়াম	...	5 বোরন
দ্বিতীয়, হ্রস্ব	... 10 নিয়ন	11 সোডিয়াম	...	...	12 ম্যাগ্নেসিয়াম	...	13 অ্যালুমিনিয়াম
প্রথম, দীর্ঘ (ক)	... 18 আর্গন	19 পটাসিয়াম		20 ক্যালসিয়াম		21 স্ক্যাণ্ডিয়াম	...
(খ)		...	29 কপার	...	30 জিঙ্ক	...	31 গলিয়াম
দ্বিতীয়, দীর্ঘ (ক)	... 36 ক্রিপ্টন	37 রুবিডিয়াম	...	38 ষ্ট্রন্সিয়াম	...	39 ইট্রিয়াম	...
(খ)		...	47 সিল্ভার	...	48 ক্যাড্মিয়াম	...	49 ইণ্ডিয়াম
তৃতীয়, দীর্ঘ (ক)	... 54 জেনন	55 সিজিয়াম	...	56 বেরিয়াম	...	57-71 রেয়ার আর্থ*	...
(খ)		...	79 গোল্ড	...	80 মার্কারি	...	81 থলিয়াম
চতুর্থ, দীর্ঘ	... 86 র‍্যাডন	87 ফ্রান্সিয়াম	....	88 রেডিয়াম	...	89 অ্যাক্টিনিয়াম	...

*21 স্ক্যাণ্ডিয়াম ও 39 ইট্রিয়াম ছাড়া 'রেয়ার আর্থ' ধাতু হলো 57 ল্যান্থানাম, 58 সিরিয়াম, 59 প্রাসিওডিয়াম, 60 নিওডিমিয়াম, 61 প্রোমেথিয়াম, 62 স্যামারিয়াম, 63 ইউরোপিয়াম, 64 গ্যাডোলিনিয়াম, 65 টার্বিয়াম, 66 ডিস্‌প্রোসিয়াম, 67 হোল্‌মিয়াম, 68 আর্বিয়াম, 69 থুলিয়াম, 70 ইটার্বিয়াম, 71 লুটেসিয়াম। আবার 93 নেপ্‌চুনিয়াম প্রভৃতি ট্রান্সইউরেনিক মৌলগুলিও 'রেয়ার আর্থ' শ্রেণীর বলা যায়; এগুলি আবার বিশেষ রেডিও-অ্যাক্টিভও বটে।

মৌলিক পদার্থের পর্যায়-সরণী

(পারমাণবিক সংখ্যার ক্রম অনুসারে)

4 a	4 b	5 a	5 b	6 a	6 b	7 a	7 b	8
...	6 কার্বন	...	7 নাইট্রোজেন	...	8 অক্সিজেন	...	9 ফ্লোরিন	...
...	14 সিলিকন	...	15 ফস্‌ফরাস	...	16 সালফার	...	17 ক্লোরিন	...
22 টিটানিয়াম	...	23 ভ্যানাডিয়াম	...	24 ক্রোমিয়াম	...	25 ম্যাগ্নেসিয়াম	...	26 আয়রন, 27 কোবাল্ট, 28 নিকেল
...	32 জার্মেনিয়াম	...	33 আর্সেনিক	...	34 সেলেনিয়াম	...	35 ব্রোমিন	...
40 জির্কোনিয়াম	...	41 নাইয়োবিয়াম	...	42 মলিব্‌ডিনাম	...	43 টেক্‌নেসিয়াম	...	44 রুথে-নিয়াম, 45 রেডি-য়াম, 46 প্যালা-ডিয়াম
...	50 টিন	...	51 অ্যান্টিমনি	...	52 টেলুরিয়াম	...	53 আয়োডিন	...
72 হাফ্‌নিয়াম	...	73 ট্যান্টালাম	...	74 টাংস্টেন	...	75 রেনিয়াম	...	76 অস্‌মি-য়াম, 77 ইরি-ডিয়াম, 78 প্লাটি-নাম
...	82 লেড	...	83 বিস্‌মাথ	...	84 পোলোনিয়াম	...	85 অ্যাস্টেটাইন	...
90 থোরিয়াম	...	91 প্রোটো অ্যাক্টিনিয়াম	...	92 ইউরেনিয়াম ...	93 ...নেপ্‌চুনিয়াম	94 প্লুটো-নিয়াম	95 অ্যামেরি-সিয়াম	96 কুরি-য়াম, 97 বার্কেলি-য়াম, 98 ক্যালি-ফোর্নিয়াম

মৃদু রেডিও-অ্যাক্টিভ মৌল হলো 19 পটাসিয়াম, 37 রুবিডিয়াম, 55 সিজিয়াম, 83 বিস্‌মাথ; আর, তীব্র রেডিও-অ্যাক্টিভ হলো 84 প্লুটোনিয়াম, 86 র‍্যাডন, 87 ফ্রান্সিয়াম, 88 রেডিয়াম, 89 অ্যাক্টিনিয়াম, 90 থোরিয়াম, 91 প্রোটোঅ্যাক্টিনিয়াম, 92 ইউরেনিয়াম। 93 নেপ্‌চুনিয়াম প্রভৃতি ট্রান্সইউরেনিক মৌলগুলিকে 'রেয়ার আর্থ' শ্রেণীর বলা যেতে পারে। এগুলিও বিশেষ রেডিও-অ্যাক্টিভ, বা তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ।

বিভিন্ন শক্তি-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ও গতি

আলোক-তরঙ্গ ঃ

দৃশ্য আলোকের (লাইট ↑) তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সীমা মোটামুটি হিসেবে (বেগুনি বর্ণের) 4×10^{-8} সেন্টিমিটার থেকে (লাল বর্ণের) 8×10^{-8} সেন্টিমিটার ধরা যেতে পারে। সাদা আলোকের সংগঠক প্রধান সাতটা বর্ণের (স্পেক্‌ট্রাম ↑, স্পেক্‌ট্রাম কালার ↑) বিভিন্ন রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের পরস্পর পার্থক্য সুনির্দিষ্টরূপে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। মোটামুটিভাবে বিভিন্ন বর্ণের আলোক-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য-সীমা নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

আলোক-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য 'অ্যাংস্ট্রম' এককে (Angstrom unit, সংক্ষেপে A. U.) ↑ পরিমিত হয় ; 1 A.U. $= 10^{-8}$, অর্থাৎ ·00000001 সেন্টিমিটার।

লালবর্ণের রশ্মির	7800 A. U.	থেকে	6400 A. U.
কমলা ,, ,,	6400 A. U.	,,	5900 A. U.
হল্‌দে ,, ,,	5900 A. U.	,,	5500 A. U.
সবুজ ,, ,,	5500 A. U.	,,	4900 A. U.
নীল ,, ,,	4900 A. U.	,,	4600 A. U.
গাঢ়নীল ,,	4600 A. U.	,,	4300 A. U.
বেগুনি ,,	4300 A. U.	,,	3800 A. U.

[7800 A. U. $= 7800 \times 10^{-8}$ সেন্টিমিটার
$= 7800 \times$ ·00000001 সেন্টিমিটার
$=$ ·000078 সেন্টিমিটার]

আলোক-তরঙ্গের গতি প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় $2{\cdot}9978 \times 10^{10}$ সেন্টিমিটার $= 186{,}326$ মাইল। বিভিন্ন দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তড়িৎ-চুম্বকীয় (ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগ্নেটিক ↑) তরঙ্গ-প্রবাহের ফলে বিভিন্ন বর্ণের আলোক ও বেতার, এক্স-রশ্মি প্রভৃতি বিভিন্ন অদৃশ্য শক্তির প্রকাশ ঘটিয়া থাকে। এগুলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য পৃথক ; কিন্তু গতি সকলেরই মোটামুটি সমান।

এক্স-রশ্মি ঃ

এক্স-রশ্মির তরঙ্গ আলোক-তরঙ্গ অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্রতর। এর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যও সুনির্দিষ্ট নয় ; একটা নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যসীমার মধ্যবর্তী বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সকল তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গই এক্স-রশ্মি নামে অভিহিত। মোটামুটি হিসেবে এই সীমা হলো 10^{-6} সেন্টিমিটার থেকে 10^{-9} সেন্টিমিটার ; এর মধ্যবর্তী সকল দৈর্ঘ্যের তরঙ্গগুলোই এক্স-রশ্মি।

গামা-রশ্মি ঃ

গামা-রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এক্স-রশ্মি অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর ; প্রায় 10^{-8} সেন্টি-মিটার থেকে 10^{-10} সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গগুলো গামা-রশ্মি।

রেডিও-তরঙ্গ ঃ

রেডিও, বা বেতার-তরঙ্গ সুবৃহৎ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ প্রবাহের ফলে সৃষ্টি হয়। বেতার-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য প্রায় এক সেন্টিমিটার থেকে 20,000 মিটার পর্যন্ত হতে পারে। সাধারণতঃ সামান্য দৈর্ঘ্যের ক্ষুদ্র বেতার-তরঙ্গগুলো র‍্যাডার ↑ যন্ত্রে ব্যবহৃত হয়। রেডিও স্টেশন থেকে সাধারণতঃ 10 মিটার থেকে 10,000 মিটার পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের বিভিন্ন রেডিও-তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। এর মধ্যে 10 থেকে 100 মিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তরঙ্গগুলোকে বলে **সর্ট ওয়েভ** ; 100 থেকে 1000 মিটারের গুলোকে বলে **মিডিয়াম ওয়েভ** ; আর 1000 থেকে 10,000 মিটার দৈর্ঘ্যের তরঙ্গগুলোকে বলে **লঙ ওয়েভ।**

শব্দ-তরঙ্গ ঃ

বিভিন্ন ইলেক্ট্রোম্যাগ্নেটিক ↑, অর্থাৎ তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ (যেমন আলোক, বেতার, গামারশ্মি প্রভৃতি) সম্পূর্ণ শূন্যস্থানে, অর্থাৎ কোন বস্তু-মাধ্যম ব্যতীতই (কাল্পনিক 'ইথার' ↑ মাধ্যমে) প্রবাহিত হতে পারে। শব্দ-তরঙ্গ কিন্তু কোনরূপ বস্তুর মাধ্যম ব্যতিরেকে পরিচালিত হতে পারে না ; কোন বস্তুর দ্রুত কম্পনের ফলে (সাউণ্ড ↑) সংলগ্ন মাধ্যম পদার্থে লঙ্গিচিউডিন্যাল ↑ আকারের তরঙ্গ প্রবাহিত হয়ে শব্দের উৎপত্তি হয়ে থাকে। এর কম্পন-সংখ্যা (ফ্রিকোয়েন্সি ↑) সেকেণ্ডে 30 থেকে

3000 পর্যন্ত হলে উৎপন্ন শব্দ মানুষের শ্রুতিগোচর হয় (অডিবিলিটি লিমিট ↑)। শব্দের গতি মাধ্যম-পদার্থের বিভিন্নতা ও তাপ-বৈষম্যের ফলে বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে। সাধারণ বায়ুমণ্ডলীয় তাপ ও চাপে (এন. টি. পি ↑) বায়ুর মাধ্যমে শব্দতরঙ্গ প্রতি সেকেণ্ডে 1120 ফুট, বা 331·7 মিটার গতিতে প্রবাহিত হয়; =প্রতি ঘণ্টায় প্রায় 760 মাইল।

বিভিন্ন মাধ্যমে শব্দ-তরঙ্গের গতি

(প্রতি সেকেণ্ডে, মিটার এককে)

গ্যাসীয় মাধ্যমে (এন. টি. পি)		কঠিন ও তরল মাধ্যমে (20° সেন্টিগ্রেড)	
বায়ু	331·7	জল	1457
কার্বন ডাইঅক্সাইড	259	অ্যালকোহল	1210
হাইড্রোজেন	1262	অ্যালুমিনিয়াম	5100
অক্সিজেন	316	আয়রন	5000
কোল গ্যাস	490	প্ল্যাটিনাম	2700

বায়ুর মাধ্যমে শব্দের প্রাবল্য-মান

(Loudness Scale in Air)

মানুষের কর্ণপটাহে 1,000 কম্পাংকের (ফ্রিকোয়েন্সি ↑) শব্দ যদি ·0002 ডাইন ↑ শক্তির বায়ুচাপ প্রয়োগ করে তাহলে সেই শব্দের তীব্রতা বা প্রাবল্যকে বলা হয় এক 'ফন' (phon); শব্দের প্রাবল্য, বা তীব্রতার একক। এই হিসেবে শব্দের প্রাবল্য ও তার বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার মান:

শব্দের প্রাবল্য: 'ফন' সংখ্যা	ফলাফল
130 উর্ধ্বে	অশ্রুত শব্দ; মারাত্মক প্রতিক্রিয়া,
130	শ্রুতির উর্ধ্বসীমা, অতি প্রচণ্ড শব্দ
120	প্রবল কামানধ্বনি
70	দ্রুতগামী ট্রেনের শব্দ
50	সাধারণ কথাবার্তা
10	মৃদু পত্র-মর্মর

গলনাংক, স্ফুটনাংক ও স্পেসিফিক হিট্

(কয়েকটি সাধারণ মৌলিক পদার্থের)

পদার্থের নাম	সাধারণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে (1 নর্ম্যাল আট্‌মস্ফিয়ার = 1·01325 বার)		স্পেসিফিক হিট ↑ (গ্র্যাম/সেন্টিমিটার/ক্যালোরি)	
	গলনাংক (ডিগ্রিসেন্টিগ্রেড)	স্ফুটনাংক (ডিগ্রিসেন্টিগ্রেড)	উষ্ণতার-স্তর (ডিগ্রিসেন্টিগ্রেড)	স্পেসিফিক হিট
অ্যালুনিনিয়াম	657	1800	17·1	·217
আয়রন	1530	2450	18·1	·113
আয়োডিন	113	184·4	9·98	·054
কার্বন	3500	4200	11·0	·160
কপার	1083	2310	15·1	·093
ক্যালসিয়াম	810	1170	0·2	·149
গোল্ড	1063	2530	17·1	·031
জিঙ্ক	418	918	20·0	·0924
টিন	232	2270	20·0	·054
টাংস্টেন	3360	3700	20·1	·034
মার্কারি	−38·8	356·7	20·0	·0333
ম্যাগ্নেসিয়াম	651	1120	17·1	·247
লেড	327	1620	20·1	·0305
সিলভার	960	1955	15·1	·056
সোডিয়াম	97·5	877	0	·283
অক্সিজেন	−219	−182·9	−200	·35
আর্গন	−188	−186	...	...
নাইট্রোজেন	−210·5	−195·7	−208	·028
নিয়ন	−248·67	−245·9	...	...
হাইড্রোজেন	−259	−252·7	−253	6·0
প্ল্যাটিনাম	1773	3910	15·1	0·0322
পটাসিয়াম	62·5	760	0·56	0·19

কয়েকটি মৌলিক পদার্থের ডেন্সিটি

(কঠিন ও তরল পদার্থ)

নিম্নলিখিত মৌলিক পদার্থগুলোর ডেন্সিটি ↑ মোটামুটি হিসেবে সাধারণ উষ্ণতায় (17° থেকে 23° সেন্টিগ্রেড) প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে ও গ্রাম এককে প্রদত্ত হয়েছে ; কোন-কোন ক্ষেত্রে অবশ্য বিশেষ উষ্ণতা উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন কারণে পদার্থের ডেন্সিটির কিছু-কিছু তারতম্য ঘটে থাকে।

পদার্থ	ডেন্সিটি গ্র্যাম/সি. সি.	পদার্থ	ডেন্সিটি গ্র্যাম/সি. সি.
অ্যালুমিনিয়াম	2·70	টিন	7·29
অ্যান্টিমনি	6·62	টাংস্টেন	19·30
আর্সেনিক	5·73	ম্যাগ্নেসিয়াম	1·74
আয়োডিন	4·95	ম্যাঙ্গানিজ	7·39
আয়রন (বিশুদ্ধ)	7·86	মার্কারি	13·56 / 15°
কপার	8·93	নিকেল	8·90
ক্যালসিয়াম	1·55 / 29°	নাইট্রোজেন (তরল)	0·79/ – 196°
ক্রোমিয়াম	7·10		
ক্লোরিন (তরল)	2·49 / 0°	লেড	11·37
গোল্ড	19·32	সিলভার	10·50
জিঙ্ক	7·10	সিলিকন	2·30
পটাসিয়াম	0·16	সোডিয়াম	0·97
প্ল্যাটিনাম	21·50	হাইড্রোজেন (তরল)	·07 (স্ফুটনাঙ্কে)
অক্সিজেন (তরল)	1·27/ – 235°		

কয়েকটি সাধারণ যৌগিক পদার্থের ডেন্সিটি

গ্লিসারিন	1·26	আয়রন, কাস্ট	7·1—7·7
গ্ল্যাস (সাধারণ)	2·4—2·6	„ , রট	7·8—7·9
টার্পেণ্টাইন	0·87	স্টিল	7·7—7·9
জল (0°)	0·99987	পেট্রল	0·68—·72
„ (4°)	1·00000	বরফ (0°)	0·9168
„ (20°)	0·99823	...	...

কয়েকটি গ্যাসীয় পদার্থের ডেন্সিটি

প্রতি লিটারে (1000·028 সি. সি.) গ্র্যাম এককে ডেন্সিটি দেওয়া হলো ; উষ্ণতা 0° সেন্টিগ্রেড, চাপ 760 মিলিমিটার, অর্থাৎ এন. টি. পি. অবস্থায়।

গ্যাস	ডেন্সিটি (গ্র্যাম/লিটার)	গ্যাস	ডেন্সিটি (গ্র্যাম/লিটার)
বায়ু	1·2928	নাইট্রোজেন, N_2	1·2507
অ্যামোনিয়া, NH_3	0·7708	মিথেন, CH_4	0·7167
অক্সিজেন, O_2	1·4290	হাইড্রোজেন, H_2	0·0899
আর্গন, A	1·7809	হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, HCl	1·6390
কার্বন ডাই-অক্সাইড, CO_2	1·9968	হাইড্রোজেন সালফাইড, H_2S	1·5390
ক্লোরিন, Cl_2	3·2200	হিলিয়াম, He	0·1785
ক্রিপ্‌টন, Kr	3·6800	ব্রোমিন, Br_2	7·1390
জেনন, Xe	5·8500	ফ্লোরিন, F_2	1·6900
নিয়ন, Ne	0·9000		

বিভিন্ন উষ্ণতায় জল ও পারদের ডেন্সিটির তুলনা

উষ্ণতা (ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড)	জল (গ্র্যাম / সি. সি.)	পারদ (গ্র্যাম / সি. সি.)
0	0·99987	13·5951
4	1·00000	—
10	0·99970	13·5704
50	0·98804	13·4725
100	0·95835	13·3518

ফ্রিজিং মিক্‌শ্চার

নির্দিষ্ট অনুপাতে কোন-কোন পদার্থের সংমিশ্রণের ফলে উষ্ণতা সবিশেষ হ্রাস পায়। এরূপ মিশ্রণকে বলে 'ফ্রিজিং মিক্‌শ্চার'; বাংলায় বলা যায় হিম-মিশ্রণ। এরূপ কয়েকটা মিশ্রণের তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো; এর প্রথম ও দ্বিতীয় স্তম্ভে মিশ্রণীয় পদার্থের নাম ও অনুপাত, তৃতীয় স্তম্ভে পদার্থ-গুলোর প্রাথমিক উষ্ণতা এবং চতুর্থ স্তম্ভে মিশ্রণের পরে উদ্ভূত নিম্নতাপ-সূচক উষ্ণতা 'ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড' স্কেলে দেখান হয়েছে ঃ

পদার্থ ও অনুপাত	পদার্থ ও অনুপাত	প্রাথমিক উষ্ণতা	মিশ্রণের পরবর্তী উষ্ণতা
অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড NH_4Cl, 30	জল, H_2O, 100	13·3	−5·1
পটাসিয়াম আয়োডাইড KI, 140	জল, H_2O 100	10·3	−11·7
অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড NH_4Cl, 25	চূর্ণিত বরফ 100	−1	−15·4
খাদ্য লবণ, NaCl, 33	" 100	−1	−21·3
জলীয় সালফিউরিক অ্যাসিড, $H_2SO_4 + H_2O$ (66·1 % H_2SO_4) 1	" 4·32	−1	−25·0
ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ও জল, $CaCl_2 + 6H_2O$, 1	" ·61	0	−39·0
" " 1	" ·70	0	−54·0
" " 1	" ·81	0	−40·0
অ্যালকোহল, CH_3CH_2OH,	কার্বনডাইঅক্সাইড, CO_2 (কঠিন)	...	−72·0
ক্লোরোফর্ম, $CHCl_3$,	" "	...	−77·0
ইথার, $(C_2H_5)_2O$,	" "	...	−77·0
সালফার ডাইঅক্সাইড, SO_2 (তরল)	" "	...	−82·0

সৌর পরিবার সম্পর্কীয় বিভিন্ন জ্ঞাতব্য তথ্যাদি

1 Km (কিলোমিটার) = 1093·611 গজ (ইয়ার্ড ↑)
1 Kgm (কিলোগ্র্যাম) = 2·204622 পাউণ্ড

গ্রহের নাম	সূর্য থেকে গড় দূরত্ব (10^6 Km)	নিরক্ষীয় ব্যাস (Km)	সূর্য পরিক্রমণ কাল (বছর) (দিনের হিসাবে)	মাস্ (ওজন) (10^{24} Kgm)	নিজ কক্ষে আবর্তন কাল (দিন)	উপগ্রহ সংখ্যা
মার্কারি	57·85	5000	87·97	0·312	—	0
ভেনাস	108·11	12400	224·70	4·9	30 ঘণ্টা	0
আর্থ	149·46	12756·6	365·26	6·0	23ঘ. 56মি.	1
মার্স	227·7	6783	686·98 (1 বছর 322দিন	0·65	24ঘ. 37মি. 23 সে.	2
জুপিটার	777·6	142600	11 বছর 314 দিন	1901·4	9ঘ. 50মি.	9
স্যাটার্ন	1426·0	119000	29 বছর 167 দিন	568·8	10ঘ. 14মি.	10এবং 3 বলয়
ইউরেনাস	2868·3	51500	84ব. 5দিন	87·7	10ঘ. 45মি.	4
নেপচুন	4494·3	49900	164বছর 288 দিন	103	15ঘ. 48মি.	1
সূর্য	—	$1{\cdot}392 \times 10^6$	—	$1{\cdot}984 \times 10^{30}$	25 দিন 9·1 ঘ.	—
চন্দ্র	—	3478	—	7.36×10^{22}	27দি. 7ঘ. 43মি.11সে. (চান্দ্র মাস)	—

বায়ুমণ্ডলের উপাদান

সমুদ্রতলের উচ্চতায় (45° ল্যাটিচিউড) অবস্থিত বায়ুমণ্ডলীয় স্তরে ওজনের শতকরা হিসেবে বায়ুতে সংমিশ্রিত বিভিন্ন গ্যাসীয় উপাদান :

	% ওজন হিসাবে		% ওজন হিসাবে
নাইট্রোজেন—	75·5	নিয়ন—	$8{\cdot}4 \times 10^{-4}$
অক্সিজেন—	23·2	জেনন—	3×10^{-6}
আর্গন—	0·92	হিলিয়াম—	7×10^{-5}
কার্বন ডাইঅক্সাইড—	0·3	হাইড্রোজেন—	7×10^{-6}
ক্রিপ্‌টন—	14×10^{-6}		

বিভিন্ন আকারবিশিষ্ট পদার্থের আয়তন ঃ

গোলাকার— $4\pi r^2/3$

চতুষ্কোণাকার—l.b.h

নলাকার— $\pi r^2 h$

সমবাহু চতুষ্কোণাকার—l^3 (কিউব)

ঘন (সলিড) কোণাকার— $\frac{1}{3}\pi r^2 h$

উল্লিখিত সূত্রগুলিতে পদার্থটির দৈর্ঘ্য l, প্রস্থ b, উচ্চতা h, ব্যাসার্ধ r এবং ধ্রুবক রাশি (পাই) ↑ $\pi = 3{\cdot}1416$ ধরা হয়েছে।

বিভিন্ন এককে আয়তনের বর্গ পরিমাণ

144 বর্গ ইঞ্চি	=	1 বর্গ ফুট	=	9·2903 বর্গ ডেসিমিটার
9 ,, ফুট	=	1 ,, গজ	=	0·8361 ,, মিটার
$30\frac{1}{4}$,, গজ	=	1 ,, পোল	=	25·293 ,, মিটার
40 ,, পোল	=	1 রুড	=	10·117 একর
4 রুড	=	1 একর	=	0·40468 হেক্টাএকর
640 একর	=	1 বর্গ মাইল	=	259·00 হেক্টাএকর

কয়েকটি ধ্রুবক রাশির মান

π (পাই) = 3·1415927

π^2 = 9·8696044

$1/\pi$ = 0·3183099

1 রেডিয়ান = 57·29578 ডিগ্রি

1° (ডিগ্রি) = 0·01745329 রেডিয়ান ↑

μ (মিউ) মাইক্রন = 10^{-3} মিলিমিটার

A. U (অ্যাঙ্গস্ট্রম ইউনিট) = 10^{-8} সেন্টিমিটার

বিভিন্ন একক পরিবর্তনের সহজ কৌশল ঃ

1. ইঞ্চিকে সেন্টিমিটার করতে 5 দিয়ে গুণ করে 2 দিয়ে ভাগ ;
2. সেন্টিমিটারকে ইঞ্চি ,, 2 ,, ,, ,, 5 ,, ,, ;
3. পাউণ্ডকে কিলোগ্র্যাম ,, 11 ,, ,, ,, 5 ,, ,, ;
4. কিলোগ্র্যামকে পাউণ্ড ,, 5 ,, ,, ,, 11 ,, ,, ;
5. লিটারকে গ্যালন ↑ ,, 50 ,, ,, ,, 11 ,, ,, ;
6. গ্যালনকে লিটার ↑ ,, 11 ,, ,, ,, 50 ,, ,, ;
7. সেন্টিগ্রেড ↑ ডিগ্রিকে ফারেন্‌হাইট ডিগ্রি করতে
   9 দিয়ে গুণ করে 5 দিয়ে ভাগ করে 32 যোগ ;
8. ফারেন্‌হাইট ↑ ডিগ্রিকে সেন্টিগ্রেড ডিগ্রি করতে
   বিয়োগ 32, তারপরে 5 দিয়ে গুণ করে 9 দিয়ে ভাগ।

বিভিন্ন রাশির একক পরিবর্তন

দৈর্ঘ্য (Length) ঃ

1 ইঞ্চি = 2·54 সেন্টিমিটার
1 গজ = 0·914399 মিটার
1 মাইল = 1·6093 কিলোমিটার

1 মিটার = 10 ডেসিমিটার (dm.)
= 100 সেন্টিমিটার (cm.)
= 1000 মিলিমিটার (mm.)
= 39·37 ইঞ্চি = 1·094 গজ

10 মিটার (m) = 1 ডেকামিটার (Dm.)
100 ,, ,, = 1 হেক্টোমিটার (Hm.)
1000 ,, ,, = 1 কিলোমিটার (Km.)
= 0·6214 মাইল

ওজন (Weight) ঃ

4° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় 1 ঘন সেন্টিমিটার (c.c.) বিশুদ্ধ জলের ওজন ধরা হয়েছে 1 গ্র্যাম ঃ

1 গ্র্যাম = 0·035 আউন্স
1000 গ্র্যাম = 1 কিলোগ্র্যাম
= 2·205 পাউণ্ড

1 গ্রেন = 0·064799 গ্র্যাম (gm)
1 আউন্স = 28·35 গ্র্যাম
1 পাউণ্ড = 0·453592 কিলোগ্র্যাম
1 টন = 1016 কিলোগ্র্যাম (Kgm)

আয়তন (Area) ঃ

4° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় 760 মিলিমিটার বায়ুমণ্ডলীয় চাপে 1 কিলোগ্র্যাম বিশুদ্ধ জলের আয়তন 1 লিটার ঃ

1 লিটার = 1000·027 ঘন সেন্টিমিটার (c. c.)
= 1·000027 ঘন ডেসিমিটার (Cu. dm.)
= 33·81 আউন্স (ফ্লুইড) = 1·816 পাইণ্ট

1 গ্যালন ↑ = 4·545963 লিটার ↑
1 ঘন ইঞ্চি = 16·387 ঘন সেন্টিমিটার (c.c.)
1 ঘন মিলিমিটার = 0·999972 ঘন সেন্টিমিটার

উষ্ণতা (Temperature) ঃ

উষ্ণতা পরিমাপের সেন্টিগ্রেড ↑ ও ফারেন্‌হাইট ↑ স্কেলে জলের হিমাংক যথাক্রমে O°C ও 32°F ; স্ফুটনাংক যথাক্রমে 100°C ও 212°F ; সুতরাং এই সমান তাপীয় ব্যবধান সেন্টিগ্রেড স্কেলে 100° এবং ফারেন্‌হাইট স্কেলে 180° হবে। কাজেই 1° ফারেন্‌হাইট = 100/180, অর্থাৎ 5/9 সেন্টিগ্রেড ডিগ্রি। এভাবে এদের যে-কোন একক থেকে অপর এককে নিম্নলিখিত সূত্রানুসারে সহজেই উষ্ণতার মান পরিবর্তন করা যেতে পারে ঃ

$$F^\circ = 9/5\,(C^\circ) + 32$$
$$C^\circ = 5/9\,(F^\circ) - 32$$

এরূপ হিসেবে ঃ

°C	°F	°C	°F
0	32	20	68
5	41	25	77
8	46·4	30	86
10	50	50	122
15	59	100	212

উষ্ণতা পরিমাপের একক হিসেবে সেন্টিগ্রেড ও ফারেন্‌হাইট এককই সমধিক প্রচলিত ; 'রুমার' ↑ স্কেলের ব্যবহার তেমন নেই।

বিভিন্ন সংখ্যার বর্গমূল ও ঘনমূল

বর্গমূল (স্কোয়ার রুট)		ঘনমূল (কিউব রুট)	
1	= 1·00	1	= 1·00
2	= 1·4142136	2	= 1·2599210
3	= 1·7320508	3	= 1·4422496
4	= 2·00	4	= 1·5874011
5	= 2·2360680	5	= 1·7099759
6	= 2·4494897	6	= 1·8171206
7	= 2·6457513	7	= 1·9129312
8	= 2·8284271	8	= 2·00
9	= 3·00	9	= 2·0800837
10	= 3·1622777	10	= 2·1544347

রোমান সংখ্যা-লিখন পদ্ধতি

1 = I	6 = VI	20 = XX
2 = II	7 = VII	30 = XXX
3 = III	8 = VIII	50 = L
4 = IV	9 = IX	100 = C
5 = V	10 = X	500 = D
		1000 = M

লিখনের কৌশলটা এই :

5 = V	, তা থেকে	...	4 = IV	আর, 6 = VI
10 = X	, ,, ,,	...	9 = IX	, 11 = XI
50 = L	, ,, ,,	...	40 = XL	, 60 = LX
100 = C	, ,, ,,	...	90 = XC	, 110 = CX
500 = D	, ,, ,,	...	400 = CD	, 600 = DC
1000 = M	, ,, ,,	...	900 = CM	, 1100 = MC

বিখ্যাত উদ্ভাবন ও উদ্ভাবক

উদ্ভাবিত জিনিস		উদ্ভাবন কাল		উদ্ভাবকের নাম
অটোমেটিক টেলিফোন	...	1889	...	স্ট্রোজার
আর্ক ল্যাম্প	...	1808	...	হামফ্রি ডেভি
অ্যান্টিসেপ্টিক সার্জারি	...	1865	...	লর্ড লিস্টার
ইলেকট্রিক ফ্যান	...	1886	...	হুইলার
,, ফার্নেস	...	1877	...	সিমেন্স
,, লাইট	...	1879	...	এডিসন
ওয়ারলেস টেলিগ্রাফ	...	1896	...	মার্কোনি
,, টেলিফোন	...	1902	...	ফেসেণ্ডেন
এরোপ্লেন	...	1903	...	রাইট ভ্রাতৃদ্বয়
এক্স-রে	...	1895	...	রণ্টগেন
কালার ফটোগ্রাফি	...	1892	...	লিপ্‌ম্যান
গ্যাস ম্যাণ্টেল	...	1885	...	ওয়েল্‌স ব্যাক
জাইরোকম্পাস	...	1906	...	আন্সকাট্‌জ
জাইরোস্কোপ	...	1817	...	বোনেন্‌বার্জার
টকি পিক্‌চার	...	1926	...	কেজ্‌
টাইপ-রাইটার	...	1867	..	শোল্‌স
টেলিগ্রাফ	...	1837	...	মোর্‌স
টেলিভিসন	...	1927	...	জন বেয়ার্ড
টেলিফোন	...	1876	...	গ্রাহাম বেল
ডায়নামো	...	1831	...	মাইকেল ফ্যারাডে
ডিনামাইট	...	1867	...	বার্নার্ড নোবেল
ডিজেল ইঞ্জিন	...	1896	...	ডিজেল
পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট	...	1827	...	অ্যাস্‌পডিল
পেনিসিলিন	...	1929	...	আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং
ফনোগ্রাফ (গ্রামোফোন)	...	1877	...	এডিসন
ফটোগ্রাফি	...	1827	...	নিপ্‌স
ফটোগ্রাফিক ফিল্ম	...	1887	...	গুড্‌উইন ইস্টম্যান
বাইসাইক্‌ল	...	1855	...	ল্যালিমেন
বুন্‌সেন বার্ণার	...	1855	...	রবার্ট বুন্‌সেন
বিসিমার প্রোসেস	...	1855	...	হেনরি বিসিমার
মোসন পিক্‌চার	...	1893	...	এডিসন
,, ,, প্রোজেক্টর	...	1894	...	জেন্‌কিন্স
ম্যাচ (দেশলাই, ঘর্ষ)	...	1827	...	ওয়েকার
,, (দেশলাই, লুসিফার)	...	1829	...	হোলডেন

উদ্ভাবিত জিনিস		উদ্ভাবন কাল		উদ্ভাবকের নাম
রেডিও	...	1896	...	মার্কোনি
রেয়ন	...	1855	...	অ্যাডেমার্স
রোটারি প্রিন্টিং	...	1847	...	হো
লাইনো টাইপ	...	1883	...	ম্যাগেস্থ্যালার
সায়েনাইড প্রোসেস	...	1890	...	ম্যাক্ আর্থার
সেলুলয়েড	...	1870	...	হায়াট্
সেফ্‌টি ল্যাম্প	...	1815	...	হামফ্রি ডেভি
সেফ্‌টি ম্যাচ	...	1844	...	পাস্‌ক
সিউইং মেসিন	...	1845	...	হায়োই
স্টিম ইঞ্জিন	...	1769	...	জেম্‌স ওয়াট
,, টার্বাইন	...	1882	...	ডি. লাভাল
স্ট্যাথিস্কোপ	...	1819	...	ল্যানেক
স্ট্রেপ্টোমাইসিন	...	1944	...	ওয়াক্সম্যান
হাইড্রোপ্লেন	...	1911	...	কার্টিস
হাইড্রোফোবিয়া ইন্‌জেক্‌সন	...	1885	...	লুই পাস্তর

নোবেল পুরস্কার

সুইডেনের বিখ্যাত বিজ্ঞানী অ্যালফ্রেড বার্ণার্ড নোবেল 1896 খৃষ্টাব্দের 10 ডিসেম্বর মারা যান। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর সারা জীবনের সঞ্চিত এক কোটি 75 লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের সম্পত্তি উইল করে একটি ন্যাসরক্ষক সমিতির (বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ) হস্তে অর্পণ করে যান। উইলের বিধান অনুসারে উক্ত সম্পত্তির বার্ষিক সুদ থেকে প্রতি বছর পদার্থবিদ্যা (Physics) রসায়নবিদ্যা (Chemistry), চিকিৎসা-বিজ্ঞান (Medicines), সাহিত্য (Literature) ও শান্তি (Peace) এই পাঁচটি বিষয়ে মৌলিক গবেষণা ও কৃতিত্বের জন্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের পুরস্কৃত করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জগতে শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী নোবেলের এই দান অতুলনীয়; নোবেল পুরস্কার লাভ করা জগতের বিভিন্ন দেশ ও জাতির পক্ষে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক-স্বরূপ। নোবেল প্রদত্ত সম্পত্তির বার্ষিক সুদ ভারতীয় মুদ্রার হিসাবে হয় প্রায় সওয়া ছয় লক্ষ টাকা;—প্রতি বিষয়ে প্রতি বছরে প্রদত্ত নোবেল পুরস্কারের মূল্য মোটামুটি 1,25,000 টাকা।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানিগণের নাম, দেশের নাম, প্রাপ্তির বছর ধারাবাহিকভাবে নিম্নে দেওয়া হলো:

পদার্থবিদ্যা

1901	উইল্‌হেল্‌ম কনার্ড রণ্টগেন	—	জার্মানি
1902	হেন্‌রিক আণ্টুন লরেঞ্জ ও পিটার জিম্যান	—	হল্যাণ্ড
1903	এণ্টনি হেন্‌রি ব্যাকেরেল, পিয়ের কুরি ও মেরি স্লোডোস্কা কুরি	—	ফ্রান্স
1904	লর্ড জন উইলিয়াম স্ট্রাট র‍্যালে	—	ইংল্যাণ্ড
1905	ফিলিপ লেনার্ড	—	জার্মানি
1906	জোসেফ জন টম্‌সন	—	ইংল্যাণ্ড
1907	অ্যালবার্ট আব্রাহাম মিচেল্‌সন	—	আমেরিকা
1908	গ্যাব্রিয়েল লিপ্‌ম্যান	—	ফ্রান্স
1909	গুগ্লিয়েমো মার্কনি ও	—	ইটালি
	কার্ল ফার্ডিন্যাণ্ড ব্রন	—	জার্মানি
1910	জোহান্স ডিডেরিক ভ্যান্‌ডারওয়াল্‌স	—	হল্যাণ্ড
1911	উইল্‌হেল্‌ম উইয়েন	—	জার্মানি
1912	গুস্তফ নিল্‌স ডালেন	—	সুইডেন
1913	হিক ক্যামার্লিং ওনেস	—	হল্যাণ্ড
1914	ম্যাক্স ভন ল'	—	জার্মানি
1915	স্যার উইলিয়াম হেনরি ব্র্যাগ ও উইলিয়াম লরেন্স ব্রাগ	—	ইংল্যাণ্ড
1916	পুরস্কার স্থগিত	—	...
1917	চার্লস গ্লোভার বার্কনার	—	ইংল্যাণ্ড
1918	ম্যাক্স ভন প্ল্যাঙ্ক	—	জার্মানি
1919	জোহান্স স্টার্ক	—	জার্মানি
1920	চার্লস এডুয়ার্ড গুইলাম	—	সুইজারল্যাণ্ড
1921	অ্যালবার্ট আইন্‌ষ্টাইন	—	জার্মানি
1922	নিল্‌স বোর	—	ডেনমার্ক
1923	রবার্ট অ্যাণ্ড্রুস মিলিক্যান	—	আমেরিকা
1924	কার্ল ম্যান জর্জ সিগ্রন	—	সুইডেন
1925	জেম্‌স ফ্র্যাঙ্ক ও গুস্তভ হার্টজ	—	জার্মানি
1926	জিন ব্যাপ্টিস্ট পেরিন	—	ফ্রান্স
1927	আর্থার হোলি কম্পটন ও	—	আমেরিকা
	চার্লস টমসন রিজ উইলসন	—	ইংল্যাণ্ড
1928	ওয়েলস্‌ উইলিয়াম্‌স রিচার্ডসন	—	ইংল্যাণ্ড
1929	লুই ভিক্টর ডি' ব্রগিল	—	ফ্রান্স
1930	স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন	—	ভারতবর্ষ

1931	পুরস্কার স্থগিত	—	...
1932	ওয়ার্নার হিসেনবার্গ	—	জার্মানি
1933	পল অ্যাড্রিয়েন মরিস ডির‍্যাক ও	—	ইংল্যাণ্ড
	আরউইন স্রুডিঙ্গার	—	অস্ট্রিয়া
1934	পুরস্কার স্থগিত	—	...
1935	জেম্‌স চ্যাড্‌উইক	—	ইংল্যাণ্ড
1936	কার্ল ডেভিড অ্যাণ্ডারসন ও	—	আমেরিকা
	ভিক্টর ফ্র্যাঞ্জ হেস	—	অস্ট্রিয়া
1937	ক্লিন্সন জোসেফ ডেভিডসন ও	—	আমেরিকা
	জর্জ পেগেট টম্‌সন	—	ইংল্যাণ্ড
1938	অ্যান্‌রিকো ফার্মি	—	ইটালি
1939	আর্নেস্ট আর্ল্যাণ্ডো লরেন্স	—	আমেরিকা
1940	পুরস্কার স্থগিত	—	...
1941	" "	—	...
1942	" "	—	...
1943	অটো স্টার্ন	—	আমেরিকা
1944	ইসাডোর আইজাক রোবি	—	আমেরিকা
1945	উল্‌ফ্‌গ্যাং পলি	—	সুইজারল্যাণ্ড
1946	পার্মি ব্রিজম্যান	—	আমেরিকা
1947	স্যার এডোয়ার্ড অ্যাপ্‌লটন	—	ইংল্যাণ্ড
1948	প্যাট্রিক মনার্ড ষ্টুয়ার্ট ব্ল্যাকেট	—	ইংল্যাণ্ড
1949	হিদেকি য়ুকাওয়া	—	জাপান
1950	সিসিল পাওয়েল	—	ইংল্যাণ্ড
1951	স্যার জন কক্র্‌ফট ও	—	ইংল্যাণ্ড
	ই. টি. উল্টন	—	আয়ারল্যাণ্ড
1952	এড্‌ওয়ার্ড পার্শেল ও ফেলিক্স ব্লচ }	—	আমেরিকা
1953	ডাঃ ফ্রিট্‌স জেরনিক	—	হল্যাণ্ড
1954	অধ্যাপক ম্যাক্সবার্ণ ও অধ্যাপক ওয়ালদার্ন বোথে }	—	জার্মানি
1955	ডঃ ডব্লিউ. ই. ল্যাম্ব ও ডাঃ পলিকার্প কুশ	—	আমেরিকা
1956	উইলিয়াম শক্‌লি, জন বার্ডিন ও ওয়াল্টার হাউসার }	—	আমেরিকা
1957	ডঃ সুং দাও লি এবং ডঃ চেন নিং ইয়াং (চৈনিক)	—	আমেরিকা

1958	ডঃ চেরেনকোভ, অধ্যাপক ফ্রাঙ্ক ও অধ্যাপক টামান	—	রাশিয়া
1959	ডঃ এমিলিও সেগ্রে (ইটালীয়) ও ডঃ ওয়েন চেম্বারলেন	—	আমেরিকা
1960	অধ্যাপক ডোল্যাণ্ড এ. গ্লেসার	—	আমেরিকা
1961	ডঃ রবার্ট হফ্স্টাডটার ও ডঃ রুডল্ফ মোয়েসবার	—	আমেরিকা
1962	লিওদাভিফোভিচ ল্যাণ্ডাউ	—	রাশিয়া
1963	অধ্যাপক ইউজিন পি. উইগনার, মারিয়া জিওপার্ড মেয়ার ও হান্স ডি. জেন্সন	—	আমেরিকা
1964	অধ্যাপক চার্লস টাউন্স ও	—	আমেরিকা
	অধ্যাপক নিকোলাই বাসোভ ও আলেকজাণ্ডার প্রকারোভ	—	রাশিয়া
1965	অধ্যাপক জুলিয়ান স্থইংগার ও রিচার্ড ফেম্যান ও	—	আমেরিকা
	অধ্যাপক সিন-ইতিতো তোমোনাগা	—	জাপান
1966	অধ্যাপক আলফ্রেড ক্যাস্লার	—	ফ্রান্স
1967	" হান্স আলব্রেক্ট বেথে	—	আমেরিকা
1968	" লুই আল্ভেরেজ	—	"
1969	" মারে গোলম্যান	—	"
1970	" লুই নীল ও	—	ফ্রান্স ও
	হান্স আল্ফ্ভেন	—	স্থইডেন
1971	ডেনিস প্যারর	—	ইংল্যাণ্ড
1972	ডক্টর লিওকুনার, ডঃ জন ব্রিফার ও জন ব্রাউন	—	আমেরিকা
1973	ডক্টর লিও ইসাকী, ডঃ আইভার গিভার ও	—	জাপান, আমেরিকা
	ডঃ ব্রায়ান ভি. যোসেফ্সন	—	ইংল্যাণ্ড

রসায়ন বিদ্যা

1901	জ্যাকোবাস হেণ্ডিক ভ্যাণ্ট হফ্	—	হল্যাণ্ড
1902	অ্যামিল ফিসার	—	জার্মানি
1903	সাণ্টে অগাষ্ট অ্যারেনিয়াস	—	স্থইডেন
1904	স্যার উইলিয়াম র‍্যাম্সে	—	ইংল্যাণ্ড
1905	অ্যাডল্ফ ভন বেয়ার	—	জার্মানি

1906	হেন্‌রি ময়সাঁ	—	ফ্রান্স
1907	অ্যাডুয়ার্ড বুচ্‌নার	—	জার্মানি
1908	স্যার আর্নেষ্ট রাদারফোর্ড	—	ইংল্যাণ্ড
1909	উইলহেল্‌ম্‌ অষ্টওয়াল্ড	—	জার্মানি
1910	অটো ওয়ালাচ	—	জার্মানি
1911	মেরী স্কলোডোস্কা কুরি	—	ফ্রান্স
1912	ভিক্টর গ্রিগ্‌নার্ড ও পল স্যাবাষ্টিয়ের	—	ফ্রান্স
1913	অ্যালফ্রেড ওয়ার্নার	—	সুইজারল্যাণ্ড
1914	থিয়োডোর উইলিয়াম রিচার্ডস	—	ইংল্যাণ্ড
1915	রিচার্ড উইল্‌ষ্ট্যাটার	—	জার্মানি
1916–1917	পুরস্কার স্থগিত	—	...
1918	ফ্রিট্‌জ হাবার	—	জার্মানি
1919	পুরস্কার স্থগিত	—	...
1920	ওয়াল্টার নার্নষ্ট	—	জার্মানি
1921	ফ্রেডেরিক সডি	—	ইংল্যাণ্ড
1922	ফ্রান্সিস উইলিয়াম অ্যাষ্টন	—	ইংল্যাণ্ড
1923	ফ্রিট্‌জ প্রেগ্‌ল	—	অষ্ট্রিয়া
1924	পুরস্কার স্থগিত	—	...
1925	রিচার্ড সিগ্‌মণ্ড	—	জার্মানি
1926	থিয়োডোর ভেড্‌বার্জ	—	সুইডেন
1927	হেন্‌রিচ অটো উইল্যাণ্ড	—	জার্মানি
1928	অ্যাডল্‌ফ উইণ্ডাস	—	জার্মানি
1929	স্যার আর্থার হার্ডে ও	—	জার্মানি
	হান্স ভন উইলার চেপ্‌লিন	—	সুইডেন
1930	হান্স ফিসার	—	জার্মানি
1931	কার্ল বস্‌ ও ফ্রেডরিক গুস্তব বার্গুইস	—	জার্মানি
1932	আর্ভিং ল্যাং মুর	—	আমেরিকা
1933	পুরস্কার স্থগিত	—	...
1934	হারল্ড ক্লেটন ইউরি	—	আমেরিকা
1935	ফ্রেড্‌রিক জোলিও কুরি ও আইরিন জোলিও কুরি	—	ফ্রান্স
1936	পিটার জোসেফ উইল্‌হেল্‌ম ডেরি	—	হল্যাণ্ড

1937	ওয়াল্টার নর্ম্যান হাওয়ার্থ ও	—	ইংল্যাণ্ড
	পল কারের	—	সুইজারল্যাণ্ড
1938	রিচার্ড কুন	—	জার্মানি
1939	অ্যাডল্‌ফ বুটেন্যাণ্ট্‌ ও	—	জার্মানি
	লিওপোল্ড রুজিকা	—	সুইজারল্যাণ্ড
1940—1942	পুরস্কার স্থগিত	—	...
1943	জর্জ হেভেসি	—	হাঙ্গেরি
1944	অটো হান	—	জার্মানি
1945	আর্তুরি বির্টান্যান	—	ফিন্‌ল্যাণ্ড
1946	ওয়েণ্ডেল ষ্ট্যান্‌লি, জন নর্থরাপ ও জেম্‌স সামার	—	আমেরিকা
1947	স্যার রবার্ট রবিন্‌সন	—	ইংল্যাণ্ড
1948	আর্নে টেলিয়ুস	—	সুইডেন
1949	ডব্লিউ, এফ, জিয়াঙ্ক	—	আমেরিকা
1950	অটো ডিয়েল্‌স ও কেণ্ট অ্যাডলার	—	জার্মানি
1951	অ্যাডুইন ম্যাক্‌মিলান ও প্লেন সিবোর্জ্জ	—	আমেরিকা
1952	আর্চার জন পার্টনার মেরিন ও রিচার্ড লরেন্স মিলিংটন	—	ইংল্যাণ্ড
1953	অধ্যাপক হ্যারম্যান ষ্টডিঞ্জার	—	জার্মানি
1954	ডঃ লিনাস পলিং	—	আমেরিকা
1955	অধ্যাপক ভিন্‌সেণ্ট হ্য ভিনো	—	আমেরিকা
1956	স্যার সিরিল হিন্‌শেলউড ও	—	ইংল্যাণ্ড
	অধ্যাপক নিকোলাই সেভেনভ	—	রাশিয়া
1957	স্যার আলোক্‌জাণ্ডার টড	—	ইংল্যাণ্ড
1958	অধ্যাপক ডঃ ফ্রেডারিক স্যাঙ্গার	—	ইংল্যাণ্ড
1959	অধ্যাপক জারোস্লাভ হেরোভস্কি	—	চেকোশ্লোভাকিয়া
1960	উইলার্ড এফ. লিবি	—	আমেরিকা
1961	অধ্যাপক কেল্‌ভিন	—	আমেরিকা
1962	ডক্টর ফার্ডিনাণ্ড কেরুজ ও ডঃ জন ফাউণ্ডে কেণ্ড্র		ইংল্যাণ্ড
1963	অধ্যাপক কার্ল জিয়েগ্‌লার ও জিউলিও নাট্রা		জার্মানি, ইটালী
1964	ডরোথি ক্রোফ্‌ট হস্‌কিন	—	ইংল্যাণ্ড
1965	অধ্যাপক রবার্ট বার্নস উডওয়ার্ড	—	আমোরকা
1966	অধ্যাপক রবার্ট এস, মুল্লিকেন	—	আমেরিকা

1967	অধ্যাপক আইজেন,	—	জার্মানি
	জর্জ্জ পোর্টার ও	—	ইংল্যাণ্ড
	অধ্যাপক নারিশ	—	আমেরিকা
1968	অধ্যাপক লারস অন্‌সেজার	—	আমেরিকা
1969	অধ্যাপক ডার্ক বার্টন ও	—	ইংল্যাণ্ড,
	অধ্যাপক উড্ হ্যাসেল	—	নরওয়ে
1970	অধ্যাপক লুই এফ. লেলয়র	—	দক্ষিণ আমেরিকা
1971	ডক্টর তোরহার্ড হার্জবার্গ	—	কানাডা
1972	ডক্টর ক্রিষ্টিয়ান আন্‌ফিনসেন, ডক্টর স্ট্যানফোর্ড মুর ও ডঃ উইলিয়াম স্টিন	—	আমেরিকা
1973	ডক্টর জিওফ্রে উইল্‌কিন্‌সন ও	—	ইংল্যাণ্ড
	আর্নেস্ট অটো ফিসার	—	পশ্চিম জার্মানি

চিকিৎসা বিজ্ঞান

1901	অ্যামিল ভন বেরি	—	জার্মানি
1902	স্যার রোনাল্ড রস	—	ইংল্যাণ্ড
1903	নিলস্ রাইবার্জ ফিন্‌সেন	—	ডেনমার্ক
1904	আইভ্যান পেট্রোভিচ্ পাভ্‌লভ	—	রাশিয়া
1905	রবার্ট কক্	—	জার্মানি
1906	ক্যামিলো গল্‌গি ও	—	ইটালি
	র‍্যামোনি কাজাল	—	স্পেন
1907	চার্লস লুই অ্যালফোর্স ল্যাভেরন	—	ফ্রান্স
1908	পল আর্লিচ ও	—	জার্মানি
	অ্যালি মেচ্‌নিকফ্	—	রাশিয়া
1909	অ্যামিল থিয়োডোর কোচের	—	সুইজারল্যাণ্ড
1910	অ্যাল্‌ফ্রেড কাসেল	—	জার্মানি
1911	অ্যাল্‌ভার গলষ্ট্র্যাণ্ড	—	সুইডেন
1912	অ্যালেকিস ক্যারেন	—	আমেরিকা
1913	চার্লস রবার্ট রিচেট	—	ফ্রান্স
1914	রবার্ট ব্যারেলি	—	অষ্ট্রিয়া
1915—1918	পুরস্কার স্থগিত	—	...
1919	জুলেস বোর্ডেট	—	বেলজিয়াম
1920	অগাষ্ট ক্রোঘ	—	ডেনমার্ক
1921	পুরস্কার স্থগিত	—	...

1922	আর্চিবল্ড ভিভিয়ান হিল ও	—	ইংল্যাণ্ড
	অটো মেয়ার হফ	—	জার্মানি
1923	ফ্রেড্যারিক গ্র্যান্ট ব্যান্টিং ও জন্ জেম্স রিচার্ড ম্যাক্লিয়ড	—	কানাডা
1924	উইল্হেলম আয়েন্থোডেন	—	হল্যাণ্ড
1925	পুরস্কার স্থগিত	—	...
1926	জোহান্স অ্যাণ্ড্রি গিব	—	ডেনমার্ক
1927	জুলিয়াস ওয়াগ্‌নার জোরেগ	—	অষ্ট্রিয়া
1928	চার্লস জুলেস হেন্‌রি নিকোল	—	ফ্রান্স
1929	ক্রিশ্চিয়ান আইক্‌ম্যান ও	—	হল্যাণ্ড
	স্যার এফ, জি, ইপ্‌কিন্স	—	ইংল্যাণ্ড
1930	কার্ল ল্যাণ্ডষ্টিনার	—	আমেরিকা
1931	অটো হেন্‌রিচ ওয়ারবার্গ	—	জার্মানি
1932	অ্যাড্‌সার ডগ্‌লাস ক্র্যাড্রিয়ান ও স্যার চার্লস স্কট শেরিংটন	—	ইংল্যাণ্ড
1933	টমাস হান্ট মর্গ্যান	—	আমেরিকা
1934	জর্জ রিচার্ডস মাউন্ট, উইলিয়াম প্যারি মর্ফি ও জর্জ হোট হুইপ্‌ল	—	আমেরিকা
1935	হান্স স্পেম্যান	—	জার্মানি
1936	স্যার হেনরি হ্যালেট ডেল ও	—	ইংল্যাণ্ড
	অটো লোয়ি	—	অষ্ট্রিয়া
1937	অ্যালবার্ট ভন্ সেন্টিওর্গি ন্যাগিরাপোল্ট	—	হাঙ্গেরি
1938	কর্নিল হেম্যান্স	—	বেলজিয়াম
1939	জেরাাড ডোম্যাক	—	জার্মানি
1940—1942	পুরস্কার স্থগিত	—	...
1943	এডওয়ার্ড অ্যাডেলনার্ট ডোইজি ও	—	আমেরিকা
	হেন্‌রিক ড্যাম	—	ডেনমার্ক
1944	জোসেফ আর্ল্যাঙ্গার ও হার্বার্ট স্পেন্সার গ্যাসার	—	আমেরিকা
1945	স্যার আলেক্‌জাণ্ডার ফ্লেমিং, স্যার হাওয়ার্ড ফ্লোরি ও আর্নেস্ট চেইন	—	ইংল্যাণ্ড
1946	হার্ম্যান মুলার	—	আমেরিকা

1947	কার্ল কোরি, গার্টি কোরি ও	—	চেকোশ্লোভাকিয়া
	বার্নাডো অ্যালবার্টো হাউসে	—	ব্রাজিল
1948	পল মুলার	—	সুইজারল্যাণ্ড
1949	রুডল্‌ফ হেস ও	—	সুইজারল্যাণ্ড
	অ্যাণ্টোনিও এগার মোনিজ	—	পর্তুগাল
1950	ফিলিপ হেন্‌চ, এড্‌ওয়ার্ড কেণ্ডলি ও	—	আমেরিকা
	এড্‌ওয়ার্ড তাডিউজ রিষ্টিন	—	সুইজারল্যাণ্ড
1951	ম্যাক্স হিলার	—	আমেরিকা
1952	সেলম্যান. এ. ওয়াক্সম্যান	—	আমেরিকা
1953	ডাঃ ফ্রিজ এ. লিপম্যান ও	—	ইংল্যাণ্ড
	ডাঃ হান্‌স এ, ক্রেবস্‌	—	আমেরিকা
1954	ডাঃ টমাস ওয়েলার, ডাঃ জন এফ্‌ অ্যাণ্ডার্স ও ডাঃ ফ্রেডারিক সি. রবিন্স	—	আমেরিকা
1955	হুগো থিয়োরেল	—	সুইডেন
1956	ডাঃ আঁদ্রে কুঁনা, অধ্যাপক ডিকিন্স রিচার্ডস	—	ইংল্যাণ্ড
	ডাঃ ভের্নের ফর্সম্যান	—	জার্মানি
1957	অধ্যাপক ড্যানিয়েল বোভেট (সুইডিশ)	—	ইটালি
1958	অধ্যাপক ডাঃ জর্জ উইলিস, ডাঃ এডওয়ার্ড ক্যাটাস ও অধ্যাপক ডাঃ জসুয়া লেডারবার্গ	—	আমেরিকা
1959	ডাঃ সেভেরো ওচোয়া ও ডাঃ আর্থার কর্ণবার্গ	—	আমেরিকা
	অধ্যাপক ফ্রাঙ্ক ম্যাক্‌ফার্লিন বার্নেট	—	অষ্ট্রেলিয়া
1960	অধ্যাপক পিটার ব্রায়ান মেডাওয়ার	—	ইংল্যাণ্ড
1961	ডাঃ জর্জ ভন বেক্‌সে	—	হাঙ্গেরি
1962	ডক্টর জেমস ডিউই ওয়াটসন,	—	আমেরিকা
	,, ফ্রান্সিস হ্যারি কম্পটন ক্রীক ও	—	ইংল্যাণ্ড
	,, মরিস হিউজ ফ্রেডারিক উইলকিন্স	—	ইংল্যাণ্ড
1963	স্যার জন কেরু একেল্‌স,	—	অষ্ট্রেলিয়া
	ডক্টর লয়েড হড্‌কিন ও	—	ইংল্যাণ্ড
	,, অ্যাণ্ড্রু ফিল্ডিং হাক্সলি	—	ইংল্যাণ্ড
1964	অধ্যাপক কোনার্ড ব্লক ও	—	আমেরিকা
	,, থিয়োডোর লাইনেন	—	পঃ জার্মানি
1965	ডক্টর ফ্রাঁসোয়া জ্যাকব, আঁদ্রে লোফ ও ডঃ জ্যাক মোনো	—	ফ্রান্স
1966	ডক্টর পেটন রাউস ও ডঃ চার্লস বি. হাগিন্স	—	আমেরিকা

1967 ডক্টর র‍্যাগনার গ্যানিট, অধ্যাপক হ্যালডেন — সুইডেন, আমেরিকা,
ডাঃ কীফার হার্টলাইন ও জর্জ্জ ওয়াল্ড — আমেরিকা
1968 ডক্টর রবার্ট হোলি, ডক্টর মার্শাল নিরেনবার্গ — আমেরিকা
ও ডক্টর হরগোবিন্দ খোরানা — ,, (ভারতীয়)
1969 অধ্যাপক ম্যাক্স ডেলব্রুক, ডাঃ আলফ্রেড
হারসো ও অধ্যাপক সালভাডর লুরিয়া — আমেরিকা
1970 স্যার বার্নার্ড কাট্জ, ডাঃ উইলফন ইউলার — ইংল্যাণ্ড, সুইডেন
ও জুলিয়ান অ্যাক্সেলবড — আমেরিকা
1971 ডক্টর আর্ল উইলবার সাদারল্যাণ্ড (জুনিয়ার) — আমেরিকা
1972 ডক্টর গেরাল্ড এডেলম্যান ও — আমেরিকা
ডাঃ রোডনি পোর্টার — ইংল্যাণ্ড
1973 ডাঃ কার্ল ফন ফ্রিশ, ডাঃ কনার্ড লরেন্স — অষ্ট্রিয়া
ও ডাঃ মিকোলাস টিনবারজেন — হল্যাণ্ড

1973 পর্যন্ত কোন্ দেশ বিজ্ঞানে কতবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছে ঃ

দেশ	পদার্থবিদ্যা	রসায়ন	চিকিৎসা বিজ্ঞান
ইংল্যাণ্ড	15	16	14
ফ্রান্স	6	4	4
জার্মানী	11	21	10
আমেরিকা	24	14	24
রাশিয়া	3	1	2
হল্যাণ্ড	4	2	3
ইটালি	2	1	2
সুইডেন	2	4	3
সুইজারল্যাণ্ড	2	3	4
অস্ট্রিয়া	2	1	4
হাঙ্গেরী	...	1	2
জাপান	3	...	...

(পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

দেশ	পদার্থবিদ্যা	রসায়ন	চিকিৎসা বিজ্ঞান
নরওয়ে	...	...	1
ফিনল্যাণ্ড	...	1	...
স্পেন	...	...	1
পর্তুগাল	...	...	1
আয়ারল্যাণ্ড	1	...	...
ডেনমার্ক	1	...	4
ভারতবর্ষ	1	...	1*
অস্ট্রেলিয়া	...	1	2
বেলজিয়াম	...	...	2
কানাডা	...	1	2
দঃ আমেরিকা	...	1	...
চেকোস্লোভাকিয়া	...	1	2
ব্রাজিল	...	...	1

* আমেরিকা-প্রবাসী ভারতীয় ডক্টর হরগোবিন্দ খোরানা।

মহাকাশ অভিযান (Space Travel)

(সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও অভিযান-তালিকা)

বর্তমান বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে নভোমণ্ডলের আবহ-তত্ত্বাদি সমীক্ষার জন্যে রকেট ↑-চালিত স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রাগার-যান মহাকাশে উৎক্ষেপণের উদ্যোগ সুরু হয়। রাশিয়া, আমেরিকা, কানাডা, বৃটেন, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি দেশের বিজ্ঞানীরা এই প্রচেষ্টার সাফল্যের উদ্দেশ্যে 1957 সালের 1, জুলাই একটি বিশ্বসংস্থা গঠন করে' 18 মাস ব্যাপী একটি কর্মসূচী গ্রহণ করেন ; এর নাম দেওয়া হয়েছিল **আন্তর্জাতিক ভূ-তাত্ত্বিক বর্ষ** (International Geophysical Year), সংক্ষেপে I.G.Y.। উন্নত দেশগুলির সহযোগিতায়

ভারতের কেরালা রাজ্যের থুম্বা নামক স্থানেও একটি আবহ-গবেষণাগার স্থাপিত হয়। ঐ সময় রাশিয়া ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে-সঙ্গে ফ্রান্স, বৃটেন ও জাপান থেকে, পরে থুম্বা থেকেও দু'একটি ক্ষুদ্র রকেট-যান উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল; কিন্তু মহাকাশ-সমীক্ষার এই প্রচেষ্টায় রাশিয়া ও আমেরিকার বিজ্ঞানীরা অভাবনীয় কৃতিত্বের পরিচয় দেন এবং মনুষ্য-নির্মিত মহাকাশ-যান শক্তিশালী রকেটের সাহায্যে উৎক্ষিপ্ত করে চাঁদের মত তাদেরও পৃথিবীকে ক্রমাগত প্রদক্ষিণ করাতে ও ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বেতার-মাধ্যমে মানুষের নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রনাধীনে রাখতে সক্ষম হয়। পৃথিবী পরিক্রমাকালে এ-সব নকল চাঁদ, বা কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে স্বয়ংক্রিয় বেতার-যান্ত্রিক (radio transmission) পদ্ধতিতে মহাকাশের নানা আবহ-তত্ত্ব পৃথিবীতে প্রেরিত ও গবেষণাগারে শ্রুত হতে থাকে; এমন কি, বিভিন্ন নৈসর্গিক দৃশ্য ও কোন-কোন গ্রহ-উপগ্রহের বেতার-চিত্রও পরিদৃষ্ট হয়। বিজ্ঞান-প্রতিভা ও প্রযুক্তিবিদ্যায় মানুষের সাফল্যের এটা একটা বিস্ময়কর অধ্যায়। আমেরিকায় এ-সব মহাকাশ অভিযানের পরিকল্পনা রূপায়নের তত্ত্বাবধায়ক প্রতিষ্ঠান হলো National Aeronautics & Space Administration, সংক্ষেপে **নাসা** (N.A.S.A); এর বিরাট আয়োজন, বিপুল অর্থব্যয়। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রেও অনুরূপ বিরাট আয়োজন চলে, এবং মহাকাশ-অভিযানে বস্তুতঃ রাশিয়াই প্রথম সাফল্যের সম্মান অর্জন করে।

অতঃপর, রাশিয়া ও আমেরিকা প্রায় প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে মহাকাশ ও মহাশূন্য সমীক্ষার উদ্দেশ্যে কেবল কৃত্রিম উপগ্রহ, বা নকল চাঁদ উৎক্ষেপণ ও তার পৃথিবী পরিক্রমাই নয়, চন্দ্র-পরিক্রমা, চন্দ্রাভিযান, কৃত্রিম গ্রহ উৎক্ষেপণ, গ্রহ-পরিক্রমা, চন্দ্রালোকের মানুষের অভিযান প্রভৃতি বিভিন্ন বিস্ময়কর পরিকল্পনায় মহাকাশ-অভিযানে ব্রতী হয়েছে এবং অদ্যাবধি ক্রমাগত উন্নততর পদ্ধতিতে এই তৎপরতা চালাচ্ছে ও বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করে চলেছে। বিশ্ব-রহস্যের সুদূর অজানা তথ্যাদি জানবার উদ্দেশ্যে মানুষের এই দুঃসাহসিক অভিযানের ইতিবৃত্ত ও ঘটনাপঞ্জী বহু ব্যাপক ও বিশাল; একে প্রধানতঃ নিম্নোক্ত তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রত্যেকটি পর্যায়ে রাশিয়া ও আমেরিকার কোন্ দেশ, কবে, কোন্ শ্রেণীর মহাকাশ-যানে, কিরূপ সাফল্য অর্জন করেছে, তার বিশেষ কয়েকটি অভিযানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তালিকাকারে সময়ের ক্রমানুসারে প্রদত্ত হলো:

প্রথম পর্যায় ঃ ক্বত্রিম উপগ্রহ (নকল চাঁদ) ঃ

উৎক্ষেপণ তারিখ	দেশ	কৃত্রিম উপগ্রহ যান	আরোহী	অভিযান	সার্থকতা ও পরিণতি
1957 4, অক্টোবর	রাশিয়া	স্পুটনিক-1	…	মহাকাশে প্রতি 95 মিনিটে একবার করে পৃথিবী পরিক্রমা, তিন মাসব্যাপী অভিযান ;	বেতার-বার্তায় মহাকাশের বহু আবহ-তত্ত্ব পৃথিবীতে প্রেরণ ; 1958, 4, জানুয়ারী বেতার-নির্দেশে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে নেমে ভস্মীভূত।
1957 3, নভেম্বর	রাশিয়া	স্পুটনিক-2	'লাইকা' নামক কুকুর	কয়েক সহস্র বার ভূ-প্রদক্ষিণ, পাঁচ মাসেরও অধিককাল পরিভ্রমণ ;	বেতার-সংযোগ অক্ষুণ্ণ ; 1958, 14, এপ্রিল পৃথিবীর গবেষণাগারের বেতার নির্দেশ মান্য করে ভূ-তলে নিরাপদ অবতরণ, কিন্তু লাইকা মৃত।
1958 31, জানুয়ারী	আমেরিকা	এক্সপ্লোরার-1	…	মহাকাশে প্রতি 115 মিনিটে একবার করে ভূ-প্রদক্ষিণ ;	বেতার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, আয়ুষ্কাল অজ্ঞাত, সম্ভবতঃ ভস্মীভূত।
1958 17, মার্চ	আমেরিকা	এক্সপ্লোরার-2	…	ভূ-প্রদক্ষিণ কাল প্রতি 134 মিনিটে একবার করে, প্রায় ছয় মাসাধিক কাল পরিভ্রমণ ;	প্রায় 6 মাস পরে সেপ্টেম্বর মাসে বেতার-সংকেত স্তব্ধ হয়ে যায় ; অনুমান, মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহরূপে আজও ভূ-প্রদক্ষিণরত।
1960 19, আগষ্ট	রাশিয়া	স্পুটনিক-5	বেল্কা ও ষ্ট্রেল্কা নামক দু'টি কুকুর, দু'টি ইঁদুর, মাছি ও চারা গাছ	প্রায় 200 মাইল ঊর্ধ্বা-কাশে প্রতি 1·5 ঘণ্টায় এক বার করে কৃত্রিম উপগ্রহরূপে ভূ-প্রদক্ষিণ ;	মোট 17 বার প্রদক্ষিণান্তে প্রেরিত বেতার-নির্দেশ মান্য করে স্বদেশের প্রায় নির্দিষ্ট স্থানে অবতরণ ; সব জীবই জীবন্ত প্রত্যাবর্তন, মহাকাশে জীবদেহে প্রতিক্রিয়া নির্ধারণ।

জানা গেছে, উল্লিখিত সময়কালের মধ্যে আমেরিকাও একবার একটি বানরকে রকেট-যানে চড়িয়ে প্রায় 60 মাইল উর্ধ্বাকাশে ঘুরিয়ে এনেছিল ; কিন্তু ভু-তলে অবতরণের সঙ্গে-সঙ্গে বানরটি পালিয়ে যায়। প্রাণীটির দেহে উর্ধ্বাকাশের প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করা যায়নি। যাহোক, পূর্ব পৃষ্ঠায় কয়েকটি মাত্র কৃত্রিম উপগ্রহ, বা নকল চাঁদ অভিযানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে ; এ-সব ছাড়াও রাশিয়া ও আমেরিকা পর্যায়ক্রমে আরও অনেক উপগ্রহ-যান পৃথিবীর উর্ধ্বাকাশের ক্রমাগত উচ্চতর কক্ষপথে স্থাপন করে এবং এ-গুলির আকার, আয়তন, ওজন, যন্ত্র-সজ্জা ও যান্ত্রিক গতিশক্তি উন্নততর হতে থাকে। আমেরিকা এক্সপ্লোরারের পরে ভ্যানগার্ড, ডিস্‌কভারার প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর **কৃত্রিম উপগ্রহ** উৎক্ষেপন করে' পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ছাড়িয়ে মহাশূন্যেরও বহু আবহ-তত্ত্ব সংগ্রহ করে এবং রাশিয়াও অনুরূপভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর যন্ত্র-যানে করে' ক্রমাগত উন্নততর প্রচেষ্টা চালায় ও তারপরে চন্দ্রাভিযানে অগ্রসর হয়।

চন্দ্রাভিযান প্রচেষ্টা :

কেবল ভূ-প্রদক্ষিণকারী রকেট-যান, অর্থাৎ কৃত্রিম উপগ্রহরূপে নকল চাঁদ উৎক্ষেপণ ও পৃথিবী পরিক্রমাই নয়, সরাসরি চন্দ্রাভিযানের প্রচেষ্টাও 1959 সাল থেকেই স্বরু হয়। পৃথিবী থেকে চন্দ্রের দূরত্ব গড়ে প্রায় 2,40,000 মাইল ; বহু-পর্যায়ী শক্তিশালী রকেটের সাহায্যে এই দূরত্ব অতিক্রম করে রাশিয়া ও আমেরিকা 1959 সাল থেকে চন্দ্রলোকে পৌছুবার উদ্দেশ্যে অনেক-গুলি চন্দ্রাভিমুখী রকেট-যান মহাশূন্যে প্রেরণ করে। এদের মধ্যে রাশিয়ার **লুনা** ও **জোণ্ড** শ্রেণীর ও আমেরিকার **রেঞ্জার, সার্ভেয়ার, অরবিটার** শ্রেণীর বহু রকেট-যান উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। এগুলির সংখ্যা অদ্যাবধি 35-টিরও বেশী ; এদের মধ্যে প্রথম দিকে 7-টি যান চাঁদের পাশ কাটিয়ে অনন্ত শূন্যে হারিয়ে গেছে, 11-টি চন্দ্র-পৃষ্ঠে আছড়ে পড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে, 6-টি চন্দ্রপৃষ্ঠে ধীরে-ধীরে অবতরণ করেছে, এবং 4-টি চন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে তার আবহ-মণ্ডলের বহু বেতার-বার্তা পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। এ-গুলির মধ্যে রাশিয়ার লুনা-3 চন্দ্রের সান্নিধ্য থেকে প্রত্যাবর্তন-কালে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে ভস্মীভূত হয়েছে। আবার, রাশিয়ারই উন্নততর চন্দ্র-যান জোণ্ড-5 চন্দ্র প্রদক্ষিণের পরে নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে এসেছে। বলা বাহুল্য, চন্দ্রাভিযান প্রচেষ্টার এ-সব যান ছিল মনুষ্য-আরোহীবিহীন যন্ত্র-যান মাত্র।

চন্দ্রাভিযানের এ-সব প্রচেষ্টার ফলে মানুষ চন্দ্র. সম্বন্ধে বহু তথ্যের বেতার-বার্তা ও চন্দ্রের দৃশ্য ও অদৃশ্য উভয় পৃষ্ঠের অনেক টেলিভিসন চিত্র পেয়েছে। এভাবে চন্দ্রপৃষ্ঠের অবস্থাদি ও আবহ-তত্ত্ব জানার পরে চন্দ্রে মনুষ্য প্রেরণ ও তাকে নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার বিভিন্ন সমস্যার সমাধান এবং উন্নত যান্ত্রিক ব্যবস্থাদি সম্পন্ন করা হয়। অতঃপর 1968 সালের 21 ডিসেম্বর আমেরিকা অ্যাপোলো-8 নামক একটি রকেট-যানে তিনজন মানব নভোযাত্রী চন্দ্রপৃষ্ঠে পদার্পণ করাতে এবং প্রায় 6-দিন পরে তাদের সুস্থদেহে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছে। চন্দ্রে মনুষ্য নভোচারী প্রেরণে আমেরিকা প্রথম সাফল্য অর্জন করলেও মানুষের চন্দ্রাভিযানে রাশিয়াও পিছিয়ে ছিল না। মহাকাশ-অভিযানের তৃতীয় পর্যায়ে 'মহাকাশে মানুষ' শীর্ষক নিবন্ধে এ-সব অভিযানের সংক্ষিপ্ত তালিকা পরে যথাস্থানে দেওয়া হলো।

দ্বিতীয় পর্যায় : কৃত্রিম গ্রহ ও গ্রহাভিযান :

বহু সংখ্যক কৃত্রিম উপগ্রহ, বা 'নকল চাঁদ' মহাকাশের ক্রমাগত উচ্চতর কক্ষপথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়ে মানুষ ক্রমে যান্ত্রিক ও তাত্ত্বিক বিদ্যায় অপরিসীম অভিজ্ঞতা ও কৃতিত্ব অর্জন করে। রাশিয়া ও আমেরিকা অতঃপর পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ও চন্দ্রলোক ছাড়িয়ে মহাশূন্য সমীক্ষার দুরূহ পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং মাধ্যাকর্ষণের বাইরে সুদূর মহাশূন্যে রকেট-যান উৎক্ষেপণ ও গ্রহাভিমুখী অভিযানের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়। বহু-পর্যায়ী (multi-staged) অতি শক্তিশালী রকেটের সাহায্যে উৎক্ষিপ্ত এরূপ যন্ত্রযানগুলি **স্পেস প্রোব** (Space Probe) নামে অভিহিত। পূর্বেই বলা হয়েছে, 1959 খৃষ্টাব্দ থেকে রাশিয়া ও আমেরিকা উভয় দেশই চন্দ্র-পরিক্রমা ও চন্দ্রাভিযানের উদ্দেশ্যে অনেকগুলি মহাশূন্য-যান উৎক্ষেপণ করে এবং অনেক ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করে ; পরিশেষে চাঁদে মানুষ অবতরণ করাতেও সক্ষম হয়। এ-সব বিবরণ পরবর্তী পর্যায়ে উল্লেখ্য। যাহোক, মহাশূন্য-সন্ধানী অভিযানে রাশিয়ার **লুনিক** (Lunic) শ্রেণীর ও আমেরিকার **পাইওনিয়ার** (Pioneer) শ্রেণীর মহাশূন্য-যান **কৃত্রিম গ্রহ** রূপে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতেও সক্ষম হয়। রাশিয়ার লুনিক-3 যানটি প্রায় 450 দিনে ও আমেরিকার পাইওনিয়ার-4 প্রায় 400 দিনে একবার করে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে-করতে সৌর পরিবারের কৃত্রিম

কৃত্রিম গ্রহ ও গ্রহাভিযান

উৎক্ষেপণ তারিখ	দেশ	রকেট-যান	ঊর্ধ্বগমন	গ্রহ-পরিক্রমা	সাফল্য ও সার্থকতা
1965 15, জুন	আমেরিকা	ম্যারিনার-4	প্রায় 7 মাসে 4 কোটি মাইল,	**মঙ্গল** গ্রহের প্রায় 6 হাজার মাইল দূরবর্তী কক্ষে পরিক্রমা-রত ;	স্বয়ংক্রিয় বেতার যন্ত্রাদির সাহায্যে মঙ্গল গ্রহের পৃষ্ঠদেশের বহু সংখ্যক বেতার-চিত্র পৃথিবীতে প্রেরণ।
1967 9, অক্টোবর	রাশিয়া	ভেনাস-4	প্রায় 2 মাসে 2·5 কোটি মাইল,	সূর্য থেকে 3·7 কোটি মাইল দূরবর্তী **শুক্র** গ্রহের চারদিকে পরিক্রমা কালে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রযান গ্রহপৃষ্ঠে অবতারণ ;	শুক্রগ্রহের নৈসর্গিক অবস্থা ও আবহমণ্ডল সম্বন্ধীয় বহুবিধ বেতার বার্তা পৃথিবীর গবেষণাগারে প্রেরণ।
1967 11, অক্টোবর	আমেরিকা	ম্যারিনার-5	প্রায় 3 মাসে 3·7 কোটি মাইল,	শুক্রগ্রহের পাশ কাটিয়ে মঙ্গল গ্রহাভিমুখী-ধাবন, মহাশূন্যে বিলীন ; পরিণতি অজ্ঞাত ;	গমনপথে শুক্র ও মঙ্গল গ্রহের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আবহ-তত্ত্বের বেতার বার্তা প্রেরণ।
1969 15, মে	রাশিয়া	ভেনাস-5	4 মাসে 6 কোটি মাইল,	শুক্রগ্রহ পরিক্রমাকালে তৎপৃষ্ঠে বেতার-যন্ত্রযান অবতারণ ও তা থেকে শুক্রের বহু তথ্য পরিজ্ঞাত;	জানা গেছে, শুক্রগ্রহের তাপমাত্রা প্রায় 400°C, আবহমণ্ডলে সামান্য নাইট্রোজেন, অধিকাংশ CO_2 গ্যাস।

গ্রহরূপে মহাশূন্যে ভ্রাম্যমান রয়েছে। 1960 সালের 17, মার্চ তারিখে উৎক্ষিপ্ত আমেরিকার মহাশূন্য-যান পাইওনিয়ার-5 পৃথিবী থেকে প্রায় 10 লক্ষ মাইল উর্ধে উঠে সূর্য পরিক্রমা করছে এবং মহাশূণ্যের বহুবিধ আবহ-তত্ত্বের বেতার-বার্তা অতি সাফল্যের সঙ্গে পৃথিবীর গবেষণাগারে পাঠিয়েছে। এভাবে মহাশূন্যের হাল-চাল ও অবস্থাদি সম্বন্ধীয় যাবতীয় বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি জেনে বিজ্ঞানীরা আরও শক্তিশালী রকেটের সাহায্যে শুক্র ও মঙ্গল গ্রহের অবস্থাদি সমীক্ষার উদ্দেশ্যেও মহাকাশ-যান প্রেরণ করেছে। এই কার্যে রাশিয়ার **ভেনাস** শ্রেণীর ও আমেরিকার **ম্যারিনার** শ্রেণীর রকেট-যানের গ্রহ-প্রদক্ষিণ অভিযানের কয়েকটি সাফল্যের কিছু বিবরণ পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় তালিকাকারে দেওয়া হয়েছে।

মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত উল্লিখিত বিভিন্ন যন্ত্রযান, বা যান্ত্রিক গবেষণাগার থেকে সংগৃহীত মহাশূন্য ও মহাকাশের যাবতীয় তথ্য জেনে নিয়ে বিজ্ঞানীরা মহাশূন্যে, বিশেষতঃ চন্দ্রলোকে মানুষ প্রেরণ ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন ও বিশ্ব-রহস্যের সম্যক তথ্যানুসন্ধানের জন্যে মনুষ্যবাহী রকেটযান প্রেরণের পরিকল্পনা সর্বশেষে গৃহীত হয়েছে। এ-সব অভিযানের বিবরণ পরে তৃতীয় পর্যায়ে 'মহাকাশে মনুষ্য-অভিযান' শীর্ষক নিবন্ধে দেওয়া হলো।

তৃতীয় পর্যায় ঃ মহাকাশে মনুষ্য-অভিযান ঃ

পূর্ববর্তী যন্ত্র-যানগুলির সাহায্যে সংগৃহীত মহাকাশ সম্বন্ধীয় বিবিধ তথ্যাদি থেকে জানা গেছে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ও মাধ্যাকর্ষণের বাইরে মহাকাশে মানুষের দেহে নানারূপ মারাত্মক প্রতিক্রিয়া ঘটে ;—নভোমণ্ডলীয় বিভিন্নরূপ তেজঃ বিকিরণের (cosmic radiations) প্রাচুর্য, মাধ্যাকর্ষণের অভাবে বস্তুর, তথা জীবদেহের ভারহীনতা, বায়ুর অভাবে চাপহীনতা, উচ্চতার স্তর বিশেষে অতি উচ্চ ও নিম্নতাপ, মহাশূন্যের চির স্তব্ধতা ও নিরন্ধ্র অন্ধকার প্রভৃতি বহুবিধ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয় মানুষকে। এ-সব প্রতিবন্ধকতা প্রতিরোধী বিবিধ যান্ত্রিক ব্যবস্থা, নভোচারী মানুষের শ্বাস-ক্রিয়া, খাদ্য-গ্রহণ, অঙ্গ-সঞ্চালন প্রভৃতি জৈবিক ক্রিয়ার সহায়ক চাপরোধী ও অক্সিজেনবাহী বিশেষ দেহাবরক পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি, এবং নভোযানের গতি নিয়ন্ত্রণ, ধীরাবতরণ, নিরাপদে প্রত্যাবর্তন প্রভৃতি অসংখ্য সমস্যার সমাধান করতে হয়েছে। মানুষের মহাকাশ অভিযানের এই সকল প্রস্তুতিপর্বে এ-যুগের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ও প্রযুক্তিবিদ্যার চরম উৎকর্ষের অতুলনীয় সাক্ষ্য বহন করে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, 1957 সালে রাশিয়া স্পুটনিক-2 মহাকাশ-যানে 'লাইকা' নামক একটি কুকুরকে মহাকাশে পরিক্রমা করিয়ে এনেছে, কিন্তু তাকে জীবন্ত ফিরিয়ে আনতে পারে নি। তারপরে রাশিয়া আবার 1960 সালে দু'টি কুকুর, ইঁদুর, মাছি প্রভৃতি প্রাণীদের পৃথিবী পরিক্রমা করিয়ে মহাকাশ থেকে জীবন্ত অবস্থায় ভূ-পৃষ্ঠে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়। আমেরিকাও ইতিমধ্যে একবার একটি বানরকে রকেট-যানে চড়িয়ে উচ্চাকাশ পরিভ্রমণ করিয়ে জীবন্ত ফিরিয়ে এনেছিল। যাহোক, এ-সব পরীক্ষায় জীবদেহের উপরে মহাকাশের নানারূপ মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার ফলাফল পর্যবেক্ষণ করে মানুষের পক্ষে মহাকাশ অভিযানের সর্ব প্রকার নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাদি সম্পন্ন করা হয়। অতঃপর 1961 সালে রাশিয়াই প্রথম মহাকাশে মানব নভোযাত্রী প্রেরণের গৌরব অর্জন করে। পরবর্তীকালে রাশিয়া ও আমেরিকা উভয় দেশই মহাকাশে মনুষ্য-অভিযানের পরিকল্পনা পর্যায়ক্রমিকভাবে অতি সাফল্যের সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছে। মানুষের মহাকাশ-অভিযান, ঊর্ধ্বাকাশে পরিভ্রমণ, চন্দ্রে অবতরণ প্রভৃতি বহু বিস্ময়কর কৃতিত্বের ঘটনা-পঞ্জীর বিবরণ অতি ব্যাপক ও বিস্তৃত ; প্রাথমিক পর্যায়ের কয়েকটিমাত্র অভিযানের তারিখ, যানের ও নভোচারীর নাম, কিরূপ অভিজ্ঞতা ও সাফল্য অর্জিত হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেওয়া হলো।

মহাকাশে মানব-অভিযানের ধারাবাহিক পূর্ণ তালিকা লিপিবদ্ধ করা এখানে সম্ভব নয় ; বিভিন্ন উন্নততর পরিকল্পনায় এ-অভিযান ক্রমাগত অদ্যাপি চলছে। পরবর্তী আরও কয়েকটি বিশেষ চমকপ্রদ অভিযানের উল্লেখ মাত্র করা গেল : 1964 সালের 12, অক্টোবর রাশিয়া প্রথম একাধিক (মোট 3 জন) নভোচারীসহ একটি যন্ত্র-যান মহাকাশে প্রেরণ করে। 1965 সালের মার্চ মাসে রুশ নভোচারী অ্যালিক্সি লিওনভ মহাকাশ-যান থেকে বেরিয়ে যানের সঙ্গে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় মহাশূন্যে মানুষের বিচরণের প্রথম অভিজ্ঞতা লাভ করেন। 1965 সালের জুন মাসে আমেরিকা মনুষ্য-আরোহীসহ জ্যামিনি-6 ও জ্যামিনি-7 নামক মহাকাশ-যান দুটিকে মহাকাশের একই কক্ষপথে ভূ-প্রদক্ষিণকালে পরস্পরের মিলন ঘটাতে সক্ষম হয়। অতঃপর 1969 সালের 16 জানুয়ারী রাশিয়াও সোয়েজ-4 ও সোয়েজ-5 নামক মহাকাশ-যান দু'টিকে নভোচারীসহ পৃথিবী থেকে প্রায় 150 মাইল ঊর্ধ্ব কক্ষপথে পরস্পরের মিলন ঘটায়, অথচ উভয়েরই গতিবেগ তখন ছিল ঘণ্টায় 18 হাজার মাইল ;—এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার !

মহাকাশে মনুষ্য-অভিযান

উৎক্ষেপণ তারিখ	দেশ	নভোযান	নভোচারী	উর্ধ্বগমন ও পরিক্রমা	অভিজ্ঞতা	পরিণতি
1961 12, এপ্রিল	রাশিয়া	ভস্টক-1	ইউরী গ্যাগারিন	প্রায় 100 মাইল উর্ধ্বে 108 মিনিটে একবার করে পৃথিবী পরিক্রমা, পরিক্রমণ প্রায় দুই বার ;	দিনের বেলা প্রখর সূর্য থাকা সত্ত্বেও মহাকাশ ঘোর অন্ধকার, উজ্জ্বল নক্ষত্র দৃশ্যমান ; অবতরণ কালে যানের বাইরে লেলিহান আগুন, ভিতরে স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রিত তাপ ;	দেহের ভারহীন অবস্থায় নৈসর্গিক বহু চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা অর্জনান্তে নিরাপদে স্বদেশের মাটিতে অবতরণ, প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে একই দিনে।
1961 23, এপ্রিল	রাশিয়া	ভস্টক-2	তিতভ	অনুরূপ পরিক্রমা	অনুরূপ অভিজ্ঞতা ;	একই দিনে নিরাপদে ভূ-পৃষ্ঠে অবতরণ।
1961 5, মে	আমেরিকা	ফেইথ-3	এলান শেফার্ড	শতাধিক মাইল সোজা-সুজি উর্ধ্বগমন ;	অভিজ্ঞতা অপ্রচারিত ;	যাত্রার দ্বিতীয়দিনে নির্বিঘ্নে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন।
1961 21, জুলাই	আমেরিকা	ফেইথ-4	ভার্জিলগ্রেসাম	অনুরূপ উর্ধ্বগমন ;	অভিজ্ঞতা অপ্রচারিত ;	নিরাপদে প্যারাসুটযোগে প্রশান্তমহাসাগরে অবতরণ।
1962 20, ফেব্রুয়ারী	আমেরিকা	অ্যাট্‌লাস	জন গ্লেন	প্রায় 200 মাইল উর্ধ্ব কক্ষপথে প্রায় 5 ঘণ্টায় 3 বার পৃথিবী পরিক্রমা ;	উচ্চাকাশের বিভিন্ন নভঃ রশ্মির বিকিরণ প্রভাব, তাপ, চাপ প্রভৃতির অভিজ্ঞতা অর্জন ;	মোটামুটি নিরাপদে অ্যাট্‌লান্টিক মহাসাগরে যান সহ অবতরণ ও জাহাজ-যোগে নভোযাত্রীর উদ্ধার।

মহাকাশে মনুষ্য-অভিযান

উৎক্ষেপণ তারিখ	দেশ	নভোযান	নভোচারী	উর্ধগমন ও পরিক্রমা	অভিজ্ঞতা	পরিণতি
1962 11, আগস্ট	রাশিয়া	ভস্টক-3	নিকোলয়েভ	94 ঘণ্টায় 64 বার ও 71 ঘণ্টায় 48 বার একই কক্ষ-পথে কয়েক মাইল ব্যবধানে ভূ-প্রদক্ষিণ ;	পরস্পরের মধ্যে বেতার সংযোগ স্থাপন ও বার্তা বিনিময় এবং পৃথিবীর সঙ্গেও পৃথকভাবে বেতার সংযোগ অক্ষুণ্ণ ;	প্রায় 3 দিন পরে 15 আগস্ট উভয় নভোচারী নিরাপদে স্বদেশের মাটিতে মূল যন্ত্র-যানসহ অবতরণ।
1962 12, আগস্ট	”	ভস্টক-4	পপোভিচ			
1963 15, মে	আমেরিকা	ফেইথ-7	গর্ডন কুপার	তদবধি বৃহত্তম 95 ফুট দীর্ঘ অ্যাটলাস রকেট সাহায্যেপ্রায় 300 মাইল উর্ধ-কক্ষে 35 ঘণ্টায় মোট 22 বার ভূ-প্রদক্ষিণ ;	মহাকাশের বহু গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষতঃ ভারহীনতার অবস্থা ও তাৎপর্য সম্বন্ধে চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা অর্জন,	যান্ত্রিক গোলযোগ হেতু বিপদাপন্ন অবস্থায় প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে যানসহ অবতরণ।
1963 23, জুন	রাশিয়া	ভস্টক-6	ভ্যালেন্‌কোভা (প্রথম মহিলা নভোচারী	মহাশূন্যে প্রায় 300 মাইল উর্ধ-কক্ষে 48 বার ভূ-প্রদক্ষিণ ;	বহু বিষয়ে পূর্ববর্তী নভোচারীদের অনুরূপ অভিজ্ঞতা অর্জন ;	গবেষণাগারের বেতার-নির্দেশ মান্য করে নিরাপদে স্বদেশের পূর্ব নির্দিষ্ট অঞ্চলে অবতরণ।

চন্দ্রলোকে মানুষের পদার্পণ :

পূর্বেই বলা হয়েছে, 1968 সালের জুন মাসে রাশিয়া জোণ্ড-5 নামক একটি মনুষ্যহীন মহাকাশ-যান শক্তিশালী রকেটের সাহায্যে উৎক্ষিপ্ত করে চন্দ্রের স্বল্প কয়েক হাজার মাইল দূরবর্তী একটি কক্ষে প্রায় 6 দিন যাবৎ ক্রমাগত চন্দ্র প্রদক্ষিণ করায় এবং উহাকে অক্ষত অবস্থায় নিরাপদে ভূ-পৃষ্ঠে অবতরণ করাতে সক্ষম হয়। অবশ্য এই রকেট-যানে মানুষ ছিল না, ছিল একটি কচ্ছপ, এবং সেটি জীবন্তই ছিল। মানুষ না হলেও একটি প্রাণীসহ রকেট-যানের মহাকাশে চন্দ্রের অতি নিকটবর্তী (প্রায় 2,30,000 মাইল) কক্ষে চন্দ্র-পরিক্রমায় রাশিয়ার এই অভিযান বিশেষ চাঞ্চল্যকর ; এ থেকে মহাকাশে প্রাণিদেহে প্রতিক্রিয়া, চন্দ্রের আবহমণ্ডল, গঠন-প্রকৃতি প্রভৃতি বহু তথ্য জানা যায় এবং বিজ্ঞানীরা মানুষের চন্দ্রাভিযানের প্রচেষ্টায় ব্রতী হন। অতঃপর অবশ্য মানব মহাকাশচারীসহ চন্দ্রাভিযানের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় আমেরিকাই প্রথম সাফল্য অর্জন করে এবং চন্দ্র-পৃষ্ঠে মানুষের প্রথম পদার্পণ সম্ভব হয়।

মানুষের চন্দ্রাভিযানের যান্ত্রিক ব্যবস্থাদি প্রযুক্তিবিদ্যার চরম নিদর্শন ; যেমন জটিল, তেমনই রোমাঞ্চকর। এ-সব বিবরণ স্বল্প পরিসরে এখানে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। মানুষের চন্দ্রাভিযানে আমেরিকার 'অ্যাপোলো' নামক যানে মহাকাশ-যাত্রার পরিকল্পনা সাফল্যের সঙ্গে 1969 সাল থেকেই ধীরে-ধীরে অগ্রসর হয় ; তিন জন মহাকাশচারীসহ অ্যাপোলো-8 চাঁদের পরিমণ্ডল ঘুরে আসে ; অ্যাপোলো-10 নামক মূল যানের তিন জন মহাকাশচারীর মধ্যে দু'জন ছোট একটি চান্দ্র যানে চড়ে চন্দ্রের মাত্র 10 মাইল ব্যবধানে প্রদক্ষিণ করে আসে। অতঃপর 1969 সালের 16ই জুলাই অ্যাপোলো-11 মহাকাশ-যান থেকে মনুষ্য-অভিযাত্রী সর্বপ্রথম চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করে, এবং বিজয়-ফলক ও জাতীয় পতাকা চন্দ্রে প্রোথিত করে এবং প্রায় 11 দিন পরে 24, জুলাই নিরাপদে ভূতলে প্রত্যাবর্তন করে। প্রায় একই সময় রাশিয়ার লুনা-15 নামক মনুষ্যবিহীন মহাকাশ-যান চাঁদের ভূমিতে অবতরণ করে এবং চন্দ্রপৃষ্ঠের বহু তথ্যের বেতার-বার্তা পৃথিবীতে পাঠায়, কিন্তু কিছুকাল পরে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। রাশিয়ার এরূপ যান্ত্রিক লুনা-চন্দ্রাভিযান ও আমেরিকার মনুষ্যবাহী অ্যাপোলো-চন্দ্রাভিযান উত্তরোত্তর উন্নত পদ্ধতিতে চলতে থাকে। এ-সব অভিযানের নভোযান ও নভোচারীদের নাম, সময়-কাল, চন্দ্রপৃষ্ঠের সংগৃহীত তথ্যাদি সংক্ষেপে নিম্নলিখিত কালানুক্রমিক তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হলো :

মানুষের চন্দ্রাভিযান

উৎক্ষেপণ তারিখ	দেশ	নভোযান	নভোচারী	সার্থকতা ও সংগ্রহ
1969 13, জুলাই	রাশিয়া	লুনা-15	মনুষ্যবিহীন	8 দিন পরে 21, জুলাই চাঁদে যন্ত্র-যান অবতরণ; বেতার মাধ্যমে চন্দ্রপৃষ্ঠের বহু তথ্য প্রেরিত, কিন্তু বিশ্বে অপ্রকাশিত; চন্দ্রের মাটি-পাথর কিছু সংগ্রহ করে আনতে পারেনি। যন্ত্রযানটি নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করে নি।
1969 16, জুলাই	আমেরিকা	অ্যাপোলো-11	3-জন: নীল আমস্ট্রং, এডুইন আলড্রিন ও মাইকেল কলিন্স	প্রদক্ষিণরত মূল যান থেকে বেরিয়ে 'ঈগল' নামক ক্ষুদ্র চান্দ্রযানে চড়ে 21, জুলাই চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের প্রথম পদার্পণ, আমেরিকার পতাকা ও স্মারক বিজয়-ফলক স্থাপন, চাঁদের মাটি ও প্রস্তরখণ্ড সংগ্রহ, চন্দ্র-পৃষ্ঠে পদচারণা, নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিভিন্ন যন্ত্র চন্দ্রপৃষ্ঠে স্থাপন, প্রত্যাবর্তনকালে প্যারাস্থটযোগে মূল যান ছেড়ে 24 জুলাই সকলেই নিরাপদে ভূপৃষ্ঠে প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব-নির্দিষ্ট অঞ্চলে অবতরণ।
1969 14, নভেম্বর	আমেরিকা	অ্যাপোলো-12	3-জন: চার্লস কনরাড, অ্যালান বীন ও রিচার্ড গর্ডন	রিচার্ড গর্ডন মূল যানে চন্দ্র প্রদক্ষিণ করতে থাকে; অপর দুই অভিযাত্রী ক্ষুদ্র চান্দ্রযানে করে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ; বিবিধ তথ্যানুসন্ধানে 31 ঘণ্টা কাটিয়ে 24, নভেম্বর মূল যানে ফিরে তিনজন অভিযাত্রীই ভূপৃষ্ঠের প্রশান্ত মহাসাগরে অবতরণ ও জাহাজযোগে উদ্ধার।

মানুষের চন্দ্রাভিযান

উৎক্ষেপণ তারিখ	দেশ	নভোযান	নভোচারী	সার্থকতা ও সংগ্রহ
1970 12, এপ্রিল	আমেরিকা	অ্যাপোলো-13	3 জন : জেম্‌স লোভেল, ফ্রেড হেস ও জন সুইগার্ট	চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ সম্ভব হয়নি ; যান্ত্রিক গোলযোগে বিশেষ বিপদাপন্ন অবস্থায় পৃথিবীর গবেষণাগারের বেতার নিয়ন্ত্রণে 19, নভেম্বর প্রশান্ত মহাসাগরে অবতরণ ও যাত্রীদের উদ্ধার।
1970 13, সেপ্টেম্বর	রাশিয়া	লুনা-16	মনুষ্যবিহীন (যান্ত্রিক কৌশলে মনুষ্যবৎ কার্যকলাপ নিষ্পন্ন)	চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ ও বেতার-নিয়ন্ত্রিত যান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় চন্দ্রপৃষ্ঠেব মৃত্তিকা-প্রস্তরাদি সংগ্রহ, চাঁদের যাবতীয় আবহ-তথ্যাদি সম্পর্কে বেতারবার্তা প্রেরণ ; আবার স্বয়ংক্রিয়ভাবে চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে 24, সেপ্টেম্বর স্বদেশের কাজাকিস্তান অঞ্চলে মূল যানটির প্রত্যাবর্তন।
1970 17, নভেম্বর	রাশিয়া	লুনা-17	মনুষ্যবিহীন যন্ত্রযান	বিভিন্ন জটিল যন্ত্রসজ্জিত লুনোখোদ-1 নামক আট চাকার একটি স্বয়ংচলমান শকট চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতারণ ; দিনের বেলা (1 চান্দ্রদিন = পৃথিবীর 14 দিন) সৌর শক্তিতে সক্রিয় হয়ে শকটটির চন্দ্রপৃষ্ঠে প্রায় 7 কিলোমিটার পরিভ্রমণ ; চন্দ্রের বিস্তৃত অঞ্চলের বহু তথ্যপূর্ণ আলোকচিত্র, বেতার-বার্তা পৃথিবীতে প্রেরণ ; 1971, মার্চ পর্যন্ত এ যান্ত্রিক অভিযান চলে।

অতঃপর, 1971, 26 জুলাই আমেরিকা কর্নেল স্কট, জেমস ডারউইন ও মেজর ওয়ার্ডেন নামক তিন জন অভিযাত্রীসহ অ্যাপোলো-15 এবং 1972, 16 এপ্রিল পুনরায় জন ইয়ং, চার্লস ডিউক ও কেন ম্যাটিংলি নামক নভোযাত্রীত্রয় সহ অ্যাপোলো-16 চন্দ্রপৃষ্ঠের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করে। উভয় চন্দ্রাভিযানই সাফল্যমণ্ডিত হয়, সকল অভিযাত্রী নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে আসেন। আমেরিকার সর্বশেষ (1972, 7 ডিসেম্বর) চন্দ্রাভিযানে অ্যাপোলো-17 ইউজিন সারনান, হ্যারিসন এম. স্মিট ও রোনোল্ড ইভান্স নামক তিন নভোযাত্রী চান্দ্রযানে চড়ে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করে এবং ব্যাটারি-চালিত গাড়ীতে চড়ে চাঁদের ভূমিতে কয়েকদিন বিচরণ করেন। রাশিয়ার মহাকাশযান লুনা-21 গত 1973, 16 জানুয়ারী মূল রকেট-যান থেকে লুনাখোদ-2 নামক স্বয়ংক্রিয় চান্দ্রযান চন্দ্রপৃষ্ঠে নামিয়ে বহু তথ্য সংগ্রহ করেছে।

আমেরিকা ও রাশিয়ার এ-সব চান্দ্র অভিযানে চন্দ্রের আবহমণ্ডল, ভূ-প্রকৃতি ও মৃত্তিকা-প্রস্তরাদি সম্বন্ধে সম্যক তথ্য মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছে। আমেরিকার মত রাশিয়া মনুষ্য-অভিযাত্রী না পাঠিয়েও অভাবনীয় যান্ত্রিক কৌশলে চন্দ্রের সকল তথ্য জেনেছে এবং চন্দ্র সম্বন্ধে উভয় দেশের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অনুরূপ ও অভিন্ন বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। জানা গেছে, চন্দ্রের আবহমণ্ডল মনুষ্য-বাসোপযোগী নয়; কিন্তু আহরিত চান্দ্রশিলা, মাটি-প্রস্তরাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানা গেছে, চন্দ্রপৃষ্ঠে বহু মূল্যবান খনিজ সম্পদ রয়েছে। দুঃসাহসিক মানুষ তাহার বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার আরও উৎকর্ষ সাধন করে হয়তো একদিন চন্দ্রপৃষ্ঠের প্রভূত খনিজ সম্পদ আহরণ করে পৃথিবীতে আনবে; এমন কি, চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের সহজ যাতায়াত ও বসতি স্থাপন করাও সম্ভব হবে বলে কেহ-কেহ মনে করেন।

ব্যবহৃত পরিভাষা

বৈজ্ঞানিক ইংরেজী শব্দের বাংলা পরিভাষা অনেক সময় প্রকৃত অর্থ-বোধক হয় না; কোন-কোন ক্ষেত্রে বাংলা প্রতিশব্দ গঠন করাও অসম্ভব হয়ে পড়ে, বা নিরর্থক মনে হয়। এ-জন্যে এ পুস্তকের অনেক স্থানেই ইংরেজী পারিভাষিক শব্দ বিশেষ তাৎপর্য্য রক্ষা করে বাংলা বানানে ব্যবহার করা হয়েছে। এর ফলে বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি পাবে, ক্রমে আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক শব্দসম্ভার বাংলা ভাষার অঙ্গীভূত হয়ে অনেক অসুবিধা দূর করবে বলে আমাদের ধারণা।

যে-সব বাংলা পরিভাষা বহু প্রচলিত ও সহজবোধ্য বলে এ পুস্তকে ব্যবহার করা হয়েছে পাঠকবর্গের সুবিধার জন্যে সে-গুলোর একটা বর্ণানুক্রমিক তালিকা মূল ইংরেজী শব্দ সহ নিম্নে দেওয়া হলো:

অক্ষ—axis
অক্ষদণ্ড—axle
অক্ষরেখা—latitude line
অক্ষিপট—retina
অগ্ন্যাশয়—pancreas
অঙ্গার—carbon
অঙ্গারাম্ল—carbonic acid
অজৈব—inorganic
অণু—molecule
অণুবীক্ষণ—microscope
অতি-বেগুনী—ultra-violet
অতিভুজ—hypotenuse
অধঃক্ষেপ—precipitate
অধিবৃত্ত—parabola
অনচ্ছ—opeque
অনন্ত—infinity
অন্ত্র—bowel, intestine
অন্তস্থ—internal (angle)
অনার্দ্র—anhydrous
অনুঘটক—catalyst
অনুঘটন—catalysis
অনুপাত—ratio
অনুপ্রভা—phosphorescence
অনুভূমিক—horizontal
অপেক্ষক—function
অপেরণ—aberration

অবতল—concave
অবলোহিত—infra-red
অবীজপত্রী—acotyledon
অভ্র—mica
অভিকর্ষ—gravity
অভিলম্ব—normal
অভিব্যক্তি—evolution
অয়নান্ত—solistice
অযুগ্ম—odd
আকর—mine
আকরিক—mineral
আকর্ষ—tendril
আকর্ষণ—attraction
আঙ্গিক—qualitative
আগ্নেয়—igneous
আণবিক—molecular
আর্দ্রতা—humidity
আত্তীকরণ—assimilation
আনুপাতিক—proportional
আপতিত রশ্মি—incident ray
আপতন কোণ—angle of incidence
আপাত—apparent
আপেক্ষিক গুরুত্ব—specific gravity
আপেক্ষিকতা বাদ—theory of relativity
আধান—charge
আবেশ—induction
আয়তন—area, volume
আয়তক্ষেত্র—rectangle
আয়নায়িত—ionised
আলকাত্‌রা—coal-tar
আলেয়া—ignis-fatuus
আসক্তি—affinity
আহিত—charged (electrically)
আহ্নিক—diurnal
ইক্ষু শর্করা—cane sugar
ইন্ধন—fuel
ঈষদচ্ছ—translucent
ঋজুরেখ—rectilinear
ঋণ তড়িৎ—negative electricity
উৎপাদক—factor
উত্তল—convex
উদ্‌বায়ী—volatile
উদ্ভিদ কুল—flora
উদর—abdomen
উদরপদ—gastropod
উদস্থিতি বিদ্যা—hydrostatics
উদাসীন—neutral
উপগ্রহ—satellite
উপক্ষার—alkaloid
উপজাত—by-product
উপচ্ছায়া—penumbra
উপবৃত্ত—ellipse
উপাদান—constituent
উভচর—amphibious
উল্কা— meteor
উল্কাপিণ্ড—meteorite
উষ্ণতা—temperature
একক—unit
এককেন্দ্রীয়—concentric
একতলীয়—coplanar
একবীজপত্রী—monocotyledon
একলিঙ্গ—unisexual
একান্তর—alternate (angle)
কক্ষ—orbit
কণিকা—particle

কর্কটক্রান্তি—summer solistice
কর্কটক্রান্তি বৃত্ত—tropic of cancer
করোটি—skull
কঠিন—solid
কষায়—astringent
কর্পূর—camphor
কলিচুন—quicklime
কাচীয়—vitreous
কিমিয়া—alchemy
কীটাণু—animalcule
কু-মেরু—south pole
কুণ্ডলী—coil
কৃষ্ণসীস—graphite
কেন্দ্র—centre
কেন্দ্রাতিগ—centrifugal
কেন্দ্রীণ—nucleus
কেন্দ্রাভিগ—centripetal
কৈশিক—capillary
কোরক—bud
ক্বাথ—decoction
ক্ষরণ—discharge, secretion
ক্ষার—alkali
ক্ষারীয়, ক্ষারধর্মী—alkaline
ক্ষারকীয়—basic
ক্ষারক—base
ক্ষমতা—power
খরতা—hardness
খর জল—hard water
খল—mortar
খনিজ—mineral
খনিজ লবণ—rock salt
খমির—ferment
খ-গোল—celestial sphere
খড়ি—chalk
গতি বিদ্যা—dynamics
গতি—motion
গতীয়—kinetic, dynamic
গলন—fusion
গলনাংক—melting point
গন্ধক—sulphur
গর্ভকেশর—pistil
গড়—average
গালা—lac
গুণক—multiplier
গুণনীয়ক—factor
গোমেদ—zircon
গ্রহ—planet
গ্রহাণুপুঞ্জ—asteriods
গ্রহণ—eclipse
গ্যাসীয়—gaseous
ঘন—cube, cubic, solid
ঘনমূল—cube root
ঘনাংক—density
ঘনীভূত—condenced
ঘর্ষ-তড়িৎ—frictional electricity
ঘাত—index, power
চান্দ্র—lunar
চাপ (বৃত্ত)—arc
চাপ—pressure
চাপমান যন্ত্র—barometer
চাপিত—compressed
চুম্বক—magnet
চৌম্বক, চুম্বকীয়—magnetic
চুল্লী—furnace
চুন—lime
চুনাপাথর—lime stone
চিহ্ন—symbol, sign
ছত্রাক—fungus
ছেদ—intersection, section
ছেদক—secant
ছায়া—shadow
ছায়াপথ—galaxy

জলীয়—aqueous
জ্বলন—ignition
জ্বলনাংক—ignition point
জোয়ার—flow-tide
জনন-কোষ—germ-cell
জলচর, জলজ—aquatic
জড়—matter
জাড্য—innertia
জীববিদ্—biologist
জীব—organism, animal
জীবাণু—bacteria, microbe
জীবাশ্ম—fossil
জৈব—organic
জ্যা—chord
ঝালাই—soldering
টান—tension, strain
তল—surface, face
তরল—liquid
তরলীভবন—liquifaction
তরঙ্গ—wave
তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য—wave-length
তাপ—heat
তাপমাত্রা—temperature
তাপীয়—thermal
তড়িৎ—electricity
তড়িৎ-দ্বার—electrode
তড়িৎ-বিশ্লেষণ—electrolysis
তড়িৎ-চক্র—electric circuit
তন্ত্র—system
তুলা যন্ত্র—balance
তুল্যাংক—equivalent
তেজস্ক্রিয়—radio-active
তেজস্ক্রিয়তা—radio-activity
তৌলিক—gravimetric
তুঁতে, তুঁতিয়া—blue vitriol, (copper sulphate)
তরুণাস্থি—cartilage
দণ্ড—rod
দল—petal
দহন—combustion
দাহ্য—combustible
দ্রব, দ্রবণ—solution
দ্রবিত—dissolved
দ্রাবক—solvent
দ্রাব্য—solute
দ্রবণীয়—soluble
দস্তা—zinc
দ্রাঘিমা—longitude
দূরবীক্ষণ—telescope
দোলক—pendulum
দোলন—oscillation
ধন-তড়িৎ—positive electricity
ধমনী—artery
ধাতু—metal
ধাতুকল্প—metalloid
ধাতুমল—slag
ধাতুবিদ্যা—metallurgy
ধাতু-সংকর—alloy
ধারকত্ব—capacity
ধ্রুব তারা—pole star
ধ্রুবক রাশি—constant quantity
নিরক্ষ রেখা—equator
নিরুদক—anhydride
নিরুদন—dehydration
নিয়ম—law
নিশাদল—sal-ammoniac
নমনীয়—plastic
নীলকান্ত, নীলা—sapphire
নীহারিকা—nebula
নিষ্কাশন—extraction
নিষ্ক্রিয়—inert, inactive
পদ্মরাগ—ruby

পরম—absolute
পরজীবী—parasite
পরমাণু—atom
পর্যায়ক্রমিক—periodic
পরিসীমা—perimeter
পরিবর্তী—alternating (current)
পরিবাহী—conductor
পরিবহন—conduction
পরিচলন—convection
পারদ—mercury
পারদ-সংকর—amalgam
পারমাণবিক—atomic
পাতন—distillation
পান দেওয়া—tempering
প্লবতা—buoyancy
প্রতিক্রিয়া—reaction
প্রতিফলন—reflection
প্রতিবিম্ব—image
প্রতিবিষ—antitoxin
প্রতিসরণ—refraction
প্রতিজ্ঞা—proposition
প্রজন-বিদ্যা—genetics
প্রবাহ—current
প্রাণিকুল—fauna
পিত্ত—bile
পিত্তাশয়—gall-bladder
পাকস্থলী—stomach
প্রচ্ছায়া—umbra
প্রশমন—neutralisation
ফট্‌কিরি—alum
ফল-শর্করা—fruit-sugar
ফলক—blade
ফলিত বিজ্ঞান—applied science
বক-যন্ত্র—retort
বলবিদ্যা—mechanics
বল—force
ব্যস্ত অনুপাত—inverse ratio
বর্গ, বর্গফল—square
বর্গমূল—square root
বর্ণালি—spectrum
বৃত্ত—circle
বৃত্তাংশ—sector
বায়ুমণ্ডল—atmosphere
বাধা (তড়িৎ)—resistance
বেগ—velocity
বেধ—thickness
বিকিরণ—radiation
বিচ্ছুরণ—scattering
বিকর্ষণ—repulsion
বিদ্যুৎ, তড়িৎ—electricity
বিবর্তন—deviation
বিবর্ধন—magnification
বিভব—potential (electric)
বিস্ফোরণ—explosion
বিশ্লেষণ—analysis
বিদাহী—caustic
ব্যবহারিক—applied
বেতার—wireless
বেলে-পাথর—sand stone
বিষুব রেখা (বৃত্ত)—equator
বীজ, বীজাণু—germ
বীজঘ্ন—germicide
বীজবারক—antiseptic
বাতান্বিত—ærated
ভর—mass
ভরবেগ—momentum
ভার—weight
ভার-কেন্দ্র—centre of gravity
ভূমি—base
ভস্ম—calx
ভস্মীকরণ—calcination
ভাস্বর—incandescent

ভূষা—lamp black
মৌলিক পদার্থ, মৌল—element
মিনা—enamel
মিনা করা—enamelling
মুদ্রাশঙ্খ—litharge
মরিচা—rust (iron-oxide)
মিশ্র, মিশ্রণ—mixture
মকরক্রান্তি—winter solistice
মঙ্গল গ্রহ—mars
মজ্জা—pith, marrow
মধ্যরেখা—meridian
মধ্যচ্ছদা—diaphragm
মমছাল, মনঃশিলা—realgar
মরীচিকা—mirage
মহাকর্ষ—gravitation
মাক্ষিক—pyrite
মান, মূল্য—value
মানচিত্র—map
মানমন্দির—observatory
মাত্রিক—quantitative
মাধ্যম—medium
মেরু—pole
মৃদু জল—soft water
মৃদু অ্যাসিড—diluted acid
রঞ্জক—dye
রঞ্জন—dying
রজন—resin
রশ্মি—ray
রক্তরস—plasma
রক্তকোষ—blood-cell
রঙ্গ, রাং—tin
রসায়ন—chemistry
রসাঞ্জন—antimony sulphide
রস-কর্পূর—corrosive sublimate
রাশি—quantity
রাসায়নিক—chemical, chemist
লঘু—dilute, light
লঘুকরণ—reduction, dilution
লম্ব—perpendicular
লসিকা—lymph
লাক্ষা, গালা—lac
লীন—latent
লৈখিক—graphical
শতকরা—per cent
শক্তি—energy
শূন্য—vaccum, zero
শিশিরাংক—dew point
শোষণ—absorption
শীর্ষ—vertex
শর্করা—sugar
শিরা—vein
শ্বেতসার—starch
শনি গ্রহ—saturn
শুক্র গ্রহ—venus
শ্রেণী—series, class
শারীরবৃত্ত—physiology
শ্বাসতন্ত্র—respiratory system
সঞ্চার-পথ—locus
সক্রিয়—active
সংপৃক্ত—saturated
সংপৃক্তি—saturation
সংশ্লেষণ—synthesis
সমবায়—combination
সমীকরণ—equation
সমানুপাত—direct proportion
সমাধান—solution
সফেদা—white lead
সীস সিন্দুর—minium
সীসা, সীসক—lead
সূচক—index, indicator
সূত্র—formula, law
সুগ্রাহী, সুবেদী—sensitive

সংকেত—formula
সংকর ধাতু—alloy
সীসাঞ্জন—galena
সীসশ্বেত—white lead
সেঁকো—white arsenic
সুষুম্না কাণ্ড—spinal chord
সোহাগা—borax
সোরা—saltpetre
সৌর কলঙ্ক—sun-spot
স্থিতিস্থাপক—elastic
স্নেহ পদার্থ—fat
স্থিতিবিদ্যা—statics
স্থৈতিক—potential (energy)
স্পন্দন—vibration
স্পন্দিত—vibrated
স্ফুটনাংক—boiling point
স্ফটিক—crystal
স্ফটিকীকরণ—crystallisation
স্ফটিকাকার—crystaline
হরিতাল—orpiment
হিঙ্গুল—cinnabar
হিমায়ী মিশ্রণ—freezing mixture
হিমায়ক যন্ত্র—refrigerator
হিমাংক—solidifying point
হিরাকস—green vitriol
হীরক—diamond

———

পারিভাষিক শব্দের তালিকা

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংকলিত পরিভাষা অবলম্বনে)

Physics—*পদার্থবিদ্যা*

Absolute—পরম
Absorbent—শোষক
Absorption—শোষণ
Aberration—অপেরণ
Adjustment—উপযোজন
Achromatic—অবার্ণ
Adhesion—আসঞ্জন
Alternating current—পরিবর্তী প্রবাহ
Amplitude—বিস্তার
Apperatus—যন্ত্র
Astigmatism—বিষম দৃষ্টি
Asymmetric—প্রতিসম
Atmosphere—বায়ুমণ্ডল
Balance—তুলা যন্ত্র
Barometer—চাপমান যন্ত্র
Beat—অধিকম্প
Bob—দোলক পিণ্ড
Boiling—স্ফুটন
" point—স্ফুটনাংক
Buoyancy—প্লবতা
Calibration—ক্রমাঙ্কন
Capacity—ধারকত্ব
Capillary—কৌশিক
Charge—আধান
Charged—আহিত
Chord (music)—স্বর-সংগতি
Coefficient—গুণাঙ্ক
Cohesion—সংসক্তি
Coil—কুণ্ডলী
Colour—বর্ণ
Complementary—পরিপূরক
Compass—দিগ্‌দর্শন যন্ত্র
Compensated pendulum—প্রতিবিহিত দোলক
Compression—সংনমন
Concave—অবতল
Concentration (of rays)—সমাহরণ
Concentrated—সমাহৃত
Condensation—ঘনীভবন, ঘনীকরণ
Conduction—পরিবহণ
Conductivity—পরিবাহিতা
Conductor—পরিবাহী
Conservation of energy—শক্তির নিত্যতা
Constant—ধ্রুবক
Constant quantity—ধ্রুব রাশি
Contraction—সংকোচন
Convection—পরিচলন
Convergent—অভিসারী
Convex—উত্তল
Crystal—স্ফটিক
Crystalline—স্ফটিকাকার
Crystallisation—স্ফটিকীকরণ
Current—প্রবাহ
Deffused light—বিক্ষিপ্ত রশ্মি
Deflection—বিক্ষেপ

Density—ঘনত্ব, ঘনাংক
Dew point—শিশিরাংক
Diamagnetism—তির্যশ্চুম্বকতা
Dip—বিনতি
Direct current—সমপ্রবাহ
Discharge—ক্ষরণ, মোক্ষণ
Dispersion (of light)—বিচ্ছুরণ
Divergent—অপসারী
Divisibility—বিভাজ্যতা
Elasticity—স্থিতিস্থাপকতা
Elastic—স্থিতিস্থাপক
Electricity—তড়িৎ, বিদ্যুৎ
Electrode—তড়িদ্দ্বার
Electrolysis—তড়িদ্বিশ্লেষণ
Electromagnet—তড়িচ্চুম্বক
Energy, kinetic—গতিশক্তি
Energy, potential—স্থিতিশক্তি
Electromotive—তড়িচ্চালক
Evaporation—বাষ্পীভবন, বাষ্পীকরণ
Expansion—সম্প্রসারণ
Fluid—তরল, বায়ব
Fluorescence—প্রতিপ্রভা
Fluorescent—প্রতিপ্রভ
Formula—সংকেত
Freezing point—হিমাংক
Friction—ঘর্ষণ
Frictional electricity—ঘর্ষতড়িৎ
Gravitation—মহাকর্ষ
Green—হরিৎ
Heat—তাপ, তাপশক্তি
Harizontal—অনুভূমিক
Humidity—আর্দ্রতা
Hydraulic—ঔদক
Hydrostatics—উদ্স্থিতি বিদ্যা
Image—প্রতিবিম্ব
Image, real—সদ্বিম্ব
Image, virtual—অসদ্বিম্ব
Impenetrability—অভেদ্যতা
Incidence—আপতন
Incident Ray—আপতিত রশ্মি
Induction—আবেশ
Inertia—জাড্য, নিষ্ক্রিয়তা
Infra-red—অবলোহিত
Insulation—অন্তরণ
Insulated—অন্তরিত
Insulator—অন্তরক
Ionised—আয়নিত
Latent—লীন
Law—নিয়ম, সূত্র
Liquifaction—গলন, তরলীভবন
Lodestone—চুম্বক পাথর
Magnet—চুম্বক
Magnetic—চুম্বকীয়, চৌম্বক
Magnetism—চৌম্বকত্ব
Magnetisation—চুম্বকন
Magnification—বিবর্ধন
Matter—পদার্থ
Medium—মাধ্যম
Melting point—গলনাংক
Microscope—অণুবীক্ষণ
Mirage—মরীচিকা
Mirror—দর্পণ
Negative electricity—ঋণ-তড়িৎ
Neutral—উদাসীন
Non-conductor—অপরিবাহী
Normal—অভিলম্ব
Opeque—অনচ্ছ
Orange (colour)—নারঙ্গ
Oscillation—দোলন
Parallax—লম্বন

Pendulum—দোলক
Penumbra—উপচ্ছায়া
Period—পর্যায়, কাল
Periodic—পর্যাবৃত্ত
Periodicity—পর্যাবৃত্তি
Permeable—প্রবেশ্য
Phase—দশা
Phosphorescence—অনুপ্রভা
Phosphorescent—অনুপ্রভ
Piston—ডাঁটি, দণ্ড
Polarization (light)—সমবর্তন
Pole—মেরু
Porous—বহুরন্ধ্র, সরন্ধ্র
Porocity—সরন্ধ্রতা, সচ্ছিদ্রতা
Positive electricity—ধনতড়িৎ
Potential (electric)—বিভব
Pressure—চাপ
Pump—পাম্প
Radiation—বিকীরণ
Rarefication—তনুকরণ
Ray—রশ্মি
Reaction—প্রতিক্রিয়া
Reflection—প্রতিফলন
Reflected—প্রতিফলিত
Refraction—প্রতিসরণ
Refracted—প্রতিসরিত
Refraction (angle of)—প্রতিসরণ কোণ
Refracting index—প্রতিসরণাংক
Refrigeration—হিমায়ন
Relative—আপেক্ষিক
Relativity—আপেক্ষিকতা
,, (theory of)—আপেক্ষিকতা বাদ
Repulsion—বিকর্ষণ
Resistance—রোধ
Resonance—অনুনাদ
Response—সাড়া
Saturation—সংপৃক্তি
Sensitive (balance)—সুবেদী
,, (photo plate)—সুগ্রাহী
Shade, Shadow—ছায়া
Solid—কঠিন, ঘনবস্তু
Solidification—ঘনীভবন, ঘনীকরণ
Source—উৎস, প্রভব
Specific gravity—আপেক্ষিক গুরুত্ব
Spectrum—বর্ণালি
Standard—প্রমাণ
Strain—টান
Stress—পীড়ন
Suction—চোষণ
Symmetry—প্রতিসাম্য
Symmetrical—প্রতিসম
Synchronism—সমলয়
Telescope—দূরবীক্ষণ, দূরবীন
Television—দূরেক্ষণ
Temperature—উষ্ণতা
Tension—টান
Thermal—তাপীয়
Thermometer—উষ্ণতামান যন্ত্র
Translucent—ঈষদচ্ছ
Transparent—স্বচ্ছ
Ultraviolet—অতি-বেগুনী
Umbra—প্রচ্ছায়া
Unit—একক, মাত্রা
Vacuum—শূন্য
Vapour—বাষ্প
Vibration—কম্পন, স্পন্দন
Violet—বেগুনী
Viscosity—সান্দ্রতা
Viscous—সান্দ্র
Vortex—আবর্ত

Wave—তরঙ্গ
Wave-length—তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য
X'ray—এক্স-রশ্মি, রঞ্জন-রশ্মি
Yellow—পীত

Mechanics—*বলবিদ্যা*

Acceleration—ত্বরণ
Attraction—আকর্ষণ
Axle—অক্ষদণ্ড
Capacity—সামর্থ্য, ধারকত্ব
Centre of gravity—ভারকেন্দ্র
Centrifugal—কেন্দ্রাতিগ, অপকেন্দ্র
Centripetal—কেন্দ্রাভিগ, অভিকেন্দ্র
Conservation—নিত্যতা
Density—ঘনাংক
Dynamic—গতীয়
Dynamics (Kinetics)—গতিবিদ্যা
Elastic—স্থিতিস্থাপক
Energy—শক্তি
Equilibrium—সাম্য, স্থিতি
Force—বল
Friction—ঘর্ষণ
Fulcrum—আলম্ব
Gravitation—মহাকর্ষ
Gravity—অভিকর্ষ
Horizontal—অনুভূমিক
Impact—সংঘাত
Impulse, blow—ঘাত
Inclined—নত
Inertia—জাড্য
Kinematics—স্থিতিবিদ্যা
Kinetic—গতীয়, চল-
Kinetics (Dynamics)—গতিবিদ্যা
Mass—ভর
Matter—জড়
Moment—ভ্রামক
Momentum—ভরবেগ
Motion—গতি
Neutral—উদাসীন
Parallelogram of forces—বল-সামন্তরিক
Pendulum—দোলক
Period—দোলনকাল, পর্যায়কাল
Periodic—পর্যাবৃত্ত
Pitch, step (of screw)—থাক
Plane—সমতল
Plumb line—লম্বসূত্র, ওলন-দড়ি
Position—অবস্থিতি
Potential (energy)—স্থৈতিক
Power—ক্ষমতা
Pressure—চাপ
Pull—টান
Pulley—কপিকল
Push—ঠেলা
Reaction—প্রতিক্রিয়া
Repulsion—বিকর্ষণ
Resistance—বাধা
Rest—স্থিতি
Resultant—ফল, লব্ধি
Retardation—মন্দন
Revolution—পরিক্রমণ
Speed—দ্রুতি
Stable—সুস্থিত, সুপ্রতিষ্ঠ
Static—স্থিতীয়
Statics—স্থিতিবিদ্যা
Tension—টান

Thrust—ঘাত
Unstable—অপ্রতিষ্ঠ, ভুস্থিত
Velocity—বেগ
Vertical—উল্লম্ব, খাড়া
Weight—ভার, ওজন
Work—কার্য

রসায়ন বিদ্যা—Chemistry

Absolute alcohol—নির্জল [অ্যালকোহল
Active—সক্রিয়
Acid—অ্যাসিড
Acidimetry—অম্লমিতি
Affinity—আসক্তি
Alchemy—কিমিয়া
Alkali—ক্ষার
Alkalimetry—ক্ষারমিতি
Alkaline—ক্ষারীয়
Alkaloid—উপক্ষার
Alloy—ধাতু-সংকর
Alum—ফট্‌কিরি
Amalgam—পারদ-সংকর
Amorphous—অনিবন্ধী, অনিয়তাকার
Analysis—বিশ্লেষণ
,, gravimetric—তৌলিক "
,, qualitative—আঙ্গিক "
,, quantitative—মাত্রিক "
,, volumetric—আয়তন "
Anhydride—নিরুদক
Anhydrous—অনার্দ্র
Annealing—কোমলায়ন
Aqueous—জলীয়
Astringent—কষায়
Atom—পরমাণু
Atomic—পারমাণবিক
Balance—তুলা, তুলা-যন্ত্র
Base—ক্ষারক
Basic—ক্ষারকীয়
Basic salt—ক্ষার-লবণ
Bell metal—কাঁসা, কাংস্য
Bellows—হাপর, ভস্ত্রা
Bi-valent—দ্বিযোজী
Bleaching—বিরঞ্জন
Binary compound—দ্বিমৌল যোগ
Blow pipe—বাঁক-নল, ফুঁক-নল
Blue vitriol—তুঁতিয়া, তুত্থ
Bone black—অস্থি-অঙ্গার
Boiling—স্ফুটন, ফোটা
Boiling point—স্ফুটনাংক
Borax—সোহাগা
Bubble—বুদ্‌বুদ
Burner—দীপ
By-product—উপজাত
Calcination—ভস্মীকরণ
Calx—ভস্ম
Camphor—কর্পূর
Cane sugar—ইক্ষু-শর্করা
Capillary—কৈশিক
Carbon—অঙ্গারক, অঙ্গার
Cast iron—ঢালাই লোহা
Catalyst—অনুঘটক
Catalysis—অনুঘটন
Caustic—বিদাহী
Caustic alkali—তীক্ষ্ণ ক্ষার
Charcoal—কাঠকয়লা
Chemical—রাসায়নিক

Chemical action—রাসায়নিক ক্রিয়া
Chemical affinity—রাসায়নিক আসক্তি
,, activity— " সক্রিয়তা
,, composition— " গঠন
,, formula— " সংকেত
,, law— " সূত্র
,, method— " পদ্ধতি
,, theory— " বাদ
Chemistry—রসায়ন
,, analytical—বৈশ্লেষিক রসায়ন
,, applied—ফলিত "
,, physical—ভৌত "
,, practical—ব্যবহারিক "
,, theoretical—তত্ত্বীয় "
Cinnabar—হিঙ্গুল
Coal-tar—আলকাত্‌রা
Combustion—দহন
Combustible—দাহ্য
Compound—যৌগিক পদার্থ, যৌগ
Composition—গঠন
Condenser—শীতক
Copper pyrites—তাম্র মাক্ষিক
,, sulphate—তুঁতে, তুঁতিয়া
Corrosive—ক্ষারী, প্রদাহী
,, sublimate—রস-কর্পূর
Crystal—স্ফটিক
Crystalline—স্ফটিকাকার
Decomposition—বিয়োজন
Decomposed—বিয়োজিত
Decoction—কাথ, ক্বথন
Dehydrated—নিরুদিত
Dehydration—নিরুদন
Destructive distillation—অন্তর্ধূম পাতন
Decantation—আস্রাবন
Density—ঘনত্ব, ঘনাংক
Dilution—লঘুকরণ
Distil—পাতিত করা
Distillation—পাতন
Distilled—পাতিত
Disinfectant—বীজঘ্ন
Dissolve—দ্রবীভূত করা
Ductility—প্রসার্যতা
Dye—রঞ্জক
Dying—রঞ্জন
Ebullition—স্ফুটন
Effervescence—বুদ্‌বুদন
Efflorescent—উদ্‌ত্যাগী
Element—মৌলিক পদার্থ, মৌল
Electrode—তড়িৎ-দ্বার
Enamel—মিনা
Evaporation—বাষ্পীভবন
Extraction—নিষ্কাশন
Essential oil—উদ্বায়ী তৈল
Explosion—বিস্ফোরণ
Explosive—বিস্ফোরক
Fat—চর্বি, স্নেহপদার্থ
Ferment—খমির, কিণ্ব
Fermentation—সন্ধান
Fermented—সন্ধিত
Fertilizer—সার
Filtration—পরিস্রাবণ, পরিস্রুতি
Filtered—পরিস্রুত
Fire-proof—অগ্নিসহ
Fixed alkali—স্থির ক্ষার
Flower of sulphur—গন্ধক-রজ
Fluorescence—প্রতিপ্রভা
Flame—শিখা
Formation—সংগঠন
Formula—সংকেত

Fruit sugar—ফল-শর্করা
Furnace—চুল্লী
Freezing point—হিমাংক
Fusion—গলন
Fume—ধূম
Fuming acid—ধূমায়মান অ্যাসিড
Gaseous—গ্যাসীয়
Galena—সীসাঞ্জন
Grape sugar—দ্রাক্ষা-শর্করা
Glass—কাচ
,, rod—কাচ-দণ্ড
,, tube—কাচ-নল
Green vitriol—হিরাকস
Gravimetric analysis—তৌলিক বিশ্লেষণ
Grind—পেষণ করা
Ground glass—ঘষা কাচ
Gun powder—বারুদ
Hard water—খর জল
Hardness—খরতা, কাঠিন্য
Heat—তাপ
Heavy metal—গুরু ধাতু
Hydrochloric acid—লবণাম্ল
Hydrolysis—আর্দ্র-বিশ্লেষণ
Hygroscopic—জলাকর্ষী
Hypothesis—প্রকল্প
Ignition—জ্বলন
,, point—জ্বলনাংক
Inorganic—অজৈব
Inactivity—নিষ্ক্রিয়তা
Incandescence—ভাস্বরতা
Incombustible—অদাহ্য
Indicator—সূচক
Indigo—নীল
Ingredient—উপাদান
Inert, inactive—নিষ্ক্রিয়
Inflamble—দাহ্য
Insoluble—অদ্রাব্য
Iron—লোহা
,, , ore—লৌহ আকরিক
,, , soft—কাঁচা লোহা
,, , wrought—পেটা লোহা
,, , cast—ঢালাই লোহা
Isomorphous—সমাকৃতি
Kiln—ভাঁটি
Lac—লাক্ষা, গালা
Lactose—দুগ্ধ-শর্করা
Lamp black—ভূষা কালি
Law—নিয়ম, সূত্র
Limestone—চূনাপাথর
Liquid—তরল
Lead—সীসা, সীসক
Lead, black—কৃষ্ণ সীস
,, , red—মেটে সিন্দুর
,, , white—সফেদা
Litharge—মুদ্রাশঙ্খ
Lixiviation—দ্রাবণ
Malt—সীরা
Mercury—পারা, পারদ
Melting point—গলনাংক
Metal—ধাতু
,, , noble—বর-ধাতু
,, , base—অবর-ধাতু
Metallurgy—ধাতুবিদ্যা
Metalloid—ধাতুকল্প
Mineral—খনিজ, মণিক
Mineralogy—মণিকবিদ্যা
Minium—মেটেসিন্দূর, সীসসিন্দুর
Mixture—মিশ্রণ
Moist—আর্দ্র
Molecule—অণু
Molecular—আণবিক

Molecular formula—আণবিক সংকেত
Monobasic—একক্ষারীয়
Monvalent—একযোজী
Mortar—খল
Multivalent—বহুযোজী
Nascent—জায়মান
Natural water—প্রাকৃত জল
Neutralization—প্রশমন
Neutral—প্রশমিত
Nitre—সোরা
Non-metal—অধাতু
Non-volatile—অনুদ্বায়ী
Normal density—প্রমাণ ঘনত্ব
Occlusion—অন্তর্ধৃতি
Octahedron—অষ্টতলক
Opeque—অনচ্ছ
Organic—জৈব, অঙ্গারক
Orpiment—হরিতাল
Paraffin—খনিজ মোম
Passive iron—নিষ্ক্রিয় লৌহ
Perfect gas—জাত্য গ্যাস
Periodic law—পর্যায় সূত্র
Phosphorescence—অনুপ্রভা
Physical change—ভৌত পরিবর্তন
Pigment—রঞ্জক-চূর্ণ
Plastic—নমনীয়, প্লাস্টিক
Precipitation—অধঃক্ষেপন
Pressure—চাপ
Poisonous—সবিষ, বিষাক্ত
Polyvalent—বহুযোজী
Putrefaction—পচন
Purified—শোধিত
Pyrite—মাক্ষিক
Quadrivalent—চতুর্যোজী
Quick lime—কলি চুন
Quick silver—পারদ
Radio-active—তেজস্ক্রিয়
Rare earth—বিরল মৃত্তিকা
Reaction—বিক্রিয়া
Reactive—সক্রিয়
Reagent—বিকারক
Realgar—মোমছাল, মনঃশিলা
Reducing agent—বিজারক দ্রব্য
Reduction—বিজারণ
Resin—রজন
Retort—বকযন্ত্র
Rock salt—খনিজ লবণ
Ruby glass—লোহিত কাচ
Ruby—পদ্মরাগ, চুনি
Rust—মরিচা
Sal-ammoniac—নিশাদল
Salt—লবণ
,, , common—খাদ্য-লবণ
,, , compound—যৌগ-লবণ
Saltpetre—সোরা
Sapphire—নীলকান্ত
Saturation—সংপৃক্তি
Saturated—সংপৃক্ত
Sediment—গাদ, কল্ক
Slag—ধাতুমল
Smelting—বিগলন
Soft water—মৃদু জল
Solder—ঝাল
Soluble—দ্রবণীয়, দ্রাব্য
Solubility—দ্রাব্যতা, দ্রবণীয়তা
Solution—দ্রব, দ্রবণ
Solute—দ্রবিত পদার্থ, দ্রাব্য
Solvant—দ্রাবক
Stable—স্থায়ী
Starch—শ্বেতসার
Standard solution—প্রমাণ দ্রব

Sublimation—উর্ধ্বপাতন
Sugar—শর্করা, চিনি
Sulpher—গন্ধক
Supersaturated – অতিপৃক্ত
Synthesis—সংশ্লেষণ
Synthetic – সাংশ্লেষিক
Symbol—চিহ্ন, প্রতীক
Temperature—উষ্ণতা, তাপমাত্রা
Tempering—পান দেওয়া
Test tube—পরীক্ষা-নল
Theory—তত্ত্ব, বাদ
Theoretical—তত্ত্বীয়, বাদীয়
Tin—রাং, টিন
Triad, Trivalent—ত্রিযোজী
Trituration—বিচূর্ণন
Tube—নল
Tubular—নলাকার
Turpentine—তার্পিন
Union—সংযোগ
Univalent—একযোজী
Unsaturated—অসংপৃক্ত
Vapour—বাষ্প
Vinegar—সিরকা
Vermillion—সিন্দুর
Viscous—সান্দ্র
Viscosity—সান্দ্রতা
Vitreous—কাচীয়
Volatile—উদ্বায়ী
Vitriol, blue—তুঁতে
" , green—হিরাকস
Volume—আয়তন
Water, hard—খর জল
" , soft—মৃদু জল
Waterproof—জলাভেদ্য
Water-tight—জলরোধক
Weak solution—ক্ষীণ দ্রব
White arsenic—সেঁকো
White lead—সফেদা, শ্বেতসীস
White heat—শ্বেততাপ
Wood charcoal—কাঠকয়লা
Zinc—দস্তা
Zircon—গোমেদ

গণিত—Mathematics

পাটীগণিত—Arithmetic
বীজগণিত—Algebra
জ্যামিতি—Geometry
ত্রিকোণমিতি—Trigonometry

Absolute—পরম
Abscissa—ভূজ
Abstract number—শুদ্ধ সংখ্যা
Adjacent angle—সন্নিহিত কোণ
Aliquot part—একাংশ
Acute angle—সূক্ষ্ম কোণ
Addition—যোগ, সংকলন
Altitude—উন্নতি
Alligation—মিশ্রণ
Alternendo—একান্তর ক্রিয়া
Approximate value—আসন্ন মান
Alternate—একান্তর
Alternative proof—বিকল্প প্রমাণ
Ambiguous—দ্ব্যর্থক
Antecedent—পূর্বরাশি
Annuity—বার্ষিক
Arc—চাপ
Area—কালি, ক্ষেত্রফল
Arithmetic series—সমান্তর শ্রেণী
Arm—ভুজ, বাহু
At par—সম-হার
Average—গড়

Axiom—স্বতঃসিদ্ধ
Axis—অক্ষ
Axis of projection—অভিক্ষেপাক্ষ
Base—ভূমি
Below par—উনহার
Binomial—দ্বিপদ
Bartar—বিনিময়
Bisector—দ্বিখণ্ডক
By (÷)—ভাজিত
Breadth—বিস্তার, প্রস্থ
Bill of exchange—হুণ্ডি
Brokerage—দালালি
Cardinal—অঙ্কবাচক
Capital—মূলধন
Centre—কেন্দ্র
Centre of Gravity—ভারকেন্দ্র
Centroid—ত্রিভূজকেন্দ্র
Chord—জ্যা
Circle—বৃত্ত
Circular measure—বৃত্তীয় মান
Circumcentre—পরিকেন্দ্র
Circumference—পরিধি
Circumscribed—পরিলিখিত
Co-axial—সমাক্ষ
Coefficient—গুণক, সহগ
Combination—সমবায়
Coincidence—সমাপতন
Collinear—একরেখীয়
Commercial discount—ব্যাজ
Complex—জটিল
Commission—দস্তুরি
Compound—মিশ্র, যৌগিক
" , interest—চক্রবৃদ্ধি সুদ
Complementary angle—পূরক কোণ
Componendo—যোগক্রিয়া
Concrete number—বদ্ধ সংখ্যা
Constant—ধ্রুবক
Concentric—এককেন্দ্রীয়
Concurrent—সমবিন্দু
Co-ordinates—স্থানাংক
Cone—শঙ্কু
Conjugate—অনুবন্ধী
Convergent—অভিসারী
Converse—বিপরীত
Coplanar—একতলীয়
Corollary—অনুসিদ্ধান্ত
Cosecant—কোসিক্যাণ্ট
Cross section—প্রস্থচ্ছেদ
Creditor—উত্তমর্ণ
Cube—ঘন, ঘনফল
Cube root—ঘন মূল
Cubic—ঘন, ত্রিঘাত
Cyclic—বৃত্তস্থ, বৃত্তীয়
Debtor—অধমর্ণ
Decimal—দশমিক
Deduction—সিদ্ধান্ত
Denominator—হর
Diagonal—কর্ণ
Diameter—ব্যাস
Difference—অন্তর
Differential Calculus—অন্তরকলন
Digit—অঙ্ক
Dimension—মাত্রা
Directrix—নিয়ামক
Divergent—অপসারী
Dividend—ভাজ্য, লভ্যাংশ
Dividendo—ভাগক্রিয়া
Division—ভাগ, হরণ
Divisor—ভাজক
Duo-decimal—দ্বাদশিক

Ratio—অনুপাত
Rational—মূলদ
Reciprocal—বিপরীত
Rectangle—আয়তক্ষেত্র
Rectilinear—ঋজুরেখ
Recurring—আবৃত্ত
Reduction—লঘুকরণ
Reflex angle—প্রবৃদ্ধ কোণ
Regular—সুষম
Remainder—অবশিষ্ট, বাকী
Rhombus—রম্বাস
Root—মূল
Right angle—সমকোণ
Rule of three—ত্রৈরাশিক নিয়ম
Side—বাহু, ভুজ, পক্ষ
Sign—চিহ্ন
Simplification—সরলীকরণ
Scalene—বিষমভূজ
Secant—ছেদক
Second—বিকাল, সেকেণ্ড
Section—ছেদ
Sector—বৃত্তকলা
Segment—বৃত্তাংশ
Semicircle—অর্ধবৃত্ত
Series—শ্রেণী
Share—অংশ
Significant—সার্থক
Size—আয়তন, আকার
Simultaneous equation—সহ-সমীকরণ
Solution—সমাধান
Square—বর্গ, বর্গক্ষেত্র
Square root—বর্গমূল
Solid—ঘন, ঘনবস্তু
Space—স্থান, দেশ
Spiral—সর্পিল
Stock—ষ্টক, মজুত মাল
Straight—সরল, ঋজু
,, angle—সরল কোণ
Subtended angle—সম্মুখ কোণ
Subtraction—বিয়োগ, ব্যবকলন
Sum—যোগফল, সমষ্টি
Superposition—উপরিপাত
Surd—করণী
Supplementary angle—সম্পূরক কোণ
Surface—তল, পৃষ্ঠ
Symmetry—প্রতিসাম্য
Symmetry, axis of—প্রতিসাম্য অক্ষ
Tangent—স্পর্শক
Tetrahedron—চতুস্তলক
Term—রাশি, পদ
Theorem—উপপাদ্য
Thickness—বেধ
Transversal—ভেদক
Transverse—তির্যক,
Trapezium—ট্রাপিজিয়াম
Triangle—ত্রিভূজ, ত্রিকোণ
Trigonometrical ratio—কোণানুপাত
Trisection—ত্রিখণ্ডন
True Discount—আসল বাটা
Unit—একক
Uniform—সম
Unitary method—ঐকিক নিয়ম
Value—মূল্য, মান
Variable—চল, পরিবর্তনশীল
Variation—ভেদ
Vertex—শীর্ষ
Vertical angle—শিরঃকোণ

Vertically opposite—বিপ্রতীপ
Volume—ঘনফল, ঘনমান, আয়তন
Vulgar (fraction)—সামান্য
Zero—শূন্য

জ্যোতির্বিদ্যা—Astronomy

Aberration—অপেরণ
Alpheratiz—উত্তর ভাদ্রপদ
Altitude—উন্নতি
Annual motion—বার্ষিক গতি
Antares—জ্যেষ্ঠা
Apparent—আপাত
Aphelion—অপসূর
Apogee—অপভূ
Aquila—আকুইলা
Ascending node—উদ্‌বিন্দু, উচ্চপাত
Aquarius—কুম্ভরাশি
Asteriods—গ্রহাণুপুঞ্জ
Auriga—প্রজাপতি মণ্ডল
Autumnal equinox—জলবিষুব
Axis—অক্ষ
Azimuth—দিগংশ
Bellatrix—কার্তিকেয়
Binary star—যুগ্মতারা
Cancer—কর্কট
Canopus—অগস্ত্য
Celestial equator, equinoctial—খ-বিষুবরেখা, খ-বিষুববৃত্ত
Celestial latitude—ক্রান্তিলম্ব, বিক্ষেপ
,, longitude—ক্রান্ত্যাংশ, ভুজাংশ
,, sphere—খগোল
Chromosphere—বর্ণমণ্ডল
Collination—অক্ষীকরণ
Comet—ধূমকেতু
Constellation—নক্ষত্র, তারামণ্ডল
Corona—ছটামণ্ডল
Culmination—মধ্যগমন
Cycle—চক্র
Declination—বিষুব লম্ব
Denebola—উত্তরফাল্গুনী
Descending node—অববিন্দু, নিম্নপাত
Deviation—চ্যুতি
Diurnal—আহ্নিক, দৈনিক
Ebb tibe—ভাঁটা
Eclipse—গ্রহণ
,, , annular—বলয়গ্রাস
,, , partial—খণ্ডগ্রাস
,, , total—পূর্ণগ্রাস
Ecliptic—ক্রান্তিবৃত্ত
Equator—নিরক্ষরেখা, ভূ-বিষুববৃত্ত
Equatorial—নিরক্ষীয়
Equinox (time)—বিষুব
Flow tide—জোয়ার
Focus—নাভি
Full moon—পূর্ণিমা
Galaxy—ছায়াপথ
Great bear—সপ্তর্ষি মণ্ডল
Great circle—গুরু বৃত্ত
Geocentric—ভূকেন্দ্রীয়
Gemenii—মিথুনরাশি
Heliocentric—সূর্যকেন্দ্রীয়
Horizon (circle)—দিগন্ত
,, (plane)—ক্ষিতিজ
Horizontal—অনুভূম

Interior planet—অন্তগ্র হ
Interstellar space—ভান্তঃপ্রদেশ
Jupiter—বৃহস্পতি
Leap-year—অধিবর্ষ
Libra—তুলারাশি
Local time—স্থানীয় সময়
Lunar—চান্দ্র
Lunation—চান্দ্রমাস
Mars—মঙ্গল
Markab—পূর্বভাদ্রপদ
Mean time—মধ্যকাল
Mercury—বুধ
Meridian—মধ্যরেখা
,, plane—মধ্যতল
Meteor—উল্কা
Meteorite—উল্কাপিণ্ড
Milky way—ছায়াপথ
Moon—চন্দ্র
Nadir—কুবিন্দু
Neap-tide—লঘুস্ফীতি, মরা কটাল
Nebula—নীহারিকা
Neptune—নেপচুন
New moon—অমাবস্যা
Node—পাত
Nutation—অক্ষবিচলন
Observatory—মানমন্দির
Orbit—কক্ষ
Orion—কালপুরুষ
Parallax—লম্বন
Penumbra—উপচ্ছায়া
Perigee—অনুভূ
Perihelion—অনুস্বর
Phase—কলা
Photosphere—আলোক-মণ্ডল
Planet—গ্রহ
Pleiades—কৃত্তিকা
Polar axis—ধ্রুবাক্ষ
,, distance—লম্বাংশ
Pole—মেরু
Pole star—ধ্রুবতারা
Pollux—পুনর্বসু
Precession—অয়নচলন
,, vertical—পূর্বাপরবৃত্ত
Progression—অগ্রগতি
Regression—পশ্চাদ্গতি
Right ascension—বিষুবাংশ
Sagittarus—ধনুরাশি
Satellite—উপগ্রহ
Saturn—শনি
Scorpion—বৃশ্চিকরাশি
Season—ঋতু
Siderial time—নাক্ষত্রকাল
Sirius—লুব্ধক
Solstice—অয়নান্ত
Spica—চিত্রা
Spring-tide—গুরুস্ফীতি, তেজ কটাল
Star—নক্ষত্র, তারকা
Summer Solstice—কর্কট ক্রান্তি
Sun—সূর্য
Sun-spot—সৌর কলঙ্ক
Sun-dial—সূর্যঘড়ি
Superior planet—বহিগ্র´হ
Synodic period—যুতিকাল
Tide—জোয়ার-ভাটা, জলস্ফীতি
Temperate zone—নাতিশীতোষ্ণ-মণ্ডল
Torrid zone—উষ্ণমণ্ডল
Transit circle—মধ্যবৃত্ত
Tropic of cancer—উত্তরায়ন বৃত্ত
Twilight—সন্ধ্যালোক
Umbra—প্রচ্ছায়া
Ursa major—সপ্তর্ষিমণ্ডল

Ursa minor—শিশুমার
Vega—অভিজিৎ
Venus—শুক্র
Vernal equinox—মহাবিষুব
Vertical—উল্লম্ব, উর্ধ্বাধঃ
Vertical circle—লম্ববৃত্ত
Virgo—কন্যারাশি
Winter solstice—মকরক্রান্তি
Zenith—খ-মধ্য, স্থবিন্দু
Zenith distance—নতাংশ

শারীরবৃত্ত—Physiology, *স্বাস্থ্যবিদ্যা*—Hygiene

Abdomen—উদর
Adam's apple—কণ্ঠমণি
Adenoids—গলরস-গ্রন্থি
Alimentary canal—পৌষ্টিক নালী
Anæmia—রক্তাল্পতা
Anatomy—শারীরস্থান
Antiseptic—বীজবারক
Antitoxin—প্রতিবিষ
Anus—পায়ু
Auorta—মহাধমনী
Appetite—ক্ষুধা
" , loss of—ক্ষুধামান্দ্য
Artery—ধমনী
Artificial—কৃত্রিম
" feeding—কৃত্রিম খাদন
" respiration—কৃত্রিম শ্বসন
Aseptic—নির্বীজ
Assimilation—আত্তীকরণ
Auricle—অলিন্দ
Balanced diet—সুষম খাদ্য
Bile—পিত্ত
Bladder—বস্তি
Blood—রক্ত
Blood pressure—রক্তচাপ
" vessel—রক্তবাহ
Bone—অস্থি, হাড়
Bowel—অন্ত্র
Breast bone—উরঃফলক
Brain—মস্তিষ্ক
Breathing—শ্বসন, শ্বাসকার্য
Bronchus—ক্লোমশাখা
Capillaries—জালক
Cardiac end—আগম দ্বার
Carpal " —করকূর্চাস্থি
Cartilage—তরুণাস্থি
Cerebellum—লঘুমস্তিষ্ক
Cerebrum—গুরুমস্তিষ্ক
Chest—বক্ষ
Choroid coat—কৃষ্ণমণ্ডল
Chyme—পাকমণ্ড
Circulation of blood—রক্ত-সংবহন
Clotting of " —রক্ত-তঞ্চন
Clavicle—কণ্ঠাস্থি
Coccyx—অনুত্রিকাস্থি
Collar bone—অক্ষকাস্থি
Colon—মলাশয়
Conjunctiva—নেত্রবর্ত্মকলা
Cornea—অচ্ছোদপটল
Corpuscles, blood—রক্ত কণিকা
" , red—লোহিত কণিকা
" , white—শ্বেত কণিকা
Cranium—করোটিকা
Cuticle—কৃত্তিক
Dermis—অন্তস্ত্বক্
Diaphragm—মধ্যচ্ছদা

Digestion—পরিপাক, হজম
Discharge—স্রাব
Disease—রোগ, ব্যাধি
" , contagious—সংক্রামক বা ছোঁয়াচে রোগ
Disease, infectious—সংক্রামী রোগ
" , water-borne—জলবাহিত রোগ
Disinfectant—বীজঘ্ন
Disinfection—নির্বীজন
Ducts, thoracic—মুখ্যা রসকুল্যা
Duodenum—গ্রহণী
Epidermis—উপচর্ম
Epiglottis—অধিজিহ্বা
Eyeball—চক্ষুগোলক
Enzyme—এঞ্জাইম
Fainting—মূর্চ্ছা
Femur—উর্বস্থি
Ferment—কিন্ব, খমির
Fibula—অনুজঙ্ঘাস্থি
Foramen magnum—মহাবিবর
Fundus—আমাশয় স্কন্ধ
Gall bladder—পিত্তাশয়
Ganglion—নার্ভগ্রন্থি, স্নায়ুগ্রন্থি
Gastric juice—পাচক রস
Germ—বীজ, রোগবীজ
Gland—গ্রন্থি
Gullet—গ্রাসনালী
Gum—মাড়ি
Hard pallet—তালু
Heart—হৃৎপিণ্ড
,, beat—হৃৎস্পন্দন
Hip bone—নিতম্বাস্থি
Humerus—প্রগণ্ডাস্থি
Immune—অনাক্রম্য
Innominate bone—জঘনাস্থি, কপাল
Inspiration—প্রশ্বাস
Instep—পদপৃষ্ঠ
Intestine—অন্ত্র
,, , large—বৃহদন্ত্র
,, , small—ক্ষুদ্রান্ত্র
Iris—কনীনিকা
Joint—সন্ধি
Kidney—বৃক্ক
Knee—জানু
Knee-cap—জানুকাপালিকা
Larynx—স্বরযন্ত্র
Ligament—সন্ধিবন্ধনী
Liver—যকৃত
Loin—কটি
Longsightedness—দূরবদ্ধ দৃষ্টি
Lungs—ফুসফুস
Lymph—লসিকা
Lymphatic vessel—লসিকানালী
Membrane—ঝিল্লী
Metacarpals—করতলাস্থি
Metamarsals—পদতলাস্থি
Microbe—জীবাণু
Mucus—শ্লেষ্মা
,, , membrane—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী
Muscle—পেশী
,, , voluntary—ঐচ্ছিক পেশী
" , involuntary—অনৈচ্ছিক ,,
Nasal passage—নাসাপথ
Neck—গ্রীবা
Nerve—নার্ভ, স্নায়ু
,, , afferent—অন্তর্মুখ নার্ভ
,, , efferent—বহির্মুখ ,,
Nerve, motor—চেষ্টিয় নার্ভ
Nerve, sensory—সংবেদী ,,

Nose cavity—নাসাবিবর
Nostril—নাসারন্ধ্র
Nourishment, nutrition—পুষ্টি
Œsophagus—গ্রাসনালী
Organ—যন্ত্র
,, , digestive—পাচন যন্ত্র
,, , excretory—রেচন যন্ত্র
,, , respiratory—শ্বাসযন্ত্র
Ovary—অণ্ডাশয়, গর্ভাশয়
Pancreas—অগ্ন্যাশয়
Parasite—পরজীবী
Pelvis—শ্রোণীচক্র
Pericardium—হৃদ্ধরা কলা
Peristalsis—ক্রমসংকোচ
Perspiration—ঘর্ম, স্বেদ
Phalanges—অঙ্গুলিনলক
Pharynx—গলবিল
Plasma—রক্তরস
Pleura—ফুস্ফুসধরা কলা
Poison—বিষ
Poisonous—সবিষ, বিষাক্ত
Poisoned—বিষিত
Poisoning—বিষণ
Prevention—বারণ, প্রতিরোধ
Pulmonary—ফুসফুসীয়
Pulse—নাড়ী
Pupil—তারারন্ধ্র
Pus—পুঁজ
Putrefaction—পচন, শটন
Pyloric end—নিগমদ্বার (আমাশয়ের)
Quarantine—সঙ্গরোধ
Radius—বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থি
Rectum—মলদ্বার
Reflex action—প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া
Respiration—শ্বসন
Retina—অক্ষিপট
Rib—পাঁজরা, পর্শুকা
Rigor mortis—মরণ-সংকোচ
Sacrum—ত্রিকাস্থি
Saliva—লালা
Salivary gland—লালাগ্রন্থি
Sanitation—স্বাস্থ্যবিধান
Scapula—অংসফলক
Sclerotic coat—শ্বেতমণ্ডল
Secretion—ক্ষরণ
Sense-organ—ইন্দ্রিয়স্থান
Sensory centre—সংজ্ঞাকেন্দ্র
Sepsis—বীজদূষণ
Septic tank—মলশোধনী
Serum—রক্তমস্তু, রক্তরস
Shank—জঙ্ঘা
Shortsightedness—অদূরবদ্ধ দৃষ্টি
Shoulder-blade—অংসফলক
Skin—চর্ম
Skull—করোটি
Socket—কোটর
Spinal chord—সুষুম্নাকাণ্ড
Spinal column—মেরুদণ্ড
Spleen—প্লীহা
Spore—বীজগুটি
Sterilization—নির্বীজন
Sterilised—নির্বীজিত
Sternum—উরঃফলক
Stomach—পাকস্থলী
Sweat-gland—স্বেদগ্রন্থি
System—তন্ত্র
" , alimentary—পৌষ্টিক তন্ত্র
" , circulatory—রক্তসংবহন "
" , digestive—পাচন "
" , respiratory—শ্বসন "
" , sensory—সংজ্ঞা "
Tarsal—চরণ-সন্ধ্যাস্থি

Tendon—কণ্ডরা
Thigh—ঊর্বস্থি, ঊরু
Throat—কণ্ঠ
Tibia—জঙ্ঘাস্থি
Tissue—কলা তন্তু
" , epithelial—আচ্ছাদক তন্তু
Tooth—দন্ত, দাঁত
" , bicuspid—দ্বিশীর্ষ দন্ত
" , canine—ছেদক দন্ত
" , incisor—কৃন্তক দন্ত
" , molar—পেষক দন্ত
Trachea—ক্লোমনালিকা, শ্বাসনালী
Trunk—মধ্যশরীর, ধড়, দেহকাণ্ড
Tympanum—কর্ণপটহ
Ulna—অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থি
Ureter—গবিনী
Urethra—মূত্রনালী
Uvula—আল্‌জীব
Vein—শিরা
Vena cava—মহাশিরা
" " , inferior—অধরা "
" " , superior—উত্তরা "
Ventilated—বাতায়িত
Ventilation—বায়ুচলন
Ventricle—নিলয়
Vertebra—কশেরুকা
Vertebral column—মেরুদণ্ড
Villus—ক্ষুদ্রান্ত্রের শোষকযন্ত্র
Viscera—আন্তর যন্ত্র
Vitamin—খাদ্য-প্রাণ
Voice-box—স্বর-কক্ষ
Windpipe—শ্বাসনালী, ক্লোমনালিকা
Waste—বর্জ্য, জঞ্জাল
Waste product—বর্জ্য পদার্থ
Worm—কৃমি
Wound—ক্ষত
Wrist—মনিবন্ধ, কব্জি

Biology—*জীববিদ্যা*

Zoology—*প্রাণিবিদ্যা*

Botany—*উদ্ভিদবিদ্যা*

Abiogenesis—অজীবজনি
Abortive—লুপ্ত
Acotyledon—অবীজপত্রী
Acquatic—জলজ, জলচর
Acquired character—লব্ধ গুণ
Acuminate—দীর্ঘশীর্ষ
Adaptation—অভিযোজন, প্রতিযোজন
Adventitious—আস্থানিক
Aerial root—অবরোহ, বায়ব মূল
Aerobic—বায়ুজীবী
Aggregate fruit—গুচ্ছফল
Air-bladder—পট্‌কা, বায়ুস্থলী
Albuminous—বহিঃসার (বীজ)
Algæ—শেওলা
Alytes—ধাত্রী ব্যাঙ
Amphibious—উভচর
Anabolism—উপচিতি
Anærobic—অবায়ুজীবী
Angiosperm—গুপ্তবীজী
Animalcule—কীটাণু
Analogous—সমবৃত্তি

Ancestral—কৌলিক
Annual—বর্ষজীবী
Anther—পরাগধানী
Antenna—শুঙ্গ
Anterior—অগ্র, পুরঃ
Ape—বনমানুষ
Appendage—উপাঙ্গ
Apey—আগা, অগ্রভাগ
Arthropod—সন্ধিপদ
Articulated—গ্রথিত, গ্রন্থিল
Asexual—অযৌন
Assimilation—আত্তীকরণ
Biogenesis—জীবজনি
Biologist—জীববিৎ
Bisexual—উভলিঙ্গ
Bark—বল্কল
Blade—ফলক
Bract—মঞ্জরীপত্র
Branching—শাখা বিন্যাস
Bat—চামচিকা, বাদুর
Beak, bill—চঞ্চু
Biped—দ্বিপদ
Bladder—স্থলী
Boa—অজগর
Breeding—প্রজনন
Buccal cavity—মুখগহ্বর
Bud—কোরক, মুকুল
Budding—কোরকোদ্গম
Bufo—কুনো ব্যাঙ
Burrow—গর্ত, বিবর
Burrowng—গর্তকারী, গর্তবাসী
Butterfly—প্রজাপতি
Bulb—কন্দ
Cell—কোষ
Cell wall—কোষ-প্রাচীর
Cephalopod—শীর্ষপদ
Calyx—বৃতি
Carpel—গর্ভপত্র, গর্ভকেশর
Canine—শ্বান
Carapace—বর্ম
Carnivorous—মাংসাশী
Caterpillar—শূক, শুঁয়াপোকা
Climber—রোহিণী
Cordate—তাম্বূলাকার
Corolla—দল
Corona—মুকুট
Centiped—শতপদ, বিছা বৃশ্চিক
Cotyledon—বীজপত্র
Character—লক্ষণ
Chactopod—শূকপদ
Cocoon—গুটি
Cold-blodded—অনুষ্ণশোণিত
Colouration—বর্ণগ্রহ
Compound eye—পুঞ্জাক্ষি
Crayfish—চিংড়ি
Creeper—ব্রততী
Crenate—সভঙ্গ
Cricket—ঝিঁঝিঁ, ঝিল্লী
Crustacean—কবচী
Cruciform—ক্রসাকার
Cryptogam—অপুষ্পক উদ্ভিদ
Class—শ্রেণী
Classification—শ্রেণী বিভাগ
Colony—সংঘ, বসতি
Contractile—সংকোচী
Culture—কৃষ্টি
Culm—তৃণকাণ্ড
Curved venation—ধনুঃশিরা
Cyme—স্তবক
Daughter cell—অপত্যকোষ
Deciduous (leaf)—পাতী
" (tree)—পর্ণমোচী

Dentate—দন্তুর
Defensive—রক্ষাকর, প্রতিরোধী
Degeneration—আপজাত্য
Dermis—অধিত্বক্
Descent—উদ্ভব
Diandrous—দ্বিকেশর
Differentiation—বিভেদ
Distribution—বিস্তারণ, সংস্থান
Diclinous, unisexual—একলিঙ্গ
Dicotyledon—দ্বিবীজপত্রী
Digitate—অঙ্গুলাকার
Dioecious—ভিন্নবাসী
Dominate—প্রকট
Dormant, latent—অব্যক্ত, লীন
Dorsal—পৃষ্ঠ্য, পৃষ্ঠ
Drone—পুং-মধুপ
Earthworm—কেঁচো
Ecology—বাস্তব্যবিদ্যা, পরিবেশবিজ্ঞান
Egg—ডিম্ব, অণ্ড
Embryo—ভ্রূণ
Embryology—ভ্রূণবিদ্যা
Endocarp—ফলের অন্তস্ত্বক
Endogenous—অন্তর্জনিষ্ণু
Endoskeleton—অন্তঃকঙ্কাল
Endosperm—শস্য, অন্তর্বিজী
Entomology—পতঙ্গবিদ্যা
Environment—প্রতিবেশ, পরিবেশ
Epicarp—বহির্ফলত্বক
Ephemeral—ক্ষণস্থায়ী
Epicalyx—উপবৃতি
Epiphyte—বৃক্ষরুহা
Evergreen—চিরহরিৎ
Evolution—অভিব্যক্তি
Exalbuminous—অন্তঃসার (বীজ)
Exoskeleton—বহিঃকঙ্কাল
Exotic—বিদেশীয়
Extinct—লুপ্ত
Eye, compound—পুঞ্জাক্ষি
Family—গোত্র
Fang—বিষদন্ত
Fauna—প্রাণিকুল
Feather—পালক
Feline—বৈড়াল
Fertilization—নিষেক, গর্ভাধান
Fin—পাখ্না
Flora—উদ্ভিদকূল
Fœtus—ভ্রূণ
Forelimb—অগ্রপদ
Fossil—জীবাশ্ম
Fossilized—অশ্মীভূত, শিলিভূত
Frugivorous—ফলাশী
Fungus—ছত্রাক
Fusiform—মূলকাকার
Gamete—জনন কোষ
Gamopetalous—যুক্তদল
Gamosepalous—যুক্তবৃতি
Gastropod—উদরপদ
Germination—অঙ্কুরোদ্গম
Generation—জনি, প্রজন্ম
Genetics—প্রজনবিদ্যা
Genus—গণ
Germ cell—জনন-কোষ
Gill—ফুল্কো
Gill flap—কান্কো
Gregarious—যূথচর, যূথচারী
Growth—বৃদ্ধি
Gymnosperm—ব্যক্তবীজী
Gynandrous—যোষিৎপুংস্ক
Habit—আচরণ, বৃত্তি
Habitat—বসতি
Hereditary—বংশগত
Heredity—বংশগতি

Hermaphrodite—উভলিঙ্গ
Heliotropism—সূর্যাবৃত্তি
Hedgehog—কাঁটাচুয়া
Herbivorous—শাকাশী, তৃণভোজী
Hind limb—পশ্চাৎপদ
Hibernation—শীতস্তম্ভ, শীতঘুম
Histology—কলাস্থান
Homogenous—সমপরিণত
Homologous—সমসংস্থ
Host—পোষক
Hybrid—সংকর
Imago—সমঙ্গ
Inflorescence—পুষ্পবিন্যাস
Insect—পতঙ্গ
Insectivorous—পতঙ্গাশী
Internode—পর্ব
Invertebrate—অমেরুদণ্ডী
Irritability—উত্তেজিতা
Katabolism—অপচিতি
Kernel—অন্তর্বীজ
Kingdom—সর্গ, কুল
Larva—শূক, লার্ভা
Labiate—ওষ্ঠাকার
Lanceolate—ভল্লাকার
Latex—তরুক্ষীর
Leaf—পত্র, পর্ণ
Leaf bud—পত্রমুকুল
Legume—শিম্ব
Leg, jointed—সন্ধিত-পদ
Lobster—গল্‌দা চিংড়ি
Life cycle—জীবন চক্র
Life history—জীবন বৃত্তান্ত
Littoral—বেলাবাসী
Marine—সামুদ্র, সামুদ্রিক
Mane—কেশর
Mammal—স্তন্যপায়ী
Mersupial—অঙ্কগর্ভ
Mersocarp—ফলের মধ্যত্বক্
Metabolism—বিপাক
Metabolic—বিপাকীয়
Metamorphosis—রূপান্তর
Micropyle—ডিম্বক-রন্ধ্র
Millepede—সহস্রপদ, কেন্নো
Mimicry—অনুকৃতি
Monoclinous—উভলিঙ্গ
Monocotyledon—একবীজপত্রী
Monoceious—সহবাসী
Molusc—কম্বোজ
Modification—পরিবর্তন
Morphology—অঙ্গসংস্থান
Moth—নিশাচর প্রজাপতি
Mould—ছাতা, চিতি
Moulting—নির্মোচন
Mutation—পরিব্যক্তি
Natural selection—প্রাকৃতিক নির্বাচন
,, history—জীববৃত্তান্ত
Naturalist—নিসর্গবেদী, প্রকৃতি-বিজ্ঞানী
Neuter—ক্লীব
Nectar—মকরন্দ, মধু
Nucleus—কেন্দ্রীণ
Node—পর্বসন্ধি
Omnivorous—সর্বাশী
Ontogeny—ব্যক্তিজনি
Order—বর্গ
Order, sub—উপবর্গ
Organism—জীব
Oviparous—ডিম্বজ, অণ্ডজ
Ostrich—উটপাখি
Oyster—ঝিনুক, শুক্তি
Ovary—ডিম্বাশয়

Animism—সর্বপ্রাণবাদ
Anomalous—ব্যতিক্রান্ত
Anomaly—ব্যতিক্রম
Anthropology—নৃবিদ্যা
Anthropomorphism—নরত্বারোপ
Anticipation—অগ্রজ্ঞান, পূর্বজ্ঞান
Antipathy—দ্বেষ, বিরোধ
Anxiety—উৎকণ্ঠা
Apathy—অনীহা
Aphorism—সূত্র
Apotheosis—দেবত্বারোপ
Apparent—আপাত
Application—প্রয়োগ
Approximate—আসন্ন
Approximation—আসত্তি
Archoeology—প্রত্নবিদ্যা
Archetype—আদিরূপ
Argument—যুক্তি
Armistice—অবহার
Asexual—অযৌন
Aspiration—উৎকাঙ্ক্ষা
Assemblage—সমূহকরণ
Assimilation—আত্তীকরণ
Association—অনুষঙ্গ
Assumption—অঙ্গীকার
Assymetrical—অপ্রতিসম
Atavism—পূর্বগানুকৃতি
Atheism—অনীশ্বরবাদ
Attribute—গুণ, ধর্ম, লক্ষণ
Auditory—শ্রাবণ
Authentic—প্রামাণিক
Automatic—স্বতঃক্রিয়
Awkwardness—অপাটব
Axiom—স্বতঃসিদ্ধ
Back ground—পশ্চাদ্‌ভূমি
Behaviour—ব্যবহার, চেষ্টিত
Being—সত্ত্বা
Bias—পক্ষপাত
Broadcast—সম্প্রচার
By-product—উপজাত
Capacity—সামর্থ্য
Castration—উপস্থচ্ছেদ
Casual—আপতিক, আকস্মিক
Category—পক্ষ, জাতি
Categorial—নিরপেক্ষ, জাতিগত
Causality—কারণতা
Cause—কারণ
Causal—কারণিক
Censor—প্রহরী
Certain—নিশ্চিত
Certainty—নিশ্চয়তা
Certificate—প্রশংসাপত্র, শংসালেখ
Chance—আকস্মিকতা
Chaos—সংপ্লব
Clairvoyance—আলোকদৃষ্টি
Clearness—বৈশদ্য, বিশদতা
Cleptomania—চৌর্যোন্মাদ
Climax—পরাকাষ্ঠা
Code—সংহিতা
Coexistence—সহস্থিতি
Coextension—সহব্যাপ্তি
Cognitive—জ্ঞানীয়
Coincidence—সমাপতন
Common sense—কাণ্ডজ্ঞান
Comparative—তৌলনিক, তুলনাত্মক
Compassion—অনুকম্পা
Compatible—সংগত, অবিরুদ্ধ
Complementary—পূরক
Complex—জটিল
Composite—সংযুত
Composition—সংযুতি

Comprehension—ধারণা
Compromise—সন্ধি, সাম্পত্য
Concatenation—শৃঙ্খলা
Concept—ধারণা, প্রত্যয়
Conception—ধারণা
Concomitant—সহভাবী
Concrete—মূর্ত
Concurrence—সমাপাত, সহঘটন
Concurrent—সহঘটমান, সহগামী
Conditional—সাপেক্ষ
Congenital—সহজাত
Congruity—সংগতি, সামঞ্জস্য
Connotation—জাত্যর্থ
Conscience—বিবেক
Conscious—সজ্ঞান
Consciousness—সংবিৎ, চেতনা
Consequence—পরিণাম, অনুক্রম
Consequent—অনুবর্তী
Constitution—সংস্থান
Contempt—অবমতি, তাচ্ছিল্য
Context—প্রকরণ
Contiguity—সন্নিধি
Continuity—অনবচ্ছেদ
Continuum—সন্ততি
Contour—পরিণাহ, সমপাত
Contrary—বিপরীত
Contrast—বৈসাদৃশ্য
Controversy—বিবাদ
Convention—প্রচল
Converse—বিপরীত
Coordination—সমন্বয়, স্বন্বয়
Correlation—অনুবন্ধ, পারম্পর্য
Correspondence—প্রতিষঙ্গ
Counterpart—প্রতিরূপ
Crime—অপরাধ, দুষ্ক্রিয়া
Criminal—দুষ্ক্রিয়, দুষ্ক্রিতিকারী
Criterion—নির্ণায়ক
Crucial—বিনিশ্চয়ক
Culture—সংস্কৃতি, কৃষ্টি
Cynic—অসূয়ক
Data—উপাত্ত
Day-dream—জাগরস্বপ্ন, দিবাস্বপ্ন
Decadence—অবক্ষয়
Decaying—জরিষ্ণু, অবক্ষয়
Deduction—অবরোহ, অনুমান
Definition—সংজ্ঞা, লক্ষণ
Defined—নিরুক্ত
Degenerate—অপজাত
Degeneration—অপজাত্য
Deism—ঈশ্বরবাদ
Delusion—ভ্রান্তি
Demensia—চিত্তভ্রংশ
Demoralisation—নীতিভ্রংশ
Denotation—ব্যক্ত্যর্থ, বিশেষাভিধান
Depreciation—অপচয়
Design—অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য
Despondency—নির্বেদ
Destiny—নিয়তি
Deviation—চ্যুতি, ব্যত্যয়
Diagnosis—নিদান
Die-hard—দুর্মর
Dilemma—উভয় সংকট
Direct—সাক্ষাৎ, অপরোক্ষ
Discipline—বিনয়, শৃঙ্খলা
Displacement—অভিক্রান্তি
Disquisition—নিবন্ধ
Dissociation—বিষঙ্গ
Divine—দিব্য, স্বর্গীয়
Doctrine—মতবাদ
Dualism—দ্বৈতবাদ
Duet—দ্বৈত গান

Effeminacy—স্ত্রীভাব
Effeminate—স্ত্রীময়, নারীসুলভ
Efferent—বহির্মুখ
Efficacy—সাধকতা, নৈপুণ্য
Effort—প্রযত্ন
Ego—অহম্
Egoism, egotism—আত্মবাদ, অস্মিতা
Elimination—অপনয়
Emaciated—কৃশিত
Emotion—প্রক্ষোভ
Empirical—প্রায়োগিক, প্রয়োগজ
Entity—সত্ত্বা, সত্ত্ব
Environment—প্রতিবেশ, পরিগম
Envy—ঈর্ষা, অসূয়া
Eolithic—আদ্যোপলীয়
Ephemeral—ঐকাহিক
Equilibrium—সাম্য, সুস্থিতি
Equivalent—তুল্য
Equivocation—বাক্‌ছল
Eternal—শাশ্বত, নিত্য, চিরন্তন
Ethics—নীতিবিদ্যা, নীতিজ্ঞান
Ethnology—নৃকুলবিদ্যা
Etiology—নিদানবিদ্যা
Eugenics—সুপ্রজনবিদ্যা
Evolution—অভিব্যক্তি
Exception—ব্যতিক্রম
Expectation—প্রত্যাশা
Expediency—উপযুক্তি
Extract—নিষ্কর্ষ, কাণ্ড
Fact—তথ্য, ঘটনা
Faculty—শক্তি
Fallacy—হেত্বাভাস
Fanaticism—ধর্মোন্মত্ততা
Feeling—অনুভূতি
Feigning—ভান
Fetish—ভক্তিমস্তু
Fetishism—বস্তুরতি
Fine art—ললিতকলা
Finite—পরিমেয়, সান্ত
Foreground—পুরোভূমি
Form—আকার
Formal—বিধিবৎ
Formality—শিষ্টাচার
Formula—সূত্র
Fortuitious—আকস্মিক
Free will—ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্য
Function—বৃত্তি, ধর্ম
Fundamental—মৌলিক, প্রধান
General—সামান্য, সাধারণ
Generalization—সামান্যীকরণ
Generic—জাতীয়
Gregarious—যুথচর, যুথচারী
Gustatory—রাসন
Habit—অভ্যাস
Hallucination—মায়া, অমূলপ্রত্যক্ষ
Hate—দ্বেষ
Hedonism—প্রেয়োবাদ, সুখাসক্তি
Hereditary—বংশগত
Heredity—বংশগতি
Heterogeneous—অসমসত্ত্ব
Homogenous—সমসত্ত্ব
Hypnosis, hypnotism—সংবেশন
Hypothesis—প্রকল্প
Idea—ভাব
Ideal—আদর্শ
Idealism—ভাববাদ, আদর্শবাদ
Identity—একত্ব, অভেদ
Identification—অভেদন
Idiot—জড়ধী, হাবা

Illusion—অধ্যাস
Image—প্রতিরূপ, ভাবমূর্তি
Imagination—কল্পনা
Immanence—ব্যাপিতা
Immediate—অব্যবহিত
Immolation—বলি
Impersonal—অব্যক্তিক
Implication—লক্ষণা
Impulse—আবেগ
Imputation—আরোপ
Inborn—সহজাত, অন্তর্জাত
Incarnation—অবতার
Incest—অজাচার
Incidental—প্রাসঙ্গিক
Incipient—উপক্রান্ত
Incompatible—বিরুদ্ধ
Inconsistent—অসঙ্গত
Indefinite—অনির্দিষ্ট, অনিশ্চিত
Indicative—সূচক
Indirect—পরোক্ষ
Individual—ব্যক্তি, ব্যক্তিগত, প্রাতিস্বিক
Individuality—ব্যক্তিতা
Induction—আরোহ, উপগম
Industry—শিল্প, শ্রমশিল্প
Industrial—শিল্পীয়
Inertia—জাড্য
Inference—অনুমিতি, অনুমান
Inferiority complex—হীনমন্যতা, হীনতাভাব
Infinite—অনন্ত, অমেয়
Infinity—আনন্ত্য, অমেয়তা
Inherence—অধিষ্ঠান
Inheritance—উত্তরলব্ধি
Inhibition—বাধ
Innate—সহজাত
Inner—আন্তর
Insight—পরিজ্ঞান
Instability—অনবস্থা, অনবস্থ
Instinct—সহজ প্রবৃত্তি, জাতপ্রত্যয়
Instinctive—সাহজিক, জাতপ্রত্যয়িত
Instrumentality—কারণতা
Intellect—বুদ্ধি
Interaction—মিথষ্ক্রিয়া
Introspection—অন্তর্দর্শন, অন্তর্দৃষ্টি
Intuition—স্বজ্ঞা
Inversion—বিপর্যয়
Irrelevant—অপ্রাসঙ্গিক
Jealousy—ঈর্ষা, অসূয়া
Judgement—বিচার, সিদ্ধান্ত
Kinaesthesis চেষ্টাবেদন
Law—নিয়ম, বিধি, সূত্র
Lethergy—জড়িমা
Limit—সীমা, অবধি
Local—স্থানীয়
Logic—যুক্তিবিদ্যা
Logical—যৌক্তিক
Logos—শব্দব্রহ্ম
Longing—অনুকাঙ্ক্ষা
Lust—রিরংসা
Luxury—বিলাস
Magic—জাদু, ইন্দ্রজাল
Major—প্রধান, মুখ্য
Malice—পৈশুন্য
Manifest—নিয়ম, বিধি, সূত্র
Masochism—মর্ষকাম
Masochist—মর্ষকামী
Material—ভৌতিক, জড়, অচিৎ
Material cause—স্থূল কারণ
Materialism—জড়বাদ, দেহাত্মবাদ
Maximum—চরম, বৃহত্তম

Mean—মধ্যক, সমক, গড়
Meditation—ধ্যান
Memory—স্মৃতি
Mentality—মানসতা
Mental Science—মানস বিজ্ঞান
Measurement—পরিমাপ
Metaphysical—আধিবিদ্যক
Metaphysics—আধিবিদ্যা
Method—প্রণালী, পদ্ধতি
Migration—অভিপ্রয়াণ
Mind—মন
Minimum—অবম, অল্পতম
Minor—অপ্রধান, লঘু
Misogynist—স্ত্রীদ্বেষী
Modal—প্রকারাত্মক
Monism—অদ্বৈতবাদ
Monotony—একান্বয়, একঘেয়েমি
Moral—নৈতিক
Morality—নীতি
Morbid—ব্যাধিত
Mystic—অতীন্দ্রিয়
Myth—অতিকথা
Mythology—পুরাণ, ঐতিহ্য
Narcissism—স্বকামিতা
Negative—নঞর্থক
Neolithic—নবোপলীয়
Normal—স্বভাবী
Notion—প্রত্যয়, মতি
Object—বিষয়
Objective—বিষয়মুখী
Observation—অবেক্ষণ, পর্যবেক্ষণ
Obsession—আবেশ
Obversion—প্রতিবর্তন
Occasional—কাদাচিৎক
Omnipotent—সর্বশক্তিমান
Omnipresent—সর্বব্যাপী, বিভু
Ontology—তত্ত্ববিদ্যা
Origin—উৎপত্তি, প্রভব
Orthodox—নৈষ্ঠিক
Outer—বাহ্য
Outline—পরিলেখ
Output—উৎপাদ
Over-population—অতিপ্রজন
Over-ruled—প্রতিদিষ্ট
Paleolithic—পুরোপলীয়
Panorama—পরিদৃশ্য
Pantheism—সর্বেশ্বরবাদ
Paradox—কূটাভাস, কূট
Parallelism—সহচার, সহচরবাদ
Passive—ভোগবৃত্ত, নিষ্ক্রিয়
Percept—প্রত্যক্ষ, রূপ
Perfection—পরোৎকর্ষ
Period—কাল, পর্যায়
Periodic—পর্যাবৃত্ত
Persistence—নির্বন্ধতা
Persistent—নির্বন্ধ
Personality—অস্মিতা, ব্যক্তিত্ব
Personification—নরত্বারোপ
Pessimism—দুঃখবাদ
Phase—দশা
Phobia—আতঙ্ক
Portable—সুবহ
Positive—সদর্থক
Positivism—দৃষ্টবাদ, প্রত্যক্ষবাদ
Postulate—স্বীকার্য
Practical—ব্যবহারিক, ফলিত
Pragmatism—প্রয়োগবাদ
Pragmatic—প্রায়োগিক
Precaution—প্রাগ্‌বিধান
Precocity—বালপ্রৌঢ়ি, অকালপক্বতা
Predicate—বিধেয়

Principle—তত্ত্ব, আদর্শ
Probable—সম্ভাব্য
Problem—সম্পাদ্য
Profile—পার্শ্বচিত্র
Projection—অভিক্ষেপ
Prologue—পূর্বরঙ্গ
Propensity—প্রবণতা
Propitiation—প্রসাদন
Proposition—প্রতিজ্ঞা
Psycho-analysis—মনঃসমীক্ষণ
Psychology—মনোবিদ্যা
Psychologist—মনোবিৎ
Punctuality—সময়নিষ্ঠা
Puritanism—অতিনৈতিকতা
Rationalism—যুক্তিপদ
Rationalization—যুক্ত্যাভাস
Reaction—প্রতিক্রিয়া
Real—বাস্তব, যথার্থ
Realism—বাস্তবতা, বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ
Reason—বুদ্ধি, হেতু
Receptive—গ্রাহী
Receprocity—ব্যতিহার
Recognition—প্রত্যভিজ্ঞা
Reconciliation—সমন্বয়
Recreation—বিনোদন
Redundancy—অতিরেক
Reflex—প্রতিবর্তী, প্রক্ষেপ
Relative—আপেক্ষিক, সাপেক্ষ
Relativity—আপেক্ষিকতা
Relaxation—শ্লথন
Repetition—আবৃত্তি
Repression—অবদমন
Reproduction—জনন
Resident—আবাসিক
Resistance—বাধা, প্রতিবন্ধক
Response—প্রতিক্রিয়া, সাড়া
Rhythm—ছন্দ
Sacrament—সংস্কার
Sadism—ধর্ষকাম
Sadist—ধর্ষকামী
Safe-conduct—অভয়পত্র
Sanctimonious—ধর্মধ্বজী
Scepticism—সন্দেহবাদ
School—সম্প্রদায়
Scientist—বিজ্ঞানী
Self-contempt—স্বাবমাননা
Self-evident—স্বতঃপ্রমাণিত
Self-supporting—স্বয়ম্ভর
Sensation—সংবেদন
Sense—জ্ঞানেন্দ্রিয়
Sense-organ—ইন্দ্রিয়স্থান
Sensitive—সুবেদী
Sentiment—রস, আন্তভাব
Sex—লিঙ্গ
Sexual—যৌন, কামজ, লৈঙ্গিক
Sexuality—যৌনতা,কামিতা,কামধর্ম
Simultaneous—যুগপৎ
Sociology—সমাজবিদ্যা
Sodomy—পায়ুকাম
Somnambolism—স্বপ্নচারিতা
Space—দেশ
Speculation—দূরকল্পনা
Spontaneity—স্বতঃবৃত্তি
Smell—ঘ্রাণ
Standard—প্রমাণ
Statistics—পরিসংখ্যান
Stimulus—উদ্দীপক
Stupor—স্তম্ভ, ব্যামোহ
Subconscious—অন্তর্জ্ঞানীয়
Subject—বিষয়
Subjective—বিষয়মুখী
Sublimation—উদ্গতি

Substitution—প্রতিকল্পন
Suggestion—অভিভাব, অভিভাবন
Superintendent—অধিকর্মা
Supernatural—অতিপ্রাকৃত
Suppression—নিরোধ
Syllogism—ন্যায়, অনুমান বাক্য
Symbol--প্রতীক
Symbolism—প্রতীকতা
Symmetry—প্রতিসাম্য
Sympathy—সমবেদনা
Synthesis—সংশ্লেষণ
Taboo—নিষিদ্ধ, টাবু
Tactile—স্পার্শন
Taste—স্বাদ
Technique—কৌশল
Teleology—উদ্দেশ্যবাদ
Texture—গ্রথন
Theism—ঈশ্বরবাদ
Theorem—উপপাদ্য
Theory—সিদ্ধান্ত, বাদ
Theoritical—তত্ত্বীয়, বাদীয়
Tint—আভা
Trance—সমাধি
Transendental—তুরীয়
Type—জাতিরূপ
Unconscious—নর্জ্ঞাত, অবচেতন
Undermining—অধঃকরণ
Universal—সার্বিক, সর্বগত
Utilitarianism—উপযোগবাদ
Utility—উপযোগ
Utopia—রামরাজ্য
Will—সংকল্প
Wish—ইচ্ছা
Vision—দর্শন, দৃষ্টি, ছায়া
Visionary—কল্পিত, ভৌতিক

Geology—ভূ-তত্ত্ব

Alluvium—পলি
Alluvial—পাললিক, পলিজ
Argillaceous—মৃণ্ময়
Antipodal—প্রতিপদ
Atmosphere—আবহমণ্ডল, বায়ুমণ্ডল
Avalanche—হিমানী-সম্প্রপাত
Azoic—অজীবীয়
Barysphere—গুরুমণ্ডল
Boulder– গণ্ডশিলা
Basin—অববাহিকা
Calcareous—চুনা, চূর্ণকময়
Clevage—সম্ভেদ
Conglomerate—সামষ্টিকরণ
Contour—সমোন্নতি রেখা
Coral island—প্রবাল দ্বীপ
Coral reef—প্রবাল প্রাচীর
Crater—জ্বালামুখ
Defile—গিরি-সংকট
Deposition—অবক্ষেপ
Desert—মরুভূমি
Diatom—দ্বি-অণু
Delta—ব-দ্বীপ
Earth's crust—ভূ-ত্বক
Estuary—খাড়ি
Erotion—ক্ষয়
Fault—স্তরচ্যুতি, স্রংস
Felspar—ফেলস্পার

Fissure – ফাটল
Fold – ভাঁজ, বলি
Fold mountain – বলিত পর্বত
Fossil – জীবাশ্ম
Geyser—উষ্ণ প্রস্রবণ
Glacier—হিমবাহ
Gorge—গিরিখাত
Harbour—পোতাশ্রয়
Hemisphere—গোলার্ধ
Horizontal—সামন্তরাল, অনুভূম
Hydrosphere—বারিমণ্ডল
Iceberg—হিমশৈল
Igneous—আগ্নেয়
Impervious – অপ্রবেশ্য
Isobar—সমপ্রেষ-রেখা
Isohyet—সমবর্ষণ-রেখা
Isotherm—সমোষ্ণ-রেখা
Lagoon—উপহ্রদ
Landslip—ভূমিস্খলন, ধ্বস
Latitude—অক্ষাংশ
Lithosphere—অশ্মমণ্ডল
Limestone—চুনাপাথর
Loam—দোআঁশ মাটি
Mesozoic—মধ্যজীবীয়
Metamorphic—রূপান্তরিত
Mica—অভ্র
Mineral – খনিজ, আকরিক
Monsoon—মৌসুমী বায়ু
Movement—আন্দোলন
Navigable – নাব্য
Palaeozoic—পুরাজীবীয়
Petroleum—খনিজ তৈল
Plateau—মালভূমি
Plutonic—পাতালিক
Promontory—শৈলান্তরীপ
Quartz—কোয়ার্টজ
Relief—বন্ধুরতা, উচুনিচু
Ridge—শৈলশিরা
Rock—শিলা
Sand stone—বেলেপাথর
Sedimentary rock—পাললিক শিলা
Silt – পঙ্ক
Slope – ঢাল
Seismic Belt—প্রকম্পন কটিবন্ধ
Seismograph—ভূকম্পন-লেখ
Slag—ধাতুমল
Sedimentary—পালল
Shale—কর্দমশিলা
Stratum—স্তর
Stratification – স্তর বিন্যাস
Stratified – স্তরিত
Sub·soil – অন্তর্ভূমি
Syneline – অবতলভঙ্গ
Table land – সমমালভূমি
Topography—ভূসংস্থান
Tornado—ঘূর্ণবাত
Tropics – গ্রীষ্মমণ্ডল
Vulcano—আগ্নেয়গিরি
Zone—বলয়, মণ্ডল
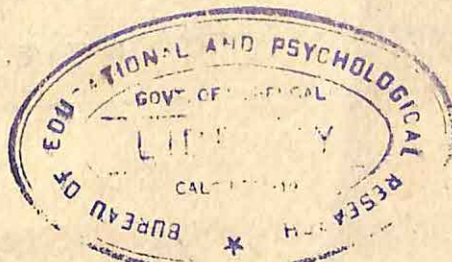
'বিজ্ঞান-ভারতী' ১ম সংস্করণ

ঃ অভিমত ঃ

অধ্যাপক সত্যেন্দ্র নাথ বসু ঃ ......আমাদের ছাত্র ছাত্রীরা নিজের ভাষায় বিজ্ঞানের মৌলিক তথ্যাদি এই অভিধান থেকে সহজে আয়ত্ব করতে পারবে...... ।

দেশ ঃ ......বিজ্ঞান-ভারতী বাংলা ভাষায় প্রথম বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় অভিধান। এক বিষয়ে একে পূর্ণাঙ্গ বলা যায়, কেননা উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি বিশিষ্ট এবং স্বতন্ত্র নিয়ম রক্ষা করা হয়েছে। শুধুমাত্র বিজ্ঞান বিষয়ক যা-কিছু সচরাচর আমাদের জানবার প্রয়োজন হয় বিজ্ঞান-ভারতীতে তা পাওয়া যাবে। এই গ্রন্থ সকল শিক্ষাক্ষেত্রে এবং বিজ্ঞান বিষয়ে উৎসাহীদের হাতে থাকা উচিত...... ।

বসুমতী ঃ ......গ্রন্থকার শুধু ছাত্রছাত্রী নয়, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের কাছেও বিশেষ ধন্যবাদ ভাজন। এই শ্রমসাধ্য কার্য্য বিশেষ অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার পরিচায়ক...... ।

শনিবারের চিঠি ঃ ......বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান রচনায় ও বিজ্ঞানের গ্রন্থপাঠে বইখানা সকলের সহায় হইবে। এইরূপ একখানা বইয়ের অভাব আমরা দীর্ঘদিন অনুভব করিতেছিলাম...... ।

আনন্দ বাজার ঃ ......বিজ্ঞান সম্পর্কে নাতিশিক্ষিত জনসাধারণের মনে অধুনা ব্যাপক কৌতুহল দেখা দিয়েছে। কিন্তু বিদেশী ভাষায় দূরতিক্রম্য মাধ্যমের দরুণ বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির সঙ্গে সাধারণের ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপন সহজসাধ্য নয়। এমতাবস্থায় বিজ্ঞান-ভারতী অভিধানখানা মস্ত একটি অভাব পূরণ করবে...... ।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নরসিংদাস পুরস্কার' প্রাপ্ত গ্রন্থ
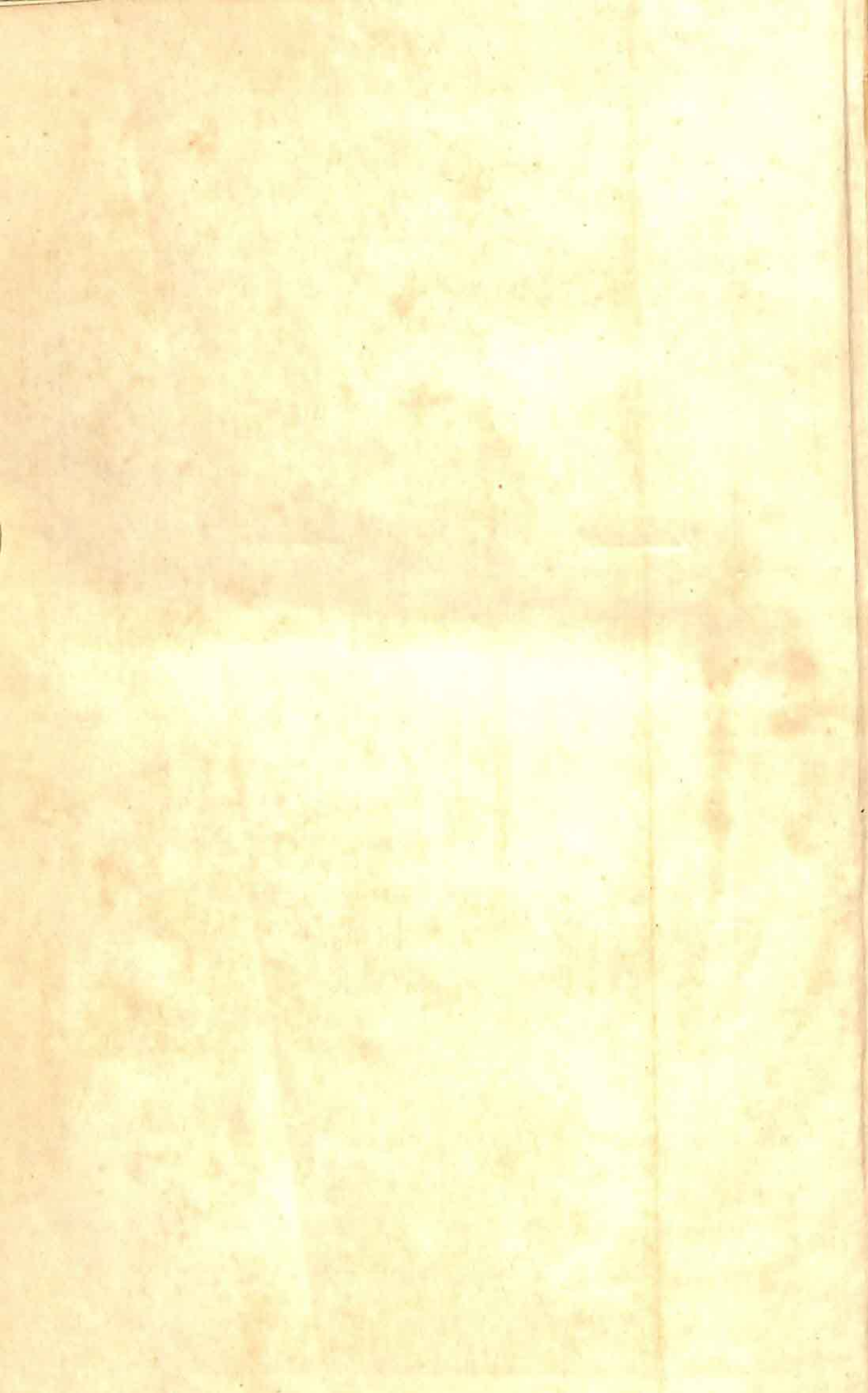
: গ্রন্থকারের অন্যান্য বিজ্ঞান-পুস্তক :

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'রবীন্দ্র পুরস্কার' প্রাপ্ত

'মানব-কল্যাণে রসায়ন'

রসায়ন বিজ্ঞানের এরূপ তত্ত্ব ও তথ্যবহুল সুবৃহৎ গ্রন্থ বাংলা ভাষায় প্রথম : রসায়নের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও সাধারণ বিজ্ঞানানুরাগী পাঠকগণের অবশ্য পাঠ্য।

ভারত সরকারের 'বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি' দপ্তরের উৎসাহ ও অর্থানুকুল্যে প্রকাশিত—

'কিশোর বিজ্ঞানী'

বিভিন্ন কৌতুকপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক সহজ পরীক্ষার মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ ও ঔৎসুক্য বৃদ্ধির সহায়ক পুস্তক।

জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' কর্তৃক প্রকাশিত স্মারক জীবনী গ্রন্থ—

'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র'

ঋষিকল্প দেশব্রতী রসায়নবিদের জীবন, দেশাত্মবোধ, শিক্ষা ও কর্মধারার অনুপম আলেখ্য।

(অন্যান্য আরও অনেক পুস্তক)